বারোটি উপন্যাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বারোটি উপন্যাস

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২

ই-মেল : patrabharati@vsnl.net

ওয়েবসাইট : patrabharati.com

জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে একটির পর একটি উপন্যাস রচনা করেছি যৌবন বয়সে। এইসব উপন্যাসগুলির কোনওটিরই আকার সুবৃহৎ নয়। অনেক বছর কেটে যাবার পর এরকম কিছু-কিছু উপন্যাস আর সুলভ থাকে না। তবু মাঝে-মাঝে এক-একটির খোঁজ পড়ে নানা কারণে। কিছু-কিছু উৎসাহী পাঠক বিশেষ দু-একটি উপন্যাসের খোঁজ জানতে চান। কিন্তু আমি নিজেই সবগুলির সন্ধান রাখতে পারি না।

এখানে যে বারোটি উপন্যাস একত্রিত হল, তাদের স্বাদ আলাদা হলেও জীবনের বিভিন্ন পর্বের একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্রও রয়ে গেছে। কোনও-কোনওটি একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিল। পত্র ভারতীর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় সেগুলি নানান জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এই যে একমলাটবদ্ধ করলেন, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে

বা রো টি উ প ন্যা স

লেখকের অন্যান্য বই

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ১

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ২

সত্যের আড়ালে

রজতের সঙ্গে উর্মির যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিনটার কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। আমিই রজতকে ডেকে এনেছিলাম।

ঠিক এক বছর তিন মাস সতেরো দিন আগে। আমার চোখের আড়ালে জ্বলজ্বল করছে বিকেলটা। ঠিক বিকেল নয়, সন্ধে গড়িয়ে এসেছে প্রায়। তখনও অন্ধকার নামেনি। চতুর্দিকে সূর্যাস্তের লাল আভা।

উর্মিকে নিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে। উর্মি বছর তিনেক ছিল না, ওর দাদা সুকোমল ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল দিল্লিতে, বিরাট কোয়ার্টার পেয়েছিল। শেষের দিকে দিল্লিতে উর্মি হঠাৎ খুব অসুখে পড়ে। দু-মাস প্রায় ভুগল, আমি দেখতেও গিয়েছিলাম একবার।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর উর্মির চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। টাইফয়েড-এর পর কিছুদিন যত্ন করে নিয়ম-কানুন মানলে এরকম হয়। কলকাতায় যখন আবার ফিরে এল, তখন ওকে দেখে মনে হয়েছিল নতুন উর্মি।

আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে স্ট্রান্ডের এই দিকটায় উর্মি অনেক দিন আসেনি। সেখানে দাঁড়িয়ে উর্মি ঘোষণা করল, কলকাতায় এই জায়গাটার মতন এত সুন্দর জায়গা দিল্লিতে কোথাও নেই। উর্মি দিল্লিতে থাকতে কলকাতার অনেক নিন্দে শুনেছে, এমন কি বাঙালিরাও আপসোস করে বলল, নাঃ কলকাতাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একেবারে। উর্মি প্রথম খুব তর্ক করত, তারপব এক সময় নিরাশ হয়ে ভেবেছিল, হয়তো এই তিন বছরে কলকাতা সত্যি বদলে গেছে।

এখন কলকাতাকে ওর নতুন করে ভালো লাগছে। বারবার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলেছিল, এত বড় একটা নদী আর কোন শহরের পাশে আছে বলো তো? নদীর ধারে দাঁড়াতেই ভালো লাগে। এই যে এরকম হু-হু করে হাওয়া—·

হাওয়ায় উড়ছিল উর্মির চুল আর আঁচল। ওর কথাগুলো গানের মতন ঝঙ্কারময় লাগল। উর্মির শরীর থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ ভেসে আসে।

হঠাৎ উর্মি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করেছিল, বিভাসদা, তুমি কখনও গঙ্গাসাগরে গেছ?

আমি বললাম, না তো। কেন?

উর্মি বলল, এখান থেকে নৌকায় চেপে সোজা গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায়? নিশ্চয় যাওয়া যাবে, গঙ্গা তো এখান থেকেই সোজা গিয়ে সাগরে পড়েছে।

আমি একটু হেসে বললাম, যাওয়া যাবে না কেন, তবে অনেক—দিন সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে নামখানা পর্যন্ত বাসে গিয়ে ওখান থেকে নৌকায় কিংবা লঞ্চে—

—আমাকে নিয়ে যাবে?

—কেন হঠাৎ গঙ্গাসাগরে যাওয়ার শখ কেন? তীর্থ করতে নাকি?

—না, না, তীর্থ ফির্ত নয়। গত বছর দিল্লি থেকে আমরা সবাই হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। ঠিক হরিদ্বারে থাকিনি, আমরা ছিলাম লছমনঝোলার একটা ধর্মশালায়। সেখান থেকে জেদ ধরেছিলাম গঙ্গোত্রীতে যাব। শেষ পর্যন্ত দাদা যেতে বাধ্য হল।

—তাই নাকি? কেমন লাগল?

—দারুণ! অনেকটা আমরা পায়ে হেঁটে গেলাম—কেন, তোমাকে আমি লছমনঝোলা থেকে চিঠি লিখেছিলাম, মনে নেই?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—তুমি যদি তখন চলে আসতে পারতে—

—আমার যে আর একটা খুব জরুরি কাজ ছিল।

—তোমার খালি কাজ আর কাজ! হ্যাঁ শোনো, যা বলছিলাম যখন দেখা হল, তখন এর সাগর-সঙ্গমের জায়গাটাও একবার দেখব। কলকাতার এত কাছে, তবু আমাদের দেখা হয় না—

—গঙ্গাসাগরে যাওয়া যেতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে? কথা দাও।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ নিয়ে যাব।

—না, কথা দাও আগে।

—কথা দিচ্ছি। এ আর এমন কি!

—দারুণ ব্যাপার হবে তা হলে। এত বড় একটা নদী, এর জন্মস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা—
——তাও তো আমরা গোমুখী পর্যন্ত যাইনি—

আমি উদারভাবে বললাম, ঠিক আছে, আর একবার আমবা গঙ্গোত্রী গোমুখীর দিকে যাব। আমার তো ওই দিকটা দেখা হয়নি—

আমবা কথা বলছিলাম সিমেন্টেব রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ ধরেই খেযার নৌকা-ঘাটের কাছে একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে সেখানে ভিড় জমছে। শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কথাবার্তা।

ঊর্মি জিগ্যেস করল, ওখানে কী হচ্ছে? এত চ্যাঁচামেচি কেন?

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ওই যে একজন লম্বা মতন ভদ্রলোক, উনিই তখন থেকে ধমকাচ্ছেন দেখছি।

—কোন লম্বা ভদ্রলোক?

ওই যে, দেখতে পাচ্ছ না? দারুণ লম্বা।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরেঃ।

ঊর্মি জিগ্যেস করল, কী হল?

—ও তো রজত।

—তোমার চেনা?

—আমি খুব ভালো করে চিনি ওকে। ও যেখানেই যায় সেখানেই গণ্ডগোল করে।

গোলমালটা আরও বেড়ে গেল। সম্ভবত মারামারি হওয়ার উপক্রম। আমি ঊর্মিকে বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও তো, আমি দেখে আসছি, এক্ষুনি আসছি।

কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, রজত একজন মাঝির গেঞ্জিটা চেপে ধরেছে, তার সঙ্গে একজন রোগা চেহারার যুবক তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, আর একটি মেয়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে। এদের ঘিরে অনেক মানুষ তাবা, মজা দেখছে।

আমি রজতকে কোনওক্রমে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। রজত কিছুতেই আসবে না, মাঝিটা অনেকবার ক্ষমা চাওয়ায় সে একটু ঠান্ডা হল।

রজতকে ওপরে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলাম ঊর্মির সঙ্গে।

দুজনেই ভদ্রতাসূচক নমস্কার করল। কয়েক বছর দিল্লিতে থেকে ঊর্মি অনেক বেশি সপ্রতিভ হয়েছে। রজত আমার দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঊর্মি তাকে বলল, আপনি বুঝি যেখানেই যান সেখানে মারামারি করেন?

রজত একটু চমকে গিয়ে বলল, এ কথা বলছেন কেন? আমার চেহারা দেখে গুন্ডাটুন্ডা মনে হয় নাকি?

ঊর্মি ফুরফুরে হেসে বলল, খুব একটা অবিশ্বাসও করা যায় না।

রজতের খুব পছন্দ হল না কথাটা। আমি জানি, নিজের চেহারা সম্পর্কে রজতের বেশ দুর্বলতা আছে। সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় সে বেশ লম্বা, খুব একটা রোগাও নয়—সেই জন্যেই যে কোনও ভিড়ের মধ্যে তার চেহারাটাই বেশি চোখে পড়ে। এইরকম চেহারা থাকলে আমি খুব গর্বিত হতাম, কিন্তু রজত লজ্জা পায়। যার যে জিনিসটা আছে, সে সেটা বেশি পছন্দ করতে পারে না। রজতের ধারণা, বেশি লম্বা হওয়ার দরুন, লোক ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে। যে চেহারার লোককে সুপুরুষ বলা হয় রজতের চেহারা তার চেয়েও একটু বেশি বড়, অনেকটা পাশ্চাত্যদেশীয়দের মতন।

রজত বলল, হয়তো গণ্ডগোলই আমাকে তাড়া করে। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কিছু না কিছু একটা হয়।

ঊর্মি জিগ্যেস করল, এখানে কী হয়েছিল?

রজত বলল, এই যে নৌকার মাঝিরা আছে না, এরা বেশিরভাগই নিরীহ ভাবের মানুষ—কিন্তু দু-একজন আছে দারুণ শয়তান। আমি এদের সবাইকেই চিনি।

—আপনি কী করে সবাইকে চিনলেন?

—আমি নৌকার মাঝিদের নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈরি করার চেষ্টা করেছিলাম এক সময়। সেই সূত্রে—

আমি রজতের কথার মাঝখানেই ঊর্মিকে বললাম, তোমার কাছে রজতের পুরো পরিচয় দেওয়া হয়নি। রজত একজন সাংবাদিক, তাছাড়া আবার রাজনীতি করার দিকে ঝোঁক আছে। ওর একটা মোটরবাইক আছে, সেটা নিয়ে চারিদিকে টো-টো করে ঘোরে। এত জোরে চালায় মোটরবাইকটা—

ঊর্মি বলল, এত সুন্দর জায়গা, এখানে ইউনিয়ন কিংবা গণ্ডগোল একদম ভালো লাগে না। আপনি বুঝি ওখানে ইউনিয়ন পাকাতে গিয়েছিলেন।

রজত একবার হাসলো, বলল না, আজকের ব্যাপারটা অন্যরকম। অনেক সময় ছেলেরা মেয়েরা এখানে নৌকায় করে গঙ্গায় বেড়াতে যায়। একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চায় আর কি, এর মধ্যে দোষের তো কিছু নেই।

ঊর্মি বলল, নৌকায় চেপে প্রেম, ভালোই তো।

রজত বলে, যদি শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যায়, আর ছেলেটি যদি একটু দুর্বল ধরনের হয়, তাহলে দু-একটা শয়তান মাঝি নদীর মাঝখানেতে নৌকো নিয়ে গিয়ে তাদের ভয় দেখায়।

—কী ভয় দেখায়?

—নানা রকম আজেবাজে কথা বলে। বেশি টাকা চাওয়ার ফন্দি আর কি।

—আজকেও বুঝি তাই হয়েছিল?

—হ্যাঁ, ছেলেটি আর মেয়েটি ফিরে এসে নালিশ করছিল অন্যদের কাছে, মেয়েটি তো দারুণ ভয় পেয়ে গেছে—মাঝিটা উলটে ওদের নামে এমন খারাপ-খারাপ কথা বলতে লাগল—এইরকম করলে আর কেউ কি নৌকায় চাপতে রাজি হবে এখানে?

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। এবার বললাম, এইরকম কাণ্ড হয় নাকি? বাবাঃ! আমিই তো একটু আগে ভাবছিলাম ঊর্মিকে নিয়ে একটু নৌকাতে বেড়াব!

ঊর্মি তৎক্ষণাৎ বলল, চলো না, যাই।

—আর না বাবাঃ! এইরকম কাণ্ড যদি হয়।

রজত বললে, তোমরা যেতে পারো। গোলমাল করলে দুই ধমক দিয়ে দেবে।

—না থাক, আজ আর দরকার নেই।

—আরে ভয় পাচ্ছ নাকি! চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

রজত একটু জোর করতে লাগলো, আমি তাকে এড়িয়ে গেলাম। রজতটা বেরসিক। আমি উর্মিকে নিয়ে নৌকোয় বেড়াতে চাই, তার মধ্যে কি তৃতীয় ব্যক্তির স্থান থাকে?

আমি একটু ঠাট্টা করে রজতকে বললাম, তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে? একলা-একলা কেউ গঙ্গার ধারে বেড়াতে আসে, এমন তো কখনও শুনিনি।

আমি এসেছিলাম অন্য কারণে। ওই জাহাজটায় যাব—

রজত হাত দিয়ে জাহাজ দেখিয়ে দেয়। জাহাজটার সর্বাঙ্গে আলো জ্বলছে, জলে পড়েছে তার ছায়া। হঠাৎ জাহাজটাকে একটা রূপকথার দৃশ্য বলে মনে হয়। কী একটা দুর্বোধ্য ভাষায় জাহাজটার নাম লেখা।

আমি রজতের কথা শুনে হেসে উঠলাম, আমি জানি, রজত যখন তখন এরকম বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে।

রজত কিন্তু গম্ভীর থেকেই বলল, হাসলে কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না?

উর্মিও হাসছিল। রজত বলল, আমি সত্যিই ওই জাহাজটায় যাব, ওখানে আমার এক বন্ধু কাজ করে।

আমি বা উর্মি তখনও বিশ্বাস করিনি। আমাদের চেনাশুনা জগতের কেউ গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসে বিদেশি জাহাজে ওঠে না।

উর্মির দিকে ফিরে রজত জিগ্যেস করল, যাবেন?

উর্মি তৎক্ষণাৎ বলল, চলুন।

উর্মির কথায় যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর ছিল। রজত প্রায় জোর করে আমাদের নিয়ে গেল ঘাটের কাছে। একটা নৌকা ভাড়া করল। জাহাজটার পাশে এসে রজত আগে একা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। আমরা নৌকোতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডেকে দুজন নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল, রজত তাদের সঙ্গে কি যেন কথা বলল, একটুক্ষণ। তারপর সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, আমার চেনা সেকেন্ড অফিসার মিঃ জেকিন্স এখন নেই, তিনি শহরে গেছেন। কিন্তু তোমরা ওপরে এসে জাহাজটা দেখে যেতে পারো, আসবে?

শুধু-শুধু একটা জাহাজ ঘুরে দেখতে রাজি হবে, এরকম মফস্‌সলেপনা উর্মির নেই। সে মাথা নেড়ে বলল, থাক, দরকার নেই।

রজত দু-একবার পেড়াপেড়ি করল, কিন্তু উর্মি রাজি হল না। নেমে এল রজত।

উর্মি বলল, নৌকোতে উঠেছিই যখন তখন একটুক্ষণ ঘুরি।

রজত বললে, বেশ তো!

আমি আপত্তি করলাম। গ্রীষ্মকাল, আকাশ মেঘলা। আকাশের চেহারা ভালো নয়।

আমি বললাম, না, এখন আর নৌকোয় চড়া দরকার নেই। চল, ফিরি বরং।

রজত, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কেন, যাবে না কেন?

—ঝড় উঠতে পারে।

—ঝড়, তা উঠুক না? ঝড় উঠলে কি হবে? তুমি কি ভাবছ—নৌকো উলটে যাবে।

—কেন, যায় তো মাঝে-মাঝে?

রজত হেসে উঠে বলল, আরে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি? তুমি সাঁতার জানো না?

উর্মিও আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই বিভাসদা, তুমি বুঝি নৌকোয় চাপতে ভয় পাও?

আমি একটু হেসে চুপ করে গেলাম? উর্মির কথাটাতে আমার মনে একটু আঘাত লেগেছে। আমি কি নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি?

উর্মি সাঁতার জানে না, হঠাৎ যদি একটা বিপদটিপদ হয়ে যায়। আমি পাঁচ-ছ'বছর বয়েস থেকেই সাঁতার জানি, এমন কি স্রোতের গঙ্গাও আমার কাছে বিপজ্জনক নয়।

রজত বলল, তোমার ভয় নেই, বিভাস। নৌকা যদি উল্টেও যায়, আমি তোমাদের দু-জনকে বাঁচাতে পারব। আমার লাইফ সেভিং-এর সার্টিফিকেট আছে।

রজত ধরেই নিয়েছে, আমি সাঁতার জানি না। এক একজন আছে, যারা নিজের সম্পর্কে সব কথা বেশ অনায়াসে বলে ফেলতে পারে। আমি পারি না।

সন্ধেটা সত্যি বড় মনোরম ছিল। একটু জোরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার স্পর্শ ঠিক মাখনের মতন কোমল। চাঁদ ওঠেনি, ঠিক যেন বৃষ্টির মতন ঝির ঝির করে অন্ধকার নামছে।

রজত কী একটা গান গাইছিল গুনগুন করে। হঠাৎ এক সময় সেটা থামিয়ে সে উর্মিকে জিগ্যেস করল, আপনি গান জানেন না? একটা গান করুন না!

উর্মি বলল, না আমি গান জানি না। বিভাসদা ভালো গান করতে পারে। বিভাসদা, একটা গান গাও না।

রজত বলল, বিভাসের গান আমি শুনেছি। আপনার গান শুনতে চাই।

—আমি সত্যি গান জানি না।

—যা জানেন, তাই করুন।

—আমার গলায় সুরই আসে না।

কিন্তু নদীর ওপারে একটা নৌকোবক্ষে একজন নারীর গানই মানায়। তা ছাড়া উর্মির মতন একজন সপ্রতিভ মেয়ে গান জানে না, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুতরাং রজত পেড়াপীড়ি করতে লাগলো। যদিও আমি জানি উর্মির গলায় টনসিল অপারেশনের পর ঠিক সুর আসে না, তবে সে সেতার বাজাতে পারে।

নিরাশ হয়ে রজত নিজেই একটা গান ধরল। বেশ দরাজ গলা ওর। প্রবল হাওয়ার মধ্যেও পাল্লা দিতে পারে। যদিও সুর একটু কম। তা হোক, তবু ওইরকম জায়গায় এরকম খোলমেলা গলার গানই মানায়। কী যেন ছিল সেই গানটা? হ্যাঁ। সেটাও মনে আছে, রজত গেয়েছিল, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কি ব্যাকুলতা....

উর্মির সেই যে শখ যেখানে মিশেছে সেই জায়গাটা দেখা—এটা সেদিন রজতের সামনেও বলেছিল কিনা আমার ঠিক মনে নেই। প্রসঙ্গক্রমে উঠতেও পারে। বিশেষত নৌকোতে বেড়াবার সময়। তাহলে এর পরবর্তী ঘটনাকে নিতান্ত আকস্মিক বলা যায় না।

রজত এর পর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি এসেছে। দু-তিনবার দেখা হয়েছে উর্মির সঙ্গে। উর্মি আমাদের বাড়ি প্রায় রোজই আসে। ওর দাদা সুকোমলের সঙ্গে আমি ইস্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছি। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের চেনা। সুতরাং উর্মি আমাদের বাড়িতে আসবে, এর মধ্যে কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচের ব্যাপার নেই। উর্মিকে আমি বিয়ে করব, এটা চার-পাঁচ বছর আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির লোকেরাও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু কেউ কোনও উচ্চবাচ্চ করেনি। তার কারণ, আমাদের জাতের অমিল। আমাদের বা উর্মির পরিবারটা খুব গোঁড়া না হলেও জাতের সংস্কারটা এখনও মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। ভিন্ন জাতের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করতে নিজে থেকে এগিয়ে আসতে পারবে না। ভাবখানা এই, আমি আর উর্মি যদি জোর করি তা হলে ওঁরা মেনে নেবেন।

আমার ঠিক পরের বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামী মাসেই তার বিয়ের তারিখ। ওর বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজের বিয়েটা পিছিয়ে দিয়েছি। এটাই সবদিক থেকে ভালো দেখায়।

উর্মিকে মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলেছি, তোমার তো পরীক্ষাটরীক্ষা হয়ে গেছে, হাতে কোনও

কাজ নেই, দেখো যেন ঝট করে অন্য কারুকে বিয়েটিয়ে করে বসো না!

উর্মি ঠাট্টা করে উত্তর দিয়েছে, আমি যে আর একদিনও অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি যে মরে যাচ্ছি একেবারে!

একদিন আমি একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলাম। সেদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। ফাঁকা বাড়ি, এই সময়ে উর্মি এসে উপস্থিত। বুকের মধ্যে ছমছম করে ওঠে।

উর্মির জন্য কখনও আমাকে লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয়নি। কখনও প্রয়োজন হয়নি লুকিয়ে দেখা করার কিংবা অন্যদের মিথ্যে কথার বলার। ওকে যে-কোনও সময় আমি টেলিফোন করেছি, কিংবা চিঠি লিখেছি, বাড়ির লোকেরা সবাই জানে। উর্মির অসুখের সময় যে আমি ওকে দিল্লিতে দেখতে গেলাম—সে ব্যাপারেও কেউ কোনও প্রশ্ন করেনি। এটা যেন আমার অধিকার।

কিন্তু ফাঁকা বাড়িতে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। উর্মিকে চুমু টুমু খেয়েছি অনেকবার, বেশি এগোইনি কখনও। সেদিন বুকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল, কিংবা ঠিক ঝড় নয়, কি যেন একটা বুকের মধ্য থেকে ফেটে বেরোতে চাইছে।

আমি উর্মিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, উর্মি আমি তোমাকে দেখতে চাই।

উর্মি আমার ঘাড়ের কাছে ঠোঁট রেখে দুষ্টুমিভরা গলায় বলেছিল, উঁহু!

আমি ওর গলা, বুক ও কোমর আচ্ছন্ন করে দিলাম চুমোতে। উর্মি প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠল। শারীরিক আদরে উর্মি যতখানি আনন্দ পায়, ততখানি বাইরেও প্রকাশ করে। রেখে-ঢেকে রাখে না। তা ছাড়া আমার কাছে লজ্জা দেখাবারও কোনও কারণ নেই। শরীরের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার এক বিন্দুও নষ্ট করতে চায় না উর্মি। ও নিজেই ওর ব্লাউজের কয়েকটা বোতাম খুলে আমাকে বলেছিল, তুমি এইখানটায় মুখ রাখো, আমাকে খুব জোরে ধরো—

পাশেই বিছানা। উর্মির কোমরে আমার হাত, আর একটা হাত ওর শাড়ির আঁচলে। ইচ্ছে করলে এক্ষুনি আমরা চরম আনন্দে মেতে উঠতে পারি।

উর্মিকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েও আমি থেমে গেলাম। হঠাৎ মনে হল, কোনও বাধা যখন নেই, তখন এত তাড়াতাড়ির কি আছে? এটা তো শুধু আনন্দের ব্যাপার না, এটার মধ্যে যেন অনেক পবিত্রতাও রয়েছে। আর বড়জোর দু-মাস বাদেই তো বিয়ে হবে—এ ব্যাপারটা সেদিনের জন্য তোলা থাক।

আসলে তখন আমি প্রচণ্ড নির্বোধ ছিলাম। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি সেদিন।

উর্মি প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল, তবু আমি তাকে বললাম, ইস, আর একটু হলে কি করে ফেলছিলাম! না, না, এখন থাক—সব জমা থাক সেই দিনটার জন্য—

উর্মিও সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বিভাসদা, তুমি কী ভালো! আমাকেও তোমার মতন ভালো করে দাও না! আমি যদি কখনও কোনও ভুল করতে যাই, তুমি আমাকে সাবধান করে দিও। দেবে তো?

আমি বলেছিলাম, আমরা দুজনেই দুজনেকে ভালো করব। আরও অনেক বেশি ভালো।

যাক, রজতের কথা বলছিলাম। রজতের সঙ্গে উর্মির খুব ভাব হয়ে গেল, এতে আমার ঈর্ষার কোনও কারণ নেই। ভালোবাসা মানে বন্ধন নয়। আমি উর্মিকে কখনও সম্পূর্ণ আঁকড়ে ধরতে চাইনি—ওর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য দিয়েছি সবসময়, ওকে খোলা মেলা থাকতে দিয়েছি।

রজত খুব ভদ্র ছেলে। মাঝে-মাঝে উলটোপালটা মিথ্যেকথা বলে, হইচই চেঁচামেচি করতে ভালোবাসে, কিন্তু কখনও অসঙ্গত কিছু করে না, বন্ধুত্ব, স্নেহ, মমতা—এই সবের মূল্য দেয়। ওর চেহারাটা যেমন বড়, তেমনি ওকে দেখলেই মনে হয়, ওর প্রাণশক্তিও যেন অনেক বেশি। ওর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আছে—যারা হিমালয়ে উঠেছে কিংবা হেঁটে মরুভূমি পার হয়েছে কিংবা ডুব দিয়ে সাগরের তলায় নেমেছে, রজত যেন সেই মানুষের দলে।

রজত একদিন এসে বলল, ও ওদের কাগজের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের মেলায় যাচ্ছে। উর্মি তখন উপস্থিত ছিল। শুনেই তো লাফিয়ে উঠল। ছেলেমানুষের মতন বলতে লাগল আমিও যাব, আমিও যাব—.

রজত বলল, চলুন না—

—মেয়েরা যেতে পারে?

—কেন পারবে না?

—তাহলে আমি ঠিক যাব। আমাকে নিয়ে যাবেন?

—আমি হাসতে-হাসতে রজতকে বললাম, তুমি নিয়ে যাও না ওকে! ওর খুব গঙ্গাসাগর দেখার ইচ্ছে।

উর্মি আমার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে রাগের সঙ্গে বলল, তার মানে? তুমি যাবে না?

—মেলার সময় দারুণ ভিড় হবে যে।

—হোক না ভিড়।

—অত ভিড়ের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, তোমাকে বলেছি তো আমি একবার নিয়ে যাব—

—কেন? এখন যাব না কেন? এখন বেশ সবাই যাচ্ছে।

রজত বলল, অন্য সময় যাওয়ার খুব সুবিধে নেই। এখনই বরং অনেক লঞ্চ-স্টিমার কিংবা স্পেশাল বাস যায়—

উর্মি বলল, আমরা স্টিমারে যাবো, সেই বেশ মজা হবে।

রজত আমাকে বলল, চলো না, দেখে তোমারও ভালো লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু ওখানে থাকা হবে কোথায়? হোটেল টোটেল আছে?

রজত হাসল। তারপর বলল, সেসব নেই অবশ্য। তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার একটু অসুবিধে হবে অবশ্য।

রজতের এই এক দোষ, আমাকে মাঝে-মাঝে বড়লোক বলে খোঁচা দেয়। আমাদের পরিবারের অবস্থা সচ্ছল, আমি একটা ভালো চাকরি করি—এটা কি আমার দোষ? আমরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা বলেই আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ি আছে। রজতের বাড়ি নেই, কিন্তু আজকাল সাংবাদিকরাও তো ভালোই মাইনে পায়। রজত কাজ করে সবচেয়ে নাম-করা ইংরেজি কাগজে।

আমি বললাম, সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন উঠছে না। থাকার তো একটা জায়গা চাই। আমি যেখানে খুশি থাকতে পারি—কিন্তু উর্মি, মানে মেয়েদের তো একটা জায়গা না হলে চলে না।

রজত বলল, সে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

উর্মি বলল, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না, আমি যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারব—সবাই যেখানে থাকবে।

আমি বললাম, কিন্তু বাথরুম টাথরুম।

উর্মি বলল, অত চিন্তা করলে চলে না।

রজত বলল শুনুন, শুনুন, আমি বলছি। আগে আর একবার আমি তো ওই মেলায় গেছি, তাই আমি ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা জানি। সবাই যেখানে থাকে সেখানে আপনারা থাকতেও পারবেন না। থাকতে হবেও না। এত বেশি ভিড় হয় যে মানুষজন সবাই খোলা মাঠেই শুয়ে থাকে—কিছু-কিছু হোগলার ছাউনি হয় বটে, কিন্তু সেখানে আর কজন জায়গা পায়!

—তা হলে আমরাও কি খোলা মাঠে?

—না। গভর্নমেন্ট-এর অফিসার এবং মন্ত্রীদের জন্য আলাদা তাঁবু থাকে, অনেকগুলি ঘর তৈরি হয়। ঘরগুলো অবশ্য খড় আর হোগলা দিয়ে তৈরি—কিন্তু থাকা যায় মোটামোটি, মাটিতে

খড় পেতে গদি করে—

উর্মি বলল, তা হলে ভালোই।

রজত বলল, বাথরুমেরও ব্যবস্থা আছে এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত—যদি কেউ রান্না করতে চায়।

আমি বললাম, এসব তো গর্ভনমেন্ট অফিসার আর মন্ত্রীদের জন্য, সেখানে আমাদের থাকতে দেবে কেন?

রজত বলল, সাংবাদিকদের জন্যও আলাদা অনেকগুলো ঘর আছে। তা ছাড়া আমি যদি তোমাদের জন্য এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারি, তা হলে আর সাংবাদিক হয়েছি কেন?

উর্মি বলল, ব্যস, তা হলে ঠিক হয়ে গেল। বিভাসদা, আমার তবে কবে যাচ্ছি?

উর্মি সত্যিই ছেলেমানুষ। এত সহজে কি সব ঠিক হয়? এখনও তো উর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। তবে আগেই কি স্বামীস্ত্রীর মতন দুজনে বেড়াতে যেতে পারি?

উর্মি ওর বাড়ি থেকে একা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বলে যেতে পারে। আমার পক্ষেও সেরকম ভাবে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় গেলে পরে সেটা জানাজানি হয়ে যাবেই। আমি চট করে মিথ্যে বলতে পারি না। মাত্র আর দু-তিন মাস পরেই যেটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এখন সেটাই হবে একটা কলঙ্কের ব্যাপার। এ রকম ভাবেও অনেক ছেলে-মেয়ে যায় আজকাল। কিন্তু আমার মনটা ঠিক সায় দেয় না।

উর্মিকে নিরস্ত করার জন্য আমি বললাম, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ পড়ে গেছে এই সময়। অফিসে এমন কতকগুলো জরুরি কাজ আটকে গেছে।

উর্মি বলল, রাখো তোমার অফিস! তুমি না থাকলে বুঝি তোমার অফিস চলবে না?

রজত সেইসঙ্গে যোগ দিয়ে বলল, আরে চলোই তো, দেখবে খুব ভালো লাগবে।

আমি রজতকে বললাম, তোমার আর কি! তুমি তো দিব্যি যাচ্ছ অফিসের কাজে। কাজও হবে, বেড়ানোও হবে।

রজত বলল, আমি বেড়াতে ভালোবাসি বলেই এসব জায়গায় যাই। নইলে আমি অফিসকে বলে অন্য কারুকে এবার পাঠাতে পারতাম, আমি তো আগে একবার গেছি—

চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমার যে বোনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে, তাকে নিয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝর্ণার সঙ্গে উর্মির বেশ ভাব আছে। ওরা দুজনে যদি যায়, তা হলে আমি ওদের অভিভাবক হিসাবে অনায়াসেই যেতে পারি। বিসদৃশ কিছু দেখাবে না।

ঝর্ণাকে আমি কথাটা বলতেই সে রাজি। উর্মিও অনুরোধ করল তাকে। বাবা-মাকেও রাজি করানো গেল। আর কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক হয়ে গেল যে আমি ঝর্ণাকে সঙ্গে করে নিয়ে উর্মির বাড়ি থেকে তাকে তুলে নেব—রজত দাঁড়িয়ে থাকবে ওর অফিসের সামনে—আমার অফিসের গাড়িটাই আমাদের নামখানা পৌঁছে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে লঞ্চ।

কিন্তু ঝর্ণাই শেষ পর্যন্ত গণ্ডগোল বাধালো। যাওয়ার আগের দিন ওর একটু জ্বর এসে গেল। সামান্য সর্দি-জ্বর যদিও, কিন্তু বাবা-মা ওকে আর যেতে দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। গঙ্গাসাগরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় ওর যদি জ্বর বেড়ে যায়? কয়েকদিন পরেই যার বিয়ে, তার সম্পর্কে এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

ঝর্ণা বেচারি নিরাশ হয়ে গেল খুব। ওর দারুণ ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। ও প্রাণপণে জ্বরটা লুকোতে গিয়েও ধরা পড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, ঝর্ণা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও ঠিকই বুঝেছিল উর্মির জন্যই আমি ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ঝর্ণা আমাকে বলল, দাদা তুমি কিন্তু উর্মিকে ঠিক নিয়ে যাবে। আমার জন্য ওর কেন যাওয়া হবে না? কেউ কিছু বলবে না, তুমি নিয়ে যাও।

আমিও সেই কথাটা চিন্তা করেছিলাম। উর্মি তৈরি হয়ে বসে থাকবে, এখন কি ওকে আর

বলা চলে যে যাওয়া হবে না? উর্মি যে ভীষণ জেদি মেয়ে।

ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। উর্মিদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই ও তৈরি হয়ে নেমে এল। বিস্মিত ভাবে বলল ঝর্ণা কোথায়? ঝর্ণা আসেনি?

আমি ওকে ঝর্ণার কথা জানালাম।

উর্মির মনটা খারাপ হয়ে গেল। আন্তরিকভাবে বললে, ইস বেচারি যেতে পারল না। আচ্ছা, ও গেল না, তবু যদি আমি যাই, তাহলে ও কি দুঃখ পাবে?

আমি বললাম, না না, তাতে কী হয়েছে। ও পরে কখনও যেতে পারবে নিশ্চয়ই। এখন রিস্ক নেওয়া যায় না বলেই—

আমি যেন উর্মিকে রাজি করাচ্ছি। ওকে তুলে নিয়ে চলে এলাম রজতের অফিসে। রজত সেখানে নেই।

আমাদের আসবার কথা ছিল সকাল সাড়ে ছটার মধ্যে। আমরাই বরং পনেরো মিনিট দেরি করে ফেলেছি। রজত কি আমাদের ফেলেই চলে গেল? উর্মির সেই রকমই ধারণা হল।

আমি অফিসের দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জানলাম, রজত তখনও আসেনি।

আমি আর উর্মি কাছাকাছি একটা দোকানে চা খেতে গেলাম।

উর্মিকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ও পরেছে একটা বেলবটম প্যান্ট আর একটা কারুকার্য করা শার্ট। দিল্লিতে মেয়েরা এরকম পোশাক খুব পরে, কলকাতায় যে পরে না তা নয়, কিন্তু এটাকে ঠিক তীর্থযাত্রার পোশাক বলা যায় না। তা হোক না। আমরা তো তীর্থ করতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি প্রকৃতি-দর্শনে। কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমার যে-কারণে গিয়েছিল।

আমি বললাম, উর্মি তোমাকে তো খুব সুন্দর মানিয়েছে।

উর্মি বলল, তোমার পছন্দ হয়েছে? এমনি রাস্তায় ঘাটে পরতে লজ্জা করে, বাইরে যাচ্ছি বলেই—

—আমরা যখন কাশ্মীরে যাব, তখন তুমি এরকম পোশাক যত ইচ্ছে পরতে পারবে!

—আমরা কাশ্মীরে যাচ্ছি, বুঝি? কবে?

—এই ধরো আর মাস তিনেক বাদেই।

উর্মির মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে মেয়েরা সাধারণত একটু লজ্জা পায়। উর্মির খুশিটা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। ও বাইরে বেড়াতে খুব ভালোবাসে। আমি ওকে বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি।

চা খেয়ে ফিরে এসেও দেখলাম, রজতের পাত্তা নেই। এদিকে সাতটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। রজত নিজেই বলেছিল, বেলা বেড়ে গেলে দারুণ ভিড় হবে। লঞ্চে জায়গা পাওয়া যাবে না।

উর্মি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অসহিষ্ণু ভাবে বলল, তোমার বন্ধু কীরকম! বড় দায়িত্বহীন তো!

আমি বললাম, কোনও কারণে আটকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

—একটি টেলিফোন করে খবর দিতে তো পারত।

—আর একটু অপেক্ষা করে দেখোই না।

—প্রায় একঘণ্টা হয়ে গেল। যদি যাওয়া না হয়?

—অত চিন্তা করতে হবে না। রজত যদি শেষ পর্যন্ত নাও আসে, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বেরিয়ে যখন পড়েছি, আর ফিরব না।

আমার কথার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে মোটর সাইকেল নিয়ে রজতকে আসতে দেখা গেল।

রজতের বড়-বড় চুলগুলো উড়ছে। চোখে কালো চশমা, গায়ে ডোরাকাটা রঙিন একটা জামা।

মোটরসাইকেল আরোহীদের সাধারণত বেশি বীরপুরুষের মতন দেখায়, বসার ভঙ্গিটার জন্য। রজতকে আধুনিক কালের এক দস্যুদলপতির মতন দেখাচ্ছে।

দেরিতে আসবার জন্য রজত কোনওরকম ক্ষমা প্রার্থনা বা ভনিতা করল না। চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে উৎফুল্ল ভাবে বলল, তোমরা এসে পড়েছ? বাঃ! আমি ধরেই নিয়েছিলাম তোমাদের দেরি হবে।

ঊর্মি বলল, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

সত্যিই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির পাশে রাস্তায়। রজত হাসতে হাসতে বলল, কেন দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেই পারতেন। তাহলে এখন বেরিয়ে পড়া যাক?

আমি বললাম, আমরা রেডি। আমার বোন আসতে পারল না।

রজতও ওর মোটরসাইকেলটা রেখে এল অফিসের মধ্যে। তারপর আমার গাড়িতে উঠে এসে বলল, বিভাস, তুমি ড্রাইভার এনেছ কেন? গাড়ি তো আমিও চালাতে পারি। শুধু-শুধু ওকে অতদূরে নিয়ে যাবে।

গাড়ি চালানোটা কোনও সমস্যা নয়। গাড়ি চালাতে তো আমিও জানি। কিন্তু রজতের মতন এরকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সে কথা আমি কখনও জানাতে পারতাম না।

একটু হেসে বললাম, আমরা ফিরব দুদিন পরে। কিন্তু অফিসের গাড়ি তো দুদিন নামখানায় পড়ে থাকতে পারবে না।

রজত বলল, ও অফিসের গাড়ি! আমি তো গাড়িটা দেখে ভেবেছিলাম একটু চালাব।

তা চালাও না। ড্রাইভার পাশে বসছে।

রজত সঙ্গে-সঙ্গে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসল। তারপর ফাঁকা রাস্তা পেয়েই দারুণ স্পিড দিল। একটু পরেই বোঝা গেল রজত দুঃসাহসী। বিপজ্জনক গাড়ি চালাতে ভালোবাসে। এটা ওর চরিত্রের সঙ্গে মানায়।

বেশি জোরে গাড়ি চালালে, পেছনের সিটে কোনও কোনও মেয়ে ভয় পায়। কোনও-কোনও মেয়ে খুশির উত্তেজনা বোধ করে। ঊর্মি সেই দ্বিতীয় দলের। ঊর্মিকে খুশি দেখেই আমি আর রজতকে সংযত হতে বললাম না। ড্রাইভার যদিও আমার দিকে বারবার ভীতভাবে তাকাচ্ছে।

রজত অন্তত তিনবার দুজন মানুষ এবং একটি ছাগলছানাকে চাপা দিতে-দিতে কোনওক্রমে রক্ষা পেল। একবার এত জোরে অকস্মাৎ ব্রেক কষল যে আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

রজত দীপ্তমুখে পেছন ফিরে আমাদের জিগ্যেস করল, কী ভয় করছে না তো?

ঊর্মি বলল, আপনি মোটেই ভালো গাড়ি চালাতে পারেন না।

রজত তখন আরও গতি বাড়িয়ে দিল। আমি মৃদু গলায় বললাম, আমাদের প্রাণ যায় যাক, শুধু যেন গাড়িটার কোনও ক্ষতি না হয়, সেটা দেখো। অফিসের গাড়ি।

রজত আর ঊর্মি দুজনেই এ কথায় হেসে উঠল হো-হো করে।

নামখানার কাছাকাছি এসে, পথে যখন মানুষজনের ভিড় খুব বেড়ে গেল, সেখানে অবশ্য আমি প্রায় জোর করে রজতকে সরিয় ড্রাইভারকে বসালাম সেখানে। একটু পরে আর গাড়ি চলতে পারল না। আমরা নেমে গেলাম।

রজত এই সময় ঊর্মির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি এ কি পোশাক পরে এসেছেন!

সে এমনভাবে ঊর্মির দিকে তাকিয়ে রইল যেন আগে তাকে দেখেনি।

ঊর্মি একটু অবাক হয়ে বলল, কেন, কি হয়েছে?

—এরকম পোশাক পরে কেউ গঙ্গাসাগর যায় নাকি?

—সেখানে যাওয়ার জন্যে বুঝি বিশেষ কোনও পোশাক আছে?

—তা নয়, তবু সাধারণ পাঁচজনে যেরকম পরে।

—আমি তো এটাকে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

না, না, এটা ছেড়ে একটা শাড়ি পরে ফেলুন।

রজতের সঙ্গে উর্মির প্রায় একটা ঝগড়া হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আরে রজত, তুমি যে এত গোঁড়া, তা তো আমি জানতাম না। এরকম তো আজকাল অনেকেই পরে।

রজত বলল, তা পরুক। কিন্তু একটা তীর্থস্থানে এরকম বড়লোকের মতন পোশাক পরে আলাদা থাকার কোনও মানে হয় না। সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়াই উচিত।

উর্মি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আর আপনি যে জামাটা পরে আছেন, সেটাই বা কি এমন সাধারণ?

রজত বলল, আমার কথা আলাদা। আমি রিপোর্টার মানুষ, আমাদের পোশাক যেরকমই হোক—

উর্মি বলল আমাকে আর একটু চিনলে বুঝতে পারবেন, আমার কথাও আলাদা।

আমি পরে আছি একটা সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট। এটাই আমার প্রতিদিনকার পোশাক। ওখানে জল-কাদায় ঘোরার জন্য আমি একটা খাকি রংয়ের প্যান্ট এনেছি অবশ্য। কিন্তু সাদা রংই আমি বেশি ব্যবহার করি। তা হলেও, অন্যদের গায়ের রংচঙে পোশাক আমার খুব ভালোই লাগে, বিশেষত মেয়েদের। আমি রজত আর উর্মির তর্কাতর্কির মাঝখানে হাত তুলে বললাম, পোশাকের কথা নিয়ে এমন সময় নষ্ট করার কি মানে হয়? তার বদলে লঞ্চের খোঁজ করা উচিত নয়? উর্মি তো সঙ্গে শাড়িও এনেছে। ওখানে পৌঁছে না হয় পোশাক বদলে নেবে।

চতুর্দিকে অসম্ভব ভিড়। কন্যাকুমারিকা কিংবা হিমালয় থেকেও এসেছে মানুষ। অরণ্যের সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়াও, সাধারণ মানুষও কম নয়। অনেকে এসেছে পায়ে হেঁটে। বেশির ভাগই গরিব। এই তীর্থটা বুঝি শুধু গরিবদেরই তীর্থ। 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।' এত দূর থেকে এত কষ্ট করে কিসের টানে মানুষ আসে কে জানে।

অব্যবস্থার চূড়ান্ত। একসঙ্গে এত মানুষকে সামলাবার মতন ব্যবস্থাপনা এখানে নেই। হুড়মুড় করে সবাই মিলে লঞ্চে উঠতে গিয়েছিল বলে লঞ্চঘাটটা নাকি বিপজ্জনক ভাবে ভেঙে পড়েছে। পুলিশ আটকে রেখেছে সে জায়গাটা। এদিকে জনতা উত্তাল হয়ে উঠেছে কাল ভোরেই পুণ্যস্নানের শুভক্ষণ, আজকের মধ্যে সবাই পৌঁছতে চায়।

যারা পুণ্য অর্জন করতে চায় না, শুধু দৃশ্য দেখতে চায়—তাদের পক্ষে গঙ্গাসাগর যাওয়ার এইটাই প্রকৃত সময় নয়। এইটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আমার বিরক্ত লাগছিল।

উর্মির কিন্তু উৎসাহ একটুও কমেনি। সে বলল, চলো তাহলে লঞ্চের দিকে যাই।

আমি বললাম, কী করে যাবে এই মানুষের দেয়াল পেরিয়ে?

রজত বলল, কোনও চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রজত সাংবাদিক, সে সরকারি আমলাদের চেনে, তাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে।

রজত গিয়ে দেখা করল এস, ডি, ও-র সঙ্গে। তিনি বললেন যে একটা লঞ্চ রাখা আছে বটে, কিন্তু এ ভিড় ঠেলে সেদিকে যাবেন কী করে?

রজত বলল, আমাকে যেতেই হবে। আমি তো আর নামখানায় বসে রিপোর্টিং করতে পারি না।

রজত আমার দিকে ফিরে বলল, বিভাস তোমার জুতো খুলে ঝোলায় পুরে নাও, তারপর আমার পেছনে-পেছনে এসো।

এস, ডি, ও আমাদের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন বাংলোর পেছন দিয়ে। সেই পথে খুব

কাদা। তিনি আমাকে বললেন, আপনারা পুরুষমানুষ, আপনারা যেতে পারবেন ঠিকই। কিন্তু আপনার মিসেস-এর খুব কষ্ট হবে।

তিনি উর্মিকে ধরে নিয়েছেন আমার স্ত্রী। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। প্রতিবাদ করে বলবই বা কি। রজত আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসল। উর্মিই সামলে দিল ব্যাপারটা, সে বলল, না, না, আমার কিছু কষ্ট হবে না।

উর্মি ওর বেলবটম প্যান্টটা গুটিয়ে নিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তারপর বলল, চলো।

নদীর ঘাটে এসে দেখলাম, সেখানেও প্রচণ্ড ভিড়। রজত বীরবিক্রমে দু-হাতে সেই ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগল—

আমরাও গলে যেতে লাগলাম সেই ফাঁকে! রজত নির্দয়ভাবে লোককে গুঁতোগুঁতি করছে। সে রকম না করে উপায়ও নেই।

লঞ্চও ভরতি হয়ে আছে মানুষজনে। এর সবাই অনধিকারী। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। সেখানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। রজত তবু দমল না। একজন পুলিশ ডেকে এনে তার সাহায্যে টেনে হিঁচড়ে কুড়ি পঁচিশজন লোককে নামিয়ে দিল। লঞ্চের ছাদটা খালি করে দিল একেবারে! আমরা সেখানে উঠে এলাম।

লঞ্চের সারেং ছাদে বসে আপন মনে বিড়ি খাচ্চে। আমাদের দেখে বলল, লঞ্চ এ বেলা ছাড়বে না। জোর বাতাস দিচ্ছে। সমুদ্রে এখন বড় বড় ঢেউ। এ সময় লঞ্চ চালানো বিপজ্জনক।

রজত যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, সে কিছুতেই রাজি হয় না। রজতের হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে গেল, সে সারেং-এর কলার চেপে ধরে ঘুষি মারতে গেল। আমি মাঝখানে পড়ে রজতকে ছাড়ালাম। সারেংকে ধরে মারলে কোনওক্রমেই লঞ্চ চলবে না।

রজত আবার নেমে গেল। বাংলো থেকে ডেকে আনল একজন সরকারি অফিসারকে। তিনি হুকুম দিলেন লঞ্চ ছাড়বার।

শেষ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হল। লঞ্চ যখন মধ্য নদী দিয়ে ছুটে চলল জোরে, হু-হু করে গায়ে লাগছে বাতাস, তখন আগেকার সব অসুবিধের কথা মন থেকে মুছে যায়।

উর্মি বলল, আপনি না থাকলে তো আমাদের আসাই হত না।

রজত বলল, এখন ভালো লাগছে কিনা, বলুন?

উর্মি বলল, দারুন দারুন।

আমি চলে এলাম সারেং-এর কাছে। লোকটি এখনও রাগ করে আছে। আমি তাকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, সারেংসাহেব, রাগ করবেন না। আমার বন্ধুর একটু মাথা গরম— তা ছাড়া আজ আমাদের পৌঁছতেই হবে।

সারেং এর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, তা ছাড়া লোকটি অহঙ্কারী প্রকৃতির! কিছুতেই আমার সিগারেট নেবে না। তার কাঁধে হাত দিয়ে অনেক করে বোঝালাম। রজতের হয়ে বার বার ক্ষমা চাইলাম। এক সময় সে শান্ত হল এবং আমার কাছ থেকে সিগারেট নিল। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। লোকটার মনটা খুব সাদা। ফিরে এসে দেখলাম, উর্মি আর রজত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে, নদীর গতিপথের দিকে মুখ। হাওয়ায় উড়ছে উর্মির চুল, এক হাত তুলে সে চুল সামলাচ্ছে। সেই ভঙ্গিতে কি সুন্দর দেখায় ওকে। আমি পিছন থেকে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

সেবার নাকি মেলায় ভিড় হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। কপিলমুনির আশ্রমটাকে ঘিরে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেই শুয়ে কয়েক লাখ নারী-পুরুষ।

আমাদের অবশ্য তেমন অসুবিধে হল না। সাংবাদিক ও অফিসারদের জন্য এক জায়গায়

অনেকগুলো সাময়িক বাড়ি-ঘর বানানো হয়েছে। একজন অফিসারের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল, তিনি শেষ মুহূর্তে আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। সেই ঘরটা আমরা নিয়ে নিলাম।

রজত আমাকে বলল, তোমরা দুজনে এখানে থাকো। আমার তো আলাদা জায়গা আছেই।

আমি বললাম, কেন, তুমিও এখানে থাকতে পারো না? একটা রাত্তিরের তো ব্যাপার।

রজত বলল, না ভাই। আমার অন্য সাংবাদিকের সঙ্গেই থাকা উচিত। না হলে সেটা খারাপ দেখায়।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ঊর্মির সঙ্গে একঘরে থাকাও কি ভালো দেখায়? অন্য কেউ জানে না আমরা স্বামী-স্ত্রী কিনা, কিন্তু রজত তো জানে? তা ছাড়া, অন্যরা যদি ঊর্মির সিঁদুর নেই দেখে কোনওরকম সন্দেহ করে।

আমি রজতকে বললাম, তোমাদের ওখানে কি বেশি জায়গা আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অঢেল জায়গা। আমাদের জন্য পাঁচ খানা ঘর দিয়েছে।

—তা হলে, আমিও কি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি? কেউ কি আপত্তি করবে?

—আপত্তি আবার কে করবে? সবাই তো আমাদের চেনা।

—তার হলে আমি তোমাদেরই সঙ্গে রাত্রে থাকব—ঊর্মি এখানে একা থাকুক। ঊর্মি, তুমি একা থাকতে পারবে তো?

ঊর্মি বিচিত্রভাবে হেসে বলল, পারব না কেন?

আমরা তিনজনে মিলেই রজতের জায়গাটা দেখতে গেলাম।

বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এসেছে। কয়েকজন বিদেশি টেলিভিশন কোম্পানির প্রতিনিধিও আছে তার মধ্যে। এক জায়গায় সবাই মিলে হইহই করে রান্না শুরু করে দিয়েছে। নতুন হাঁড়ি, নতুন খুন্তি। ইটে তৈরি উনুনে বসানো হয়েছে খিচুড়ি। একজন আবার একটা মস্তবড় কাতলা মাছ ছুরি দিয়ে কুটতে বসেছে। কাছেই একটা গ্রামে নাকি সস্তায় পাওয়া গেছে মাছটা। তীর্থক্ষেত্রে বসে মাছ রান্নার ব্যাপারটা শুধু বাঙালিদের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের দেখে ওরা আপ্যায়ন করতে লাগল খুব। ঊর্মির দিকে একটু বেশি মনযোগ যে দেবে তা তো স্বাভাবিক। কয়েকজন মদের বোতল খুলে বসেছিল, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল গেলাসপত্র। ঊর্মিও লেগে গেল ওদের রান্নায় সাহায্য করতে।

রজত আর আমি একটা আলাদা ঘর পেলাম। শুধু খড়ের ওপর একটা চাদর পেতে শোওয়া। আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। রজত অবশ্য বহুরকম অবস্থায় থেকেছে, কিন্তু আমি এমনভাবে কখনও কোথায় যাইনি। প্রথমে একটু মানিয়ে নেবার অসুবিধে হলেও বেশ ভালোই লাগছে। আমি ভালোছেলের মতন শুধু পড়াশুনা করেছি, তারপর চাকরি-বাকরিতে ঢুকে পড়েছি—এই ধরনের রোমাঞ্চকর জীবন কাটাবার সময় পাইনি কখনও।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন ঘুরে বেড়ালাম বাইরে। তখনও মানুষজনের আসবার বিরাম নেই। কচুবেড়িয়ার মোড় থেকে যারা পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে রিক্সায় আসছে, তাদের মেলায় প্রবেশ করা জন্য একটা মাত্র ছোট ব্রিজ। সেখানে অসম্ভব ঠেলাঠেলি। এক সময় নাকি ব্রিজের রেলিং ভেঙে কয়েকজন মানুষ নিচে পড়ে গেছে। অবশ্য নিচে জল কাদা মেশানো নরম মাটি, কারুর প্রাণহানির সম্ভাবনা নেই, তবু ঘটনার বিবরণ নেওয়ার জন্য সাংবাদিক হিসেবে রজতকে যেতেই হয়। আমরা ওর সঙ্গে যাই।

ভিড়ের মধ্যে যাতে ঊর্মি হারিয়ে না যায়, তাই ওর হাত ধরে রেখেছিলাম শক্ত করে।

ঊর্মি হেসে বলল, বাবা রে বাবা, তুমি এমন ভয় করছ, যেন আমি একটা কচি খুকি।

এই কথা শুনে আমি যেই ঊর্মির হাত ছেড়ে দিলাম, তার একটু পরেই ঊর্মি হারিয়ে গেল। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঊর্মিকে আর দেখতে পেলাম না। একটু দূরেই রজত একটা

ছোট্ট খাতা খুলে দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নোট করছে, কিন্তু কাছাকাছি উর্মি কোথাও নেই। চতুর্দিকে শুধু মানুষের মাথা—কারুকে চেনাও শক্ত। অল্প কয়েকটা আলোতে অন্ধকার দূর ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায়নি।

আমি রজতের কাছে গিয়ে বললাম, উর্মি কোথায়?

রজত সঙ্গে সঙ্গে খাতা বন্ধ করে বলল, জানি না তো। তোমার সঙ্গেই তো ছিল।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, তা ছিল হঠাৎ যে কোথায় চলে গেল—

—কোথায় আর যাবে? আমি নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও—

—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে—

—ঠিক আছে, খুঁজে দেখা যাক। তুমি ওই দিকটায় যাও, আমি এই ডান দিকটাতে।

রজত আর আমি উর্মিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের ভিড়ে সহজে হাঁটাও যায় না। একটু জোরে হাঁটতে গেলেই মানুষজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অনেকে অবশ্য ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছে, কেউ তার প্রতিবাদও করছে না।

সেই ভিড়ের মধ্যে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। অনেকদিন আগে, তখন আমার বয়েস সতেরো আঠারোর বেশি না—উর্মিদের বাড়ির সবাই আর আমাদের বাড়ির লোকেরা মাঝরাত্তিরে দুর্গাপূজার অষ্টমীর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। বাগবাজারের প্যান্ডেলে অসম্ভব ভিড়, তার মধ্যে উর্মি হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, মাইকে তার নাম ডাকাডাকি হয়েছিল, সবাই দারুণ চিন্তিত, উর্মির বয়স তখন পনেরো—রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না। শেষ পর্যন্ত আমিই উর্মিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। উর্মি বেশ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখার পর বলেছিল, বাড়ির লোকদের আর একটু ভয় দেখানো যাক না। আমরা তক্ষুনি ফিরে যাইনি। পুজো প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে মধ্যরাত্তির নির্জন রাস্তায় আমরা বেড়িয়েছিলাম খানিকক্ষণ। সেই প্রথম আমি উর্মির হাত ধরেছিলাম। এমনিতে একটি মেয়ের হাত ধরা এমন কিছুই না। নানা কারণে আগেও হয়তো অনেকবার ধরেছি, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, এই হাতটা আমার নিজস্ব। কি কোমল আর উষ্ণ, যেন একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, আমি সত্যিই আমার নাকের কাছে উর্মির হাতটা এনে গন্ধ শোকার চেষ্টা করেছিলাম। সেইদিনই প্রথম বুঝেছিলাম ভালোবাসা কাকে বলে।

আজ এই গঙ্গাসাগর মেলায় উর্মিকে অনেকক্ষণ খুঁজেও বার করতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগল, রজত বোধহয় এতক্ষণে উর্মিকে খুঁজে পেয়েছে, সে আগেও এসেছে বলে এ জায়গা আমার চেয়ে ভালো চেনে। এখন ওদের দুজনকে আমি খুঁজে পাব কি করে?

এই কথা মনে হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অদূরে আমি দেখতে পেলাম উর্মিকে। একটা গোল করা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। কাছাকাছি রজত নেই।

আমি পেছন থেকে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, এই উর্মি!

উর্মি মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বাঃ, তুমিই তো হারিয়ে গেলে।

—আমি তো অনেকক্ষণ থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরাও তো হারিয়ে গেছ।

—রজত কোথায়?

—আমি তো জানি না। আসবে নিশ্চয়ই। দ্যাখো, এখানে দ্যাখো কি অদ্ভুত কাণ্ড!

আমি ভিড় ঠেলে উর্মির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিড়ের মধ্যে একটি বিচিত্র দৃশ্য। একজন সাধুর সমস্ত দেহটা মাটির মধ্যে পোঁতা, শুধু মাথাটুকু বেরিয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ওপরে পড়ে আছে একটা কাটামুণ্ডু।

ভিড়ের লোকের মন্তব্য শুনে বুঝলাম, এই সাধুটি এইরকম অবস্থায় নাকি তিন দিন ধরে রয়েছে।

এই সব সাধুদের গল্প আগে শুনেছি যদিও, তবু এখন চোখে দেখলেও ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এই রকম ভাবে একটা লোক তিনদিন থাকতে পারে? কে একে খাইয়ে যায়?

সাধুটির মুখটি বেশ প্রশান্ত, স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে, সে নাকি কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলে না। শরীরকে এরকম কষ্ট দিয়ে সাধুরা কি পেতে চায়, আমি বুঝতে পারি না।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, এ দিকটা সাধুদেরই পাড়া। কোনও সাধু শুয়ে আছে এক গোছা কাঁটাতারের ওপর। কেউ সারা গায়ে ইট চাপা দিয়ে আছে। লোক-মুখে শুনলাম, একটু পরেই আর একজন সাধু এসে পৌঁছাবেন, তিনিই সবার সেরা তিনি শুয়ে থাকেন কাঠকয়লার আগুনে।

তার একদিকে প্রায় লাইন করে বসে আছে নাগা সন্ন্যাসীর দল। প্রত্যেকের হাতে ত্রিশূল, বিশাল বিশাল চেহারা এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারুর কারুর লিঙ্গে লোহার আংটা বাধা—ওরা যে জিতেন্দ্রিয়, সেটা বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। উলঙ্গ পুরুষ মানুষ দেখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। গা-শিরশির করে। উর্মি পাশে আছে বলে আমার লজ্জা করে আরও বেশি। অবশ্য, তীর্থস্থানে এসে এরকম মনের বিকার থাকা বোধহয় উচিত নয়।

উর্মির কিন্তু একটুও বিকার নেই। সে নাগা সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই শীতের মধ্যে ওরা এরকম খালি গায়ে থাকে কি করে?

আমি বললাম, পৃথিবীতে এরকম অনেক আশ্চর্য ব্যাপার আছে।

—ওরা গায়ে ছাই মেখে থাকে, তাতে বোধহয় বেশ গরম হয়।

—সেইসঙ্গে গাঁজা খায়।

যাই বলো, সাধু হওয়ার একটা বেশ উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি।

সব সাধু-রই স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়। মুক্ত আকাশের নিচে পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়াই জীবন কাটানো বোধহয় মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরা কত স্বাধীন।

—সেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'।

—সেটাই বোধহয় ভালো ছিল।

একজন নাগা সন্ন্যাসী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা হুকুমের ভাব ছিল যে আমরা কাছে না গিয়ে পারলাম না। সাধুটি আমাদের কপালে দুটো ছাইয়ের টিপ পরিয়ে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তাকে দিলাম। আমি সাধুটির দিকে তাকাতে পারছিলাম না। উর্মি সাধুটির সঙ্গে কি যেন কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম।

সেখানে উর্মি ছাড়াও আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন। দু-একজনকে দেখে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের। তারাও ওই সব উলঙ্গ সাধুদের কাছে শিবশঙ্করের পয়সা দিয়ে ছাইয়ের টিপ পরে পুণ্য অর্জন করছেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লজ্জাবোধ আসলে কম। কিংবা বোধহয় ভুল বললাম। এখানে একজন নগ্ন সন্ন্যাসিনী থাকলে পুরুষদেরও কি ভিড় হত না?

একটুক্ষণ আমরা রজতকে খুঁজলাম। পাওয়া গেল না কোথাও। যাই হোক, রজতের জন্য চিন্তা করে কোনও লাভ নেই।

উর্মি বলল, চলো, আমরা একটু সঙ্গমের ধার থেকে ঘুরে আসি। যাবে?

—এই রাত্তিরেই?

—চলো না।

অনেক নিদ্রিত ও জাগ্রত মানুষের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে এলাম নদীর কিনারায়। এ দিকটা বেশ অন্ধকার। এত রাত্তিরেও কয়েকজন স্নান করছে সেখানে। শুনলাম কেউ-কেউ নাকি সূর্যোদয় পর্যন্ত জলের মধ্যেই থেকে স্তবপাঠ করবে। শীতের মধ্যে এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকা—কতরকম পাগলই যে আছে!

উর্মি তাকিয়ে আছে দূরের অন্ধকারের দিকে। আমি ওকে বললাম, তা হলে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর দেখা হল তো?

উর্মি আমার একবার বাহু ছুঁয়ে বলল, কি ভালো যে লাগছে! সেই গঙ্গোত্রীতে দাঁড়িয়েই মনে মনে ভাবছিলাম, একদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গার শেষ মুখে দাঁড়াব। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে সেখানে আসা হবে, ভাবিনি।

আমি বললাম, রজত না থাকলে কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি আসা হত না।

উর্মি আমার বুকের হাত দিয়ে বলল, আমার ভালো লাগছে, আমার খুব ভালো লাগছে।

আমি উর্মির গালে হাত ছোঁয়ালাম। কি উষ্ণ হয়ে থাকে ওর শরীরটা। সে কথা উর্মিকে বলতেই ও আপন মনে হেসে উঠল।

খানিকটা বাদে আমরা ফিরে এলাম আমাদের বাসস্থানের দিকে। রজতের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, রজত ওর খড়ের বিছানায় শুয়ে আপন মনে সিগারেট টানছে। আমি বললাম, একি, তুমি এখানে? আর আমরা তোমাকে খুঁজছি।

রজত বলল, আমাকে কি খোঁজার কথা ছিল?

উর্মি বলল, আমাকে তো খোঁজার দরকার ছিল। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, আর আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন?

রজত এবার হাসতে-হাসতে উত্তর দিল, আমি দূর থেকে দেখলাম আপনারা দুজনে জলের দিকে যাচ্ছেন, তখনই বুঝলাম আর খোঁজাখুজির দরকার নেই, তাই আমি আমার কাজ সেরে এলাম সেই ফাঁকে।

—এখানে আপনার আবার কি কাজ? এত রাত্রে?

—বাঃ, খবর পাঠাতে হবে না? মেলা অফিসের টেলিফোন থেকে ট্রাঙ্ককল-এ খবরগুলো পাঠিয়ে দিলাম আমার অফিসে।

—কী-কী খবর পাঠালেন?

—তার মধ্যে আপনার হারিয়ে যাওয়ার খবরটাও আছে।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম একসঙ্গে। উর্মি ঘরের মধ্যে এসে বসল। কিছুক্ষণ গল্প করার পর রজত তাকে জিগ্যেস করল, আপনি শুতে যাবেন না?

খুব একটা যেন ইচ্ছে নেই, এরকম ভাবে উর্মি বলল, আপনারা এখন ঘুমোবেন নাকি?

—বাঃ, ঘুমব না? আবার তো ভোরেই উঠতে হবে।

—তা হলে আমিও যাই। একলা একলা যাবো?

—বিভাস, যাও, ওঁকে পৌঁছে দিয়ে এসো—

আমি উর্মিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। উর্মির ঘরটা কাছেই। ভেতরে আলো জ্বালা নেই। অন্ধকারে উর্মি আমাকে ধরে রইল আমি দেশলাই জ্বাললাম! উর্মির মুখখান একটু যেন বিবর্ণ। অচেনা জায়গায় একা ঘরে শোওয়ার অভ্যাস ওর নেই। আমার বুকটা মুচড়ে উঠল। আমি যদি ওর সঙ্গে রাতটা কাটাতে পারতাম। কি বাধা আছে তাতে। বিয়ে টিয়ে এগুলো তো আসলে নিয়ম রক্ষা মাত্র। এগুলো গ্রাহ্য না করলে কি হয়? আমরা যদি সেই নিয়ম ভাঙি, তবু সমাজ আমাদের কোনও শাস্তি দিতে পারবে না। সমাজের সে জোর আর নেই তবু শুধু চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা এড়াতে পারি না।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে উর্মিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম। উর্মির সারা শরীরটা কাঁপছে। আমার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটা প্রায় মিশিয়ে দিয়ে উর্মি বলল, আমার একা থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

আমি অতিকষ্টে মনের জোর এনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, একটু ঘুমোও—কয়েক ঘণ্টা তো মাত্র—তারপর আমরা এসে তোমাকে ডেকে তুলব—

—যদি আমার ভয় করে?

—দূর, ভয়ের কি আছে।

আমি উর্মিকে দু-হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিলাম ওর বিছানায়। উর্মি তবু ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তবু আমি অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে চলে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে তখন মনে হল, আজ থেকে দু-তিন মাস পরেই যদি এখানে আসতাম, তা হলে কত সহজে আমি উর্মির সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম। এই রাতটা বৃথা যেত না। বিয়েটিয়ের ব্যাপারগুলো যতই সংস্কার হোক তবু সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। যাই হোক, আর দু-তিন মাস বাদে আমরা এর চেয়েও ভালো কোনও জায়গায় তো যাবই—

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, রজত কোথা থেকে ব্রান্ডির বোতল বার করে তাতে চুমুক মারছে।

আমাকে দেখে বলল, গেলাস ফেলাস নেই। মাটির গেলাসে এসব খাওয়া যায় না। তুমি চুমুক দিয়ে খেতে পারবে?

আমি বললাম, আমি খাই না ভাই।

—খাও না তো কি হয়েছে? আজ একটু খাও, বেশ শীত-শীত পড়েছে, গা গরম হয়ে যাবে।

—না ভাই, দরকার নেই। অফিসের একটা পার্টিতে একবার খেয়েছিলাম, আমার একটুও ভালো লাগেনি।

—তুমি একটা টিপিক্যাল গুডবয়। আমি খেলে তোমার আপত্তি নেই তো?

—না, না, আপত্তি কিসের!

—তা হলে তোমার যদি ঘুম পায়, ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই—

আমি ঘুমোবার চেষ্টা না করে একটা সিগারেট ধরালাম। আগুনটাগুনের ব্যাপারে এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। চারিদিকে শুধু খড় আর হোগলা, যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে।

তখন সিগারেটটা শেষ হয়নি। কে যেন আমাদের দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। আমি তড়াক করে উঠে দরজাটা খুললাম।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় উর্মি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কিছু জিগ্যেস করার আগেই উর্মি ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। তারপর বিহ্বল গলায় বলল, আমি কিছুতেই ও ঘরে থাকতে পারব না। ওখানে ভূত আছে।

—ভূত!

রজত হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, ভূত আবার কী?

উর্মি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, নিশ্চয়ই ভূত আছে। কী সব অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ, কানের পাশে ফিস ফিস করে কথাবার্তা।

রজত বলল, নিশ্চয়ই পাশের ঘরের শব্দ। শুধুমাত্র হোগলার দেওয়াল—এত পাতলা দেওয়াল দেওয়া ঘরে তো আগে কখনও থাকেননি।

—মোটেই না। সেরকম শব্দ শুনলেই বোঝা যায়। মোট কথা আমি ওখানে একলা থাকতে পারব না। কিছুতেই পারব না, আমি এখানে থাকব, তাতে আপনাদের অসুবিধে আছে?

আমি উর্মির হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। তোমাকে আর ও ঘরে যেতে হবে না।

এতক্ষণে রজতের হাতের ব্রান্ডির বোতলটার দিকে চোখ পড়ল উর্মির। এবার সে রীতিমতো ঝাঁঝাল গলায় বলল, ও, এই জন্যেই আপনারা আমাকে ও ঘরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন? মদ খাবার জন্য? আপনারা অনায়াসেই আমার সামনে খেতে পারেন। আমার শুচিবাই নেই।

আমি ঊর্মিকে বললাম, আরে, তুমি এত রাগ করছ কেন? ব্যাপারটা তা নয়।

রজত ঊর্মির দিকে সোজা চোখে বলল, আপনি দুটি ভুল করেছেন। 'আপনারা' নয়, শুধু আমি একাই মদ খাচ্ছি। আপনার ভাবী স্বামী খুবই সচ্চরিত্র, তিনি এসব খান না। আর আমার দিক থেকেও আপনাকে লুকোবার কোনও কারণ নেই। আমি আপনাকে অন্য ঘরে যেতে বলেছিলাম যাতে বিভাসও আপনাকে পৌঁছতে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। বিভাসের মতন একটা ইডিয়েট ছাড়া আর কেউ তার বান্ধবীকে ওরকম একা ঘরে ফেলে চলে আসত না।

আমি লজ্জায় মুখটা ফিরিয়ে বললাম, এই সব নিয়ে কোনও মন্তব্য করতেও আমার লজ্জা করে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য ঊর্মি রজতকে বলল, আমি ভূতের কথা বললাম বলে আপনি হেসে উঠলেন কেন?

রজত বলল, ভূত আবার কী?

—বাঃ এখানে প্রত্যেক বছরই তো অনেক লোক মরে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ ভূত হতে পারে না?

মানুষ মরলেই ভূত হবে নাকি? যত সব আজেবাজে কথা। অবশ্য মেয়েরা ভূতের ভয় পেতে ভালোবাসে। এক-এক সময় ভয় পেলে মেয়েদের বেশ মানায়।

—আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন না?

—আমি ভূত কিংবা ভগবান কোনওটাতেই বিশ্বাস করি না।

—আপনি তাহলে কিসে বিশ্বাস করেন?

—আমি শুধু বিশ্বাস করি, আজকের এই বিশেষ মুহূর্তটাকে। যে সময়টাতে আমি বেঁচে আছি। আমি অতীতের কোনও কিছুর জন্যই অনুতাপ করি না, ভবিষ্যতের জন্যও মাথা ঘামাই না।

—তা হলে তো মানুষের ন্যায়-নীতি এসবেরও তো কোনও মূল্য থাকে না।

—আমি যে খুব একটা ন্যায়-নীতি করি, সে কথাই বা কে বলল আপনাকে?

ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি চুপ করে বসেছিলাম। রজত যে কথাগুলো বলছে, তা কখনও মানুষের জীবনে সত্যি হতে পারে না। অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না, এমন মানুষ নেই। কিছু কিছু ন্যায়-নীতি অধিকাংশ মানুষকেই মানতে হয়, নিজের নিরাপত্তার জন্যই। তবু রজত যে কথাগুলি বলছে, তা অনেক সময় শুনতে ভালো লাগে।

কথাবার্তা আবার ভূতের প্রসঙ্গে ফিরে আসছিল বলে আমি বললাম, রজত তুমি কিন্তু ভেবো না ঊর্মি সত্যিই ভূতের ভয় পায় কিংবা ভূত বিশ্বাস করে। আমি তো কোনওদিন দেখিনি। আজ ওর একা থাকতে ভালো লাগছিল না বলেই ভূতের কথা বলছে।

রজত বলল, ভূত-টুত বোধহয় গত শতাব্দী পর্যন্ত ছিল, এখন আর তারা পৃথিবীতে আসে না।

রজতের এই কথাটা আমি কখনও ভুলিনি। খুবই সাধারণ কথা তবু আমার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। পরে বহুবার এই কথাটা আমার মনে পড়েছে, ঊর্মিকে মনে করিয়ে দিয়েছি।

রজত ব্রান্ডির বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছিল। সেই দেখে ঊর্মি আমাকে বলল, বিভাসদা, তুমি খাচ্ছ না কেন? আমার জন্য?

আমি যে-কোনওদিন ওসব খাই না, ঊর্মি তা ভালো করে জানে। কিংবা মাঝখানে তিন বছর ও দিল্লিতে ছিল, ভেবেছে বোধহয় সেই সময়ের মধ্যে আমি বদলে গেছি। অথবা ঊর্মিই খানিকটা বদলেছে।

আমি বললাম, কেন, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

ঊর্মি অনাবিল ভাবে হেসে বলল, আমি দিল্লিতে দু-একবার খেয়েছি। ওখানকার পার্টি টার্টিতে

অনেক মেয়েরাই খায়, কেউ কিছু মনে করে না।

রজত বলল, এখানের পার্টিতে অনেক মেয়ে খায়, এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

আমি উর্মিকে বললাম, তোমার ইচ্ছে করে তো একটু খাও না।

উর্মি আমার দিকে গাঢ় ভাবে তাকিয়ে বলল, তুমি না খেলে আমি খাব না।

—আমার খেতে ভালো লাগে না তাই খাচ্ছি না, আমার তো কোনও সংস্কার নেই।

রজত একটু ঠাট্টার সুরে বলল, তুমি অনুমতি না দিলে উনি খেতে পাচ্ছেন না।

—বাঃ, অনুমতির আমার কি আছে!

উর্মি আমার গলায় হাত রেখে আদুরে গলায় বলল, তুমি একটু খাও। কী হবে—কিছুই হবে না। তুমি একটু না খেলে আমি কিছুতেই খাব না।

অগত্যা আমাকে একটা চুমুক দিতেই হল। প্রথমে গন্ধটাই আমার খুব খারাপ লাগে। তারপর তরল পদার্থটা জ্বলতে-জ্বলতে নামে গলা দিয়ে। ঠিক যেন আগুনের একটা স্রোত। উঃ এত কষ্টতেও মানুষ আনন্দ পায়।

বোতলটা আমি বাড়িয়ে দিলাম উর্মির দিকে। উর্মি যখন সেটা মুখের কাছে নিয়ে গেল, তখন আমি আর রজত একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছি। রজত আনমনে তার বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর একটা সিগারেট ঠুকছে। এইটা রজতের একটা বাতিকের মতন। প্রত্যেকবার সিগারেট ধরাবার আগে ও নখের ওপর একটু ঠুকবেই কয়েকবার।

উর্মি বেশ অবলীলাক্রমেই এক ঢোঁক খেয়ে ফেলল। মুখে কোনও বিকৃতি দেখা গেল না। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঠোঁটটা মুছে বলল, এটা কি জিনিস?

রজত বলল, ব্রান্ডি। তীর্থস্থানে এসে আপনাকে মদ দিলাম কিন্তু।

—ব্রান্ডিকে ঠিক মদ বলা চলে না। অনেকে অসুখের সময়েও খায়। দিল্লিতে আমার অসুখের সময়েও খেয়েছিলাম।

—দিল্লিতে আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

—সে যাই হোক না। এখন আমি মোটেই অসুখের গল্প করতে চাই না।

—তা হলে এখন কিসের গল্প হবে বলুন?

—আপনাকে তো বললামই আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, ভূতের গল্প কী করে জানব!

—ভূতে বিশবাস করুন বা না-ই করুন, ভূতের গল্প কিন্তু শুনতে কিংবা পড়তে বেশ ভালোই লাগে।

আমি বললাম, রজত ওর নিজের জীবনের কোনও গল্প বলুক বরং! ও তো অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে। তা ছাড়া ওর কত বান্ধবী। তাদের সম্পর্কেও বলতে পারে—

উর্মি জিগ্যেস করল, আপনার অনেক বান্ধবী বুঝি?

রজত কোনওরকম ভনিতা না করে উত্তর দিল, আট দশজন হবে অন্তত। আমি তো কারু প্রেমে পড়ি না। তবে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আমার বেশ ভালোই লাগে।

উর্মি বললে, ভূত ভগবানের মতন আপনি বুঝি প্রেমেও বিশ্বাস করেন না?

—না বন্ধুত্বই যথেষ্ট।

—মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের ঠিক বন্ধুত্ব হয়?

—কেন হবে না? আমার সঙ্গে হয়।

—ঠিক আছে, আপনার বান্ধবীদের সম্পর্কেই দু-চারটে গল্প বলুন। রজত আমার দিকে ব্রান্ডির বোতলটা বাড়িয়ে দিল। আমি বললাম, না ভাই, আর নেবো না। এক চুমুক নেওয়ার কথা ছিল, সেটা তো হয়েই গেছে—

উর্মি আর এক চুমুক দিল। তারপর আমার দিকে বলল, বিভাসদা, আমি আজ একটা সিগারেট

খাব? খুব ইচ্ছে করছে।

উর্মির এই প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষী সরলতা ছিল যে আমার খুব মায়া হল। তা ছাড়া, মেয়েরা সিগারেট খেতে পারবে না—এমন কোনও ধারণা আমার নেই। আমি বললাম, খাও না।

রজত ততক্ষণে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছে ওর দিকে। নিজের লাইটারে সেটা ধরিয়ে দিল। উর্মি কেশে উঠল কয়েকবার, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, তবুও ওর মুখে হাসি।

সেইরকম হাসতে-হাসতে বলল, এই অবস্থায় আমার বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলত, কি ভাবত? মদ খাচ্ছি সিগারেট খাচ্ছি—

রজত বলল, তা ছাড়া রাত্তিরবেলা দুজন পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে রয়েছেন—

আমি বললাম, কথাগুলো শুনতে যে রকম খারাপ, আসলে কিন্তু তেমন নয়। মানুষের মনটা কীরকম, তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

এইরকম কথাবার্তা চলছিল। কখন যে আমি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেই জানি না।

আবার চোখ মেলেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম, উর্মি আর রজত শোয়নি। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ওরা তখন ও গল্প করে যাচ্ছে। বাইরে ঈষৎ ভোরের আলো দেখা যায়।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে রজত বলল, খুব বাবা! দিব্যি একটা ঘুম সেরে নিলে।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম, কখন যে ঘুম এসে গেছে, নিজেই টের পাইনি। তোমরা আমাকে ডাকলে না কেন?'

উর্মি বলল, তুমি তো কথা বলতে-বলতেই হঠাৎ চোখ বুজলে। প্রথমে তো আমরা বুঝতে পারিনি যে ঘুমোচ্ছ। ভেবেছিলাম এমনিই চুপ করে আছো।

—তোমাদের একটুও ঘুম পায়নি।

উর্মি বলল, আমার রাত জাগা অভ্যাস আছে। একটুও ঘুম পায় না।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর কি, ভোর তো হয়েই এল, চলো, এবার বেরোনো যাক।

আমরা তিনজনে ঘর থেকে বাইরে এলাম। বহুলোক এরই মধ্যে জেগে উঠেছে, গঙ্গার ধারে কোলাহল পড়ে গেছে রীতিমতন।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। কয়েক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে নেমে পড়েছে স্নান করতে। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু গোরু-বাছুরও আছে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গোরুর ল্যাজ ধরে মন্ত্র পড়লে নাকি মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হওয়া যায় সহজেই। সেখানেই চলেছে নানারকম চিৎকার ও মন্ত্রপাঠ। পুণ্য অর্জনের কি ব্যাকুল চেষ্টা।

দূরে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেই বিপুল জলরাশিতে মিশেছে নতুন সূর্যের রক্তিম আলো। সেদিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায়। নদী এখানে এসে লীন হয়ে যাচ্ছে, এই কথা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়।

রজত বলে, চলো, আমরাও স্নানটা করে নিই, তা হলে বেশ ফ্রেশ লাগবে।

উর্মি বলল, আমি তাহলে তোয়ালে টৌয়ালেগুলো নিয়ে আসি?

আমি খুব একটা উৎসাহিত বোধ করলাম না। এত লোকের ভিড়ের মধ্যে স্নান করতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কীরকম যেন নোংরা নোংরা মনে হয়। তীর্থযাত্রীরা সাধারণত পরিচ্ছন্ন হয় না। যে-গঙ্গানদীকে তারা এত পবিত্র মনে করে, সেখানেই তারা থুথু ফেলছে। কিংবা নাক ঝাড়ছে।

রজত সেখানেই তার শার্ট ও প্যান্ট খুলে ফেলল। এত লোকজনের সামনের জামাকাপড় ছাড়তে তার একটুও লজ্জা হয় না। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে সে শুধু আন্ডারওয়্যার পরে জলে নামবার জন্য তৈরি হল।

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি জামা টামা খুলবে না?

—আমি স্নান করব না।

—সেকি? এতদূর কষ্ট করে এসে শেষ পর্যন্ত স্নান করবে না?

—আমি তো স্নান করতে আসিনি, দেখতে এসেছি।

রজত আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। বার বার বলতে লাগল, আরে চলো, চলো! একবার নেমে পড়লেই—

—না, ভাই, সত্যি আমার ইচ্ছে করছে না।

—তুমি যে জলকে এত ভয় পাও, তা তো জানতুম না।

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। এই সময় ঊর্মি তোয়ালে জামাকাপড় নিয়ে এসে হাজির হল।

রজত তাকে বলল, আপনার বিভাসদা তো স্নান করতে রাজি নয়।

ঊর্মি বলল, একি, তুমি স্নান করবে না?

—নাঃ, তোমরা যাও।

ঊর্মি আমাকে আর বেশি জোর করল না। ওরা দুজনে চলে গেল জলের দিকে। রীতিমতন মানুষদের দল ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে যেতে হয়।

ঊর্মি ওর শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বেঁধেছে। পায়ের খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরেছে। জলে এক পা ছুঁইয়েই বলল, বাবাঃ বেশ ঠান্ডা।

রজত ঊর্মির হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেল। একটু বাদে ওদের আর দেখতে পেলাম না মানুষের ভিড়ে-ভিড়ে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রজত আর ঊর্মির পোশাক পাহারা দিতে লাগলাম।

ওদের দু-জন বোধহয় স্নানের নেশায় পেয়ে বসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে ওঠার নাম নেই। মাঝে মাঝে দেখতে পাই, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। চারিদিকে এত গোলমাল যে আমি চেঁচিয়ে কিছু বললেও ওরা শুনতে পাবে না।

ওপরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগল। ভারতের বিভিন্ন জাতের নারী-পুরুষ স্নান করতে এসেছে এখানে। অনেকেরই আবার ব্যবহার আলাদা। অনেক মেয়েরা এখানে যে পোশাকে স্নান করতে নেমেছে কিংবা স্নান করে উঠে যেভাবে পোশাক বদলাচ্ছে, সেটা ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মতন নয়। এরা অনেকেই ব্লাউজ পরে না এবং সম্পূর্ণ বুকটা খুলে দাঁড়াতে কোনও লজ্জা নেই। আমি পুরুষ মানুষ, আমার চোখ তো সেদিকে যাবেই।

কিন্তু এক সময় আমার মনে হল, লোকেরা বোধহয় ভাবছে আমি স্নান করতে এসেছি। যদিও সেখানে এত রকম মানুষের এত ভিড় যে এরকম কথা নিয়ে চিন্তা করার কারুর সময় নেই, তবু আমার অস্বস্তি যায় না। আমি এই রকমই। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তা করি। আরও হাজারটা লোক ওখানে মেয়েদের পোশাক বদলানো কিংবা নগ্ন বুক দেখছে, কিন্তু আমি লজ্জায় সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম।

এবার ঊর্মি আর রজত উঠে এল। ভিজে শাড়ি ও ভিজে চুলে অপূর্ব দেখাচ্ছে ঊর্মিকে। ওর সমস্ত শরীরের রেখাগুলি ফুটে উঠেছে—আমি সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকি অনায়াসেই, আমার লজ্জা করে না। কারণ, ঊর্মি আমার।

ঊর্মি আমার দিকে দৌড়ে এসে বললে, তুমি নামলে না, দেখতে তোমার খুব ভালো লাগত।

—আর একটু ভিড় কমুক। দুপুরের দিকে নামবো।

—আর নেমেছ!

—তুমি তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নাও। শীত করছে না?

—এখন আর একটুও শীত করছে না। আরও অনেকক্ষণ জলে থাকতে পারতাম। তোমার

কথা ভেবেই উঠে এলাম।

—ভালোই করেছো।

রজতের বোধহয় কানে জল ঢুকেছে, তাই সে লাফালাফি করে জলটা বার করবার চেষ্টা করছে। বিরাট লম্বা চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাকড়া চুল—বহু নারী-পুরুষ তাকিয়ে দেখছে রজতের দিকে।

রজত আমাকে হাসসতে হাসতে বলল, এত ভালো স্নান করেছি যে সব পাপ টাপ ধুয়ে গেছে বুঝলে? তুমি কিন্তু পাপীই রয়ে গেলে।

আমি বললাম, দু একজন পাপী না থাকলে পৃথিবীটা বড্ড বাজে জায়গা হয়ে যাবে।

ঘরে ফিরে এসে ওরা দুজন পোশাক টোশাক বদলে নিল। তারপর আমরা চায়ের সন্ধানে বেরুলাম। চা-টা খেয়ে কপিলমুনির আশ্রমটা দেখে, মেলার দোকানপাট ঘুরে আবার ফিরে এলাম ঘরে। রজতের ইচ্ছে এবার একটা ঘুম দেওয়া।

দিনের বেলা বিশেষ কিছু করার নেই। আমাদের ফেরার কথা ছিল বিকেলে। কিন্তু খাবার খেতে গিয়েই আমরা একটা খবর পেয়ে গেলাম। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য একটি লঞ্চ তক্ষুণি ছাড়বে। রজতের সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে, আমাদের তিনজনের জায়গা হয়ে যেতে পারে সেখানে। লঞ্চটা এখান থেকে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত যাবে, সুতরাং এটাতে ফেরা অনেক সুবিধের। রজত কথা বলে এলো। আমরা একটা হোটেল দেখে খুব তাড়াতাড়ি ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে নিলাম। এখানে আর থাকার কোন মানে হয় না, যা দেখার তো হয়েই গেছে।

সাগরদ্বীপে কোনও জেটি ঘাট নেই, জোয়ারের জল কখন কতদূর পর্যন্ত আসবে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সুতরাং স্টিমার বা লঞ্চ একেবারে পাড়ের কাছে ভিড়তে পারে না। নদীর ওপরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, সে পর্যন্ত নৌকো করে যেতে হয়।

তখন ভাঁটার সময়। পাড়ের কাছে থকথকে কাদা, সেই কাদা ভেঙে গিয়ে উঠতে হবে খেয়ার নৌকোতে। আমরা জুতো খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে কোনক্রমে এসে নৌকোয় উঠলাম। অনেকেই ফেরার জন্য ব্যস্ত বলে খেয়া নৌকাগুলিতে এখন দারুণ ভিড়। মাঝিরাও পয়সার লোভে অত্যধিক যাত্রী তোলে। প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা হয়। আমাদের নৌকোতেও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এবং রীতিমতো নাটকীয়।

ছটফটে স্বভাব রজতের। সে নৌকোয় মাঝিদের ওপর হম্বিতম্বি করতে লাগল, এক্ষুনি নৌকো ছাড়ো।

মাঝিরা আরও লোক তুলছে। অনেক লোক হাঁটু-জলে এসে দাঁড়িয়ে নৌকোয় ওঠা জন্য হুড়োহুড়ি করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকোটা বিপজ্জনক ভাবে ভরতি হয়ে গেল। রজত ধমকাতে লাগলো সেই জন্য।

নৌকোটা ছাড়ার পর একটুখানিক মাত্র এগিয়েছে, এইসময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল একদিকে। এই সময় মাথা ঠান্ডা করার বদলে লোকে আরও ঝটাপটি শুরু করে। মাঝিরা সামাল সামাল বলার আগেই নৌকো কাত হয়ে দু-তিনজন পড়ে গেল জলে। তাদের মধ্যে উর্মিও আছে।

আমি সেটা দেখতে পেলেও চঞ্চল হইনি। সেখানে ভয়ের কিছু নেই, বড়জোর বুক-জল। কেউই সেখানে ডুববে না। নৌকোটা ঠিক রাখতে পারলে ওদের ঠিকই টেনে তোলা যাবে। কিন্তু সেই চেষ্টা করার বদলে সবাই দারুণ চিৎকার করে বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসল।

সামান্য ব্যাপারকেও অতি নাটকীয় করে তুলতে চায় রজত। উর্মি জলে পড়ে যেতেই ওর মাথার ঠিক রইল না। মধ্যযুগীয় নাইটদের মতন বিপন্না নারীকে উদ্ধার করার জন্য ও তৎক্ষণাৎ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। প্রবল বিক্রমে ও নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

আসল বিপদটা রজতই বাধালো। ওর অত বড় শরীর নিয়ে লাফিয়ে পড়ায় পায়ের ধাক্কায়

নৌকোটা ছিটকে চলে গেল দূরে, টালমাটাল হয়ে গেল, উলটোদিক থেকে আরও কয়েকজন টুপটাপ করে গাছ-পাকা ফলের মতন পড়তে লাগল জলে। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম, সামলে নিলাম কোনওক্রমে। তাকিয়ে দেখি একটি ন-দশ বছরের ছেলে বসেছিল আমার পাশে, সে সেখানে নেই। জলের মধ্যে ছেলেটা খাবি খাচ্ছে।

আমি উর্মির জন্য চিন্তার করলাম না। কারণ ও যেখানে পড়েছে প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু এই ছেলেটি সম্পর্কে সেকথা বলা যায় না। এখানে জল গভীর, ওর পক্ষে তো বটেই। আমি খুব সাবধানে ঝাঁপ দিলাম নৌকো থেকে।

আশে পাশে আরও বেশ কিছু নৌকো এবং অনেক মানুষজন ছিল। তাদের কোলাহলে জায়গাটা রীতিমতো সরগরম হয়ে উঠল। একে তো নৌকো থেকে মানুষ পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট উত্তেজক দৃশ্য, তার ওপর দুজন সমর্থ চেহারার পুরুষ যদি একটি যুবতী ও একটি বালককে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হলে ব্যাপারটা তো আরও রোমাঞ্চকর হবেই।

অবশ্য, বালক-উদ্ধারের চেয়ে যুবতী-উদ্ধারই যে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। উর্মিকে রজত যখন নৌকোয় তুলল তখন বহু হাত এগিয়ে এল সেদিকে। আমি ছেলেটিকে ধরতে পারছিলাম না, একটা চলন্ত লঞ্চের বড়-বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় যে ওলট-পালোট খাচ্ছিল, আমি তাকে দু-হাতে উঁচু করে তুলে ধরে বুক-সাঁতার কেটে নিয়ে এলাম নৌকোর কাছে। ছেলেটির মা তখন হাউ-হাউ করে কাঁদছিল।

যাই হোক, ইতিমধ্যে আর একটি নৌকো এগিয়ে এসেছিল আমাদের সাহায্যের জন্য যাত্রীদের ভাগ করে দেওয়া হল দুটো নৌকোয়। পূর্বের নৌকোয় মাঝিদের রজত তখন মারধোর করতে শুরু করছে। আমি মাঝখানে এসে থামালাম।

উর্মির মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! সে সবসময় হাসিখুশি থাকে, কোনও অসুবিধেই গ্রাহ্য করে না—কিন্তু হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, উর্মি, তোমার লাগে টাগে নি তো কোথাও?

উর্মি মাথা নাড়িয়ে জানাল, না। মুখে কিছুই বলল না।

আমি ওকে চাঙ্গা করার জন্য বললাম, কি, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি? বেশ তো একটা অ্যাডভেঞ্চার হল।

উর্মি চুপ করে রইল।

ভিজে জামাকাপড়েই আমরা লঞ্চে এসে উঠলাম। এটা সরকারি লঞ্চ, এতে অন্য যাত্রী নেওয়া হবে না—কয়েকজন মাত্র সরকারি অফিসার, আর আমরা তিনজন। প্রচুর জায়গা আছে।

আমি উর্মিকে বললাম বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নিতে। তারপর আমরা যাব। কিন্তু উর্মি কোনও উৎসাহ দেখানো না। ঠকঠক করে কাঁপছে, ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবুও ভিজে কাপড় বদলাতে চাইছে না।

আমি একরকম জোর করেই উর্মিকে বাথরুমে পাঠালাম। এ ঘটনাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন উর্মি? এর মধ্যে কি আছে? প্রায় তীরের কাছেই নৌকো থেকে জলে পড়ে যাওয়া তো একটা হাসিরই ব্যাপার।

রজত গম্ভীর হয়ে গেছে যেন। উর্মি বাথরুমে যাওয়ার পর রজত বিস্মিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বিভাস, তুমি তা হলে সাঁতার জানো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো ছেলেবেলা থেকেই সাঁতার জানি। কেন, কী হয়েছে?

—আমার ধারণা ছিল না।

—কী ধারণা ছিল না?

—আমি ভেবেছিলাম, তুমি সাঁতার জানো না, তুমি জলকে ভয় পাও। সেই আগে একদিন

গঙ্গায় নৌকোতে উঠে তুমি যেরকম কথা বলেছিলে, কিংবা আজ সকালে স্নান করতে চাইলে না—

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, তীর্থস্নানে এসে স্নান করা বোধহয় আমার নিয়তিতে লেখা ছিল। আমি স্নান করতে না চাইলেও পাকেচক্রে ঠিকই হয়ে গেল।

রজত হাসল না। একটু লজ্জিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বুঝতে পেরেছি ঠিকই, রজত সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। উর্মি আমার বান্ধবী, সে বিপদে পড়লে আমারই উদ্ধার করতে যাওয়ার কথা। আমি অপারগ হলে অন্য কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু রজত আমাকে কোনও সুযোগই দেয়নি, সে আগে থেকেই সিনেমার হিরোর মতন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমিও যদি বাচ্চা ছেলেটির জন্য ঝাঁপিয়ে না পড়তুম, তাহলে সকলে আমাকে কাপুরুষ ভাবতে পারতো। আমি অবশ্য সে সবকথা চিন্তা করে জলে নামিনি।

আমি রজতের মনের কুয়াশা কাটিয়ে দেওয়ার জন্য আবার হেসে উঠলাম। এটা এমন কিছু গুরুত্ব দেওয়ার মতন ব্যাপার নয়। এরকম হতেই পারে। কখনও-কখনও হয়ে যায়।

কিন্তু ফেরার পথে সমস্ত সময় রজত আর উর্মি কেউই সহজ হতে পারল না।

গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পর কিছুদিন আমি আমার বোনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত হয়ে রইলাম। উর্মি সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ আমি ওদের বাড়িতে যেতে পারিনি।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, উর্মি তো আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন আসেনি। ও তো অনায়াসেই আসতে পারে। আগে যেমন এসেছে।

আমার বোন ঝর্ণাও আমাকে একদিন বলল, সেজদা, তোমার সঙ্গে উর্মির কি ঝগড়া হয়েছে?

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, কেন রে?

—অনেকদিন আসে না তো!

—ভেবেছে বোধহয় কাজের বাড়ি, সবাই খুব ব্যস্ত থাকবে।

—আহা উর্মিদি এলে বুঝি কাজের ক্ষতি হবে?

—আসবে নিশ্চয় দু-একদিন মধ্যে।

—পরশুদিন নিউমার্কেটের কাছে উর্মিদির সঙ্গে দেখা হল। কীরকম যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখলাম। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, খুব লম্বা, মাথায় বড়-বড় চুল—উর্মিদিকে আসতে বললাম বাড়িতে, খুব একটা উৎসাহ দেখাল না।

আমার মনে হল ঝর্ণা বোধহয় উর্মির নামে কিছু একটা নালিশ করতে চাইছে। এর প্রশ্রয় দিতে নেই। সঙ্গে-সঙ্গে আমি প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বললাম, তোর ফার্নিচারে অর্ডার দিতে যাব আজ। তুই পছন্দ করে নিতে যাবি তো আমার সঙ্গে।

ঝর্ণার কথাটা উড়িয়ে দিলেও উর্মির কথাটা আবার মাথায় ঘুরতে লাগল। উর্মিকে বেশিদিন না দেখলে আমার কষ্ট হয়। ও যখন দিল্লিতে ছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, উর্মিকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিই ওকে কলকাতায় জোর করে ফিরিয়ে এনেছি। উর্মিকে দেখলে, উর্মি কাছে থাকলে আমার এই জীবনটা সত্যি-সত্যি বেঁচে থাকার যোগ্য মনে হয়।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা গেলাম উর্মিদের বাড়িতে। কিন্তু ওকে পেলাম না! উর্মি দুপুরবেলাই কোথায় যেন বেরিয়েছে। উর্মির মা বললেন ও নাকি হঠাৎ চাকরি খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু-শুধু বাড়িতে বসে থাকতে ওর ভালো লাগে না। ও চাকরি করবেই।

মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। আমি নারী-স্বাধীনতার বিরোধী নই। মেয়েরা যা খুশি সেটাই করতে পারে। কিন্তু চাকরি করাটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার নয়। আমরা চাকরি করি নিতান্ত বাধ্য হয়ে। সুতরাং যে মেয়েদের টাকা উপার্জনের প্রশ্নটা খুব বড় নয়, তারা শুধু সময় কাটাইবার জন্য চাকরি করতে যাবে কেন? সময় কাটাবার আরও কত

ভালো উপায় আছে, গান-বাজনার চর্চা করা, অন্যদের নানা কাজে সাহায্য করা, কিংবা স্রেফ বই পড়া।

উর্মি যদি সত্যই চাকরি করতে চায়, আমি অবশ্যই তাতে বাধা দেব না। কিন্তু ও ব্যাপারে ওর প্রথমেই আমাকে বলাই তো ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। আমাকে কিছু জানাল না কেন? হয়তো উর্মি ভেবেছে একেবারে একটা চাকরি জোগাড় করে ও আমাকে চমকে দেবে। উর্মির মাকে কিছু না বলে আমি উঠলাম একটু বাদে। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললাম একটু ধর্মতলা ঘুরে যেতে। ওখান থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে।

এলগিন রোডের কাছে ঠিক আমার গাড়ির পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল একটা মোটরসাইকেল খুব আওয়াজ তুলে। রঙিন জামা পরা রজত, হাওয়ায় উড়ছে তার চুল। তার পেছনে যে মেয়েটি বসে আছে তার মুখ দেখতে না পেলেও উর্মিকে চিনতে আমার ভুল হয় না। উর্মির শুধু পিঠ বা হাত বা শরীরের যে-কোনও অংশ দেখলেই বোধহয় আমি চিনতে পারি।

ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। প্রায় চোখের নিমেষেই বাঁ দিকে বেঁকে গেল, উর্মিদের বাড়ির দিকেই। হয়তো রাস্তায় কোথাও উর্মির সঙ্গে রজতের দেখা হয়ে গিয়েছিল, রজত ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। আজকাল ট্রামে-বাসে যা ভিড়, একা কোনও মেয়ের পক্ষে ট্যাক্সিতে ঘোরাও তেমন নিরাপদ নয় সুতরাং রজত ওকে পৌঁছে দিয়ে উপকারই করছে। অনেক মেয়ে মোটরবাইকের পেছনে চাপতে ভয় পায়—কিন্তু উর্মি এইসব উত্তেজনাই বেশি পছন্দ করে।

আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর উর্মিদের বাড়িতে এখন গিয়ে দরকার নেই। কাল গেলেই হবে। তা ছাড়া উর্মি যখন বাড়িতে গিয়েই শুনবে যে আমি এসেছিলাম।

ধর্মতলার দিকে খানিকটা এগিয়েই আমি হঠাৎ রোককে-রোককে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই আমি বললাম, গাড়ি ঘোরাও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হয়ে গাড়ি ঘোরাতে শুরু করল। রাস্তার ওপরে এরকম ভাবে গাড়ি ঘোরানো শক্ত। তবু যেন আমার জেদ চেপে গেল যে এক্ষুনি উর্মির সঙ্গে দেখা করতে হবেই। না দেখা করে চলবেই না।

কিন্তু একটু বাদেই আমার লজ্জা করতে লাগল। এক্ষুনি উর্মিদের বাড়ি থেকে এসেছি, আবার এর মধ্যেই ফিরে যাব? বাড়ির সকলে কী ভাববে? আমার চরিত্রে তো এরকম আবেগের বাড়াবাড়ি থাকার কথা নয়।

সুতরাং আমি ড্রাইভারকে আবার বললাম, থাক, ওদিকে আর যাওয়ার দরকার নেই। আবার ঘোরাও, ধর্মতলার দিকেই চলো।

ড্রাইভার আগে কখনও আমার এমন অস্থিরচিত্ততার প্রমাণ পায়নি। সে রীতিমতন অবাক হয়ে বার বার চোরা চাহনি দিতে লাগল আমার দিকে, মুখে কিছু বলল না যদিও। আমি নিজেও নিজের ব্যবহারে অবাক হচ্ছিলাম।

মানুষের জীবনে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আসে, যখন একটি কথা বা একটি সিদ্ধান্তে সবকিছু বদলে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় সেইসময়টা পেরিয়ে যায়। আমারও বোধহয় সেইরকম কিছুই হয়েছিল।

কয়েকদিন পরেই উর্মির সঙ্গে হঠাৎ আমার দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল। এর আগে আমরা পরস্পরকে একটাও কঠিন কথা বলিনি পর্যন্ত। আমাদের দুজনের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কোনও অবকাশ ছিল না। কিন্তু সেদিন আমরা দুজনেই মেজাজের সংযম হারিয়ে ফেললাম।

আমি উর্মির বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পরদিনও উর্মি আমাদের বাড়িতে আসেনি। ব্যাপারটাতে বেশ খটকা লেগেছিল আমার। উর্মি তো এ রকম ব্যবহার কখনও করে না।

উর্মির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই রজতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রজতের ব্যবহার স্বাভাবিক।

সে কথায় কথায় জানাল যে উর্মি একদিন ওদের কাগজের অফিসে এসেছিল। কখনও তো কাগজের অফিস দেখেনি, সেই কৌতূহলে। রজত ওকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখিয়েছে রোটারি মেশিন, টেলিপ্রিন্টার, ব্লক কী করে তৈরি হয় এই সব। তারপর কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে কফি খাইয়ে নিজের মোটরবাইকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

উর্মি সেদিনই কথায় কথায় রজতকে বলেছে যে সে একটা চাকরি চায়। সে-ও কি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেতে পারে না? মেয়েরা সাংবাদিক হতে পারবে না কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তো অনেক নামকরা মেয়ে-সাংবাদিক আছে।

রজত হাসতে-হাসতে এই সব কথা বলল আমাকে। আমিও হাসলাম। রজত আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, বিভাস, তুমি খুব লাকি। তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ, সে খুব স্পিরিটেড গার্ল। দেখতে তো সুন্দর বটেই। কিন্তু শুধু রূপটাই বড় কথা নয়,—ওর চরিত্রে যেরকম তেজ আছে—

আমি খুশি হয়েছিলাম রজতের কথা শুনে। যে উর্মির প্রশংসা করে, সে আমার কৃতজ্ঞতা পায়।

উর্মিদের বাড়িতে সকালবেলা গিয়ে ওকে পেলাম। প্রথমেই জিগ্যেস করলাম, কী ব্যাপার তোমার? পাত্তাই নেই যে?

উর্মি উলটো অভিযোগ করে বলল, তুমিই তো আমার কোনও খোঁজখবর করো না। তুমি বোধহয় আজকাল আর আমাকে তেমন পছন্দ করো না। তাই না?

মেয়েদের একটা সুবিধে আছে, তারা যুক্তি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাই যে কোনও কথাই বলে দিতে পারে।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম, এসব আবার কী উলটো-পালটা কথা?

উর্মি হাসল না। মুখে তার অভিমানের হালকা ছায়া। মুখটা অন্যদিকে রেখে বলল, আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি, তাই না? জানি তুমি খুব ভালো, খুব মহৎ, আমি তোমার যোগ্য নই।

আমি একটু বিচলিত হয়ে উর্মির কাছে এসে ওর হাত ধরে বললাম, তুমি এসব কী বলছ, উর্মি? তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—কিছু হয়নি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, তুমি আমাকেও বলবে না?

—কী আবার বলব?

—তুমি নাকি চাকরি খুঁজছ? হঠাৎ কেন?

—কেন মানে? আমার কি স্বাধীনভাবে কিছু করার অধিকার নেই?

উর্মি এই কথাটা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বলেই আমি আঘাত পেলাম। আমি কি উর্মির কোনও কাজে কখনও বাধা দিয়েছি?

আমি ধীরস্বরে বললাম, তোমার চাকরির দরকার হলে আমিই বোধহয় খুব সহজে তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

—যাক, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি তো অনেক কিছুই করেছ আমার জন্য।

—উর্মি, তুমি কি আজ আমাকে শুধু আঘাত দিয়েই কথা বলতে চাও?

—আমি কি তোমাকে আঘাত দিতে পারি? আমার কি সেটুকুও মূল্য আছে তোমার কাছে?

—উর্মি, তুমি জানো না, তোমার জন্য আমি—

—আমি সবই জানি। আমি তোমার কাছে একটা খেলনা মাত্র। যখন ইচ্ছে হবে, আমাকে নিয়ে খেলা করবে। যখন ইচ্ছে হবে না, তখন একবারও ভাববে না আমার কথা—তখন আমি বেঁচেই থাকি কিংবা মরেই যাই।

—উর্মি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এসব কি কথা।

—আমি ঠিকই বলছি। আমার জীবনের কোনও দাম আছে তোমার কাছে? আমি নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তুমি আমার দিকে হাতটাও বাড়িয়ে দাওনি। তুমি গ্রাহ্যও করোনি।

আমার হাসি পেল। উর্মি সেই ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি অভিমান করেছে? ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!

হাসতে হাসতেই বললাম, জলে পড়ে গিয়ে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে? তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি মরে যাবে?

উর্মি শুকনো গলায় বললে, মরে গেলে যেতাম! কি আর হত।

—আরে দূর! ওখানে তো মাত্র বুক-জল, ওখানে কি কেউ ডোবে নাকি!

—আমার নিশ্বাস আটকে আসছিল—আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল—তবু—

—আরে এটা তো একটা সামান্য ব্যাপার।

—তোমার কাছে তো সামান্য হবেই।

আমি চুপ করে গেলাম। রজত যে আমাকে কোনও সুযোগ না দিয়ে আগেই নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটা বলতে গিয়েও আমার জিভ আটকে গেল। আড়ালে কোনও বন্ধুর নিন্দে বা সমালোচনা করা আমার পছন্দ হয় না। রজত একটা কৃতিত্ব দেখাতে চেয়েছিল, তাতে কি আর এমন ক্ষতি হয়েছে!

উর্মির দাদা-বউদি দিল্লিতে চলে যাওয়ার ফলে এ বাড়িতেই এখন লোকজন বিশেষ নেই। উর্মির বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ওর মা আছে দোতলায়। একতলার বসবার ঘরে শুধু আমি আর উর্মি। একটা জাম রঙের শাড়ি পরে উর্মি বসে দূরের সোফায়। আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। খুবই রেগে আছে মনে হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের ব্যাপারটায় যে এত গুরুত্ব থাকতে পারে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। এই সুন্দর সকালবেলাটা ঝগড়া করে কাটাবার কোনও মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি রজতের অফিসে গিয়েছিলে? কেমন লাগল খবরের কাগজের অফিস?

উর্মি বলল, আমি ওদের অফিসে গিয়েছিলাম? কে বলল তোমাকে?

—কেন তুমি যাওনি?

—না।

আমি এবার ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলাম, এর মধ্যে রজতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি বলচে চাও?

উর্মি কঠোর মুখ করে আবার বলল, না।

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল। উর্মি তো কখনও এরকম ছিল না। এরকম ভাবে বদলে গেল কী করে। মিথ্যে কথা বলা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। রজতের সঙ্গে উর্মি দেখা করলে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু ও সে কথা আমার কাছে গোপন করবে কেন?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি রজতের মোটরসাইকেলের পেছনে চেপে আসছ।

উর্মি ব্যঙ্গের সহিত বলল, তাই নাকি? তুমি নিজের চোখে দেখেছ? যদি চেপেই থাকি, সেটা কি খুব অপরাধ?

—মোটেই আমি বলিনি সেটা অপরাধ। তুমি নিশ্চয়ই দেখা করতে পারো কিন্তু তুমি সেটা গোপন করতে চাইছিলে কেন?

—মোটেই আমি গোপন করতে চাইনি। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি, তুমি দেখেছ। এলগিন রোডের কাছে, তোমার গাড়ির পাশ দিয়েই আমরা এলাম। তুমি কেন তখন আমাদের ডাকোনি? কিংবা কেন গাড়ি ঘুরিয়ে আসোনি! আমরা একটু দূরে থেমে পড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা

করছিলাম। তোমার মনে পাপ আছে, তাই তুমিই সেটা আগে গোপন করে আমাকে জেরা করতে চাইছিলে।

—ছিঃ, ঊর্মি, তুমি আমাকে এরকম ছোট ভাবলে?

—তুমি বলো, তুম প্রথমেই কেন বললে না আমাকে রজতের মোটরবাইকের পেছনে দেখেছিলে? কেন জেরা করতে শুরু করলে?

—একটা সাধারণ কথা জিগ্যেস করতে পারব না?

—এটা সাধারণ কথা?

আর আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। এই সময় যদি প্রসঙ্গটা বদলাতে পারতাম কিংবা ঘরে অন্য কেউ এসে পড়ত, তাহলে সব ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যেত। তার বদলে, আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, ধরা পড়ে গেছ, কিনা, তাই এখন ওই কথা বলছ! তুমি আমাকে না জানিয়ে রজতের অফিসের গিয়েছিলে?

ঊর্মি অত্যন্ত জেদি মেয়ে। রাগের সময় ওর জ্ঞান থাকে না। আমাকে বাধা দিয়ে ও কথার মাঝখানেই বলল,—শুধু ওর অফিসে কেন, ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম একদিন।

—ও, এতদূর! আমার বোন নিউমার্কেটের সামানেও তোমাকে একদিন দেখেছে রজতের সঙ্গে।

—বেশ করেছি। আমার যেখানে খুশি, যার সঙ্গে খুশি যাব। আমি কি খাঁচার পাখি?

এরপর ঝগড়া চরমে উঠল। আমি রাগে কাঁপতে-কাঁপতে ঊর্মির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় বলে এলাম, তোমরা যা খুশি করো। আর কোনওদিন বিরক্ত করতে আসব না।

ঊর্মির রাগ বেশিক্ষণ তাকে না। একটা দিন কাটলেই ঊর্মির সঙ্গে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। এর আগেও দেখেছি, দিনের বেলা ঊর্মি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করলে সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কাঁদবে। সকালবেলায় তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কিন্তু এবার সেরকম হল না। আমি চলে যাওয়ার একটু পরেই ঊর্মি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা গিয়ে উপস্থিত হল রজতের ফ্ল্যাটে। জেদের বসে বলল, আমি আর কোথাও যাব না। আমি এখানেই থাকব। আপনিও কি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?

রজত ঊর্মিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করল। রাগ করল, ধমকালো, ঊর্মি তখনও কিছুই শুনবে না। তারপর রজত ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ওর পিঠে হাত ছোঁয়ালো। একবার স্পর্শের পর সব কিছু বদলে যায়। রজত তো বলেই ছিল, সে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ঠিক আটদিন পরে রজত এসে দেখা করল আমার অফিসে। আমার একটা ছোটখাটো ঘর আছে, সেটার দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রজত জিগ্যেস করল, বিভাস, তুমি কি খুব ব্যস্ত? আসতে পারি?

রজতকে দেখেই আমি একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেললাম। অফিস থেকে আমাকে বম্বেতে ট্রান্সফার করার কথা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। সেখানে গেলে আমার চাকরিতে প্রমোশন হবে, সুযোগ-সুবিধেও অনেক বেশি পাব। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না।

রজতকে বললাম, তুমি এক মিনিট বসো। আমি ম্যানেজারের ঘর থেকে এখুনি আসছি।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বলল, স্যার, আমি বম্বেতে যেতে রাজি আছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করুন।

ফিরে এসে দেখলাম, রজত ওর বুড়ো আঙুলের নখে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ঠুকছে।

আমি বললাম, কী ব্যাপার বলো? কফি-টফি খাবে?

রজত মুখ তুলে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। মুখটা দেখেই বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলছে। রজত যদি কোনও বদমাইশ লম্পট ধরনের মানুষ হত তাহলে ওর কোনও অসুবিধেই ছিল না। ও ভদ্রলোক বলেই কষ্ট পাচ্ছে।

রজত বলল, তোমার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা আছে। কিন্তু এখানে বসে ঠিক—তুমি কি একটু বেরুতে পারবে? খুব কাজ আছে?

আমি বললাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে নিতে পারি, যদি বসতে পারো।

—আমি বসছি।

আমি কাজ করতে লাগলাম। রজত চুপচাপ বসে একটা-পর-একটা সিগারেট শেষ করতে লাগল।

তারপর এক সময় বেরুলাম। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই গাড়ির স্টিয়ারিং-এ বসে বললাম, কোথায় যাবে?

রজত বলল, আমার ফ্ল্যাটেই সুবিধে। তোমার আপত্তি আছে।

—না, না, আপত্তি থাকবে কেন?

রজতের ফ্ল্যাটে আমি আগে দু-তিনবার এসেছি। ব্যাচেলারের ফ্ল্যাট, এখানে বন্ধুবান্ধবদের দারুণ আড্ডা হয়। আমি অবশ্য রজতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন নয়—আমার নিজের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নেই—ওদের তাস খেলা বা মদের আড্ডায় আমি সেরকম ভাবে যোগ দিতে পারি না।

আগের বার এসে ফ্ল্যাটটাকে অত্যন্ত অগোছালো দেখেছিলাম। এখন সেখানে যত্নের স্পর্শ আছে।

ঘরে ঢুকেই রজত টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ব্রান্ডির বোতল বার করল, ঢকঢক করে চুমুক দিল খানিকটা। তারপর আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে বলল, খাবে একটু?

আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। মানসিক উত্তেজনা দমন করার জন্য রজতের ব্রান্ডির দরকার হয়, কিন্তু আমার হয় না।

দুজনে দুটো চেয়ারে বসলাম। রজত ওর লম্বা চুলে চিরুনির মতো আঙুল চালাতে-চালাতে ক্লিষ্ট স্বরে বলল, কীভাবে শুরু করব, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি জানো নিশ্চয়ই সব ব্যাপারটা?

আমি বললাম, শোনো রজত, তোমারও দোষ নেই, ঊর্মিরও দোষ নেই। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখছি।

রজত বলল, দাঁড়াও-দাঁড়াও, ওরকম ভারিক্কি চালে কথা বলো না। তুমি মহত্ত্ব দেখাতে চেয়ো না কিংবা উপদেশও দিও না। আমরা দুজন পুরুষমানুষ, প্র্যাকটিক্যাল হয়ে কথা বলতে হবে।

—ঠিক আছে, তুমিই বলো তাহলে!

—আমার যেটুকু বলার আগে বলে নিচ্ছি। তুমি আমার বন্ধু, তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক, তাকে কেড়ে নেওয়ার মতন মনোবৃত্তি আমার নয়। কোনওরকম ছলছুতো করে আমার দিকে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও আমি করিনি।

—আমি জানি।

—আমাকে সবটা বলতে দাও। আমি ঊর্মির সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছি। তোমাকে কোনওরকম ভাবে ঠকাবার ইচ্ছেও আমার মাথায় কখনও জাগেনি। গঙ্গাসাগরে তোমরা আমার সঙ্গে গিয়েছিলে নিজেদের ইচ্ছেতেই। জল থেকে ঊর্মিকে আমি কোলে করে তুলে এনেছিলাম, সেজন্য কি তুমি কিছু মনে করেছিলে?

—না।

—সেটাই স্বাভাবিক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে যে আমার সেই সময়কার ব্যবহার ক্যালকুলেটেড কিছু না, একেবারে ইনসটিংটিভ—তুমি যে সাঁতার জানো, সেটা আমার ধারণাতেই ছিল না।

—এ সম্পর্কে আর বেশি বলে লাভ কি?

—এ ব্যাপারটিতে তুমি কোনও গুরুত্ব দাওনি। কিন্তু ঊর্মি দিয়েছে। ওর ধারণা হয়েছে, তুমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করোনি।

—ওখানে মরার প্রশ্নই ছিল না।

—হয়তো তাই। কিন্তু মেয়েরা ছোট ব্যাপারকেও বড় করে দেখে। ওরা ওদের প্রতি মনোযোগের বাড়াবাড়িও পছন্দ করে। ওরা মেলোড্রামায় বিশ্বাসী। যাকগে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি খুব ধীর-স্থির-শান্ত ধরনের মানুষ, তুমি অনেক সলিড এবং নির্ভরযোগ্য, কিন্তু আবেগ আর উত্তেজনা তোমার মধ্যে কম। ঊর্মির স্বভাব সম্পূর্ণ উলটো। সে ছটফটে, জেদি, খামখেয়ালী—

এখান আমার হাসি পাওয়ার কথা। রজত ঊর্মির চরিত্র বোঝাচ্ছে আমাকে—অথচ ঊর্মিকে ও দেখেছে মাত্র দু-তিন মাস। আর আমি ঊর্মিকে চিনি অন্তত এগারো বছর ধরে।

রজত বলল, তোমাদের মধ্যে মিল হওয়া খুব শক্ত ছিল। ঝগড়া হতোই—এখন না হোক বিয়ের পরে। সুতরাং এখন যে হয়েছে, সেটা এক হিসেবে ভালোই।

—এখন তোমাদের প্ল্যান কী?

তুমি জানো, আমার বিয়ে করার কোনও প্ল্যান ছিল না। আমি বিয়ে টিয়ের কথা কখনও ভাবিইনি। কিন্তু ঊর্মি, মানে সেদিন ঊর্মি আমার এখানে এসে পড়ল ঝড়ের মতন। কিংবা ওর যা নাম—একটা প্রকাণ্ড ঢেউ—আমার সব ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গেল—মানে, সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেমন লেখে, মেড ফর ইচ আদার—আমরা দুজনে ঠিক তাই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছি।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি এখানে চুপচাপ বসে আছি কেন? এই রজত, এ আমার কাছ থেকে ঊর্মিকে কেড়ে নিচ্ছে আমি কোনও বাধা দেব না।? বছরের-পর-বছর ধরে যে ঊর্মিকে আমি আমার বুকের মধ্যে লালন করেছি, পৃথিবীতে যার চেয়ে সুন্দর আমি আর কারুকে দেখি না, সেই ঊর্মি। একটা ঘুষিতে রজতের সব দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা উচিত নয় আমার?

তবু আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। রজত ঠিকই বলছে। ওর সঙ্গেই ঊর্মিকে ঠিক মানায়। রজত তো নিজে থেকে ঊর্মিকে গ্রাস করেনি। আমিই ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছি, ঊর্মির স্বেচ্ছায় এসেছে এখানে।

আমি জিগ্যেস করলাম, ঊর্মি কোথায়?

—আসবে, আর-একটু পরেই আসবে।

—আমি এইসব কথা ঊর্মির মুখ থেকে শুনতে চাই।

—ঊর্মি নিজের মুখে তোমাকে কিছু বলতে পারবে না। ঊর্মি খুব ভেঙে পড়েছে। একদিন রাগের মাথায় ঝগড়া করলেও তোমার সঙ্গে ওর এতদিনের সম্পর্ক, তা ছাড়াও ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে।

একদিন যেটা ছিল ভালোবাসা, আজ সেটা হয়ে গেল শ্রদ্ধা? মাত্র একমাস আগেও ঊর্মি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেনি যে আমায় ছেড়ে ও বেশিদিন দূরে থাকতে পারে না?

না, আমি ভুল করেছিলাম। ঊর্মির মুখ থেকে কিছুতেই শুনতে চাই না যে সে আমাকে ভালোবাসে না। ওটা মরীচিকা হয়েই থাক। ভালোবাসা তো কোনও বন্ধন নয়। কোনও প্রতিশ্রুতিই বোধহয় সারা জীবন টেঁকে না। ঊর্মিকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে বেঁধে রাখতে চাইনি তো কখনও।

রজত আবার বলল, বিভাস, আর একটা কথা তোমার কাছে বলতে আমার খুব লজ্জা

করছে। কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই। এখন উর্মির চেয়ে আমি যেন বেশি পাগল হয়ে উঠেছি। আমি বুঝতে পেরেছি, উর্মির মতন একজন মেয়েকেই আমি সারা জীবন ধরে খুঁজেছিলাম। ওকে না পেলে আমার চলবে না। ওকে না দেখলে আমি সারা জীবন অসম্ভব অতৃপ্ত থেকে যেতাম। আমি জানি, তোমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিচ্ছি আমি। এটা ভয়ংকর স্বার্থপরতা। কিন্তু ভালোবাসার জন্য মানুষ এ রকম স্বার্থপরও হয়। তুমি আমাদের ক্ষমা করো। তুমি জীবনে সার্থক, তুমি জীবনে অনেক নারীর ভালোবাসা পাবে; উর্মির চেয়েও অনেক ভালো কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু উর্মি শুধু আমারই জন্য।

রজতের গলা আবেগে কাঁপছিল। যে-কোন লোকেরই সহানুভূতি হবে তার কথা শুনে। উর্মিকে সে তীব্রভাবে ভালোবেসে ফেলেছে এখানে যেন আমার কোনও ভূমিকা নেই।

আমি রেগে উঠে রজতের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করলে সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক হত। কিন্তু আমরা একটা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি। আমরা এখন আর কোনও নারীর জন্য মারামারি করি না। এখন সব দুঃখ বুকে চেপে রাখতে হয়।

রজত আবার চুমুক দিচ্ছে ব্রান্ডির বোতলে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। খুব ধীর স্বরে বললাম, আমার দুটো শর্ত আছে। আমি চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে শিগগিরই চলে যাচ্ছি বম্বেতে। আমি কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার আগে তোমরা বিয়ে করবে না। আর আমার বোনের বিয়ের আগে তোমাদের এই সম্পর্কের কথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। সেই বিয়েতে তোমরা দুজনেই নেমন্তন্ন খেতে যাবে।

রজত উঠে দাঁড়াল। আমার হাত ধরে বলল, তুমি যদি রাজি না হতে কিংবা রাগ করতে, তা হলে আমি কী করতাম জানো? আমি সেটাও আগে ঠিক করে রেখেছিলাম। আমি কারুকে কিছু না জানিয়ে, উর্মিকেও না জানিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতাম, আমার আর খোঁজ পেতে না। অবশ্য তাতে সমস্যা মিটতো কিনা আমি জানি না। হয়তো তাতে আমাদের তিনজনের জীবনই অভিশপ্ত হয়ে উঠত।

আমি বললাম, না তার দরকার নেই। আমিই দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাদের বাধার সৃষ্টি করব না।

জানি, আমার এই কথাগুলো মহৎ-মহৎ শোনাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, একটা কিছু তো বলতে হবে। এর চেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আর কী বলা যায়!

রজত আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই জিগ্যেস করল, নো হার্ড ফিলিংস?

আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম, না।

জোর করে একটু হাসিও ঠোঁটে ফোটালাম। তারপর পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

রজত বলল, একি, এক্ষুনি চলে যাচ্ছো, আর একটু বসো, উর্মি ছ'টার মধ্যেই এসে যাবে। ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

—না, আমার অনেক কাজ আছে।

রজতের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আমি গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম আগে। আয়নায় দেখলাম নিজের মুখটা। কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন তো ঘটেনি। কেউ কি আমার মুখ দেখে বুঝবে, আজ থেকে আমার জীবনটা শূন্য হয়ে গেল?

গাড়িটা চালিয়ে সি আই টি রোডের বাঁক ঘোরার মুখেই আবার থামলাম। রজতের ফ্ল্যাটটা যেন চুম্বকের মতো আমাকে টানছে, ওটা ছেড়ে দূরে যেতে পারছি না। একটু পরেই ওখানে উর্মি আসবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়ালাম। এখান থেকেও রজতের ফ্ল্যাটটা দেখা যায়। রজত দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। অনবরত চুলে মধ্যে আঙুল বোলাচ্ছে। রজত প্রতীক্ষা করছে উর্মির জন্য।

আমিও তাই। অথচ দুজনের মধ্যে কত তফাত।

গঙ্গাসাগরে নৌকো উলটো যাওয়ার ঘটনাটা আসলে কিছুই নয়। একটা নিমিত্ত মাত্র। জল থেকে তোলার সময় রজত উর্মিকে স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শেই উর্মি বুঝেছে, এইরকম পুরুষকেই তাই চাই। আমি উর্মির যোগ্য নই।

পরপর ক'টা সিগারেট শেষ করেছিলাম মনে নেই। এক সময় দেখলাম রজতের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামল। তার থেকে নামল উর্মি। একটা সাদা রঙের শাড়ি পরে আছে। মুখ-চোখ উদভ্রান্তের মতন। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

উর্মির সঙ্গে বস্তুত সেই আমার শেষ দেখা। আমি মনে মনে বললাম, উর্মি, আমি চিরকাল তোমায় ভালোবাসবো। আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে সুখী করতে চেয়েছিলাম। তুমি সুখী হও। আমি তোমার সুখের জন্যই তোমাকে রজতের হাতে সমর্পণ করলাম।

বম্বেতে বাড়ি ভাড়া জোগাড় করা খুব শক্ত, তাই প্রথমে এসে আমাকে উঠতে হল একটা হোটেলে। সেখানে সময় কাটে না।

বম্বেতে ট্রান্সফারের কথা আর কারুকে আগে ঘুণাক্ষরেও জানাইনি। আমার বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে খবরটা প্রকাশ করে, ঠিক সেইদিনই ট্রেনে চেপে বসেছি। এখন কলকাতাকে নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে অনেকরকম আলোচনা এবং জল্পনাকল্পনা হচ্ছে। আমার আড়ালে যা খুশি তাই হোক।

কাজের মধ্যে সবসময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কাজেরও তো একটা সীমা আছে। এক সময় না এক সময় একা থাকতেই হয়, তখনই রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে। উর্মির ছবিটা বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি সেটা তাড়াবার জন্য তক্ষুনি চলে যাই কোনও সিনেমা দেখতে। যে-কোনও আজেবাজে সিনেমাই হোক না কেন।

বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আমি যেন সিনেমা দেখি। স্পষ্ট দেখতে পাই উর্মি আর রজত হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। কিংবা রজত মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে। উর্মি বসেছে পিছনে! মোটরসাইকেলটা গর্জন করে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। পতপত করে উড়ছে উর্মির আঁচল। সমস্ত শব্দ ভেদ করেও আমি শুনতে পাই ওদের দুজনের মিলিত হাসির শব্দ।'

সেই সময় বিছানা থেকে উঠ আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই।

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পর কয়েকটা দিন উর্মি আর রজতের কীভাবে কেটেছিল, তা অনেকটা আমি এই রকম স্বপ্নে দেখেছি, অনেকটা শুনেছি পরে লোকমুখে। সবই আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেছে।

আমি কলকাতা ছাড়বার পর উর্মি যখন রজতকে বিয়ে করার কথা বলেছে, তখন হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছিল যে উর্মির সাথে আমার কিছু একটা গুরুতর গণ্ডগোলই ঘটেছে, কিন্তু পাত্র হিসাবে রজতকে কারুরই পছন্দ হয়নি। সাধারণ সংসারী লোকেরা রজতের মতন ছেলেকে সুনজরে দেখে না। তার লম্বা-চওড়া চেহারা অন্যদের কাছে মনে হয় 'গুণ্ডার মতন'। সে একটা চাকরি করে বটে, কিন্তু সে উচ্ছৃঙ্খল, বাউন্ডুলে। তার বিষয় সম্পত্তি নেই, জমানো টাকা নেই, প্রকাশ্যে মদ খায়, নারীঘটিত অনেক কাহিনি আছে তার নামে। তার উপরে একেবারেই নির্ভর করা যায় না।

উর্মিকে অনেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল, তাকে আবার পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল দিল্লিতে। কিন্তু অন্য কারুর কথায় যে সে মত বদলাবে না, তা আমি অন্তত খুব ভালো করেই জানি। উর্মি যখন আমাকে ছাড়তে পেরেছে, তখন আর কারুকেই সে গ্রাহ্য করবে না।

উর্মির দাদা সুকোমল বম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নেওয়ার

জন্য। সুকোমল ভেবেছিল উর্মির সঙ্গে আমার সাধারণ ঝগড়া বা মান-অভিমান হয়েছে, আর একবার দুজনের দেখা করিয়ে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি সুকোমলকে খুব শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বললাম যে আমি উর্মির ভালোর জন্যই ওকে ছেড়ে এসেছি। রজতের সঙ্গেই ওর স্বভাবের মিল হবে, রজতকে ওই সত্যিকারের ভালোবাসতে পারবে।

সুকোমল বলল, এটা ভালোবাসা নয়, এটা একটা সাময়িক মোহ।

—কিন্তু উর্মির চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, সে বুঝবে না কোনটা মোহ কোনটি ভালোবাসা।

—মেয়েরা অনেক বয়েস পর্যন্ত ছেলেমানুষ থাকে। ওরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

—তবুও যদি ভুল করতে চায়, তুই আমি বাধা দেবার কে? জীবনটা তো ওর নিজেরই।

তা হলে ও যদি এরকম একটা ভুল করে আমি দাদা হয়েও তাতে বাধা দেব না?

—এসব ক্ষেত্রে বাধা দিয়েও কোনও ফল হয় না। তুই রজতের সঙ্গে দেখা করেছিস?

ওরে বাবা, সে তো একটা গুন্ডা। তার ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আমরা কোনও আপত্তি করলেও সে উর্মিকে কেড়েই নিয়ে যাবে। অবশ্য এসব লোককে কী করে ঠান্ডা করতে হয় আমি জানি।

—সুকোমল, তুই ভুল করছিস। রজত মোটেই গুন্ডা নয়, তার অনেক গুণ আছে। ওকে বিয়ে করলে উর্মি সুখীই হবে। এ বিয়ে হবেই মাঝখানে তোরা বাধা দিয়ে তেতো করে তুলিস না।

কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে সুকোমল আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে বলে গেল, তুই যে এত কাপুরুষ, তা আমি জানতাম না। তুই এত সহজে ছেড়ে দিলি? নিজের বোন বলে বলছি না, উর্মিকে ছেড়ে দিয়ে তুই বিরাট ভুল করলি।

আমি সে কথার কোনও উত্তর দিইনি।

আমি আগেই শুনেছিলাম, রজত আনুষ্ঠানিক মন্ত্র পড়া বিয়েতে রাজি নয়। ওরা রেজিস্ট্রি করবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া। আমি মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নির্দিষ্ট দিনে রজতের ফ্ল্যাটে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। মাঝখানে গম্ভীরমুখ প্রৌঢ় রেজিস্ট্রার। দু-একটা শপথবাক্য এবং কয়েকটা সই—হয়ে গেল বিয়ে। সারাজীবনের অঙ্গীকার। এখন থেকে উর্মি সামাজিক ভাবে রজতের—

এর পর খাওয়া-দাওয়া। উর্মি কি নববধূর মতন লজ্জাশীলা? না সহজ স্বাভাবিক ভাবে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করছে? সেটাই যেন উচিত। রজতও ঘুরে ঘুরে সকলকে জিগ্যেস করল, আর একটা ফিস ফ্রাই নেবেন না? একটু দই?

ওখানে আমার কথা একবারও কি কারুর মনে পড়েছে?

বিয়ের পর হনিমুন। আমি উর্মিকে কাশ্মীরে নিয়ে যাব বলেছিলাম। রজত অত দূরে যাবে না। রজত খুব পাহাড় ভালোবাসে। খুব সম্ভবত দার্জিলিং।

দার্জিলিং-এ রজত আর উর্মি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জলাপাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। দারুণ খুশিতে উজ্জ্বল দুই তরুণ-তরুণী। কী সুন্দর মানিয়েছে ওদের। ওরা হাত ধরাধরি করে দৌড়াচ্ছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। ওরা কি বুঝতে পারছে যে হাজার মাইল দূর থেকে ওদের আমি দেখছি?

ঘোড়া ভাড়া করেছে রজত। উর্মিকে ঘোড়ার চড়া শেখাচ্ছে। উর্মি একটুও ভয় পাচ্ছে না। হাসিতে দুলে দুলে উঠছে ওর শরীর।

রজত আর উর্মি পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কালিম্পংয়ের দিকে। যেন সে যুগের এক রাজকুমার আর রাজকুমারী।

বৃষ্টি, বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে। ভিজে যাচ্ছে উর্মি। ইস, যদি ঠান্ডা লেগে যায়!

ওরা দুজন বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতন ছুটে-ছুটে আসছে হোটেলের দিকে। উঠে গেল হোটেলের

দোতলায়। ঊর্মির খুব শীত করছে এখনও। রজত ওর হাতে হাত ঘষে গরম করে দিচ্ছে।—

রজত সাংবাদিক, কত লোকের সঙ্গে চেনা। দার্জিলিংয়েও অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ম্যালের কাছে রজতের দুজন বন্ধু তারা শিলিগুড়ি থেকে মোটর সাইকেলে এসেছে বেড়াতে। একজনের মোটর সাইকেলে কি যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

মোটর সাইকেলটা রজতের নেশার মতন। ঊর্মিকে দাঁড় করিয়ে রেখে রজত তার বন্ধুর মোটর সাইকেল সারাচ্ছে! এই তো ঠিক হয়ে গেল। রজতের মুখে সাফল্যের হাসি।

রজত ঊর্মিকে বলছে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি মোটর সাইকেলটা একটু ট্রায়াল দিয়ে আসি।

স্টার্ট দিয়ে রজত সেটা নিয়ে দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় না শব্দ।

নাঃ, কত আর ছবি দেখাব। আবার দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম। আঃ, ঘুম কি কিছুতেই আসবে না?

মাঝরাত্রে কিসের একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ, না কে যেন ধাক্কা দিল আমার মাথায়? কে যেন আমাকে ধাক্কা দিতে-দিতে ব্যাকুল গলায় বলল, বিভাস ওঠো-ওঠো!

কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘরের দরজা বন্ধ, কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবে? উঠে আলো জ্বাললাম। দরজা বন্ধ আছে। ঘরে, কেউ নেই। তবে, আমার সুটকেসটা একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা ছিল, সেটা পড়ে গেছে নিচে। সেই শব্দেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। সুটকেসটা পড়ল কী করে? হয়তো আমার পায়ের ধাক্কা লেগেছে ঘুমের মধ্যে। যদিও ওটা বেশ দূরে—

না। আসলে আমার ঘুম ভেঙেছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। ওঃ কি বিশ্রী স্বপ্ন। আমি দেখলাম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে দারুণ স্পিডে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে আসছে রজত। পাশেই খাদ। তবু দুঃসাহসী রজত সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে ব্যান্ডির বোতল বার করে চুমুক দিতে গেল...এক হাতে হ্যান্ডেল ধরা...একি করছে, রজত হঠাৎ হ্যান্ডেলটা বেঁকে গেল কিংবা চাকা স্কিড করল—মোটরবাইক শুদ্ধু রজত গড়িয়ে পড়ছে, খাদে, অনেক নিচে—

না, না, না, এ হতেই পারে না। অসম্ভব! অসম্ভব!

ঊর্মিকে যখন আমি আবার দেখলাম, তখন তাকে মানুষ না বলে একটি ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। দেহে প্রাণ আছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে শরীরে ঠিক মতন রক্ত-চলাচল করছে, শুধু আলোটুকুই নেই? সেই ঊর্মিকে যেন চেনাই যায় না। সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে। কাঁদে না, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সবসময় কী যেন ভাবে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখার পরের দিনই আমি টেলিগ্রামে রজতের দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলাম। আমি যেরকম দেখেছিলাম, প্রায় সেইরকম ভাবেই খাদে পড়ে গিয়ে রজত মারা গেছে। তার শরীর টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

টেলিগ্রামটা পেয়ে আমি কেঁদেছিলাম। রজত আমার বন্ধু ছিল, অনেকখানি বড় প্রাণ ছিল তার সেই প্রাণের একি অপচয়! ঊর্মির কথা ভেবেও আমি কান্না থামাতে পারিনি অনেকক্ষণ। ঊর্মি জীবনে সুখ চেয়েছিল, রজত কেন তাকে এরকম ভাবে বঞ্চিত করে চলে গেল। সে নিজেও নিয়ে গেল কি দারুণ অতৃপ্তি!

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই অবশ্য আমি কলকাতায় ছুটে যাইনি। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল সুকোমল। আমি জানতাম সুকোমলই ঊর্মিকে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে। এই সময় ঊর্মিকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। আমিও না।

আমি একমাস অপেক্ষা করলাম বম্বেতে। সেই একমাস যে কত দীর্ঘ, কত যন্ত্রণাময় তা আমি কারুকে বোঝাতে পারব না। প্রতি মুহূর্তে আমি চাইছিলাম ঊর্মির কাছে ছুটে যেতে, অথচ জানতাম তখন যাওয়া চলে না।

এই একমাস সময় আমি নিলাম উর্মির শোক খানিকটা শান্ত হওয়ার জন্য। সময়ের একটা শোক ভুলিয়ে দেওয়ার অমোঘ শক্তি আছে। তা ছাড়া, এই শোকের মধ্যে আমার কথা উর্মির দু-একবার মনে পড়বেই। খবর পেয়েই আমি উর্মির কাছে ছুটে যাব, এইটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমি না যাওয়ায় উর্মি নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ উর্মির মনে আমার জন্য একটা প্রতীক্ষা জন্মাবার সময় নিচ্ছিলাম আমি।

আমি যখন কলকাতায় ফিরে উর্মির খাটের পাশে দাঁড়ালাম উর্মি শান্ত গলায় জিগ্যেস করল, তুমি এত দেরি করে এলে?

আমি বললাম, কিছুই তো দেরি হয়নি। সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে।

উর্মি আমার দিকে স্থির চোখ মেলে বলল, আমার আর বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। আমি বাঁচব কী জন্য?

—আমার জন্য।

—বিভাস, আমি তোমার নখেরও যোগ্য নই। আমি তোমাকে যা অপমান করেছি—

—উর্মি ও কথা থাক।

—আচ্ছা একটা কথা বলো তো? রজতের সঙ্গে কি আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল? আমি কি সত্যিই ওকে বিয়ে করেছিলাম? নাকি পুরো ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্ন?

—অনেকটা স্বপ্নেরই মতন।

—আমি রজতের মুখটা এখন আর মনে করতে পারছি না। রজত মরে গেছে, না আমি মরে গেছি? আমিই মরে গেছি। বোধহয়।

আমি উর্মির মাথার কাছে বসে ওর হাতটা তুলে নিলাম। মনে হল যেন সেই হাতে একটু প্রাণের স্পন্দন নেই। ওর ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ বিবর্ণ। চোখ দুটোতে জ্যোতির চিহ্নমাত্র নেই।

উর্মির মা এবং সুকোমল বলল, উর্মি যদি দিনের-পর-দিন এইরকম ভাবে শুয়ে থাকে, তা হলে ও আর কিছুতেই বাঁচবে না। এইভাবে মেয়েটাকে চোখের সামনে মরতে দেখা যায়?

তখন উর্মিকে বাঁচাবার যা উপায়, আমি তাই করলাম। একদিন ওকে প্রায় জোর করেই বিছানা থেকে তুলে আমার গাড়িতে এনে বসালাম। তারপর নিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গঙ্গার ধারটা সেদিন অনেক নির্জন। জলের পাশে দাঁড়িয়ে আমি উর্মিকে বললাম, রজতের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমরা এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?

উর্মি ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—আমাদের জীবন আবার সেখান থেকে শুরু করা যায় না?

—না।

—কেন?

আমি তোমার অযোগ্য। আমি তোমাকে অপমান করেছি। আমি নষ্ট। অন্যের উচ্ছিষ্ট।

—তুমি আমার কাছে সেই উর্মিই আছো, ঠিক আগেকার মতন।

—তা হয় না। তা হয় না।

—রজতকে তুমি ভুলতে পারবে না?

—ভোলা কি সম্ভব?

সম্পূর্ণ ভুলতে বলছি না। তার স্মৃতি থাকবেই, তবু সেই জন্য তুমি তো তোমার নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারো না।

—আমি কি আবার বাঁচতে পারব?

এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে উর্মি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি ওকে

ধরে তুললাম। ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলাম, কী হল উর্মি? কি হয়েছে তোমার?

কয়েকটা বড় বড় নিশ্বাস নিয়ে উর্মি ম্লান গলায় বলল, কী জানি বোধহয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। কিংবা, কেউ কি আমাকে ধাক্কা দিয়েছে?

আশেপাশে কোনও লোক নেই, কে আবার ধাক্কা দেবে। এতদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে ওর পা দুটোই দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে দাঁড় করিয়ে রাখাই বোধহয় ভুল হয়েছে আমার।

আস্তে-আস্তে ধরে ওকে নিয়ে এসে একটা বেঞ্চে বসালাম। তারপর বললাম, উর্মি, তুমি আমার ছিলে, এখনও আমারই আছো। মাঝখানে যেটা ঘটে গেছে, সেটা কিছুই নয়।

উর্মির গালে যেন রক্তের আভা দেখা দিল। ফিসফিস করে বলল, বিভাসদা তুমি মহৎ কিন্তু আমার জন্য আর কত কষ্ট সহ্য করবে?

আমি হেসে বললাম, আমি মহৎ টহৎ কিছু না। আমি স্বার্থপর। আমি তোমাকে চাই! তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না।

রজতের মৃত্যুর ঠিক আড়াই মাস পরে উর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। রেজেস্ট্রি করেই। এত তাড়াতাড়ি একটি বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হওয়া হয়তো দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে—কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটাও কথা বলেনি। সকলেই বুঝেছিল, উর্মির আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য এইটাই একমাত্র উপায়।

শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হওয়ার আগে উর্মি আমাকে দিয়ে এই শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে আমি কোনওদিনই রজতের নাম আর উচ্চারণ করতে পারব না। রজত আর কোথাও নেই, সে মুছে গেল।

আমার বড়মামার একটা বাড়ি আছে মধুপুরে। বাড়িটা খালি পড়ে থাকে, পুজোর সময় শুধু মামারা যান। আমি উর্মিকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম মধুপুরে, বিয়ের দুদিন পরেই।

কাশ্মীরে যাওয়ার কথা বলেছিলাম, কিন্তু উর্মি রাজি হয়নি। ও এখন বেশি লোকজনের মধ্যে যেতে চায় না। অন্য লোকদের সঙ্গে কথা বলতেও ওর ইচ্ছে করে না। শুধু আমার সঙ্গে নির্জন কোথাও থাকতে চায়।

সেদিক থেকে মধুপুরের বাড়িটা চমৎকার। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে দোতলা ছিমছাম বাড়ি, সামনে বিরাট বাগান। বাগানের গেটের সামনে দিয়েই একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে জসিডির দিকে। আশেপাশে আরও তিন-চার খানা বড়-বড় বাড়ি থাকলে অধিকাংশই ফাঁকা। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছনটাতেই প্রকাণ্ড মাঠ, তারপর পাহাড়। জানলা দিয়ে তাকালেই দিগন্তের পাহাড় চোখে পড়ে।

বাড়ির মালি এবং তার বউ ছেলে মেয়ে থাকে বাগানের একপাশের ঘরে। ওরাই আমাদের রান্না-বান্না করে দেবে। মামা বলে দিয়েছেন মালির বউ নাকি দারুণ রান্না করে।

আমরা এসে পৌঁছলাম সন্ধের দিকে। বাগানের গেটে কাছে টাঙ্গা থেকে নামার পর অনেকদিন পরে উর্মির মুখে একটু হাসি ফুটল। ও বরাবরই বেড়াতে ভালোবাসে! শহর ছাড়িয়ে অন্য কোথাও গেলেই খুশি হয়।

বাড়িটা দেখে উর্মি বলল, বাঃ, কি সুন্দর! বাড়িটা ঠিক ছবির মতন।

—তোমার পছন্দ হয়েছে তা হলে?

—এখানে যতদিন খুশি থাকব। অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। এইখানে আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে।

যেন সত্যিই নতুন জীবনে প্রবেশ করছি এইভাবে আমরা দুজনে একসঙ্গে পা ফেলে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে।

আমি আগে দু-তিনবার এসেছি এ-বাড়িতে, সুতরাং আমার সবই চেনা। উর্মি প্রথমে ঘুরে

ঘুরে দেখল সারা বাড়িটা। তারপর মালিকে বাজার করতে পাঠিয়ে আমরা বেড়াতে গেলাম বাগানে।

বাগানের মাঝখানে এক সময় কেয়ারি করা গোলাপের খেত ছিল, আমি ছেলেবেলায় এসে দেখেছি, এখন আর সেসব নেই। সারা বছর কেউ থাকে না বলেই এখন সেখানে আলু আর টমাটোর চাষ হয়। মালিই সেগুলো বিক্রি করে খায়। তবে, দেওয়ালের পাশে-পাশে অনেকগুলো বড়-বড় উইক্যালিপট্যাস গাছ আছে। এক কোণে একটা পেয়ারা বাগানও এখনও রয়ে গেছে—ছেলেবেলায় আমরা ভাইবোনরা এসে এখানে খুব হুটোপুটি করতাম।

উর্মিকে সেই সব গল্প শোনাই, ও বেশ আগ্রহ বোধ করে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে অনেক কথা। উর্মিকে এখন অনেক স্বাভাবিক দেখায়।

এই আড়াই মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে উর্মি। চোখ-মুখের দুর্বল ভাবটা এখনও কাটেনি। তবু এই পড়ন্ত বিকেলে তাকে খুবই সুন্দর দেখায়। উর্মির দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময় জাগে। কতদিন ধরে চিনি ওকে। কতবার এইরকম বিকেলবেলা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব কিছুই আলাদা। উর্মি আমার স্ত্রী, এতেই অনেক কিছু তফাত হয়ে যায়।

আমি আলতো ভাবে উর্মির হাতটা ধরলাম। বাগানটা সম্পূর্ণ নির্জন, আমাদের কেউ দেখছে না, এখন অনায়াসেই উর্মিকে আরও ঘনিষ্টভাবে আদর করতে পারি, দু-এক বছর আগেও এরকম করেছি, কিন্তু এখন সে কথা মনে এল না।

উর্মি দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা ওই পাহাড়গুলো কত দূরে?

আমি বললাম, ঠিক জানি না, বোধহয়—

—নিশ্চয় কুড়ি-পঁচিশ মাইল হবে।

—না, না, অত দূরে নয়। বড়জোর সাত-আট মাইল।

—তবে যে, শুনেছিলাম, যে পাহাড়কে দেখে খুব কাছে মনে হয়, আসলে সেগুলো অনেক দূরে?

—তা বলে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরের জিনিস কি আর খালি চোখে দেখা যায়?

—বিভাসদা, আমরা একদিন ওই পাহাড়ে বেড়াতে যাব।

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। উর্মি অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে। আমার হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না। একটু যেন আহত ভাবে বলল, হাসলে কেন? আমরা যাব না ওই পাহাড়ে?

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু স্বামীকে কি কেউ কখনও দাদা বলে ডাকে?

উর্মি লজ্জা পেয়ে গেল! এখনও ওর পুরোনো অভ্যেসটা যায়নি। মাঝে-মাঝেই বিভাসদা বলে ফেলে আমাকে। এটা এমন কিছুই না। আমি উর্মিকে লজ্জা দেবার জন্যই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর বাগানে থাকার মধ্যে কোনও মানে হয় না। আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম! ট্রেন-জার্নির পর উর্মি নিশ্চয়ই এখন ক্লান্ত, তার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আমি একরকম জোর করেই উর্মিকে বিশ্রাম নিতে পাঠালাম।

তারপর একটা বই খুলে বসলাম। আমার মামারা অনেক খরচ করে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক এনেছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধেবেলা কম ভোল্টেজ ছাড়াও লোডশেডিং হয় রাত্তিরের দিকে।

আমি অবশ্য বই খুলেও সেই দিকে মন বসাতে পারছিলাম না। মন চলে যাচ্ছে অন্য দিকে। আমার মনে এখন শুধু একটাই চিন্তা। উর্মিকে সুখী করতে হবে। উর্মির জীবনটা আবার সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। আমি কি তা পারব না?

খানিকটা বাদে মালি এসে জানাল রান্না তৈরি হয়ে গেছে। খাওয়ার ঠান্ডা করে লাভ নেই। উর্মি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তাকে ডেকে নিয়ে এলাম ডাইনিং রুমে।

মালিটি সত্যিই খুব কুশলী। ডাইনিং টেবিলে পরিষ্কার চাদর পেতে প্লেট ও কাঁটা-চামচ সাজিয়ে রেখেছে। এই অল্প সময়ে রান্নাও করেছে অপূর্ব। গরম-গরম ভাত, মুগের ডাল, বেগুন পোড়া, ও পেঁয়াজ মাখা, ফুলকপির তরকারি ও মুরগির ঝোল।

আমি বেশ তরিবত করে খাচ্ছিলাম। একসময় উর্মিকে জিগ্যেস করলাম, রান্না কেমন হয়েছে, তোমার ভালো লাগছে?

উর্মি মুরগির ঝোলের স্বাদ নিয়ে বলল, হ্যাঁ বেশ ভালোই।

তারপর মালির দিকে তাকিয়ে বলল, ঝাল এত কম দিয়েছ কেন? দাদাবাবু ঝাল খান। কাল থেকে একটু বেশি ঝাল দেবে।

আমি খাওয়া থামিয়ে উর্মির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সাতপুরুষে কেউ ঝাল খায় না। বাড়িতে লঙ্কা সম্পর্কে একটা আতঙ্ক আছে। আমি ঝাল জিনি জিভে ছোঁয়াতে পারি না। একবার দক্ষিণ ভারতে অফিসের কাজে গিয়ে আমি ঝাল রান্নার জ্বালায় এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, কয়েকদিন শুধু ফল আর দই খেয়ে কাটিয়েছি।

আমার খাদ্য-অভ্যেস যে উর্মি একেবারেই জানে না তা নয়। ওদের বাড়ি অনেকবার নেমন্তন্ন খেয়েছি। তা ছাড়া দিল্লিতে উর্মির দাদার বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। তখন আমার জন্য বিশেষ করে ঝাল ছাড়া রান্না হত।

উর্মি নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে গেছে। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল ওর জীবনের ওপর দিয়ে। এসব খুঁটিনাটি কী করে মনে থাকবে। এমন হতে পারে, উর্মি নিজেই ঝাল খেতে ভালোবাসে, তাই ধরেই নিয়েছে যে আমিও। ঠিক আছে, এখন থেকে আমিও ঝাল খাওয়া অভ্যেস করব।

মালিকে বললাম, হ্যাঁ কাল থেকে রান্নায় একটু ঝাল দিও। ঝাল ছাড়া খাওয়া যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা একটুক্ষণ বসলাম দোতলার বারান্দায়। বাগানের সামনে দিয়ে রাস্তাটা বহুদূর চলে গেছে, ফিকে জ্যোৎস্নায় সেটাকে অন্তহীন পথ মনে হয়। হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের পাতার ঝিরঝিরে শব্দ, একটা টাটকা সুগন্ধও পাওয়া যায়। আমরা কথা না বলে চুপ করে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

রাত মাত্র ন'টা। চতুর্দিক নির্জন বলে এরই মধ্যে গভীর রাত মনে হয়। আমার দেরি করে ঘুমোনো অভ্যেস। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করতে হবে।

আমার মনে হল, উর্মি আজ ক্লান্ত, ওকে আর বেশিক্ষণ জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়। হাওয়ায় একটা ঠান্ডা-ঠান্ডা ভাব আছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, উর্মি তোমার শীত করছে?

—একটু।

চলো উঠে পড়ি। শুয়ে পড়া যাক।

—তুমি এক্ষুনি শোবে?

—হ্যাঁ, আমার একটু ঘুম পাচ্ছে।

উর্মি আর আপত্তি করল না। আমরা বারান্দা ছেড়ে ঘরে চলে এলাম। উর্মি চুল বেঁধে, মুখে ক্রিম মেখে শুয়ে পড়ল, আমিও জামাকাপড় বদলে বিছানায় চলে এলাম।

জানলা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পরেছে ঘরে। অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। কোথা থেকে যেন একটা ফুলের হাল্কা গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়।

বিয়ের পর অন্যদের যেমন ফুলশয্যা হয়, আমাদের সেরকম কিছু হয়নি। রেজিস্ট্রি বিয়ের পর আমরা আলাদা ভাবে দুজনে দুজনের বাড়িতেই থেকেছি। প্রকৃতপক্ষে আজই প্রথম সেই ফুলশয্যার রাত।

আমার কি উচিত ছিল কিছু ফুল কিনে এনে বিছানায় ছড়িয়ে দেওয়া? একবার কথাটা মনে

এসেছিল অবশ্য। তারপর লজ্জা পেয়েছিলাম। নিজে নিজে এসব করা যায় না।

আজই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের দিন। উর্মির শরীরের মাদকতার জন্য আমার মধ্যে একটা তীব্র ব্যাকুলতা থাকলেও আমি মনে-মনে ঠিকই করে রেখেছিলাম যে এ ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়ো করব না। উর্মির মন এখনও দুর্বল, হঠাৎ কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। বরং আরও কিছুদিন সময় কাটুক। উর্মি যখন নিজে থেকেই চাইবে—

আমি উর্মির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। উর্মি নিঃশব্দে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর এক সময় মনে হল, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কাঠ হয়ে জেগে রইলাম। শরীরের মধ্যে একটা ছটফটানি, আমাকে দমন করতেই হবে, কিন্তু বোধহয় সারারাত ঘুম আসবে না।

এক সময় উর্মি পাশ ফিরে আমার কাছাকাছি চলে এসে মৃদু গলায় বলল, তোমার বুকে আমি একটু মাথা রাখব?

আমি বললাম, হ্যাঁ, রাখো না! তুমি ঘুমোওনি?

—ঘুম আসছেনা।

—আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

—তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না তো?

—ছিঃ এ কি কথা বলছ?

আমি আলতো ভাবে উর্মির মুখটা তুলে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। আর বেশি কিছু এখন না।

উর্মি আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজল। আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, তুমি জানো না?

—জানি, তুমি আমাকে আর দূরে চলে যেতে দিও না।

—ঘুমোও, এবার ঘুমোও।

—তুমি ঘুমোও। ঘুমের মধ্যে কিন্তু আমাকে ছেড়ো না।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ উর্মি ধড়ফড় করে উঠে বসে বলল, ওকি? ওকি?

আমি চমকে উঠেছিলাম, উঠে বসে উর্মিকে ধরে বললাম, কী, কী, হয়েছে?

উর্মি বিহ্বলভাবে বলল, কিসের শব্দ? কে আসছে?

—কোথায় শব্দ? কোনও শব্দ নেই।

—শুনতে পাচ্ছ না? ভালো করে শোনো।

—আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বহুদূরে একটা ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই। রাস্তার কোনও গাড়ির আওয়াজ।

আমি বললাম, রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাতে কি হয়েছে?

—না, তুমি ভালো করে শোনো।

এবার বোঝা যায় আওয়াজটা একটা মোটর সাইকেলের। ক্রমেই আওয়াজটা বাড়ছে, অর্থাৎ এদিকেই আসছে।

উর্মি চেঁচিয়ে উঠল, ও আসছে। ও আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

আমি উর্মিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, উর্মি, কি ছেলেমানুষী করছ। রাস্তা দিয়ে একটা মোটর সাইকেল যাচ্ছে, তাতে তোমার ভয় পাবার কি আছে?

—না, না, না, তুমি জানো না, ও আসছে। ও আমাকে ছাড়বে না।

মোটর সাইকেলের আওয়াজটা খুবই কাছে এসে পড়েছে। আমি উর্মিকে চেপে ধরে রইলাম। উর্মির দুর্বল মনে নানারকম ভয়ের চিন্তা। মোটরসাইকেলটা আমাদের বাড়ির সামনে পেরিয়ে চলে

যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

কিন্তু শব্দটা আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঊর্মি তীব্র কান্নার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ও এসে পড়েছে। ও ঠিক এসে পড়েছে। আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

আমি ঊর্মিকে ছেড়ে চলে এলাম জানলার কাছে। রাস্তায় কেউ নেই। মোটর সাইকেলটা দেখা যাচ্ছে না। পাতলা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। নিশ্চয়ই মোটর সাইকেলটা ঢুকে গেছে কাছাকাছি কোনও বাড়িতে। আমাদের আশপাশে তিনখানা বাড়ি আছে। 'সেন-লজ'-এ মানুষজন আছে দেখেছিলাম। সে বাড়ির কারুর মোটরসাইকেল থাকা খুবই সম্ভব।

জানলা থেকে আবার ঊর্মির কাছে ফিরে আসতেই ঊর্মি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগল, ও আমাকে কেড়ে নিতে এসেছে। তুমি ছেড়ে দিও না, ছেড়ে দিও না বিভাসদা, তুমি আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিও না—।

বোম্বাইতে যে ঘুমের ওষুধগুলো কিনেছিলাম, তার কিছু অবশিষ্ট ছিল। ভেবেছিলাম ওগুলো আর কখনও কাজে লাগবে না। কিন্তু আবার কাজে লাগল। ঊর্মিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েই ঘুম পাড়াতে হল। আমি প্রায় সারারাতই জেগে রইলাম। সে রাত আর কিছু হল না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঊর্মি কিন্তু রাত্তিরের কথা কিছুই উল্লেখ করল না। মুখখানা একটু গম্ভীর ও ম্লান।

আমি বললাম, ঊর্মি চট করে তৈরি হয়ে নাও। আমরা একটু বেরুব। সকালবেলা এখানে বেড়াতে খুব ফাইন লাগে।

কোনওরকম ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ না দিয়েই আমি ঊর্মিকে হাত ধরে তুললাম বিছানা থেকে। ঊর্মি অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে নিল। আবার বেরিয়ে পড়লাম!

সকালবেলা বেড়াতে সত্যিই ভালো লাগে। বাতাসে একটা শিরশিরে ভাব। ঘাসগুলো ভিজে আছে শিশিরে।

আমরা বাগান ছেড়ে চলে এলাম বাইরে রাস্তায়। বেশ খানিকটা দূর চলে গেলাম হাঁটতে-হাঁটতে।

আমি গোপনে লক্ষ করছিলাম। রাস্তায় মোটর সাইকেলের টায়ারের দাগ দেখা যায় কিনা। ঠিক বোঝা গেল না। গোরুর গাড়ির চাকার দাগই প্রকট। 'সেন লজ'-এর কম্পাউন্ডটা বিরাট। ওর ভেতরে কোনও মোটর সাইকেল রাখা থাকলেও বাইরে থেকে দেখা যায় না। ও বাড়িতে অনেক লোক এসেছে। বারান্দায় বসে চা-খাচ্ছে পাঁচ-সাতটি যুবক-যুবতী। একটা রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজাচ্ছে।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, শিগগিরই একদিন ও বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। মানুষ নির্জনতা খুঁজতে আসে ঠিকই। কিন্তু আবার মানুষের সঙ্গ ছাড়া ভালোও লাগে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি বলে আবার একটা দিবা-নিদ্রা দেওয়ার সাধ ছিল।

কিন্তু ঊর্মি হঠাৎ বললে, কাল রাত্তিরে আমি তোমাকে খুব জ্বালাতন করেছি তাই না?

আমি অবাক হওয়ার ভাব করে বললাম, জ্বালাতন? আমাকে আবার তুমি কখন জ্বালাতন করলে? একটু জ্বালাতন করলে তো আমিই খুশিই হতাম।

—কাল আমি মিছামিছি ভয় পেয়েছিলাম। মন দুর্বল থাকলে ওরকম হয়।

—মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করো।

ঊর্মি নিজেই এসে আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার গালে-গালে ঠেকিয়ে বলল, তুমি এত ভালো! তবু আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কী করে?

আমি অনুভব করলাম, ঊর্মির গাল রীতিমতো উত্তপ্ত। কামনাবাসনা যে উত্তাপ আনে। ঠিক আগেকার ঊর্মির মতন।

গভীর আবেগে আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। ঊর্মি ওর জিভ দিয়ে সাড়া দিল। এবার সব বাঁধ ভেঙে গেল। আমি চুম্বনে-চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম ঊর্মিকে। ওর কানের পাশে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে আঁকা হল অজস্র চুম্বন। এক সময় আমরা বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমরা বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা মুক্তি পেল। প্রায় এক ঘণ্টা উন্মত্ততার পর আমরা দুজনে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হলাম।

বিকেলবেলা সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। শারীরিকভাবে কাছাকাছি না এলে নারী-পুরুষ কখনও সত্যিকারের কাছাকাছি আসতে পারে না। ঊর্মির মধ্যে যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এখন সে বারবার আমার দিকে লাজুক-লাজুক ভাবে তাকাচ্ছে। ঠিক নববধূর মতনই লজ্জারুণ তার মুখ।

সন্ধেবেলা চা খেতে-খেতে আমরা পরিকল্পনা করতে লাগলাম, কোথায় কবে বেড়াতে যাওয়া হবে। এখান থেকে গিরিডি, শিমূলতলা, দেওঘর প্রভৃতি অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায়। একটা গাড়ি সঙ্গে থাকলে ভালো হত। যাক, তাতে কোনও অসুবিধে হবে না। জসিডিতে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে, আমি জানি।

একটুবাদে ঊর্মি বলল, তুমি একটা গান শোনাও না। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

আমি বললাম, আমি আর কি গান শোনাব। ইস, তোমার সেতারটা আনলে পারতে! মাঝে মাঝে সেতার বাজালে তোমার মন ভালো থাকত।

—আমার মন এখন বেশ আছে। তুমি একটা গান গাও।

আমি মাথা নিচু করে গান ভাবতে লাগলাম। এক সময় গানের চর্চা করতাম ঠিকই। দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসংগীতের কোর্সও শেষ করেছিলাম। চাকরিতে ঢোকার পর আর সময় পাই না বিশেষ।

খানিকক্ষণ গুন-গুন করে একটা গান ধরলাম ঃ

দেখা না দেখায় মেশা হে

হে বিদ্যুৎলতা....

সবে মাত্র দু-লাইন গেয়েছি, ঊর্মি বাধা দিয়ে বলে উঠল, না, না, এ গান নয়! এ গান নয়!

আমি চমকে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঊর্মির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে আবার।

—কী হয়েছে ঊর্মি?

—তুমি এই গানটা গাইলে কেন?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল। রজতের সঙ্গে যেদিন প্রথম ঊর্মির আলাপ হয়েছিল, সেদিন নৌকোর ওপর রজত এই গানটা গেয়েছিল। ও খুব মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান করত। এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি। রজতের সেই গান শুনে ঊর্মি বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি কিন্তু কোনওরকম চিন্তা করে এ গানটা গাইনি। আপনিই গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আগে মনে পড়লে নিশ্চয়ই এটা গাইতাম না। আমি সঙ্গে-সঙ্গে অন্য একটা গান ধরার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আর যেন জমল না। ঊর্মি মাথা নিচু করে বসে আছে।

মালি এসে বলল, নিচে কে একজন আমাকে ডাকছে।

ঊর্মিকে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, তাই ওকে বললাম, চলো, তুমিও নিচে চলো।

—অচেনা লোকের কাছে গিয়ে আমি কী করব?

—একটা কথা বললেই অচেনা লোক চেনা হয়ে যাবে।

—না, ইচ্ছে করছে না। আমি এখানেই বসছি, তুমি ঘুরে এসো।

—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।

নিচে এসে দেখলাম একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ বসে আছেন। আলাপ-পরিচয়ের পর শুনলাম ইনি আমার বড়মামার বন্ধু। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর মধুপুরেই পোলট্রির ব্যাবসা করেছেন। এ বাড়িতে লোক এসেছে শুনে খবর নিতে এসেছেন বড়মামার।

ভদ্রলোক স্থানীয় সমস্যা, রাজনীতি, মুরগির ব্যবসায়ের সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তুললেন। বোধহয় কথা বলার লোক পান না। এ সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগছিল না। তবু ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য হুঁ হাঁ করে যেতেই হয়।

একটু বাদে প্রায় একরকম জোর করেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরে চলে এলাম। বারান্দায় যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম ঊর্মি নেই। ঘরের মধ্যে চলে গেছে নিশ্চয়ই।

ঘরের মধ্যে এসেও ঊর্মিকে দেখতে পেলাম না। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঊর্মি কোথায় গেল? দোতলার অন্য ঘরগুলো তালাবন্ধ। আমাদের দরকারে লাগবে না বলে খোলা হয়নি। বাথরুমের দরজাটাও খোলা, তবু ভেতরটা দেখে এলাম।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, ঊর্মি, ঊর্মি।

কোনও সাড়া নেই।

ঊর্মি কোথায় যেতে পারে? নিচে নেমে গেলে বসবার ঘর দিয়েই একমাত্র যাওয়া যায়। তা হলে আমি দেখতে পেতাম ঠিকই।

তবু আমি দৌড়ে এলাম নিচে। সম্ভাব্য জায়গাগুলো দ্রুত দেখে নিলাম। ঊর্মি কোথাও নেই।

রান্নাঘরে যায়নি তো? সেখানে যাওয়ার কথা নয়, তবু দেখে এলাম একবার। মালিকে কিন্তু বললাম না, সে বেচারা অকারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

বাগানটাও একবার ঘুরে দেখব সবটা ভাবলাম। তারপরই মনে হল, ঊর্মি নিচে নেমে আসতে পারেই না। আমি বসবার ঘরে এতক্ষণ ছিলাম, ও কী করে সেখান দিয়ে বাইরে যাবে? তা ছাড়া আমাকে না বলে যাবেই বা কেন?

আবার ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম দোতলায়। বারান্দা, ঘর, বাথরুম তন্নতন্ন করে দেখলাম। ঊর্মি নেই।

ঊর্মি নেই? এ কি করে সম্ভব হতে পারে?

আমি গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, ঊর্মি! ঊর্মি!

মনে হল আমার চিৎকার ফাঁকা বাড়িতে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। আরও দু-তিনবার ডাকার পর এটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। কোথা থেকে শব্দটা আসছে? হ্যাঁ, ঊর্মির গলা, কিন্তু সে কোথায়?

আওয়াজটা দূর থেকে আসছিল, একটু কান পাততেই বুঝতে পারলাম, সেটা আসছে ছাদ থেকে। উঃ, কি বোকা আমি! ছাদের কথাটা আমার মনে পড়েনি!

ছাদের সিঁড়ির দিকে দৌড়োতেই শুনতে পেলাম ঊর্মি কাঁদতে-কাঁদতে বলছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে বললাম, ঊর্মি, আমি আসছি তোমার কোনও ভয় নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শুনতে পেলাম, অনেক দূরে সম্ভবত ছাদের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঊর্মি বলছে না, না, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও—

ছাদের দরজাটা চেপে বন্ধ করা ছিল। লাথি মেরে সেটাকে খুলে আমি দৌড়ে গেলাম। ছাদের এক কোণে কার্নিসের ওপর মাথা দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে ঊর্মি দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি ওকে স্পর্শ করতেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে অসম্ভব জোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা

গলায় বলল, ও আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। ও আমাকে নিতে এসেছে। ও আমাকে ছাড়বে না। আমি যাব না। আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, আর কিছুতেই যাব না।

আমার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। ঝিমঝিম করতে লাগল মাথাটা। উর্মি কি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছে! এ তা পাগলামিরই লক্ষণ। উর্মি সাহসী মেয়ে, সে কোনও দিন ভুত টুত বিশ্বাস করে না—তা হলে এ রকম ব্যবহারের মানে কী?

ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললাম, উর্মি, শান্ত হও। শান্ত হও। এ কি করছ?

ফোঁপানিতে উর্মির শরীরটা কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই বলল, ও এসেছিল। ও আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল।

—কে এসেছিল?

—রজত! আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি।

—কী যা-তা কথা বলছ! চেয়ে দ্যাখো, এখানে কেউ নেই। তা ছাড়া সে এখানে কী করে আসবে?

—তুমি বিশ্বাস করছ না? সে আমাকে জোর করে টানতে-টানতে এখানে নিয়ে এসেছিল।

—উর্মি, নিচে চলো।

—ও আমাকে জোর করে চেপে ধরে আমার ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরেছিল। যে-রকম ওর স্বভাব। এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়ে গেছে। দ্যাখো, তুমি দ্যাখো—

আজ জ্যোৎস্না অনেক উজ্জ্বল। অনেক কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। তবে, উর্মির ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়েছে কিনা সেটা তো ওর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। আমি দেখতে পারি। লালচে দাগ একটা আছে, ঠিকই। কিন্তু সেটা দুপুরবেলা আমিই করে দিয়েছিলাম। তখনই লক্ষ্য করেছি।

আমি বললাম, দাগ-টাগ কিছু নেই। এরকম ভাবে আর রাত্তিরে একা-একা ওপরে এসো না।

—আমি নিজে ইচ্ছে করে আসিনি। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারো?

—হ্যাঁ পারব। চলো, নিচে চলো লক্ষ্মীটি।

উর্মি যেন একটা যন্ত্র-মানুষ, এই ভাবে আমি ওর কোমর ধরে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে খিল তুলে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা মাত্র নেমেছি, এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল। এরকম ঘটনাকে কাকতালীয় বলা যায়। মানুষের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেই। ঠান্ডা মাথায় বিচার করলে এর একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আর ব্যাখ্যা খোঁজার দিকে মন থাকে না।

হঠাৎ একটা গান ভেসে উঠল, সেই গান, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা—গানটা যেন ছাদ থেকে বাজছে।

উর্মির দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল আমার বুকে, গানটা শুনেই যে স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে গেল। অদ্ভুত পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে, ওই যে শুনতে পাচ্ছ না? ও এখনও আছে? গান গাইছে!

মনঃস্থির করতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপর ঝট করে আবার দরজাটা হাট করে খুলে দিলাম। মনে হল যেন, গানটা ভাসতে-ভাসতে দূরে চলে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে গান। চট করে আবার থেমে গেল।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময় ছাদে পা দিতে আমার ভয় করছিল। ভীষণ দুর্বল লাগছিল মাথাটা। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর আমি ভাবলাম, আমিও কি উর্মির মতন পাগলা হয়ে যাচ্ছি নাকি? একি ছেলেমানুষী। উর্মি আমার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টানার চেষ্টা করে ফিসফিস করে বলল, যেও না,

তুমি যেও না। নিজের কানে এবার শুনলে তো।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, ধ্যাৎ! এটা তো রেকর্ড। পঙ্কজ মল্লিকের রেকর্ড আছে। সেন লজ-এ রেকর্ড প্লেয়ার আছে সকালে দেখেছি, বিকালেও গান শুনতে পেয়েছি।

—না, না, ও আমাদের ছাদের ওপরে—

—রাত্তিরবেলা দূরের আওয়াজকেও কাছের মনে হয়।

আমার ইচ্ছে হল তখুনি সেন লজ-এ ছুটে গিয়ে প্রমাণ নিয়ে আসি, ওরা পঙ্কজ মল্লিকের এ রেকর্ডটা বাজাচ্ছিল কিনা। কিন্তু তা হলে ঊর্মিকে একা রেখে যেতে হয়। ওকে এই অবস্থায় নিয়েও যাওয়া যায় না। তাই বিরত হলাম।

ঊর্মি সেই রাত্রে কিছুই খেলো না। অনেক জোর করলাম। কিন্তু ওর একটুও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। সব খাওয়ার থালায় ফেলে রাখল। আমরা তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম।

স্পষ্ট বুঝলাম, আজও সারা রাত ঊর্মিকে পাহারা দিতে হবে। ওর পাগলামির ভাবটা ক্রমশ বাড়ছে। কোথাও একটু খুটখাট শব্দ কিংবা পাখির ডাকেই ও চমকে উঠছে। মাঝে-মাঝেই বলছে, ও আসবে, ও ছাড়বে না।

ঊর্মি আমার হাতটা সর্বক্ষণ শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আমি ওকে অনবরত বোঝাচ্ছি, কেউ আসবে না। কেউ আসতে পারে না। তুমি যার কথা বলছ, তার পক্ষে আসা তো অসম্ভব।

ঊর্মি তবু বলল, তুমি জানো ও কীরকম জেদি। ও দারুণ অতৃপ্তি নিয়ে গেছে। ও ফিরে আসতে চাইবেই। ও আবার আমাকে কেড়ে নেবে।

ঊর্মিকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে একসময় আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমার মাথাটা অবশ লাগছে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তো চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

আজও একসময় মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল। সেই সময় ঊর্মিকে সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। আমি ওকে সবলে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম।

ঊর্মির ঘুম আসারও লক্ষণ নেই। কিন্তু আজ আর আমি ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে সাহস করলাম না। যতদূর শুনেছি, এরকম দুর্বল মানসিক অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাওয়া আরও বেশি ক্ষতিকর।

কাল এ সম্পর্কে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কিংবা বোধহয় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে আলোচনা করাই বেশি দরকার। কিন্তু সেরকম কাউকে কি এখানে পাওয়া যাবে। না হলে ফিরেই যেতে হবে কলকাতায়।

ঊর্মি নিজেই আমার কাছে কয়েকবার ঘুমের ওষুধ চাইল। আমি ওকে বললাম, ফুরিয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঘুমপাড়াবার মতন কর ওর মাথা চাপড়ে দিতে লাগলাম।

তখন কত রাত জানি না। সমস্ত পৃথিবী নিঝুম। ঊর্মিও কিছুক্ষণ চুপ করে আছে। আমার একবার বাথরুম যাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ ধরে চেপে বসে আছি। ঊর্মিকে একা ফেলে যেতে হবে বলে যেতে পারছি না। এবার ঊর্মি ঘুমিয়েছে, এখন যাওয়া যায়।

ওর হাত ছাড়িয়ে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কোনওরকম শব্দ যাতে না হয় তাই পা টিপে-টিপে চলে এলাম দরজার কাছে। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল, বাইরে গিয়েই ধরাবো।

দরজাটা খুলতেই দেখলাম বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রজত। পরিষ্কার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেখানে। রজতের লম্বা শরীরটা হেলান দিয়ে দাঁড়াবার জন্য এখন বেঁকে আছে, মাথায় বড়-বড় চুল, শার্টের বোতাম খোলা।

আমাকে দেখে হাসিমুখে বলল, কী বিভাস—

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, রজত।

রজত আবার কী যেন বলতে গেল। আমিও প্রাণপণে চিৎকার করলাম—

আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, পা থরথর করে কাঁপছে, মাথার মধ্যেটা একেবারে ফাঁকা। আমি কিছুতেই সামলাতে পারছি না।

আমি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

এর পরের দুটো দিনের ঘটনার সঙ্গে আমার জীবনের আর কিছুই মেলে না। সেই অদ্ভুত ব্যাপারটার কোনও ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না। অবশ্য ডাক্তাররা অনেকরকম কথাই বলেছেন। তার মধ্যে কোনওটা সত্যি হবে নিশ্চিত।

আমার ধারণা আমি মধ্য-রাত্রে দরজা খুলে রজতকে দেখেছিলাম। কিংবা হয়তো দেখিনি। চোখের ভুল। হ্যালুসিনেশান। সে যাই হোক, সেই মুহূর্তে যে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে দারুণ সত্যি মনে হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

আমি ঠিক অজ্ঞান হয় যাইনি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমার ধারণা আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, আসলে তা নয়, আমি দেওয়ালে ধরে পতনের হাত থেকে রক্ষা করছিলাম নিজেকে। আমার ব্যবহারটা তখন অন্ধের মতন, সত্যিই যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আমার চিৎকার শুনে ঊর্মি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছিল। সে আমাকে ওই অবস্থায় দেখে জিগ্যেস করেছিল, কী হয়েছে তোমার?

আমি ফিস ফিস করে বলেছিলাম, রজত...রজত সত্যিই এসেছে।

কোথায়, কোথায়, বলে ঊর্মি ছুটে গেল বাইরে। ওকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নেই।

একটু বাদেই ঊর্মি ফিরে এসে আমাকে ধরল। খুব শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বলল, না, কেউ নেই। চলো, ভেতরে চলো।

এরপর সব ব্যাপারটাই উলটে গেল। এতক্ষণ ঊর্মিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম আমি, এখন সে-ই আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

ঊর্মি আকস্মিকভাবে দারুণ শান্ত হয়ে গেছে। যেন ফিরে এসেছে মনের জোর। আমাকে দুর্বল হতে দেখেই ও নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে।

আমাকে রীতিমতন এক ধমক দিয়ে ঊর্মি বলল, তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তুমি কখনও রজতের নাম উচ্চারণ করবে না!

—কিন্তু আমি যে রজতকে দেখলাম!

—মোটেই কিছু দেখোনি তুমি। মৃতরা কখনও ফিরে আসে না। এতক্ষণ আমি পাগলামি করছিলাম। সবই আমার ভুল!

আমার ভীষণ ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। কথা বলারও জোর পাচ্ছিলাম না। এবং আশ্চর্যের বিষয়, একটু বাদেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখলাম, ঊর্মি তার আগেই জেগে গেছে। বিছানায় নেই। একটু বাদেই ও দু-কাপ চা নিয়ে ঘরে এল। আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কি শুয়ে-শুয়ে চা খাবে?

চায়ের কাপ নিয়ে ঊর্মি বিছানায় বসল আমার পাশে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, কাল রাত্তিরে আমি চোখে ভুল দেখেছিলাম তাই না?

—হ্যাঁ, তুমি কীরকম অদ্ভুত করছিলে। তোমার এরকম হল কেন? তুমি তো কখনও আজেবাজে ব্যাপারে বিশ্বাস করতে না।

—কীরকম যেন হয়ে গেল।

—আর ওরকম ভাবে আমাকে ভয় দেখিও না!

তুমি আর ভয় পাবে না তো!

—না। আমার ওসব কেটে গেছে। কি বোকার মতনই যে ব্যবহার করছিলাম। মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? ওঠো, মুখ ধুয়ে নাও।

উর্মি সুস্থ হয়ে উঠেছে, সব ব্যাপারটাই এখন শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। এবার সত্যিই আমাদের নতুন জীবন শুরু হওয়ার কথা।

তবু আমি সারা শরীরে কীরকম যেন ছটফটানি বোধ করছি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। এটা কাটানো দরকার।

আমি বললাম, একটু পরে উঠব। আমার সিগারেট দেশলাইটা এনে দাও তো একটু।

সেগুলে এনে দিয়ে উর্মি আবার আমার পাশে বসল। আমি একটা সিগারেট বার করে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম উর্মি আমার আঙুলের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

আমি জিগ্যেস করলাম, কী দেখছ উর্মি?

—কিছু না।

আমি আমার দু-হাতের দিকে তাকালাম। অস্বাভাবিক তো কিছু নেই।

উর্মি বলল, এবারে ওঠো। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না?

—বড্ড রোদ উঠে গেছে।

—গিরিডি এবং দেওঘর কবে বেড়াতে যাব আমরা?

—গেলেই হবে। ব্যস্ততার তো কিছু নেই। তুমি তো এখানে অনেক দিন থাকবে বলছ।

—যতদিন তোমার ছুটি না ফুরোয়।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়েছিল, জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম টুকরোটা। উর্মি আবার সেইরকম ভাবে তাকাল।

আগে আমি কিছু বুঝিনি। সেদিন তিন-চারবার সিগারেট ধরাবার পর এক সময় আমার খেয়াল হল, প্রত্যেকবার আমি সিগারেট প্যাকেট থেকে বার করে আগে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ঠুকে নিচ্ছি। এবং সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এলে, কাছাকাছি অ্যাসট্রে থাকলেও আমি টুকরোটা সেখানে না নিভিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি জানলা দিয়ে।

এরকম স্বভাব আমার কখনও ছিল না। রজত এরকম করত। কখন যেন অবচেতন ভাবে আমি রজতকে অনুকরণ করতে শুরু করেছি। এর কারণ কী?

যাই হোক, এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার কোনও কারণ নেই।

ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম।

আসলে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেলাম। এবং পরবর্তী সিগারেট ধরাবার সময় ঠিক সেই ভাবে আবার ঠুকতে লাগলাম বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলের নখে।

কাল রাত্রে উর্মির পাগলামির ভাব দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ডাক্তার ডাকতে হবে। কিংবা শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে হবে। কিন্তু আজ সকালে উর্মি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

সকালবেলাই স্নান করে নিয়েছে। স্নান করার পর ভিজে চুল সব মেয়ের মুখেই একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে ওঠে। উর্মির রূপ এই সময় আরও বেশি খোলে। উর্মির সেই উদাসীন-উদাসীন ভাবটা আর নেই। সে বরং ঘুরে-ঘুরে টুকিটাকি করছে এবং ঘরটাকে সাজাচ্ছে। আমরা এখানে বেশ কিছুদিন থাকব তো, সেই জন্য। এই দুদিন আমাদের জিনিসপত্তর যেমন ভাবে আনা হয়েছিল, প্রায় সেইরকম ভাবেই পড়েছিল।

এমনকি উর্মি ইচ্ছে প্রকাশ করল, সে দু-একটি আইটেম নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে আমাকে। প্রত্যেকদিন মালির রান্না খাওয়া যায় না। মালি যদিও বেশ ভালোই রাঁধে, তবে মাছটা একেবারে পারে না। প্রত্যেকদিন মাংস খাওয়া যায় না, বাঙালি জিভে মাছ না হলে খাওয়াটাই জমে

না ঠিক মতন।

উর্মি বলল, তুমি যাও না, বাজার থেকে ভালো দেখে মাছ নিয়ে এসো না।

আমি হাসলাম। আজ থেকে তাহলে আমাদের খাঁটি বিবাহিত জীবন শুরু হল। স্বামী বাজার করে আনবে। স্ত্রী থাকবে রান্নাঘরে। সারাদিন স্ত্রী ব্যস্ত থাকবে সংসারের কাজে, স্বামী বাইরে-বাইরে ঘুরবে।

আমি উর্মিকে বললাম, তুমিও চলো না। একসঙ্গে বাজার যাই।

উর্মি বলল, আমি আজ যেতে পারব না। আমার কত কাজ! পরদাগুলো লাগাতে হবে। আয়নাটা পরিষ্কার করতে হবে।

আমি কখনও বাজার করিনি। আমাদের নিজেদের বাড়িতে ও কাজটা চাকররাই সারে। তবু উর্মির অনুরোধে বেরিয়ে পড়লাম। উর্মি আরও কতকগুলো জিনিসের লিস্ট বানিয়ে দিল, যেমন সাবান, সুঁচ, সুতা, কনডেন্সড মিল্ক, পাঁপড় ইত্যাদি।

সেন লজ-এর সামনে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আজও ভেতরে রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছে।

আমার একবার ইচ্ছে হল জিগ্যেস করি, ওরা কাল রাত্তিরে পঙ্কজ মল্লিকের ' দেখা না দেখায় মেশা হে' গানটা বাজিয়েছিল কিনা। কিন্তু লজ্জা করল। হঠাৎ এরকম প্রশ্নে ওরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে।

নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করার মতন প্রতিভা আমার নেই। অচেনা লোকের কাছে আমি এখনও একটু লাজুক হয়ে পড়ি। তবু সেন লজ-এর সামনে দাঁড়ানো লোক দুটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনারা কবে এসেছেন?

ভদ্রলোক দু-জনও সঙ্গে-সঙ্গে নমস্কার করে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তারপর নাম জানাজানি এবং কলকাতার কোন পাড়ায় আমাদের বাড়ি এবং ওদের বাড়ি, এইসব কথাবার্তা হল। ওঁরা ওঁদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি পরে এক সময় যাব বলে ওদের নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের বাড়িতে আসার।

এই সময় রাস্তায় একটা খালি টাঙ্গা যাচ্ছিল বলে আমি সেটা ডেকে উঠে পড়ে রওনা দিলাম বাজারের দিকে।

বাজার থেকে একগাড়ি জিনিসপত্র কিনে ফেললাম উৎসাহের আতিশয্যে। উর্মির লিস্ট মিলিয়েও সব কিছু কিনতে ভুললাম না। আজ আমার প্রথম সংসার।

ফিরে এসে দেখলাম উর্মি তার শাড়িটা গাছকোমর বেঁধে রীতিমতন রান্নায় লেগে আছে। আমি মাছ-তরকারি মশলা ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে এলাম রান্নাঘরে এবং পাকা সংসারীর মতন উর্মিকে বারবার জিগ্যেস করতে লাগলাম, দ্যাখো তো মাছটা কীরকম এনেছি? বেগুনগুলো কীরকম টাটকা দেখেছ—কলকাতায় পাওয়া যায় না।

আমার নতুন ভূমিকায় আমি নিজেই মজা পাচ্ছিলাম।

উর্মি আমাকে তাড়া দিয়ে বলল, তুমি ভেতরে গিয়ে বসো তো। রান্নাঘরে কী করছ?

আমি উর্মিকে দরাজ গলায় হুকুম দিলাম, এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো।

উর্মি অবাক হয়ে বললে, তুমি এই সময় চা খাবে? সকালবেলা এক কাপের বেশি চা তো খাও না কখনও।

—আজ থেকে খাবো।

ভেতরে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাঁ-হাতের নখের ওপর সিগারেট ঠুকতে লাগলাম। ভেতরে-ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধ করছি। এখুনি যেন একটা কিছু করা দরকার। খানিকটা দৌড়োদৌড়ি লাফালাফি করলে বেশ হতো। অথচ এরকম ইচ্ছে আমার আগে কখনও হয়নি।

সেখান থেকে উঠে চলে এলাম দোতলায়। মিনিট দশেক শুয়ে রইলাম বিছানায়। তাও ভালো লাগছে না। আবার সেখান থেকে এলাম বারান্দায়। একটা বই খুলে বসলাম। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। আমার গায়েও রোদ লাগছে। লাগুক, তবু আমি এখানেই বসে থাকব।

বই খুললেও তাতে একটুও মন বসে না। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে। মাঝখানে দরজা খুলেই রজতকে দেখেছিলাম। সেটা আমার চোখের ভুল? নিশ্চয়ই। চোখের ভুল ছাড়া আর কী? ঊর্মিকে সামলাতে-সামলাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুর্বল মস্তিষ্কে মানুষ এরকম অনেক কিছু দেখে। রজত আমাকে দেখে হেসেছিল...ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলেছিল চুপ—রজত আমাকে কি আরও কিছু বলতে চাইছিল?

এক সময় ঊর্মি এসে জিগ্যেস করল, এই, তুমি রোদ্দুরের মধ্যে বসে আছ কেন?

আমি পেছন ফিরে ঊর্মির দিকে তাকালাম। এতক্ষণ আগুনের আঁচের কাছে ছিল বলে ঊর্মির মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে। কপালে আর গালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম।

—ঊর্মি, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

—সত্যি! আয়নায় মুখটা একবার দেখতে হল।

—থাক, আর মুখ দেখে দরকার নেই। জানো, আমার হঠাৎ খুব সর্দি হয়ে গেছে। তোমার রুমালটা দাও তো—

—কী করে সর্দি হল?

কী জানি! কাল রাত্তিরে ছাদে ঠান্ডায় দাঁড়িয়েছিলাম—সর্দি আমার একটুও ভালো লাগে না। কি ওষুধ খাওয়া যায় বলো তো?

—ওষুধ?

আমি সঙ্গে উঠে দরাজ গলায় হেসে উঠলাম। হাসতে-হাসতেই বললাম, সবচেয়ে ভালো ওষুধ আছে আমার কাছে? তারপর অবিকল ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে আমি প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে বার করলাম একটা ছোট ব্রান্ডির বোতল।

রীতিময় ভয় পেয়ে ঊর্মি তাকাল আমার দিকে। আমিও হকচকিয়ে গেলাম।

ব্রান্ডির বোতল আমার পকেটে এল কী করে? এ তো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সত্যিই ম্যাজিক নাকি?

আমার অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ল বাজার থেকে ফেরার সময় আমি একটা মদের দোকান দেখেছিলাম বটে। সে দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন? আমি মদ কিনব, দিনদুপুরে, এ কি কল্পনা করা যায়? কেউ কি আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে?

আমার বিস্ময় কয়েক মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। তারপরই যেন আমার মনে হল, আমার পকেটে একটা ব্রান্ডির বোতল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি বোতলের ছিপি খুলে ঊর্মির দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নাও, এক চুমুক খেয়ে দেখো না।

ঊর্মি বিস্ফারিত চোখে বলল, তোমার হয়েছে কী?

—কী আবার হবে? সর্দি হলে ব্রান্ডি খেতে হয়, এ তো সবাই জানে।

—তুমি, তাই বলে তুমি—

ঊর্মিকে কথা শেষ করতে দিলাম না। বোতলটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম ওর মুখের দিকে। ঊর্মি হাত দিয়ে জোরে সেটা ঠেলে দিল।

—তুমি এরকম করছ কেন? আগে বুঝি কখনও ব্রান্ডি খাওনি?

—আর কোনও দিন খাবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি।

এটা যেন খুব হাসির কথা, এইরকম ভাবে হেসে উঠলাম আমি। তারপর বোতলটা নিজের

কাছে এনে ঢকঢক করে ঢেলে দিলাম গলায়। বোতলটা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানীয় একসঙ্গে নামল আমার গলা দিয়ে, মুখটা একটুও বিকৃত হল না। খুব তৃপ্তির সঙ্গে আঃ বলে একটা সিগারেট ধরালাম।

উর্মি পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখের দিকে ওর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ, মনে হয় যেন পলক পড়ছে না।

আমি ঠাট্টার সুরে জিগ্যেস করলাম, কী, ওরকম ভাবে কী দেখছ?

—তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—অন্যরকম মানে কী রকম?

—আয়নায় একবার দেখো।

তুমিই তো আমার আয়না।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে আমি উর্মিকে জড়িয়ে ধরলাম। রাস্তা থেকে বারান্দায় সব কিছু দেখা যায়—কোন পথ চলিত লোক কিংবা বাড়ির মালি আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পাবে। সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

উর্মি ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল, ছাড়ো-ছাড়ো।

—না ছাড়ব না।

—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

—আমি তো বরাবরই পাগল।

উর্মিকে আর কথা বলতে না দিয়ে সেই অবস্থাতেই টানতে-টানতে নিয়ে এলাম শোওয়ার ঘরে, একটানে ওর শাড়ি খুলে ফেললাম।

উর্মি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যেন কোনও নারীকে বলাৎকার করছি এই ভঙ্গিতে অতি দ্রুত ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে শায়ার দড়িতে গিঁট পাকিয়ে, ওকে নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলাম বিছানার ওপর। তারপর বর্বরের মতন শুধু সম্ভোগেই মত্ত হয়ে রইলাম।

এই সময়টাতে উর্মি একটাও কথা বলেনি। তারপর খুব ধীরে-ধীরে ওর বিস্রস্ত বসন ঠিক করল। মুখ নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। যেন ও খুব অপমানিত হয়েছে। আমি সিগারেট ঠুকতে লাগলাম নখে।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে উর্মি রীতিমতন দৃঢ় গলায় বলল, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। মাঝখানে আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বলে আমি রজতের কাছে চলে গিয়েছিলাম। সেটা ভালোবাসা নয়, শুধুই মোহ—এখন আমি ভালোই বুঝতে পেরেছি। রজত আমার কেউ নয়। রজত বেঁচে নেই। তুমি রজতকে ভুলে যাবে বলেছিলে, তুমি কথা দিয়েছিলে—

—তোমরা মেয়েরা বড্ড ন্যাকা হও।

এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে আমি ঠাস করে উর্মির গালে একটা চড় বসালাম। অত্যন্ত জোরে। উর্মির ফর্সা মুখে আমার আঙুলের ছাপ বসে গেল।

ওকে সেই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম বারান্দায়। ব্রান্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে আবার চুমুক দিলাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে। যেন এরকম ভাবে ব্রান্ডি পান করার আমার বহুদিনের অভ্যেস।

বোতলটা পাশে নামিয়ে রাখার পরেই মনে হল, একি করলাম আমি? উর্মিকে চড় মারলাম? কোনও দিন স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি। উর্মিকে আঘাত করে আমি আনন্দ পাচ্ছি? এ কি কখনও সম্ভব?

আবার দৌড়ে চলে এলাম পাশের ঘরে। উর্মি ঠিক সেই একভাবে বসে আছে। আমি ওর পাশে গিয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলাম, উর্মি এ আমি কি করলাম! আমি বুঝতে পারিনি—উর্মি আমাকে ক্ষমা করো, লক্ষ্মীটি—

উর্মি মুখ তুলল। চোখ দুটো শুকনো। আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বলল, তুমি মেরেছ,

সে জন্য আমি কিছু মনে করিনি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে—

রজতের কোনও স্থান নেই আমাদের জীবনে—সে হারিয়ে গেছে।

সে আর কোথাও নেই—

আমার মেজাজটা আবার বদলে গেল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায় বললাম, এসব আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে কি লাভ!

রান্নাবান্না হয়ে থাকলে খাওয়ার-দাওয়ার দিতে বলো—

ঊর্মি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাবার খেতে বসে আমি দুটো কাঁচালঙ্কা চেয়ে নিয়ে কচকচ করে চিবিয়ে খেলাম। ঝাল লাগলো না একটুও। কোনও রান্নাই ঠিক পছন্দ হল না আমার। নানারকম অভিযোগ করতে-করতেও অবশ্য খেয়ে ফেললাম অনেকখানি। আমার সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল। সারা জীবনে আমি কখনও যেন এত ক্ষুধার্ত বোধ করিনি।

খেয়ে উঠে বললাম, চলো ঊর্মি একটু বেরিয়ে আসা যাক।

ঊর্মি অবাক হয়ে বলল, এই রোদ্দুরের মধ্যে? এখন কোথায় যাবে?

—চলোই না। বেরিয়ে পড়া যাক। তারপর দেখা যাবে।

—না, এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না!

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে চলো, চলো।

ঊর্মি এবার খুব কঠোর ভাবে বলল, আমি এখন কোথাও যাব না। তুমি কি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাও?

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তুমি থাকো আমি একাই চললাম।

—কোথায় যাবে একা?

—যেখানে খুশি।

—যেও না, আমি অনুরোধ করছি যেও না।

—শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

চটিটা পায়ে গলিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হনহন করে খানিকটা হেঁটে এসে সেন লজ-এর কাছাকাছি থমকে দাঁড়ালাম।

গেটের পাশ থেকে দেখা যায় বাগানের ওপরের বাড়িটার বারান্দায় দুটি মেয়ে ও একজন পুরুষ বসে গল্প করছে। এ বাড়িটা একতলা। এরা বেশির ভাগ সময় সামনের বারান্দাটাতেই কাটায়।

মেয়ে দুটির দিকে আমি খানিকটা লোভের দৃষ্টিতে তাকালাম। দুজনেই মোটামুটি সুন্দরী। স্বাস্থ্য ভালো। আমার ইচ্ছে হল, ভেতরে ঢুকে ওদের সঙ্গে আলাপ করি। অসুবিধের কী আছে, এ বাড়ির দুজন লোক তো আমাকে যেতে বলেইছিল।

গেটের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ আমি কী করছি? ঊর্মিকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে আমি অচেনা দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার কথা ভাবছি? আমি মনে-মনে ঠিক করছিলাম, স্বেচ্ছায় ঊর্মিকে এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করব না। সেই আমি ঊর্মিকে ফেলে রেখে এসে...

পেছন ফিরে আবার হন হন করে হাঁটলাম বাড়ির দিকে। গেটের কাছে এসে দেখলাম, বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে ঊর্মি দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রতীক্ষায়। আমি এক দৌড়ে বাগান পেরিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঊর্মি, ঊর্মি, আমি কি খারাপ হয়ে গেছি? আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।

—তুমি আজ সারাদিন যেরকম ব্যবহার করছ, তার একটুও তোমার মতন নয়।

—কেন আমি এরকম করছি বলো তো?

—তোমার মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

চলো, এখন একটু ঘুমোবে চলো। ভালো করে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীছেলের মতন আমি উর্মির সঙ্গে চলে এলাম ঘরের মধ্যে। উর্মি বিছানায় বসে জোর করে আমার মাথাটা তুলে নিল ওর কোলে। আমার চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগল। উর্মির হাতের ছোঁয়ায় দারুণ শান্তি পেলাম। কেন আমি বাইরে গিয়েছিলাম রোদ্দুরের মধ্যে? এরকম ভাবে যদি শুয়ে থাকা যায়, তার চেয়ে বেশি শান্তি কিসে?

এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তাও জানি না। চোখ মেলে মনে হল, বিকেল পেরিয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে।

উর্মি তখনও আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। এতক্ষণ এরকমভাবে বসে থাকার কোনও মানে হয়, অনায়াসেই নামিয়ে দিতে পারত।

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম তুমি ঘুমোওনি?

—না।

—কেন? শুধু-শুধু বসে রইলে?

—আমার ঘুম পায়নি। তোমার এখন কেমন লাগছে।

—খুব ভালো। ব্রান্ডির বোতলটা কোথায় গেল?

—তুমি এখন ব্রান্ডি খাবে নাকি?

—তা ছাড়া কী খাব?

—এখন চা খাওয়ার সময়—

—না, না, বেশি চা আমার ভালো লাগে না। ব্রান্ডির বোতলটা দাও না।

—তুমি তো আগে কখনও মদ খেতে না!

—এখন থেকে খাব। রোজ খাব—

—না, তুমি ওসব খেতে পারবে না।

—আঃ, তর্ক করছ কেন? বলছি বোতলটা এনে দাও, তা নয় যত আজেবাজে কথা—

—তুমি যদি এরকম করো, তাহলে আমরা আর একদিনও এখানে থাকব না! কালই কলকাতায় ফিরে যাব।

আমি উর্মির কাঁধের কাছটা আঁকড়ে ধরে বললাম, কোথায় যাবে তুমি? আমি আর তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।

—ছাড়ো, অত জোরে ধরছ কেন, আমার লাগছে। ছাড়ো, ছাড়ো।

দার্জিলিং থেকে পালিয়েছো বলে আবার এখান থেকেও পালাবে?

দার্জিলিং কী বলছ তুমি?

আমি উর্মির মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হিংস্র গলায় বললাম কেন এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে? দার্জিলিং-এর কথা মনে নেই? মেয়েছেলেরা এরকমই হয়, তাই না? এত ভালোবাসা ছিল এত আদর—আর এরই মধ্যে সব ভুলে যেতে পারলে?

উর্মি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, ওকি, তুমি আমার দিকে ওরকম করে তাকাচ্ছে কেন? তুমি রজত নও তুমি রজত নও—

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ! এখন তো এসব কথা বলবেই! ছেনালি মেয়েছেলে কোথাকার?

আমি উর্মির ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরলাম। উর্মি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। আমি ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে—

এই সময় দরজার বাইরে থেকে মালি ডাকল, বাবু-বাবু!

আমি হুংকার দিয়ে বললাম, কে?

—আপনাকে ডাকতে এসেছেন।

—এখন কথা হবে না, চলে যেতে বলো।

—সেন লজ-এর দাদাবাবু আর দিদিমণিরা এয়েছেন। ওনারা বললেন—

ঊর্মি ততক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে মালির নাম ধরে বলল, না, না, রতন, ওদের দাঁড়াতে বলো আমি আসছি—কিংবা, রতন ওদের বলো ওপরে আসতে, ওপরে আসতে বলো এক্ষুনি।

আমি উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালাম। বাগানের মধ্যে সেন লজ-এর দুজন মহিলা এবং তিনজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। একজনের সঙ্গে একটা মোটরসাইকেল।

সেটা দেখেই আমার চোখ চকচক করে উঠল। যেন অনেককালের পুরোনো বন্ধুকে দেখলাম। চিৎকার করে বললাম, দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

ঝড়ের বেগে দুমদাম করে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। রক থেকে লাফিয়ে বাগানে নেমে ছুটে ওদের কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসেছেন? বাঃ, খুশি হয়েছি আসুন, ভেতরে এসে বসুন, আমার স্ত্রী আসছেন।

ওদের কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি মোটর সাইকেলটার কাছে গিয়ে বললাম, বাঃ, এটা তো দারুণ জিনিস, একেবারে নতুন, তাই না?

মোটরসাইকেলের মালিক বিগলিত হাস্যে বলল, হ্যাঁ, নতুনই প্রায়।

আমি লোকটিকে গ্রাহ্য না করেই বললাম, এটা একটু চালিয়ে দেখব? আমার ছেলেবেলা থেকে মোটরসাইকেলের শখ।

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সে হ্যাঁ কিংবা না বলার আগে আমি তার কাছ থেকে মোটরসাইকেলটা নিয়ে নিলাম। স্টার্ট দিলাম পা দিয়ে। সেটা গর্জন করে উঠতেই আমার শরীরে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। কি মিষ্টি আওয়াজ।

মোটরসাইকেলটায় উঠে বসেই হুস করে বেরিয়ে গেলাম বাগান থেকে। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঊর্মির চিৎকার, না, না, যেও না। এই কী করছ! আপনারা ওকে ধরুন। শিগগিরই ধরুন।

কিন্তু তখন আমাকে ধরার সাধ্য কারুর নেই। বাগান থেকে বেরিয়েই আমি বেঁকে গেলাম ডান দিকে। খোলা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ছুটে চলল।

হু-হু করছে হাওয়া, তার মধ্য দিয়ে আমি ছুটে যাচ্ছি, অসম্ভব ভালো লাগছে। হাত দিলাম প্যান্টের পেছনের পকেটে, ব্র্যান্ডির বোতলটা বার করার জন্য। সেটা নেই। কেন যে সেটা আনলাম না বুদ্ধি করে।

পরমুহূর্তেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছি! জীবনে কখনও মোটরসাইকেলে উঠিনি। কী করে স্টার্ট নিলাম, কী করে এর ওপরে বসে আছি!

থামাতে হবে, এখুনি থামাতে হবে। কিন্তু থামাতে তো জানি না। কোথায় ব্রেক? কোথায় ক্লাচ? গাড়িটা চলছে কী করে?

সামনে কতকটা দূরে একটা গোরুর গাড়ি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এবার আমি মরব। গাড়িটা থামাতেই হবে যে-কোনও উপায়ে।

আমার মাথার ভেতরে কে যেন ফিসফিস করে বলল, কোনও ভয় নেই, ওই তো গোরুর গাড়ির পাশ দিয়ে জায়গা আছে।

আমি বুঝলাম, এটুকু জায়গা দিয়ে আমি যেতে পারব না। গাড়ি থামাতেই হবে। থামাতে পারছি না। একমাত্র লাফ দিয়ে পড়া—

আবার কে যেন মাথার মধ্যে বলল, কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, এই তো চমৎকার

জীবন, কী দারুণ উত্তেজনা—এখানে কি কেউ ভয় পায়?

গোরুর গাড়িটা খুব কাছে এসে গেছে। অন্ধকারে আমি দেখতে পাচ্ছি, গরুগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ, এবার ধাক্কা লাগবে। এখনও যদি লাফিয়ে না পড়ি—

—না, না, লাফিও না।

হ্যাঁ, আমাকে বাঁচতে হবে—

পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা শব্দ। আমার চোখের সামনে চড়াৎ করে তীব্র হলদে আলোর একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপর সব অন্ধকার।

চোখ মেললাম হাসপাতালে। শরীরে অনেকগুলো ব্যান্ডেজ। তবু আমার মনে পড়ছিল না কেন হাসপাতালে এসেছি। কী হয়েছিল আমার? কথা বলতে গেলাম। কণ্ঠস্বরই যেন বেরুচ্ছে না। আমি কি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি?

নিজের শরীরটার দিকে তাকালাম। আমার দু-খানা হাত, দু-খানা পা ঠিকই আছে। আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের খাটে। কেন? আমার মনে পড়ছে, রাত্তিরবেলা উর্মি ভয় পেয়েছিল, ওকে আমি সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। তারপর থেকে কী হয়েছে?

চোখের সামনে থেকে যেন হালকা ধোঁয়া সরে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেও যেন জলস্রোতের শব্দ। না, না, জলস্রোত নয় তো একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ, এবার আমরা মনে পড়ছে।

উর্মি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে এগিয়ে এল। তখুনি আমার মনে হল, উর্মিকে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা আমার তখুনি জানানো দরকার কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে না যেন। গলা আটকে যাচ্ছে।

উর্মি আমার দিকে ওরকম অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে কেন? উর্মি কি এখনও ভুল করছে?

আমার চোখ দিয়ে দুফোটা জল গড়িয়ে এল।

উর্মি আমার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম না।

—তোমার চোখ দুটো মুছে দিই?

উর্মি আমাকে স্পর্শ করা মাত্রই আমার কণ্ঠস্বর ফিরে এল। আমি মিনতিমাখা গলায় বললাম, উর্মি, আমি বিভাস।

আমাকে চিনতে পারছ তো?

খেলা

চারতলার ওপরে গোল বারান্দাটায় রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পরিতোষ দেখলেন, গেটের সামনে এসে থামল একটা ট্যাক্সি। প্রথমে নামল কাজরী, একটা হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি পরা, বাঃ চেহারাটা এখনও বেশ সুন্দরই আছে মনে হচ্ছে। কাজরীর স্বাস্থ্যটা বরাবরই ভালো, এতগুলো বছরের মধ্যে তার কখনও বড়রকম অসুখের কথা শোনা যায়নি। বাঙালিদের মধ্যে এত লম্বা ও সুসমঞ্জস গড়নের মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। কত বড় একটা সুটকেশ টেনে তুলছে কাজরী। ওর সঙ্গের পুরুষটি কই? হ্যাঁ, এবার সে বেরুল। সঙ্গে অনেক মালপত্র এনেছে, ট্যাক্সি থেকে একটার পর একটা ব্যাগ বেরুচ্ছে তো বেরুচ্ছেই।

পরিতোষ নিজের গালে হাত বুললেন। চারদিন দাড়ি কামান হয়নি, বেশ খোঁচা-খোঁচা হয়েছে। এখন শুধু পাকা দাড়ি ওঠে। গায়ে একশো দুইয়ের মতো জ্বর, মুখভরা বিস্বাদ। কাজরীর জন্য স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল পরিতোষের, কিন্তু ক'দিন ধরেই খুব জ্বর।

কাজরী একবার ওপর দিকে মুখ তুলতেই পরিতোষ হাত নাড়লেন। চেঁচিয়ে বললেন, চারতলায় উঠে এসো!

মালপত্র ওদেরই তুলতে হবে। পরিতোষের চাকর-বাকর নেই। তিনি নিজে অসুস্থ শরীরে ওদের সাহায্য করতে পারবেন না। তা ছাড়া ভারী জিনিস কখনও তোলেন না পরিতোষ।

তিনি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেট ধরালেন। প্রথম টানের সঙ্গে-সঙ্গে খক-খক করে কাশি এসে গেল। তিনি থুঃ করে কোণের নর্দমা টিপ করে গয়ের ফেলতে গেলেন, কিন্তু সেটা একটু আগে পড়ে গেল। পরিতোষ একটু হাসলেন। বাড়িতে অতিথি আসছে, এ সময় বারান্দাটা এরকম ভাবে নোংরা করা ঠিক নয়। কিন্তু কে এখন পরিষ্কার করবে? তিনি পুরোনো খবরের কাগজটা ছুঁড়ে সেটার ওপর চাপা দিয়ে দিলেন।

প্রথমে পুরুষটি উঠে এল দুটো পেল্লায় সুটকেশ নিয়ে। পরিতোষের সঙ্গে আলাপ নেই, তাই সে পরিতোষের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে হেসে বলল, নমস্কার।

পরিতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না, একটা হাত তুলে বললেন, ওই যে বাঁ-দিকের ঘরটা, ওইখানে রাখুন।

সুটকেশ দুটো সেই ঘরে নামিয়েই লোকটি নিচে গেল আরও মাল আনতে।

পরিতোষের পরনে একটা লুঙ্গি, খালি গা।

বম্বের চিড়বিড়ে গরমে বাড়ির মধ্যে গায়ে জামা রাখতে ইচ্ছে করে না। পরিতোষ একবার ভাবলেন, উঠে একটা গেঞ্জি পরে আসবেন কি না। তারপর বেশ জোরেই বললেন, ধুস।

তিনি বুকের রোম চুলকোতে-চুলকোতে ইমন কল্যাণের সুর ভাঁজতে লাগলেন।

কাজরীর হাতেও একটা সুটকেশ, একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে তার ফরসা মুখে বিনবিনে ঘাম বেরিয়ে গেছে। জিনিস দুটো বারান্দাতেই নামিয়ে রেখে সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, উফ! ভালো আছ, পরুদা?

পরিতোষ বললেন, বাঁ-দিকের ঘরটা তোদের জন্য রেখেছি। দ্যাখ, পছন্দ হয় কি না। কত মালপত্র এনেছিস রে, গোটা সংসারটা তুলে এনেছিস?

কাজরী বলল, দুজনের সংসার! তোমার এখানে আর কেউ নেই?

পরিতোষ বললেন, আর কে থাকবে?

হঠাৎ কাশির দমক এসে গেল। সেটা সামলে নিয়ে তিনি আবার বললেন, আমার এখানে

আর কে থাকবে, অ্যাঁ?

কাজরী তবু অবিশ্বাসের সুরে জিগ্যেস করল, তা বলে তুমি একদম একা থাকো?

পরিতোষ বললেন, বম্বেতে কাজের লোক পাওয়া সহজ নয়। একটা বাই সকালে এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে চা করে দিয়ে যায়। তোদের এখানে সব কিছু হাতে-হাতে করে নিতে হবে।

এবার পুরুষটি এল কাঁধে-হাতে চার পাঁচটা ব্যাগ ঝুলিয়ে। সেও হাঁপাচ্ছে।

কাজরী তার কাঁধ থেকে ব্যাগ নামাতে বলল, পরুদা, এ হচ্ছে বিমান, বিমান মুখার্জি, এখানকার ইউনিয়ান কারবাইডে জয়েন করতে এসেছে। বিমান, পরুদার ভালো নাম হচ্ছে পরিতোষ দাশগুপ্ত, তুমি নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? পরুদাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি, আমি মানে আমাদের বাড়ির সবাই। পরুদা, তুমি কিন্তু বিশেষ বদলাওনি, একটু মোটা হয়েছ শুধু!

পরিতোষ বললেন, সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেই দেখবি রান্নাঘর। চা-কফি খেতে চাইলে করে নিতে পারিস। আমাকেও এক কাপ দে।

বিমান একটু অবাক হয়ে কাজরীর দিকে আড়চোখে তাকালো। গৃহকর্তা লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বসে থাকবে, অতিথিদের দেখে উঠেও দাঁড়াবে না, পরিচয় করাবার পর হাসবে কিংবা নমস্কার করবে না, এটা সে আশা করেনি। সে বোধহয় খুব উষ্ণ অভ্যর্থনা পাবে ভেবে রেখেছিল।

কাজরী হালকা ভাবে বলল, এক্ষুনি চা খাওয়ার দরকার নেই। আগে তোমার ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখি, এসো বিমান!

পরিতোষ তাঁর সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে দিলেন রাস্তায়।

এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে কাজরী দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, পরুদা, ওই ঘরটার জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়!

পরিতোষ বললেন, সেইজন্যেই তো ওই ঘরটা তোদের দিয়েছি।

বাচ্চা মেয়ের মতন হাততালি দিয়ে কাজরী বলে উঠল, দারুণ! দারুণ!

পরিতোষ মনে-মনে হিসেব করে দেখলেন, কাজরীর বয়েস এখন অন্তত তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশের কম হবে না। তাঁর চেয়ে কাজরী পাক্কা কুড়ি বছরের ছোট ছিল। বয়েসটা কাজরী বেশ ভালোই লুকিয়েছে, তার সাজগোজ দেখে তাকে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। বিমানের চেহারাটাও বেশ ভালো, সরল-স্বাস্থ্যবান পুরুষ, চেহারায় বনেদি বাড়ির ছাপ আছে, সে কাজরীর সমবয়েসিই হবে, একটু ছোট হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

কাজরী বলল, পরুদা, তোমার ফ্ল্যাটটা চমৎকার। এত সুন্দর জায়গায়। বম্বে শহরে এমন ভালো ফ্ল্যাট পাওয়া একটা ভাগ্যের ব্যাপার।

পরিতোষ বললেন, শস্তার আমলে কিনেছিলাম। এটা কে জোগাড় করে দিয়েছিল জানিস? শচীন কর্তা, শচীন দেববর্মন, উনি আগে এটা নিজের নামে বুক করেছিলেন। তারপর তো আলদা বাড়ি কিনলেন।

বিমান একটা চেয়ার টেনে বসে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল পরিতোষের দিকে। একটু আগেই একটা সিগারেট শেষ করলেও দামি ব্র্যান্ড দেখে পরিতোষ লোভীর মতন একটা সিগারেট নিলেন এবং কাশতে লাগলেন।

কাজরী বলল, পরুদা, তুমি খালি গায়ে বসে আছ? তোমার ঠান্ডা লেগেছে মনে হচ্ছে।

পরিতোষ বললেন, তোদের জন্য কি সাজগোজ করতে হবে নাকি রে? নাঃ ঠান্ডা লাগেনি, এই কাশি আমার বরাবরের। বাড়িতে কিন্তু রান্নার ব্যবস্থা নেই। তোরা বাইরে বেরিয়ে খেয়ে আসতে পারিস, কিংবা উলটোদিকের একটা হোটেল আছে, এখান থেকে হেঁকে বললে ওরা খাওয়ার দিয়ে যায়।

কাজরী বলল, সে খাওয়ার কথা পরে চিন্তা করা যাবে। এখন তো মোটে সাড়ে এগারোটা

বাজে। জানো বিমান, পরুদার সঙ্গে বোধহয় আমার গত দশ বছর দেখাই হয়নি। কিন্তু জান, পরুদা, তোমার কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করি। আমার ছোট বোন রুমিকে মনে আছে? ও তো এখন অ্যামস্টারডামে থাকে, এ বছরই গোড়ার দিকে এসেছিল দেশে, ও বলল তোমার কথা। রুমি একগাদা চকলেট নিয়ে এসেছিল দেশে, সেগুলো দেখিয়ে প্রথমেই বলল, তোর মনে আছে দিদি, ছেলেবেলায় পরুদা আমাদের চকলেট খাইয়ে-খাইয়ে কীরকম অভ্যেস খারাপ করিয়ে দিয়েছিলেন?

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকি বম্বে চলে এসেছিলেন পরিতোষ। এর মধ্যে কাজরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে বড়জোর পাঁচবার বা ছ'বার। তার মধ্যে দু-বারই বিয়ে বাড়িতে, সামান্য সময়ের জন্য। একবার কাজরী বম্বে এসেছিল তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে, সেবার কাজরী কোনও যোগাযোগই করেনি, বোধহয় ঠিকানাও জানতো না, চার্চ গেট স্টেশনের সামনে হঠাৎই মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। সেবার খুব উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিল, এ বাড়িতে আসবে বলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর আসেনি। তারপর শেষবার কোথায় যেন দেখা হল।

দেখা না হলেও মোটামুটি খবরাখবর কানে আসে। কাজরীর আগেকার দুই স্বামীই বিখ্যাত পরিবারের মানুষ, তাদের বিয়ে ও ডিভোর্সের কাহিনি মুখে-মুখে ছড়িয়ে যায়। পরিতোষ আগে অন্তত বছরে একবার কলকাতায় যেতেন, কিন্তু কাজরীর সঙ্গে দেখা করার কোনও আগ্রহ বোধ করেননি। কোনও প্রয়োজনও ঘটেনি। তবু অন্যান্য পরিচিতদের মুখে মাঝে-মাঝে কাজরীর প্রসঙ্গ শুনেছেন।

কাজরীর তৃতীয় বিয়েটা কবে হল, তা অবশ্য পরিতোষ জানতেন না। এই বিমান সেরকম বিখ্যাত কেউ নয়। কমার্শিয়াল ফার্মের মাঝারি ধরনের অফিসার। তবে ছোকরাটিকে দেখতে ভালো লাগে, মুখের মধ্যে একটা সারল্য আছে।

কাজরী আবার জিগ্যেস করল, আমার ছোট বোন রুমিকে তোমার মনে নেই, পরুদা?

পরিতোষ বললেন, হুঁ, একটু একটু মনে আছে, বড্ড ছোট ছিল। বোধহয় ন-দশ বছর বয়েস ছিল তাই না?

কাজরী হেসে বলল, এখন রুমিরই তিনটি ছেলে মেয়ে। বড়টির বয়েস বারো।

তারপর সে বিমানকে বলল, আমরা এক সময় পরুদাদের বাড়ি ভাড়া থাকতুম। রাসবিহারি এভিনিউতে পরুদাদের বিরাট বাড়ি ছিল। তখন পরুদাকে যদি তুমি দেখতে! এই লুঙ্গিপরা পরুদার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। তখন কী স্টাইলিস্ট, প্রত্যেকদিন নতুন-নতুন পোশাক, কতরকম পারফিউম মাখত, একটা ব্লু রঙের অস্টিন গাড়ি ছিল, মেয়ে মহলে দারুণ পপুলার!

পরিতোষ হাসলেন। বাকি কথাগুলোও কি কাজরী বলবে বিমানকে? বিমান জিগ্যেস করল, আপনাকে কি আজ বেরুতে হবে? রোজই কি আপনাকে বেরুতে হয়?

কাজরী বলল, রোজ বেরুবেন কেন? উনি তো কোথাও চাকরি করেন না!

পরিতোষ বললেন, রোজই বেরুই একবার করে। সন্ধের দিকে, তবে ক'দিন ধরে আমার জ্বর চলছে। শরীরটা সুবিধের নেই!

কাজরী দারুণ উদ্বেগ দেখিয়ে বলল, জ্বর হয়েছে? সে কথা এতক্ষণ বলোনি?

উঠে এসে পরিতোষের কপালে হাত দিয়ে দেখে বলল, এ তো বেশ জ্বর। তুমি কী, পরুদা? এইরকম জ্বর নিয়ে খালি গায়ে বসে আছ? ডাক্তার দেখিয়েছ?

কাশতে-কাশতে পরিতোষের আবার মুখে গয়ের এসে গেল। এবার আর এখান থেকেই ফেলা যায় না। তিনি উঠে গিয়ে ভেতরের বেসিনে থুতু ফেলে, মুখ ধুয়ে একটা চাবি নিয়ে ফিরে এসে বললেন, ডাক্তার দেখাবার মতন কিছু হয়নি। এ জ্বর আপনি সেরে যাবে। এই একটা চাবি তোরা রাখ। আমি থাকি বা না থাকি, তোরা যখন ইচ্ছে ফিরবি।

কাজরী বলল, পরুদা, তোমার শরীর খারাপ, তবু তুমি এরকম একলা-একলা থাকো, এটা ভারি অন্যায়।

পরিতোষ এ কথায় একেবারেই গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, তোরা তো এখন জিনিসপত্র গুছিয়ে টুছিয়ে নিবি। আমি ততক্ষণ একটু শুয়ে থাকি। রান্নাঘরের কলটা চেপে বন্ধ করতে হয়, নইলে জল নষ্ট হয়। বাথরুমের গিজারটা খারাপ হয়ে গেছে, গরম জল পাবি না। অবশ্য গরম জল এখানে লাগে না।

শরীরের ব্যাপার নিয়ে আদিখ্যেতা একেবারে পছন্দ করেন না পরিতোষ। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় বালিশে মাথা দিলেন। পাশেই ওলটানো একটা বেশ মোটা ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস। তিনি আজকাল এইসব বই-ই পছন্দ করেন। বইটা বুকে তুলে নিলেন।

কাজরী এসেছে বলেই যে এখন তাঁর সব পুরোনো কথা মনে পড়ে যাবে, তার কোনও মানে নেই। স্মৃতি চর্বণের অভ্যেস নেই পরিতোষের।

এই ঘরের একটা দেয়াল ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে প্রায় দু-বছর। ব্যাটারি বদলাতে হবে। সে কথাও পরিতোষের মনে থাকে না। কে যেন ঘড়িটা উপহার দিয়েছিল। বালিশটা ফুটো হয়ে গিয়ে তুলো বেরুচ্ছে। একবার বেরিয়েছে। এ বালিশটা ফেলে দিয়ে একটা নতুন কিনতে হবে। পড়তে-পড়তে ঘুম এসে গেল পরিতোষের।

একটা মিষ্টি গন্ধে পরিতোষের ঘুম ভেঙে গেল। খাটের একবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কাজরী। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।

কাজরী বলল, পরুদা, তখন তুমি চা চেয়েছিলে।

পরিতোষ বললেন, চিনি দিয়েছিস নাকি?

—হ্যাঁ। এক চামচ। কেন, তুমি খাও না?

—কখনও খাই, কখনও খাই না। ঠিক আছে, দে।

—ইস ঘরের চেহারাটা কী করেছ, পরুদা? এত সুন্দর ফ্ল্যাট তোমার।

—একা মানুষ, এতেই চলে যায়।

—কেন, একা থাকো কেন? সারাজীবন একাই কাটাবে?

কাজরী তার দুই উরু পরিতোষের কাঁধের সঙ্গে জোরে চেপে ধরেছে। তাতে পরিতোষের বিন্দুমাত্র রোমাঞ্চ হল না। মানবচরিত্র তিনি ভালোই বোঝেন। কাজরীর মতন সুন্দরী রমণী যে এরকম শারীরিক ঘনিষ্ঠতা দিতে চাইছে, তার পেছনে আছে স্বার্থ। অল্পবয়েসে এইরকম স্বার্থবোধ থাকে না, তখন ঝোঁকের মাথায় মানুষ নিজের কত ক্ষতিও করে ফেলে। তারপর বাস্তবের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে-খেতে মানুষ আস্তে-আস্তে কঠিন হয়ে ওঠে। কাজরী এরকম অনেকগুলো ঠোক্কর খেয়েছে।

বম্বেতে হোটেলের খরচ অনেক, চট করে পাওয়াও যায় না। এতকাল পরে কাজরী হঠাৎ কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিল, তার স্বামী বম্বেতে বদলি হয়েছে, কোয়ার্টার পেতে দিন দশেক দেরি হবে, সেই ক'টা দিন ওরা কি পরিতোষের ফ্ল্যাটে থাকতে পারে?

পরিতোষ যে একা থাকেন, সে খবরও কাজরী আগেই নিয়েছিল নিশ্চয়ই। পঁচিশ বছরে সে আর একটাও চিঠি লিখেছে কি না সন্দেহ, পরিতোষের তো মনে পড়ে না।

পরিতোষ চায়ে চুমুক দিয়ে একটু সরে গেলেন।

কাজরী মাথার কাছে বসে পড়ে আদুরে গলায় বলল, পরুদা, তুমি এরকম ময়লা বিছানায় শুয়ে আছ, আমার বিচ্ছিরি লাগছে। একবার ওঠ, আমাদের কাছে একস্ট্রা চাদর আছে, আমি এনে পেতে দিচ্ছি।

পরিতোষ বললেন, আমার অন্য চাদর আছে। বদলানো হয় না। আজ এই ঠিক আছে, বেশ তো যাচ্ছে।

—না, ওঠো প্লিজ। আমি এসে পড়েছি, এবার থেকে আমার কথা শুনে চলতে হবে তোমাকে।

—খুকু, এই বিমানের সঙ্গে তোর কবে বিয়ে হল?

পরিতোষো বুকের ওপর একখানা হাত রেখেছিল কাজরী, এই কথা শুনেই সরিয়ে নিল। মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। মনের কথা গোপন করার জন্য এইরকম সে সময়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে।

পরিতোষ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কাজরীর মুখের দিকে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কাজরী আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। তারপর বলল, পরুদা, তোমার কাছে গোপন করার কোনও মানে হয় না। বিমানের সঙ্গে এখনও আমার ফরমাল বিয়ে হয়নি। বিমান বিবাহিত, ওর স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ-ছ'বছর ওর কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু সে মহিলা কিছুতেই ডিভোর্স দিতে রাজি নন। বিমান খুবই আনহ্যাপি, কিন্তু মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। যদি মিউচুয়্যালি ডিভোর্স পাওয়া যায়, আমরা অপেক্ষা করছি। তুমি আশা করি বুঝবে যে, আমি—

পরিতোষ হালকাভাবে বললেন, হ্যাঁ তাতে কী হয়েছে? এরকম তো হয়ই।

কাজরী তবু বলল, অনেকে ভুল বুঝবে। বিমান কিন্তু আমার জন্যই ডিভোর্স করতে যাচ্ছে না। আমি কারুর বিয়ে ভাঙতে চাই না। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াব আগে থেকেই বউয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বিমানের। ওদের রুচির কোনও মিল হয়নি।

পরিতোষ আবার একই কথা বললেন, হ্যাঁ, এরকম তো হযই।

কাজরী বলল, পরুদা, এই বিমান একেবারে অন্যরকম মানুষ। মনটা এত ভালো, আমাকে এমন ভাবে বোঝে, আমার মনে হচ্ছে এতদিন পর আমি সত্যিকারের সুখি হব। সেইজন্যই কলকাতা থেকে চলে এসেছি, ভালো হয়েছে, আমি আব চেনাশুনোদের মধ্যে থাকতে চাই না। এতগুলো বছর আমার ওপর দিয়ে যে কী গেছে, তা তুমি জানো না। আগে কখনও ভাগ্য মানিনি, এখন মনে হয়, সবই কি আমার ভাগ্যেব দোষ? আমি তো একটা নিজস্ব সংসার চেয়েছিলুম, তবু কী যে হল...। এবার আমি নতুন করে আমার জীবনটা শুরু করব।

চোখের জল সামলাতে পাবছে না কাজরী। এসব কথা মুখ ফুটে বলা সহজ নয়। তার রূপ আছে, গুণও আছে যথেষ্ট, কিন্তু জীবন তাকে যথেষ্ট দেয়নি।

পরিতোষ একেবারে কান্না সহ্য করতে পারেন না। তিনি শুকনো ভাবে বললেন, ভালোই তো, নতুনভাবে জীবন শুরু কর।

চায়ের পরেই সিগারেট দরকার। পরিতোষ বিছানা হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে লাগলেন।

একটু সময় নেওয়ার পর চোখ মুছে কাজরী বলল, পরুদা, তোমার ফোনটা কোথায়? বিমানকে একবার অফিসে ফোনে জানিয়ে দিতে হবে।

—ফোন কেটে নিয়ে গেছে। আমার তো লাগে না।

প্রায় আর্তনাদের মতন কাজরী বলল, ফোন নেই?

—দরকার হলে রাস্তার উলটোদিকের দোকান থেকে করতে পারিস। তবে ফোনে কি সব কাজ হয় এদেশে। বিমানকে ওর অফিস থেকে একবার ঘুরে আসতে বল না।

—এত লম্বা ট্রেন জার্নি করে এসে আজ আর ওর বেরুতে ইচ্ছে করছে না। পরুদা, অফিস থেকে বিমানকে অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দেবে বলেছে, যদি দিন দশেকের মধ্যে পাওয়া না যায়, হয়তো মাসখানেক আমাদের এখানেই থাকতে হতে পারে।

এবারে পরিতোষ নিজেই কাজরীর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, আরে সে জন্য চিন্তা করতে হবে না। একমাস থাকতে হলে থাকবি। বাড়ি পাওয়া কি সোজা?

কাজরী ঝুঁকে এসে পরিতোষের খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে নিজের ফরসা কোমল ক্রিমমাখা গালটা চেপে ধরে বলল, তুমি ঠিক আগের মতোই আছ। পরুদা, আমি তোমাকে আগের মতোই ভালোবাসি। তুমি আমার সেই পরুদা।

আর তিন দিন পরেও পরিতোষের জ্বর ছাড়ল না। ডাক্তারও দেখাবেন না তিনি কিছুতেই। আজকাল ডাক্তাররা তো শুধু নাড়ি টিপে রোগ দেখেন না, রক্ত, থুতু পেচ্ছাপ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়, এসব জায়গায় যেতে পরিতোষের ঘোর আপত্তি। তা ছাড়া ওষুধ দেওয়ার আগেই ডাক্তাররা কী-কী অভ্যেস ছাড়তে বলবেন, তা পরিতোষের জানা।

কাজরীরা এর মধ্যে বেশ সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। এখনও অবশ্য বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা করেনি। শুধু চা-কফি ব্রেকফাস্ট কাজরী তৈরি করে নেয়। বিমান অফিসে লাঞ্চ খায়, রাত্তিরে ওরা দুজন বাইরে কোথাও খেয়ে নিচ্ছে। সকালবেলা কাজরী বিমানের সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। সে নিজেও কিছু একটা চাকরি খুঁজছে, আসবার আগে কলকাতা থেকেই কয়েকটা জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়ে রেখেছে।

পরিতোষ সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে গল্পের বইতে হারিয়ে যান। কাজরীদের সম্পর্কে যেন তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তার ক্ষিদে পেলে তিনি জানলা দিয়ে উলটোদিকে হোটেলে একটা হাঁক পাড়েন। অনেকদিন ধরেই এই ব্যবস্থা চলেছে, সেইজন্য ওরা ঠিক বুঝতে পারে। একটা ছোকরা খাওয়ার নিয়ে উঠে আসে চারতলায়। সেই ছোকরাকেই কিছু বকশিস দিয়ে পরিতোষ মদের বোতল আনান।

শনিবার সন্ধেবেলা পরিতোষের মন আনচান করে উঠল। সারা দুপুর-বিকেল তিনি ঘুমিয়েছেন, এরপর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসবে না। পাশের ঘরটা নিঝুম, কাজরী বিমান বাড়িতে নেই। বিছানা থেকে গল্পের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন পরিতোষ। বম্বেতে অনেকক্ষণ বিকেলের আলো থাকে, এখন সবে অন্ধকার হতে শুরু করেছে।

পরিতোষ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন। জ্বরের জন্য মুখটা টকটক হয়ে আছে, দাড়ির জন্য কুটকুট করছে গাল। রাস্তায় এখন গাড়ি ঘোড়ার প্রতিযোগিতা চলছে, হুড়হুড় করে ছুটছে মানুষ।

পরিতোষ বাথরুমের আলো জ্বেলে দাড়ি কামিয়ে ফেললেন। তাকের ওপর দেখলেন একটা নতুন আফটার শেভ লোশানের শিশি। বিমানের নিশ্চয়ই। পরিতোষেরটা শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। বিমানেরটা নিয়েই একটুখানি গালে লাগালেন। বাঃ বেশ গন্ধটা। তাঁর মনটা একটু ভালো হয়ে গেল।

স্নান হয়নি দুদিন আজও করলেন না। মুখে-পিঠে খানিকটা জল ছিটিয়ে তিনি পাটভাঙা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরলেন। একটা রুমাল নিলেন। তারপর বিছানা থেকে উলটে দিলেন একটা তোশক।

দুটো তোশকের মাঝখানের জায়গাটাই তাঁর সিন্দুক। কিছু দু-টাকা, পাঁচ টাকার নোট পড়ে আছে, বড় পাত্তি নেই একটাও

সেদিকে তাকিয়ে পরিতোষ বললেন, দূর শালা।

দেয়ালের গায়ে একখানা ছোট বুক র‍্যাক। সেখানে কিছু বাছা-বাছা বই রাখা আছে। যে সব বই কখনও কেউ একটানা পড়ে শেষ করে না। কালি সিংহীর বাংলা মহাভারত বাঁধানো আছে পাঁচ ভলুম। এই মহাভারতগুলো পরিতোষের ব্যাঙ্ক।

একটা-একটা করে মহাভারতের পাতা উলটে গেলেন ফরফরিয়ে। গোটা চারেক দশ টাকার নোট আর-একটি পঞ্চাশ টাকার নোট মোটে পাওয়া গেল। পরিতোষ ঠোঁট উলটে নিজেকে ভ্যাঙচালেন।

সবক'টা নোটই মুঠো করে পকেটে ভরে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফ্ল্যাট থেকে। তাঁর নিজের ঘরের দরজা খোলাই রইল, সদর দরজা টেনে দিলেই তালা লেগে যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে তিনি টের পেলেন, জ্বরের জন্য তাঁর পা টলটল করছে, মাথাটা

হালকা লাগছে। সে দুর্বলতা অগ্রাহ্য করে তিনি সুর ভাঁজতে লাগলেন পূরবীর।

রাস্তায় নেমে তিনি শৌখিনবাবুদের মতন ফিটন ডাকার ভঙ্গিতে হাঁক দিলেন, ট্যাক্সি!

বিমান আর কাজরী ফিরে এল রাত্তির সাড়ে দশটায়। আজ তারা বিমানের অফিসের এক কলিগের সঙ্গে একটা চিনে হোটেলে খেতে গিয়েছিল। গল্পে-গল্পে বেশ রাত হয়ে গেল। কাজরী এক বাক্স ফ্রাইড প্রন নিয়ে এসেছে পরিতোষের জন্য। কিছু ফুলও সে এনেছে ঘর সাজাবার জন্য, বম্বের রাস্তায় রাত্তিরের দিকে বেশ সস্তায় ফুল পাওয়া যায়।

চাবি খুলে ওরা দেখল, ফ্ল্যাটটা অন্ধকার।

কাজরী ডাকল, পরুদা!

পরিতোষের ঘরে সে উঁকি দিল, বাথরুমের দরজা ঠেলে দেখল। তারপর আশঙ্কাভরা চোখ মুখ নিয়ে জিগ্যেস করল, কোথায় গেল পরুদা?

বিমান টাই-এর গিঁট খুলতে-খুলতে বলল, বেরিয়েছেন বোধহয় কোথাও!

কাজরী বলল, ক'দিন ধরে জ্বর ছাড়ছে না, শরীরটা বেশ দুর্বল, তাই নিয়ে এত রাত্তিরে বাইরে থাকবে?

বিমান পোশাক পালটে বারান্দায় বেতের চেয়ারে এসে বসল। হাতের গেলাসে অনেকখানি জল মেশানো হুইস্কি। কাজরীর সাজ বদল করতে খানিকটা সময় লাগল। বাথরুমে ঘুরে মুখে ক্রিমট্রিম মেখে, একটা লম্বা ঢিলে রাত পোশাক পরে সে বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে বলল, পরুদা এখনও ফিরল না?

বিমান বলল, কোথায় গেছেন তা তো আমাকে বলে যাননি! তোমার এই পরুদাটি যেন কেমন-কেমন! কথাবার্তার ধরনটা অদ্ভুত।

কাজরী বলল, বয়েস হয়ে গেছে, খানিকটা সিনিক্যাল হয়ে পড়েছে। একসময় কিন্তু দারুণ আমুদে ছিল, সবসময় হাসিঠাট্টা করত।

—তুমি বলেছিলে খুব ফেমাস লোক। আমার অফিসে কয়েকজনকে নাম বললুম কেউ চিনতে পারল না। একজন বাঙালি শুধু নামটা জানে। তবে সেও বলল, পরিতোষ দাশগুপ্ত এখন একেবারে ফালতু। কেউ পোঁছে না।

—এখন বিশেষ চান্স পায় না। কিন্তু এককালে নাম করা সুরকার ছিল। বাংলা ফিল্মে তো একচেটিয়া ছিল।

—সে তো পঁচিশ বছর আগেকার কথা।

—বম্বেতে এসেও বেশ কয়েকটা ছবিতে হিট সুর দিয়েছিল। গত বছরেও পরুদার একটা ছবি রিলিজ করেছে। তবে টেস্ট পালটে যায়। দ্যাখো না, হেমন্তবাবু, সলিল চৌধুরি সবাই বম্বে ছেড়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। পরুদা অবশ্য রয়েই গেলেন এখানে।

—এই বয়েসে কী অসম্ভব স্মোক করেন দেখেছ? এইরকম জ্বর সব সময় খক-খক করে কাশছেন, তারমধ্যেও একটার পর একটা সিগারেট টেনেই যাচ্ছেন।

—শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন না, পরুদা। শেষ বয়েসে দেখবার কেউ নেই। অথচ একসময় কত মেয়ে পরুদার চারপাশে ঘোরাঘুরি করত। শুধু কলকাতায় নয়, এই বম্বেতেও দু-বার পরুদার বিয়ের গুজব রটেছিল, একবার তো আশা ভোঁসলের সঙ্গে....

—তুমিও এক সময় লাইন লাগিয়েছিলে নাকি?

—যাঃ, আমার সঙ্গে কত বয়েসের ডিফারেন্স। পরুদা আমাদের নিজের দাদার মতন ছিল, ওর কাছে কত আবদার করেছি, আমাদের টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় নিয়ে যেতেন। দেখলে না, আমি একবার চিঠি লিখতেই এখানে থাকতে দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

—হ্যাঁ, ফ্ল্যাট সত্যি চমৎকার।

—কী সুন্দর সমুদ্রের হাওয়া আসছে। তুমি আবার হুইস্কি নিলে?

—তুমি ও একটু নাও না। কাল ছুটি আছে।

—কাল ফ্ল্যাটটা ভালো করে গুছোব। যা বিশ্রী অবস্থা হয়ে আছে, পরুদার ঘরটার দিকে তো তাকানোই যায় না।

—শোনও কাজরী, আমি একটা ভুল করে ফেলেছি। আজ অফিসে আচারিয়া বলছিল, বম্বেতে চাকরি নিয়ে এলে আগে থেকে কম্পানিকে ফ্ল্যাট খুঁজে দেওয়ার শর্ত দিতে হয়। না হলে কোম্পানি হাজার দুয়েক টাকা হাউজ রেন্ট অ্যালাউন্স বলে হাতে ধরিয়ে দেবে, ফ্ল্যাট খোঁজার দায়িত্ব আমাদের। আমি তো ধরেই নিয়েছিলুম, কম্পানিই ফ্ল্যাট দেবে। কী ঝামেলা বল তো।

—অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। ধীরেসুস্থে খুঁজলেই হবে। আমি পরুদাকে বলে রেখেছি। আজ ওয়েস্ট আন্ধেরিতে যে ফ্ল্যাটটা দেখা হল, খুপরি দু-খানা ঘর, অন্ধকার, বারান্দা নেই, তাই-দু-হাজার টাকা ভাড়া, ওরকম বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

—এখানে রান্নাবান্নার কোনও ব্যবস্থা নেই। রোজ-রোজ বাইরে খাওয়া কি সহ্য হবে?

—তা বলে আমাকে দিয়ে তুমি রোজ রান্না করাতে পারবে না। আমি জন্মে কখনও রান্না করিনি। এক আধদিন স্পেশাল কিছু করতে পারি। পরুদা তো হোটেলের খেয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন।

—ওই জন্য এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেছেন। দাড়িগুলো সব পাকা। আমার গ্যাসের প্রবলেম আছে, তুমি কি চাও আমারও অমন দাড়ি পাকুক।

কাজরী ঝুঁকে এসে বিমানের গালে হাত বুলিয়ে বলল, আহা-হা, তুমি মোটেই বুড়ো হবে না। তুমি পরুদার চেয়ে কত ছোট!

বিমান কাজরীকে আরও কাছে টানে, দুজনের মুখ একাকার হয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বিছানায় পরস্পরের শরীরকে তো পাওয়াই যায়, কিন্তু বারান্দায় অন্ধকারে বসে, সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায় কিন্তু রাস্তার লোক বারান্দা দেখতে পায় না, সেখানে আদর করার একটা অন্য রোমাঞ্চ আছে।

হঠাৎ দরজার বাইরে ঘটর-ঘটর শব্দ শুরু হল। কেউ যেন চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছে।

ছিটকে সরে গিয়ে কাজরী দরজার খুলে দিতে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে তার একটা অদ্ভুত অনুভূতিও হল। ঠিক এইরকম ঘটনা তার জীবনে আগে কতবার ঘটেছে?

এইরকমভাবে তাকে কেউ নিরিবিলিতে আদর করছে, আচকমা অন্য কেউ এসে পড়েছে সেখানে। জীবনে এরকম হয়ই, সত্যিকারের নিরিবিলি জায়গা আর কোথায় পাওয়া যায়। কাজরীর ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু একজনই নয়, বিভিন্ন পুরুষ। সে একজনকেই চেয়েছিল, একজনই মাত্র পুরুষকে ভালোবাসতে চেয়েছিল, যে হবে তার স্বপ্নের রাজকুমার। কিন্তু তার বারবার চিনতে ভুল হয়েছে। যাকে সে প্রিয় ভেবে আঁকড়ে ধরতে গেছে, সে তাকে ঠেলে দিয়েছে দূরে। স্বপ্নের রাজকুমার আসেনি।

তার জীবনের প্রথম পুরুষের নাম পরিতোষ দাশগুপ্ত। সে ছিল একজন রূপবান যুবক, খানিকটা খেয়ালি, বোহেমিয়ান, টাকাপয়সার অভাব ছিল না, সব দিক থেকেই পরিতোষ দাশগুপ্ত ছিল একটি সতেরো বছরের সদ্য যুবতীর মন জয় করার পক্ষে আদর্শ। একটা পিয়ানো ছিল পরিতোষের ঘরে, সে একা-একা খানিকটা ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্টভাবে সেই পিয়ানো বাজাত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাজরী দেখত পরুদার ফরসা, চওড়া কাঁধ, আঙুলগুলো খেলা করছে সুর নিয়ে, সে যে কী সাঙ্ঘাতিক ভালোলাগা।

পরুদা কাজরীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের কাছে টানেনি, এ কথা কাজরী স্বীকার করতে বাধ্য, কাজরীই নিজে থেকে যেত চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে। শুধু হিরো ওয়ারশিপ নয়, কাজরীর তখন মনে হয়েছিল সেটাই প্রেম। জীবনের প্রথম চুম্বন সে পায় পরুদার কাছ থেকে। পরুদার তখন সিনেমার

অনেক নায়িকার বাড়িতে যাতায়াত, উঠতি নায়িকারা তাকে অনেক কিছু দিতে রাজি, পরুদা সেইজন্যই কাজরীর প্রতি কখনও লোভ দেখায়নি, সতেরো বছরের একটি ব্যাকুল যুবতীকে সে আদর করত যেন দয়া করে, কাজরী তাতেই ধন্য হয়ে গিয়েছিল। একদিন সেই অবস্থায় চুমু খাওয়ার মুহূর্তে এসে পড়েছিল কাজরীর ছোট বোন। বাবা-মা'ও কী যেন সন্দেহ করেছিলেন, তবু কাজরী লুকিয়ে-লুকিয়ে চলে আসত, পরুদার কাছে সমস্ত পোশাক খুলে ফেলতেও সে দ্বিধা করেনি। সকালবেলা সদ্য ফোটা ফুলের মতন কাজরীর নরম, পবিত্র শরীরে হাত ছোঁয়াবার আগে পরুদা বলেছিল, ইস তুই কী সুন্দর রে, তোকে যে বিয়ে করবে, সে ধন্য হয়ে যাবে।

কাজরীকে নিজের করে পাওয়ার কিংবা তার সঙ্গে কোনওরকম হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপন করার চিন্তা স্বপ্নেও স্থান দেননি পরিতোষ। তিনি যেন নিরাসক্তভাবে এই উৎসুক যুবতীকে যৌবন ধর্মে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। মাস ছয়েক পরেই কাজরীর বাবা যখন এক ধনী পরিবারের যুবকের সঙ্গে কাজরীর বিয়ে ঠিক করে ফেললেন, তখন কাজরী পরিতোষের কাছে কেঁদে ভাসাল। পরিতোষ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, তুই কি পাগলি রে, এতে কাঁদবার কি আছে? তোর স্বামীটি শুধু বড়লোকের ছেলে নয়, লেখাপড়ায় ভালো, নামকরা বংশ, এতে কখনও আপত্তি করতে আছে? আমি তোকে আশীর্বাদ করছি...

সেসব কতকাল আগেকার কথা। সেই প্রথম বয়েসের ছেলেমানুষির জন্য কাজরীর একটুও অনুতাপ নেই। পরুদা তার কোনও ক্ষতি করেননি, পরুদা এরপর আর কোনওদিন কাজরীর প্রতি গোপন দাবি জানাননি। কাজরীর সেই বিয়েটা যে পাঁচ বছরের বেশি টিকল না তার কারণ সম্পূর্ণ অন্য।

কাজরী দরজা খুলতেই পরিতোষ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তার গায়ে। সোজা দাঁড়াতে পারছেন না, একেবারে চুরচুরে মাতাল।

কাজরী তাকে ধরে-ধরে এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েই বকুনি দিতে শুরু করে দিল।

মাছি তাড়াবার মতন মুখের সামনে হাত নেড়ে পরিতোষ সেই বকুনি অগ্রাহ্য করলেন। ঠোঁটে তাঁর ফুরফুরে হাসি। তিনি বললেন, কোথায় গেসলুম জানিস? গুলজারের ওখানে বিরাট পার্টি... আমায় নেমন্তন্ন করেনি, আজকাল আমাকে ওরা ডাকতে ভুলে যায়, কিন্তু গিয়ে পড়লে খাতির করে। গুলজার লোকটা ভদ্রলোক, আমাকে নিজের হাতে খাওয়ার তুলে দিলে...অঢেল খাওয়ার আর মদ বুঝলি, তা ভাবলুম পরের পয়সায় পাচ্ছি যখন, যত পারি খেয়েনি। হ্যাঁ।

কাজরী বলল, পরের পয়সায় বলে...তোমার এই শরীর নিয়ে...তোমার জন্য আমরা জেগে বসে আছি...কাল সকালেই যদি তুমি ডাক্তার না দেখাও।

পরিতোষ বললেন, আমার জন্য জেগে বসে আছিস? কেন?

কাজরী বলল, বাঃ, তুমি এই অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছ, এত রাত হয়ে গেল, তোমার জন্য আমাদের চিন্তা হবে না?

পরিতোষ বললেন, পরের জন্য চিন্তা করে নিজের শরীর খারাপ করতে নেই। যা, শুয়ে পড় গিয়ে।

কাজরী বলল, পরুদা, তোমাকে আমরা মোটেই পর মনে করি না।

পরিতোষ হো-হো করে হেসে উঠলেন। তার বিমানের পাশে রাখা হুইস্কির বোতলটার দিকে চোখ পড়তেই তিনি যেন চমকে উঠে বললেন, আরে, তোমরাও ড্রিংক করো নাকি? দেখি, আমাকে একটু দাও তো।

তিনি তুলে নিলেন কাজরীর গেলাসটা।

কাজরী সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কেড়ে নিয়ে বলল, না, তোমাকে আর খেতে দেব না। তুমি যথেষ্ট খেয়েছ।

পরিতোষ বললেন, যথেষ্ট হয়নি, আর একটুখানি নেশা বাকি আছে। ওরা সাত তাড়াতাড়ি খাওয়ার সার্ভ করে দিল। আমার কোটা ফিনিস হয়নি।

কাজরী বলল, পরুদা, তোমার শরীর ভালো নেই, তোমাকে আমি আর খেতে দেব না।

ঠক করে গেলাসটা নিচে নামিয়ে রেখে পরিতোষ কটমট করে তাকালেন।

তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, ও, তোদের মদ দিবি না? কম পড়ে যাবে? ভাবছিস কি, আমার আর স্টক নেই? আমি তোদের ভরসায় থাকব?

বিমান বলল, না, না, কাজরী তা মিন করেনি।

পরিতোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ধোৎ।

বিমান বলল, ঠিক আছে, আপনি একটা নিন। এই কাজরী, ওঁকে বল।

কাজরী হাত বাড়িয়েও পরিতোষকে ধরতে পারল না। পরিতোষ টলতে-টলতে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বিমান বলল, এঃ ব্যাপারটা খারাপ হয়ে গেল। উনি ভুল বুঝলেন। শিগগির ওঁকে ডাকো।

পরিতোষ ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

কাজরী দরজা ঠেলতে-ঠেলতে বলতে লাগল, পরুদা, শোনও, আমি তোমার ভালোর জন্যই বলেছিলাম। বিমান আমাকে বকছে। তুমি প্লিজ একবার এসো—।

পরিতোষ ধমকের সুরে কী যে উত্তর দিলেন তা আর বোঝাই গেল না। তারপর জোরে-জোরে কাশতে লাগলেন, দরজা খুললেন না কিছুতেই।

বিমান আর কাজরী মুখোমুখি চুপ করে বসে রইল আরও খানিকক্ষণ। অন্ধকারেও তারা যেন পরস্পরের মুখে আশঙ্কার ছাপ দেখতে পাচ্ছে।

পরদিন সকালে কাজরীর আগে জেগে উঠল বিমান।

রান্না ঘরে কিছু একটা ঘটর-ঘটর শব্দ শুনে কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল।

বাই আসনি, পরিতোষ নিজেই চা তৈরি করছেন। একটা বড় মগে চা ছাঁকতে-ছাঁকতে গুনগুন করে আশাবরীর সুর ভাঁজছেন। লুঙ্গি পরা, খালি গা, সারা পিঠে লোম। পরিতোষের ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট।

বিমানকে দেখে পরিতোষ বললেন, গুড মর্নিং। উঠে পড়েছ, এর মধ্যেই? তুমি চা খাও, না কফি? চা অনেকটা আছে, ইচ্ছে করলে নিতে পার।

যেন কাল রাত্রে কিছুই ঘটেনি, এমন স্বাভাবিক পরিতোষের কণ্ঠস্বর।

বিমান সেই প্রসঙ্গ না তুলে বিনীতভাবে বলল, হ্যাঁ, আমি একটু চা খেতে পারি। আপনি এত ভোরে উঠে পড়েন?

পরিতোষ বললেন, সারাদিনই তো ঝিমোই। রাত্তিরে তাই বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারি না। এককালে আমি সকাল দশটা-এগারোটা পর্যন্ত ঘুমতুম, বুঝলে? একবার, বেশিদিন আগে না, এই সাত-আট বছর হবে, এক পার্টি থেকে শনিবার শেষ রাত্রে ফিরে ঘুম মেরেছি, চোখ মেলেছি কখন জানো? সোমবার। মাঝখানে রোববারটা যে কী করে কেটে গেল তা জানিই না। হে-হে-হে-হে! সে একটা কাণ্ড হয়েছিল বটে!

সাধারণত বেশি কথা বলেন না পরিতোষ, হঠাৎ আজ সকালে তাঁকে যেন গল্পে পেয়ে বসেছে। বিমানকে তিনি তাঁর বম্বের জীবনের অনেক গল্প শোনাতে লাগলেন।

একটু পরে বাই এল। মালকোঁচা মেরে শাড়ি পরা একটি লম্বা লিকলিকে যুবতী। সে বেশ জোরে জোরে কথা বলে। তার মারাঠী ভাষা বিমান একবর্ণ বুঝতে পারে না, পরিতোষ কিন্তু বেশ জলের মতন মারাঠী বলেন। দুজনের মধ্যে কথায় কথায় খুনশুটি হয় তা বোঝা যায়।

বাইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে যেন একটুক্ষণ ঝগড়া করে পরিতোষ হঠাৎ বিমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা ওকে কুড়িটা টাকা দিয়ে দিও। তোমরা আসায় ওর কিছু কাজ বেড়েছে, সেইজন্য ওর মেজাজ খারাপ হয়েছে, ও ভেবেছে, সেজন্য বুঝি এক্সট্রা পয়সা পাবে না।

বিমান বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আজই দিয়ে দিচ্ছি।

পরিতোষ হেসে বললেন, না, না, এখনই দরকার নেই, তোমরা যেদিন চলে যাবে, সেদিন দিও। ততদিন একটু সাসপেন্সে থাক না।

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পরিতোষ আবার বললেন, এই মেয়েটার একটা গুণ আছে, একদিনও কামাই করে না। রোজ সকালে ঠিক আসে। আমি যদি এই ঘরের মধ্যে মরেও যাই, তাহলেও আমার বডি এই ঘরের মধ্যে পচবার চান্স পাবে না। ও এসে আমার সাড়া না পেলেই হল্লা তুলবে।

কাজরী এর মধ্যে ঘুম চোখে উঠে এসেছে। সে বলল, এ কী অলক্ষুণে কথা পরুদা? সক্কালবেলা।

পরিতোষের আজ বেশ মেজাজ ভালো আছে। এক গাল হেসে বললেন, কী রে তুইও উঠে পড়েছিস? দ্যাখ, আমার জ্বর ছেড়ে গেছে।

কাজরী বলল সত্যি?

কাজরী এগিয়ে এল পরিতোষের দিকে। তার শরীরে একটা অতি পাতলা নীল রঙের রাত পোশাক। মেয়েরা সাধারণত ঘরের বাইরে বেরুতে হলে এর ওপর আর একটা কিছু চাপিয়ে নেয়। কিন্তু কাজরী এখানে কারুকে বাইরের লোক মনে করে না।

রোদ্দুরের দিকে আসতেই কাজরীর সেই পাতলা পোশাক ভেদ করে শরীরের সবক'টি রেখা দেখা গেল। স্তনদুটি একে পরিষ্কার। সেদিকে তাকিয়ে বিমানই বরং একটু লজ্জা পেয়ে গেল।

পরিতোষ কিন্তু কাজরীর শরীরের দিকে একবারের বেশি তাকালেনই না। রেলিং ধরে চেয়ে রইলেন রাস্তার দিকে।

কাজরী কাছে এসে পরিতোষের গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তাঁর কপালে হাত রাখল। সত্যিই পরিতোষের কপাল ঘামে ভেজা, ঠান্ডা। একটু যেন বেশিই ঠান্ডা।

পরিতোষ কাজরীর শরীর-স্পর্শ থেকে একটু সরে গিয়ে বললেন, দেখলি তো, আমার নিজস্ব টোটকা আছে, ডাক্তার-ফাক্তার দেখাতে হয় না। জ্বর ফর নিজেই সারিয়ে ফেলি।

কাজরী অবিশ্বাসের সুরে বলল, অত ড্রিংক করা তোমার নিজস্ব টোটকা?

পরিতোষ বললেন, আমার ব্যাপার নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোরা নতুন বিয়ে করেছিস, তোরা নিজেদের নিয়ে থাক। তোরা আসবার আগে আমি যেমন ছিলাম, পরেও সেইরকমই থাকব।

সারা সন্ধে ঘুরে তিন জায়গায় বাড়ি দেখা হল। এর মধ্যে দাদারের ফ্ল্যাটটাই কাজরীর মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু ভাড়া একেবারে আকাশ ছোঁয়া। কোম্পনি যা হাউস রেন্ট দিচ্ছে, সেই টাকার মধ্যে বম্বে শহরের মধ্যে মনের মতন ফ্ল্যাট পাওয়া প্রায় অসম্ভবই মনে হচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে যাতায়াতের খরচ আর সময়ও খুব বেশি লেগে যাবে।

এখন বোঝা যাচ্ছে, কেন কলকাতা অফিসের সহকর্মীরা অন্য কেউ বম্বেতে ট্রান্সফার নিতে রাজি হয় না।

বিমান আর কাজরী কলকাতা ছাড়তে চেয়েছিল নিজেদের গরজে, ওরা পরিচিত লোকজনদের গন্ডি থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু বম্বেতে বাড়ি জোগাড় করাই তো বিরাট সমস্যা।

দাদার স্টেশনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বিমান বলল, সবচেয়ে সুবিধে হত কী জান? যদি তোমার পরুদা তাঁর ফ্ল্যাটের অর্ধেকটা আমাদের ভাড়া দিতেন।

কাজরী মৃদু গলায় বলল, সে তো জানিই।

বিমান বলল, তুমি একটু বুঝিয়ে দ্যাখো না। ভদ্রলোক যখন ভালো মুডে থাকবেন, তখন যদি ওর গায় মাথায় হাত বুলিয়ে রাজি করাতে পার, তাহলে আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকে না।

কাজরী বলল, তুমি কি ভাবছ আমি চেষ্টা করিনি?

এক মাস সতেরো দিন কেটে গেছে। ফ্ল্যাট পাওয়ার আশা সুদূর পরাহত। কথাটা কাজরীরই মাথায় এসেছিল আগে।

পরিতোষ এতবড় ফ্ল্যাটে একা থাকেন, কাজরীদের একখানা ঘর ভাড়া দিলে দু-দিক থেকেই সুবিধে। কাজরীদের আর বাড়ি খোঁজার দুশ্চিন্তা থাকে না। সময়ে অসময়ে পরিতোষকে দেখাশোনা করতে পারবে কাজরী আর বিমান। পরিতোষ প্রায়ই অসুখে ভোগেন, তাঁর পক্ষে এরকম একা থাকা মোটেই উচিত নয়।

কিন্তু কাজরী একদিন সকালে প্রস্তাবটা তোলা মাত্র পরিতোষ রুক্ষ্মভাবে বলেছিলেন, না, আমি ভাড়াফাড়া দেব না। কেন, তোদের কি আমি চলে যেতে বলেছি? এর মধ্যে টাকাপয়সার প্রশ্ন আসছে কী করে?

পরিতোষ ওদের চলে যেতে বলেননি বটে, কিন্তু নিজে আগ্রহ করে থাকতে বলেননি একবারও।

একমাস পার হওয়ার পর বিমানই নিজেই ভদ্রতা করে বলতে গিয়েছিল, আপনার এখানে দশ দিনের জন্য থাকব বলে এসেছিলাম, কিন্তু এখনও বাড়ি পাওয়া গেল না, আমরা খুব খোঁজাখুঁজি করছি অবশ্য।

পরিতোষ খকখক করে কাশতে-কাশতে উত্তর দিয়েছিলেন, ওইরকম খোঁজাখুঁজি করতে করতেই হঠাৎ একটা পেয়ে যাবে। মেয়েদের কি আর সহজে বাড়ি পছন্দ হয়।

এরকম কথা শুনলে একটু অপমানবোধ হয় না?

যেন বাড়িতে এতদিন অতিথি রাখার মোটেই ইচ্ছে নেই পরিতোষের। অথচ তার ক্ষতি তো হচ্ছে না। ঘরখানা এমনিই খালি পড়ে থাকে, একা মানুষ, বাড়িতে একজন পেয়িং গেস্ট কিংবা চেনাশুনা ভাড়াটে রাখলেই তো সবদিক থেকে সুবিধে!

কাজরী আর একদিনও পরিতোষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বাড়িতে তখন বিমান ছিল না, সেই দুপুরে কাজরীও বেরোয়নি, হঠাৎ সে শখ করে সেদিন রান্না করেছিল। সকালে বাজারে গিয়ে মাছ কিনে এনেছিল। পরিতোষকে সে বলেছিল, পরুদা, আজ কিন্তু তুমি হোটেলে খাবে না, আজ তোমার নেমন্তন্ন।

সেদিনও পরিতোষের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, স্নান করেননি দু-দিন। রান্না শেষ হওয়ার পর কাজরী বলেছিল, পরুদা, তুমি নোংরা থাকলে চলবে না কিন্তু। আজ দুপুরে আমরা একসঙ্গে খাব, তুমি দাড়ি কামাও স্নান কর।

পরিতোষ বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইছিলেন না, কাজরী প্রায় জোর করেই তাকে ঠেলে বাথরুমে পাঠাল। পরিতোষের পাঁচ-ছ'মিনিটের বেশি লাগে না। মাথায় একটু জল ঢেলে তিনি কাক স্নান সেরে নেন।

বাথরুম থেকে বেরুতেই দেখলেন, একখানা নতুন পাঞ্জাবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাজরী। মুখে তার লাজুক-লাজুক হাসি।

—পরুদা, আজ এটা তোমায় পড়তে হবে!

—কী ব্যাপার, নতুন পাঞ্জাবি পরব কেন? আজ কি আমার জন্ম দিন নাকি? উঁহু, না তো! আমার জন্মদিন ডিসেম্বরে।

—পরুদা, আজ আমার জন্মদিন।

—ওঃ হো, তোর জন্মদিন। বাঃ ভালো কথা। বয়েস বাড়লে আর জন্মদিন টন্মদিন না করাই

ভালো বুঝলি? লোকে আবার বয়েস জিগ্যেস করে বসতে পারে। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

—পরুদা, তুমি খালি গায়ে খেতে বসবে না। পাঞ্জাবিটা এখনই গায় দাও!

—তোর জন্মদিনে আমি নতুন পাঞ্জাবি পরব কেন রে? এঃ এই ক্যাটকেটে রঙের পাঞ্জাবি কিনেছিস! আমি যে সাদা ছাড়া পরি না।

—এই গোলপি রংটা তোমাকে মানাবে।

কাজরীর জোরাজুরিতে পরিতোষ নিজের ঘরে গিয়ে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে এলেন বটে। কিন্তু চুল আঁচড়ালেন না। বনমানুষের মতন তাঁর মাথার চারপাশ দিয়ে চুল ঝুলছে।

কাজরী একটা ভারী চিরুনি এনে পরিতোষকে প্রায় জড়িয়ে ধরে চুল আঁচড়ে দিল। তারপর তাঁর গালটা টিপে দিয়ে বলল, এই তো লক্ষ্মী ছেলে! দ্যাখো তো, কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আগেকার মতন। কেন ইচ্ছে করে এত বুনো সেজে থাক?

পরিতোষ নাক দিয়ে একটা ঘোঁৎ শব্দ করে বললেন, ভাত ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কী-কী রেঁধেছিস দেখি!

কাজরী বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার জন্মদিনে তোমাকে প্রণাম করা হয়নি!

হাঁটু গেড়ে বসে সে পরিতোষের দু-পায়ে প্রণাম করল। তারপর উঠে একেবারে পরিতোষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইল।

কাজরীর সতেরো বছর বয়েসে সাঁইত্রিশ বছর বয়স্ক বিখ্যাত পরিতোষ দাশগুপ্তকে এইরকম ভাবেই প্রণাম করতে গিয়েছিল তেতলার নির্জন ঘরে। পরিতোষের বুক ঘেঁসে দাঁড়িয়ে এরকমই উৎসুক চোখে সে দাঁড়িয়েছিল, তফাতের মধ্যে এই যে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল কাজরী। পরিতোষ তাতে দু-হাতে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল, এ কী তুই কাঁপছিস কেন?

তারপর তিনি কাজরীকে চুম্বন করেছিলেন। কাজরীর জীবনের সেই প্রথম চুম্বন। প্রথম একজন অনাত্মীয় পুরুষের শরীরের উত্তাপের স্বাদ পাওয়া।

এখন পরিতোষ কাজরীর উৎসুক মুখের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত, সরে গিয়ে খাওয়ারের টেবিল থেকে একখানা বেগুন ভাজা তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন লোভীর মতন।

খুব যত্ন করে টেবিল সাজিয়েছিল কাজরী। বিলিতি টেবল ম্যাট, দামি ক্রকারি, কাটলারি, ফুলের মতন ন্যাপকিন, এসবই কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে কাজরী। কাচের গেলাসের নতুন সেট। যুঁই ফুলের মতন দেরাদুন রাইসের ভাত।

এমনই অদ্ভুত মানুষ পরিতোষ যে পাঞ্জাবিটা উপহার দেওয়ার জন্য কাজরীকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাক খুশির ভাব দেখালেন না। কাজরী প্রণাম করার পর আশীর্বাদ করলেন না। এমনকি কাজরীর রান্না খেয়ে বিন্দুমাত্র প্রশংসা করার বদলে মাছের ঝোল মুখে দিয়ে তিনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, একী ঝোল রেঁধেছিস রে? ঝাল নেই মশলা নেই, এ যে একেবারে রুগির ঝোল। এ আমি খেতে পারি না!

কাজরী আহত হয়ে বলল, তোমার কি বেশি ঝাল মশলা খাওয়া ভালো?

পরিতোষ বললেন, হোটেলের রিচ রান্না খেয়ে-খেয়ে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। পাতলা ঝোল আমার মুখে রোচে না।

—তোমার ওই সব অভ্যেস এখন পালটাতে হবে পরুদা। সেই জন্যেই তো আমি এখানে থেকে যেতে চাই। তোমাকে চোখে-চোখে রাখব। তুমি নিজের কোনও যত্ন নাও না।

পরিতোষ হঠাৎ হা-হা করে হাসতে লাগলেন।

কাজরী বলল, তুমি হাসছ, পরুদা? তুমি পুরোনো কথা সব ভুলে গেলেও আমি তো ভুলিনি। আমি তোমাকে এরকমভাবে নষ্ট হতে দেব না।

কথাটা সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে নিয়ে পরিতোষ বললেন, আরে, তোর জীবনে অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে,

এখন একজনকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাততে চাইছিস, তোরা সুখে নিরিবিলিতে থাকবি, তার মধ্যে আমার মতন একটা বুড়ো হাবড়াকে কি মানায়? সেই ইংরেজিতে একটা কথা আছে না, টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড? আমাকে নিয়ে তোদের মাথা ঘামাতে হবে না। তোরা বাড়ি পেয়ে যাবি ঠিক!

কাজরীর মুখখানা আরক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মাছের ঝোলের নিন্দে করলেও পরিতোষ চেটে পুটে খেয়ে নিয়েছিলেন সবটুকু। তারপর নাক ডাকিয়ে একটা ঘুম দিলেন।

একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনে এনে বিমান বলল, আচ্ছা তোমার পরুদার এখন চলে কী করে বল তো? রোজগার তো কিছু নেই। এই ফ্ল্যাটটাই যা দেখছি ওঁর একমাত্র সম্পত্তি। এটার একটা অংশ ভাড়া দিলে তবু তো মাসে মাসে কিছু পাবেন। আমরা হাজার দেড়েকে পর্যন্ত দিতে পারি।

কাজরী বলল, পরুদা কিছুতেই ভাড়া দিতে রাজি নয়।

—বুড়ো অতি ঘোড়েল। বাড়িতে ওর কোনও বন্ধু-বান্ধবকে পর্যন্ত ডা'ক না। পাছে কেউ থাকতে চেয়ে বসে।

—একা থাকতে-থাকতে কোনও-কোনও মানুষের সেটাই সহ্য হয়ে যায়। পরুদার যে একেবারে রোজগার নেই তা নয়। নিজে আর চান্স না পেলেও এখনও মাঝে-মাঝে দু-চারখানা গানে সুর দেয়। আমায় একদিন বলেছিল। আসল ব্যাপারটা কী জান? যারা এখন খুব ব্যস্ত সুরকার, হাতে একসঙ্গে সাত-আটখানা ছবি, তারা সময় বাঁচাবার জন্য দু-একখানা গান খুব গোপনে পরুদাকে দিয়ে সুর করিয়ে নেয়। পরুদার নাম থাকে না, ওদের নামেই চলে, পরিতোষদাকে কিছু টাকা দেয়। আমাকে এরকম দু-তিনখানা গানের ক্যাসেট শোনাল। ভালোই হয়েছে কিন্তু তবু পরুদাকে কোনও প্রোডিউসার আর ডাকে না।

—একবার বদনাম ছড়ালে আর কেউ পাত্তা দেয় না। আমার কী মনে হয় জানো, উনি এরকম মাতাল বলেই কেউ আর ওঁর ওপর ভরসা রাখতে পারে না। বোম্বাইতে মেয়েঘটিত কোনও গোলমাল করেননি তো?

—এখানে তো কত লোকই ওই সব করে। তাতে গ্ল্যামার আরও বাড়ে। ওসব কিছু না। তুমি আরও লক্ষ করবে, উনি মাঝে-মাঝে দু-তিনদিন একটানা বেশ সোবার থাকেন। স্নান টান করে সকালে বেরিয়ে যান। সেই সময়ে উনি অন্য মিউজিক ডিরেক্টারের সঙ্গে কাজ করতে যান। ওঁর থেকে অনেক জুনিয়র তারা।

হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বিমান। দু-বার জোর করে কাশবার চেষ্টা করল।

উদ্বিগ্নভাবে কাজরী বলল, কী হল? কী হল তোমার?

বিমান বলল, বুক জ্বালা করছে। এত অ্যাসিডিটি হচ্ছে কয়েকদিন ধরে। সেই সঙ্গে উইণ্ডের চাপ। হোটেলের খাওয়া রোজ রোজ আমার সহ্য হচ্ছে না। তুমিও তো বাড়িতে রান্না করতে পারবে না।

কাজরী বলল, রোজ রান্না করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাধুনীগিরি করতে আমি পারব না।

—তোমাকে আমি বলেছি রান্না করতে?

—রাগ করছ কেন? আমি লাইব্রেরির কাজটা সম্ভবত পেয়ে যাব। রান্নার একটা লোক রাখতেই হবে।

কী করে রান্নার লোক রাখবে? বাড়ি ঠিক হলে তবে তো রান্নার লোক। সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছে ওই বুড়োটা।

—বাঃ, পরুদার সব দোষ হয়ে গেল? পরুদা যে আমাদের এই ক'দিন থাকতে দিয়েছে তাই তো যথেষ্ট। তোমার কম্পানি কোনও ফ্ল্যাট খুঁজে দিল? বম্বেতে তোমার চেনাশুনাও তো কারুকে বার করতে পারলে না?

—তুমিই তো বম্বে আসবার জন্য জোর করেছিলে। নইলে আমি কলকাতাতেই থাকতে পারতুম।

এর আগে কাজরীর সঙ্গে বিমানের কখনও ঝগড়া হয়নি। বিমান লাজুক, ভদ্র ধরনের মানুষ? খারাপ কথা তার মুখ দিয়ে কখনও বেরোয় না। সে চেঁচিয়ে কথা বলে না। আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে কাজরীকে বকাবকি করছে? কাজরী এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার চোখ জ্বালা করছে।

এক সময় সে ধরা গলায় বলল, তোমার কি বুকে এখনও ব্যথা করছে।

যন্ত্রণাটা দাঁতে-দাঁতে চেপে বিমান বলল, না। আই অ্যাম সরি, কাজরী। বম্বেতে আমিও আসতে চেয়েছিলুম, শুধু তুমি জোর করোনি। কিন্তু ছেলেটার জন্য মাঝে-মাঝে মন কেমন করে।

বিমানের আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে, কাজরীর আছে প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে। কাজরীর মেয়ে শান্তিনিকেতনে পড়ে, তার জন্য কি কাজরীরও মন কেমন করে না? কিন্তু বিমান আর কাজরী অনেক ভেবেচিন্তেই ঠিক করেছিল যে তাদের ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্যই তাদের এখন দূরে থাকা উচিত। বিয়ে না করে দুজনে একসঙ্গে থাকা কলকাতায় কি সম্ভব ছিল?

দাদার স্টেশনে ঢুকে বিমান বলল, আজ আর আমি হোটেলে খাব না। কিছুই খাব না। তুমি কোথাও খেয়ে নিতে পারও।

তাহলে কাজরীরও কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই। সেও উপোস দেবে। কিন্তু এইভাবে কতদিন চলবে? বিমান আবার রাগারাগি শুরু করে দেয়।

তখন কাজরীর আবার মনে পড়েই যায় যে, পরিতোষ ইচ্ছে করলেই তাদের এই সমস্যার সহজ সমাধান করে দিতে পারতেন। কাজরী তো বিনা পয়সায় থাকতে চাইবে না। তবু যে পরিতোষ কেন এমন গোঁয়ার্তুমি করছেন।

আরও দিন সাতেক কেটে গেল এইভাবে।

সব সময় একটা অনিশ্চয়তা। কাজরীর একটা চাকরি হতে হতেও হল না, তবে আর একজায়গায়, একটি প্রাইভেট কম্পানির রিসেপশানিস্ট হিসেবে কাজ পাওয়ার সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। কাজরী দেখতে শুনতে ভালো, ইংরেজি বলতে পারে ঝরঝর করে, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি তার যথেষ্ট। বম্বের কমার্শিয়াল জগতে তার স্থান পাওয়া শক্ত কিছু না, কিন্তু যারা তাকে কাজের সুযোগ করে দিতে চায়, তারা কাজরীর কাছ থেকে অন্য সুযোগও নিতে চায়। কাজরী সেইসব ফাঁদে কিছুতেই ধরা দেবে না। অশান্ত, ছন্নছাড়া জীবন তাকে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে, এখন সে চায় একটি নিভৃত সুখী সংসার। সবাইকে সে প্রথমেই জানিয়ে দেয় যে সে বিবাহিতা, সে তার স্বামীর মতামত না নিয়ে কোনও কাজ নিতে পারবে না। সন্ধের পর সে কারুর সঙ্গে দেখা করতেও পারবে না।

বিমানকেও খাটতে হচ্ছে বেশ।

নতুন এসেছে বলেই হয়তো সহকর্মীরা তাকে খাটাচ্ছে বেশি করে যখন তখন তাকে পাঠাচ্ছে পানবেল ফ্যাকটরিতে, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। এরই ফাঁকে-ফাঁকে চলছে বাড়ি খোঁজা। বিমান আর এ বাড়িতে কিছুতেই থাকতে চায় না। তার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। বিনা ভাড়ায় সে অন্যের বাড়িতে মাসের পর মাস থাকবেই বা কেন?

রাত্তিরের দিকে বিমান হোটেলের খাওয়ারের বদলে স্যান্ডউইচ খেতে শুরু করেছে। হালকা খাওয়ারের তার পেট ভালো থাকে।

কাজরী রান্না করতে কিছুতেই রাজি নয়। গিন্নিবান্নিদের মতন সারাদিন রান্নাঘরে কাটানো

তার মতে মোটেই আদর্শ সংসার করা হতে পারে না। সে চায় সন্ধেবেলা সে আর বিমান সেজেগুজে কোনও সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাবে, কিংবা একসঙ্গে বসে গল্প করবে, গান বাজনা শুনবে।

সকালবেলা যে বাইটি আসে তাকে কাজরী রান্নার ব্যাপারে সাহায্যের প্রস্তাব দিতেই সে একেবারে ফোঁস করে উঠেছিল। সে নাকি সকাল দশটার পর কোনও বাড়িতে কাজ করে না। তার নিজের সংসার আছে না?

পরিতোষের তুলনায় বিমান অনেক শক্ত সমর্থ পুরুষ, তাকে প্রায় যুবকই বলা যায়, সে অফিস ক্লাবে টেনিস খেলে, সাঁতার কাটে। পরিতোষের প্রায় জবু থবু অবস্থা, তবু দিনের-পর-দিন হোটেলের খাওয়ার খেয়েও তিনি দিব্যি আছেন।

কয়েকদিন যাবৎ পরিতোষ প্রায়ই সন্ধের সময় বাড়ি থাকছেন না। আবার খুব অত্যাচার শুরু করেছেন, বাড়ি ফেরেন সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায়। রাগের চোটে বিড়বিড় করে ফিলম জগতের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ধরে গালাগাল দেন, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গান শুরু করেন, সে গানের সুর আছে কথা নেই।

পানবেল ফ্যাক্টরি থেকে বিমান একদিন ফিরল রাত দশটায়। হঠাৎ যেতে হয়েছিল বলে কাজরীকে সে কোনও খবরও দিতে পারেনি। এ বাড়িতে টেলিফোনও নেই। কাজরী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিমান কখনও দেরি করেন না। কাজরী সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় রাস্তায় বেরিয়ে একটা দোকান থেকে ফোন করল বিমানের সহকর্মী আচারিয়াকে। কোনও কারণে সেদিন আচারিয়া অফিস যাননি, সে বিমানের কোনও খবর জানে না।

তবে আচারিয়া কাজরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এসে যাবে, কোনও চিন্তা নেই। তুমি এক কাজ করো না। তোমার যদি একা থাকতে খারাপ লাগে, তুমি তোমার হ্যাজব্যান্ডের জন্য নোট লিখে চলে এসো না আমার এখানে। দুজনে গল্প করা যাবে।

কাজরী তাতে রাজি হয়নি, আচারিয়ার চোখের দৃষ্টি তার যেন কেমন-কেমন লাগে। লোকটি ব্যাচিলর। তার কাছে কাজরী একা একা যাবে কেন?

বিমান একদিন হাসতে-হাসতে বলেছিল, বম্বেতে অফিসার মহলে সহকর্মীদের বউদের সঙ্গে প্রেম বা ফস্টিনস্টি করা অতি চালু রীতি। কেউ এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না।

কিন্তু কাজরী ওইরকম অনেক স্তর পার হয়ে এসেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিমানের জন্য প্রতীক্ষা করতে-করতে অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগল কাজরীর। এক সময় জল এসে গেল তার চোখে।

প্রথম দরজার আওয়াজ হতেই কাজরী দৌড়ে গিয়ে খুলে দিয়ে দেখল বিমানের বদলে পরিতোষ। আজও তিনি যথেষ্ট মাতাল হয়ে এসেছেন।

কাজরী পরিতোষের হাত ধরে আকুল ভাবে কেঁদে উঠে বলল, পরুদা, বিমান এখনও ফেরেনি। কোনও খবরও দেয়নি।

কান্না দেখে পরিতোষের নেশা কেটে যাওয়ার জোগাড়।

চোখ কপালে তুলে বললেন, কী বললি, বিমান ফেরেনি? এখন ক'টা বাজে? ওরে, বম্বেতে এখন তো সবে কলির সন্ধে। এগারোটা বরোটার আগে ক'জন বাড়ি ফেরে?

কাজরী বলল, পরুদা, আমার ভয় করছে।

পরিতোষ বললেন, ভয়? তুই কি ভাবছিস পাখি উড়ে গেল? নারে, বিমান অতি ভালো ছেলে। সে তোকে ছেড়ে যাবে, না, তোর মতন মেয়ে সে পাবে কোথায়?

—পরুদা, তুমি আমার সঙ্গে এখানে একটু বসবে?

—আরে মলো। আমি যে আজ অনেকটা খেয়ে ফেলেছি।

—তবু, একটু বসো। সত্যি আমার ভয় করছে, পরুদা।

মিনিট তিনেক পরেই দরজায় আবার শব্দ, এবার বিমানই ফিরেছে।

এত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর কষ্ট ছিল তবু বিমানকে চোখের সামনে দেখে কাজরী প্রথমে কোনও কথাই বলতে পারল না।

পরিতোষ বললেন, এই দ্যাখো, তুমি এত দেরি করে ফিরলে, তোমার বউ একবারে বিরহিনীর মতন কেঁদে কেটে ভাসাচ্ছিল। মেয়েটার এখনও বয়েস বাড়ল না।

বিমানও খবর দিতে পারেনি বলে লজ্জিত বোধ করছে। সে বলল, আর বলবেন না দাদা, হঠাৎ-হঠাৎ বাইরে পাঠাচ্ছে। আমি একেবারে ছুটতে-ছুটতে আসছি। আজ একেবারে ডগ টায়ার্ড। বসুন দাদা বসুন।

পরিতোষ বললেন না, তোমরা গল্প করো। আমি এখন শোব। আজ আবার একটা নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে, হাঁটুতে ব্যথা।

বিমান তবু বলল, বসুন। একটুখানি বসুন। এই কাজরী হুইস্কির বোতলটা নিয়ে এস প্লিজ, আর কয়েকটা গেলাস।

হুইস্কির নামে পরিতোষ খানিকটা দুর্বল হলেন।

গেলাস এনে কাজরী নিজেই তাতে হুইস্কি ঢালল। জল মিশিয়ে একটা গেলাস পরিতোষের হাতে তুলে দেওয়ার পর তিনি প্রথম চুমুক দিয়েই বললেন, কতখানি দিয়েছিস রে? এ যে পাতিয়ালা। আরও জল দে।

আগে থেকে নেশা থাকলে পরিতোষ আস্তে-আস্তে খেতে পারেন না। চার চুমুকে গেলাস শেষ করে দিলেন।

কাজরী আবার ঢালতে যেতেই তিনি বললেন, কম করে দিবি।

বিমান বলল, খান না! অনেক আছে।

পরিতোষ বললেন, কাল সকালে একটা গানের রেকর্ডিং আছে। এই গানটা হিট হবেই। কিন্তু নাম হবে অমুক শালার।

কাজরী বলল, পরুদা, তুমি গানটা শোনাও না!

কথাটা শুনে বোধহয় পরিতোষ হাসতে গিয়েছিলেন, তার বদলে কাশতে লাগলেন খুব। কাশতে-কাশতে পিঠ বেঁকে গেল!

কাজরী তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। বিমান বলল, এক ঢোঁক খেয়ে নিন, ঠিক হয়ে যাবে।

চুমুক দিতে খানিকটা কমল ঠিকই। পরিতোষ তারপর বললেন, আরে, আমার গলায় কী আর সুর আছে? সুরা দেবীর সঙ্গে সুরের যে বড় বিরোধ।

বিমান জিগ্যেস করল, আচ্ছা মেহেদি হাসান নাকি পাকিস্তানে....

গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে গেলাস শেষ হতে লাগল।

তৃতীয় গেলাসের পর পরিতোষের মতন মানুষ নিজে থেকেই বললেন, আমি আর খাব না যথেষ্ট হয়ে গেছে।

বিমান বলল, সে কি, আপনার কথা তো একটু জড়ায়নি। আর একটু নিন।

গেলাস উলটে দিয়ে পরিতোষ বললেন, নাঃ আজকের মতন শেষ। আগে অনেক খেয়েছি যে।

বিমানেরও নেশা হয়ে গেছে। সে পরিতোষের হাত ধরে টেনে বললেন, আর দাদা বসুন বসুন। আপনার গল্প শুনতে বেশ ভালো লাগছে আর একটু নিন প্লিজ, এক হাফ।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ কর্কশভাবে পরিতোষ বললেন, ছাড়ো। আমি জোর করা একদম পছন্দ করি না। গুড নাইট।

নিজের ঘরের দিকে এগুতে গেলেম তিনি। হঠাৎ হাঁটু দুটো আলগা হয়ে গেল, পায়ে কোনও

জোর নেই। দড়াম করে তিনি পড়ে গেলেন সোজা। মাথাটা ঠুকে গেল চৌকাঠে।

কাজরী আর বিমান দৌড়ে এসে ধরল তাঁকে।

পরিতোষ ফিসফিস করে বললেন, কী হল। অজ্ঞান হয়ে গেলুম নাকি? কী হল অ্যাঁ? আমায় তুলে ধর তো, দেখি প্যারালিসিস হয়েছে কি না। গায়ে সাড় নেই।

কাজরী আর বিমান দু-দিক থেকে ধরে তুলল তাঁকে।

পরিতোষ পা ঠুকে-ঠুকে দেখলেন। দুটো পা-ই অচল। একবার কাজরী আর একবার বিমানের দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকালেন তিনি। তারপর কাজরীর মুখে দৃষ্টি স্থির করে বললেন, আমি জানি তোরা কী ভাবছিস। তোরা ভাবছিস, আমি পট করে মরে গেলে তোরা ফ্ল্যাটটা দখল করে থাকতে পারবি। অ্যাঁ? বেশ মজা হবে, অ্যাঁ?

কিন্তু আমি সহজে মরছি না। হে-হে-হে-হে।

ওদের হাত ছাড়িয়েই তিনি দিব্যি থপথপ করে হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে। শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন দরজা।

কাজরীর মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। বিমানের চোখ দুটি হল রক্তবর্ণ।

যেহেতু সত্যিই বিমানের মনে এই চিন্তাটা বিদ্যুতের মতন খেলে গিয়েছিল, সেই জন্যই সে বেশি রেগে গিয়ে দাঁতে-দাঁত চেপে বলল, আর একদিনও এ বাড়িতে আমি থাকব না। যদি বাড়ি না পাই কাল থেকে কোনও হোটেলে চলে যাব।

হোটেলে অবশ্য দু-চারদিনের মধ্যে যাওয়া হল না।

একটু নেশার ঝোঁকে, রাগের মাথায় যা বলা যায়, পরদিন সকালে তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় অনেকবার। রাত্রিরে যা মনে হয় খুব সহজ, দিনের বেলা সেটাই মনে হয় অসম্ভব।

বিমানকে তার কম্পানি যা হাউজ রেন্ট অ্যালাওয়েন্স দেবে, তাতে বম্বের অতি সাধারণ কোনও হোটেলে আট-দশদিনের বেশি থাকা যায় না। তা ছাড়া হোটেলের জীবন আবার জীবন নাকি? সে রকম সংসারের স্বপ্ন নিয়ে কাজরী বম্বেতে আসেনি।

পরিতোষও তো সেই রাতে কথাটা নেশার ঝোঁকেই বলেছেন। পরদিন তাঁর ব্যবহারে কোনও তিক্ততার চিহ্ন পাওয়া গেল না। বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে উনি কাজরীর সঙ্গে টুকিটাকি কথা বললেন, তারপর নটার মধ্যে বেরিয়ে গেলেন পাট ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরে। আগের রাতে উনি অসুস্থ ছিলেন তা বোঝাই যায় না।

সেই রাতে তিনি আটটার মধ্যেই ফিরে এলেন, হাতে মস্ত বড় একটা কেক নিয়ে। সেটা কেউ তাঁকে উপহার দিয়েছে। এখনও কেউ-কেউ তাঁকে কিছু উপহার দেয়। দরজা খোলার পর বিমানকেই তিনি প্রথম দেখতে পেয়ে তার হাতে কেকটা তুলে দিয়ে বললেন, এটা তোমাদের জন্য এনেছি। আমার অনেক ব্লাড সুগার, মিষ্টি খাওয়া একেবারে বারণ!

বিমান সেটা প্রত্যাখান করতে পারল না, একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এই পাগলা বুড়োটার ধরন সত্যি বোঝা দুষ্কর।

পরিতোষ নিজের ঘরে গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে প্যাঁ-পোঁ শুরু করলেন। আজ তাঁর মদ খাওয়ার দিকেও ঝোঁক নেই।

এক সময় তিনি রাত্তিরের খাওয়ার চেয়ে জানালা দিয়ে হাঁক দিলেন হোটেলে। বারান্দায় একবার উঁকি মারলেন।

আজ আর বিমান কিংবা কাজরী বারান্দায় বসেনি। বিমান অফিসের লেখাপড়া করছে, কাজরী বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ইংরেজি উপন্যাস পড়ছে। পরিতোষ দরজার কছে এসে বললেন, এ একটা দেশলাই দে তো রে। সিগারেট ধরাতে পারছি না।

দেশলাই এর বদলে বিমানের একটা লাইটার নিয়ে এসে কাজরী বলল, এটা তোমার কাছে

রাখো।

কাজরীর মুখটা থমথমে, অন্যদিনের মতন সে পরিতোষের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসির ঝিলিক দিল না।

সিগারেট ধরাবার পর পরিতোষ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বললেন, টেলিফোন অফিসে আজ টাকা জমা দিয়ে এলুম বুঝলি। শিগরিই আবার কানেকশান দিয়ে দেবে।

কথাটা একটা ঘোষণার মতন, শুনিয়ে চলে গেলেন তিনি।

বিমান বিমূঢ়ভাবে কাজরীর দিকে তাকাল। এ কথাটার মানে কী? বিমানদের সে এ বাড়িতে রাখতে চায় না, তা হলে টেলিফোনের খবর শুনে তাদের কী লাভ? হঠাৎ আজ কেকটাই বা দিতে গেল কেন?

বনেদী ঘরের ছেলে বলে বিমানের অপমানবোধটা মিলিয়ে যায়নি। পরিতোষ যদি ভাড়া নিতে না চায়, কিংবা নিজের থেকে তাদের এ বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ না করে, তা হলে বিমান এ বাড়িতে আর কিছুতেই থাকবে না। হোটেলে না যাওয়া হোক, যে কোনও উপায়ে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বার করতেই হবে। পছন্দ হোক বা না হোক।

এতদিন পরিতোষের কছে কোনও লোকজন আসেনি, হঠাৎ একদিন বিকেলে দশ-বারোজন নারী পুরুষ এসে হাজির। সিনেমার লোক, না কোনও বাঙালি ক্লাবের লোক তা ঠিক বোঝা গেল না।

বারান্দায় অত চেয়ার নেই। পরিতোষের ঘর থেকে, কাজরীদের ঘর থেকেও দু-চারটে চেয়ার বার করতে হল। হোটেল থেকে চা ও খাবার এল বার দু-এক, সন্ধের পর মদের বোতল বেরুল, আড্ডা ও হই হল্লা চলল প্রায় রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। মনে হয় যেন পরিতোষ এক বিরাট বড়লোক।

কাজরী আর বিমান, দুজনেই ফিরেছে বিকেল-বিকেল। পরিতোষ ওদের দুজনের সঙ্গে তার অতিথিদের আলাপ করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু কাজরী সেখানে বেশিক্ষণ বসল না, একটু পরেই তারা বাইরে খাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল, ফিরল নটা আন্দাজ। তখন আড্ডা একেবারে তুঙ্গে।

কাজরী আর বিমান নিজের ঘরে ঢুকে বসে রইল।

ঘরের চেয়ার দু-খানা নেই, বিমানদের জানলার ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসা অভ্যেস, তাকে আজ বসতে হল বিছানায়। কাজরী জানলার ধারে দূরে সমুদ্র দেখতে লাগল।

পুরো অন্ধকার নয়, সমুদ্রের ওপর বিন্দু-বিন্দু আলো, অনেক দূরে একটা জাহাজ। শোওয়ার ঘর থেকে জাহাজ দেখা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। এইরকম একটা ফ্ল্যাট আজকাল ভাড়া নিতে গেলেই মাসে সাত-আট হাজার টাকা লেগে যাবে।

বিমান ক্ষুব্ধভাবে বলল, চেয়ারদুটো নিয়ে যাওয়ার মানে কী জানো, আমাদের নোটিশ দেওয়া।

কাজরী বলল, চেয়ার দুটো তো আমাদের নয়। বাড়িতে লোক এলে তো নিতেই পারেন।

বিমান বলল, এরপর কোনও একদিন খাটটা নিয়ে যাবেন।

কাজরী কিছু বলার আগেই বাইরের সবাই কী একটা মজার কথায় একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল। পরিতোষ আজ বেশ জমিয়েছেন। একটি মেয়ে গান ধরল।

ওদের চ্যাঁচামেচির জন্য বিমানদের কথা বলতে হচ্ছে ফিসফিস করে। বইতে মন বসছে না। ওরা যেন চোরের মতন বসে আছে।

কাজরী বলল, চল, আমরাও গিয়ে বাইরে বসি।

বিমান দৃঢ়ভাবে বলল, না।

কাজরী বলল, কেন, তোমার বোতলটাও নিয়ে চল। এখানে ভালো লাগছে না।

বিমান খাট থেকে নেমে দরজাটা টেনে ছিটকিনি দিয়ে দিল। তারপর ফিরে এসে জড়িয়ে ধরল কাজরীকে। যেন বাইরের ওই হল্লার প্রতিবাদে সে কাজরীর শরীরে মুখ লুকোতে চায়।

কিন্তু বিমানের কপাল কুঁচকে আছে বিরক্তিতে। ওদের সামনে দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় কাজরী খুবই লজ্জা পেয়েছে। এই অবস্থাতে প্রেম জমে না। কারুরই শরীর সেভাবে সাড়া দিচ্ছে না। মাঝপথে দুজনেই থেমে গেল। বিমান শুয়ে রইল পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে। কাজরী শাড়ি ঠিকঠাক করে উঠে গিয়ে ছিটকিনিটা নিঃশব্দে খুলে দরজাটা একটু ফাঁক করে দিয়ে এল।

পরদিন সকালেই পরিতোষের ধুম জ্বর। সেইসঙ্গে প্রবল কাশি। পরিতোষ বিছানা থেকে উঠতেই পারেননি, কাজরী তাঁকে চা দিতে গিয়ে দেখল পরিতোষ বেশ কাহিল হয়ে পড়েছেন।.

পরিতোষের কপালে হাত রেখে কাজরী মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল তোমার শরীর খারাপ, তবু কাল আবার এত অত্যাচার করলে?

পরিতোষ চোখ পিটপিট করে বললেন, এ যাত্রায়ও বোধহয় মরব না।

কাজরী কাতরভাবে বলল, পরুদা, তুমি আমাদের এত খারাপ ভাব?

পরিতোষ ফিক করে হেসে বললেন, আরে, এতে ভালো খারাপের কী আছে? এ সবই তো খেলা।

—আজও তুমি ডাক্তার ডাকবে না?

—বালিশের তলায় অনেক ওষুধ আছে। ডাক্তাররা ওইসব ওষুধই তো দেবে।

—তোমার পায়ের সেই ব্যথাটা?

—নেই। জ্বরটা কমলে বিকেলবেলা একটু বেরুব। জরুরি কাজ আছে।

—আজ প্লিজ বেরিও না, পরুদা। তোমার চোখ ছলছল করছে। অন্তত একশো তিন জ্বর।

কপাল থেকে কাজরীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে পরিতোষ আবার বললেন, এই সবই খেলা।

কাজরী বলল, পরুদা, কাল অত লোক এসেছিল তোমার কাছে। ওরা কারা?

—একটা বাঙালি ক্লাব, আমাকে প্রেসিডেন্ট করতে চায়। আমি অবশ্য রাজি হইনি। প্রশ্নই ওঠে না। ক্লাব-ফ্লাব আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

—রাজি হওনি? তবু তুমি ওদের অত খাওয়ালে, অতক্ষণ বাড়িতে বসিয়ে....

—ওই তো মজা। এরপর আবার এলে দুর-দুর করে তাড়িয়ে দেব। হঠাৎ কিছু নগদ টাকা পেয়েছি তো।

বারান্দা থেকে বিমান ডাকল, কাজরী! কাজরী!

পরিতোষ বললেন, যা, তোকে ডাকছে। রুগির ঘরে বসে থাকতে হবে না।

কাজরী বেরিয়ে আসবার পর বিমান গম্ভীরভাবে বলল, আমার জামার বোতাম পাচ্ছি না। তুমি ওই ঘরে এতক্ষণ কী করছিলে?

কাজরী বলল, পরুদার আজ আবার খুব জ্বর এসেছে। শরীরটা বেশ খারাপ।

কাজরীর চোখে চোখ রেখে বিমান বলল, মরবে?

কাজরী বলল, ছিঃ বিমান।

—ওই লোকটা বেঁচে থেকে কার কী উপকার হচ্ছে?

—আমি এই ধরনের কথা একদম শুনতে চাই না।

—তুমি ওই বুড়োর সঙ্গে অত যে ন্যাকামি করো তাতে কোনও লাভ হচ্ছে? দুপুরবেলা আমি যখন বাড়িতে থাকি না, তখন কি তুমি ওর সঙ্গে শুচ্ছো-টুচ্ছো নাকি?

কাজরী একটা পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে গেল। তার আগের দুজন স্বামীর কাছ থেকেও সে এ ধরনের কথা শুনেছে। পুরুষ যখন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে, তখনই তাদের হিংসা ঈর্ষা বেড়ে যায়।

কথাটা বলে আর বিমান দাঁড়াল না। পোশাক পালটাতে চলে গেল নিজেদের ঘরে। কাজরী শুকনো চোখ চেয়ে রইল রাস্তার দিকে। কাজরীর অন্য দুই স্বামীর তুলনায় বিমানের টাকাপয়সার

জোর কম, কলকাতায় ওদের যৌথ পরিবার, বিমানের আগের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা জট পাকিয়ে আছে, তবু বিমান মানুষ হিসেবে ওদের চেয়ে অনেক ভালো। তার কথাবার্তা ব্যবহার খুবই সুন্দর, বিশেষত ব্যবহারটাই তার সম্পদ। এই জন্যই সবাই তাকে পছন্দ করে।

বিমান আবার বেরিয়ে আসার পর কাজরী খুব শান্তভাবে বলল, তুমি যে-কোনও একটা ফ্ল্যাট ঠিক করো। আমরা আর এখানে থাকব না। আমরা দুজনেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছি।

বিমান গলা চড়িয়ে বলল যে ক'টা ফ্ল্যাট দেখেছি, কোনওটাই তুমি ইচ্ছে করে পছন্দ করনি। তুমি এখানেই থাকতে চাও। আমাকে জোর করে এখানে এনে তুলেছ তুমি।

কাজরী বলল, বিমান প্লিজ, এভাবে বোলো না। তুমি জানো আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না। আমার চোখের দিকে তাকাও, বলো জানো না? আমিও কি অনেক কিছু ছেড়ে আসিনি?

বিমান সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল টকটক করে।

তিনদিন বাদে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেল।

বিমানের অফিসেরই একজন বাঙালি সহকর্মী মলয় সিনহা কলকাতা অফিসে বদলি হয়েছে। তার ফ্ল্যাট বিমান অনায়াসে পেতে পারে। ভাড়াও দুঃসহ নয়। মেরিন ড্রাইভের কাছেই সেই বাড়ি, দারুণ ভালো পাড়া। সে বাড়ি থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

সঙ্গে-সঙ্গে দারুণ মন ভালো হয়ে গেল বিমানের। কাজরীকে এক্ষুনি খবরটা দিতে পারলে ভালো হত। কিন্তু ফোন তো করার উপায় নেই। ফ্ল্যাটটা পেতে অবশ্য দিন পনেরো দেরি হবে, তা ওই ক'টা দিন দাঁতে দাঁত চেপে থাকতেই হবে পরিতোষের সঙ্গে।

পরিতোষের অসুখ বেশ বেড়েছে। এবার সে সত্যিই বাঁচবে কি না, সন্দেহ। এর মধ্যে একদিন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, কাজরী ডেকে এনেছিল পাড়ার ডাক্তারকে। ডাক্তার বলেছেন, পরিতোষের লিভার খারাপ, ব্লাড প্রেসার খুব হাই, ব্লাড শুগারও সাঙ্ঘাতিক বেশি। এর মধ্যে পরিতোষ সিগারেট খাওয়া কমাননি।

বুড়োটাকে অন্তত পনেরোটা দিন বাঁচিয়ে রাখা দরকার। মরে তো মরুক, তার আগে বুড়োটা জেনে যাক, বিমান ওর ফ্ল্যাটের পরোয়া করে না। ওকে মুমূর্ষ দেখেও বিমানরা নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাবে। বিমান ওঁর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ করবে। পরিতোষ ভাড়ার টাকা নেননি, বিমান সেই টাকা শোধ করে দেবে।

মলয় সিনহা বলল, মিঃ মুখার্জি, আপনার প্রবলেম সলভ করে দিলাম তো? বাড়ির জন্য আর চিন্তা নেই। চলুন, আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চলুন। সন্ধেবেলা আপনার মিসেসকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে আসবেন। ভালো করে দেখে নেবেন।

বিমান খুব আগ্রহের সঙ্গে মলয়ের সঙ্গে যেতে রাজি হল।

মলয় সিনহা একটা সুইমিং ক্লাবের মেম্বার। সঙ্গে বার আর ডাইনিং হল আছে। মলয়ের চেষ্টায় বিমানও এই ক্লাবের মেম্বার হচ্ছে। কাজরী সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। ক্লাবে এলে উঁচু মহলের অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। এখানকার সমাজে যোগাযোগটাই তো বড় কথা।

সুইমিং পুলের পাশে-পাশে রঙিন ছাতার নিচে টেবিল চেয়ার পাতা। খাদ্য খাওয়ার আগে দু-এক পেগ খেয়ে গলা ভিজিয়ে, গা গরম করে নিতে হয়। গল্পে-গল্পে তিন পেগ জিন খাওয়া হয়ে গেল। বিমান আরও একটা হাফ নিল।

বেশ কয়েকজন সাঁতার কাটছে নীল রঙের জলে। ছাত্র জীবনে বিমান নাম করা সাঁতারু ছিল। জল দেখলেই এখনও তার মন আনচান করে। বম্বেতে এতখানি সমুদ্র, তবু ভালো বিচ নেই, সাঁতার কাটার সুবিধে হয় না।

বিমান বলল, সুইমিং ট্রাংক থাকলে খানিকটা সাঁতার কেটে নিতুম। তা হলে খিদেটা বেশ চাঙ্গা হত।

মলয় বলল, আমার সুইমিং ট্রাংক এই ক্লাবেই রাখা আছে। আপনি ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারেন। আপনার ফিট করে যাবে।

অতি উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বিমান বলল, তা হলে চেঞ্জ করে আসি? গেস্টরা অ্যালাউড তো?

মলয় বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি তো প্রভিশনাল মেম্বার। কোনও অসুবিধে নেই।

বিমান ভেতরে গিয়ে জামা প্যান্ট খুলে রেখে সুইমিং ট্রাংক পরে গায়ে একটা তোয়ালে জড়িয়ে ফিরে এল, অনেকদিন পর সাঁতার কাটবে। তার শরীরটা বেশ চনমনে লাগছে, জিনের নেশাও কাজ করছে মাথায়।

হাত দুটো মাথার ওপর তুলে বিমান বলে, দেখুন, মিঃ সিনহা। আমি ডুব সাঁতারে এই সুইমিং পুলটা পার হয়ে যাব।

ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিমান শুধু সেই ছোট্ট পুকুরটা নয়, পৃথিবীর সমস্ত দূরত্ব পার হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল তার সমস্ত খোঁজাখুঁজি।

মলয় কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পরও বিমানকে উঠতে না দেখে চোখ বড়-বড় করে এদিক ওদিক চাইল। তারপর শুরু করল হই-চই।

বিমানকে যখন তোলা হল, তখন সে ডাক্তারদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। তার ঠোঁটে যেন লেগে আছে একটা অব্যক্ত আর্তনাদ।

মলয় সিনহা এবং তার স্ত্রী দীপা কয়েকদিন কাজরীকে নিজেদের কাছে নিয়ে রেখেছিল। কলকাতায় বিমানের বাড়িতে খবর দেওয়া হতেই বিমানের ছোট ভাই এবং শালা ইভনিং ফ্লাইটে চলে এসেছিল বম্বেতে। বিমানের দেহ তারা নিয়ে গেল কলকাতায়। তার ছেলে শেষবার দেখবে না বাবাকে? ছেলেই মুখাগ্নি করবে।

কাজরীকে তারা সঙ্গে যাওয়ার কথা একবারও বলেনি। বরং তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল, কাজরী কলকাতায় গেলেও তাকে বিমানদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কাজরী বিমানের কে?

বিমানের শেষকৃত্য, তার লাইফ ইনসিওরেন্স, অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি এইসব কোনও কিছুরই ওপরেই কাজরীর কোনও অধিকার নেই। জীবিত বিমান ছিল কাজরীর সব কিছু, মৃত বিমান তার পরিবারের এবং বিবাহিত স্ত্রীর, যে স্ত্রীর সঙ্গে বিমানের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

কাজরী যেন একটা ঝাড় লণ্ঠন, সবই ঠিকঠাক আছে, তার চেহারা এখনও কত সুন্দর, শুধু আলোগুলো আর জ্বলছে না।

কান্নাকাটি করার চেয়েও কাজরীর যেন বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। অদ্ভুত বিস্ময়ভরা নিঃশব্দ তার দৃষ্টি। বিমানের ছোট ভাই এবং শালা জানত যে বিমানের আগে একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। অথচ বিমান সে কথা কাজরীকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি? বুকের ব্যথাকে সে অম্বলের জ্বালা বলে চালাত।

দীপাই জোর করে কাজরীকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে।

কিন্তু দীপা বম্বে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের এখন অনেক কাজ। একটা পুরো সংসার তুলে নিয়ে যাওয়া কি কম কথা? দীপার তিনটি ছেলেমেয়ে। এই ফ্ল্যাটটা বিমানের নেওয়ার কথা ছিল, এখন সেখানে কাজরীর একা থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

দীপাদের যাওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে, কাজরী বলল, আমি এবার বাড়ি যাব।

কাজরীর আবার বাড়ি কোথায়? তার মা-বাবা বেঁচে নেই, তেমন কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নেই তার, একমাত্র মেয়ে থাকে হস্টেলে। সে কলকাতায় ফিরে যাবে কার কাছে? তার দ্বিতীয় স্বামীর ঈর্ষার আগুনে জ্বলে তাকে চাবুক মারত। তার সঙ্গে আইনগত বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

মলয় একদিন কাজরীকে নামিয়ে দিয়ে গেল পরিতোষের বাড়ির সামনে।

সকাল সাড়ে নটা। পরিতোষ বিছানার ওপর হারমোনিয়াম নিয়ে একটা সুর তুলছিলেন মন দিয়ে। আজই জ্বরটা একেবারে ছেড়ে গেছে বলে তিনি দাড়ি কামিয়েছেন, চোখ বেশ পরিষ্কার, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট।

কাজরী তাঁর ঘরে আস্তে-আস্তে এসে চুপ করে দাঁড়াল। পরিতোষ একবার তাকে চোখ তুলে দেখে আবার হারমোনিয়াম বাজিয়েই চললেন। কাজের সময় তিনি কথা পছন্দ করেন না।

কাজরীও মন দিয়ে শুনতে লাগল সেই সুর। একটু বাদে সে বসল খাটের পাশে।

খানিকবাদে নতুন সিগারেট ধরাবার জন্য থেমে তিনি বললেন, ধরে রাখতে পারলি না? হারামজাদাটা তোকে ফেলে এরকমভাবে পালিয়ে গেল?

জল গড়িয়ে এল কাজরীর দু-চোখ দিয়ে। সে বলল, পরুদা, আমি অপয়া। আমার কাছে কেউ থাকে না। আমি কী দোষ করেছি জানি না, আমার ভাগ্যটা এরকমই।

পরিতোষ মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন, আমার তো কিছু হল না। তোরা ভেবেছিলি আমি টেঁসে যাব। অনেকেই তাই ভাবে। কিন্তু আমি বাবা সহজে জায়গা ছাড়ছি না।

পরুদা, আমি এখন কী করব?

—তোদের কেন এখানে থাকতে দিতে চাইনি জানিস? এতবড় ফ্ল্যাটটা পড়ে আছে, তার একখানা ঘর নিয়ে তোরা থাকবি, তাতে আমার কী ক্ষতি হত? বরং তোরা কিছু ভাড়া দিলে আমার সাশ্রয় হত, তাই না। তবু তোদের রাখতে চাইনি, কারণ, আমার হিংসে হত। হিংসে বুঝলি।

দেশলাইটার সব কাঠি শেষ হয়ে গেছে, পরিতোষ খাট থেকে নেমে রান্নাঘরে গেলেন দেশলাই খুঁজতে। সেখানেই পেয়ে গেলেন কাজরীর দেওয়া লাইটার। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লাইটারটা দেখতে-দেখতে তিনি মৃদু হাসলেন।

ফিরে এসে বললেন, তুইও যেমন বোকা। নতুন করে ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে সংসার পাততে চেয়ে কি কেউ পুরোনো ভালোবাসার নাকের ডগায় এসে ওঠে? তুই একসময় আমায় ভালোবাসতিস না? একসঙ্গে দুজন ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে কোনও মেয়ে সুখে বাস করতে পারে? নাকি আমাকে মানুষ বলে গণ্যই করিসনি! ওরে না হয় বুড়ো হয়ে গেছি, চেহারাটা নষ্ট হয়ে গেছে, জীবনে আমি ফেলইওর, তবু তো আমি পুরুষ মানুষ? না কি!

কাজরী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরিতোষের দিকে।

পরিতোষ কাজরীর মুখোমুখি বসে বললেন, আমি বাপু সবসময় সাফসুফ সত্যি কথা বলি। তোরা সুখি হবি, এইটাই আমি চেয়েছিলুম, সেই জন্যই তোদের দূরে সরে যেতে বলতুম রে। চোখের সামনে থাকলে সবসময় সহ্য করি কী করে? তুই ওই ছোকরার সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিবি, তা দেখে আমার কষ্ট হবে না? সে কথা কখনও ভাবিসনি, না? মাঝে-মাঝে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে আসতি, যেন বেড়াল ছানাকে আদর করা।

—না, পরুদা, না। সত্যি তোমার জন্য আমার কষ্ট হত।

—তোর কষ্ট দেখে আমার হত রাগ। ওই বিমান ছোকরাটাকে প্রথম দিন থেকেই আমার পছন্দ হয়নি, কিন্তু তার ওপর আমার রাগ ছিল না। সে ভালোমানুষের ছেলে, তার তো কোনও দোষ নেই। আমাকে কতটুকুই বা চেনে। সে তো ভাবতেই পারে, এই শালা বুড়োটা নিকেষ হলে ফ্ল্যাটটা পাওয়া যাবে, বেশ হয়। সে এরকম ভাবলে আমার বয়েই গেল। কারুর ইচ্ছেতে কি কোনও মানুষ মরে? কিন্তু তুই, তোকে কত ছোটবেলা থেকে আমি চিনি, তোকে স্নেহ করি, ভালোবাসি, তোর শরীরটা আমি চিনি, সেই তুই আমার চোখের সামনে একটা পুরুষ মানুষকে নিয়ে এলি ঘর করতে। তাও দু-দিনের জন্য এসে আর যাওয়ার নাম নেই। কুকুরের দিকে পাঁউরুটির টুকর ছুঁড়ে দেওয়ার মতন, মাঝে-মাঝে আমার গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে আসতি?

—পরুদা, পরুদা, আমি মরে যাব।

—মরবি কেন, বালাই ষাট, মরার কথা চিন্তা করতে নেই, নিজেরও না অন্যেরও না। মরব তো মরব, একদিন, ব্যস, ফুরিয়ে যাব, তাতে আর কী আছে? সব খেলাই তো একদিন না একদিন শেষ হয়। আগে থেকে অত চিন্তা করার কী আছে?

—আমি এখন কী করব পরুদা, তুমি বলে দাও।

—তুই চাকরি করবি?

—আমার মেয়ের পড়ার খরচ, সে তার বাবার টাকা নিতে চায় না।

—তোর একটা চাকরি আমি জুটিয়ে দিতে পারব, এখনও যেটুকু চেনাশুনো আছে, নিজে রোজগার করে মেয়েকে পড়াবি।

—কী চাকরি আমি করব? এত বড় শহরে, একা...একা....

—কাজরী আবার কান্নায় নুয়ে পড়তেই পরিতোষ দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাকে বুকের কাছে রেখে নিয়ে এলেন জানলার ধারে। আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, বিমানকে আমি মারিনি। সে মরেছে নিজের দোষে। নিজের শরীরটা নিজেকেই বুঝতে হয়। যেমন আমি বুঝি। নিজের চেয়ে আর ভালো কে বুঝবে। এমনকি ডাক্তাররাও সব বোঝে না। বিমানকে আমি মারিনি, কিন্তু আমি তোকে বড্ড চেয়েছিলুম রে! কিন্তু আমি ভদ্দরলোক, সেইজন্য ছুঁকছাঁক করি না। আমি চেয়েছিলাম হয় কাজরী ওই ছোকরাকে নিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাক, অথবা সে সম্পূর্ণ করে আমার হোক। বম্বে শহরে কত মেয়েছেলে আছে, একটু ডাকলেই ছুটে আসবে, কিন্তু কারুকে আমার পছন্দ হয় না। কিন্তু তুই...সেই ছেলেবেলায় আমার কাছে নিজে থেকে এসেছিলি, তোর বিয়ে ঠিক হওয়ার পর আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছিলি, সেসব ভুলে গেছিস? তোর জীবনে যখন পরে অনেক দুঃখ কষ্ট এসেছে, তখন একবার আমাকে বলতে পারিসনি, পরুদা, তুমি আমাকে নাও।

—আমি বুঝতে পারিনি। আমি সত্যি বুঝতে পারিনি।

—বুঝলে বিমানকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতিস তাড়াতাড়ি তাই তো? আমি কি বোঝাবার চেষ্টা কম করেছি? সে ছোকরার ভাগ্য নেই তো আমি কি করব? হার্টের রুগি কখনও সাঁতার কাটতে যায়? তাও মদ খেয়ে? হুঁ যত্ত সব।

—পরুদা, আমি বুঝতে পারিনি যে তুমি এতদিন পরেও আমার জন্য...

—তার কারণ আমি ভদ্দরলোক। আমি অন্যের কাছে থেকে একটা মেয়েকে কেড়ে নিই না। লুকিয়ে চুরিয়ে চুমুটা খাই না, হ্যারে মেয়েরা বুঝি ভুলে যেতে পারে? একবার যার সঙ্গে ভালোবাসা হয়েছিল, অন্য সব কিছু হয়েছিল, তার কথা মন থেকে একেবারে মুছে যায়?

—না, পরুদা, আমি ভুলিনি। আমি ভেবেছিলুম, তোমার এত বড় জগৎ, এত লোকের সঙ্গে চেনা, তুমিই আমার মতন একটা সামান্য মেয়ের কথা মনে রাখবে না।

—ওই দ্যাখ, সমুদ্র দ্যাখ, মানুষের মন সমুদ্রের থেকেও বড়। আয়, এবার কিছুদিন আমরা দুজনে খেলা শুরু করি। দ্যাখ, যদি আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারিস। এই ফ্ল্যাটটা এখন থেকে তোর।

—না পরুদা, ওরকম কথা বোলো না। তুমি আমাকে দয়া করতে পারবে না। আমি তোমার দয়া নেব না।

—পাগলি আর কাকে বলে। গবেট, ইডিয়েট। দিতে চাইছি ভালোবাসা, তাকে ভাবল দয়া। তবে শুধু ভালোবাসা দিলেই হয় না। ট্যানজিবল কিছুও দিতে হয়। না হলে ভালোবাসা টেঁকে না। ওই দ্যাখ না, ওই বিমান ছোকরা তোকে শুধু ভালোবাসাই দিয়েছিল, আর কিছু দেয়নি, সেইজন্য তুই ফাঁকিতে পড়ে গেলি। আমি ফ্ল্যাটটা তোর নামে রেজিস্ট্রি করে দেব।

—না পরুদা, তার দরকার নেই।

—তুই অন্য কোথাও যেতে চাস? তো যা! তোকে জোর করে ধরে রাখব নাকি ভেবেছিস? কখনও না। আমি আগে যেমন ছিলুম, তেমনই থাকব।

—আমি আর কোথায় যাব? আমার কেউ নেই। কিন্তু তুমি আমায় জোর করেই ধরে রাখ পরুদা। আমায় কোথাও যেতে দিও না। আমায় খুব শক্ত করে ধরে রাখ।

হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

পরিতোষ চমকে সেদিকে ফিরলেন, তারপর টেলিফোন না ধরে বাজতেই দিলেন। তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

তিনি বললেন, কতদিন পর টেলিফোনটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। আওয়াজটা নতুন-নতুন লাগছে না?

কাজরী মৃদুভাবে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

পরিতোষ বললেন, ঘরের কোণে-কোণে ঝুল জমেছে। বাথরুমের পাশে একটা ঝুল-ঝাড়া আছে বোধহয় দ্যাখ।

তারপর পরিতোষ আবার ফিরে গেলেন হারমোনিয়ামের কাছে। বাজাতে লাগলেন অন্য একটা সুর।

খেলা নয়

এক-একদিন ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে যায়। এক একদিন অনেক বেলাতেও বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। ঘুমের ধরনধারণ বোঝা খুব মুশকিল।

ধীমানের সকালবেলা কোনও তাড়া থাকে না। ধীরেসুস্থে সে তার প্রতিদিনের রুটিন শুরু করতে পারে। কিন্তু যে-দিন ভোর পাঁচটায় তার ঘুম ভাঙে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ভাবে, আরও তো ঘণ্টা দুয়েক অন্তত ঘুমিয়ে নেওয়া যেত! বিছানার যেদিকে তার বালিশ, তার ঠিক উলটোদিকের দেওয়াল-ঘেঁষা একটা আলমারির মাথায় রয়েছে একটা টাইমপিস। সময় দেখার পর ধীমান আবার পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

কিন্তু তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জেগে উঠেছে, আর ঘুমোবার উপায় নেই। ঘড়ির টিক-টিক শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ঘড়ি তো চব্বিশ ঘণ্টাই টিক-টিক করে, কিন্তু সেই শব্দটা অনেক সময়ই শোনা যায় না, অথবা খেয়াল হয় না, আর এক-এক সময় প্রতিটি মুহূর্ত পর্যন্ত শোনা যায়।

খাট থেকে নেমে পড়ল ধীমান।

অন্য দিন সাতটা-সওয়া সাতটায় সে ওঠে। ততক্ষণে খবরের কাগজ এসে যায়। ধীমান নিজেই চা বানিয়ে নিয়ে আবার বিছানায় ফিরে আসে। শুয়ে-শুয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে খবরের কাগজ পড়া তার বিলাসিতা।

আজ এই অতিরিক্ত দু-ঘণ্টা নিয়ে সে কী করবে? কাগজ আসতে অনেক দেরি। অনেকে ভোরবেলা হাঁটতে যায়, ধীমানের ওসব বাতিক নেই। সকালে উঠেই পোশাক পালটে জুতোটুতো পরতে তার ভালোলাগে না। স্নান করার আগে সে কিছুক্ষণ যোগব্যায়াম করে নেয়। রোজ কিছুটা ব্যায়াম করা ভালো, কিন্তু ভোরবেলা উঠেই যে ব্যায়াম করতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই! যেদিন সকালে ভুলে যায়, সেদিন বিকেলে সে ব্যায়াম করে। এই আটত্রিশ বছরেও ধীমানের শরীর বেশ সুস্থ, সবল। শরীরে মেদ জমেনি। অনেকে তাকে সুপুরুষই বলে, যদিও ধীমান নিজে জানে, তার নাক-চোখ-মুখ এমন কিছু কন্দর্পের মতন নয়। সাধারণ মানুষের মতন।

ধীমান বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা বড় ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলা, সামনে দুটো রাস্তার মোড়, মাঝখানে এক চিলতে পার্ক, ট্র্যাফিক আয়ল্যান্ডের বদলে সেই পার্ক বাচ্চাদের জন্য তৈরি হয়েছিল, একটা দোলনা আর ঢেঁক কুচকুচ ছিল, এখন সব ভেঙেচুরে গেছে, অনেকে সেখানে নোংরা ফেলে। রেলিং ভাঙা।

ওই পার্কটার দিকে এখন তাকাতেই ইচ্ছে করে না। ওদিকে চোখ পড়বে বলে ধীমান বারান্দাতেই আসে না বেশি। এ পাড়ার পুরসভার যিনি প্রতিনিধি, সেই প্রাণতোষবাবুর সঙ্গে ধীমান একবার দেখা করে বলেছিল, বাচ্চাদের ওই পার্কটা যাতে বাচ্চারা ব্যবহার করতে পারে, সে ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি? প্রাণতোষবাবু বলেছিলেন, নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। সত্যি তিনি রেলিং সারালেন, দোলনা-টোলনা বসাবার ব্যবস্থা করলেন। মাস ছয়েকের মধ্যে আবার রেলিং চুরি, দোলনা ভাঙা। ধীমান কি আবার প্রাণতোষবাবুকে বলতে যাবে নাকি? তিনি নিজের চোখে দেখতে পান না?

এর মধ্যেই বেশ আলো ফুটে গেছে। এত ভোরেও রাস্তা দিয়ে অনেক মানুষ যায় এ সময়েও। প্রাতঃভ্রমণকারীদের চেয়ে জীবিকাসন্ধানীদের সংখ্যাই বেশি। ঝাঁক-ঝাঁক স্ত্রীলোক এত সকালে যাচ্ছে কোথায়? একটু তাকিয়েই ধীমান বুঝতে পারল, এরা সব ঠিকে ঝি, আজকাল যাদের বলে কাজের মেয়ে। এরা তো গ্রামট্রাম থেকে ট্রেনে আসে, এখনই ট্রেন চলতে শুরু করেছে? কাছাকাছি বস্তি

তো নেই। পার্কসার্কাস স্টেশন থেকেও এই রাস্তাটা বেশ দূর। ওরা হাঁটতে-হাঁটতে আসে।

ঠেলাগাড়িও যাচ্ছে পরপর, তাতে টাটকা তরিতরকারি সাজানো। মাথায় করে তরকারির ঝুড়িও নিয়ে যাচ্ছে কেউ-কেউ। কাছেই বাজার। আরও কিছু লোক এমনি খালি হাতেই যাচ্ছে বেশ ব্যস্ত ভঙ্গিতে। এরা কোথায় যায় কে জানে!

ঠিকে ঝিরা তিনজন-চারজনের একটি দল বেঁধে কলকল করে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে। কী গল্প করে ওরা? যে-সব বাড়িতে কাজ করে ওরা, সেইসব বাড়ির কর্তা-গিন্নিদের সমালোচনা? ধীমান ভাবল, ওরা আমাদের সম্পর্কে ঠিক কি মনে করে, তা আমরা কোনওদিন জানতে পারব না।

একটি মেয়ে আসছে একা-একা। বছর ষোলো-সতেরো বয়েস হবে, আধ-ময়লা ডুরে শাড়ি পরা, বুকের কাছে হাত দুটি জোড় করা, পা ফেলছে আস্তে-আস্তে, মুখ নিচু। মেয়েটি এমন কিছু দর্শনীয় নয়, শুধু ওর হাঁটার ভঙ্গিটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেন গভীরভাবে অন্যমনস্ক। দু-দিন খুব বৃষ্টি হয়েছে, বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব, মেয়েটি সেইজন্যই বোধহয় বুকের কাছে হাত রেখেছে।

এক-একটা পাখি আছে, ওড়ার সময় ঢেউয়ের মতন দুলতে-দুলতে যায়। পাখিটা এমন কিছু দেখতে ভালো না হলেও তার সেই উড়ে যাওয়ার দোলানিটাই দেখতে ভালোলাগে। এই মেয়েটিরও হাঁটার ভঙ্গি এমন কিছু সুন্দর নয়, কিন্তু অন্যদের মতন নয়। রাস্তার অন্য মেয়েদের তুলনায় সে আলাদা, একা। হয়তো এত ভোরে তার জাগার ইচ্ছে ছিল না।

মেয়েটি চোখের আড়ালে চলে গেল।

তার একটু পরেই ধীমানের দরজার বেল বেজে উঠল।

ধীমান ভুরু কোঁচকালো। এত সকালে তার কাছে কে আসবে?

ধীমান একা থাকে। এতখানি বয়েস পর্যন্ত সে আর বিয়ে করে উঠতে পারল না। মাঝে-মাঝে ভাবে বটে বিয়ের কথা, কিন্তু ইচ্ছেটা তেমন জোরাল হয় না। একা থাকাই তার অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। সংসারী বন্ধুবান্ধবদের দেখে সে ভাবে, আমি অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে গেছি।

তার এক বন্ধু অনীশ নিজের মেয়েকে একটা বিশেষ স্কুলে ভরতি করবার জন্য পুলিশ কমিশনারকে পর্যন্ত ধরাধরি করেছিল। ধীমানের মুখে একটা বিতৃষ্ণার রেখা ফুটে ওঠে। ওসব ধরাধরি তার চরিত্রে একেবারেই নেই। আজকাল নাকি ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে ভবতি করাতে না পারলে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। ধীমান অন্যের ছেলেমেয়েদের আদর করবে, তার নিজের পিতৃত্বের শখ নেই!

ধীমান স্বাবলম্বী। অনেক পুরুষ ছেলেবেলা থেকেই এমনভাবে মানুষ হয় যে বাড়ির কাজকর্ম কিছুই করতে শেখে না। বাবা-মা শুধু লেখাপড়ার জন্যই তাড়া দেয়। ট্যাংরা মাছের সঙ্গে পাবদা মাছের কী তফাত তা পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শেখায় না। ধীমান যৌথ পরিবারে বর্ধিত হয়েছে, তাকে বাড়ির অনেক কাজ করতে হত। সে রান্না করতেও জানে। রান্না করতে ভালোবাসে। সেই জন্যই রান্নার কোনও লোক রাখেনি। নিজেরটা নিজেই রান্না করে নেয়। মাঝে-মাঝে বাইরে খায়।

শুধু বাসন মাজা, ঘর মোছার জন্য একজন বয়স্কা ঠিকে ঝি আছে। তাও একবেলার জন্য। ধীমানদের বহরমপুরের বাড়িতে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই-বোন মিলিয়ে ছিল এগারো জন, সবসময় হইচই লেগেই থাকত। এখন ধীমান একা থাকাটা বেশ উপভোগ করে।

বয়স্কা ঝিটি আসে সাধারণত সাড়ে সাতটার সময়। তার আগে কেউ তো বেল দেয় না।

ধীমান দরজা খুলে একটু অবাক হল।

রাস্তায় যে-মেয়েটিকে সে বিশেষ লক্ষ করেছিল, সেই মেয়েটি। সেই ময়লা ডুরে শাড়ি পরা, বুকের কাছে হাত। মুখে এটা ম্লান ছায়া। পোশাকে গরিব মনে হলেও ঠিক যেন ঝি শ্রেণির মনে হয় না। ভুরুর রেখায় কিংবা ঠোঁটে কিংবা কোথায় যেন ভদ্র পরিবারের একটুখানি চিহ্ন

লেখা আছে।

ধীমান জিগ্যেস করল, তুমি কে?

মেয়েটি মিনমিন করে বলল, মাসির খুব অসুখ, জ্বর আর বমি, ক'টা দিন আমি এ বাড়ির কাজ করে দেব।

তাহলে ঝি শ্রেণিরই মেয়ে?

কলকাতার ভদ্র শ্রেণির বাঙালিরা সব 'স'-কেই তালব্য 'শ'-এর মতন উচ্চারণ করে। যেমন, মাশি, মিশ্‌টি, বৃশ্‌টি। আর কিছু শ্রেণির মানুষ বলে মাস্‌সি, মিস্‌টি, বিস্‌টি! এই মেয়েটি কিন্তু মাসিকে মাশি বলল। অছুক নয় অশুখ।

দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে ভেতরে ঢুকতে দিল ধীমান। তারপর জিগ্যেস করল, তোমার মাসি তো আসে সাড়ে সাতটায়, তুমি এত সকাল-সকাল এলে কেন?

মেয়েটি সরাসরি ধীমানের দিকে তাকাচ্ছে না। মাটির দিকে চেয়ে বলল, আমি আর-একটা বাড়িতে কাজ করি...

তারপর সে এমনভাবে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, যেন এই ফ্ল্যাটটা তার চেনা। তার মাসি নিশ্চয়ই তাকে সব কাজের কথা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কয়েকদিনের জন্য বদলিতে যারা আসে, তাদের কাজ খুব দায়সারা হয়। এ মেয়েটির মুখ দেখলেই মনে হয়, সে খুবই অনিচ্ছুকভাবে এসেছে। কাজের মেয়েদের ওপর খবরদারি করার অভ্যাস নেই ধীমানের, সে খুঁতখুঁতেও নয়, সে আর মনোযোগ দিল না।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সে একটা বই খুলে বসল। ধীমান বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। প্রতি সপ্তাহে একটি-দুটি বই কেনে, পড়া হয়ে গেলে তার বই অন্যদের বিলিয়ে দেয়।

মিনিট দশেক পরেই রান্নাঘরে একটা ঝনঝন শব্দ হল। একটা বড় কিছুই ভেঙেছে। খুব সম্ভবত ভাত খাওয়ার প্লেট।

নতুন জায়গায় এলে সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক বুঝে নিতে কিছুটা সময় লাগে। এ মেয়েটির বয়স কম, এখনও ঝি-গিরিতে ঠিক অভ্যস্ত হয়নি। একটা প্লেট ভাঙলে কিছু আসে যায় না। ধীমান মাঝে-মাঝে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, তার ওরকম প্লেট আছে আটখানা। একটা কমে গেল।

চায়ের কাপে কিংবা খাওয়ার প্লেটে সামান্য একটা ফাটা দাগ দেখা গেলে বা চলটা উঠলেই ধীমান সেটা ফেলে দেয়। ভঙ্গুর জিনিস কখনও-না-কখনও তো ভাঙবেই। মাঝে-মাঝে ডিজাইনটা বদলালেও ভালো লাগে। ধীমান এজন্যই স্টেইনলেস স্টিলের বাসন ব্যবহার করে না। সেগুলো একেবারে অজর, অমর। সারাজীবন একই থালা-বাটিতে খাওয়ার কোনও মানে হয়?

বইয়ের একটা পৃষ্ঠা ওলটাতে গিয়ে ধীমানের খেয়াল হল, আর কোনও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সারা ফ্ল্যাট একেবার নিস্তব্ধ। আর একজন মানুষ ঘোরাফেরা করলে, কাজ-কর্ম করলে কিছু-না-কিছু শব্দ তো হবেই। মেয়েটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল নাকি?

বই মুড়ে রেখে ধীমান এসে রান্নাঘরে উঁকি দিল।

প্লেটের ভাঙা টুকরোগুলি ঝাঁট দিয়ে এক কোণে জড়ো করা। মেঝেতে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে মেয়েটি। পিঠটা একটু-একটু কাঁপছে।

ধীমান কিছু বলার আগেই, তার উপস্থিতির উত্তাপ পেয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। অদ্ভুত ভয়, লজ্জা আর অসহায়তা-মাখা সেই মুখ, যেন শিকারির উদ্যত তিরের সামনে একটি কোণঠাসা হরিণী।

দুটি চোখ জলে-ভেজা, মেয়েটি আর্তগলায় বলল, আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি...হাত থেকে হঠাৎ...আপনি মাইনে থেকে কেটে নেবেন...

বাড়ির কাজের লোকেরা কোনও জিনিসপত্র ভাঙলে গৃহিণীরা সাধারণত বকাবকি করে। বাংলো

সিনেমায় এরকম দেখা যায়। ওসব পুরোনো আমলের ব্যাপার।

আদিখ্যেতা দেখানো ধীমানের স্বভাব নয়। সে শুধু বললে, ঠিক আছে, কিছু হয়নি—

মেয়েটি তবুও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন ভয় পেয়ে তার শরীরের জোর চলে গেছে, সে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না।

একটি ষোলো-সতেরো বছরের ভীতচকিতা মেয়েকে একজন আটত্রিশ বছরের যুবকের উচিত এই অবস্থায় হাত ধরে তোলা। দু-একটা নরম বাক্য বলা। কিন্তু একটি কাজের মেয়ে অর্থাৎ ঝি-এর হাত ধরেন না বাড়ির কর্তা, ধরলে তার অন্য অর্থ হয়।

ধীমান ওসব হাত ধরাটরার মধ্যে নেই।

সে গম্ভীরভাবে বলল, রান্নাঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নাও, তারপর ঘরগুলো মুছে দিও!

ফিরে গিয়ে ধীমান বই নিয়ে দু-শতাব্দী পরের কাহিনিতে চলে গেল।

সে ভেবেছিল চা বানিয়ে ফেলবে, কিন্তু অনেকক্ষণ তার আর খেয়ালই রইল না।

আবার একটা শব্দ পেয়ে সে মুখ তুলে তাকাল। বালতি ভরতি জল ও স্পঞ্জের ন্যাতা হাতে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। যেন সে অনুমতি চাইছে।

গল্পের বইয়ের রেশটা কাটাবার জন্য কয়েক পলক মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল ধীমান। তারপর জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

মাটির দিকে তাকিয়ে সে বলল, ইনু।

এটাই ওর একমাত্র নাম, না আর একটা ভালো নাম আছে? পদবি বলল না। এই বয়সি মেয়েরা হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে। হায়ার সেকেন্ডারি পড়া কোনও মেয়েকে নাম জিগ্যেস করলে সে বলবে, শ্রীপর্ণা ঘোষ কিংবা শিউলি দাশগুপ্ত কিংবা ঋতুপর্ণা মুখার্জি। কাজের মেয়েদের পদবি থাকতে নেই। অনেকের নামও থাকত না আগেকার দিনে। বহরমপুরের বাড়িতে অনেক কালের পুরোনো দাসীটিকে সবাই বলত পুঁটির মা। সেই পুঁটিকে কেউ কখনও দেখেনি, পুঁটির মায়ের নামটাও কেউ জানে না।

ধাঙড় বা মেথরের বদলে আজকাল বলে জমাদার। যে-জমাদারটি দুদিন অন্তর বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে ধীমান তার নাম জানে না। নাম ধরে ডাকার কখনও প্রয়োজনও হয় না। ধোপা আসে প্রতি রবিবার। তার কী নাম কে জানে? শ্রেণিবিভেদ এখনও এত তীব্র যে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের নাম না জেনেও আমরা দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি। তাতে আমাদের মানবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না।

ধীমান একবার ভাবল জিগ্যেস করবে, তোমার পুরো নাম কী?

কিন্তু জিগ্যেস করল না, ইনুকে ঘর মুছতে দিয়ে সে রান্নাঘরে চা বানাতে চলে গেল।

ইনুর যে মাসি এখানে নিয়মিত কাজ করে তার নাম চপলা। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, ধীরস্থির, কম কথা বলে। বিভা ওকে পাঠিয়েছিল। আড়াই-তিন বছর কাজ করছে, আগে কখনও কামাই করেনি। মানুষের তো তিন বছরে একবার অসুখ হতেই পারে।

ধীমান রোজ প্রায় কেটলি ভরতি চা বানায়। নিজে খায় প্রায় তিন কাপ, বাকিটা কেটলিতেই থাকে, চপলা এসে গরম করে নিয়ে খায়, আগের রাতের বাসি রুটি কিংবা বিস্কুটও বরাদ্দ থাকে তার জন্য। কাজের লোকদের কিছু খেতে দিতে হয়, চপলা নিজেই নিয়ে নেয় নিজেরটা।

ধীমান বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছে। ইনু কাজ শেষ করে এসে বলল, আমি যাচ্ছি।

ধীমান বলল, কেটলিতে চা আছে, খেয়ে নাও।

ইনু বলল, আমি চা খাই না।

ধীমান বলল, রুটি-ফুটি কিছু নেই, হলদে রঙের টিনটায় বিস্কুট আছে, কয়েকটা নিয়ে নাও।

ইনু বলল, আমি কিছু খাব না, যাচ্ছি।

ধীমান ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এর কোনও লোভ নেই দেখা যাচ্ছে। মাসিকে মাশি বলে। মুখের রেখায় ভদ্র পরিবারের ছাপ। এর তো বাড়ি-বাড়ি দাসীগিরি করার কথা নয়।

কিছু জিগ্যেস করলেই নিশ্চয়ই একটা দুঃখের গল্প শুনতে হবে। পারিবারিক বিপর্যয় অথবা দুর্ঘটনা অথবা বঞ্চনার কাহিনি। এরকম হাজার-হাজার করুণ গল্প আছে। ধীমানের শুনতে ইচ্ছে করে না। শুনেও তো কিছু প্রতিকার করতে পারবে না সে। ধীমান বলল, ঠিক আছে, যাও।

॥ দুই ॥

অফিসে ধীমানকে বেশ খাটতে হয়। তাদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি বিদেশি ব্যাঙ্কের গাঁটছড়া বাঁধা আছে, ধীমানকে সামলাতে হয় সেই দিকটা। ধার পুনরুদ্ধারের দায়িত্বও তার। এইসব কাজে তাকে প্রায়ই সাড়ে পাঁচটা-ছ'টা পর্যন্ত থাকতে হয়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে ধীমান বাড়ি ফেরে না। সারা দিনের মধ্যে একমাত্র সন্ধেবেলাটাই একা থাকা কষ্টকর। বুড়োদের মতো ধীমানের টিভি প্রোগ্রাম দেখার বাতিক নেই। বাড়িতে তার জন্য কেউ অপেক্ষা করেও থাকে না।

অফিসের পর ধীমানের তিনটি যাওয়ার জায়গা আছে। অনীশের ফটোগ্রাফি স্টুডিওতে বেশ একটা আড্ডা হয়। অনীশের ফিলম ডেভেলপিং আর প্রিন্টিং-এর ব্যবসাটা ভালোই চলে, তা ছাড়া অনীশ অনেক বাংলা-হিন্দি সিনেমায় স্টিল ফটোগ্রাফারের কাজ করে। সেই জন্যই তার কাছে ফিলমের লোকেরা আসে। এছাড়া ধীমান যেতে পারে, সুভাষ-বিভার বাড়িতে, যে-কোনও সময়। দু-তিনদিন না গেলে বিভা রাগ করে। ধীমান একটা ক্লাবেরও মেম্বার, সেখানে ধীমানের একটা তাস খেলার বন্ধুর দল আছে। তাস খেলা মানে তাসের জুয়া। তবে সাঙ্ঘাতিক কিছু জুয়া নয়। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খেলা, আজ যে হারে কাল সে জেতে, কেউই খুব একটা হারে না। ধীমানের রক্তে একটা জুয়াড়ির ভাব আছে, পরপর কয়েক বার হারলেই তার জেদ চেপে যায়। তিন তাসে সে ব্লাইন্ড খেলে।

তাসের আড্ডাটা অবশ্য রাত আটটার আগে শুরু হয় না। সেজন্য আগে খানিকটা সময় কাটাবার জন্য সে অনীশের কাছে কিংবা সুভাষ-বিভার বাড়িতে যায়। আজ বিভা অফিসে ফোন করেছিল দুপুরে, সে চিংড়ি মাছের কচুরি বানিয়েছে, ধীমানকে যেতেই হবে একবার।

আজকাল পত্রপত্রিকায় নানান রকমের রান্নার সচিত্র প্রণালী বেরোয়। অনেক বাড়িতে এজন্য খরচ বেড়ে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নতুন কিছু রান্না হলেই ধীমানের ডাক পড়ে। সবাই ভাবে, আহা, ও বেচারি বিয়ে করেনি, নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খায়, কী যে খায় কে জানে! ধীমানের অবশ্য ধারণা, অনেক বন্ধুর স্ত্রীর চেয়েই সে ভালো রান্না করে।

সার্দান এভিনিউ ছেড়ে একটু ভেতরে, কেয়াতলায় সুভাষ-বিভার বাড়ি। দোতলা, সামনে একটু বাগান। এরকম বাড়ি কলকাতা শহরে আর বিশেষ টিকে নেই। কিন্তু সুভাষের এই পৈতৃকবাড়ি নানা প্রলোভনেও বিক্রি করার কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। সুভাষের অবস্থা সচ্ছল, একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সে অংশীদার।

বন্ধুমহলে সুভাষ-বিভার নাম দুটি একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সিনেমা-থিয়েটারে, পার্টিতে, ক্লাবে ওদের সব সময় একসঙ্গে দেখা যায়। অনেক স্বামী-স্ত্রী সব জায়গায় একসঙ্গে যেতে পারে না, কিন্তু বিভাকে বাদ দিয়ে সুভাষ কোথাও যায় না। সুভাষের নিজের তেমন ব্যক্তিত্ব নেই, সে যে বিভার ছায়া।

অনেকে অবশ্য জানে, এই দম্পতির মাঝখানে ধীমানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু

সেই ভূমিকাটি যে সঠিক কী, তা যেন ধরা যায় না। অবৈধ সম্পর্কের কথা ভেবে অনেকেই কৌতূহলে শোঁকাশুঁকি করেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত তার ঠিক কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিভার চরিত্রে এমন সারল্যের জোর আছে যে তার সামনে এই ধরনের সন্দেহের কোনও ইঙ্গিতও কেউ দিতে সাহস পায় না।

গেট ঠেলে ধীমান ভেতরে ঢুকে এল। একতলায় সুভাষের এক দূর-সম্পর্কের পিসি তার দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে থাকেন, দোতলাটা বিভার নিজস্ব। ওদের একটি মাত্র ছেলে পড়ে দার্জিলিং-এর কনভেন্টে।

সুভাষের পিসির ছেলেটির নাম নিরঞ্জন, পড়াশুনো বিশেষ করতে পারেনি, হায়ার সেকেন্ডারিতে দুবার ফেল করে অন্য পাড়ার কিছু বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল। লেকের পিছন দিকে কিছু ছেলে গুন্ডামি করে বেড়ায়, প্রথমে তারা সাধারণ ছিনতাইতে হাত পাকায়, তারপর ওয়াগান ব্রেকার হয়। নিরঞ্জন এরকম একটা দলে ভিড়ে গিয়ে প্রায় গুণ্ডা হতে যাচ্ছিল, এই সময় ধীমান পোর্ট কমিশানে তার একটা চাকরি জুটিয়ে দেয়।

চাকরির এমনই মহিমা, এবং সে চাকরিতে যথেষ্ট ওভার টাইম এবং কিছু ঘুষের সুযোগ আছে বলে উপার্জনও ভালো, তাই নিরঞ্জন আবার ভদ্র শ্রেণিতে ফিরে এসেছে। সে আর লেকের ধারে যায় না, বাঁ-হাতের লোহার বালা খুলে ফেলেছে, আগে সিগারেট টানত মুঠো করে, এখন বাবুদের মতন দু-আঙুলের ফাঁকে রাখে। তার জন্য পাত্রী দেখা চলেছে।

ধীমান সামান্য চেষ্টাতেই নিরঞ্জনের চাকরিটার বন্দোবস্ত করে দিতে পেরেছিল। কিন্তু তাতেই পিসিমা আর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে এমনই কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে যে ধীমানকে দেখলেই জোর করে নিজেদের ঘরে একটুক্ষণের জন্য অন্তত টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং পেড়াপিড়ি করে দোকানের সন্দেশ বা রসগোল্লা খাওয়াতে চায়। ধীমান এতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে এবং বারবার কৃতজ্ঞতার কথাও সে শুনতে চায় না।

সেইজন্যই এ বাড়িতে সন্ধের সময় চুপি-চুপি ঢুকে ধীমান প্রায় দৌড়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

বিভাকে যখনই দেখা যায়, তখনই মনে হয় যেন এইমাত্র স্নান করে এল। তার মুখখানা এমনই পরিষ্কার।

দোতলার বারান্দাটি আগাগোড়া গ্রিল দিয়ে ঘেরা, সেখানে একটা বেতের চেয়ারের সেট। ধার দিয়ে-দিয়ে ফুল গাছের টব, খুব যত্ন করে ফুল ফোটায় বিভা।

হালকা রঙের একটা টাঙ্গাইল শাড়ি পরে বসে আছে বিভা। চুল খোলা, মুখটা একটু ঝুঁকিয়ে সে একটা পত্রিকা পড়ছে। যখনই সময় পায়, সে কিছু না কিছু পড়ে।

ধীমানকে দেখে সে মুখ তুলে মিষ্টি করে হাসল।

ধীমান একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বলল, এত কম আলোতে তুমি পড়ো কেন?

পত্রিকাটি মুড়ে রেখে বিভা বলল, তুমি কাল আসোনি। কাল সন্ধেবেলা কী করলে?

ধীমান বলল, কাল...কাল তো আসবার কথা ছিল না এখানে। তোমরা কাল চন্দননগর গিয়েছিলে...আমি কাল অফিস থেকে বেরিয়ে, ও মনে পড়েছে, এয়ারপোর্টে গেলাম।

—এয়ারপোর্টে কেন?

—শেখরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল থিয়েটার রোডে। শেখর মানে, তোমাদের শেখর, সুভাষদার পিসতুতো ভাই। এক সময়ে আমরা একসঙ্গে সাউথ ক্লাবে টেনিস খেলতাম। আমি যখন হায়দ্রাবাদে কিছুদিন ট্রেনিং-এ ছিলাম, তখন শেখরও কাজ করত ওখানে। ইদানীং যোগাযোগ ছিল না অনেকদিন। শেখর ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে হুইস্কি কিনছিল একটা দোকান থেকে। সেই ট্যাক্সি নিয়েই এয়ারপোর্টে গিয়ে দিল্লির ফ্লাইট ধরবে। আমাকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে নিল।

—শেখর কলকাতায় থাকে? এ বাড়িতে অনেক দিন আসেনি তো।

—দিল্লি-কলকাতায় যাওয়া-আসা করে প্রায়ই। সীতা ট্রাভেলস-এর ডেপুটি ম্যানেজার হয়েছে। এয়ারপোর্টে গিয়ে শুনলাম প্লেন আড়াই ঘণ্টা লেট। শেখর আমাকে ছাড়তে চাইল না। দোতলার রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দিলাম।

—কখন বাড়ি ফিরলে?

—দশটা কুড়ি-পঁচিশ।

—খেলে কোথায়?

—এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁতেই তো দু-তিনরকম স্ন্যাক্স খেয়েছিলাম, বাড়িতে ফিরে আর কিছু খাইনি।

—নেশা হয়েছিল?

—না, না, মাত্র তিন পেগ। শেখর অবশ্য বেশি খেয়েছে। খুব বকবক করছিল। নানারকম উলটোপালটা কথা। ওর দ্বিতীয় বিয়েটাও বোধহয় টিকবে না।

—বাড়ি ফিরে তুমি কী করলে?

বিভার এটাই অভ্যেস। সে ধীমানের প্রতিদিনের খবর জানতে চায়। ধীমানের জীবন যেন তারও জীবনের অঙ্গ।

ধীমান বলল, রেকর্ড প্লেয়ারে একটা ক্যাসেট চালিয়ে, হাতে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বিভা মুচকি হেসে বলল, তারপর কী ঘটল আমি জানি, ক্যাসেটটা এক সময় থেমে গেল, আলো জ্বলতে লাগল, বইখানা খসে পড়ল হাত থেকে। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। তারপর রাত দুটো-আড়াইটের সময় উঠে তুমি আলো নেভালে।

ধীমান হাসতে হাসতে বলল, ঠিক ধরেছ, এরকম আমার প্রায়ই হয়।

—বেড সুইচ করাও না কেন?

—টেবল ল্যাম্পটা তো বিছানার কাছেই। তাও মনে থাকে না।

এই সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল এ বাড়ির দারোয়ান। তার হাতে একটা লেসের ঢাকনা দেওয়া বাটি।

সে বলল, পিসিমা এটা পাঠিয়ে দিয়েছে এই দাদাবাবুর জন্য।

পিসিমা কিংবা নিরঞ্জন চট করে ওপরে আসে না। এ বিষয়ে বিভার বোধহয় কোনও নির্দেশ আছে। ওরা কেউ ধীমানকে দেখে ফেলেছে।

বিভাই বাটিটা নিয়ে ঢাকনা খুলল। গন্ধ শুঁকে দেখল একটু। তারপর বলল, ঘুগনি। মাংসের ছাঁট আছে। তুমি এটা খাবে?

সেই কৃতজ্ঞতার রেশ!

ধীমান একটু ইতস্তত করে বলল, কী জানি, খুব একটা ইচ্ছে নেই, কিন্তু পিসিমা পাঠিয়েছেন যখন, একটু বোধহয় খাওয়া উচিত?

বিভা বলল, এখন নয়। চিংড়ি মাছ সেদ্ধ করে বেটে কচুরি বানিয়েছি। খেয়ে দেখো, কেমন হয়েছে। আগে এই বিশ্রী ছাঁট মাংসের ঘুগনি খেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। ইচ্ছে হলে পরে খেও।

বিভার নির্দেশে ওদের কাজের লোকটি গরম-গরম কচুরি নিয়ে এল।

ধীমান চট করে প্রশংসা করে না। প্রত্যেকদিনই প্রশংসা করলে একঘেয়েমির মতন শোনায়। তাই সে বলল, হুঁ, নতুনত্ব আছে। একবার বিদেশ থেকে একজন বিস্কিট এনে দিয়েছিল, তাতে হ্যাম মেশানো ছিল। মাংস দিয়ে বিস্কুট, কিন্তু পচে যায় না। হায়দ্রাবাদে খেয়েছি মুরগির মাংসের আচার, তাও বহু দিন থাকে। তোমার এই কচুরির স্বাদ খুব ভালো হয়েছে, তবে একটু নুন কম।

বিভা বলল, আমি তো চেখে দেখতে পারি না। আমি চিংড়ি মাছ খাই না।

ধীমান বলল, ওঃ হো, তাই তো, তোমার চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি। তাহলে তুমি এটা বানালে কেন?

বিভা বলল, একজন চিংড়ি মাছ খুব ভালোবাসে। তার জন্য বানিয়েছি।

—সুভাষদা কোথায়?

—তোমার সুভাষদাও চিংড়ি মাছের বিশেষ ভক্ত নয়। ওর আজ ফিরতে একটু দেরি হবে। জামসেদপুর থেকে কারা এসেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা আছে ক্যালকাটা ক্লাবে।

—তুমি গেলে না সেখানে?

—ওসব অফিসের কথাবার্তার মধ্যে আমি থাকি না।

—তোমরা কাল কী করলে? চন্দননগর থেকে ফিরলে কখন?

—চন্দননগরে আমার বন্ধু সুদেষ্ণার বিবাহবার্ষিকী ছিল। ফিরেছি রাত সাড়ে এগারোটায়। ও হ্যাঁ, তোমাকে আসল কথাটাই তো বলা হয়নি। সেইজন্যই তোমাকে আজ বিশেষ করে ডেকেছি। আজ সারা সকাল আমার মন খারাপ ছিল।

—কী হয়েছে, বিভা?

—কাল অনেক রাতে, তখন তিনটে দশ, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। অত রাতে টেলিফোনের আওয়াজ শুনলেই ভয় লাগে। আমাদের শোওয়ার ঘরে একটা এক্সটেনশন লাইন আছে, রিসিভারটা আমার দিকেই থাকে। ঘুম ভেঙে গেল, আমি রিসিভারটা তুলতেই একজন আমার নাম ধরে খুব খারাপ কথা বলল।

—অ্যাঁ? কে, কী বলল?

—কে তা তো জানি না, নাম বলেনি। তবে একেবারে অচেনা কেউ নয়, আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে।

—কী বলল?

—তা তোমার কাছে উচ্চারণ করতে পারব না। নোংরা ভাষা। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ফোনটা রেখে দিলাম। মানুষ শুধু-শুধু কেন এরকম খারাপ কথা বলে? আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে আর ঘুমই এল না।

ধীমানের মুখখানা রাগে কালো হয়ে গেল। একজন পাষণ্ড বিভাকে অকারণে দুঃখ দিয়েছে। হাতের কাছে তাকে পেলে ধীমান তার গলা টিপে ধরত। কিন্তু সে কে?

দুজনে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর ধীমান বলল, নোংরা ভাষাগুলো তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে না। কিন্তু কী কথা সে বলল, তা বলতে পারবে না?

মাটির দিকে তাকিয়ে বিভা আস্তে-আস্তে বলল, তোমার আর আমার সম্বন্ধে। তুমি একটা দুশ্চরিত্র...লম্পট, তোমার সঙ্গে আমি—

সিঁড়িতে কাদের পায়ের শব্দ হল, আর কিছু বলতে পারল না বিভা।

এবার এল একটি দম্পতি, তৃষা-সুবিমল। বিভা-সুভাষের মতন এদের নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। এদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, সন্ধেবেলা প্রায়ই কোনও-না-কোনও বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে আসে।

সুবিমল ওপরে এসেই উল্লাসের সঙ্গে বলল, গন্ধ পেয়ে এসেছি। চিংড়ি মাছের কচুরি! হুঁ-হুঁ বাবা, আমাদের বাদ দেবে ভেবেছিলে?

তৃষা বলল, দুজনে মুখোমুখি বসে কী গল্প হচ্ছে, অ্যাঁ? আমরা শুনতে পারি না।

বিভা বলল, নিশ্চয়ই দুপুরবেলা অফিসে সুভাষের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে? তৃষা, তোদের বাড়ির ফোন তো খারাপ!

তৃষা বলল, হ্যাঁ, ফোন খারাপ। কিন্তু তুই রামুকে দিয়ে একটা চিরকুট পাঠাতে পারতিস না?

বিভা বলল, অত আমি পারি না। আয় বোস।

তৃষা ভ্রূভঙ্গি করে বলল, আমরা কিছু পাবো, না ধীমান সব কচুরি শেষ করে ফেলেছে? ব্যাচেলর হয়ে ধীমান যেন সবার মাথা কিনে রেখেছে। সব বাড়িতেই ওর স্পেশাল খাতির!

ধীমান বিভার সঙ্গে চোখাচোখি করল। বিভা খুব ভালোই জানে, ধীমান অন্য কোনও বাড়িতে পারতপক্ষে যায় না। হঠাৎ কোথায় গিয়ে হাজির হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এরপর আরও অনেক কচুরি এল, লঘু কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল।

ধীমান সে-আড্ডায় বিশেষ যোগ দিচ্ছে না, সে শুধু ভেবে চলেছে, কে বিভাকে অসভ্য ভাষায় ফোন করতে পারে? চেনাশুনো কেউ? সাত্যকি হতে পারে কী? সাত্যকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, কিন্তু নিভৃত আড্ডায় খানিকটা মদ খেলেই দারুণ খিস্তিখেউড় শুরু করে। তখন তার মুখের ভাষা শুনলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে এই মানুষটি একজন অধ্যাপক। তবু, সাত্যকি নাম না বলে টেলিফোনে খারাপ কথা বলার মতন মানুষ নয় বোধহয়। যারা ওইসব করে তারা বিকৃত-রুচি, পারভার্ট। সাত্যকির সব কিছুই খোলাখুলি।

তা হলে কে?

চেনাশুনো কারুকেই এতটা নিচু স্তরের মানুষ মনে হয় না। অবশ্য এদের চেনা খুবই শক্ত, অন্য সময়ে একেবারে ভালোমানুষটি সেজে থাকে।

সুবিমল এক সময় ধীমানের দিকে ফিরে বলল, ভাই ধীমান, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। আমাদের গ্রামের বাড়িতে একজন পুরুতমশাই ছিলেন। তিনি প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারিও করতেন। আমার হাতে-খড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। সেই পুরুতমশাই অনেকদিন ধরে অসুস্থ। তাঁর একটি মাত্র ছেলে বি.এস-সি পাস করে বেকার বসে আছে। পুরুতমশাই আমার কাছে চিঠি দিয়ে ছেলেটিকে পাঠিয়েছেন। তোমাকে ভাই তার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ধীমান বলল, আমি কোথায় চাকরি পাব?

সুবিমল বলল, তুমি অনেকের চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছ আমি জানি। তুমি ভাই এর জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দাও। ওদের অবস্থা খুবই খারাপ!

বিভা বলল, তোমরা কেন সব দায়িত্ব ধীমানের ওপর চাপাবে? নিজেরা চেষ্টা করো।

ধীমান হেসে বলল, আপনাদের নিজস্ব ব্যবসা আছে, আপনার বন্ধুবান্ধবরা বড় চাকরি করে, ইনকাম ট্যাক্সের চিফ কমিশনার আপনার বন্ধু, আপনারা চাকরি দিতে পারবেন না? আমি তো সামান্য একটা ব্যাঙ্কের কেরানি!

সুবিমল বলল, আমাদের অফিসে ইউনিয়নের কী ঝামেলা! ওদের লোক ছাড়া নতুন কারুকে আমরা ঢোকাতেই পারি না! তুমি মোটেই কেরানি নও, বড় অফিসার, পার্টিদের লাখ-লাখ টাকা লোন দাও, তারা তোমায় খাতির করে।

তৃষা বলল, ধীমান অনেক লোকের উপকার করে। সেইজন্যই তো ধীমানকে আমার এত ভালো লাগে। হ্যাঁরে বিভা, তোর কোন দূর-সম্পর্কের দেওরকে ধীমান চাকরি করে দিয়েছে না?

তৃষা বলতে চাইল, বিভার অনুরোধে ধীমান যখন একজনের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাহলে তৃষার অনুরোধেই বা দেবে না কেন?

সুবিমল বলল, ছেলেটিকে তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব? একবার কথা বলে দেখবে? ছেলেটিকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে...

বিভা বলল, না, না, ওর বাড়িতে পাঠিও না। একবার রটে গেলে ওর বাড়িতে বেকার ছেলেদের লাইন পড়ে যাবে!

এই কথাটা ধীমানেরই বলা উচিত ছিল, বিভার মুখে ঠিক মানায় না। তবু বিভা এরকম বলে ফেলে।

ধীমান বলল, আমার ব্যাঙ্কেই পাঠিয়ে দেবেন। চেষ্টা করে দেখব।

এরপর কথাবার্তা আবার ঘুরে গেল অন্যদিকে। আরও একটি দম্পতি এল।

একটু পরে উঠে পড়ল ধীমান, জরুরি কাজের ছুতো দেখিয়ে। আসলে তার কোনও কাজ নেই। বিভা তাকে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানাল না। সে জানে, বেশি লোকের মাঝখানে ধীমান স্বস্তিবোধ করে না।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীমান একবার ভাবল, তাসের আড্ডায় যাবে কিনা। ইচ্ছেটা প্রবল হল না তেমন। তখনই ট্যাক্সি নেওয়ার বদলে হাঁটতে লাগল সে। মাথার মধ্যে একটাই কথা ঘুরছে। কে অত রাতে টেলিফোন করেছিল বিভাকে? কে সেই পাষণ্ড, যে বিভার মনে দুঃখ দিয়েছে? তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাওয়া যেত!

॥ তিন ॥

দিন তিনেক বাদে ভোরবেলা দরজায় বেল বাজতেই ধীমানের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। ইনু নামের সেই মেয়েটি সাড়ে পাঁচটার সময় বাসন মাজতে আসে। ধীমানকে ঘুম থেকে উঠে এসে দরজা খুলে দিতে হয়।

কাল ধীমান রাত আড়াইটে পর্যন্ত বই পড়েছে। এখনও তার চোখ ঘুমে ভরা।

নাঃ, এভাবে চলতে পারে না।

দরজা খুলতেই ধীমান দেখল, মেয়েটি প্রতিদিনকার মতন একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। ম্লান মুখ, বুকের কাছে হাত দুটো মুঠো করা, মাটির দিকে চোখ। পারতপক্ষে সে একটাও কথা বলে না।

ধীমান খানিকটা রুক্ষ স্বরে বলল, শোনো, তুমি অন্য যে বাড়িতে কাজ করো, সেখানে আগে যেতে পারো না?

মেয়েটি দু-দিকে মাথা নাড়ল।

অর্থাৎ সে বাড়ির লোক সাতটা-সাড়ে সাতটার আগে দরজা খুলবে না। সেটাই এ মেয়েটির আসল কাজের বাড়ি। এখানে সে বদলির কাজ করছে, সুতরাং আসল কাজের বাড়ির সময় বদলাতে পারবে না।

ধীমান জিগ্যেস করল, তোমার মাসির জ্বর কমেনি?

মেয়েটি বলল, না খুব জ্বর।

ধীমান একটু চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে। তোমাকেও আর আসতে হবে না। তোমার মাসি সেরে গেলে যেন আবার আসে।

মেয়েটি যেন খুব আঘাত পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

ধীমান বলল, মাইনে কাটব না, এ কদিন আমি নিজেই চালিয়ে নেব।

ধীমান দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটি বাইরে।

মেয়েটি এবার বলল, আজকের কাজ করে দিয়ে যাব না?

ধীমান সরে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, আজ বাসনটাসন মেজে দিয়ে যাও।

ধীমান আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। বাকি ঘুমটা পুষিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো মানুষ নিজের মাথাটাকে ঘুম পাড়াতে পারে না।

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল ধীমান। অথচ উঠে পড়ে দাঁত-টাত মেজে নিতেও

ইচ্ছে করছে না। আলস্য লাগছে খুব।

ইনু নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। বাসনটাসন আর ভাঙেনি এর মধ্যে। কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়া গেলেও বাড়িতে আর একটি প্রাণী যে রয়েছে তা অনুভব করা যায়।

এক সময় দরজার কাছে ঠক করে একটা শব্দ হল। এ শব্দটা ইনু ইচ্ছা করেই করেছে। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল ধীমান, ফিরে তাকাল। দরজার কাছে একটা বালতি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইনু।

অন্যদিন ধীমান বাথরুমে গেলে ইনু এ ঘরটা মুছে দেয়। আজ ধীমান এখনও শুয়ে আছে বলে সে অনুমতি চাইছে।

ধীমান জিগ্যেস করল, তুমি চা বানাতে পারো?

ইনু ঘাড় হেলিয়ে বলল, পারি।

ধীমান বলল, ঘর মুছে দিও পরে। এক কাপ চা করে নিয়ে এসো তো। এক চামচ চিনি দেবে। আর দেখো খবরের কাগজ এসেছে কিনা।

ইনু আগে খবরের কাগজ এনে দিয়ে রান্নাঘরে গেল চা বানাতে।

ধীমান স্বাবলম্বী হলেও এক-একদিন ইচ্ছে করে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চা খেতে। এক-একদিন ইচ্ছে করে, কেউ ভাত বেড়ে দিক। খাওয়ার সময় কেউ সামনে বসে থাকুক।

ইনু বেশ ভালোই চা বানায়। একটা ট্রে-তে চা আর বিস্কুটের টিন সাজিয়ে খাটের পাশে একটা টুলে রাখল।

ধীমান জিগ্যেস করল, তুমি কোনওদিন চা খাও না?

ইনু বলল, না।

ধীমান আবার জিগ্যেস করল, তুমি অন্য কিছু খাবার খাও না কেন? রুটি-ফুটি থাকে।

ইনু বলল, অন্য বাড়িতে খাই।

এরপর সে ঘর মুছতে লেগে গেল।

ইনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ধীমানের মনে হল, এ মেয়েটি ঠিক ঝি শ্রেণির নয়। মুখের রেখাতেই বোঝা যায়। ধীমানের এখানে যে কাজ করে, সে হয়তো ওর আসল মাসি নয়।

ইনুর গায়ের রং মাজামাজা, ফরসার দিকেই। নাক-চোখ সুশ্রী। শরীরে সদ্য যৌবন আসি-আসি করছে।

কিন্তু মুখে সবসময় ভীতু-ভীতু ভাব কেন?

বোধহয় ওকে কেউ সাবধান করে দিয়েছে। ধীমান একা থাকে, সে একজন সমর্থ পুরুষ, ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ, তার কাছাকাছি একটি কিশোরী। এরকম অনেক কেলেংকারির কথা শোনা যায়।

নিছক পেটের দায়ে যারা দাসী-বাঁদির কাজ করতে আসে, তাদের শরীর ভোগ করতে কি কারোর প্রবৃত্তি হয়? অথচ এরকম ঘটনা তো ঘটে ঠিকই। কিছু মানুষ এসব মেয়েদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয়।

সেইসব মানুষ কেমন হয়, তা ধীমান জানে না।

ধীমান হঠাৎ জিগ্যেস করল, ইনু, তুমি লেখাপড়া কিছু শিখেছ?

ইনু এবার মুখ তুলে তাকিয়ে বেশ কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। সেই ভয়ার্ত ভাবটা এখনও আছে। আস্তে-আস্তে বলল, না। একটুখানি।

আবার সে ন্যাতা বুলোতে-বুলোতে মাথা গলিয়ে দিল খাটের নিচে।

এর সঙ্গে চেষ্টা করলেও কথাবার্তা চালানো যাবে না।। এ মেয়েটি কথা বলতে চায় না।

এক সময় ইনু বলল, আমার হয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি।

ধীমান এখনও বিছানায় শুয়ে আছে। উঠল না।

বলল, ওই টেবিলের ওপর কাগজ আর ডট পেন আছে। তোমার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যাও। যদি হঠাৎ খুব দরকার পড়ে, খবর দেব।

ইনু কাঠের মতন দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট। ধীমান দেখতে চায়, এবার ও কী বলে। ধীমানের দৃঢ় ধারণা হয়েছে, ও লিখতে-পড়তে জানে।

ইনু কিছুটা ইতস্তত করে কলম তুলে নিয়ে কাগজে লিখল কিছু।

খাটের এক পাশে ঝুলছে ধীমানের গত রাত্রির জামা। তার পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে সে বলল, তুমি যে কয়েকদিন কাজ করলে, এটা নাও। তোমার মাসি পুরো মাইনে পাবে।

ইনু বেশ জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বলল, না, না, আমার টাকা চাই না।

এটাও যেন ধীমানের একটা পরীক্ষা। সে জানত, মেয়েটি আপত্তি জানাবে। ওর আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। পেশাদার ঝি হলে সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে নিত।

ধীমান জোর গলায় বলল, নাও! আমি দিচ্ছি নাও!

ধীমান নোটটা বাড়িয়ে ধরে আছে। ইনু ধীমানের ব্যক্তিত্ব অগ্রাহ্য করতে পারল না। দম দেওয়া পুতুলের মতন একটু-একটু করে এগিয়ে এল।

এই প্রথম ওকে খুব কাছ থেকে দেখল ধীমান। ভালো করে খেতে পায় না বোঝা যায়। অথচ ওর খাওয়ার লোভ নেই। শাড়িটা বেশ ময়লা। চোখের নিচে গভীর বিষাদের রেখা।

টাকাটা নিয়ে ইনু চলে গেল। শব্দ হল দরজা বন্ধ হওয়ার। ইনু আর কোনওদিন আসবে না। এটাই তো ঠিক হয়েছে। ধীমান নিজেই ওকে আসতে বারণ করেছে। এটা ফ্ল্যাট বাড়ি। অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা নিশ্চয়ই এক সময় লক্ষ করবে ধীমানের ফ্ল্যাটে একটি যুবতী মেয়ে আসে। অনেক লোকই রসালো গল্প ছড়াতে ভালোবাসে। এই জন্যই তো ধীমান বয়স্কা ঝি রেখেছিল।

ধীমানের ফ্ল্যাটে তার কোনও বান্ধবী এলে কেউ আপত্তি জানাবে না। কিন্তু যুবতী ঝি দেখলেই কানাকানি শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধীমান এবার উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর কাগজটা দেখল। নিজের নাম লেখেনি ইনু। পার্কসার্কাসের দিকের একটা ঠিকানা, খুব সম্ভবত বস্তি। গোটা-গোটা হাতের লেখা, বানান ভুল নেই, অন্তত ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে মনে হয়।

ঠিকানাটা দিয়ে কী হবে? ধীমান নিশ্চিত কখনও ওই বস্তিতে খোঁজ করতে যাবে না। কাজের লোক ছাড়াই কয়েকটা দিন চালিয়ে নেওয়া যায়। রাঁধবে না, বাইরে খাবে, তাতে এঁটো বাসন জমবে না, ইনুর মাসি জ্বর থেকে সেরে উঠলে ঠিকই আবার কাজে যোগ দেবে।

সারাদিন ইনুর কথাই ধীমানের মাথায় ঘুরতে লাগল।

মনের কোথাও একটু ঘা দিয়েছে এই মেয়েটা। এর কথা বিভাকেও এখনও বলা হয়নি। সুভাষ আর বিভা কয়েকদিনের জন্য দুর্গাপুর গেছে।

বিকেল থেকে টিপি-টিপি বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ঠিক অফিস ভাঙার সময় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বৃষ্টির মধ্যেই ঘনঘন বিদ্যুৎ চমক আর বাজের আওয়াজ।

ক্যামাক স্ট্রিটে এমন জল জমেছে যে ধীমানের ট্যাক্সি আর এগোতেই পারল না। হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে জলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল ধীমান। এসব তার বেশ মজাই লাগে।

অনীশের স্টুডিওটা খোলাই রয়েছে, ভেতরে কেউ নেই।

ধীমান কয়েকবার অনীশের নাম ধরে ডাকতেই ডার্করুম থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ধীমানকে সে ডার্করুমেই আসতে বলছে।

একটা প্রোজেক্টারে কিছু স্টিল ফটো দেখছে অনীশ। আর কেউ নেই সেখানে। মাঝে-মাঝে আলো, মাঝে-মাঝে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আন্দাজে একটা চেয়ার টেনে ছবি দেখতে লাগল ধীমান। কোনও বাংলা ছবির এক-একটা দৃশ্য। গ্রামের হাট, পুকুরঘাট, মারামারি, নায়িকাকে পাঁজাকোলা করে তুলেছে নায়ক।

অনীশ বলল, একটা রামের বোতল আছে দ্যাখ তোর ডান পাশে। গেলাসও আছে। ঢেলে নে।

ধীমান বলল, সে কি, এর মধ্যে মদ খেতে শুরু করেছিস?

অনীশ বলল, বাদলার দিনে কোনও নিয়ম খাটে না ভাই। আজ আর কেউ আসবে না।

ধীমান মদ নিল না। জিগ্যেস করল, কী নাম রে ফিল্মটার?

অনীশ বলল, নাম জেনে কী করবি? থার্ড রেট ছবি হবে বোঝাই তো যাচ্ছে।

—তবু তুই এসব ছবিতে কাজ করিস কেন রে?

—টাকা পাই বলে। হাতে আরও দুটো ছবি এসেছে। একটার জন্য আউটডোর যেতে হবে দার্জিলিং। সেটাও একটা লাভ। এই গরমে অপরের পয়সায় দার্জিলিং ভ্রমণ!

—তুই এত ব্যস্ত হয়ে পড়বি, তোর এই স্টুডিও দেখবে কে?

—দুজন তো লোক আছেই। আজ তারা ছুটি নিয়ে চলে গেল। আর একটা নতুন লোক রাখতে হবে।

—বাঃ, খুব ভালো কথা। আমাদের সুবিমলদা একটি ছেলের কথা বলেছিল।

—কোন সুবিমল?

—তৃষা-সুবিমল। ছেলেটি বি.এস-সি পাস, ভালো ছেলে, তুই কিছুদিন ট্রাই করে দ্যাখ।

—আবার তুই অন্যের জন্য উমেদারি করছিস। সুবিমল তো আমাকে কিছু বলেনি। সবাই তোকে বলে কেন?

—একটা বেকার ছেলের যদি চাকরি হয়ে যায়...আমি সবাইকে বলে রাখি, লেগে যায় একটা না একটা...আচ্ছা অনীশ, তোর এখানে কোনও মেয়ে কাজ করতে পারে না?

—না, মেয়েফেয়ে রাখার অনেক ঝামেলা। এখানে মেয়েরা বাথরুম করবে কোথায়? তোর হাতে কি মেয়ে ক্যান্ডিডেটও আছে নাকি?

—অনীশ, তোর কাছে একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে এসেছি।

—কী ব্যাপার, শুনি-শুনি।

অনীশ প্রোজেক্টার বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিল।

দুটো গেলাসে রাম ঢেলে, জল মিশিয়ে একটা দিল বন্ধুকে। নিজেরটায় চুমুক দিয়ে বলল, শুট!

ধীমান তাকে শোনাল তার বাড়ির ঝি বদলের কাহিনি। প্রথম দিন ভোরবেলা রাস্তায় ইনুকে দেখা থেকে শুরু করে আজ সকালে তাকে বিদায় করে দেওয়ার ঘটনা পর্যন্ত।

থুতনিতে আঙুল দিয়ে অনীশ জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার রে, ধীমান? প্রেম?

ধীমান বলল, ধ্যাৎ। তুই আমাকে চিনিস না?

অনীশ বলল, হ্যাঁ চিনি, সেইজন্যই ঠিক বুঝতে পারছি না। তুই হঠাৎ একটা ঝিয়ের মেয়েকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

—সাধারণ ঝি হলে মাথা ঘামাতুম না, সুন্দরী হলেও না। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে, ও বাধ্য হয়ে ঝি-গিরি করছে। খুব একটা বিপদে পড়েছে। খানিকটা লেখাপড়া জানে, আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, এরকম একটা মেয়ে শুধু-শুধু ঝি-গিরি করে নষ্ট হয়ে যাবে?

—তুই তাকে আসতে বারণ করে দিলি কেন?

—তার কারণ, আমার বাড়িতে তাকে ঝি গিরি করাতে চাই না। দেখে আমার খারাপ লাগে।

—তাহলে তুই কী করতে চাস ওকে, বিয়ে?

—আমাকে লোকে ধরে, আমি কিছু-কিছু বেকার ছেলের চাকরি জোগাড় চাকরি করে দিই। ওই মেয়েটার জন্য কিছু করা যায় না?

—তুই যা বয়েস বললি, অন্তত স্কুল ফাইনালও পাস না করলে চাকরি পাবে?

—কত মেয়ে তো সেলাইটেলাই করেও সংসার চালায়। ওকে যদি কোনও সেলাইয়ের স্কুলে পাঠানো যায় কয়েক মাস, আর-একটা সেলাইয়ের মেশিন কিনে দেওয়া যায়, তা হলে একটা ভদ্রগোছের জীবিকা হতে পারে।

—ঝি-গিরি করছে বাধ্য হয়ে, নিশ্চয়ই খাওয়া জুটত না। সে কাজ ছেড়ে সেলাই শিখতে যাবে, মাইনে লাগবে, কয়েক মাসের সংসার খরচই বা পাবে কোথায়?

—ধর, সে টাকাটা আমি দিয়ে দিলাম। এটা তো আমার একটা এক্সপেরিমেন্ট, সেলাইয়ের মেশিনটাও আমি কিনে দেব।

—তোর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও লোকে ভাববে ও মেয়েটা তোর রক্ষিতা।

—কী বাজে কথা বলিস! লোকে এরকম সাহায্য করে না?

—এদেশের যা ধরন, তাই বললাম। তুই একটা ব্যাচেলর, একটা যুবতী মেয়েকে টাকা দিয়ে সাহায্য করবি!

—যদি আমার নাম না জানাই?

—হাওয়া দিয়ে উড়ে-উড়ে টাকাগুলো ওর কাছে যাবে?

—ও মেয়েটার কি লেখাপড়া শেখার সুযোগ কিংবা নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় না?

—এদেশের ওরকম হাজার-হাজার, আরও বেশি, লক্ষ-লক্ষ অসহায় ছেলেমেয়ে আছে। তুই তাদের ক'জনকে উদ্ধার করবি?

—সারা দেশের অবস্থা আমরা বদলাতে পারব না। তবু আমাদের চোখে যারা পড়ে, সাধ্যমতন তাদের দু-একজনকেও তো সাহায্য করতে পারি?

—ও মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো, ভদ্রগোছের ব্যবহার, তাই ওর প্রতি তোর ঝোঁক হয়েছে। যদি দেখতে খারাপ হত, কিংবা একটা ছেলে হত, তা হলেও কি তুই এত উৎসাহ দেখাতিস?

—হ্যাঁ, মেয়ে বলেই, আর কিছুটা সুশ্রীও বটে, সেই জন্যই ওর ওপরে আমার মায়া পড়েছে। কিন্তু তার বদলে তো আমি কিছু চাই না। আমি কোনওদিন মেয়েটার সঙ্গে আর দেখাই করব না।

—তা হলেও হয় না। বেনামিতে টাকা দিয়ে সাহায্য করা যায় না। ওর বাড়ির লোক পাড়ার লোক সোর্স খুঁজবেই।

—কোনও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানকে যদি টাকা দেওয়া যায়। তারা ওকে সেই টাকাটা দিয়ে সাহায্য করবে।

—ওকেই কেন বেছে নেওয়া হল, সে প্রশ্ন উঠবে না? ওর বাড়ির কথা তো আমরা কিছুই জানিনা।

—কোনও উপায় নেই বলছিস?

—একটি মাত্র উপায় আছে।

—কী সেটা, এতক্ষণ বলছিস না কেন?

—অনীশ গেলাসে আবার রাম ঢালল।

—একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, তুই হচ্ছিস পরোপকারী ধীমানদাদা। মাঝে-মাঝে বেকার ছেলেদের ধরে এনে চাকরির জন্য উমেদারি করিস। লোকে তা নিয়ে একটু ঠাট্টা করে আবার মনে-

মনে তোর প্রশংসাও করে। কিন্তু যেই তুই একটা অল্পবয়েসি মেয়ের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করবি, অমনি সবাই ভাববে, তোর কোনও বদ মতলব আছে।

ধীমান এবার রেগে উঠে বলল, আমি গ্রাহ্য করি না। কে কী ভাবল...সবাই মানে কারা?

অনীশ হাসতে-হাসতে বলল, এই যাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, তৃষা-সুবিমল, সুশোভন-অনিন্দিতা, তোর তাস খেলার গ্রুপ, আর হ্যাঁ, ভালো কথা, বিভা কেমনভাবে নেবে ব্যাপারটা? বিভার সঙ্গে তোর একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে।

ধীমান বলল, বিভার ব্যাপারটা আমি বুঝব। অন্যদের ভাবাভাবি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। একটা ছেলের চাকরি জুটিয়ে দিতে পারি, আর একটা মেয়ের চাকরি জোগাড় করে দিতে গেলেই অন্যায়? সে মেয়েটা ঝি-গিরি করলেই সবাই খুশি হবে?

—আজকাল ভালো ঝি পাওয়া খুব শক্ত। তুই বলে দ্যাখ, অনেকেই ওকে বাড়ির কাজের জন্য রাখতে রাজি হবে। কিন্তু লেখাপড়া শেখানো-টেকানোর ব্যাপারে কারুর গরজ নেই!

—যাকগে, বাজে কথা রাখ। তুই যে বলছিলি একটা উপায় আছে, যাতে ওকে সাহায্য করা যায়, সেটা কী?

—বলছি। মনে কর, একটা বস্তিতে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, তার মধ্যে শুধু একজনকে বেছে নিতে পারে কে বল তো? যাকে কেউ কোনও সন্দেহ করবে না, অন্যরাও আপত্তি করবে না?

—এটা কি ধাঁধা? আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারি না। তুই চটপট বলে ফ্যাল!

—সিনেমার পরিচালক! কোনও সিনেমার পরিচালক গিয়ে বলতে পারে, এই মেয়েটিকে দেখে আমার মনে হল, আমার পরের ছবিতে একটা রোলে এই মেয়েটিকেই মানাবে। এই বয়েস, ঠিক এই রকম মুখ চোখ...পরিচালকের পছন্দের ওপর কেউ কোনও কথা বলতে পারে না। আমি বলে কয়ে কোনও পরিচালককে ধরে ওই মেয়েটার জন্য একটা রোল জোগাড় করে দিতে পারি। তাতে কিছু টাকা পাবে। আর যদি লেগে যায়, যদি মেয়েটা পার্ট ভালো করে, তা হলে পরপর চান্স পেয়ে যাবে!

ধীমান খানিকটা নিরাশভাবে বলল, ফিলমে নামবে? যাঃ, সেটা ভালো হবে না!

অনীশ বলল, ফিলম কী দোষ করল?

ধীমান বললে, ওটা বাজে লাইন। একটা উঠতি বয়েসের মেয়ে, ওকে নিয়ে অনেকে ছিনিমিনি খেলবে!

—ওসব আজকাল চলে না! মানে, কোনও-কোনও ক্ষেত্রে চলে, কিন্তু কোনও মেয়ে যদি ভালো থাকতে চায়, খেলার পুতুল হতে না চায়, তাতেও কোনও অসুবিধে হয় না। কলেজে-পড়া মেয়েরা ফিলমে কিংবা টিভি সিরিয়ালে ছোটখাটো পার্ট করে মাঝে-মাঝে টাকা রোজগার করে।

—কিন্তু ওর ষোলো-সতেরো বছর বয়েস। ভীতু-ভীতু, সরল, এখনও ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি, ও কি নিজেকে সামলাতে পারবে?

—দ্যাখ ধীমান, মেয়েটা করে ঝি-গিরি। তুই সাধুপুরুষ, তুই ওকে ব্যবহার করিসনি, কিন্তু অন্য বাড়িতে কোনও বেকার ছোকরা কিংবা কাজের লোক যে ওকে নষ্ট করবে না, তার কী মানে আছে? সিনেমা লাইনে গেলে তার চেয়ে বেশি কী হবে? সতীত্ব সম্পর্কে বেশি শুচিবাই না থাকাই ভালো। তুই যা বললি, তাতে আমি এইভাবে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। অন্য কিছু আমার দ্বারা হবে না!

—মেয়েটার যদি অভিনয়ের গুণ না থাকে? তোর কথা শুনেই কোনও পরিচালক ওকে নেবে?

—প্রথম চান্সটা আমি জোগাড় করে দিতে পারি। ছোটখাটো রোলে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া যায়। তারপর ওর এলেম। যদি গুণ থাকে অন্যরা ওকে লুফে নেবে।

—কতদিনের মধ্যে তুই ব্যবস্থা করতে পারবি?

—অন্তত দু-মাস তো লাগবেই। নতুন কোনও ছবি শুরু না হলে তো কিছু করা যাবে না। এরকম দু-একটা কথা চলছে।

—এ দু-মাস ও ঝি-গিরিই করে যাবে?

—সেটা আমি আটকাবো কী করে ভাই?

—এখন বাড়ি-বাড়ি কাজ করে মেয়েটা যা টাকা পায়, সেই টাকাটা ওকে দিলে কাজ ছাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। তোরা সিনেমার লোকেরা যে-কোনও জায়গায় গিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারিস। তুই কালকেই ক্যামেরা-ট্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ওই বস্তিতে গিয়ে মেয়েটাকে দ্যাখ না। এখন থেকে তুই ওকে সিনেমার নাম করে দু-তিন মাস টাকা দিয়ে যাবি। যাতে ও জীবনটা বদলাতে শুরু করে।

—আমি টাকা দেব?

—তুই দিবি বা আমি দেব, একই কথা।

—না, মোটেই একই কথা নয়। এই শখটা তোর মাথায় চেপেছে। তুই একটা ঝিয়ের মেয়েকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চাস। আগে দু-চারবার এরকম হয়েছে। বস্তির মেয়ে ভালো পরিচালকের নজরে পড়ে গিয়ে নায়িকা হয়ে গেছে। কিন্তু সিনেমার লোক না। তোর শখটা খানিকটা উদ্ভটই বটে।

—দ্যাখ অনীশ, আমরা যেটা করতে যাচ্ছি, সেটা যদি সার্থক নাও হয়, তাতে, মেয়েটা এখন যে অবস্থায় আছে, তার চেয়ে খারাপ কিছু হবে না আশা করি!

—ধরা যাক, মেয়েটা ফিলমে একেবারেই সুবিধে করতে পারল না। অনেকে ক্যামেরার সামনে ঠিক মতন চলাফেরাই করতে পারে না। কাঠের পুতুলের মতন দেখায়। তাদের দিয়ে চলে না। এ মেয়েটার যদি সে অবস্থা হয়, তাহলে কী হবে? বড় জোর, শরীরটাকেই সম্বল করবে। বেশ্যা হয়ে যাবে। সেটাও কি ঝি-গিরির চেয়ে খারাপ? আজকাল বেশ্যাদের বলে সেক্স-ওয়ার্কার, যৌন-কর্মী, সেটাও তো একটা জীবিকা।

—তোদের ফিলম লাইনের কেউ যদি ওকে খারাপ পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে তাকে আমি খুন করব!

—ওরে বাবা, এত প্রেম?

—আমি মেয়েটার সঙ্গে কোনওদিন দেখা করব না। ও যেন কিছুতেই আমার নাম জানতে না পারে। আমি যে ওকে সাহায্য করতে চেয়েছি, তা কোনওক্রমে জানাবি না!

—তুই বার্নার্ড শ'য়ের 'পিগম্যালিয়ান' নামে নাটকটা পড়েছিস?

—না, পড়িনি। হঠাৎ সেটার কথা কেন?

—পড়ে নিস বইটা। একটা গ্রিক কাহিনির আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন বার্নার্ড শ। লন্ডনের রাস্তার একটা ফুলওয়ালি মেয়ে, অশিক্ষিত, ইংরিজি বলে ভুল উচ্চারণে, তাকে দেখে এক প্রফেসরের এক অদ্ভুত শখ হয়, ঠিক তোর মতন। সেই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে, সমস্ত আদবকায়দা রপ্ত করিয়ে উঁচু সমাজে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপরেই প্রেম, বুঝতেই পারছিস! ওঃ হো, এই নাটকটা নিয়েই তো পরে একটা দারুণ ফিলম হয়েছিল, 'মাই ফেয়ার লেডি'। তাতে অড্রে হেপবার্ন দুর্দান্ত অভিনয় করেছিল, দেখিসনি?

—না।

—এককালে খুব নাম করেছিল ফিলমটা। সুযোগ পেলে দেখে নিস।

—এই গল্পের সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। আমি মেয়েটির সামনে কখনও যাব না। ও আমাকে চিনবেই না। তা হলে এখন আমি চলি।

অনীশ ওকে এগিয়ে দিতে এল। বৃষ্টি এখনও থামেনি, জল দাঁড়িয়ে গেছে রাস্তায়। লোকজন বিশেষ নেই। ধীমান এরই মধ্যে যেতে চায়।

অনীশ তার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, আমি কালই যাব খোঁজ করতে। মেয়েটার ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে রে!

॥ চার ॥

কয়েকদিন ধীমান দু-বেলাই বাইরে খেয়ে নিল। রান্নাবান্নার পাট নেই, তাই বাসন মাজারও ঝামেলা নেই। এ বাড়িরই অন্য একটা ফ্ল্যাটের কাজের ছেলে তার দুধ-টুধ এনে দেয়, ঘরগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে যায়।

বিভা-সুভাষ দুর্গাপুরে গেছে, তাই সন্ধেগুলো তাস খেলে কাটাত ধীমান। অনীশ আউটডোর শুটিং-এ গেছে মুর্শিদাবাদ, তার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে এর মধ্যে।

অনীশের কাছ থেকে মোটামুটি ভালো খবর পাওয়া গেছে।

ধীমান ঠিকই আন্দাজ করেছিল। ইনু এ বাড়ির ঝি চপলার আত্মীয়-টাত্মীয় কিছু নয়। এমনিই মাসি বলে ডাকে।

ইনুর বাবা নেই, বাবা মারা গেছে না কোথাও পালিয়ে গেছে তা ঠিক জানা যায়নি। ওরা আগে [illegible] থাকত, কোনও কারণে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ইনুর একটি ভাই আছে, মাত্র এক বছরের ছোট, আর ওর মা বিছানায় শুয়ে থাকে আর কাঁদে। কথা শুনলেই বোঝা যায়, এরা ভদ্রঘরের, কিন্তু পয়সাকড়ি একেবারেই নেই, বস্তির ঘরভাড়াও দিতে পারে না। ওর ভাই ইস্কুলে যায়, ইনু ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিল। এখন ঝি-এর কাজ নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই সংসার চালায়।

অনীশ দুটো-তিনটে ক্যামেরা আর দু-তিনজন লোককে সঙ্গে নিয়ে বস্তির নানান ছবি তুলতে-তুলতে তারপর ইনুদের ঘরে গেছে। ইনুকে পছন্দ হয়েছে তার, যে-কোনও পরিচালক ওকে একটা সুযোগ দিতে রাজি হবে। কিন্তু ইনুর মা মেয়েকে ফিল্মে নামাতে রাজি না। সে মহিলা কোনও কথাই বলতে চাননি, বিছানায় অন্য পাশ ফিরে শুয়ে থেকে বারবার মাথা নেড়েছেন আপত্তি জানিয়ে। অনীশ এখন থেকেই মাসে-মাসে এক হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে এসেছে, মনে হয় দু-তিনদিনের বেশি ওর মায়ের আপত্তি টিকবে না।

ইনুর পুরো নাম হিমানী দে সরকার। ওর বেশ ইচ্ছে আছে বলে মনে হয়েছে অনীশের। ওর ভাইটিরও খুব উৎসাহ। ওরাই মাকে রাজি করাবে।

ফিল্মে নামার ব্যাপারটা ধীমান এখনও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু ওই মেয়েটির জীবনযাত্রা পরিবর্তনের আর তো কোনও উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশ্য হিমানীর যদি ভালো লাগে...দেখা যাক ওর জীবন কোন দিকে মোড় নেয়।

সে যাই হোক, ধীমানের বাড়ির কাজের লোকের কী হবে? চপলার তো আসবার কোনও লক্ষণ নেই, তার ঠিক কী অসুখ তা জানা গেল না। আর দেরি করলে ধীমানকে অন্য লোক রাখতেই হবে।

দিনের-পর-দিন বাইরে খেতে ভালো লাগে না ধীমানের।

মাংসের বদলে মাছই তার বেশি পছন্দ। হোটেল-রেস্তোরাঁয় মাছ কখনও ভালো রান্না হয়

না। মাছগুলো ভেঙে-ভেঙে কাঠের টুকরোর মতন করে দেয়। হোটেলে মাংসই ভালো।

আজ নিজে বাজার করে আনল ধীমান। মাছ কুটতে পারে না সে, বাজারেই মাছ কোটার লোক পাওয়া যায়। পুঁটি মাছ কিংবা মৌরলা মাছ ভাজা তো কোনও হোটেলে পাওয়া যায় না! আলু-পেঁয়াজ দিয়ে কুচো চিংড়ি রাঁধতে পারে ধীমান। আজ ছুটির দিন, ধীমান নিজেই বাড়িতে রান্না করবে।

দু-একজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করলে হত। শুধু নিজের জন্য বেশি কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করে না। কারুকে বলা হয়নি।

দুটো গ্যাসের উনুনের একটাতে চায়ের জল আর একটাতে রান্না চাপিয়েছে ধীমান। হাতে একটা বই। সর্বক্ষণ রান্নার দিকে তাকিয়ে থাকার তো দরকার হয় না। কিছুটা সময় বাঁচিয়ে বই পড়া যায়।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে একটু বই পড়ে নিচ্ছে ধীমান, আর মাঝে-মাঝে কড়াইতে পুঁটি মাছগুলো উলটে দিচ্ছে, এই সময় দরজার বেল বাজল।

ভুরুটা কুঁচকে গেল ধীমানের। এখন বেলা সাড়ে এগারোটা, এই সময় কে আসবে? ফ্ল্যাট বাড়িতে ফেরিওয়ালারা এসে বিরক্ত করে। যদিও ওদের ওপরে ওঠা নিষেধ, গেটে দারোয়ান আছে, তবু কী করে চলে আসে কে জানে!

দরজা খুলে ধীমান শুধু যে অবাক হল তাই-ই নয়, মনটা যেন শীতের নরম রোদে ভরে গেল।

একটা কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে বিভা। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, হাতে একটা ঝোলা ব্যাগ।

সামান্য হেসে বিভা বলল, কী, ভেতরে আসতে বলবে না?

সঙ্গে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ধীমান বলল, এসো, এসো!

বিভা এর আগে কোনওদিন একা আসেনি ধীমানের ফ্ল্যাটে।

যদিও ধীমানকে প্রশ্ন করে-করে এ ফ্ল্যাটের কোথায় কী আছে, খুঁটিনাটি সব বিভা জানে। জানলার পরদায় কী রং হবে, সে সম্পর্কেও বিভার মতামত আছে। চায়ের কাপডিশের সেট বিভারই কিনে দেওয়া, টিভি কেনার সময় বিভা সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু সুভাষের সঙ্গে অন্য অতিথিরাও ছিল, মাত্র দু-বার সন্ধের সময় সে এসেছে এখানে।

বিস্ময় লুকিয়ে ধীমান বলল, তুমি এসে পড়েছ, বাঃ! আমি রাঁধছি, তুমি আজ আমার সঙ্গে খেয়ে যাবে।

আস্তে-আস্তে মাথা দুলিয়ে বিভা বলল, না, আমি বেশিক্ষণ থাকব না। ইস, কী অগোছালো করে রেখেছ বাড়িটা!

দুটি শয়ন ঘর, একটি বসবার ঘর, একটি বারান্দা। বিভা খাটের ওপর দলাপাকানো একটা জামা তুলে রাখল আলনায়, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল ঝাঁটার কাঠির টুকরো, টেবিলের ওপর দু-দিন ধরে রাখা দুটো কাচের গেলাস নিয়ে গেল রান্নাঘরে। এমনকি বাথরুমেও উঁকি মেরে সে বেসিনের ময়লা দেখে সাফ করতে শুরু করে দিল।

যেন সে-ই এ বাড়ির গৃহিণী। আসবাবপত্রের অসামঞ্জস্য সে সহ্য করতে পারে না। দেওয়ালে একটা বড় ছবি বেঁকে ছিল কিছুটা, সেটা উলটে দিল, ক্যালেন্ডার থেকে ছিঁড়ে নিল গত মাসের পাতা।

কোনও কথা না বলে সে নিঃশব্দে এইসব করে যাচ্ছে, ধীমান তার পাশে-পাশে ঘুরছে। একবার শুধু সে ধীমানের খাটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, বালিশের ওয়াড় এত ময়লা হয়েছে, কাচতে দাওনি কেন?

ধীমান বলল, চপলা অনেক দিন আসছে না। তার অসুখ।

ভুরু তুলে বিভা বলল, তা হলে বাড়ির কাজ কে করছে? চপলা অন্য লোক দেয়নি?

ধীমান বলল, একটা বাচ্চা মেয়েকে পাঠিয়েছিল, সে মেয়েটিকে দেখেই মনে হল, এসব কাজ তার ভালো লাগে না। তাই তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছি। এই বাড়িরই একটা ছেলে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়।

হিমানী সম্পর্কে এখন কিছু আর বলতে চাইল না ধীমান। বিভা এসেছে বলে তার এত ভালো লাগছে যে অন্য কোনও প্রসঙ্গ সে তুলতে চায় না।

ধীমানের গালে বিভা তার নরম, রক্তাভ ফরসা একটা হাত রেখে জিগ্যেস করল, তুমি আজ দাড়ি কামাওনি?

এত অন্তরঙ্গ সুরে আর কোনও নারী ধীমানের সঙ্গে কথা বলে না। যেন বিভা তার প্রেমিকা। অথচ বিভাকে এ পর্যন্ত একটা চুমুও খায়নি ধীমান। বছর তিনেক আগে, একবার শুধু খুব উতলা হয়ে ধীমান ওকে চুম্বন করতে এগিয়েছিল, বিভা হাত তুলে বলেছিল, না।

বিভার ওই একটা শব্দই যথেষ্ট। জোর করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বিভা ইচ্ছে করলে ধীমানের শরীরে হাত ছোঁয়াতে পারে, অনেক সময় ধীমানের চুলে হাত বুলিয়ে আদর করে। কিন্তু ধীমানকে সে প্রশ্রয় দেয় না। ধীমান তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে বিভা শুধু বলে, না।

ধীমান বলল, ছুটির দিনে ইচ্ছে করে না। তোমার তাড়া কিসের, তুমি আমার সঙ্গে খেয়ে যাও না!

বিভা বলল, কাল বাপি এসেছে। বাপির সঙ্গে বাড়িতে খাব। একটু বাদেই চলে যাব।

বাপি অর্থাৎ সন্দীপ ওদের ছেলে। দার্জিলিং থেকে এসেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। বাপির বয়েস বারো বছর। ওরসঙ্গে ধীমানের খুব ভাব।

ধীমান বলল, বাপির স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে? ওকে নিয়ে এলে না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধীমানের মুখের দিকে কাতরভাবে চেয়ে বিভা বলল, আমি তোমাকে আটকে রেখেছি, তাই না?

ধীমান বলল, তার মানে?

একটু পিছিয়ে গিয়ে একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বিভা। হাতের ঝোলাটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

আস্তে-আস্তে অসম্ভব তীব্রতার সঙ্গে বলল, আমি তোমায় ভালোবাসি, ধীমান। অসম্ভব ভালোবাসি। সর্বক্ষণ তোমার কথা ভাবি। আমি সংসারের কাজ করি, সুভাষের সঙ্গে অনেক জায়গায় যাই, নানারকম কর্তব্য পালন করতে হয়, বাপি এসেছে, ওকে যত্ন করব তাও ঠিক, তবু আমার মন পড়ে থাকে তোমার কাছে। তুমি সারাদিন কোথায় থাকো, কোথায় যাও, কল্পনায় দেখতে পাই। এ যেন পাগলের মতন ভালোবাসা।

ধীমান বলল, আমিও তোমায় কতখানি ভালোবাসি, তুমি তা জানো না?

বিভা বলল, জানি, কিন্তু সেও তো আমার স্বার্থপরতা। আমি তোমায় আটকে রেখেছি। আমাকে ভালোবেসে তুমি কী পাবে? আমি তো কোনওদিন তোমার বউ হবো না। আমার সংসার ছেড়েও তোমার কাছে আসব না।

ধীমান বলল, আমার কিছু চাই না। তোমার ভালোবাসা পাওয়াটাই যথেষ্ট।

বিভা বলল, সারা জীবন তুমি এরকম একলা থাকবে? যাঃ, তা হয় নাকি? এটা সত্যি আমার স্বার্থপরতা। ওই যে বাজে লোকটা, যে মাঝরাত্তিরে টেলিফোন করে, সেই একথাটা আমায় মনে পড়িয়ে দিল।

ছলাৎ করে যেন অনেকখানি রক্ত উঠে এল ধীমানের মাথায়।

কঠিন মুখ করে সে জিগ্যেস করল, সে আবার টেলিফোন করেছিল?

বিভা ফ্যাকাশে গলায় বলল, হ্যাঁ, প্রায় রোজই...এমনকি দুর্গাপুরেও ফোন করেছিল, কী করে যে জানল! তারপর কাল রাত্তিরে...

বিভার চোখ দিয়ে গড়িয়ে এল জলের ধারা।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ, আর কেউ নেই, আর কেউ দেখবে না। ধীমান যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, সেই নারী দুঃখ বা ব্যথায় কাঁদছে। এই সময়ে তাকে বুকে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেওয়াটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক।

ধীমানের সেই ইচ্ছেটা অদম্য হল। তবু সে এগোতে পারল না। যদি বিভা এখনও তাকে না বলে।

কে কাঁদিয়েছে বিভাকে? হঠাৎ রাগে যেন ধীমানের শরীর কাঁপছে। আবার ভালোবাসার আবেগেও তোলপাড় হচ্ছে বুক। একসঙ্গে এই দুই বিপরীত অনুভূতি সামলানো সহজ নয়।

ধীমান ধপ করে বসে পড়ল নিজের খাটে। দু-হাতে মুখ ঢেকে উঃ-উঃ করতে লাগল।

বিভা কান্না থামিয়ে চেয়ে রইল একটুক্ষণ।

তারপর কাছে এসে ধীমানের পিঠে হাত রেখে আস্তে-আস্তে বলল, মেয়েরা যে কথা মুখে উচ্চারণ করে না, তেমন কথাও আমি তোমার সামনে বলতে পারি, ধীমান। আমি প্রায়ই কল্পনায় তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে থাকি। তোমাকে আদর করি। আমার সারা শরীর এমন হয়, যেন সত্যি-সত্যি তুমি আমায় জড়িয়ে ধরে আছো...

ধীমান মুখ তুলতেই বিভা বলল, তুমি এখন কিছু বলবে না, তুমি চুপটি করে থাকো। তোমার সঙ্গে আমি মনে-মনে কত জায়গায় বেড়াতে যাই, কোনও নদীর ধারে, আর কেউ নেই, একটা বাচ্চা মেয়ের মতন আমি খালি পায়ে দৌড়োই, জলে নেমে পড়ি, তুমি ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে ধরো...

বিভা এবার সরে গেল জানলার কাছে। ধীমানের দিকে পেছন ফিরে বলল, বাচ্চা বয়েস থেকেই আমি এরকম, মনে-মনে কত কী ভাবি, কল্পনাতেই বেশি আনন্দ পাই। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আমার খুব শখ হয়েছিল সিনেমায় নামার, কলেজের মেয়েদের যেমন হয়, সবাই আমাকে সুন্দর-সুন্দর বলত, আমি ভালো কোনও গল্প-উপন্যাস পড়লেই মনে-মনে ভাবতাম, এটা সিনেমা হলে আমি হব নায়িকা, আমার সঙ্গে থাকবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়! উত্তমকুমারের কথা মনে হয়নি, সৌমিত্রকেই বেশি পছন্দ ছিল...তারপর কী হল জানো? একদিন সত্যি-সত্যি, দাদার এক বন্ধু ফিলম প্রোডিউসার, আমাকে একটা সিনেমায় নামবার প্রস্তাব দিল। তারাশঙ্করের লেখা গল্প, সেটা আমার আগেই পড়া, খুব প্রিয় গল্প, আর নায়ক সৌমিত্র! দাদাদের আপত্তি ছিল না, আমার বাবা তো অনেক দিন নেই, মাও অমত করেনি, কিন্তু আমি রাজি হলুম না! আমি বললুম, ধুৎ, সিনেমায় নেমে কী হবে? রোজ একটু-একটু শুটিং, দুটো-চারটে কথা, মুখের ওপর চড়া আলো পড়বে, একগাদা লোক হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে, শুটিং ব্যাপারটাই খুব বোরিং। কল্পনায় কত সুবিধে, কোনও কষ্ট নেই, কোথাও যেতে হয় না, ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয় না—

ধীমান উঠে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

বিভা আবার ধীমানের মুখোমুখি এসে বলল, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, ধীমান। কিন্তু তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবো না! শুলেই যদি ফুরিয়ে যায়? তারপর আর কল্পনাতেও সুখ যদি না পাই?

ধীমান বলল, একটা কথা জিগ্যেস করব, বিভা? তুমি আজ হঠাৎ আমার এখানে এলে কেন? কখনও তো আসো না!

বিভা বলল, এসেছি বেশ করেছি।

ধীমান হেসে ফেলল। বিভাকে বোঝা খুব শক্ত। ক্ষণে-ক্ষণে তার মর্জি বদলে যায়।

একটা চেয়ার টেনে বসে বিভা জিগ্যেস করল, তুমি আজ কী-কী রান্না করছ?

ধীমান বলল, তুমি আজ আমায় বিশেষ কোনও একটা কথা বলতে এসেছ। সে কথাটা কী?

বিভা বলল, ঠিক ধরেছ। এখনই বলব? হ্যাঁ, আর দেরি করাও তো যাবে না। বাপি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। ধীমান, তুমি আমার ছেলেকে ভালোবাসো, সেও তোমাকে খুব পছন্দ করে। কিন্তু সেটাও কেউ একজন সহ্য করতে পারছে না। মানুষ এমন হয় কেন? ধীমান, তুমি বাপির সঙ্গে দেখা কোরো না। তুমি আমাদের বাড়িতে আর এসো না।

ধীমান বলল, কেন, কেন, এরকম কথা বলছ কেন? আমি তোমাদের বাড়িতে গেলে কী দোষ হয়? আমরা কোনওদিন তো কিছু...

—কারণটা তোমাকে মুখে বলতে পারব না। কেউ একজন আমার সর্বনাশ করতে চাইছে। আমাদের সম্পর্কটাকে কুৎসিত করে দিতে চাইছে!

—কে? তুমি তার নাম বলো! তোমাকে কেউ আঘাত দিলে আমি তার সঙ্গে চরম বোঝাপড়া করতে চাই!

—নাম তো জানি না। যে বারবার ফোন করে। কাল রাত্তিরে যখন সে ফোন করেছিল, আমি সঙ্গে-সঙ্গে কেটে দিইনি। আমি হুঁ-হাঁ করে তার সব খারাপ কথাগুলো শুনেছি। পাশে একটা ক্যাসেট রেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছিলাম। সব কথা টেপ হয়ে গেছে।

—তাই নাকি? বাঃ, খুব ভালো কাজ করেছ। গলা চিনতে পারোনি?

—না, চেনা যায় না।

ব্যাগ থেকে একটা ক্যাসেট বার করে ধীমানের সামনে রাখল বিভা। তার সারা মুখে বেদনার ছায়া। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানোর কষ্ট।

মুখ নিচু করে সে বলল, একজন খারাপ লোক, যার মন বিকৃত, পাগল, তার কথায় ভয় পাওয়া আমাদের উচিত নয়। আমরা কোনও অন্যায় করিনি। তুমি আমার বন্ধু, কোনও বিবাহিত মেয়ের একজন বন্ধু থাকতে পারে না? আমি শুধু মনে-মনে তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই। মনে-মনে তো মানুষ কত কিছুই ভাবে, সেটা কি কোনও অপরাধ? একটা লোক খারাপ ভাবছে বলেই আমরা দূরে সরে যাব কেন? তবু যেতে হবে, ধীমান। তোমার সঙ্গে আমার আর অনেক দিন দেখা না হওয়াই ভালো। সে এমন একটা ভয় দেখিয়েছে যে আমি একেবারে অসহায় হয়ে গেছি, কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না—

ব্যাগটা তুলে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল বিভা। ধীমান আর একটাও কথা বলল না।

বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে বিভা আবার বলল, দেখা হোক বা না হোক, তোমাকে আমি ভালোবাসব, ধীমান। মনে-মনে বেশি করে তোমায় পাবো।

ধীমান তবু কোনও কথা বলল না। বিভার কথাও মন দিয়ে শুনল না। ক্যাসেটটা বাজাবার জন্য সে ছটফট করছে।

দরজা বন্ধ করে দিয়েই সে তার টু-ইন ওয়ানে ক্যাসেটটা চালিয়ে দিল।

কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে ঠিকই, যে কথা বলছে, সে মুখের সামনে কিছু একটা চাপা দিয়ে আছে, তাই কণ্ঠস্বর চেনার উপায় নেই।

হারামজাদী...তুই ধীমানের সঙ্গে...তোর স্বামীটা তো একটা ভেড়ুয়া...নিজের...জোর নেই। সব সময় হ্যা হ্যা করে হাসে, ওই শুয়োরের বাচ্চা ধীমানটা যে তার শোবার ঘরে সিঁধ কাটছে...বিভা, তুই একটা...এখনও আমার কথা শোন, যদি তুই...বন্ধ না করিস, তা হলে সব কথা তোর ছেলেকে

বলে দেব। ছেলে জানবে যে তার মা...তোর ছেলে বাপি তোকে ঘেন্না করবে, ঘেন্না করবে, ঘেন্না করবে...

রাগে ধীমানের সারা শরীর জ্বলছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে সে যেন একজন খুনি, ওই লোকটাকে হাতের কাছে পেলে গলা টিপে শেষ করে দিত।

॥ পাঁচ ॥

অবিবাহিত বলেই ধীমানের অফিস মাঝে-মাঝেই তাকে ট্রান্সফারের প্রস্তাব দেয়। যারা সংসারী, যাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে, তাদের পক্ষে ট্রান্সফার নেওয়ার অনেক অসুবিধে। তারা ধীমানকে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ধীমান কলকাতার জীবন ছেড়ে বাইরে যেতে চায়নি। সেইজন্য সে অনেকবার পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছে।

কিন্তু প্রধানত যে আকর্ষণে কলকাতায় থাকা, তো সেটাই যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে কলকাতায় থেকে আর লাভ কী? কলকাতা শহরেই ঘোরাঘুরি করবে, অথচ বিভার সঙ্গে দেখা হবে না, এই চিন্তাটাই ধীমানের কাছে অসহ্য।

একটা প্রস্তাব কিছুদিন ধরে ঝুলে ছিল, ধীমান এবার সেটা নিতে রাজি হয়ে গেল। শিলিগুড়ি শহরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। শিলিগুড়ি একটা বর্ধিষ্ণু শহর, দিন-দিন ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে, ওখানকার একটা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের অনেক ক্ষমতা। সবাই ধরে নিল পদোন্নতির লোভেই রাজি হল ধীমান।

তিনদিন পরেই চলে যেতে হবে। ধীমান কলকাতার ফ্ল্যাটটা ছাড়ল না। আবার কখনও ফিরে এলে কলকাতায় বাড়ি পাওয়া খুব শক্ত হবে। তার এক মামাতো ভাই ডাক্তারি পড়ে, তাকে থাকতে দিল এখানে। কারুকে কিছু না জানিয়ে ধীমান চেপে বসল দার্জিলিং মেলে।

শিলিগুড়িতে বাড়ি পেতে সময় লাগবে। ধীমান প্রথমে এসে উঠল একটা হোটেলে।

অন্তত তিন বছর তাকে এখানে থাকতেই হবে। এই শহরে তাকে কেউ চেনে না। এখানে শুরু হবে তার নতুন জীবন।

ইনু বা হিমানী নামের সেই মেয়েটাকে নিয়েও মাথা ঘামাতে চায় না ধীমান। তার যা হওয়ার হোক। এদেশে ওরকম কত ছেলেমেয়ে আছে, তাদের ক'জনকে ধীমান উদ্ধার করবে?

বিভাকে ধীমান ফোন করবে না, চিঠি লিখবে না, কিচ্ছু না। কোনও যোগাযোগ রাখবে না। বাপির মনে যাতে কোনও সন্দেহ দেখা না দেয়। বাপি আর একটু বড় হলে তাকে বুঝিয়ে বলা যেত যে টেলিফোনে নাম না জানিয়ে যারা ফোন করে, তারা এক ধরনের উন্মাদ, তাদের কথা বিশ্বাস করতে নেই। মা-বাবার বন্ধুদের মধ্যে কে ভালো, কে খারাপ, ও নিজেই তা বুঝতে শিখবে। কিন্তু এখন ওর যা বয়েস, তাতে ওর নরম মনে যে-কোনও খারাপ কথাই একটা ছাপ ফেলে যেতে পারে।

ধীমানের একা থাকাই অভ্যেস, কিন্তু হোটেলের ঘরের একাকিত্ব যেন অন্যরকম। কলকাতায় সন্ধেবেলা সে ইচ্ছে করলে যে কোনও একটা জায়গায় চেনাশুনো মানুষের কাছে যেতে পারত। কিন্তু এখানে সে কোথায় যাবে? সন্ধের পর থেকেই ঘরের মধ্যে বসে থাকা আর কেবল টিভি-তে আজেবাজে সিনেমা দেখা।

দু-তিনদিন পর থেকেই ধীমান বিয়ে করার কথা ভাবতে লাগল। বিভা তার মোহ ভেঙে দিয়েছে। সত্যিই তো বিভার সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক রাখা কতদিন সম্ভব? বিভা অত্যন্ত সৎ ও খাঁটি নারী, সে নিজের স্বামী বা সন্তানের মনে আঘাত লাগার মতন কোনও কাজ কখনও করবে

না। ধীমানকে সে ভালোবাসবে কিন্তু নিজের কাছে কখনও টেনে নেবে না।

এ কথা ঠিক, বিভার সামনে গিয়ে বসে থাকতে, তার সঙ্গে সাধারণ টুকিটাকি কথা বলতেও ভালো লাগত ধীমানের। কিন্তু এভাবে তো সারাজীবন কাটতে পারে না।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকেই বলে, এবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও, ধীমান! আর দেরি করলে সারাজীবন একাই থেকে যেতে হবে।

কিন্তু আটত্রিশ বছর বয়েসের একজন মানুষ কীভাবে বিয়ে করে?

কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক নেই ধীমানের। সেভাবে কারুর সঙ্গে মেশেনি। কলেজ জীবনে দু-একজনের সঙ্গে ভাব-টাব ছিল, তারা হারিয়ে গেছে কোথায়। গত সাত-আট বছর ধরে বিভা ছাড়া আর কোনও মেয়ের সামনে একা বসে গল্পও করেনি।

ধীমানের বাড়ির লোকেরা অনেকবার সাধাসাধি করতে-করতে এখন চুপ করে গেছে। সবাই ধরেই নিয়েছে, সে নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চায়। এবার কি ধীমান হঠাৎ নিজের মুখে নিজের বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারে। ধ্যাৎ, তা হয় না!

অনেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। বিজ্ঞাপনের ভাষাটাও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, উচ্চপদস্থ অফিসার পাত্রের জন্য সুন্দরী, গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। গান-বাজনা ও রান্না জানা চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই।

ধীমানের ছোট মামার বিয়ের সময় এই রকম একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বাংলা খবরের কাগজে রবিবারের পাতায়। এগারোশো-র বেশি চিঠি এসেছিল। বাড়িতে একেবারে চিঠির পাহাড়। কত মেয়ের বাবা কষ্ট করে চিঠি লিখেছে। সব চিঠি খুলে পড়াই হল না। শ-দেড়েক মাত্র খাম খুলে, পাত্রীদের ছবি দেখে উত্তর দেওয়া হয়েছিল আটজনকে। সাতটি মেয়ের বাবা-কাকারা পরপর এসে হাজির, একটি ক্ষেত্রে এসেছিল মেয়ের মা। তারপর ঘুরে-ঘুরে পাত্রী দেখা। কিন্তু পুরোটাই পণ্ডশ্রম হয়ে গেল। এর মধ্যে বড় মাসিমা কোথা থেকে তাঁর এক মাসতুতো বোনকে আমদানি করলেন, একেবারে সে বাড়িতে এসে উঠল, বিয়ে ঠিক হয়ে গেল তারই সঙ্গে।

নাঃ, ওরকম বিজ্ঞাপন দিয়ে বিয়ে করা ধীমানের ধাতে পোষাবে না। সে কোনওদিনও পাত্রী দেখতে যেতে পারবে না।

সন্ধের পর ধীমানের একমাত্র কাজ সেই ক্যাসেটটা বাজিয়ে শোনা। অন্তত দেড়শোবার তা শোনা হয়ে গেছে।

কার এত রাগ ধীমানের ওপর! কে বিভার সর্বনাশ চায়? সন্তানের কাছে মায়ের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ কথা যে বলতে পারে, সেরকম নিচ চরিত্রের মানুষ কে আছে? পরিচিত গণ্ডির মধ্যেই কেউ?

প্রথম-প্রথম আলাপের পর ধীমান দেখেছিল, অনেক পুরুষরাই বিভার চারপাশে ঘিরে থাকে। সুভাষ খানিকটা নির্বিকার ধরনের বলে অনেকেই ভেবেছিল, বিভার সঙ্গে আড়ালে প্রেম করা বুঝি সহজ। কিন্তু বিভা যে সেরকম মেয়েই নয়। সে যে এত রোমান্টিক, তা কেউ বোঝেনি। ধীমানও বোঝেনি, ধীমান অবশ্য বিভার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টাও করেনি। একবার সুভাষ, বিভা ও আরও তিন-চারজনের সঙ্গে ধীমানও বেড়াতে গিয়েছিল নেপাল। দিন দশেক একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে, এক হোটেলে থেকেছে। সেই সময়েই বিভার সঙ্গে ধীমানের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

বিভা বন্ধুত্ব শব্দটা তখনও বলেনি। সে বলেছিল, তোমার সঙ্গে আমার মনের তরঙ্গের একটা মিল আছে, ধীমান। অনেক কথা তুমি মুখে না বললেও আমি বুঝতে পারি।

যারা বিভার সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, তাদেরই কেউ এখন প্রতিশোধ নিতে চায়?

বিভার সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা হোক বা না হোক, এই অদৃশ্য শত্রুটিকে ধীমান একদিন

খুঁজে বার করবেই।

শিলিগুড়ি আসার দিন পনেরো পরই ধীমানকে একবার কলকাতায় যেতে হল। অফিসের জরুরি কাজে। তিনদিন থাকতে হবে।

প্লেনে এল ধীমান। দমদম থেকে ট্যাক্সি নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে না গিয়ে সোজা সে উঠল চৌরঙ্গি পাড়ার এক হোটেলে। কেউ জানবে না সে এসেছে। অফিসের মিটিং সেরে আবার ফিরে যাবে।

কিন্তু কলকাতার মানুষের পক্ষে কলকাতার হোটেলে থাকা যে কত কষ্টকর, তা ধীমান টের পেল দ্বিতীয় দিনে। এরকম আত্মগোপন করা প্রায় অসম্ভব। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ইচ্ছে করে কারুকে না কারুকে টেলিফোন করতে।

অনীশের দোকানে কিংবা ক্লাবে তাসের আড্ডায় সে তো যেতেই পারে। কিন্তু একবার তাকে দেখলেই সবাই হইহই করে উঠবে।

শেষ পর্যন্ত নিজের থেকে কারুর কাছে যেতে হল না, ধীমান ধরা পড়ে গেল।

সন্ধের পর ঘরের মধ্যে বসে থাকা অসম্ভব। একা-একা খেতেও ইচ্ছে করে না। ধীমান হোটেলের বারে এসে বসেছিল। দু-তিন পেগ পান করে এখানেই ডিনার সেরে নেবে।

হঠাৎ পেছন থেকে তার পিঠে চাপড় মারল একজন। ধীমান ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, অনীশ।

খুব একটা বিস্ময়ের ভাব না দেখিয়ে অনীশ বলল, ক'জনের কাছে টাকা মেরে পালিয়েছিস রে?

ধীমান বলল, টাকা মেরেছি? কার টাকা মেরেছি!

অনীশ বলল, তোর ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলাম। তুই কারুকে কিছু না জানিয়ে চুপি-চুপি পালিয়ে গেছিস কলকাতা ছেড়ে। টাকা ধার করেই লোকে এভাবে পালায়।

ধীমান বলল, পৃথিবীর কেউ আমার কাছে এক পয়সাও পায় না।

—আমিই তো তোর কাছে দু-হাজার টাকা পাই। টাকাটা ছাড়ো তো চাঁদু!

—তুই দু-হাজার টাকা পাবি? কবে নিলাম?

—বলছি, তার আগে এক পেগ রাম আর এক প্লেট বোনলেস চিকেনের অর্ডার দে। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

অনীশের কাঁধে সর্বক্ষণ ক্যামেরা ঝোলে। ক্যামেরাটা সে রেখে গেল টেবিলের ওপর।

ধীমান আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। অনীশের কাছে সে আবার ধার নিল কবে? ধার নেওয়ার অভ্যেসই নেই তার।

অনীশ আগেই বেশ খানিকটা মদ্যপান করেছে বোঝা যায়। সিনেমার লাইনে তার অনেক বন্ধু। প্রায় রাত্তিরেই সে বিভিন্ন বারে ঘুরে বেড়ায়। এখানে অনেক টেবিলেই তার চেনা লোক। বিভিন্ন টেবিলে দু-এক মিনিট করে দাঁড়িয়ে, হাত-পা নেড়ে কথা বলে একসময় সে ফিরে এল ধীমানের কাছে।

ফিসফিস করে বলল, যদি বাঁচতে চাস তো চল, এখান থেকে পালাই! কোণের টেবিলে সাত্যকি বসে আছে। তোকে দেখলেই এসে ধরবে!

ধীমান ভুরু কুঁচকে বলল, সাত্যকিকে ভয় পাওয়ার কী আছে? এখন কোথাও যাব না!

অনীশের জন্য রাম এসেছে। সে একটা চুমুক দিয়ে বলল, তুই কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছিস রে?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধীমান সরাসরি জিগ্যেস করল, তুই আমার কাছে দু-হাজার টাকা পাবি বললি, কিসের জন্য বল তো।

—তোর পরোপকারের ঘটা। তোর ওই যে মেয়েটা, হিমানী না কী যেন নাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিমানী দে সরকার, তার তো একটা হিল্লে হয়ে গেছে রে!

—সে আমার মেয়ে হতে যাবে কেন? আমি তোকে বলেছিলাম, যদি মেয়েটাকে সিনেমার কোনও কাজ দিতে পারিস—

—এখন ওসব বললে তো হবে না। তুমি মহৎ সেজে তার উপকার করতে গিয়েছিলে! ওরকম মেয়ে তো কতই আছে! তোমার কথা শুনে আমি অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়েছি। সে এখন আর বস্তিতে নেই। সে আছে বনানীদেবীর বাড়িতে।

—বনানীদেবীটা আবার কে?

—বনানীদেবীকে চিনিস না? তুই বাংলা সিনেমার কোনও খবর রাখিস না। এককালে নায়িকা ছিলেন, বেশি চান্স পাননি অবশ্য, পাঁচ ছ-খানা। এখন মায়ের পার্ট একেবারে বাঁধা। সব বাংলা সিনেমায় মা হচ্ছে ওই বনানী। ঝগড়ুটে মা, কুচক্রী মা, উদার মা, গরিবের মা, বড়লোকের মা, যা চাস। সেই বনানীর বাড়িতে এ মেয়েটার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

—অর্থাৎ সে একজন ফিলম অ্যাকট্রেসের বাড়ির ঝি হয়েছে? এতে তার কী উন্নতি হল?

—মোটেই না। ঝি কেন হবে? আমি বনানীকে বলে দিয়েছি, খবরদার, ওকে দিয়ে বাড়ির কাজ করাবে না।

—তা হলে সেখানে শুধু-শুধু থাকতে গেল কেন?

—বস্তিতে থাকলে কোনওদিন ফিলমে চান্স হবে না। ওকে কথাবার্তা কইতে শিখতে হবে। হাঁটাচলা শিখতে হবে। উচ্চারণ শিখতে হবে। বনানীর কাছে সে সব শিখবে।

—তারপর ওকে কোনও ফিলমে নেবে?

—সে ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু তার আগে ওকে দু-সেট জামা-কাপড় কিনে দিয়েছি। মেয়েটার মাকে এক হাজার টাকা দিয়েছি। তোর চোখ আছে, ধীমান। হিমানী জেনুইন ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে। ওর বাবা ওদের ছেড়ে চলে গেছে, প্রচুর ধারদেনা রেখে। সেইজন্যই বস্তিতে...তুই কিন্তু আমাকে দু-হাজার টাকা দিবি।

—ঠিক আছে, দেব। কিন্তু এই একবারই। আমি অনবরত ওর জন্য টাকা দিয়ে যেতে পারব না।

শুটিং শুরু হলে ও নিজেই কিছু টাকা পাবে। তারপর ওর ভাগ্য। যদি ভালো করতে পারে, তা হলে আরও চান্স পাবে। আর যদি না পারে, হারিয়ে যাবে! কিন্তু তখন আর বস্তিতে ফিরে ঝি-গিরি করতে পারবে না। একবার রূপালি পর্দার ছোঁওয়া লাগলে কেউ আর ফেরে না।

—অনীশ, সত্যি করে বল তো, মেয়েটাকে নিয়ে এরকম এক্সপেরিমেন্ট করাটা কি ভুল হল?

—ও যে অবস্থায় ছিল, তার চেয়ে আর কী খারাপ হতে পারে? একটা লাক-ট্রাইয়ের খেলা হচ্ছে। এই সুযোগই বা কজন পায়। বস্তিতে থাকলে আর ক'দিন বাদে ওর অবস্থা কি হত জানিস? ওর মা কোনও এলেবেলে লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে বাধ্য হত। অথবা বস্তির অন্য ছেলেরা ওর ওপর জুলুম করত। কয়েক বছরের মধ্যেই ওর দুটো-তিনটে বাচ্চা হয়ে যেত, হাড়-জিরজিরে চেহারা...। আমাদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে, তার তিনটে বাচ্চা, স্বামী খেতে দেয় না। বেশিরভাগ ঝিদেরই দেখবি স্বামী নেই, কয়েকটা বাচ্চা হওয়ার পর স্বামীরা পালায়। অথবা অসুস্থ, পঙ্গু স্বামীকে বউরাই কাজ করে খাওয়ায়। দেখা যাক ওর কী হয়।

—ঝানু ফিল্ম অ্যাকট্রেসের বাড়িতে থাকবে, সেখানকার পরিবেশ—

—সে ব্যাপারে কোনও ভয় নেই। বনানীর একটা গুণ আছে, সে কখনও বেশ্যাবৃত্তি করেনি। তারও স্বামী নেই। ডিভোর্স হয়ে গেছে। এখন একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু বাড়িতে কোনও আজেবাজে লোকদের প্রশ্রয় দেয় না। শুটিংয়ের সময় তো দেখেছি কতবার, তার আত্মসম্মানবোধ আছে। মেয়েটা ওর কাছে ভালোই থাকবে।

—টাকা তোকে দেব, অনীশ। কিন্তু তুই ঘুণাক্ষরেও ওদের কাছে আমার নাম বলিসনি তো?

—তা বলিনি। ওদের কাছে বলিনি। শুধু একজনকে জানাতেই হয়েছে ভাই। আমার বউকে। সে আমার টাকা-পয়সার সব হিসেব রাখে। একটা বস্তির মেয়ের জন্য আমি দু-হাজার টাকা খরচ করেছি, এতে সে সন্দেহ করবে না আমাকে? সুতরাং তোর কথা বলতেই হয়েছে। টাকাটা কি সাধে ফেরত চাইছি! শুধু তাই না, আমার বাড়িতে গিয়ে তোকে নিজের মুখে বলেও আসতে হবে। তুই ব্যাচেলর, তোর সাতখুন মাপ!

এই সময় ঈষৎ টলতে-টলতে সাত্যকি এসে দাঁড়াল ওদের টেবিলের সামনে।

চোখ পাকিয়ে ধীমানকে বলল, এই শালা, তুই তাসের আড্ডায় আর আসিস না কেন রে?

ধীমান যে কলকাতায় থাকে না, সে কথাই জানে না সাত্যকি। আরও কয়েকটা গালাগালি দিতে লাগল সে। ধীমান জানে, এই সময় প্রতিবাদ জানিয়ে বা তর্ক করে লাভ নেই। মাতাল কোনও যুক্তি বোঝে না। সে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সাত্যকি একটু পরে তার জামা খিমচে ধরে বলল, চলো, এখন ক্লাবে চলো, তাস খেলব!

ধীমান বলল, কাল যাব। এখন কেউ থাকবে না। কাল ঠিক যাব।

সাত্যকি কিছুতেই ছাড়বে না।

অনীশ তার দিকে চোখের একটা ইঙ্গিত করে বলল, চল, ধীমান, ক্লাবেই যাওয়া যাক। এখানে শুধু-শুধু বেশি পয়সা দিয়ে লাভ কী?

তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। অনীশের একটা ছোট গাড়ি আছে, খুব মাতাল হলেও সে স্টিয়ারিং-এ বসলে টান-টান হয়ে যায়। ধীমান ওদের মতন বেশি মদ্যপান করে না, বেশি পান করাটা সে উপভোগ করে না। সে ক্লাবে গিয়ে একটুক্ষণ থেকেই কেটে পড়বে ঠিক করল।

সুভাষ আর বিভা এই তাস খেলার আসরে কখনও আসে না। বিভার সঙ্গে দেখা হবে না, এই একটা ব্যাপারে ধীমান নিশ্চিন্ত।

বিভার সঙ্গে আর দেখা হবে না, এটা খুব সহজেই মেনে নিয়েছে ধীমান। সত্যিই কি মানাটা খুব সহজ? যুক্তির বিচারে তো ঠিকই আছে, বিভার জীবনে যাতে ক্ষতি না হয়, তার সন্তানের মনে যাতে কোনও আঘাত না লাগে, তা তো দেখতেই হবে। কিন্তু কলকাতায় আসার পর, অন্তত টেলিফোনেও একবার বিভার গলার আওয়াজ শুনতে কতবার যে ইচ্ছে হয়েছে!

রাত এখন সাড়ে ন'টা। ক্লাবের তাসের আড্ডায় এখনও রয়েছে সাত-আটজন। তাদের মধ্যে দুজন মহিলা, তৃষা আর অনিন্দিতা। রামি খেলায় তৃষা প্রায় প্রতিদিনই জেতে। সবচেয়ে বেশি হারে সাত্যকি। দু-খানা বেশ চালু নোটবই লিখেছে সাত্যকি, ভালো রোজগার, তাস খেলায় হারলেও তার গায়ে লাগে না। অন্যের পয়সায় কখনও মদ খায় না সে।

এদের মধ্যে শেখরকেও দেখতে পেল ধীমান। আগে কখনও সে এখানে আসেনি।

সে জিগ্যেস করল, কী রে শেখর, তুই দিল্লি থেকে কবে ফিরলি?

শেখর বলল, কবে ফিরলাম মানে? ওঃ হো, সেই যে তুই এয়ারপোর্টে গিয়েছিলি...তার দু-দিন পরেই তো ফিরেছি। তারপরেও আরও দু-বার যেতে হয়েছে এর মধ্যে। প্রায়ই যেতে হয়। একদিন তোর অফিসে ফোন করলাম। শুনলাম তুই ট্রান্সফার্ড! সুভাষদার বাড়িতে গিয়েছিলাম, ওরা জানে না তুই কোথায় চলে গেছিস!

তৃষা বলল, রিটার্ন অফ দা প্রডিগাল সান। কোথায় পালিয়েছিলে ধীমান?

সাত্যকি বলল, এই শুয়ারের বাচ্চাটাকে আমি ধরে নিয়ে এলাম। একটা বারে ঘাপটি মেরে বসেছিল। একা-একা চুকচুক করে মদ খাচ্ছিল।

অনীশ বলল, একা একা কোথায়? ধীমান আমার সঙ্গে বসেছিল।

সাত্যকি বলল, তুই চুপ মার শালা! তুই তাস খেলিস না, তোর কথা কে ধরছে?

তৃষা বলল, ল্যাঙ্গোয়েজ, ল্যাঙ্গোয়েজ, সাত্যকি! তুমি বড্ড মুখ খারাপ করো!

সাত্যকির মুখে শুয়ারের বাচ্চা শব্দটা ধীমানের কানে খট করে লাগল। সেই টেপে আছে, ‘শুয়ারের বাচ্চা ধীমান’। তা হলে কি সাত্যকিই? সাত্যকি তো বিভাকে ভালো করে চেনেই না।

নতুন করে তাস দেওয়া শুরু হল। অনীশ খেলবে না। সে অন্য টেবিলে আড্ডা দিতে গেল। প্রথম কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে তাসে মন দেয়।

তারপর একসময় সুবিমল জিগ্যেস করল, তুমি প্রমোশন পেয়ে কোথায় চলে গেলে, ধীমান? ভয় নেই, আমরা তোমার কাছে গিয়ে হামলা করব না। জায়গাটার নামও বলবে না?

শেখর বলল, বিভা বউদিও বলল, ধীমানটা একটা আশ্চর্য ছেলে, কোথায় চলে গেল, একবার আমাদের জানিয়েও গেল না?

তৃষা খুব সূক্ষ্ম একটা খোঁচা মেরে বলল, হ্যাঁ, বিভা পর্যন্ত জানে না। আমরা জানব কী করে।

ধীমান বলল, শিলিগুড়ি। হঠাৎ চলে যেতে হল, কারুকে খবর দেওয়ারও সময় পাইনি!

সাত্যকি বলল, শালা, টেলিফোন করেও জানাতে পারিসনি। এত বড় কাজের লোক হয়েছিস!

এবারেও তৃষা জিতল।

আবার তাস দিতে শুরু করার আগে শেখর বলল, আমি এবার উঠব। আমাকে আর দিও না।

সাত্যকি জড়ানো গলায় বলল, বোস না শালা। তোর তো বউ পালিয়েছে, তোর অত বাড়ি ফেরার তাড়া কিসের?

অন্য সবাই ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে সাত্যকির দিকে তাকাল। একটা বিশেষ মহলে কোনও খবরই কারুর অজানা থাকে না। কিন্তু কেউ এ প্রসঙ্গটা প্রকাশ্যে উত্থাপন করে না। এরকমভাবে শেখরকে কথাটা বলা সাত্যকির একেবারে উচিত হয়নি।

শেখর শুকনো গলায় বলল, কাল সকালবেলা আমাকে বম্বের ফ্লাইট ধরতে হবে না? আমি তাস খেলতে ভালো পারিও না। আউটডোর খেলাই আমার পছন্দ।

ধীমান উঠে দাঁড়িয়ে সাত্যকির দিকে চেয়ে রূঢ় গলায় বলল, আমিও আর সাত্যকির সঙ্গে খেলতে চাই না। ও একেবারে যা-তা মাতাল হয়ে গেছে।

সাত্যকি একটা হাত নাড়তে-নাড়তে বলল, যা, যাঃ।

পরিবেশটা হালকা করার জন্য তৃষা বলল, তোমরা দুজনে বুঝি বিভাদের ওখানে আড্ডা দিতে যাচ্ছ? তা হলে আমরাও একসময়ে গিয়ে হানা দেব!

ধীমান দু-দিকে মাথা নাড়ল।

অনীশ অন্য একটা দলের সঙ্গে জমে গেছে, সে এখন আসবে না। শেখর আর ধীমান সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। শেখর ধীমানকে একটা সিগারেট দিয়ে বলল, আমি তো তোদের ক্লাবের মেম্বার নই, তৃষা-সুবিমলই আজ আমায় ডেকে আনল।

ধীমান জিগ্যেস করল, ওদের সঙ্গে তোর আলাপ ছিল বুঝি? জানতাম না।

শেখর বলল, সুভাষদার বাড়িতে দেখেছি কয়েকবার। সামান্য আলাপ। ওরা আগামী মাসে ইউরোপ যাবে। আমাদের অফিসে এসেছিল টিকেটের খোঁজটোজ নিতে। সেইখানে দেখা। তারপর ক্লাবে নেমন্তন্ন করল। সাত্যকিদাকে আমি অবশ্য অনেকদিনই চিনি। উনি প্রায়ই বিদেশে যান, আমাদের ক্লায়েন্ট। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস, তৃষা বিভা বউদিকে পছন্দ করে না, হিংসে করে। অথচ ওপরে-ওপরে খুব ভাব।

ধীমান বলল, সে তো অনেক মেয়েই বিভাকে হিংসে করে।

শেখর বলল, আসল কারণটা জানিস? ওই সুবিমল একসময় বিভা বউদির প্রেমে পড়েছিল। একেবারে হাবুডুবু অবস্থা। অথচ একতরফা। বিভা বউদির দিক থেকে কিছুই ছিল না। আমি তো

আমার বউদিকে চিনি। ওঁর মনটা একেবারে পরিষ্কার, পবিত্র।

ধীমানের হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এতক্ষণ সুবিমল একটাও কথা বলেনি। কেন? সে আর ওর গলার আওয়াজটা শোনাতে চায় না? বিভাকে মাঝরাত্তিরে যে টেলিফোন করে, সে কি জেনে গেছে যে তার কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয়ে গেছে? আর সেই ক্যাসেট আছে ধীমানের কাছে?

কোন মানুষের ভিতরটা যে কীরকম তা জানা একেবারে অসম্ভব!

সুবিমল? তা কি হতে পারে? ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা? এতদিন পর!

শেখর ধীমানের একটা হাত ছুঁয়ে বলল, তুই আমার সঙ্গে উঠে এলি, তুই আমার প্রকৃত বন্ধু।

ধীমান অনুভব করল, সাত্যকির কথাটা শেখরের মনে খুব লেগেছে। এমনিতেই ওর মনটা এখন খুব নরম হয়ে আছে।

বিবাহিত জীবনে কিছুতেই সুখী হতে পারল না শেখর। ওর প্রথম স্ত্রী বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই মারা যায়। কেউ-কেউ বলে, সে আত্মহত্যা করেছিল। এই নিয়ে একটা চাপা গুজব ছিল একসময়। ধীমান তাতে কান দেয়নি। রান্নাঘরের গ্যাস ফেটে গিয়ে আগুন লাগে, অনেকের ধারণা সে ইচ্ছে করে গায়ে আগুন লাগিয়েছিল। কোনও পুলিশ কেস অবশ্য হয়নি। শেখরের সেই প্রথম স্ত্রী ছিল এম এ পাশ, সুন্দরী তরুণী। একটা স্কুলে পড়াত। শেখরের দ্বিতীয় বিয়ে হল সিউড়ির একটি সাদামাটা মেয়ের সঙ্গে। সরল, স্বাস্থ্যবতী সেই মেয়েটিকে দেখেছে ধীমান। তার নাম অনন্যা, তার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগত। শেখর তাকে নিজের মতন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। সেই অনন্যা যে এমন কাণ্ড করবে তা কল্পনাও করা যায়নি। মাত্র ছ'মাস আগে সে শেখরেরই এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে। শোনা যায়, ওরা এখন আছে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে।

ধীমান হোটেলে থাকে শুনে দারুণ অবাক হয়ে গেল শেখর। দুজনের বাড়ি দু-দিকে। ধীমান বলল, আমি ট্যাক্সি নিচ্ছি, তোকে নামিয়ে দিয়ে যাব। আমার হোটেলের পথেই পড়বে।

শেখর বলল, কেন, হোটেলে যাবি কেন?

ধীমান বলল, অফিস থেকে পয়সা দিচ্ছে। নিজের ফ্ল্যাটে থাকলে আবার রান্নাবান্নার ঝামেলা। কাজের লোক তো নেই। হোটেলেই সুবিধে।

শেখর বলল, তুই আমার বাড়িতে থাকতে পারিস। আমার একজন বাবুর্চি আছে, ভালো রান্না করে। আমি কলকাতায় না থাকলেও কোনও অসুবিধে নেই।

ধীমান বলল, আবার কবে আসব তার ঠিক তো নেই। আমার কলকাতা শহর ভালো লাগে না। শিলিগুড়ি বেশ পছন্দ হয়ে গেছে, ইচ্ছে হলেই আলিপুরদুয়ার, জলদাপাড়ার জঙ্গলে ঘুরে আসা যায়।

শেখর কিছুতেই ছাড়ল না। ওর বাড়িতে একবার নামতে হল।

বাড়িটা পৈতৃক, একতলা ও তিনতলায় শেখরের দুই দাদা থাকে, দোতলাটা শেখরের নিজস্ব। দাদাদের সঙ্গে ওর বিশেষ সম্পর্ক নেই।

ওপরে এসেই শেখর হুইস্কির বোতল আর গেলাস বার করল।

ধীমান আর কিছুতেই খেতে চায় না। শেখর ঢেলে ফেলেছে দুটি গেলাশে। নিজের গেলাস তুলে বলল, দে, দে, চুমুক দে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা আপন মনে আবার বলল, আমার কোনও বন্ধু নেই রে! এখন আর কারুকে বিশ্বাস করতে পারি না। তোর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে কী চমৎকার দিনগুলো কেটেছিল! তুইও আর কলকাতায় থাকবি না?

ধীমান বলল, তোর তো প্লেনের টিকিটের পয়সা লাগে না। মাঝে-মাঝে শিলিগুড়ি চলে আসতে পারিস।

শেখর বলল, হ্যাঁ, যাব।

ধীমান দেখল, কলকাতায় তার ফ্ল্যাটটার সঙ্গে শেখরের এই ফ্ল্যাটের একটা বেশ বড় তফাত আছে। যদিও একজন বৃদ্ধ বাবুর্চি ছাড়া আর কেউ নেই, তবু একটা মেয়েলি গন্ধ যেন এখনও রয়ে গেছে। অনেক কিছুতেই অনন্যার স্পর্শ। একবার বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখা গেল ওদের শোবার ঘর। ড্রেসিং টেবিলের ওপর মেয়েদের পাউডারের কৌটো, ক্রিম, বড়-বড় দাঁড়ার চিরুনি সাজানো রয়েছে। শেখর কিছুই সরায়নি। খুব সম্ভবত আলমারি খুললে পাওয়া যাবে অনন্যার শাড়ি। অনন্যাকে শেখর সত্যিই ভালোবাসত।

শেখর জিগ্যেস করল, তুই শিলিগুড়িতে একলা-একলা থাকবি। এইভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দিবি?

ধীমান বলল, না, এবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছি। একা-একা আর থাকতে ভালো লাগে না। অনেকদিন তো হল। এবার বিয়ে করে ফেলব ঠিক করেছি।

শেখর চমকে উঠে বলল, বিয়ে করবি? কাকে? ঠিক করে ফেলেছিস?

—সেরকম কিছু ঠিক করিনি। দেখা যাক।

—কোনও মেয়ের কথা মনে-মনে ভাবিসনি?

—না রে! সেরকমভাবে তো মিশিনি কারুর সঙ্গে।

শেখর চুপ করে গেলাসে চুমুক দিতে লাগল। প্রায় শেষ করে এনেছে।

ধীমান নিজের গেলাস এখনও ছোঁয়নি। সে ভাবল, বিয়ের কথাটা বলা কি ভুল হল? যার বউ সদ্য ছেড়ে চলে গেছে, তার সামনে অন্য একজনের বিয়ের কথা বলাটা বোধহয় উচিত নয়। এত ভেবেচিন্তে কি কথা বলা যায়?

শেখর বলল, পুরুষ মানুষের জীবনে কোনও নারী না থাকলে সবকিছু নীরস হয়ে যায়। একজন কারুকে দরকার, কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটার ওপরেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

॥ ছয় ॥

অনীশের স্ত্রী সীমার সঙ্গে ধীমানের ভালো পরিচয় হয়নি কখনও। অনীশ নিজের বাড়িতে বন্ধু-বান্ধবদের বিশেষ ডাকে না, সেখানে মদের আসর বসায় না। বিভিন্ন পার্টিতেও অনীশ সঙ্গে আনে না তার স্ত্রীকে। অনীশ বলে, ওর বউ আসতে চায় না ওসব জায়গায়।

অনীশের ছোট ছেলের মুখে-ভাতের সময় নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল ধীমান। তখন সে সীমাকে দেখেছে। উৎসবের ব্যবস্থার মধ্যে সীমার সঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগ হয়নি।

অনীশ তার স্ত্রীকে ভয় পায়, কিন্তু আড়ালে তাকে নিয়ে মস্করা করে। আড়ালে স্ত্রীকে বলে, হার হাইনেস। এক একদিন আড্ডা ছেড়ে আগে উঠে পড়ার সময় বলে, হার হাইনেসের হুকুম, আজ নটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। তাকে তো চিনিস না, জজ সাহেবের মতন মেজাজ!

শিলিগুড়ি ফেরার দিন দশেক পর একদিন সকালবেলা হোটেলের দরজা খুলে একজন মহিলাকে দেখে ধীমান বেশ অবাক হয়ে গেল। সে বাথরুমে স্নান করছিল, দু-তিনবার বেলের আওয়াজ শুনে সে তোয়ালে পরে খালি গায়ে বেরিয়ে এসেছে। ভেবেছি, কোনও বেয়ারা বোধহয় বেল দিচ্ছে।

মেরুন রঙের শাড়ি-পরা মহিলাটি বেশ লম্বা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, মাজা-মাজা গায়ের রং, সুন্দরী বলা যায় না, তবে পরিচ্ছন্ন ও সুশ্রী ভাব আছে। চোখের দৃষ্টি স্পষ্ট, সোজাসুজি তাকাতে পারে।

খানিকটা অস্বস্তি ও খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে ধীমান বলল, ইয়েস?

মহিলাটি একটু হেসে বলল, আমি সীমা।

নামটা শুনেও কিছু মনে পড়ল না ধীমানের। শিলিগুড়িতে সকাল আটটায় সে হোটেলের ঘরের দরজায় অনীশের স্ত্রীকে দেখতে পাবে, এটা প্রায় অসম্ভবের কাছাকাছি।

ধীমানের ভুরু কোঁচকানো চোখ দেখে সীমা বলল, আমরা তো আজ ভোরে দার্জিলিং মেলে পৌঁছেছি। অনীশ চলে গেল কালীঝোড়া বাংলোয় ইউনিটের সঙ্গে, আমরা উঠেছি এই হোটেলেই।

ধীমান বলল, অনীশ মানে, ও আপনি? কী আশ্চর্য, বুঝতেই পারিনি, আসুন, আসুন।

সীমা বলল, আপনি স্নান করছিলেন, আমি পরে আসব, আমাদের রুম নাম্বার দুশো নয়।

ধীমান বলল, আমার হয়ে গেছে, আর এক মিনিট লাগবে, বসুন এসে ভেতরে।

ধীমানের এটা ঠিক সাধারণ ঘর নয়, সুইট। সামনের দিকে খানিকটা বসবার জায়গা, তারপর বেডরুম। বাথরুমের পাশে ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেবিল।

সে চটপট ভেতরে গিয়ে জামাপ্যান্ট পরে চুল আঁচড়ে নিল।

দরজার তলা দিয়ে স্থানীয় একটা খবরের কাগজ দিয়ে গেছে, সীমা সেটা পড়ছে।

ধীমান বলল, অনীশ আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেয়নি, সেই জন্য আমি প্রথমটায় আপনাকে চিনতে পারিনি।

সীমা বলল, আমার ছেলে দুটি তো ছোট, বাড়িতেও বেশি জায়গা নেই। ওদের পড়াশুনোর অসুবিধে হয়, তাই ওকে বলেছিলাম, বাড়িতে আড্ডা বসিও না। আর সিনেমার লোকজনেরা বড্ড রাত করে। তা বলে আপনাকে দু-একদিন অবশ্যই নিয়ে যেতে পারত ছুটি-টুটির দিনে।

—ছেলেমেয়েরাও এসেছে?

—না ওদের রেখে এসেছি আমার মায়ের কাছে। ওখানে ভালো থাকে। হঠাৎ পুরুলিয়ার বদলে এখানে একটা ফিলমের শুটিং-ডেট পড়ল। আমি ওর সঙ্গে চলে এলাম।

—আপনি তো কখনও কোথাও যান না শুনেছি।

—হ্যাঁ, ছেলেদের পড়াই। আমার অন্য কাজও আছে। তাই কোথাও যাওয়া হয় না। এবারে বিশেষ করে এলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য।

দরজায় আবার বেল। বেয়ারা ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধীমানের ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়।

ধীমান জিগ্যেস করল, আপনি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবেন?

সীমা বলল, আমি স্নান-টান করে একেবারে খেয়ে এসেছি। আপনি খান, লজ্জা করবেন না। আপনি দুটো ডিম সেদ্ধ খান? রোজ?

ধীমান বলল, হ্যাঁ। কেন?

সীমা বলল, আপনার বন্ধুও খুব ডিম ভালোবাসত। এখন কোলেস্টেরলের ভয়ে একদিন অন্তর একটা করে খায়। আপনিও রোজ দুটো খাবেন না।

ধীমান হেসে বলল, আমার কোলেস্টেরলের ভয় নেই।

—আপনি শুটিং দেখতে যাবেন না? বেলা একটা থেকে শুরু হবে।

—আমার তো অফিস আছে।

—অফিস থেকে বেরুতে পারবেন না বুঝি?

—না, অনেক কাজ থাকে, বেরুনো মুশকিল। তাছাড়া শুটিং মানে, এমনিতেই তো খুব বোরিং হয়, তাও বাংলা ছবির গল্প, কোনও মাথামুন্ডু থাকে না। আমার দেখার কোনও আগ্রহ নেই।

—আপনি আজ যাবেন। আপনাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ধীমান খাওয়া থামিয়ে, ছুরি-কাঁটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

এরকম কথা সে কখনও শোনেনি। সে যেতে চায় না, তবু এই মহিলাটি জোর দিয়ে বলছে তাকে নিয়ে যাবে!

ধীমান এবার জোর দিয়ে বলল, না, না, শুটিং-টুটিং আমি দেখতে যেতে পারব না। বরং সন্ধেবেলা আপনারা ফ্রি থাকলে গল্প করা যাবে।

—আপনি এই ব্রেকফাস্ট খেয়েই বেরুবেন? ততক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিসে পৌঁছোই। আরও এক ঘণ্টা সময় আছে।

—ধীমানবাবু, আপনি অন্য আর পাঁচজনের মতন নন, সেইজন্যই আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

—তাই নাকি? কিসে আমি অন্যদের থেকে অলাদা হলাম? আমি সাধারণ একজন ব্যাঙ্কের চাকুরে। অন্য কোনও গুণ নেই।

—যাদের অন্য গুণও থাকে, তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আপনি অন্যদের কথা ভাবেন। ধীমানবাবু, আমি একটা অনাথ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। ঢাকুরিয়াতে কিছু উৎসাহী লোক সেটা খুলেছে, আমি প্রায়ই সেখানে যাই। পয়সাকড়ি দিয়ে বিশেষ সাহায্য করতে পারি না। আপনার বন্ধু তো উড়নচণ্ডী, টাকাপয়সা চোখে দেখতেই পাই না, তবে ওই অনাথ আশ্রমে আমি যাই, বাচ্চা ছেলেমেয়েদের পড়াই, কিছু-কিছু হাতের কাজ শেখাই—

—আপনি নিজের ছেলেদের পড়িয়েও সময় পান?

—ইচ্ছে করলে সবাই সময় করে নিতে পারে। শুধু নিজের ছেলেমেয়েদের পড়ানোটা এক ধরনের স্বার্থপরতা নয়? ওখানকার ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করতে পারলে মনটা ভালো থাকে।

—আপনিই তো দেখছি আর পাঁচজনের মতন নয়।

—আপনার কথা শুনেছি। আপনি বেশ কয়েকটি বেকার ছেলের জন্য চাকরি করে দিয়েছেন। আজকাল ক'জন আর এসব নিয়ে মাথা ঘামায় বলুন।

—আমায় লজ্জা দিচ্ছেন। এটুকু তো সবাই করে। চেনাশুনো লোকদের বলে যদি চাকরির ব্যবস্থা করা যায়...আমাদের ব্যাঙ্কে অনেক ব্যবসায়ীই তো আসে...

—আপনি হিমানী নামে মেয়েটিকে বস্তি থেকে তুলে আনার ব্যবস্থা করেছেন। ওর জন্য টাকা খরচ করেছেন!

ধীমান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ এমন কিছু ব্যাপার নয়। অনীশই তো বলেছে, এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট।

সীমা তাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে-করতে বলল, আমি এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট পছন্দ করি। তবে বিশেষ কেউ তো করে না। হিমানীর ওপর আমি চোখ রেখেছি, সপ্তাহে অন্তত দু-তিনদিন ওকে দেখতে গেছি বনানীর বাড়িতে। সিনেমার লোকজনদের বাড়িতে আমি কখনও যাই না। তবু গেছি ওই মেয়েটার জন্যই। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, বনানীর বাড়ির আবহাওয়া ভালো। এর মধ্যে একদিন কী হয়েছে জানেন না?

—আমি তো কোনও খবরই রাখি না আর।

—কেন রাখেন না? একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলেন, তার ফলাফল কী হল জানতে চাইবেন না? ধীমানবাবু, ভুলে যাবেন না, এটা একটা খেলা নয়, একটি মেয়ের জীবন!

—আপনি বুঝি আমাকে বকুনি দিতে এসেছেন এখানে?

—ওমা, আপনাকে বকুনি দিলাম কোথায়? আপনি তো আমার মনের মতন লোক, আমার স্বামীর মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন নন।

—অনীশ যথেষ্ট দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছে। সে-ই তো সব ব্যবস্থা করেছে।

—সে তো আপনারই ইচ্ছে অনুসারে। আইডিয়াটা আপনার।

—সে যাই হোক। দেখুন, আমি অনীশকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার নামটা কারুকে না জানাতে। বিশেষত ওই মেয়েটি যেন জানতে না পারে। আমি আড়ালে থাকতে চাই।

—কেন?

—মানে, এমনিই...সবাই জানুক, আমার দিকে তাকিয়ে থাকুক, এটা আমি চাই না।

—ও একটা কমবয়েসী মেয়ে, এই জন্য তো? আপনি কিছু-কিছু বেকার ছেলেকে সাহায্য করেছেন। সেটা আপনার মহত্ত্ব আর একটি অসহায় মেয়েকে সাহায্য করলেই লোকে খারাপ কোনও মতলব দেখতে পাবে? এটা আপনি গ্রাহ্য করবেন কেন? আপনি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসুন, মেয়েটির পাশে-পাশে থাকুন, থেকে বুঝিয়ে দিন যে আপনার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। শুনুন, ধীমানবাবু, একটা মেয়েকে শুধু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করাই যথেষ্ট নয়। কিছুটা মানবিক সহানুভূতিও দরকার। সে যদি বুঝতে পারে কেউ একজন তার পাশে আছে, বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবে, তা হলে সে জোর পায়।

—ওই ভূমিকাটা আমি ঠিক নিতে পারি না। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক। আপনিই তো নিচ্ছেন, আপনি মেয়েটি সম্পর্কে উৎসাহ দেখাচ্ছেন!

—না, ধীমানবাবু। শী ইজ ইয়োর বেবি! আমি কিংবা অনীশ কিছু-কিছু দায়িত্ব নিতে পারি বটে, কিন্তু আপনি যখন শুরু করেছেন, পুরোটাই আপনার দেখা উচিত। সেইজন্যই আপনাকে বলছিলাম আজ শুটিং-এ যেতে। হিমানী আজই প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে।

—অ্যাঁ? মেয়েটি এখানে এসেছে? অনীশ যে বলেছিল, দু-মাসের আগে কোনও ছবির সুযোগ হবে না?

—সেরকমই ঠিক ছিল। হঠাৎ এই ছবিতে একটি মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ছোট রোল। তার জায়গায় হিমানীকে চেষ্টা করে দেখা হচ্ছে যদি পারে। বনানীই ব্যবস্থা করেছে, তার মেয়ের পার্ট, সে মানিয়ে নেবে বলেছে।

—ওরা সবাই এই হোটেলে থাকবে নাকি ?

—আপনি এত ভয় পেয়ে যাচ্ছেন কেন, ধীমানবাবু?

সীমা এবার বেশ জোরে হেসে উঠল। সত্যি ধীমানের মুখে-চোখে বেশ উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। সেটা ঢাকবার জন্য সে একটা সিগারেট ধরাল।

সঙ্গে-সঙ্গে সীমা বলল, সিগারেটটা একটু পরে খেলে হয় না? আমি সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারি না।

সীমার কণ্ঠস্বরে এমনই ব্যক্তিত্ব আছে যে ধীমান সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি।

হুকুমের সুরে নয়, খানিকটা অনুনয়ের সুরে সীমা বলল, সিগারেটটা আস্তে-আস্তে ছেড়ে দিন। কী দরকার খাওয়ার? আমি অনীশকে ছাড়িয়েছি।

ধীমান বলল, আপনার খুব স্বাস্থ্যবাতিক আছে দেখা যাচ্ছে!

—আমি তো মদ খেতে বারণ করি না। তা হলে আপনি যাচ্ছেন আজ শুটিং-এ?

—না।

—ঠিক আছে, আজ না হয় কাল যাবেন। আট দিন চলবে। আপনি শিলিগুড়িতে থাকলে সিনেমার লোকজনদের এড়াতে পারবেন না। গাদা-গাদা বাংলা ফিলমের শুটিং হয় এদিকে। ঠিক আছে, এখন আর আপনাকে আটকে রাখব না।

সীমা উঠে দাঁড়াল। চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, দিনের পর দিন হোটেলে থাকা...কেমন লাগে?

ধীমান বলল, খুব একটা ভালোলাগে না। বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না। পেলেই চলে যাব।

সীমা বলল, আমি চলি তা হলে, পরে আবার দেখা হবে।

ধীমান বলল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল।

সীমা বলল, আমি কিন্তু সহজ মেয়ে নয়। আপনাকে ছাড়ছি না। হিমানী যাতে নষ্ট না হয়ে যায় কিংবা বস্তিতে ফিরতে বাধ্য না হয়, সে দায়িত্ব আপনার।

দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর ধীমান একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনীশের স্ত্রী তো ভয় পাওয়ার মতন মেয়ে নয়। বেশ সহজ, সাবলীল ব্যবহার। কিন্তু মেয়েটি ভেতরে-ভেতরে বেশ শক্ত, তা বোঝা যায়। এবং অন্যরকম।

সীমা বলতে শুরু করেছিল, বনানীর বাড়িতে এর মধ্যে হিমানীকে নিয়ে কী যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, সেটা শোনা হল না।

একটু পরে অফিসে বেরিয়ে গেল ধীমান।

এখানে তাদের ব্যাঙ্কের শাখাটি বেশ বড়। খুব কাজের চাপ থাকে। অনেক লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

দুপুরেও সে বাইরে খেতে যায় না। পাশের একটি হোটেল থেকে তার জন্য লাঞ্চের প্যাকেট আসে। দরজা বন্ধ করে সে একা-একা খায়।

খাওয়ার সময় সে চিঠিপত্র পড়ে।

অনেক কাজের চিঠির মধ্যে একটা তার ব্যক্তিগত চিঠি।

সম্বোধন নেই, তলায় নাম নেই, তবু ধীমান মুহূর্তে বুঝে গেল যে চিঠিখানা লিখেছে বিভা। ধীমানের সারা শরীরে রোমাঞ্চ হল।

...তুমি হঠাৎ চলে গেলে, কেন চলে গেলে আমি জানি। সব বুঝি। তবু কষ্ট হয়। আমার জন্যই তোমাকে কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হল। তুমি আগে কখনও যেতে চাওনি। আমি বলেছিলাম, তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কেন বলেছিলাম? তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কেন বলেছিলাম? একটা বাজে লোক ভয় দেখাল, অমনি আমি কেন এত ভয় পেলাম? আমরা কোনও অন্যায় করিনি, আমার স্বামী জানে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। সে তোমাকে আমারই মতন ভালোবাসে। সুভাষ বারবার বলছে, ধীমান আমাদের কিছুই না জানিয়ে চলে গেল কেন? সে খুব দুঃখিত হয়েছে। তুমি আমাদের চিঠি লিখো ধীমান। তোমার টেলিফোন নাম্বার জানিও, আমি তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলব। কথা না বলে পারব না আমি।

সেই বদ লোকটি আরও দু-বার ফোন করেছিল। তুমি যে চলে গেছ, তা সে জানে। তাতে যেন সে আরও রেগে গেছে। পাগলের মতন চিৎকার করছিল। ভয় দেখিয়ে বলল, এতে নাকি আরও প্রমাণ হয় যে তোমার সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। কী খারাপ ভাষা, তুমি কল্পনা করতে পারবে না, ধীমান। ও হ্যাঁ, তুমি তো খানিকটা শুনেছ। দু-দিনই সে বলল, বাপিকে সব জানাবেই জানাবে! ছেলের কাছে আমার মুখোশ খুলে দেবে! তবে আমিও ছাড়িনি, বলে দিয়েছি যে তার কথা টেপ করেছি সব। পুলিশে খবর দেব।

তবু সর্বক্ষণ আমার ভয় হয়। যদি বাপিকে সত্যিই কিছু খারাপ কথা বলে। আমি বাপিকে টেলিফোন ধরতে দিই না, সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখি। বাপির মনে যদি কোনও ভুল ধারণা হয়, ভাবতে-ভাবতে আমারই পাগল হওয়ার মতন অবস্থা।

শেষে আমি মন ঠিক করে ফেললাম। কাল আমি নিজেই বাপিকে অনেক কথা বলে দিয়েছি। ওর এগারো বছর বয়েস, কিন্তু অনেক কিছুই বোঝে। আমি বলেছি, দ্যাখো বাপি, একটা লোক, খুব খারাপ লোক, আমাদের দারুণ ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। তোর কাছে কোনওদিন হয়তো আমার নামেই খুব বিশ্রী কথা বলবে। তুই একদম বিশ্বাস করবি না। আমি তোর গা ছুঁয়ে বলছি বাপি, তোর মা হয়ে আমি কোনওদিন কোনও খারাপ কাজ করতে পারি না। কোনও দিন না। তুই কত

বড় হবি, তোকে নিয়ে আমাদের কত গর্ব!

এই চিঠিটা পড়ামাত্র ছিঁড়ে ফেলো। লক্ষ্মীটি, প্লিজ, ছিঁড়ে ফেলো, রেখে দিও না। আমার মনের মধ্যে তুমি চিরকাল থাকবে।

এরকম চিঠি পড়ার পর আর কাজে মন বসানো যায়?

কিন্তু উপায়ও তো নেই। খাওয়া শেষ হতে না হতেই চা-বাগানের এক ম্যানেজার এসে হাজির, খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিল ধীমান। কাজের কথা বলতে লাগল ম্যানেজারটির সঙ্গে। ড্রয়ারটা আধ-খোলা, মাঝে-মাঝে সেদিকে দু-এক পলক তাকাচ্ছে। চিঠিটার মধ্যে যেন সে দেখতে পাচ্ছে বিভার মুখ।

বিভাকে সে কখনও জড়িয়ে ধরেনি, চুমু খায়নি। তবু দুজন-দুজনকে ভালোবেসেছে। এ ভালোবাসার মর্ম কেউ বুঝবে না। ধীমানের কষ্টও কেউ বুঝবে না।

অফিস ছুটির পর আরও কিছুক্ষণ ধীমান বসে রইল নিজের চেম্বারে। চিঠিখানা এতবার পড়ল যে মুখস্থ হয়ে গেল তার।

এরপর আর না রাখলেও চলে। আস্তে-আস্তে চিঠিখানা সে কুচিকুচি করে ছিঁড়ল। বিভার সব কথাই সে রেখেছে, এটাই বা রাখবে না কেন?

বাপির কাছে বিভা প্রতিজ্ঞা করেছে, ধীমান কোনওদিন বিভাকে আর স্পর্শ করবে না। কিন্তু যে-লোকটা টেলিফোন করে এই কুৎসিত কথা বলেছে, তার পরিচয় যদি কোনওদিন জানতে পারা যায়, তাকে খুন করে ফাঁসি যেতেও রাজি আছে ধীমান।

হোটেলে ফেরার পরই একদল লোক এল তার ঘরে।

ফিলমের ডিরেকটর, প্রোডিউসার, আরও দু-তিনজন লোক, তারা কে কী করে কে জানে! কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, তাদের মধ্যে রয়েছে বনানী ও হিমানী। অনীশ আর সীমা তো আছেই। প্রোডিউসারটি বলল, তাদের অ্যাকাউন্ট আছে ধীমানদের ব্যাঙ্কে, সুতরাং এখানে ধীমানের সাহায্যের দরকার হবে।

হিমানীকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি ধীমান। মলিন পোশাকে যাকে দেখেছে বাড়ির ঝি হিসেবে, সে এখন সুন্দর শাড়ি পরেছে, বিশেষ কায়দা করে চুল বাঁধা, মুখে হালকা মেকআপ, ভুরুতে কাজল। ফিল্মের মেয়েদের সঙ্গে মিশে গেছে সে, বস্তির ঝি বলে আর কল্পনাও করা যায় না।

হঠাৎ যেন বড়ও হয়ে গেছে হিমানী। আগে তাকে দেখে মনে হয়েছিল একটি কিশোরী, এখন মনে হয় তার বাইশ-তেইশ বছর বয়েস। মুখখানিতে বেশ লাবণ্য আছে। চোখ দুটি সত্যি সুন্দর।

হিমানী অবাকভাবে চেয়ে আছে ধীমানের দিকে। মনে হল, তার এই ভাগ্য পরিবর্তনের মূলে যে ধীমানের কিছু ভূমিকা আছে তা এখনও কেউ তাকে জানায়নি। সে এখানে ধীমানকে দেখতে পাবে আশাই করেনি।

ধীমানও তাকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করল।

কিন্তু ওর জড়তা ভাঙার জন্য একটু পরে হেসে বলল, কী ব্যাপার ইনু, তুমি সিনেমায় নামছ নাকি?

সীমা ধীমানের দিকে তাকিয়ে রইল।

ইনু অর্থাৎ হিমানী উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করে রইল লজ্জায়।

ধীমান আবার বলল, বাঃ, খুব ভালো তো!

অনীশ বলল, আজ হিমানী দুটো শট খুব চমৎকার দিয়েছে। কোনও ডায়ালগ ছিল না অবশ্য। তবু তো জীবনে প্রথম মুভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াল। দেখিস রে, আমি তোকে এনেছি। আমার

মান রাখতে হবে তোকে।

এত লোক বসার জায়গা নেই, ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে রইল অনেকে। ধীমান অনেকখানি দূরত্ব রাখল ওদের সঙ্গে। দাঁড়িয়ে রইল ঘরের পেছন দিকের জানলার কাছে হেলান দিয়ে।

সে যে এই ফিলম ইউনিটের কেউ নয়, তা বুঝিয়ে দিতে চায়। অনীশ তার বন্ধু, সেইজন্যই সবাই এসেছে।

বনানী মা সাজে, কিন্তু সে তো মোটেই বুড়ি নয়। তার বয়েস বড়জোর বছর চল্লিশ, বেশ ভালোই চেহারা। ধীমান লক্ষ করতে লাগল তাকে। তার কথাবার্তা সংযত, শিক্ষিতা মহিলাদের মতন।

ফিলমের মেয়েদের সম্পর্কে আগে থেকেই কেমন যেন একটা ভুল ধারণা থাকে। কারুর ব্যবহারই অমার্জিত নয়।

প্রোডিউসারটি কয়েক বোতল মদ এনে ফেলল, এবং প্রচুর খাবার-দাবার। অনীশের আর ধৈর্য থাকছিল না, সে চ্যাঁচাতে লাগল, গেলাস লাগবে, আর পাঁচ-ছ'টা গেলাস, আর সোডা কোথায়?

এত লোক থাকলে কারুর সঙ্গেই আলাদাভাবে আলাপ হয় না।

সীমা বসে আছে এক কোণে। কথা বলছে খুব কম। মাঝে-মাঝেই তাকাচ্ছে ধীমানের দিকে, তাকেই যেন শুধু লক্ষ করছে।

মেয়েদের জন্য এল ঠান্ডা পানীয়। বনানী শুধু হুইস্কি খায়। ধীমানও একটা গেলাস নিল।

একটু বাদে একটা গান শুরু করল বনানী। শ্যামাসংগীত ধরনের। এই ফিল্মে তার ঠোঁটে অন্য কেউ গাইবে। সেও বেশ ভালোই গায়। পরপর গান চলতে লাগল। অনীশ হেঁড়ে গলায় গাইতে লাগল মাঝে-মাঝে। অন্য মেয়েরা একটা কোরাস গাইল, তাতে হিমানীও গলা মেলাল একটু-একটু।

ডিনারের ব্যবস্থা নিচে, একসময় সবাই নেমে গেল সেখানে। ধীমান ওদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও গেল না। তার কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই।

আসলে এই আড্ডাটা ভালো লাগছিল না তার। মনের মধ্যে সর্বক্ষণ ঘুরছে বিভার চিঠির লাইনগুলো। যেন আজই বিভার সঙ্গে তার সব সম্পর্কের শেষ হয়ে গেল। না, না, কোনওদিনই শেষ হবে না, কিন্তু সব কথাই থাকবে মনে-মনে।

অন্যরা চলে যেতেই সে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

তারপর একটা ক্যাসেট প্লেয়ারে চাপিয়ে দিল সেই ক্যাসেটটা। এতবার শুনে এর সব কথাই তার মুখস্থ। তবু সে রোজই প্রায় শোনে।

গলার আওয়াজ চিনতে না পারলেও প্রত্যেক মানুষের কথা বলার একটা নিজস্ব ধরন আছে। এক-একজন মানুষ এক-একটা শব্দ বিশেষভাবে উচ্চারণ করে।

বিভাকে যে ফোন করে, সে নিশ্চয়ই চেনাশুনো গণ্ডিরই কেউ হবে। না হলে সে সব খবর জেনে যায় কী করে?

হারামজাদী...তুই ধীমানের সঙ্গে...ওই শুয়োরের বাচ্চা ধীমানটা...বিভা, তুই একটা...যদি তুই...বন্ধ না করিস...তোর ছেলে বাপি তোকে ঘেন্না করবে, ঘেন্না করবে, ঘেন্না করবে...

সাত্যকি কথায়-কথায় শুয়ারের বাচ্চা বলে। সে?

ফোনের রিসিভারে একটা তোয়ালে চাপা দিলে গলার আওয়াজ বদলে যায়। ধীমান পরীক্ষা করে দেখেছে।

কিন্তু সাত্যকি বলে শুয়ারের বাচ্চা! এখানে শোনা যাচ্ছে শুওয়োরের বাচ্চা। দুটো আলাদা ধরন। সাত্যকি বলে হারাম জ-দা। এখানে শোনা যাচ্ছে হারা-আ-মজাদা। না, সাত্যকি নয়। অনীশও হারামজেদা বলে প্রায়ই, অনীশের উচ্চারণ হারামজাদার মতন।

ঘেন্না। ঘেন্না। এটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে। ঘে-এ-এ-ন্না এই ধরনের উচ্চারণ করে কে যেন? ঘেন্নাও নয়, ঘে-এ-এ-ন্না, এটা চেনা-চেনা লাগছে। কিছুদিনের মধ্যে কার মুখে এই শব্দটা

অনেকবার শুনেছে? কী প্রসঙ্গে?

বিয়ের ওপর, না, বিয়ে ব্যাপারটার ওপরেই ঘে-এ-এ-ন্না ধরে গেছে। কে বলেছিল!

শেখর। না, না, শেখর কী করে হবে? সে একটা দুঃখী মানুষ, সুভাষ-বিভাদের আত্মীয় হয়, ও বাড়িতে প্রায়ই যায়। না, না, শেখর হতে পারে না!

আরও কয়েকবার ক্যাসেটটা বাজাবার পর ধীমান স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। কোনও সন্দেহ নেই, এটা শেখরেরই গলা। এখন বোঝা যাচ্ছে, অনেকগুলো শব্দই শেখরের মতন উচ্চারণ।

শেখর এরকম খারাপ ভাষা জানে? তাও তার বউদিকে বলেছে! বাইরে ধীমানের সঙ্গে সে কত বন্ধুত্ব দেখায়, ভেতরে-ভেতরে ধীমানের ওপর তার এত রাগ? এত হিংসে? ওর দু-দুটো বিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বলে ভেতরে-ভেতরে এতখানি বিকৃত হয়ে উঠেছে!

মানুষ চেনা এত শক্ত!

বাইরে দেখতে নিরীহ, ভেতরে-ভেতরে সাঙ্ঘাতিক হিংস্র, এইসব মানুষ দারুণ বিপজ্জনক হয়। কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই।

শেখর ইচ্ছে করলেই বিভাদের বাড়ি যেতে পারে। বিভা ওকে কোনও সন্দেহই করবে না। বিভার ছেলেকে আলাদা ডেকে নিয়ে যদি কিছু ক্ষতি করে। মেরেও ফেলতে পারে। কিছুই বিশ্বাস নেই।

শেখরকে চরম শাস্তি দেবে ধীমান। তার আগে এক্ষুনি বিভাকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।

এখন রাত পৌনে এগারোটা। এখনও ফোন করা যায়।

ধীমানের ঘর থেকেই ডায়াল ঘুরিয়ে লাইন পাওয়া যায় কলকাতার। রিং হওয়ার পর ওদিক থেকে কেউ ধরল, ধীমান হ্যালো বলতেই বিভার গলা শোনা গেল। আবার? আবার?

ধীমান বলল, বিভা, আমি ধীমান।

প্রায় জলে পড়া মানুষের মতন বিভা হাহাকার করে বলে উঠল, তুমি? তুমি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এখন কী করে তোমার সঙ্গে কথা বলব, ধীমান!

—কেন, কী হয়েছে?

—আমি বলতে পারছি না। তুমি ধরো, সুভাষকে ডেকে দিচ্ছি, ওরসঙ্গে কথা বলো!

একটু পরে সুভাষ গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করল, কে, ধীমান? তুমি খবর পেয়েছ বুঝি?

ধীমানের বুক কেঁপে উঠল, খবর? এরই মধ্যে মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে? বাপি?

ধীমান ফ্যাকাশে গলায় বলল, কিসের খবর? কী হয়েছে?

সুভাষ বলল, আমার পিসতুতো ভাই, শেখর, তোমারও তো বন্ধু ছিল, সে আজ আত্মহত্যা করেছে। পাতাল রেলের লাইনে তার ডেড বডি পাওয়া গেছে। একটু আগে ওদের বাড়ি থেকে জানাল, আমরা সেখানেই যাচ্ছি...বিভা খুব আপসেট হয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে। জানো তো, বিভা নরম। এইসব ঘটনা একেবারে সহ্য করতে পারে না...

॥ সাত ॥

মৃত্যুর পর কোনও মানুষের ওপর রাগ পুষে রাখা উচিত নয়। তবু ধীমান ক্ষমা করতে পারছে না শেখরকে।

শেখর নিজের জীবনটা তো নষ্ট করে দিলই, তা ছাড়া ধীমানের সঙ্গে বিভার সম্পর্কটাও নষ্ট করে দিয়ে গেল। আর কি বিভা কোনওদিন তার কাছে স্বাভাবিক হতে পারবে? কখনও ওরা সামনাসামনি বসলেও ওদের মাঝখানে এসে পড়বে শেখরের কালো ছায়া।

এর মধ্যে সুভাষ একদিন টেলিফোন করেছিল, তখন বিভা কোনও কথা বলেনি।

সিনেমার দল কাজ করে চলেছে, ধীমান ইচ্ছে করে সন্ধের সময় হোটেলে ফেরে না। আরও কয়েকটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাদের সঙ্গে তাসের আড্ডায় যায়। ইচ্ছে করেই সিনেমায় লোকদের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চায় না সে।

রাত দশটা-এগারোটার সময় ফেরে। চুপি-চুপি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। দরজা বন্ধ করে দেয়।

অনীশ দু-একদিন তার খোঁজ করে ব্যাপারটা বুঝে গেছে। সে তার বন্ধুকে চেনে। আর বিরক্ত করে না।

একদিন রাত সাড়ে এগারোটায় দরজাবেল শুনে বিরক্ত হয়ে ধীমান কয়েকবার চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, কে? কে?

কোনও উত্তর নেই, বেলটা বেজেই চলল।

ধীমান ঘুমোবার সময়কার ডোরাকাটা পাজামা ও শার্ট পরে ফেলেছে, বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিল। লাফিয়ে নেমে এসে ধমক দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে দরজা খুলল।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সীমা।

ধীমান ধমকটা গিলে ফেলে ভাবল, এ তো এক আশ্চর্য মেয়ে। খুব সকালবেলা কিংবা এত রাতে একা-একা একজন পুরুষমানুষের ঘরে অবলীলাক্রমে চলে আসে। হোক না স্বামীর বন্ধু, তবু তো পুরুষমানুষ!

সে বলল, কী ব্যাপার?

সীমা বলল, আপনাকে একবার নিচে আসতে হবে।

—এখন? কেন?

—জরুরি দরকার আছে।

—বুঝতে পারছি না তো, কী জরুরি দরকার থাকতে পারে? এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

—খুব জরুরি দরকার না থাকলে কি আমি রাতে শুধু-শুধু এসে আপনাকে বিরক্ত করি? যেতে আপনাকে হবেই। আগেই বলেছি না, আপনাকে সহজে ছাড়ছি না!

—আপনি তো দেখছি আশ্চর্য মেয়ে। কারণটা বলবেন না? হুট করে ডাকলেই চলে যেতে হবে?

—কারণটা আপনি নিচে গেলেই বুঝতে পারবেন। আজ একটা দারুণ ঝঞ্ঝাট শুরু হয়ে গেছে দুপুর থেকে। আপনাকে জানাবার জন্য দুপুর থেকে খুঁজেছি। অফিসে ছিলেন না, সন্ধের পর হোটেলে ফেরেননি, জানাব কখন?

—ঝঞ্ঝাটের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে?

—নিশ্চয়ই আছে। এই করিডোরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব বলতে হবে। এত রাতে লোকে কী বলবে? সরে দাঁড়ান। ভেতরে গিয়ে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলছি।

ধীমান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সরে গেল।

এত রাতে করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বললে কিছু ভাববে, আর ঘরের মধ্যে এলে কিছু হবে না?

সীমা একটা চেয়ারে বসেই বলল, আজ হঠাৎ হিমানীর বাবা এসে উপস্থিত।

এমনই আকস্মিক খবরটা যে, ধীমান বিশ্বাস করতে পারল না। তার ধারণা ছিল হিমানীর বাবা নেই।

সীমা আবার বলল, গাঁজাখোরের মতন চেহারা। খুনি-টুনিও হতে পারে। হিমানী আর ওর

মাকে ফেলে কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল। এখন কোথায় খবর পেয়েছে যে মেয়ে সিনেমায় সুযোগ পেয়েছে। ঠিক এখানে এসে উপস্থিত।

—কী চায় সে!

—পাঁচ হাজার টাকা!

—সোজাসুজি এসে টাকা চাইল?

—কীরকম সাহস ভেবে দেখুন। এ ছবিতে হিমানীর এতই ছোট পার্ট যে হাজার দেড়েক টাকা পাবে মোট। আর ওর বাবা এসে চাইছে পাঁচ হাজার টাকা। শুনলে কী মনে হয় বলুন তো? লোকটাকে ধরে চাবকাতে ইচ্ছে করে না?

—ঠিক বলেছেন।

—লোকটা বলছে, হয় ওকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে, অথবা ও মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে। হিমানীর তিনটে সিন শুটিং করা হয়ে গেছে। আর একটা বাকি। ওকে এখন ছাড়া যায় না, কনটিনিউইটি নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ লোকটা হুমকি দিচ্ছে, টাকা না পেলে ও কাল সকালেই মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে চাপবে!

—হিমানী কী বলছে?

—বাবার সঙ্গে যেতে চায় না। কাঁদছে। বারবার আমার হাত চেপে ধরে বলছে, আমাকে ছেড়ে দেবেন না।

—লোকটাকে তা হলে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করলেই হয়।

—অত কি সহজ? বাবা বলে কথা। বাবার অধিকার আছে মেয়ের ওপর, এই তো সমাজের নিয়ম। সে বাবাটা যত অপদার্থই হোক।

—হিমানীর বয়েস কত?

—কুড়ি বছর চার মাস। সে খবর নিয়েছি।

—তা হলে তো মেয়ে অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে। বাবার কথা শুনতে বাধ্য নয়!

—বয়েসটা প্রমাণ করতে হবে। পুলিশের কাছে নালিশ করলে পুলিশ ওকে কোনও হোমে পাঠিয়ে দেবে। তারপর মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার। এদিকে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে।

—তাহলে আমি কী করতে পারি?

—ধীমানবাবু, এবার আপনাকে প্রকাশ্যে আসতে হবে। আপনি মেয়েটাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছিলেন, এত সহজে হার স্বীকার করবেন? একটা গাঁজাখোর, বদমাশ, যে মেয়ের কিংবা মায়ের কোনও দায়িত্ব নেয় না, এখন টাকার গন্ধ পেয়ে এসেছে। ও হিমানীকে নিয়ে যাবে, আর আমরা তা মেনে নেব!

—তা হলে আমি, মানে, আমি কী করব বলতে পারেন?

—আপনি নিচে যাবেন, সেখানে তর্ক-বিতর্ক চলছে। হিমানী কাঁদছে। ওর বাবাটা তড়পাচ্ছে সমানে। হিমানী খুব ভালো মেয়ে, এই ক'দিন তো দেখলাম। সত্যি ভালো মেয়ে। ও নষ্ট না হয়। আপনি নিচে গিয়ে হিমানীর পাশে দাঁড়ান।

—শুধু পাশে দাঁড়ালেই হবে?

—কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না? হ্যাঁ, শুধু পাশে দাঁড়ালেই হবে। চলুন, চলুন, প্লিজ, চলুন, চট করে একটা প্যান্ট আর শার্ট গলিয়ে নিন। আমি অন্যদিকে ফিরে থাকছি।

উঠে এসে, ধীমানের একটা হাত ধরে সীমা কাতর গলায় বলল, প্লিজ চলুন। তাহলে আপনাকে একজন সত্যিকারের পুরুষমানুষ হিসেবে সম্মান করব।

দু-মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ধীমান।

সীমা তাকে প্রায় টানতে-টানতে, দৌড়ে চলে এল নিচে।

একতলার লবিতে দশ-বারোজন গোল হয়ে ঘিরে বসে আছে। মাঝখানে হাফশার্ট ও ধুতি পরা একজন মাঝবয়েসি লোক। মাথার চুল খোঁচা-খোঁচা, চোখ দুটো লাল। গলায় বেশ জোর আছে। লোকটি কথা বলছে সবার গলা ছাপিয়ে।

ধীমান অনীশের পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগল। এখনও পাঁচ হাজার টাকারই কথা চলছে। অনীশ ওই লোকটিকে এক পয়সাও দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। লোকটিও তেজের সঙ্গে বলছে, তা হলে আমার মেয়েকে ছেড়ে দিন। আমার মেয়ে ঢের-ঢের টাকা রোজগার করতে পারবে। সিনেমা লাইনে কী হয় সব আমি জানি।

লোকটির কথার মধ্যে একটা কদর্য ইঙ্গিত আছে। নিজের মেয়ে সম্পর্কে এরকম বলতেও তার আটকায় না।

ছবির পরিচালক-প্রযোজকরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তারা এখন হিমানীকে বাদ দিয়েও কাজ চালিয়ে যেতে রাজি। অনীশ লড়ে যাচ্ছে একাই। অনেকক্ষণ ধরে একই কথা চলছে।

ধীমান একটাও কথা বলছে না।

একসময় সীমা এগিয়ে এসে বলল, এই লোকটি হিমানীর সত্যিকারের বাবা কি না আমরা জানি না। কোনও প্রমাণ আছে? হিমানী ওরসঙ্গে যেতে রাজি নয়। হিমানীকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করেছেন ধীমানবাবু। তিনি ওর মাকেও টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধীমানবাবু এ ব্যাপারে কী বলতে চান, আমরা শুনতে চাই।

হঠাৎ দারুণ রাগে ধীমানের সারা শরীর উত্তপ্ত হয়ে গেল।

সে প্রচণ্ড জোরে বলে উঠল, এই লোকটাকে দূর করে দাও! পুলিশ কেস হোক বা যা হোক, সে আমি বুঝব।

একটা বোঝাপড়ার মতন প্রতিক্রিয়ায় সবাই চুপ হয়ে গেল একমুহূর্তে।

হিমানী একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল ধীমানের দিকে। সীমা তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ধীমানের পাশে।

হিমানীর কাঁধে একটা হাত রেখে ধীমান এবার আস্তে-আস্তে বলল, ওর সব দায়িত্ব আমার!

একটি নদীর নাম

বাগানটা সত্যি চমৎকার। ফুলগুলোর স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায়, এদের পেছনে অনেক যত্ন আছে। ফুলের গাছও নানা ধরনের। প্রবাল কিংবা জয়া অবশ্য এর একটি গাছও লাগায়নি, সরকারি মালিও এমন কিছু উদ্যম নিয়ে বাগানের পরিচর্যা করে না। প্রবালের আগে যিনি এখানে ছিলেন, সেই সুরঞ্জন মজুমদারের ছিল সত্যিকারের গাছপালার শখ, প্রত্যেকদিন ভোরে তিনি হাফ প্যান্ট পরে খুরপি নিয়ে নিজের হাতে বাগানের কাজ করতেন। দূর-দূর জায়গা থেকে তিনি নিয়ে আসতেন ফুলগাছের চারা।

সুরঞ্জন মজুমদার বদলি হয়ে গেছেন ঠিক এক মাস আগে। অপরের বাগান এখন ভোগ করছে প্রবাল ও জয়া।

একটা বড় ছাতা বসানো হয়েছে এই বাগানের এক পাশে। সেখানে এক-একদিন সন্ধেবেলা ওরা দুজনে চা খেতে বসে। আজকের আকাশ মেঘলা, বাতাস বইছে মৃদু মন্দ, এমন দিনে ঘরের মধ্যে বসে থাকার কোনও মানে হয় না।

আর্দালি ট্রে-তে করে চায়ের পট ও দু-প্লেট গরম-গরম নিমকি দিয়ে গেছে। জয়া বানাচ্ছে চা, টুংটাং শব্দ হচ্ছে পেয়ালায়। হাসন্যুহানার ঝাড়টার দিকে চেয়ে গুনগুন করছে প্রবাল। রবিবার সন্ধ্যায় নিতান্ত কোনও রাজনৈতিক হোমরা-চোমরা ছাড়া কোনও ভিজিটারের সঙ্গে সে দেখা করে না।

চায়ের কাপে সবে মাত্র দু-বার চুমুক দিয়েছে প্রবাল, গেটের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। গেটের দুজন গার্ডের হাত ছাড়িয়ে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে একজন প্রৌঢ়। সাদা ধুতি ও সাদা টুইলের শার্ট পরা, দুটোই বেশ মলিন, পায়ে ময়লা কেড্স। রোগা লম্বাটে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, কাঁধে ঝোলানো একটা থলে।

ভূত দেখার মতন ফ্যাকাসে মুখ হয়ে গেল প্রবালের। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি ভেতরে যাচ্ছি।

জয়া প্রথমে অবাক হয়ে বলল, নিমকি খেলে না? চা-ও তো শেষ করোনি!

তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে সেও দেখতে পেল প্রৌঢ়টিকে। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি।

সে বলল, এবার ডি. এম. সাহেবের পলায়ন।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখলো না প্রবাল, সে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

জয়া বলল, আমাকে ফেলে পালাচ্ছ?

প্রবাল বলল, তুমিও কেটে পড়।

জয়া তাড়াতাড়ি শেষ করল চা, দু-খানা নিমকি হাতে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল বাগানের মধ্যে। শকুন্তলার মত সে মাধবী ও চাঁপা ফুলগাছের আড়ালে মিশে গেল।

প্রৌঢ় লোকটি গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে অনেকখানি চলে এসেছে ভেতরে। একজন গার্ড তার সঙ্গে-সঙ্গে এসে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু তার ওপর জোর জবরদস্তি করছে না।

এর আগে একদিন গার্ডরা ওই লোকটির হাত চেপে ধরায় লোকটি সরু গলায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। গার্ডরা তখন তাকে টানতে-টানতে নিয়ে এসেছিল ডি. এম. সাহেবের কাছে।

লোকটি বলেছিল, আই অ্যাম এ হাম্‌বল স্কুল টিচার, স্যার। আই ওয়ান্ট টু সাবমিট এ পিটিশান।

প্রবাল রূঢ়ভাবে গার্ডদের বলেছিল, ছেড়ে দাও! ওরকম বিশ্রী ভাবে ধরে এনেছ কেন? চোর না ডাকাত? দেখে বুঝতে পারো না নিরীহ লোক?

প্রথম দিনই ভুলটা করে ফেলেছিল প্রবাল। তার পরেও সে অবশ্য আদেশ বদল করেনি।

প্রবালের বাবা একজন স্কুল-শিক্ষক ছিলেন। সেইজন্যই বোধহয় সে একজন গ্রাম্য শিক্ষককে বন্দুকধারী গার্ডদের দিয়ে আটকাবার হুকুম দিতে পারে না। তবে লোকটিকে দেখলে সে নিজেই আত্মগোপন করে।

প্রবাল একেবারে উঠে গেল দোতলায়। প্রৌঢ় শিক্ষকটি আর যাই করুক ডি. এম. সাহেবের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে আসতে সাহস পাবে না।

জয়া গাছপালার আড়াল থেকে দেখল, সেই লোকটি প্রথমে ঢুকে গেল একতলার অফিস ঘরে। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এল বাইরে। নাজির সাহেব নিশ্চয়ই অফিস ঘর থেকে ভাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রৌঢ়টি এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে এল বাগানের দিকে।

ছাতাটির নিচে এসে সে চায়ের টেবিলের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। সরু মুখখানিতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে।

চায়ের পটে এখনও অনেকটা চা রয়ে গেছে। একজন অতিথিকে অনায়াসে আপ্যায়ন করা যেত। কিন্তু জয়া আর প্রবাল নিজেরাই ভালো করে চা উপভোগ করতে পারেনি!

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল, স্যার? ম্যাডাম? জয়া কোনও উত্তর দিল না। সে একটুও শব্দ করছে না।

নাজির এখানে এসে রুক্ষভাবে বলল, কেন ঝামেলা করছেন ভট্টাচার্যিবাবু? বললাম না, এখন দেখা হবে না? সাহেব আর মেমসাহেব এখন ওপরে বিশ্রাম নিচ্ছেন!

প্রৌঢ়টি বলল, ডি.এম. সাহেব কি এই গরিব ব্রাহ্মণকে দয়া করবেন না? একবার না হয় মেমসাহেবকে বলে দেখতাম?

নাজির বলল, আপনাকে কত বলেছি, উইক ডেজ-এ অফিস টাইমে আসবেন। তখন আপনার যা বলার আছে মন খুলে বলবেন। মেমসাহেব কোনও অফিশিয়াল ব্যাপারে মাথা গলান না। তাঁকে বলে কোনও লাভ নেই।

প্রৌঢ়টি বলল, অন্য দিন ইস্কুল থেকে ছুটি পাই না। অনেকখানি তো দূর!

নাজির বলল, তা বললে কি চলে? এই সব অফিশিয়াল কাজ কি রবিবারে হয়? সাহেবকে সারা সপ্তাহ খাটতে হয়, একটা দিন বিশ্রাম দেবেন না?

প্রৌঢ়টি বলল, তা অবশ্য ঠিক। আমারই দোষ। আমায় ক্ষমা করবেন, স্যার। দেখি, যদি আর একদিন...

নাজির বলল, আপনি বরং আর একখানা পিটিশান দিয়ে যান।

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

যেন সে ফুলগাছের আড়ালেও কিছু দেখতে পাচ্ছে। জয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল।

নাজিরসাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সে প্রৌঢ়টির হাত ধরে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মোলায়েম গলায় বলল, চলুন, চলুন! সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে অন্য একদিন ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আসবেন।

জয়া অপেক্ষা করল আরও একটুক্ষণ। প্রৌঢ়টিকে গেটের বাইরে চলে যেতে দেখে তারপর

বেরুলো সে। তার এখন বেশ রাগ হচ্ছে। নিজের বাড়িতে তাকে এমন চোরের মতন লুকোতে হবে কেন? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য একজন লোককে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে, এটা বড্ড বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। নিমকিগুলোই আর কে খাবে?

ও সব সেখানেই ফেলে রেখে জয়া চলে এল দোতলায়।

প্রবাল টেলিফোনে কথা বলছিল। তখনই নামিয়ে রেখে বলল, সইফুল ওর ওখানে ডাকছে, চল ঘুরে আসি। তৈরি হয়ে নাও।

জয়া রাগ-রাগ মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, সইফুলের ওখানে আবার কী আছে?

প্রবাল বলল, আড্ডা মারা হবে। কলকাতা থেকে বিজন এসেছে। বিজন তো তোমার গ্রেট অ্যাডমায়ারার। সন্ধেটা কাটিয়ে আসব।

জয়ার মুখ থেকে রাগ মুছে গেল খানিকটা। সন্ধেগুলো এখানে কাটতেই চায় না। টিভি আছে বটে, কিন্তু ছবি আসে না ভালো। ক্যাসেটের গান শুনে আর বই পড়ে দিনের-পর-দিন কাটানো যায় না। প্রবাল যখন ইনসপেকশানে কিংবা অন্য কাজে ডিসট্রিকটের অন্যান্য জায়গায় যায়, রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারে না, তখন তো একেবারে অসীম একাকিত্ব। এত বড় বাড়িটাকে সেসময় ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের বউ বলেই এখানে যার তার সঙ্গে মিশতেও পারে না জয়া। সেও এক জ্বালা। প্রায় সমান-সমান বা কাছাকাছি সরকারি অফিসারদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত নেই।

প্রথম- প্রথম জয়া স্বাভাবিক ভাবে অনেকের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তারদের স্ত্রীদের নিজের বাড়িতে ডাকত। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল তারা জয়াকে ধরে প্রবালকে দিয়ে কিছু-না-কিছু করিয়ে নিতে চায়। সুবিধে চায়, সুযোগ চায়। এইভাবে কি বন্ধুত্ব হয়!

সইফুল এই জেলার এস. পি.। খুব আমুদে মানুষ। তার স্ত্রীও বেশ সুন্দর ও ভারি চমৎকার ব্যবহার, ওদের বাড়িতে সময় কাটে বেশ ভালোই।

নতুন করে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে জয়া জিগ্যেস করল, রাত্তিরে খাওয়ার কথা কিছু বলেছে নাকি?

প্রবাল বলল, না, সেরকম কিছু বলল না। সইফুলের যা ভুলো মন, হয়তো ব্যবস্থা আছে। নীলা তো কোনওদিনই না-খাইয়ে ছাড়ে না।

জয়া বলল, আমরা ওদের বাড়িতে গিয়ে বারবার খেয়ে আসছি। আমাদের এখানে ওদের একবার ডাকা উচিত। কিন্তু ওদের মতন অত চমৎকার কাবাব আর বিরিয়ানি তো আমরা বানাতে পারব না।

প্রবাল হাসতে-হাসতে বলল, আমরা ডাল-ভাত খাওয়াব!

একটু বাদে তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে জয়া আবার জিগ্যেস করল, এ বুড়ো লোকটির ব্যাপারটা কী বল তো? শুধু-শুধু ঘোরাচ্ছ কেন?

প্রবাল বলল ও যা চায়, তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই যে। আগেকার দিনে বাংলা উপন্যাসে লেখা হত, ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সেই জেলার 'দণ্ড মুণ্ডের কর্তা'। কথাটা শুনলেই একজন প্রকাণ্ড চেহারা, রাগী, গোঁফ-পাকানো লোকের কথা মনে হয় না? তাদের তুলনায় আমরা...

প্রবাল হাসতে শুরু করল আপন মনে।

জয়া বলল, ভদ্রলোককে স্ট্রেট 'না' বলে দিলেই তো পার। শুধু-শুধু আসেন অত দূর থেকে।

হাসি থামিয়ে প্রবাল বলল, পৃথিবীতে অনেক কিছুই স্ট্রেট 'না' কিংবা স্ট্রেট 'হ্যাঁ' বলা যায়

না। বেশির ভাগ ব্যাপারই এর মাঝামাঝি ঝুলতে থাকে। তাই না? তা ছাড়া উনি আমার কথা বুঝতেই পারছেন না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রবাল বলল, তোমার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে। মুছে নাও। বেশি সাজগোজ করেছ মনে হচ্ছে! বিজন আসছে বলে?

জয়া প্রবালের দিকে একটা নিষেধের ভ্রূভঙ্গি করল।

ড্রাইভার ছাড়াও সামনের সিটে একজন আর্মড গার্ড থাকে সবসময়। এই চাকরিতে শুধু স্বামী-স্ত্রীর নিরিবিলি বেড়াবার অধিকার নেই। ড্রাইভার আর গার্ডের সামনে সবরকম রসিকতা যে করা যায় না, সে কথা মনে রাখতে পারে না প্রবাল।

এস. পি. সইফুল আলমের কোয়ার্টার পুলিশ লাইনের বাইরে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির চেয়েও এক হিসেবে এ-বাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর। প্রবালরা থাকে একটা সাহেবি আমলের ঢাউস দোতলা বাড়িতে, অনেকগুলো ঘর খোলার দরকারই হয় না। আর সইফুলের বাড়িটা একতলা, ছিমছাম, কিন্তু পেছনে অনেকখানি জমি, প্রায় একটা জঙ্গলের মতন, তার মধ্যে একটা পুকুরও আছে। শুধু বাগান নয়, এই জমিতে বেগুন, টোমাটো, ঝিঙে লাউ এসবও হয়, পুকুরে বড়-বড় মাছ আছে।

সইফুল বাইরে দাঁড়িয়ে দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, প্রবালদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেই সে সঙ্গে-সঙ্গে লোকদুটিকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল কথা হবে।

তারপরই সে ঠক করে দু-পায়ের জুতো ঠুকে, অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বলল, আসুন স্যার!

এটা সইফুলের ঠিক রসিকতা নয়, নিয়ম রক্ষার বাড়াবাড়ি।

সার্ভিসে প্রবাল মাত্র এক বছরের সিনিয়ার, বয়েসে যদিও দুজন সমান। তবু ঘরের মধ্যে সে ডাকবে প্রবালদা, অন্য সময় বলবে স্যার। প্রবাল অনেকবার বলেছে, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাক না কেন? সইফুল শোনে না।

বিজন সেনগুপ্ত বসবার ঘরের মেঝেতে বসে আছে দেয়াল-হেলান দিয়ে, তার হাতে রামের গেলাস। সইফুলের কলেজ জীবনের বন্ধু এই বিজন কাজ করে কলকাতার এক বিদেশি দূতাবাসে, এখানে আসে প্রায়ই। এর আগেও একটা জেলাতে সইফুল আর প্রবাল একসঙ্গে পোস্টিং ছিল, সেখানেই বিজনের সঙ্গে প্রবাল-জয়ার আলাপ। দু-একদিনের মধ্যেই দারুণ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে কেউ এলেই কলকাতার গল্প বেশি হয়। কে কোন পাড়াতে থাকে, কোন ইয়ারে পাশ করেছে, এমন বন্ধু কেউ আছে কি না! কথায়-কথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো, এই বিজন সেনগুপ্তের সঙ্গে জয়ার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল! কথাবার্তা এগিয়েও ছিল অনেকখানি, তারপর হঠাৎ জয়ার বাবার এক বন্ধু প্রবালের খবর নিয়ে আসেন। অনেকটা বাবার সেই বন্ধুর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই প্রবালের সঙ্গে জয়ার বিয়ে হয়ে যায়।

সেই সম্বন্ধের কথাটা বেরিয়ে পড়বার পর বিজন হো-হো করে হেসে উঠেছিল। এগারো বছর আগেকার কথা, এসব এখন হাসি ঠাট্টারই ব্যাপার। জয়াকে বিজন বলেছিল, আমাকে আপনি রিজেক্ট করে দিলেন। আমি কি পাত্র হিসেবে খুব খারাপ? না হয়, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারিনি।

বিজনও এখন বিবাহিত, কিন্তু তার স্ত্রীকে এখানে আনে না।

বিজনের সঙ্গে জয়ার এখনকার সম্পর্কটাতে প্রবাল মজা পায়। ওদের বিয়ে হলেও হতে পারত, হয়নি, তাই বিজনের মধ্যে একটা প্রেমিক-প্রেমিক ভাব ফুটে ওঠে জয়াকে দেখলেই। বিজনের মুখে প্রশংসা আর স্তুতি বেশ উপভোগ করে জয়া।

আড্ডার মধ্যে একটু পরে রসভঙ্গ করল আর একজন এসে। এর নাম কল্যাণ দত্ত, সইফুলের একজন এস. ডি. পি. ও.। কল্যাণ এদের চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট, কিন্তু কাজের ব্যাপারে বড্ড সিরিয়াস। আড্ডার মধ্যেও কাজের কথা ভোলে না। সে ঘরে ঢুকে বসে পড়ার পরেই সইফুলকে বলল, স্যার, ফুলমণি মার্ডার কেসের দুজন আসামি আজ ধরা পড়েছে, খবর পেয়েছেন?

সইফুল অবাক হয়ে বলল, ধরা পড়েছে, কখন?

কল্যাণ বলল, আজই দুপুরবেলা। নদীর চরে লুকিয়েছিল।

তারপর কল্যাণ লম্বা করে শুরু করল পুলিশি বিবরণ। তা মোটেই গল্পের মতন নয়, যেন সরকারি রিপোর্ট।

জয়া হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ধমক দিয়ে বলল, এবার চুপ করুন তো! আপনারা শুধু আজেবাজে লোকদের ধরেন। টিয়াজালি গ্রামের কেসটার তো কিছুই করতে পারলেন না এতদিনে!

কল্যাণ থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

সইফুল বলল, টিয়াজালি গ্রামের কেসটার কিছুই করা যাবে না। আসামিরা এই জেলার লোক নয়। বাইরে থেকে এসেছিল, আবার পালিয়েছে!

জয়া বলল, বাইরে থেকে এসেছিল বলেই তাদের ধরা যাবে না? কলকাতা থেকে কেউ এ জেলায় এসে যদি একটা খুন করে আবার কলকাতায় ফিরে যায়, তা হলে তাকে কে ধরবে? তার কোনও শাস্তি হবে না? আপনারা বলবেন, আসামি এ জেলায় থাকে না, তাকে আমরা কী করে ধরব? আর কলকাতার পুলিশ বলবে, ক্রাইমটা বাইরে হয়েছে, সুতরাং আমরা কি জানি!

বিজন হেসে উঠে বলল, বেশ মজা তো! আমিও তা হলে এখানে এসে যা খুশি করে কলকাতায় ফিরে যেতে পারি?

সইফুল বলল, ব্যাপারটা তা নয়। টিয়াজালির কেসটা তো ভালো করে ইনভেস্টিগেট করাই গেল না। মেয়েটির বাবা, ভেরি পিকিউলিয়ার পার্সন, পুলিশের সঙ্গে কো-অপারেটই করতে চায় না।

প্রবাল বলল, সেই বুড়ো ভদ্রলোক আজও বিকেলে এসেছিলেন আমার ওখানে!

জয়া বলল, আপনারা কিছু করছেন না। আর সেই বুড়ো আমাদের গিয়ে প্রায়ই জ্বালাচ্ছে!

সইফুল বলল, কেন, প্রবালদা, ওই বুড়ো আপনার কাছে যাচ্ছে কেন? আপনি ভাগিয়ে দেবেন! না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। জানেন, আমি নিজে টিয়াজালিতে ওই বুড়োটার বাড়ি গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা ফিলোসফিক্যাল ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগলো আমার সঙ্গে। কোনও ইনফরমেশান দেবে না, খালি বলে সবই ভগবানের ইচ্ছে! যে যায়, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না!

কল্যাণ এবার বলল, জানেন, ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় কোনও খবর দেয়নি? সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলে নিশ্চয়ই ধরে ফেলা যেত! শুধু-শুধু পাঁচ-পাঁচটা দিন কেটে গেল!

প্রবাল বলল, খবর না দেওয়ার কারণ ছিল। সেটা বোঝা শক্ত নয়।

সইফুল বলল, কী কারণ থাকতে পারে, আপনি বলুন? একজন হারিয়ে গেল, বাড়ির লোক সে খবর থানায় জানাবে না?

প্রবাল বলল, একটি মেয়ে, তাও বামুন বাড়ির যুবতী মেয়ে, রাত্তিরে বাড়ি ফিরল না। বাড়ির লোকেরা কি সে খবর কারুকে জানাতে চায়? বামুনেরা, বিশেষ করে গরিব বামুনেরা সবচেয়ে বেশি কি ভয় পায় জানও? বংশের বদনাম! কোনও মেয়ের নামে কলঙ্ক! ওরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিল যে মেয়েটি তার কোনও প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। তাই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। মেয়ের কুলত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো, এই রকম এখনও অনেকে মনে করে।

বিজন সোজা হয়ে বসে বলল, শুনি, শুনি, কেসটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কী হয়েছিল ব্যাপারটা।

প্রবাল বলল, কেসটা খুবই ট্র্যাজিক। ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখের সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে।

জয়া বলল, জানেন, ওই বুড়োটাকে দেখলেই ও পালায়।

প্রবাল জয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার বিমর্ষভাবে তাকাল। তার ওই ব্যাপারটা সবার কাছে বলে দেওয়াটা সে পছন্দ করেনি। ওই বৃদ্ধকে দেখলেই যে প্রবালের বাবার কথা মনে পড়ে, তা জয়া কিছুতেই বুঝবে না। জয়া এসেছে এক সচ্ছল পরিবার থেকে, কিন্তু প্রবাল এক গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে।

সইফুল কল্যাণকে জিগ্যেস করল, তুমি তো মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলে?

কল্যাণ বলল, হ্যাঁ, দু-বার দেখেছি।

সইফুল ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, ওয়াজ শি রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল? অ্যান্ড ট্যালেন্টেড?

কল্যাণ বলল, রিয়েলি। খুব সুন্দরী হয়তো বলা যায় না, তবে মোটামুটি দেখতে বেশ ভালোই ছিল। তার অনেক গুণ ছিল। গ্রামে এরকম মেয়ে চট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সইফুলের স্ত্রী একটা বড় প্লেট-ভরতি মাছ ভাজা নিয়ে সেই সময় ঘরে এসে বলল, কোন মেয়েটির কথা হচ্ছে? কোন মেয়েটা!

জয়া বলল, ওই যে টিয়াজালি গ্রামের একটা মেয়ে...

নীলা বলল, খুন হয়েছিল? ওরে বাবা, না, না। শুনব না। ওইসব কথা এখন থামাও তো! বাড়িতে সর্বক্ষণ খুন আর ডাকাতি আর মারামারির কথা শুনতে-শুনতে কান একেবারে পচে গেছে।

জয়া বলল, যাক, ওইসব কথা এখন থাক।

সইফুলের স্ত্রীর নাম এখানে সবাই জানে নীলা, একমাত্র বিজনই তাকে আসল নামে ডাকে। সে বলল, নীলোফার, তোমরা তো ঘটনাটা সব জান, আমাকে একটু শুনতে দাও! তুমি এখানে আমার পাশে এসে বস!

সইফুল বলল, কল্যাণই ভালো বলতে পারবে। ওর মহকুমার ঘটনা। কল্যাণ, আমি যেটা জানতে চাই, তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় মেয়েটিকে যখন দেখেছিলে, তখন তোমার কী ইমপ্রেশন হয়েছিল? মেয়েটা কি বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য কারুর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারত?

কল্যাণ বলল, অতটা আমি বলতে পারব না। আমি ওকে দু-বারই দেখেছি একটা স্কুলের ফাংশানে। প্রথমবার প্রায় দু-বছর আগে...তখন সে সেই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল, বয়েস হবে পনেরো-ষোলো। স্কুলের ফাংশান যে-রকম হয় আর কি, দু-তিনটে গান, কিছু আবৃত্তি, সেক্রেটারির ভাষণ এইসব পরিচালনা করছিল ওই মেয়েটি।

বিজন জিগ্যেস করল, মেয়েটির নাম কী?

কল্যাণ বলল, নামটাও বেশ আন-ইউজুয়াল। গ্রামে-ট্রামে এরকম নাম শোনা যায় না। সেইজন্য প্রথমবার শুনেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। ওর নাম বেদবতী। বেদবতী ভট্টাচার্য।

—বেদবতী? কখনও শুনিনি। মানে কি এই নামের? যে মেয়ে বেদ জানে? বেদের সব জ্ঞান হজম করে ফেলেছে? বাচ্চা মেয়েদের এরকম খটমট নাম রাখা মোটেই উচিত না।

—ওর বাবা যে বামুন পণ্ডিত।

—হলেই বা। আজকাল ক'টা বামুন পণ্ডিত বেদ পড়ে? কেউ পড়ে না। এই যে আমরা এই ক'জন রয়েছি এই ঘরে, সইফুল আর নীলোফারকে না হয় বাদ দাও, আমরাই কি বেদ-টেদ কিছু বুঝি?

প্রবাল বলল, বেদবতী নামটার অন্য একটা মানে আছে। এটা একটা পৌরাণিক নাম। বেদবতী হচ্ছে দেবতাদের কুলগুরু বৃহস্পতির নাতনি। বৃহস্পতির ছেলে কুশধ্বজ, তার মেয়ে। এই কুশধ্বজ চেয়েছিল...

বিজন বাধা দিয়ে বলল, ওসব গল্প বাদ দিন। ওসব সেকেলে গল্প আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। এই মেয়েটির কী হল, তাই বলুন!

সইফুল বলল, বিজন, তুমি বললে বেদ কেউ পড়ে না। কিন্তু প্রবালদা পড়েছেন, উনি অনেক রেফারেন্স দিতে পারেন।

প্রবাল শুকনো ভাবে হেসে বলল, না, সেরকম কিছু না। ঠিক আছে, কল্যাণ, তুমি তোমার অ্যাঙ্গেল থেকেই ঘটনাটা বল।

কল্যাণ বলল, মেয়েটির নামই শুধু অন্যরকম নয়। সবদিক থেকেই সে আলাদা, অন্য সব ছাত্র-ছাত্রীর থেকে তাকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়বেই। দেখতে বেশ ভালো, আর খুব পরিষ্কার উচ্চারণ। আমার মনে হচ্ছিল, সেই টিয়াজালির মতন গণ্ডগ্রামে যেন হঠাৎ একটা বালিগঞ্জের মেয়ে এসে পড়েছে। একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরেছিল, কোনও সাজগোজ করেনি, তবু তাকে দেখলে গরিব ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। সে 'মেঘনাদবধ' থেকে দু-পাতা আবৃত্তি করে শোনাল, একেবারে নিখুঁত উচ্চারণ, অত শক্ত-শক্ত কথা, তবু পুরোটাই তার মুখস্থ।

সইফুল বলল, বালিগঞ্জের কোনও মেয়ে 'মেঘনাদ বধ' আবৃত্তি করতে পারবে না। সবাই ওখানে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে।

জয়া বলল, গ্রামের কোনও মেয়ের মুখেও আমি এ পর্যন্ত ভালো উচ্চারণ শুনিনি। তালব্য শ-টা কেউ যেন বলতেই জানে না।

কল্যাণ বলল, বউদি, এ মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ ছিল। হেড মাস্টারমশাই আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছাত্রীটি আমাদের গ্রামের গর্ব। আমরা আশা করে আছি, ও হায়ার সেকেন্ডারিতে নিশ্চয়ই স্ট্যান্ড করবে!

জয়া বলল, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টও করেছিল, তাই না?

সইফুল বলল, প্রথম দশজনের মধ্যে আসেনি। মেয়েদের মধ্যে ওর পজিশান ছিল ফোরটিনথ! একটা অজ পাড়াগাঁর মেয়ের পক্ষে অবশ্য সেটাও কম নয়।

প্রবাল অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে মাথা নিচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছে একমনে। তার মুখখানা থমথম করছে।

বিজন জিগ্যেস করল, দেন হোয়াট হ্যাপেনড?

কল্যাণ বলল, আমি ওই বেদবতী ভট্টাচার্যকে দ্বিতীয়বার দেখি সেই একই ইস্কুলে। তখন সে এক্স-স্টুডেন্ট, তবু স্কুলের ফাংশানে এসেছিল। দু-বছরেই অনেকটা বড় হয়ে গেছে, রূপ আরও খুলেছে। সেবার সে গান গেয়েও শোনালো। অতুলপ্রসাদের গান। কারুর কাছে শেখেনি, রেকর্ড শুনে-শুনে গলায় তুলেছে। তাও নিজের কোনও ক্যাসেট প্লেয়ার নেই, পাশের বাড়ির একজনের। চমৎকার গেয়েছিল, মেয়েটা সত্যিই গুণি। আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম ওর সঙ্গে।

—মেয়েটা কলেজে ভরতি হয়েছিল?

—হ্যাঁ, কলেজে পড়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল। ওদের গ্রামের কাছাকাছি তো কলেজ নেই। নিয়ারেস্ট কলেজ বদরপুরে, টিয়াজালি থেকে ১৪ মাইল দূরে। কিন্তু বদরপুর কলেজে মেয়েদের হস্টেল নেই। বড় শহরে ভালো কোনও কলেজে পড়ালে ও মেয়ে অনেক সাইন করতে পারত, কিন্তু ওর বাবা তো খুব গরিব, সে সামর্থ কোথায়? সাধারণত গ্রামের গরিব ঘরের এইসব মেয়েদের কি হয়, তা তো জানেনই, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছে, তাই ঢের, তারপরেই

সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু মেয়েটির তো ইচ্ছে ছিলই, ওর বাবা দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যিও চেয়েছিলেন মেয়েকে কলেজে পড়াবেন। যত কষ্টই হোক। বদরপুরে থাকার জায়গা নেই, তাই মেয়েটিকে গ্রাম থেকেই রোজ কলেজে যাতায়াত করতে হত। ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটলে পাকা রাস্তা, সেখান থেকে দিনে দুটো বাস যায়। সকাল সাড়ে ন'টার বাসটা মিস করলে আর সেদিন কলেজ যাওয়া হবে না। আর এদিককার বাসে ভিড়ও সাংঘাতিক...

প্রবাল হঠাৎ উঠে পড়ল। বাথরুমে যাওয়ার ছলে সে উঠে এল বারান্দায়। এক হাতে রামের গেলাস, অন্য হাতে সিগারেট। সে ম্লান মুখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, তবু আকাশে এখনও গাঢ় মেঘ।

ঘরের মধ্যে কল্যাণ তার কাহিনিটা বলে চলেছে।

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে ওই বেদবতী, তার আর কোনও ভাইবোন নেই। বাচ্চা বয়েস থেকেই মেয়েটির পড়াশুনোয় খুব মাথা। তার বাবা সে-রকম একটা কিছু পণ্ডিত নয়, খুব একটা বিদ্যে-বুদ্ধি নেই, আগের দিনের আই. এ. পাশ, স্কুলে বাংলা আর ভূগোল পড়ান। বেদবতী নিজে নিজেই পড়াশুনো করেছে, যে-কোনও বই পড়লে সে চট করে মুখস্থ করে ফেলতে পারে, সব কিছু শেখার দিকে তার তীব্র ঝোঁক। কত কষ্ট করে তাকে কলেজে যেতে হয়। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোয় সকাল ন'টায়। ভিড়ের বাসে কোনওক্রমে ঠেলাঠেলি করে ওঠে, কোনওদিন বসার জায়গা পায় না। ১৪ মাইল রাস্তা যেতেই বাসটা প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। কলেজ থেকে ফিরতে তার সাতটা বেজে যায়। তার আগে বাস নেই। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তাকে দেড় মাইল হেঁটে ফিরতে হয়। প্রথম প্রথম তার বাবা গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন সন্ধেবেলা। যুবতী মেয়ে, দেখতে সুন্দর, তার অনেকরকম বিপদ। কিন্তু বেদবতী খুব আপত্তি করত। বাবা কেন কষ্ট করে অতক্ষণ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে? গ্রামের রাস্তায় তার কোনও বিপদের ভয় নেই, গ্রামের সব মানুষ তাকে চেনে, তাকে ভালোবাসে। বেদবতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে সহজে ভয়ও পায় না।

গ্রামের লোক সত্যিই তাকে ভালোবাসে। ভালো রেজাল্ট করার জন্য স্কুল কমিটি তাকে পাঁচশো টাকা অনুদান দিয়েছে কলেজে পড়ার জন্য। বদরপুর কলেজেও সে ফ্রি। রেজাল্ট বেরুবার পর গ্রামের পাঁচ-ছ'টি পরিবার তাকে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে ও একটি করে শাড়ি দিয়েছে। চালের কারবারি বিষ্ণুপদ সাহা বলেছে, যতদিন বেদবতী পড়াশুনো করবে, ততদিন তার বই-খাতাপত্রের সব খরচ সে দেবে।

কলেজে যাওয়া-আসার কষ্ট ছাড়া বেদবতীর পড়াশুনোর অন্য কোনও অসুবিধে ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল, সে একদিন কলকাতায় গিয়ে এম. এ. পড়বে। তারপর রিসার্চ করবে!

কল্যাণ বলল, মেয়েটি যদি দেখতে কুৎসিত হত, স্বাস্থ্য খুব খারাপ রোগা, কোল কুঁজো, শ্যাওলা-শ্যাওলা মতন চামড়া, তাহলে হয়তো ঠিকই কলকাতা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছে যেত, নামকরা ছাত্রী হত। ডকটরেটও পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশে সুন্দরী মেয়েদের বেশি লেখা পড়া হয় না। বিশেষত গরিব ঘরের। তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই বোধহয় ঠিক কাজ। চোদ্দো মাইল বাস ঠেঙিয়ে রোজ এরকম কোনও কলেজে পড়তে পাঠান বোধহয় বোকামিই।

বিজন জিগ্যেস করল, শেষ পর্যন্ত কি হল মেয়েটির?

কল্যাণ গম্ভীরভাবে বলল, একদিন সে কলেজ থেকে আর ফিরল না।

সইফুল রাগের সঙ্গে বলল, ওর বাপটা একটা ড্যাম ফুল। বাস থেকে মেয়ে নামলো না দেখে ফিরে গেল বাড়িতে। পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় একটা খবর দেয়নি।

—মেয়েটা পালিয়ে গেছে কারুর সঙ্গে? কেউ ধরে নিয়ে গেল?

—ছ'দিন বাদে তার ডেড বডি ভেসে উঠল কেলেঘাই নদীতে। শি ওয়াজ রেপড অ্যান্ড মার্ডারড!

সইফুলকে তার পেশার জন্য অনেক খুন-জখম প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। অনেক রক্ত সে দেখেছে। এইসব ব্যাপারে সে আর তেমন আবেগে উত্তেজিত হয় না। এই কেসটা ঠিক মতন হ্যান্ডল করা যায়নি বলে সে ক্ষুব্ধ।

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল।

তারপর নীলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, তোমরা পুলিশরাই তো কিছু পারো না? একটা মেয়ে কলেজে যাবে-আসবে, তার সেফটিও তোমরা দিতে পার না? এই তো ল অ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা!

সইফুল বিদ্রুপের সুরে বলল, তুমি গ্রামের সম্পর্কে এই কথা বলছ? দিল্লিতে তোমার কী হয়েছিল?

নীলা ঠোঁট উলটে চুপ করে গেল।

বাবার ট্রান্সফারের চাকরি বলে নীলাকে দু-বছর দিল্লিতে কলেজে পড়তে হয়েছিল। সে স্মৃতি নীলার কাছে তিক্ত। একদিন দুপুরে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল রাজেন্দ্রনগরের রাস্তায়। খুব গরমের দিন, রাস্তায় বিশেষ লোক থাকে না। হঠাৎ দুটি মোটর সাইকেল এসে থামল তার দু-পাশে। দুটি ছেলে জোর করে তাকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল সেই দিন দুপুরে। নরম, লাজুক, ভীরু স্বভাবের মেয়ে ছিল নীলা, কোনওদিন সে চেঁচিয়ে কথা বলেনি, তবু ছেলে দুটিকে বাধা দিয়েছিল প্রাণপণে, সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল, একটি ছেলে তার চুল ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করেছিল পর্যন্ত। নীলা সেবার বেঁচে যায় আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ একটা বাস এসে পড়েছিল সেখানে। বাস-ভরতি মানুষদের চোখের সামনে আততায়ী দুজন পালাল।

সেই ঘটনার পর নীলা সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। তারপর থেকে বাড়ির একজন লোক প্রত্যেকদিন তার সঙ্গে যেত কলেজ পর্যন্ত। সেটাও কম লজ্জার ব্যাপার নয়। কিন্তু নীলা আর একা বেরুতে সাহস করেনি।

সইফুল বলল, রাজধানী দিল্লিতেই যদি ওইরকম কাণ্ড হয়, তা হলে আমরা এতগুলো গ্রামের ব্যাপার কি করে সামলাব? ক'খানা মাত্র গাড়ি আমাদের। দরকারের তুলনায় পুলিশ ফোর্স অনেক কম!

বিজন বলল, মেয়েটাকে মেরেই ফেলল একেবারে? যারা রেপ করে, তারা খুনিও হয়!

প্রবাল এই সময় আবার ঘরে ফিরে এসে বলল, আজ আবার বৃষ্টি নামছে!

জয়া এতক্ষণ যেন তার স্বামীর অনুপস্থিত লক্ষই করেনি। সে বলল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

প্রবাল কোনও উত্তর দিল না। সে যেন কোনও অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। কারুকে চেনে না।

সইফুল উঠে গিয়ে প্রবালের হাতের খালি গেলাসটা নিয়ে তাতে রাম ঢালল, সোডা মেশাল। গেলাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, প্রবালদা, আই অ্যাম ভেরি সরি। ওই বুড়োটা আপনাকে গিয়ে বিরক্ত করে, আপনি ওকে আমার কাছে রেফার করে দেবেন। আমরা কালপ্রিটদের ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেসটা কোর্টেই ড্রপ করা হয়নি।

প্রবাল নিজের শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠে বলল, তিনি তো আমার কাছে সে জন্য আসেন না। কালপ্রিটরা ধরা পড়ল কি পড়ল না, সে ব্যাপারে ওঁর কোনও আগ্রহই নেই। উনি আমার কাছে তো সে কথাটাই তোলেননি কখনও।

—তা হলে উনি আপনার কাছে কীসের নালিশ জানাতে আসেন?

—নালিশ না। একটা দাবি। উনি চান, যে-নদীতে ওঁর মেয়ের মৃতদেহটা ভেসে উঠেছিল, সেই নদীর নামটা বদলে দিতে।

বিজন বলে উঠল, এটা তো অদ্ভুত প্রস্তাব। নদীটা কী দোষ করল?

প্রবাল বলল, অদ্ভুত প্রস্তাব? হ্যাঁ, অদ্ভুতই বোধহয়। আবার ভেবে দেখতে গেলে তেমন অদ্ভুতও কিছু না। কিন্তু এই দাবি মানবার সাধ্য আমার নেই।

॥ ২ ॥

রাত্তিরে বৃষ্টি জয়ার বেশ পছন্দ। চুলটুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম মেখে, রাত-পোশাক পরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছে। খুব জোরে নয়, ঝিরঝির-ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

পা-জামা আর গেঞ্জি পরে প্রবাল শরীর এলিয়ে আছে একটা বিরাট সেকেলে ইজি চেয়ারে।

এই ইজি চেয়ারটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া। এই বাড়িতে এরকম অনেক পুরোনো ফার্নিচার রয়েছে। তার হাতে একটা রাম-ভরতি গেলাস। প্রবাল রোজ মদ্যপান করে না! কিন্তু যেদিন খায়, সেদিন খুব কমে থামতে পারে না। সইফুলের বাড়িতে সে দু-বারের বেশি নেয়নি, এখন তার আবার খেতে ইচ্ছে করছে।

জয়া মুখ ফিরিয়ে বলল, আজ এস. পি. সাহেবের বাড়ির পার্টিটা তেমন জমল না।

প্রবাল বলল হুঁ!

—তুমি হঠাৎ অফ-মুড হয়ে গেলে! নীলা অত ভালো-ভালো রান্না করেছিল, তুমি কিছুই খেলে না কেন?

—ইচ্ছে করল না।

—তোমার কী হয়েছে বল তো? ওই মেয়েটির ব্যাপারটা খুবই ট্র্যাজিক, খুবই স্যাড। কিন্তু তোমার চাকরির কেরিয়ারে এরকম আগে কখনও ঘটেনি? আমার তো মনে পড়ছে, পুরুলিয়ার সেই যে জোড়া খুন।

প্রবাল হাত তুলে জয়াকে থামিয়ে দিয়ে বলল, খাটের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দেবে প্লিজ?

প্যাকেটটা এনে প্রবালের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বুঝতে পারছি, আজ তোমার কথা বলার মুড নেই। তুমি কিন্তু আর ড্রিংক করবে না। এটাই শেষ। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ছি।

প্রবাল এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে বলল, আর খাব না। এই শেষ আজকের মতন। শোন, একটু বস! আজ কল্যাণ যখন ওই বেদবতীর বাড়ির কথা, ইস্কুলে পড়াশুনার কথা বলছিল, আমার মনে হচ্ছিল, আমি ওর মুখে আমারই জীবন-কাহিনি শুনছি!

জয়া অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী?

প্রবাল বলল, আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, সবাই আমাকে কি বলত জান? জিনিয়াস!

আপনমনে হা-হা করে হেসে উঠল প্রবাল। নিজের হাসি সে নিজেই খুব উপভোগ করছে। হাসতে-হাসতে দু'তিনবার বলল, জিনিয়াস! জিনিয়াস!

তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বলল, আসলে কিন্তু আমি জিনিয়াস ফিনিয়াস কিছু নই! তাহলে আর শুধু আই. এ. এস. হব কেন? আমার মেমারিটা খুব ভালো ছিল, মুখস্থ করতে পারতাম খুব, ইংরেজি-বাংলা পাতার-পর-পাতা গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারতাম। তাতেই লোকে অবাক হয়

যেত! ইস্কুলের মাস্টাররা মনে করত আমি বড় হয়ে দারুণ একটা কিছু হব।

জয়া বলল, তুমি কিছু খারাপ হওনি। এম. এ.-তে ইংলিশে ফার্স্ট হয়েছিলে। এবার উঠে পড়ো তো। তোমার নেশা হয়ে গেছে।

—শোনো, শোনো। আসল কথাটা শোনো। তুমি আমাদের নবীপুরের বাড়িতে যাওনি। এখন সে বাড়িতে আমার এক কাকা থাকে। মাটির বাড়ি বুঝলে, টিনের চাল। আমরা ছেলেবেলায় কখনও পাকা বাড়িতে থাকিনি। বাবা স্কুল মাস্টার, জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন, তার সংসারটাও বাবার ঘাড়ে পড়েছিল। ভালো করে খাওয়া জুটত না। সেই বাড়ির ছেলে আমি। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আমি কী করে কলেজে পড়ব, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। বাবার তো সামর্থ্য ছিল না। স্কলারশিপ পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে টাকা নিয়মিত প্রতি মাসে পাওয়া যায় না। আর সেই সামান্য টাকায় হস্টেলেও থাকা যায় না। আমার পড়াশুনোই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

—আহারে, অথচ তুমি তো তোমার বাবার একমাত্র ছেলে ছিলে?

—ঠিক ওই বেদবতীর মতন। সে মেয়ে। আমি ছেলে। শেষ পর্যন্ত আমিও বাস আর ট্রেন বদল করে একুশ মাইল দূরের কলেজে যেতাম। বাস ভাড়া লাগত না। ট্রেনের টিকিট কাটতাম না প্রায়ই। তবু আমি ঠিক চালিয়ে গেছি। তার কারণ, আমি একটা ছেলে। আর বেদবতী পারেনি, তার কারণ সে একটা মেয়ে। ছাত্র অবস্থায় আমি যদি মরে যেতাম, তা হলে আমার বাবা-মায়ের কী অবস্থা হত বল তো? ইউ ক্যান ওয়েল ইমাজিন। আর এই বেদবতী, তার বাবা-মায়েরও নিশ্চয়ই অনেক সাধ আর স্বপ্ন ছিল এই মেয়েটিকে ঘিরে। একটা মেয়ে, মাত্র সতের বছর বয়েস, সুন্দর, মেধাবিনী, গান গাইতে পারে ভালো, মনের জোর আছে, সেই রকম একটা মেয়েকে কয়েকটা লোক ধরে নিয়ে গেল, শুধু কয়েকবার তার শরীরটা ভোগ করার জন্য, তারপর তাকে খুন করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই লোকগুলো কি মানুষ না রাক্ষস?

—পুলিশ তাদের কোনও ট্রেসই পেল না। কী আশ্চর্য বল তো! লোকে যে পুলিশের নামে বদনাম দেয়, তা কি এমনি-এমনি? অথচ সইফুলকে দেখলে মনে হয়, খুব কাজের!

—জয়া, তুমি বাড়ির গাড়ি করে প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে, তাই না?

—ভ্যাট! প্রথম প্রথম দু-একদিন, তারপর বাসে করেই তো গেছি রোজ। কলকাতা শহরে আবার ভয় কি! সবাই বাসে করেই তো যায়!

—কলকাতার বাস আর এখানকার বাস তো এক নয়। সেদিন বদরপুর থেকে বাসটা আসতে-আসতে মাঝপথে থেমে যায়। কিছুক্ষণ বনেট তুলে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বলে দিল আর যাবে না। তখন রাত হয়ে গেছে। আর কোনও বাস নেই। গ্রামের লোক হেঁটেই পাঁচ-দশ মাইল চলে যেতে পারে। কিন্তু একটি সতেরো বছরের সুন্দর চেহারার মেয়ে কি তা পারে? পারলেও অন্যরা তাকে পারতে দেবে না। সেইখান থেকেই বেদবতীকে আর পাওয়া যায়নি। কেউ বলে ওই রাস্তা দিয়ে একটা জিপ গিয়েছিল, সেই জিপটাই মেয়েটিকে তুলে নিয়েছে। আবার অনেকেই জিপটিপ কিছু দেখেনি।

—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি বাইরের লোকেরাই এই কাণ্ডটা করে থাকে, তা হলে মেয়েটি মাঝখানের পাঁচ দিন ছিল কোথায়? লোকেরা তাকে ধরে অন্য কোথাও নিয়ে গেল, তারপর মেরে আবার এখানকার নদীতেই ফেলে গেল?

—হয়তো এখানেই কোথাও লোকগুলো ঘাপটি মেরে ছিল কয়েকদিন। মেয়েটার শরীরের সঙ্গে পাথর-টাথর বেঁধে ফেলে দিয়েছিল। কোনওরকমে পাথরগুলো খুলে গিয়ে বডিটা ভেসে ওঠে। শরীরে একটা সুতোও ছিল না। শরীরে আর কোনও ক্ষতও নেই, গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

—থাক, আর বলতে হবে না।

—রাবণ এসেছিল। রাবণকে আটকাতে পারল না মেয়েটা।

—অ্যাঁ, রাবণ? কী বলছো? এই তোমার নেশা হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি।

—হ্যাঁ রাবণই তো। কিন্তু হেরে গেল মেয়েটা!

—আর বাজে বকবক কোরো না তো। তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড ব্রুড করছ। এবার শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি।

—শোনো, কুশধ্বজ আর মালাবতীর মেয়ে হচ্ছে বেদবতী। ওরা স্বামী-স্ত্রী চেয়েছিল স্বয়ং লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে পেতে। কিন্তু যে-মেয়ে জন্মাল, সে জন্মের পরই বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। এ তো লক্ষ্মী নয়! এ অন্য মেয়ে। এর নাম রাখা হল বেদবতী। মেয়ে পড়াশুনোয় খুব ভালো, আই মিন, বেদটেদ সব মুখস্থ ছিল। কিন্তু যখন সে জানল, তার মা-বাবা লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে চেয়েছিল, তখন সে কঠোর তপস্যায় লক্ষ্মী হতে চলে গেল। আমাদের এই টিয়াজালি গ্রামের দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য আর তার বউ নিশ্চয়ই মেয়ের বদলে ছেলে চেয়েছিলেন। আমার মাকে সবাই বলত ভাগ্যবতী। কারণ আমি হিরের টুকরো ছেলে। হে-হে-হে-হে! তা ওই দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলে হল না, শুধু এক মেয়ে, তখন সেই মেয়েকেই ছেলের মতন মানুষ করতে লাগল। বেদবতীও বুঝতে পেরেছিল বাবা-মায়ের দুঃখ। ছেলেরা ভবিষ্যতের ভরসা। বেদবতী চেষ্টা করছিল, সে ছেলের মতনই হয়ে উঠবে, লেখাপড়া শিখবে অনেক, ভালো চাকরি পাবে, বাবা-মায়ের দুঃখ দূর করবে। কিন্তু রাবণ এসে গেল!

—এর মধ্যে আবার রাবণ আসছে কোথা থেকে?

—রাবণ এসেছিল। হ্যাঁ সত্যি। এই বেদবতী না, পুরাণের সেই বেদবতী, সে পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে। আমাদের এই বেদবতী যেমন অনেক দূরের কলেজে পড়তে গিয়েছিল। পুরাণের সেই বেদবতী নির্জন পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে, সে লক্ষ্মী হতে চেয়েছিল। সেখানে একদিন রাবণ এল। অতিথি হয়ে! অতিথিকে সেবা করতে হয়, তাই বেদবতী তার সামনে ফল-মূল সাজিয়ে সেবা করতে গেল। কিন্তু রাবণ শালা ছিল মহা কামুক। সুন্দরী মেয়ে দেখলে দশটা মাথাই ক্ষেপে যেত একসঙ্গে। সে বেদবতীকে ভোগ করার জন্য হাত বাড়াতেই সেই তপস্বিনী বলল, তিষ্ঠ! সেকালে মেয়েদের তেজ থাকত, বুঝলে। আর সে মেয়ে সাঙ্ঘাতিক তপস্বিনী। সে তিষ্ঠ বলতেই ব্যস, রাবণ আর এগোতে পারে না। স্তম্ভিত হয়ে গেল একেবারে। স্ট্যাচুর মতন! কিন্তু দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে তো তা পারল না। কেন পারল না! সীতা, সে সীতা হবে?

জয়া কাছে এসে প্রবালের হাত ধরে বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না! তুমি কী বলছ। রামায়ণের গল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ। এবার আমি কিন্তু আলো নিভিয়ে দেব।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে প্রবাল খানিকটা টলে গেল। জয়ার দু-কাঁধে হাত রেখে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল, আমি কিচ্ছু গুলিয়ে ফেলিনি। সব ঠিক বলছি। পুরাণ-টুরান আমার ভালো করে পড়া আছে। ওই যে বেদবতী রাবণকে স্তম্ভিত করে দিল, তারপরই কি তার কাহিনি ফুরিয়ে গেল? না। আরও আছে। রাবণ যে তার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিল। তার জন্য রাবণের আর কোনও শাস্তি হবে না? বেদবতীর যে অপমান হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবে না? রাবণের মতন একটা লম্পট তার দিকে কামাতুর চোখে চেয়েছিল বলে বেদবতী ক্ষোভে-দুঃখে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে স্বেচ্ছায় পুড়ে মরে। কিন্তু তার আগে সে রাবণকে বলে গেল, আমি আবার শিগগিরই এক আযোনিজ কন্যা হয়ে জন্মাব। তখন আমারই জন্য সবংশে ধ্বংস হবে। সেই মেয়ে পরের জন্মে কী হল বল তো? সীতা। জনক রাজার মেয়ে, কিন্তু তার কোনও মা ছিল না। বিষ্ণুর অবতার তো রাম, তার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হল, সুতরাং সে লক্ষ্মীর জায়গাটাও পেল। তার তপস্যা সার্থক। আর তার জন্যই রাবণকে মরতে হয়নি? এবার বুঝলে? আমি ঠিক বলেছি, না

ভুল বলেছি?

জয়া প্রবালকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকালে সে অন্য মানুষ। ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ।

দফায়-দফায় মিটিং। বিভিন্ন দলের দাবি-দাওয়া শোনা। নানান জায়গা পারিদর্শন। সার্কিট হাউসে একজন মন্ত্রী এসে উঠলেন হঠাৎ, তাঁর সঙ্গে রাত দেড়টা পর্যন্ত কাটাতে হল জরুরি আলোচনায়। এক ফোঁটা মদ তো দূরের কথা, বয়স্ক মন্ত্রীর সামনে সে সিগারেটও খেতে পারে না।

তিন দিন পরেই তাকে জিপ নিয়ে সোজা চলে যেতে হল কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী সব ডি. এম. দের ডেকেছেন কোনও গোপন পরামর্শের জন্য। সেখান থেকে পরদিন ফিরেই প্রবাল আবার গেল একটা মহকুমা সদরে, কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল, বড় কিছু ঘটার আগেই থামান গেল কোনওক্রমে।

এর মধ্যে জয়ার সঙ্গে ভালো করে কথা বলারই সময় পায় না সে। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের কথা আর উত্থাপন করল না একবারও।

মহকুমা থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরছে প্রবাল, অ্যামবাসেডরে বসে বসে সে ঝিমুচ্ছে। এসকর্টের গাড়িটা পেছনে। রাত প্রায় ন'টা। আজও বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। কয়েকদিনের পরিশ্রমে অনেক ক্লান্তি জমেছে তার শরীরে।

হঠাৎ তার ড্রাইভার খুব জোরে ব্রেক কষল। সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, স্যার!

প্রবাল চমকে চোখ মেলল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় শুধু গাড়ির হেড লাইট পড়েছে। বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কুয়াশার মতন। তার মধ্যে দেখা গেল একজন মানুষকে, ধুতি ও শার্ট পরা, দু-হাত উঁচু করে কী যেন বলতে চাইছে।

যেন এক প্রেতাত্মা! আবছা।

ঘুমের আবেশ কাটেনি বলে প্রবালের মনে হল, এ কি হ্যামলেটের বাবার মতন কোনও কিছুকে সে দেখছে? এই ধুতি-শার্ট-পরা মূর্তিটা তো অবিকল তার অনেক বছর আগে মৃত বাবা। বাবা কি কোনও গোপন কথা বলতে এসেছে তাকে?

তারপর গাড়ির দরজা খুলে নেমে, গটমট করে হেঁটে গিয়ে প্রবাল খানিকটা কঠোর গলায় বলল, কী ব্যাপার? আপনি এ-ভাবে আমার গাড়ি আটকালেন কেন?

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য হাতজোড় করে অনুনয় করল, এক মিনিট স্যার, এক মিনিট আপনি আমার কথাটা শুনে যান।

প্রবাল আবার বলল, আপনার বয়স হয়েছে, তবু এমন ছেলেমানুষী করতে আছে? আমার গার্ড আগেই গুলি চালিয়ে দিতে পারত। তাকে দোষও দেওয়া যেত না। এমনভাবে ডাকাতরা গাড়ি আটকায়।

দারুকেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন, স্যার। বুঝতে পারিনি স্যার।

—বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকার রাস্তায় আপনি এ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? কী করে বুঝলেন, আমি এই সময় এ রাস্তা দিয়ে যাব।

—আমি রোজই এখানে দাঁড়িয়ে থাকি এই সময়টায়।

—তার মানে এটা আপনাদের গ্রামের বাস স্টপ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভট্টাচার্যিমশাই আপনি শিক্ষিত মানুষ, একটা স্কুলে পড়ান। এ আপনি কী পাগলামি করছেন? আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আপনার মেয়ে আবার একদিন এখানে কলেজ থেকে

ফিরে বাস থেকে নামবে?

—না, না, তা বিশ্বাস করি না। সে কি আর হয়। এমনিই অভ্যেস। এখানে রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তো। সেই টানে চলে আসি। আমার বউ নিষেধ করে।

শুধু-শুধু বৃষ্টি ভেজার কোনও মানে হয় না। দারুকেশ্বরের অবশ্য সর্বাঙ্গ ভিজে। বুড়ো মানুষটার না নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

গাড়ি দুটোকে সাইড করতে বলল প্রবাল।

তারপর নিজের গাড়ির দরজা খুলে বলল, আপনি ভেতরে এসে বসুন, সামনের সিটের ওপর দেখুন একটা তোয়ালে আছে, সেটা দিয়ে ভালো করে মাথাটা মুছে নিন।

দারুকেশ্বর বলল, থাক-থাক ওসব লাগবে না। আপনি দয়া করে...

প্রবাল বেশ জোর দিয়ে বলল, আগে মাথাটা মুছে নিন! পরে কথা শুনব।

নিজেও ভেতরে এসে প্রবাল বলল, ভট্টাচার্যিমশাই, আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি? কিছু মনে করবেন না তো?

দারুকেশ্বর প্রায় মরমে মরে গিয়ে জিভ কেটে বলল, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! এ কী বলছেন স্যার! আপনি কত বড়, আপনি আমার অনুমতি নেবেন কেন? আমি অতি নগণ্য মানুষ। স্যার, আপনাকে আমি যে পিটিশানটা দিয়েছিলাম।

—আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো! আপনার মেয়ে একদিন কলেজ থেকে ফিরল না। সারা রাত কেটে গেল। তারপরেও আপনি থানায় খবর দেননি কেন?

—কেউ-কেউ যে বলল, সে রতন দাসের সঙ্গে বাসে উঠেছিল, তার সঙ্গেই শহরে চলে গেছে। কলকাতা শহরে। যেখানে কোনও মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

—রতন দাসটি কে?

—পরের দিন সকালেই আমি বদরপুর কলেজে খোঁজ নিতে গেলাম। দুটি মেয়ে বলল, আগের দিন বিকালে তারা আমার কন্যাকে রতন দাসের সঙ্গে এক বাসে উঠতে দেখেছে। রতন উঁচু ক্লাসের ছাত্র। পলিটিক্স করে। কলকাতায় যাওয়া-আসা করে। একদিন সে সীতার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল। দুপুরে খেয়ে গেল ভাত।

—সীতা কে? আপনার মেয়ের ডাক নাম?

—বেদবতীরই তো আর এক নাম সীতা।

প্রবাল এমন একটা মুখের ভাব করল, যেন এসব বিষয়ে সে কিছুই জানে না, জানার আগ্রহও নেই। ঠিক বিজয়ের মতন।

সে জিগ্যেস করল, রতন দাস? পুলিশ এর খোঁজ পায়নি?

দারুকেশ্বর প্রায় আর্তভাবে বলে উঠল, না, না, তার কোনও দোষ নেই। রতন দাস কোথাও যায়নি। সে সীতা-মা'র সঙ্গে বাসে উঠেছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই নেমে যায়। তার বাড়ি পাশের গ্রামে।

—রতন দাস কিছু জানে না? তবু আপনি একটা বাজে সন্দেহ করে পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় গেলেন না?

—আসল ব্যাপার কী হয়েছিল জানেন, স্যার। একদিন দুপুরে ওই রতন আমাদের মেয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল তো। ছেলেটি ভালো, কথাবার্তাও ভালো। কিন্তু দাসেদের বাড়ির ছেলে সীতার সঙ্গে তার অমনধারা মেলামেশা ঠিক ভালো দেখায় না। আমার স্ত্রী সীতাকে সেদিন বলেছিল, তুই ওই রতনকে বিয়ে করবি নাকি? খবরদার, অমন কথা মনেও স্থান দিবি না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু জাত-ধর্ম গেলে আর মানুষের কী থাকে? এই কথা শুনে সীতা খুব রাগ

করেছিল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তারপর কান্নাকাটি করেছিল খুব।

—মেয়েকে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না? একদিন একটা ছেলে বাড়িতে গিয়েছিল বলেই বিয়ের কথা ভাবতে হবে?

—আপনি ঠিকই বলছেন, স্যার। ন্যায্য কথা বলেছেন। দিন কাল পালটে গেছে। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ইস্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু আমরা তো পুরোন আমলের, বিশেষত আমার ব্রাহ্মণী এসব ঠিক বুঝতে পারেন না। দাসেদের ছেলে দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে এসে ভাত-টাত খেল, মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তাই কেমন-কেমন লাগে। মেয়ে যখন ফিরল না, আমরা ভাবলাম, মা-বাবার ওপর রাগ করে সে ওই ছেলের সঙ্গে চলে গেছে, তাতে আমরা কপাল চাপড়ে কাঁদতে পারি। আর তো কিছু পারি না। পুলিশ আর কী সাহায্য করবে বলুন।

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রবাল নিষ্ঠুরের মতন বলল, আপনার মেয়ে খুন হয়েছে, তার বদলে সে যদি রতন দাসের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত, সেটা বোধহয় আরও খারাপ হত, তাই না? ধরুন, পুলিশ ওদের কলকাতা থেকে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে এল, তখন কি মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতেন?

প্রবালকে অবাক করে দিয়ে দারুকেশ্বর বলল, এটা আপনি ঠিক বলেছেন, স্যার। সে যদি এক শুদ্দুরের সঙ্গে বেরিয়ে যেত, বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করে, তিলে-তিলে তাকে গড়ে তুলেছি, নিজেরা না খেয়ে তার বই-পত্তর কিনে দিয়েছি, সেই মেয়ে যদি অমন অকৃতজ্ঞ হত। তবে সেই আঘাত কি সহ্য করতে পারতাম? বোধহয় পারতাম না। এখন যা ঘটেছে, তাতে আমার মেয়ের কোনও দোষ নেই। নিয়তি। ভবিতব্য। মানুষের তো এতে কোনও হাত নেই!

—মানুষেরই হাত। মানুষের হাতেই খুনটা হয়েছে। নিয়তির কোনও হাত থাকে না। আপনি নাকি খুনিদের শাস্তি হোক, তাও চান না?

—শাস্তি তারা পাবেই। যিনি শাস্তি দেওয়ার তিনিই দেবেন। সেজন্য আপনাকে ব্যস্ত করতে চাই না স্যার।

—আপনার মতন আরও বহু লোক যদি ভগবানের ওপর এমন পুরোপুরি নির্ভর করত, তা হলে পুলিশের কাজ, আমাদের কাজ অনেক কমে যেত।

—আপনি স্যার, শুধু আমার সামান্য আর্জিটা...আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

—না, পারি না। নদীর নাম কি হঠাৎ বদলানো যায়? এরকম শুনেছেন কখনও? কত রকম কাগজে, পত্রে, দলিলে, ম্যাপে নদীর নাম লেখা থাকে। সেসব কে বদলাবে?

—কেন স্যার, রাস্তার নাম যে বদলায়? কলকাতায় হ্যারিসন রোড যে হয়ে গেল মহাত্মা গান্ধী রোড। আর কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট হয়ে গেল বিধান সরণী। হয়নি?

—সে তো সব বিদেশি নাম বদলানো হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদেশি নামের রাস্তা কেউ রাখে?

—সব বিদেশি নাম নয়। ধর্মতলার নাম হল লেনিন সরণী, চৌরঙ্গির নাম জওহরলাল নেহেরু রোড। তারপর ধরুন স্যার, মাদ্রাজ হয়ে গেল তামিলনাড়ু। গুজরাটের নামও কী যেন হয়েছে। এত বড়-বড় জায়গার নাম যদি বদল হতে পারে তা হলে একটা ছোট নদীর নাম কি বদলান যায় না?

প্রবাল এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে বলল, আঃ! এসব তো রাজনৈতিক ব্যাপার। তা ছাড়া নদীর নামটা বদলেই বা আপনার কী লাভ হতে পারে? কেন এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন?

এতক্ষণ পর্যন্ত দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা হলেও চোখ ছিল শুকনো। এবার সে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। হাউ-হাউ করে কেঁদে বলতে লাগল, লাভ হবে না কিছু, আমি লাভের কথা ভাবিনি স্যার, আমার মেয়েটার একটা স্মৃতি...সে কি একেবারে হারিয়ে যাবে...আমার

সীতা, তাকে কেউ মনে রাখবে না? ওঃ হো-হো, আমার সীতা মা...

প্রবাল কান্না সহ্য করতে পারে না। বাধাও দিতে পারে না, সান্ত্বনাও দিতে পারে না। সে চুপ করে থেকে প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটিকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল।

নদীর নাম কেলেঘাই। শীত-গ্রীষ্মে প্রায় শুকিয়ে যায়, তার চেহারা দেখে তখন নদী বলে মনেই হয় না, তার গর্ভে নেমে গিয়ে ছেলেরা খেলা করে, রাখালরা গরু চরায়, বাড়ির ভিত করার জন্য অনেকে মাটি তুলে নিয়ে যায়। একমাত্র বর্ষাকালেই দেখা যায় তার তেজ। তখন তার ঢেউ যেন টগবগ করে ফোটে। স্রোতের টানে নৌকো ভেসে যায়। এক-এক বছর এই নদী উপচে উঠে বন্যাও হয়। দু-পারের বাড়ি ভাসায়।

কেলেঘাই কোনও ঠাকুর দেবতার নাম নয়। পীর-ফকিরের নাম নয়। স্থানীয় কোনও সংস্কৃতির সঙ্গেও এর যোগ নেই। নিতান্তই একটা অর্থহীন শব্দ। এ নামের বদলে একটা ফুটফুটে সুন্দর কিশোরী মেয়ের নাম দিয়ে তার স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখলে দোষের কী আছে?

কিন্তু একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েই এ রকম নাম পালটাতে পারে না। অনেক প্রশ্ন উঠবে।

দারুকেশ্বরের কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে গেল। ধুতির খুঁট দিয়ে নাক মুছে সে সামলে নিল খানিকটা।

প্রবাল ভারি গলায় বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনি জেলা বোর্ডের কাছে আপিল করুন। স্থানীয় এম. এল. এ. কে ধরুন। ওঁরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পলিটিক্যাল লেভেল সিদ্ধান্ত নিলে আমি সেটা কার্যকর করতে পারি। তার বেশি আমার আর ক্ষমতা নেই।

দারুকেশ্বর অসহায় মুখখানি তুলে বলল, আমরা অল্প বয়েস থেকে দেখেছি, ডি.এম. সাহেব ইচ্ছে করলে সবই পারেন।

প্রবাল হেসে বলল, সেসব দিন আর নেই। চলুন, পণ্ডিতমশাই, আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দারুকেশ্বর তাতে প্রবল আপত্তি করে উঠল। তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে না, সে হেঁটেই যেতে পারে। তা ছাড়া জল-কাদার রাস্তা, তার বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায়ই না।

প্রবাল বলল, যতটুকু যাওয়া যায়, ততটুকু এগিয়ে দিচ্ছি। এই অন্ধকারের মধ্যে হাঁটবেন কেন?

দারুকেশ্বর কিছুতেই রাজি হল না। না, না, না বলতে-বলতে প্রায় জোর করেই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। বৃষ্টি পড়ছে এখনও।

অন্যসময় দারুকেশ্বর এত বিনীত, কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় সে একটাও কিছু বলল না প্রবালকে। তার রাগ কিংবা অভিমান হয়েছে। তাই সে প্রবালের গাড়িতে চড়তে চায় না।

প্রবাল একবার কাঁধ ঝাঁকাল। সে আর কী করতে পারে।

ড্রাইভারকে সাক্ষী মেনে বলল, দেখলে তো, এত করে বোঝালাম, তবু কিছুতেই বুঝবে না। আমি আর কী করতে পারি বলো।

ড্রাইভার বলল, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার। একটাই মোটে মেয়ে, সে অমনভাবে মরেছে, কী করে সহ্য করবে। আমি শুনেছি স্যার, টিয়াজালির ওই মেয়েটার সঙ্গে অনেকেই ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভালো-ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। কলেজে পড়তে না পাঠিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলে বেঁচে যেত। ঠিক কি না স্যার, বলুন!

প্রবাল এই আলোচনা আর চালাতে চায় না। সে বলল, স্টার্ট দাও। চল, অনেকটা দেরি হয়ে গেল!

গাড়ি আবার চলতে শুরু করতে প্রবাল মাথা এলিয়ে দিল। এখনও ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে পৌঁছোতে। আবার খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে হয়। এই রাস্তাটা যে টিয়াজালি গ্রামের ওপর দিয়ে গেছে, তা প্রবালের আগে খেয়াল হয়নি। অন্য একটা রাস্তা দিয়েও ফেরা যেত।

কিন্তু ঘুম আর এল না। এলোমেলো চিন্তা ঘুরতে লাগল মাথায়।

বাবার কথা মনে পড়ল। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার বাবার যেন চেহারারও মিল ছিল খানিকটা। বাবাও এরকম দুর্বল ধরনের মানুষ ছিলেন।

এম. এ. পাশ করার পরই একটা কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি পেয়ে যায় প্রবাল। সেই চাকরি করতে করতেই সে আই. এ. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেই সময় কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাবা-মাকে গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। তখন তার গাড়ি থাকার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বাবা-ট্রামে-বাসেও চড়তেন না। হেঁটে-হেঁটেই ঘুরতেন কলকাতা শহরে। প্রবালের ভয় হত, বাবা গাড়ি-চাপা না পড়েন। কলকাতায় কখনও থাকেননি তো আগে। সেবারও বেশিদিন রইলেন না। কলকাতা তাঁর ভালো লাগেনি। মাকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেলেন, প্রবালকে বলে গেলেন, তুই যখন বড় চাকরি করবি, গ্রামের বাড়িটার একখানা ঘর অন্তত পাকা করে দিস। বর্ষাকালে মাঝে-মাঝে সাপ ঢোকে। আর এক জোড়া গরু কিনব। আসলে তো আমরা ঘোষ গয়লা, গরু পালতে পারব ভালোই।

আই. এ. এস. পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করেছিল প্রবাল। উত্তর ভারতের এক পাহাড়ি শহরে সে যখন ট্রেনিং নিচ্ছে, সেখানে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেল বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। অ্যাটাক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া যায়নি।

ছেলের 'বড় চাকরি' দেখে যেতে পারেননি বাবা। প্রবাল তার পিতৃঋণ কিছুই শোধ করতে পারেনি।

গ্রামের বাড়িটা আর পাকা করা হয়নি। বাড়ির অংশ নিয়ে কাকা ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। ওই তো সামান্য সম্পত্তি, তা নিয়ে আবার ভাগাভাগি। সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল প্রবাল। বাবা নেই, সে কি ওই গ্রামে আর কোনওদিন বাস করতে যেত? মা এরপর বেঁচে ছিলেন পাঁচ বছর।

প্রবালের ছেলেবেলার গ্রাম, মফস্‌সল শহরের কলেজ জীবনের সঙ্গীসাথী, এসব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে একেবারে। কলেজটার পঁচিশ বছরের জয়ন্তীতে তাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, প্রবাল তখন দিল্লিতে, যেতে পারেনি।

রতন দাস ছেলেটি কেমন? ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সে একা একদিন চোদ্দো মাইল দূরে বেদবতীর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে ভাত খেয়েছে। সেখানে সে কীরকম ব্যবহার পেয়েছিল বেদবতীর বাবা-মায়ের কাছ থেকে? রতন প্রায়ই বেদবতীর সঙ্গে বাসে ফিরত। শুধু কি বন্ধুত্ব, না সে ভালোবেসেছিল বেদবতীকে? মনে-মনে তাকে বিয়ে করার সাধ ছিল? কিংবা সে জানত, ভট্টাচার্যি বাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাসদের বাড়ির ছেলেদের বিয়ে হয় না।

জয়া বিয়ের আগে ছিল চক্রবর্তী। প্রবাল ঘোষের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে জাতের কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। জয়াদের বাড়িতে ওসব কেউ মানে না। শহরের অনেকেই এসব গ্রাহ্য করে না আজকাল। শহর থেকে এইসব গ্রামগুলো কত লক্ষ-লক্ষ মাইল দূরে!

বহু পুরোনো একটা ব্যথা প্রবালের বুকে কাঁটার মতন বিঁধল আবার। প্রবাল অস্বস্তিতে ছটপট করে এপাশ-ওপাশ ফিরল, আর একটা সিগারেট ধরাল, তবু ব্যথাটা যাচ্ছে না।

মেয়েটির নাম মালিনী। ষোলো-সতেরো বছর বয়েস হবে তখন। প্রবাল সেই সময় মফস্‌সল কলেজের ছাত্র। ভালো রেজাল্ট করার জন্য সহপাঠীরা অনেকে তাকে খাতির করত। সন্তোষ ব্যানার্জি

নামে একটি ছেলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল প্রবালের।

সন্তোষদের অবস্থা ছিল সচ্ছল, মাঝে-মাঝে সে প্রবালকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। গরিবের ছেলে প্রবাল ভালো করে খেতে পায় না, কলেজে কখনও টিফিন করে না, এইসব কারণেই সন্তোষ ডাকত প্রবালকে। সন্তোষেরও মা-ও খুব স্নেহ করতেন তাকে। সন্তোষের বাবা প্রায়ই তাঁর ছেলেকে ধমক দিয়ে বলতেন, এই প্রবালকে দেখে-দেখে শেখ। গ্রামের ইস্কুলে পড়েও স্কলারশিপ পাওয়া যায়।

সেই সন্তোষের বোন ছিল মালিনী। খুব চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে ছিল, ব্যবহারে জড়তা ছিল না একটুও। দেখতে খুব একটা সুন্দর না, আবার খারাপও না, তার সঙ্গে সাবলীল ব্যবহারের একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল। পড়াশুনোয় তেমন কিছু ভালো ছিল না মালিনী, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করত চমৎকার। নানান অনুষ্ঠানে সে আবৃত্তি করতে যেত।

সেই মালিনীর সঙ্গে কি তার প্রেম হয়েছিল? না, না, তখন প্রেম-ট্রেমের কোনও চিন্তাই মাথাতে ছিল না প্রবালের। একমাত্র জেদ ছিল, পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে কলকাতায় এম.এ. পড়তে যেতে হবে। মফস্‌সলের গণ্ডি ছেড়ে বড় জায়গায় যেতেই হবে তাকে।

মালিনীর সঙ্গে প্রেম ছিল না, ভাব ছিল বেশ। নানারকম ইয়ার্কি, ঠাট্টা হত, তার বেশি কিছু ছিল না। সেই মালিনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। একটিমাত্র পাত্রপক্ষ দেখতে এসেই পছন্দ করে ফেলল মালিনীকে, পণ-যৌতুক নিয়েও বেশি দরাদরি হল না। সবাই বেশ খুশি।

সেই সময় সন্তোষের একটা কথা প্রবালের গালে একটা থাপ্পড়ের মতন লেগেছিল!

সন্তোষ হাসতে-হাসতে জানিয়েছিল, বাবা কী বলছিল জানিস? বাবা আফশোষ করে বলল, তোর ওই বন্ধু প্রবাল ছেলেটাকে আমার মেয়ের খুব পছন্দ, ও যদি ঘোষ না হয়ে বামুন হত, ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতাম। গরিব হলেও আমার আপত্তি ছিল না!

সন্তোষ ভেবেছিল, এটা প্রবাল সম্পর্কে প্রশংসার কথা। কিন্তু অপমানে প্রবালের সমস্ত শরীর ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। সে মালিনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যায়নি, সন্তোষের সঙ্গেও আর মিশত না বিশেষ।

সেই অপমানের জ্বালাটা এতদিন পরেও রয়ে গেছে।

মালিনীর মুখখানাও মনে আছে স্পষ্ট। যদিও মালিনীর সঙ্গে জয়ার কোনও তুলনাই হয় না। জয়ার রূপ গুণ অনেক বেশি। জয়াও ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। তবু এখনও প্রবালের ইচ্ছে হয়, সেই মফস্‌সল শহরে গিয়ে সন্তোষের বাবাকে কোনও এক ছুতোয় ধরে এনে চাবকাতে।

রতন দাসের সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পাচ্ছে প্রবাল। আহা, ওই রতন ছেলেটা এখন নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। ভট্চাজ বাড়ি থেকে বেদবতীকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার সাহস হল না কেন তার? মেয়েটা তা হলে হয়তো সত্যি বেঁচে যেত।

॥ ৩ ॥

বৃষ্টি এবার পাকাপাকি বিদায় নিয়েছে। আকাশের মেঘ কাশফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাদা হয়ে এসেছে, মাঝে-মাঝে উঁকি মারে গাঢ় নীল।

সোমবার একটা সরকারি ছুটি। শনিবার দুপুর থেকে লং উইক এন্ড। এই ছুটিটা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। একটা কিছু প্রোগ্রাম করার জন্য জয়া ছটফট করছে। কলকাতা ঘুরে এলে কেমন হয়?

প্রবালের খুব আপত্তি নেই? মঙ্গলবার যদি রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা কাজের ব্যাপার তৈরি করা যায়, তা হলে সরকারি গাড়ি নিয়েই যাওয়া যেতে পরে। তার সরকারি ট্যুর হবে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ কিছু কাজও আছে সত্যিই।

জয়ার দিদি-জামাইবাবু কানপুর থেকে কলকাতায় এসেছে, এখন ওখানে গেলে বেশ আড্ডা হবে। প্রবালের নিজস্ব কেউ আর নেই। শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গেই তার প্রধান সামাজিক সম্পর্ক।

কিন্তু অন্য একটা প্রস্তাব এল সইফুলের কাছ থেকে।

সইফুলের বন্ধু বিজন একটা বাড়ি কিনেছে শান্তিনিকেতনে। খুব সুন্দর করে নাকি সাজিয়েছে সেই বাড়ি। এই ছুটিতে সে একটা হাউজ ওয়ার্নিং পার্টি দিতে চায়।

শুক্রবার রাত্রে সইফুল আর নীলা এল কিছুক্ষণের জন্য। সইফুল বলল, চলুন প্রবালদা, শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি। এখন জেলাটা মোটামুটি পিসফুল, কোথাও কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

নীলা বলল, চলুন, চলুন। আমি কখনও শান্তিনিকেতন যাইনি!

জয়া তাকাল প্রবালের দিকে। মুখ দেখে মনে হয়, তার আপত্তি নেই।

প্রবাল বলল, তুমি ঠিক কর, কলকাতায় যাবে, না শান্তিনিকেতন যাবে?

জয়া বলল, দিদিরা তো এখন কিছুদিন থাকবে। কলকাতায় পরেও যেতে পারি। তুমি না পারলেও আমি একলাই চলে যাব।

প্রবাল মুচকি হাসল। নিজের দিদির চেয়েও বিজনের প্রতিই জয়ার টান বেশি দেখা যাচ্ছে।

জয়া আবার বলল, শান্তিনিকেতনে কীরকম বাড়ি বানিয়েছে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমারও শান্তিনিকেতনে জমি কেনার ইচ্ছে আছে।

প্রবালের এখনও নিজস্ব কোনও বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেই। কলকাতায় গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে উঠতে হয়। শান্তিনিকেতনে জমি কেনার আগে কলকাতাতেই আগে একটা কিছু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রবাল বলল, ঠিক আছে, চলো তা হলে যাওয়া যাক।

এখান থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। সইফুল গাড়ি নেবে, একটা গাড়িতেই চলে যাবে।

কাল দুপুর বারোটায় একটা স্কুল কমিটির মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে প্রবালকে, এটা অনেক আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। সুতরাং দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরেই বেরুতে হবে। শান্তিনিকেতনে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে অবশ্য। তাতেও কোনও ক্ষতি নেই। বোলপুর থানায় ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে রাখলে বিজনকে জানিয়ে দিতে পারবে, বিজন রান্না-বান্না তৈরি রাখবে।

পরদিন সকাল থেকে জয়া ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে তৈরি। কিন্তু বেলা এগারোটার সময় একটা সমস্যার সৃষ্টি হল।

একটি লোক নিয়ে এল স্থানীয় এম. এল. এ.-র চিঠি। তিনি আজ কলকাতা থেকে ফিরছেন। আজ সন্ধেবেলাতেই তিনি ডি. এম.-এর সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব জরুরি গোপন ব্যাপার আছে। সার্কিট হাউজে নয়, ডি. এম.-এর কোয়ার্টারেই তিনি আসছেন।

চিঠিখানা নিয়ে প্রবাল ওপরে এসে জয়াকে দেখাতেই সে জ্বলে উঠল তেলে বেগুনে। এম. এল. এ. যখন তখন চিঠি পাঠালেই ডি. এম. কে থাকতে হবে নাকি? ডি. এম.-এর ছুটি বলে কোনও বস্তু নেই? সরকারি ছুটি প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী অবশ্যই পেতে পারে।

প্রবাল কপাল কুঁচকে বলল, তবু যাওয়া মুশকিল। আগে বেরিয়ে পড়ল কোনও কথা ছিল না। কিন্তু চিঠি যখন রিসিভ করেছি, উনি লিখেছেন জরুরি ব্যাপার।

জয়া বলল, যতই জরুরি ব্যাপার হোক। তুমি ছুটির দিনে পাবে না? তুমি কি এম. এল.

এ.-র চাকর নাকি? সার্ভিস রুলে এরকম লেখা আছে?

প্রবাল দুর্বল ভাবে হেসে বলল, সব কিছু লেখা থাকে না। সরকারি চাকরি অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। সরকারি কাজে যে-কোনও সময় আমায় ডাকতে পারে।

—এটা আবার কীসের সরকারি কাজ? কোনও মন্ত্রী যদি ডাকতেন, তাহলেও না হয় বোঝা যেত। এম. এল. এ. সরকারের কে?

—রুলিং পার্টির এম. এল. এ. সরকারের প্রতিনিধি। নাঃ, আমার পক্ষে যাওয়া মুশকিল!

—ঠিক আছে, আমি আর জীবনে কোথাও যাবো না। এই মফস্সলে পচে মরব। কলকাতাতেও আর যাবো না কোনওদিন।

—আহা-হা, অত রাগ করছ কেন? আজকের বদলে আমরা কালকে বেরুতে পারি। কাল ভোর-ভোরে বেরিয়ে দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাব।

—নীলারা আজ দুপুরে যাবে বলে রেডি হয়ে আছে। ওরা শুধু-শুধু একটা দিন নষ্ট করবে কেন? ওদের বন্ধুর কাছে ওরা আনন্দ করতে যাচ্ছে, আমরা কেন স্বার্থপরের মতন ওদের আটকাব। তা ছাড়া তোমার ওই এম. এল. এ. কোন জরুরি কাজের কথা বলবে তার কোনও ঠিক আছে? কালকেও তোমাকে আটকে দেবে।

—না, সেটা আমি ম্যানেজ করব। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারব যে রবিবার আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে!

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই! তা ছাড়া সইফুলরা চলে গেলে তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে যাবে? গাড়ির ব্যাপারে তোমার যা পিটপিটানি। সইফুলরা গাড়ি নিয়ে কত জায়গায় যায়। আর তুমি একটু সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় একেবারে।

—গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা নিয়ে চিন্তা কোরো না।

—আজ এম. এল. এ. আসছে, কাল যদি কোনও মন্ত্রী এসে পড়ে? আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হবে না। আমি ঠিক বুঝে গেছি!

—তা হলে এক কাজ করা যাক। তুমি সইফুলের সঙ্গে আজ চলে যাও। যেমন ঠিক করা আছে।

—আমি তোমাকে রেখে একা যাব? তা হয় নাকি? না, আমার কিচ্ছু দরকার নেই।

—শোনো, শোনো তুমি আজ সইফুল-নীলাদের সঙ্গে যাও। আমি কাল গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করব। এতে অসুবিধে কী আছে? প্ল্যানটা ঠিকই রইল।

—না, আমি যাব না!

কিন্তু প্রবাল লক্ষ করল, জয়ার আপত্তিটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। বেচারি বেড়াতে যাওয়ার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে ছিল। সে আর একটু পেড়াপিড়ি করতেই জয়া রাজি হয়ে গেল। প্রবাল তো একদিন পরে যোগ দিচ্ছে তাদের সঙ্গে।

স্কুল কমিটির মিটিং সেরে এসে প্রবাল ওদের বিদায় জানাল। যাওয়ার আগে সইফুল জিগ্যেস করলো, এম. এল. এ. সাহেব আমার খোঁজ করবেন না তো? আপনি তাহলে একটু ম্যানেজ করে দেবেন।

প্রবাল বলল, চিঠিতে তোমার কথা কিছু লেখেননি।

সইফুল চোখ টিপে বলল, বলে দেবেন, আপনার চিঠি আসবার আগেই আমি বেরিয়ে গেছি। আমি অনেকদিন ছুটি নিইনি!

জয়া বলল, তুমি কিন্তু কাল ঠিক আসছো।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রবাল অফিসে গিয়ে বসল। এম. এল. এ. জরুরি কাজের কথা

লিখেছেন, নিশ্চয়ই এ জেলা সংক্রান্ত কাজ। আপাতত কোথাও কোনও গোলমাল নেই। হয়তো উনি নতুন কোনও প্রজেক্টের কথা বলবেন।

বিভিন্ন এস. ডি. ও.-দের রিপোর্ট পড়তে লাগল প্রবাল।

অন্যান্য কর্মচারীরা চলে গেল একে-একে, রয়ে গেল শুধু নাজিরসাহেব। এর কোয়ার্টার পাশেই। নাজিরসাহেব একেবারে কাজের পোকা।

দুপুর তিনটে আন্দাজ প্রবাল বলল, নাজিরসাহেব, আর্দালিকে চা দিতে বলুন তো!

নাজিরসাহেব চায়ের ব্যবস্থা করে প্রবালের কাছে এসে বসে পড়ে বলল, স্যার, সেই ভটচার্যি মাস্টার, এখন কী করছেন জানেন? ওই যে ইস্কুল মাস্টার, যার মেয়ে মারা গেছে!

প্রবাল মুখ তুলে বলল, কী করছেন তিনি?

নাজির হাসতে-হাসতে বলল, লম্বা-লম্বা ছড়া বানিয়েছে। মেয়ের নামে সেইসব ছড়া শোনায় হাটে-হাটে ঘুরে। পরশুদিন পলাশপুরের হাটে শুনলাম। নেচে-নেচে ছড়া বলে। মাথাটা একেবারে গেছে।

নাজিরসাহেবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে প্রবাল জিগ্যেস করল, আপনি নিজে শুনলেন? কেমন হয়েছে ছড়াগুলো?

নাজিরসাহেব বললেন, মন্দ না, স্যার। লাইনের শেষে মিল আছে। মেয়ের জীবনকাহিনি শুরু করেছে একেবারে জন্ম থেকে। খুনের কথা, ধর্ষণের কথা সব আছে। এমনকি পরজন্মের কথাও যেন আছে। সবশেষে হাতজোড় করে সবাইকে বলে, বাবা সকল, এখন থেকে কেলেঘাই নদীর নাম হল ওই দুখিনী কন্যার নামে। তোমরা কেউ আর কেলেঘাই বল না। বাবা সকল, তোমাদের কাছে অনুরোধ....

—লোকজন শুনে কী বলে?

—কেউ বিশেষ কোনও উচ্চবাচ্য করে না। পণ্ডিতের গলাটা তো ভালো না, ভাঙা-ভাঙা সবকথা বোঝা যায় না। লোকেরা ওকে পাগল বলেই মনে করে বোধহয়।

—উনি তা হলে নদীর নাম বদলাবার চেষ্টা এখনও ছাড়েননি। আচ্ছা, নাজির সাহেব, নদীর নামটা পালটে দিলেও তো হয়। ওর যখন এতই ইচ্ছে। এরকম একটা বড় ঘটনা থেকেই তো গ্রামের নাম, নদীর নাম হয়। জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবটা দিলে হয় না?

—ওই ছড়ার মধ্যে আছে, স্যার, জেলা বোর্ড প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছে। জেলা বোর্ডের কাছেও পিটিশান দিয়েছিল। আপনার নামও আছে।

—আমার নামও আছে? আমাকে পাষণ্ড-টাষণ্ড বলেছেন বুঝি?

—না, অতটা নয়। আপনার সম্পর্কে এইরকম আছে, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় মহা ব্যস্ত অতি। যাবতীয় কর্মকাণ্ড সবই রাজনীতি!

নাজিরসাহেব হা-হা করে হেসে উঠল, প্রবালও গলা মেলাল তাতে।

তারপর প্রবাল বলল, আমাকে রাজনীতির লোক বানিয়ে দিল? যাক, বেশি গালাগালি দেয়নি ভাগ্যিস। আমি ওঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। আজ তো এম. এল. এ. আসছেন, ওঁর কাছে একবার প্রস্তাবটা তুলব নাকি?

নাজিরসাহেব বেশ আপত্তির সুরে বললেন, এম. এল. এ. সাহেব কি জানেন না ভাবছেন? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু একজন লোকের কথায় শুধু একটা নদীর নাম পালটাতে যাবেন কেন?

—রাস্তার নাম, জায়গার নামও তো বদলান হয় অনেক সময়। নদীর নাম যদি সুন্দর হয়, কেলেঘাই শব্দটার কি কোনও মানে আছে? সেই তুলনায় বেদবতী, শুনতে ভালো না?

—আমার কিন্তু স্যার কেলেঘাই নামটাই ভালো লাগে। মানে যাই হোক, একটা বেশ লোকাল

ফ্লেভার আছে নামটার মধ্যে। শুনলে মনে হয়, বেশ গভীর কালো জল, বড়-বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে!

—আপনি খুব বেশি কল্পনা করছেন, নাজির সাহেব। ও নদীতে গভীর কালো জল কোথায় দেখলেন? বড়-বড় ঢেউই বা বছরে ক'দিন থাকে? আমি তো শুকনো চিড়চিড়েই দেখি!

—এই তো বর্ষা গেল, এখন ওই নদীর চেহারা একবার দেখে আসুন গিয়ে স্যার! কত তেজি নদী। এবার আর একটুর জন্য বন্যা হল না। যাই বলুন, স্যার, বেদবতীর চেয়ে কেলেঘাই নাম অনেক ভালো।

—আপনিও তা হলে নাম বদলের পক্ষপাতী নন?

—বেদবতী নামটা খটমট, না? তা ছাড়া, বেদ আপনাদের পবিত্র গ্রন্থের নাম! লোকের মুখে এর বিকৃত উচ্চারণ হবে, সেটা কি ভালো? অনেক গোঁড়া মুসলমান এ নাম মানতে চাইবে না। হিন্দুদেরও আপত্তি থাকতে পারে!

—হিন্দু দেব-দেবীদের নামেও তো নদীর নাম আছে। গঙ্গা, সরস্বতী, ভৈরব, আরও কত আছে। সেসব নাম মুসলমানরা উচ্চারণ করে না?

—সে আগেকার যা আছে তা আছে। নতুন করে এরকম নাম দিতে গেলে গোলমাল হতে পারে, সরকারি দিক থেকে এরকম চেষ্টা না করাই ভালো।

—ও, তাহলে একটা অ্যাঙ্গেলও আছে? এটা আমি ভেবে দেখিনি!

—সরকারের লোকদের সবসময় সাবধানে থাকাই ভালো। কে কোথায় বলে দেবে, নতুন করে হিন্দুয়ানি চালাবার চেষ্টা হচ্ছে নদীর নাম বদলে।

—একটা করুণ ঘটনা, এক শোকার্ত পিতৃ-হৃদয়ের দাবি, সেটাকে নিয়েও যদি কেউ-কেউ ধর্মীয় ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করে, তবে তাদের ধরে-ধরে জুতোপেটা করা উচিত। যাক গে, আমার হাতে নাম বদলাবার ক্ষমতাও নেই, আমি এ নিয়ে আর মাথাও ঘামাচ্ছি না।

—সেই ভালো, স্যার। আপনি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কেলেঘাই নদীতে খুব বড়-বড় কালবোস মাছ পাওয়া যায়, আপনি কখনও খেয়েছেন? খুব মিষ্টি স্বাদ। একদিন এনে দেব আপনার জন্য।

প্রবালের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। পাথর-বাঁধা অবস্থায় সতেরো বছরের বেদবতী নাম্নি মেয়েটির নগ্ন শরীর অনেকক্ষণ পড়ে ছিল নদীর গর্ভে। মাছেরা নিশ্চয়ই ঠুকরে-ঠুকরে খেয়েছে সেই শরীর। জলজ গুল্মও জড়িয়ে গিয়েছিল তার গায়ে!

হঠাৎ ফিসফিস করে সে বলে উঠল ঃ হোয়েন ডাউন হার উইডি ট্রফিজ অ্যান্ড হারসেলফ/ফেল ইন দ্য উইপিং ব্রুক হার ক্লোদস স্প্রেড ওয়াইড/অ্যান্ড মারমেইড-লাইফ, এ হোয়াইল দে বোর হার আপ...

নাজির সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে প্রবাল লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যামলেট, ওফেলিয়ার মৃত্যুদৃশ্য। এমনি মনে পড়ল হঠাৎ। নাঃ, আপনাকে মাছ আনতে হবে না, আমি অত মাছের ভক্ত নই।

ওপরে উঠে এসে দোতলার একটা ছোট ছাদে চেয়ার নিয়ে বসল প্রবাল। শুধু জয়া নেই বলেই দোতলাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। জয়া থাকলে কি চ্যাঁচামেচি করে? একজনের উপস্থিতিই অনেকটা শূন্যতা ভরিয়ে দেয়।

আর-এক কাপ চা খেয়ে প্রবাল ঘড়ি দেখলো। সাড়ে পাঁচটা। এম. এল. এ. পাঁচটার মধ্যে আসবেন বলেছিলেন।

আরও এক ঘণ্টা বাদে একজন এসে খবর দিলেন, এম. এল. এ. আজ কলকাতা থেকে

ফিরতে পারছেন না। তিনি আসবেন বুধবার।

খুব জরুরি আলোচনা ছিল, অথচ সেটা পাঁচদিন পিছিয়ে গেল। তাহলে সেটা কতখানি জরুরি? এরা ব্যস্ত লোক, যখন-তখন এদের প্রোগ্রাম পালটায়। প্রবালের বুঝি সময়ের কোন মূল্য নেই? অবশ্য এম. এল. এ. মহোদয় জানত না যে প্রবালের এই ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল!

ভেতরে-ভেতরে ক্ষোভ জমলেও প্রবাল সে কথা কাকে এখন জানাবে! এম. এল. এ.-র চিঠি অগ্রাহ্য করে দুপুরবেলা চলে গেলেই হত। এ. ডি. এম.-কে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া ছিল। তবু, চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর যাওয়া যায় না। এই চাকরির এটাই একটা চরম বিরক্তিকর ব্যাপার। একটু এদিক-ওদিক হলেই একটা অপ্রয়োজনীয় দফতরে ঠেলে দেবে।

ভেতরের ঘরে বসে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রবাল। এরপর সারা সন্ধে তার কিছুই করার নেই। কথা বলার কেউ নেই।

এখন সে ইচ্ছে করলে শান্তিনিকেতনের দিকে বেরিয়ে যেতে পারে অবশ্য। হঠাৎ মাঝরাত্রে পৌঁছে জয়াদের চমকে দেবে। কিন্তু একা সে একটা গাড়ি নিয়ে যাবে? জয়া ঠিকই বলেছে, সরকারি গাড়ি ব্যাক্তিগত কাজে ব্যবহার করাব ব্যাপারে তার একটা খুঁতখুঁতুনি আছে। এরকম সবাই করে। প্রবাল তবু এখনও পারে না। এখান থেকে শান্তিনিকেতনের সরাসরি ট্রেনও নেই। বর্ধমান গিয়ে পালটাতে হবে, সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার আজ আর হবে না। কাল দেখা যাবে।

তা ছাড়া, জয়া আজ একটু অন্যরকম আনন্দ করুক না। স্বামী কাছে না থাকলে অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের ব্যবহার কিছুটা পালটেই যায়। বিজন বেশ খাতির করে জয়াকে। আজ একটু বেশি খাতির করবে। জ্যোৎস্না রাতে ওরা সবাই মিলে বেড়াতে যাবে। তবে জয়ার একটা ডিগনিটি আছে, সে কখনও মাত্রা ছাড়াবে না, তা প্রবাল জানে। বিজন আজ চেষ্টা করবে জয়াকে বেশি জিন খাইয়ে টিপসি করে দিতে। এরকম সে অন্যদিনও চেষ্টা করে। আজ প্রবাল কাছে থাকবে না। আজ জোরাজুরি করবে। করুক না। এক-আধদিন এরকম হলে দোষ নেই তো কিছু।

ঘরের আলো জ্বালেনি প্রবাল, সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শান্তিনিকেতনে জয়াদের আনন্দ ফুর্তির দৃশ্য। প্রবালকে কেউ যেন নির্বাসিন দণ্ড দিয়েছে।

অফিসার মহলে পরস্পরের বউদের সঙ্গে খানিকটা ফস্টি-নস্টি, ঠাট্টা-ইয়ার্কি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রবালও ওখানে থাকলে নীলার সঙ্গে নানারকম মজা করত। কিন্তু গ্রামের মানুষ ওসব কী চোখে দেখে? তারা হয়তো এগুলোকেই মনে করে উঁচু সমাজের ব্যভিচার। বাবা আর মা যদি এখন এখানে প্রবালের কাছে থাকতেন, তাঁরা কি সমর্থন করতেন জয়ার এরকম সইফুলদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া?

বাবার ইচ্ছে ছিল দুটো দুধেল গাই বাড়িতে রাখার। শেষ পর্যন্ত আর কিনে দেওয়া হয়নি। সেই সময়ই তো পেল না প্রবাল। গ্রামের বাড়িটা জয়াকে দেখানোই হল না।

সন্ধেবেলা আর কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা যায়। একবার উঠে প্রবাল নিচে নেমে বাগানে চলে এল। গ্রামের ছেলে হয়েও প্রবালের তেমন গাছপালার শখ নেই। ছোটবেলা থেকে সে শুধু পড়াশুনোই করেছে। তাদের গ্রামের বাড়িতে ফুলগাছ ছিল না। ঘরের চালে লাউ কুমড়ো হত। উঠোনে ছিল বেগুন গাছ কয়েকটা।

এখানে এত সুন্দর বাগান, রোজ আসাই হয় না বাগানে। জয়া অবশ্য প্রত্যেকদিন সকালে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ফুল ছেঁড়ে না, গন্ধ শোঁকে। বেদবতী যদি বেঁচে থাকত, এম. এ. পড়ার জন্য কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারত, তারও কি কোনও ডাক্তার অধ্যাপক আই. এ. এস.-এর সঙ্গে বিয়ে হতে পারত না!

একজন আর্দালি এসে বলল, আর. টি.-তে একটা কল এসেছে স্যার। আপনি ধরবেন?

প্রবাল বিরক্ত হয়ে না বলে দিতে যাচ্ছিল। কোনও মন্ত্রী হলেও সে আর ধরবে না। সে এখন ছুটিতে। তবু অভ্যেস বশে সে জিগ্যেস করল, কে ফোন করেছে?

আর্দালি আবার ছুটে গেল জিগ্যেস করে আসতে।

প্রবালের মনে হল, চিফ সেক্রেটারি হতে পারেন। এর আগেরবার কলকাতায় দেখা হলে তিনি প্রবালকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে পাঠাবার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। প্রবালেরই একজন ব্যাচমেট জাপান ঘুরে এল।

আর্দালি ফিরে এসে বলল, এস. ডি. পি. ও. কল্যাণ দত্ত ফোন করছেন স্যার।

এটা প্রবাল অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করতে পারত, তবু দ্রুত হেঁটে এসে সে ফোন তুলে জিগ্যেস করল, কী খবর কল্যাণ?

কল্যাণ বলল, আপনাকে কি ডিসটার্ব করলাম, স্যার? এস. পি. ছুটিতে গেছেন, শুনলাম, উনি স্টেশন লিভ করেছেন। তাই ভাবলাম, খবরটা আপনাকে জানিয়ে রাখি।

প্রবাল বলল, খবরটা কী তাই বল!

কল্যাণ বলল, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ একজন নৌকার মাঝিকে অ্যারেস্ট করেছি। এর সঙ্গে টিয়াজালি কেসটার কানেকশন আছে। মনে হচ্ছে, এবার কেসটার একটা ব্রেক হবে।

—টিয়াজালির কেস মানে, কোন কেস?

—ওই যে দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের মার্ডার কেস!

—তার সঙ্গে নৌকার মাঝির কী সম্পর্ক?

—এর নৌকায় তিনজন লোক গোটা একদিন ছিল। মেয়েটাও সঙ্গে ছিল।

—মেয়েটার ছবি ও আইডেন্টিফাই করেছে?

—তার দরকার হয়নি, স্যার। ও যে ঘটনাটা বলল, তা এই কেসটার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে। এই লোকটা একজন অ্যাকসেসরি। যদিও বলছে, ওর কোনও দোষ নেই।

—লোকটা এখন কোথায়?

—আপাতত আমার অফিসে বসিয়ে রেখেছি। আরও কথা বার করার চেষ্টা করছি।

—আমি এক্ষুনি আসছি। ওখানেই রাখো ওকে।

ফোন রেখেই ব্যস্ত হয়ে প্রবাল আর্দালিকে বলল, গাড়ি বার করতে বল। গার্ড রেডি আছে তো? একজন গার্ড সঙ্গে যাবে, ফিরতে রাত হতে পারে।

প্রবাল দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। পাজামা-পাঞ্জাবি ছেড়ে পরে নিল প্যান্ট-শার্ট। সিগারেট-দেশলাই পকেটে ভরে নিয়ে নেমে এল তরতর করে। গাড়িতে উঠেই সে বলল, তাড়াতাড়ি চল, এস. ডি. পি. ও. কল্যাণ দত্তর অফিসে।

আর্মড গার্ড তখনও এসে পৌঁছোয়নি বলে বিরাটভাবে বকুনি দিল প্রবাল। সে সাধারণত সাবঅরডিনেটদের উঁচু গলায় ধমকায় না।

গাড়ি চলার পর প্রবাল নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। সে এত অস্থির হচ্ছে কেন? খুনের আসামি ধরা তার কাজ নয়। কল্যাণ যথেষ্ট পারদর্শী, সে ঠিক মতোই এগোচ্ছে। প্রবালের মাথা গলাবার কোনও প্রয়োজনই নেই।

সে কি তবে ঘটনার ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগাতে চায়? মেয়েটা নিজে থেকেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, না কেউ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? এখানেই একটা নদীর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা একটা নৌকাতে কাটাল মেয়েটি, কেউ জানতে পারল না? মেয়েটি চিৎকার করে কারুর সাহায্য চায়নি?

কল্যাণ দত্তর অফিসে পৌঁছে প্রবাল অবশ্য অত ব্যস্ততা দেখাল না। সিগারেট ধরিয়ে ধীরেসুস্থে ঢুকল। যেন সন্ধেবেলা তার কোনও কাজ নেই বলে সে কল্যাণের কাছে বেড়াতে এসেছে।

মাঝিটাকে রাখা হয়েছে পাশের ঘরে। মাঝবয়সি দাড়িওয়ালা একজন লোক, এর মধ্যেই মার খেয়েছে প্রচণ্ড, কষের ধারে রক্ত জমে আছে। হাতে পায়ে দড়ি বাঁধা। একটা আহত পশুর মতন দেয়ালের এক কোণে বসে আছে লোকটা। মুখে অপরাধের স্পষ্ট চিহ্ন। প্রবালের ধারণা, সে মুখ দেখে মানুষের চরিত্র বুঝতে পারে।

কল্যাণের ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে সে বসল। তাকে দেখেই কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠেছে, প্রবাল হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে জিগ্যেস করল, এই মাঝিটার স্টোরিটা কি? ওকে ধরলে কী করে?

কল্যাণ বলল, অন্য একজন মাঝি খবর দিয়েছে। মেয়েটার বডি যেদিন কেলেঘাই নদীতে ভেসে ওঠে, তার দু'দিন আগে কয়েকজন লোক ওর নৌকা ভাড়া নিয়েছিল।

প্রবাল বলল, বাইরের লোক?

কল্যাণ বলল, এ মাঝিটা তো এখন তাই বলছে। ভালো করে চেক করতে হবে। এর একটা বড় নৌকা আছে, স্যার। খড় নিয়ে যায়। ভেতরে ছই আছে, মানে থাকবার জায়গা আছে। চারপাশটা খড়ের গাদায় ঢাকা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তিনজন লোক সেই মেয়েটাকে নিয়ে এই নৌকোয় উঠেছিল। নদীর বুকেই একটা দিন আর একটা রাত কাটিয়েছে। খুব সম্ভবত মনে হচ্ছে স্যার, বর্ধমানের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসের তিনজনই এরকমভাবেই গা ঢাকা দিয়েছিল।

প্রবাল বলল, আশ্চর্য, একদিন একরাত এখানে নৌকোয় কাটাল, কেউ টের পেল না? পুলিশও কিছু জানল না? বর্ধমানের ডাকাতির পর তো সবক'টা জেলায় পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

কল্যাণ বলল, বর্ষাকালে নদী এখন অনেক চওড়া। অনেক নৌকো যায়। আমাদের তো স্যার মটোর বোট নেই। নদীর ওপর চেক করার কোনও ব্যবস্থাই নেই। খেয়াঘাটগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছিল শুধু।

—মাঝিটা বুঝেছিল ওরা গুণ্ডা-বদমায়েশ। তবু কোনও খবর দেয়নি!

—এখন ও বলছে অবশ্য যে লোকগুলো ওকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল।

—তার পর প্রায় দু-মাস কেটে গেছে। এর মধ্যেও সে নিজে থেকে এসে পুলিশকে কোনও খবর দেয়নি?

—অ্যাকরডিং টু দিস সবুর আলি মাঝি, সেই লোকগুলো ওকে শাসিয়ে গেছে যে, কোনওদিন যদি ও মুখ খোলে, পুলিশকে কিছু জানায়, তা হলেই তারা এসে ওকে খুন করবে!

—আর সেই মেয়েটি? সে স্বেচ্ছায় লোকগুলোর সঙ্গে ছিল?

—না। মেয়েটির মুখ বাঁধা ছিল। মেয়েটিকে ওরা নৌকোর খোলের মধ্যে ভরে রেখেছিল যাতে অন্য কোনও নৌকো থেকে কেউ দেখে না ফেলে।

—নৌকোয় এই মাঝি ছাড়া আর কেউ ছিল না?

—এই সবুর আলির ছেলে ছিল, তার বয়েস হবে চোদ্দো-পনেরো। তার নাম কাশেম। তাকে এখনও ধরিনি। নৌকোটা সিজ করা আছে। কাশেম সেই নৌকোতেই রয়েছে।

—এখান থেকে কত দূরে আছে নৌকোটা?

—বড় জোর তিন-চার কিলোমিটার হবে। স্যার, যাবেন সেখানে? আমিও ভাবছিলাম, এই সবুর আলিকে নৌকোর ওপরে নিয়ে গিয়ে জেরা করব। অ্যাকচুয়াল সিন অফ দা ক্রাইমে গেলে অনেক কিছু আপনা-আপনি বেরিয়ে আসে।

—চল, তা হলে যাওয়া যাক। আমার এখন কোনও কাজ নেই। তুমি ইনভেস্টিগেশেন কনডাক্ট করো, আমি শুধু পাশ থেকে দেখব।

কল্যাণ উঠল প্রবালের গাড়িতে। আর একখানা গাড়িতে সবুর আলিকে নিয়ে উঠল দুজন কনস্টেবল। লোকটা জেদি আছে, কী নিয়ে যেন আপত্তি জানাতে গিয়ে আবার গুঁতো খেল পুলিশের কাছে। রেপ কেসের ব্যাপারে কারুকে ধরলেই পুলিশ প্রথম থেকেই বেদম পেটায়। বোধহয় এক ধরনের পুরুষমানুষের ঈর্ষা কাজ করে।

কল্যাণ বলল, আমি মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি বলেই আমি এই ঘটনাটায় খুব বেশি আঘাত পেয়েছি। চাকরির ব্যাপার ছাড়াও আমার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, কালপ্রিটদের ধরবই। এই লোকটার মুখ থেকে একটা যা কথা শুনলাম স্যার, শুনলে আপনারও খুব কষ্ট হবে।

প্রবাল বলল, কী ব্যাপার?

কল্যাণ বলল, এই সবুর আলি বেশ কয়েকবার শপথ করে বলেছে যে সে তার নৌকোয় বেদবতীর ওপর কোনও পাশবিক অত্যাচার করতে দেখেনি। মেয়েটার ওপর যা কিছু অত্যাচার করেছে ওই তিনটে লোক, তা আগেই হয়ে গেছে! মেয়েটার তখন নির্জীবের মতন অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে, তা ওরা ভেবে পাচ্ছিল না। ওদের খুন করার মতলব ছিল না। ওরা যদি ব্যাঙ্ক ডাকাত হয়েও থাকে, কিন্তু ঠিক খুনি টাইপের নয়। কিন্তু মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেও ওদের বিপদ। মেয়েটা ওদের আইডেন্টিফাই করে দেবে পুলিশের কাছে।

প্রবাল বলল, রেপের পর এই জন্যই তো খুন করে।

কল্যাণ বলল, সবুর আলি বলল, ও নিজে শুনেছে, মাঝরাত্তিরে ওরা মেয়েটাকে নৌকোর খোল থেকে বার করে মুখের বাঁধন খুলে খেতে দিয়েছিল। একজন বলছিল, গালাগাল দিয়ে নয়, ভালোভাবে, মেয়েটা ওদের সঙ্গে অনেক দূর যেতে রাজি আছে কিনা। ওরা মেয়েটার আর কোনও ক্ষতি করবে না।

—মেয়েটি কোনও উত্তর দিয়েছিল?

—মেয়েটি হঠাৎ নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল।

—অ্যাঁ? পালাবার চেষ্টা করেছিল? গ্রামের মেয়ে সাঁতার জানত নিশ্চয়ই।

—তা জানি না। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও মেয়েটা পালাতে পারেনি। ওই বদমাশগুলো ভালোই সাঁতার জানে। ওদের মধ্যে দুজনও জলে ঝাঁপ দেয় সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর নদীর মধ্যেই ধস্তাধস্তি হয়। সেই অবস্থাতেই বেদবতী শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। সবুর আলির বিবৃতি অনুযায়ী ওরা যখন মেয়েটিকে জল থেকে নৌকোয় তোলে, তখনই তার প্রাণ নেই। তারপর ওরা ডেডবডিটা ডিসপোজ করার চিন্তা করে।

প্রবাল দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। স্পষ্ট। অন্ধকারে নদীতে সাঁতার কেটে পালাবার চেষ্টা করছে একটি কিশোরী মেয়ে, দুটো গুন্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। দুজনের সঙ্গে একা লড়াই করবে কী করে? ওদের একজন নিশ্চয়ই ওর গলা টিপে ধরেছিল।

কল্যাণ আরও অনেক কিছু বলছে, প্রবাল কিছুই শুনছে না। সে শুধু ওই দৃশ্যটাই দেখে যাচ্ছে।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলে সে জিগ্যেস করল, কল্যাণ, তুমি রতন দাস নামে একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছ?

কল্যাণ একটু সময় নিল বুঝতে। তারপর বলল, রতন দাস? হ্যাঁ স্যার, তার সঙ্গে আমি দু-তিনবার কথা বলেছি। সে এই কেসে ইনভলভড নয়। অন্তত পাঁচজন সাক্ষী আছে, সে বাস থেকে আগেই নেমে গিয়েছিল। রাত্তিরে সে বাড়িতেই ছিল। কলেজও গিয়েছিল পরের দিন।

—কেমন ছেলে সে?

—ভালোই ছেলে। পলিটিকস করে। মেয়েদের পেছনে লাগে না। তবে বেদবতী সম্পর্কে তার জেনুইন দুর্বলতা ছিল। খুবই ভেঙে পড়েছে দেখলাম। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না। সবচেয়ে আয়রনিক ব্যাপার হচ্ছে, সেই সন্ধেবেলা কী জানি কেন সে চেয়েছিল বেদবতীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে। বেদবতী রাজি হয়নি। তার বাবা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন ছেলের সঙ্গে বেদবতী ফিরছে দেখলে তিনি রাগ করতেন।

প্রবাল নিজের ছাত্র বয়সের চেহারাটা দেখতে পেল। মালিনী এখন কোথায় আছে কে জানে। মালিনীকে দেখলে সে হয়তো এখন চিনতেও পারবে না।

কেলেঘাই নদীর ঘাটে বড় নৌকোটার পাশে আরও দুটো ছোট নৌকো বাঁধা! সবুর আলির এখন দাঁড় বাইবার ক্ষমতা নেই। অন্য দুজন মাঝিকে ডেকে তোলা হল সেই নৌকোয়! পুলিশের আদেশ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

প্রবাল সবুর আলির ছেলে কাশেমকে এক ঝলক দেখল। রোগা, পাতলা সরল চেহারার এক কিশোর। এর চোখের সামনেই ওই বীভৎস কাণ্ডগুলো ঘটেছে? সারাজীবন ও কি সে কথা ভুলতে পারবে? এই বয়েসে ওর ইস্কুলে যাওয়ার কথা। তার বদলে ও নৌকোর হাল ধরতে শিখেছে।

প্রবাল এপ্রিল মাসের পর আর এই নদীর ধারে আসেনি। বর্ষার পর কেলেঘাই এমন স্বাস্থ্যবতী হয়েছে যে সত্যিই চেনা যায় না। কানায় কানায় উপছে উঠছে জল। অন্ধকারে মনে হচ্ছে অতল কালো জলে জমছে মত্ত ঢেউয়ের খেলা।

নৌকোটা চলেছে অকুস্থলে। কল্যাণ সবুর আলি আর অন্য মাঝিদের জেরা করে যাচ্ছে, প্রবালের যেন আর কোনও আগ্রহ নেই। সে বসে আছে গলুইয়ের কাছে। আকাশে আজ বেশ জ্যোৎস্না। জয়ারা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে শান্তিনিকেতনে। এখন খুব মজা করছে ওরা। বিজন প্রবালের মতন গরিবের ছেলে নয়। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে। শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই জমি কেনা ছিল, প্রবালের বদলে বিজনের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভালো হত? অবশ্য জয়া বলে, বিজনের সঙ্গে পার্টিতে আড্ডা দিতেই মজা লাগে। আসলে মানুষটা খুব হালকা। বিশেষ পড়াশুনো নেই। অমন মানুষের সঙ্গে সারাজীবন সে কাটাতে পারত না।

নৌকোটা এসে থেমেছে এক জায়গায়, নদীর মাঝখানে। সবুর আলিকে প্রবালের কাছে টেনে এনে কল্যাণ বলল, স্যার, এর মধ্যে আর একটা জিনিস জানা গেল। এর বাড়ি সার্চ করে আমাদের লোক একটা শাড়ি পেয়েছে। ওই বেদবতীর শাড়ি। মেয়েটা মরে যাওয়ার পর ডেডবডিটা জলে ফেলে দেওয়ার আগে এই সবুর আলিই বলেছিল, তাহলে আর শুধু শাড়িটা নষ্ট করার কী দরকার। ও শাড়ি আর জামাটামা খুলে নিয়েছিল বডি থেকে।

প্রবাল বলল, মেয়েটার শরীরের সঙ্গে পাথর বেঁধে ফেলা হয়েছিল, তা ঠিক?

—হ্যাঁ স্যার, পাথর বাঁধা হয়েছিল সেই জন্যই ভেসে উঠেছে আরও একদিন পরে।

—এখানে পাথর পেল কোথা থেকে?

—নৌকোয় এরা রান্না করে খায়। মশলাবাটার শিল নোড়া ছিল। সেই শিলনোড়াই বেঁধে দিয়েছিল।

—কে বেঁধেছে?

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল প্রবাল। বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, কে সেই পাথর বেঁধেছিল? কে? তুই বেঁধেছিলি?

সবুর আলির গলা টিপে ধরে তাকে পাটাতনের ওপর আছড়ে ফেলে দিল প্রবাল। তারপর তার বুকের ওপর চড়ে বসে চিৎকার করতে লাগল, বল, বল, তুই বেঁধেছিলি? নিজের হাতে...

কল্যাণ আর একজন পুলিশ জোর করে টেনে তুলল প্রবালকে। সে এমন জোরে সবুর আলির গলা টিপে ধরেছিল যে লোকটা মরেও যেতে পারত। তা হলেই কেলেঙ্কারি হত একটা। আজকাল এসব ব্যাপার চাপা দেওয়া যায় না।

কল্যাণ বেশ ভর্ৎসনার সুরে বলল, এ আপনি কী করছিলেন স্যার? হঠাৎ এমন খেপে গেলেন কেন? যা জিগ্যেসাবাদ করার আমিই তো করছিলাম।

প্রবালের শরীরটা এখনও থরথর করে কাঁপছে। সে কোনও কথা বলতে পারছে না।

কল্যাণ তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। প্রবাল নিল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। সবুর আলির বদলে এখন তার এই নদীর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বাসঘাতিনী নদী তাকে বাঁচাতে পারল না!

নৌকোটা কোন দিকে যাচ্ছে এখন তা কিছুই খেয়াল করছে না প্রবাল। তার বাড়ি ফেরার কোনও তাড়া নেই। এরকম একটা জ্যোৎস্না রাতে নদীর ওপর নৌকো ভ্রমণ অন্য কোনও উপলক্ষ্যে কত উপভোগ্য হতে পারত। কিন্তু এই নদীতে একটি নিষ্পাপ মেয়ের মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল, এই নৌকোতে তার শরীর থেকে সব বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়েছে!

একটু পরে একজন কনস্টেবলের কথা শুনে আবার চমকে উঠল প্রবাল।

সেই পুলিশটি কল্যাণকে বলছে ওই যে দেখুন স্যার, ডান দিকের পাড়ে একজন হ্যারিকেন নিয়ে বসে মাটি খুঁড়ছে। বোধহয় সেই বুড়ো!

কল্যাণ জিগ্যেস করল, কোন বুড়ো? মাটি খুঁড়ছে কেন?

পুলিশটি বলল, আজ দুপুর থেকে স্যার একজন এই নদীর ধারে-ধারে সাইনবোর্ড বসাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে গেঁথে দিচ্ছে। সেগুলো তুলে ফেলতে হবে কিনা, সেরকম কোনও অর্ডার পাইনি।

—কীসের সাইনবোর্ড?

—এই নদীর নাম বদলে কী যেন একটা অন্য নাম।

—বোধহয় তাই হবে। বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এত রাতেও মাটি খুঁড়ছে।

কল্যাণ গলা তুলে প্রবালকে বলল, স্যার শুনলেন ব্যাপারটা? দারুকেশ্বর ভট্টচাজ নিজেই সাইনবোর্ড বসাচ্ছে! ওগুলো কি তুলে ফেলা হবে?

প্রবাল উত্তর না দিয়ে ডান দিকে তাকাল। নৌকোটা পাড় ঘেঁষেই যাচ্ছে এখন। এদিকটা ফাঁকা। এক জায়গায় হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে একজন মানুষ। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, সে যে মাঝে-মাঝে শাবল তুলছে, বোঝা যাচ্ছে সেটুকু।

প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। একা নামব। তোমরা কেউ সঙ্গে এস না।

কল্যাণ বলল, এখানে নামবেন কেন? আপনার গাড়ি অনেক দূরে। আমরা এখন সেদিকেই ফিরছি।

প্রবাল আদেশের সুরে বলল, নৌকো ভেড়াতে বল। আমি নামব।

নৌকোটা লাগল একটু দূরে। কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে প্রবাল বলল, কল্যাণ, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একটু পরে আসছি। যাও, এগিয়ে যাও!

বৃদ্ধটি এক মনে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে। তার কাছে কে এল, না এল, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। ঘামে জবজব করছে তার গায়ের জামা। কপাল দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে ঘাম।

সাইনবোর্ডটি পড়ে আছে একপাশে। প্রবাল সেটা তুলে নিয়ে দেখল বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'বেদবতী'। তলায় ব্রাকেটে ছোট অক্ষরে লেখা 'কেলেঘাই নদীর নতুন নাম।' তার নিচে লেখা, 'এই

নদীর জলে বেদবতী নামে এক কন্যা প্রাণ দিয়াছে, এই নদীর নামে সেই কন্যা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে।'

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল প্রবালকে। অন্যদিনের মতন সে বিনয়ে বা ভক্তিতে গদগদ হল না। শুকনো গলায় জিগ্যেস করল, আপনি এগুলো তুলে দিতে এসেছেন?

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রবাল বলল, না। নদীর ধারে কে কী সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে, তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাতে যাবে কেন? সবশুদ্ধ, এরকম ক'টা লাগিয়েছেন?

—পাঁচটা। আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, নিজের হাতে লিখেছি।

—বেশ ভালোই বানিয়েছেন। তবে টিনের দাম আছে। সরকার কিছু না বললেও অন্য লোকেরা খুলে নিয়ে যেতে পারে।

—তা নিয়ে নিক। যার ধর্ম সে নেবে। আমার লাগাতে ইচ্ছে হয়েছে আমি লাগাচ্ছি। আমার কর্ম আমি করছি।

—এই সাইনবোর্ড লাগালেই কি এ জেলার মানুষ এই নদীর নাম-বদল মেনে নেবে?

—তা জানি না। আমি যতদিন বাঁচব, চেষ্টা করে যাব।

শাবল খোঁড়া থামিয়ে প্রবাল বলল, না। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না।

দারুকেশ্বর বলল, আমি করি। আমরা পুরোনো লোক, আমরা মানি। আমার মেয়ে আবার জন্মাবে। আমার মতন গরিব আর দুর্বলের ঘরে না, অনেক বড় ঘরে সে জন্মাবে। এ জন্মে সে বড় কষ্ট পেয়ে, বড় ব্যথ্যা নিয়ে গেছে। পরের জন্মে সে শোধ তুলবে। সেসব দুষ্টের দমন করবে! আর কেউ কোনও নারীর ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চোখ বুঝব!

প্রবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তারপর বলল, পণ্ডিতমশাই, আপনি বড্ড ঘেমে গেছেন। শাবলটা এবার আমাকে দিন। আমি গর্ত খুঁড়ে দিচ্ছি। তারপর আপনি সাইনবোর্ড বসিয়ে দেবেন।

দারুকেশ্বর বলল, না, না, তার দরকার নেই। আমিই পারব। আপনি কেন কষ্ট করবেন!

প্রবাল তবু জোর করেই নিয়ে নিল শাবলটা।

সেটা মাটিতে পোঁতার পর তার মনে হল, সে যেন তার বাবার জন্য গ্রামের বাড়িটা পাকা করে দেওয়ার কাজের ভিত খুঁড়ছে।

সে জোরে-জোরে শাবল চালাতে লাগল।

হে প্রবাসী

এই কিছুদিন হল বিল্ব দোতলা থেকে একতলায় নেমে এসেছে। দোতলার ঘরখানি ছিল দারুণ জানলাময়, সিঁড়ির ঠিক মুখেই, প্রচুর আলো হাওয়াযুক্ত। সেই তুলনায় নিচতলার ঘরটি ছোট আর একদিকের দেওয়ালে দুটি মাত্র জানলা। সবাই বলে পরস্পরবিরোধী জানলা না হলে সে ঘরে থাকার সুখ নেই। তবু, এটাকে যদি অধঃপতন বলা যায়, তাহলে এরকমটি বহুকাল ধরেই চেয়েছিল বিল্ব। সে বন্ধুদের বলে, স্বর্গ থেকে পতনের ফলেই মানব সভ্যতার যাবতীয় কাণ্ডকারখানা শুরু হয়েছিল, জানিস না?

দোতলার ঘরটিতে সে ছিল আর দুই ভাইয়ের সঙ্গে, নিচের ঘরে সে একা। ঘরটি নিতান্ত তুচ্ছ নয়। একটি খাট, একটি বইয়ের আলমারি, একটি টেবিল ও একটি চেয়ার স্বচ্ছন্দে জায়গা করে নিয়েছে। জানলা দুটি পুরোনো আমলের হওয়ায়, সামনে বেশ চওড়া বেদি, তাতে বইপত্র রাখা যায়। বিল্ব অবশ্য অন্য কাজে লাগিয়েছিল। দিনের বেলাও যে ঘরটি একটু অন্ধকার সেটি বিল্বর পছন্দ। ফটফটে সূর্যের আলো চাই? সেজন্য তো যখন তখন রাস্তায় বেরিয়ে গেলেই হয়।

দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁদিকে আলমারি ও টেবিল-চেয়ার, ডানদিকে খাট। একটি মাত্র আলোও ডানদিকের দেয়ালে, সেজন্য পড়াশুনোর ব্যাপারগুলো খাটে শুয়ে করতে হয়। যে কেউ বলবে, খাট আর টেবিল-চেয়ার দু-দিকে বদলাবদলি করে নিলেই তো ভালো ছিল। এই কাজটি সোজা নয়, এর জন্য একটা যা তা ধরনের অন্তত উদ্যম চাই। তাছাড়া, যারা এই উপদেশ দেবে, তারা কেউ মেপে দেখেনি যে আলমারি আর টেবিল দুটোকেই ডানপাশে আনলে একটা জানলা ঢেকে যায় কিনা। আবার এর যে-কোনও একটিকে সরালে বাকি জায়গাটুকুতে খাটটা ধরে না। সুতরাং বিল্ব বেশ আছে। তা ছাড়া, তার খাটে শুয়েই পড়তে বা লিখতে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথ কাঠের চেয়ারে সোজা হয়ে কৃচ্ছ্রসাধনার ভঙ্গিতে বসে লিখতেন প্রত্যক্ষদর্শীরা এরকম জানিয়েছেন। কিন্তু ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর চিঠিতে আছে যে তাঁর রবিকাকা যৌবনে বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে গীতাঞ্জলির টুকরো কবিতাগুলি রচনা করেছেন ধারাবাহিক দুপুরে। বিল্বর বয়েস তার চেয়েও কিছুটা কম।

ঘরটি পাওয়া গেছে এক দোকানদারের সৌজন্যে। বিল্বদের বাড়ির সামনের, রাস্তার দিকের, ঘরটি একটি মনোহারি দোকান। এর আগের দোকানদার দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে, নিজে এই পেছনের ঘরটিতে থাকতেন। তিনি প্রকাশ্যে অবিবাহিত ছিলেন। মাস তিনেক আগে কোনও এক অসুখে ভুগে তিনি আর নেই। কিন্তু অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে তিনি এই ঘরটিতে মরেননি, সেই ব্যাপারটি তিনি চুকিয়ে ফেলেছিলেন জয়নগর মজিলপুরে।

বিল্বর বাবা দ্বিগুণ ভাড়ায় শুধু দোকানঘরটি আবার ভাড়া দিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় ঘরটি নতুন মালিক চায়নি, শোভাবাজারে তার পরিবার আছে। বিল্ব এক একদিন মধ্যরাত্রে এ ঘরের দেয়ালে প্রাক্তন দোকানদারের গায়ের গন্ধ পায়। তিনি লুঙ্গি পরতেন। ওঃ। এইসব মানুষ, বিল্ব ভাবে, যত তাড়াতাড়ি মরে ততই মঙ্গল। কবে যে পৃথিবী থেকে লুঙ্গি উঠে যাবে। বিল্বর বাবাও লুঙ্গি পরতে ভালোবাসেন।

পুরোনো আমলের বাড়ির স্বাভাবিক নিয়মবশতই একতলার ঘরের দেয়ালে ড্যাম্পের নানারকম ডিজাইন ফুটে থাকে এবং প্রায়ই বদলায়। কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে যারা এই ধরনের ড্যাম্প লাগা ঘরে একা থাকবার মহান সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ কবি হয়। যেমন বিল্ব।

একদিন রাত পৌনে এগারোটায় বিশ্বর নবজন্ম হল।

ট্রামের ভাড়া এক পয়সা বাড়াবার ফলে কলকাতায় একটি চমৎকার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যখন তখন ট্রামে উঠে বলা, ভাড়া দেব না। কেউ আপত্তি করে না। বারবার ট্রামে ঘোরাঘুরি করে ব্যাপারটা একটু ফিকে লাগে। কেউ আপত্তি করলে ঘুঁসি মারার জন্য হাতের মুষ্টি উদ্যত ছিল। কন্ডাক্টরদের নিরুত্তাপ ব্যবহারের জন্যই বাধ্য হয়ে কলেজ ক্যান্টিনে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ট্রাম পোড়াবার। ট্রাম পোড়ানো এত সোজা, বাসের মতন ঝামেলা নেই, ট্রাম তো আর ইচ্ছে মতন পালাতে পারে না। পেছন দিককার কেবল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেই ট্রলিটা খুলে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে ট্রাম অসহায়, তারপর যেখানে খুশি মারো শালা আগুন!

ঠনঠনের মোড়ে বিশ্বও এরকম একটা খেলায় মেতে উঠেছিল। বেশ একটা শরীর চনমন করা উত্তেজনা। পরপর দুটো ট্রাম জ্বলছে, বিশ্ব তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা ঝাঁপ ফেলা সেলুনের রকে বসে সিগারেট টানতে-টানতে ঘন-ঘন তাকাচ্ছে ডানদিকে বাঁ-দিকে। সেলুনটা চেনা, এর মালিক এক 'ঠাকুর' ভক্ত। ইনি দোকানের নাপিতদের বলেন আর্টিস্ট। বিশ্ব একদিন দুপুরে চুল ছাঁটাতে এসেছিল, মালিক তখন বলেছিলেন, আপনি একটু বসুন, আমাদের আর্টিস্ট বিড়ি খেতে গেছে।

বিশ্ব মনে-মনে ভাবছিল, কোনও ছুতোয় এই দোকানটায় আগুন লাগানো যায় কিনা। সেই সময় ডানদিকের ফাঁকা রাস্তায় বেশ দূরে দেখা গেল দুটি চলন্ত কালো বিন্দু। পুলিশের গাড়ি। নেমন্তন্ন বাড়িতে খেতে বসে মাংস না আসা পর্যন্ত যেমন একটা উসখুসে ভাব থাকে, সেই রকমই পুলিশের গাড়ির জন্য একটা অস্বস্তি ছিল। এবার ওরা নিশ্চিত হল। আধলা ইঁট তৈরি আছে। এর পরের দায়িত্ব নেবে বোম্বিং স্কোয়াড। বিশ্ব অতিশয় ধুরন্ধর ছেলে, সে নিজের হাতে বোমা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না, কেন না সে কবি, সে হুংকার দেয় ও ইট মারে এবং পালায়।

ঝামাপুকুর লেন দিয়ে ছুটতে-ছুটতে বিশ্ব হঠাৎ বোধ করে যে সে একা। সামনে, গলির মোড়ে টিয়ার গ্যাস শেল সমেত বেঁটে বন্দুখধারী চারজন পুলিশ যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকে নামে। পেছন দিকে ব্ল্যাক মারিয়া বিশ্ব নিজের চোখে দেখে এসেছে। এই সময় যে-কোনও বাড়িতে ঢুকে পড়ার জন্য সে প্রতিটি বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়। প্রতিটি দরজা বিপুলভাবে বন্ধ। বিশ্ব একবার ওদিকে একবার এদিকে, সে ক্রমাগত শুনতে পায় বুটের শব্দ, ক্রমাগত এত ভারী শব্দ যে কানে তালা লেগে যায়...। মৃত্যুর চেয়ে আহত হওয়ার ভয় বিশ্বর বেশি। বিশেষত, যদি অন্ধ হতে হয়।

খাটাল উচ্ছেদ আন্দোলন তখন সবে শুরু হলেও মোটেই সার্থক হয়নি। তাই বিশ্ব বেঁচে যায়। খাটালের দরজা থাকে না, তবু বিশ্ব লাফ দিয়েছিল এবং একটি পা ভেঙেছিল। ঠিক ভাঙেনি, মচকে ছিলই বলা যায়।

কোনওদিন বারোটা সাড়ে বারোটার আগে আলো নেভে না বিশ্বর ঘরে। রাত দশটার পর বাড়ি ফিরলে টেবিলের ওপর ভাত ঢাকা থাকে। সেদিনও ছিল। কিন্তু যার পায়ে অসম্ভব ব্যথা, তার খিদে থাকে না। বিশ্ব আধখানা ডিমের ঝোল খেয়ে ফেলল। তারপর খানিকটা ভাত ও ঝোল থালায় মাখামাখি করে এমন একটা রূপ দেওয়া হল যেন খুব একটা খাওয়াদাওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে গিয়ে সমস্ত ডাল ভাত-তরকারি ফেলে দিল নর্দমায়। তিন বালতি জল ঢালতে হল। বাড়ির আর সবাই ওপরে, নিচে বিশ্ব একা।

বারান্দায় আলোটা জ্বেলে, ঘরের আলোটা নিভিয়ে সে এবার শুয়ে পড়বে, নিজের ভাঙা পাটাকে আদর করবে, পাজামার দড়ি আলগা করে দেবে, পাশ বালিশটাকে দুই উরুর মধ্যে প্রিয়তমার মতন জড়িয়ে নেবে, কিন্তু তার আগে একটি সমস্যা, বাঁ-দিকের জানলা। বিশ্বদের বাড়িতে পোষা বিড়াল নেই, সে নিজেই বিড়াল।

প্রত্যেক দিন বাঁদিকের জানলার ছেঁড়া জাল দিয়ে ইঁদুর ঢোকে। সদ্য রোমিও জুলিয়েট নামে

নাটিকাটি পড়ার ফলে বিল্ব প্লেগ রোগ সম্পর্কে একটা রোমান্টিক ধারণা লালন করেছে। সে কোনও ইঁদুরকে কাছে আসতে দিতে চায় না। সেইজন্য, প্রতি রাত্রেই সে ঘুমের আগে একটা ভাঙা খিল হাতে নিয়ে ইঁদুর মারার জন্য নৃশংস হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত একটাও মারতে পারেনি অবশ্য। কিন্তু ইঁদুর বিষয়ে সে এমনই মনোযোগী যে ওদের ওপরে সে একটা কবিতা লিখে ফেলেছে পর্যন্ত। অবশ্য কোনও এক দুর্বোধ্য কারণে সেই কবিতায় সে ইঁদুরের বদলে মূষিক শব্দটি ব্যবহার করেছিল।

কিন্তু আজ ব্যথাতুর পায়ে সে ওই খেলাটি খেলতে পারবে না। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর, সে বাঁ-দিকের জানলাটি আজ বন্ধই রাখবে ঠিক করল। জানলা বন্ধ করতে এসে সে দেখল একটি চলচ্চিত্র।

বিল্বর ঘরের পাশেই একটি গলি। গলির ওপরে একটি বড় বাড়ি। সেই বাড়িটি একটি মানবিক চিড়িয়াখানা। তার প্রতিটি ঘরে একটি করে ভাড়াটে। কারুর রান্নাঘর নেই, উঠোনে উনুন ধরিয়ে বারান্দায় রান্না। প্রতি সন্ধ্যাবেলায় ওই বাড়ি থেকে তেরোটি উনুনে ধোঁয়া বেরোয়।

বিল্বর জানলা দিয়ে তিনটি ঘর দেখা যায়। একটি ঘর অন্ধকার। পাশাপাশি দুটি ঘরে তখনও আলো জ্বলছে। একটি ঘরে সে স্পষ্ট দেখল, একজোড়া নারীপুরুষ বিছানার ওপর খবরের কাগজ পেতে খাবার খেতে বসেছে। বিল্বদের বাড়িতে এখনও এটোকাঁটার অনাবশ্যক বাছবিচার বলে এই দৃশ্যে সামান্য আকৃষ্ট হল সে। বিছানার ওপর বসে বসে খাওয়াটা মন্দ নয়, বিল্ব নিশ্চয়ই একদিন একটা কোনও রাজি করা মেয়ে পেলে এইভাবে খাবে। রাত্রিবেলা খবরের কাগজের কী অপূর্ব ব্যবহার!

মেয়েটির বয়েস যাই হোক না কেন, মুখখানা কিশোরীর মতন। সে জোড়াসনে না বসে একটা হাঁটু উঁচু করে তার ওপরে থুতনি রেখে খায়। দুজনেই নিঃশব্দ বা এত মৃদুস্বরে কথা বলে যে বিল্বর পক্ষে শোনা অসম্ভব।

পাশের অন্য ঘরে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে একটি বাচ্চা। বিছানায় শুয়ে বাচ্চাটি কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। স্বামীটি পাজামা পরা, খালি গা। সে মশারি খাটাবার জন্য পেরেক ঠুকতে ব্যস্ত। স্ত্রীটি একবার ঘরের বাইরে যাচ্ছে আর আসছে। স্ত্রীটি গোলগাল ও পাঁচ ফুটের কম। কিন্তু তার পোশাক বিল্বর নিশ্বাস কেড়ে নেয়।

তার শাড়িটি বিছানার ওপর নদীর মতন ছড়ানো। ব্লাউজ নেই। শায়াটি টেনে তুলে বুকের ওপর বাঁধা। ওপর দিকে তার স্তনের অর্ধেক এবং নিচের দিকে তার হাঁটু থেকে নগ্ন। এরকম শায়াসজ্জা কখনও দেখেনি বিল্ব। স্ত্রীলোকটির নিচের দিকটা সে বেশি দেখতে পাচ্ছে না, ওপরের দিকে যা দেখেছে তাই যথেষ্ট। এর আগে কোনওদিন সে আলো নিভিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়নি। এ সময়। সে এদের চেনে না।

পাশের ঘরের যুগলের খাওয়া হয় ধীরেসুস্থে। মেয়েটি থালা বাসন নিয়ে যায় বাইরে, পুরুষটি সিগারেট ধরায়। মেয়েটি দু-তিন মিনিটের মধ্যে বিছানা পেতে ফেলে, পুরুষটি প্রথম সিগারেট থেকে দ্বিতীয় সিগারেটে চলে যায়। এরা মশারি নিয়ে চিন্তিত নয়। পুরুষটি উরু চুলকোয়, মেয়েটি টুপ করে এসে যায় পাশের ঘরে। চিল কান্না-কাঁদা বাচ্চাটাকে তুলে নেয় খাট থেকে। এ ঘরের স্ত্রী ও পুরুষমানুষটি এই পাশের ঘরের মেয়েটির সঙ্গে নৈঃশব্দ ভাঙতে কথা বলে এবং নিজেদের টুকিটাকিতে ব্যস্ত থাকে। কিশোরীর মতন মুখ মেয়েটি শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে কান্না থামায়, তার মুখে তখন স্নেহের ঢৌল, দেখায় পরিপূর্ণ ম্যাডোনার মতন, পাশের ঘরে তার স্বামীটি চতুর্থ সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে বসে আছে। কোনও ব্যস্ততা নেই। দুটি ঘরেরই অভিনয় একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে বিল্ব।

এক সময় এ ঘরের মশারি টাঙানো হয়ে যায়। অন্য ঘরের মেয়েটি নিজের বুক থেকে শান্ত ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে শুইয়ে দিয়ে মুখোজ্জ্বল করে হাসে। দুটো একটা কথা হয়। মেয়েটি বেরিয়ে এলে আলো নেভে।

মেয়েটি নিজের ঘরের দরজায় খিল দেয়। তার স্বামীর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে এক টান দিয়ে ফেরত দেয় সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর ঠিক এক লহমার মধ্যে সে তার শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রা, শায়া খুলে ফেলে। ঠিক যেন ঝড়ের বেগে। আবার স্বামীর কাছ থেকে সিগারেট নেয়, ধোঁয়া গড়িয়ে যায় তার নগ্ন বুকে।

বিল্ব প্রথমে মাথা নিচু করে ফেলে, তার শরীর কাঁপে, সে ভয়ও পায়, তার একুশ বছর বয়সে এই প্রথম একজন বাস্তব, জ্যান্ত, মাত্র কুড়ি ফুট দূরত্বে নগ্ন নারী। এই দৃশ্যটির জন্য সে ঠিক আট বছর ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। যেন স্বপ্ন না হয় এই ভেবে সে আবার মাথা তুলল, খুব আস্তে-আস্তে। এইটুকু রাত্রেই গলির জীবন একেবারে নির্জন, সে দেখল একটু আগের ম্যাডোনা এখন সমুদ্র থেকে উঠে আসা উর্বশী, মেয়েটি নিজেই ধরে আছে তার একটি স্তন, তার সরু কোমর, তার নাভি। আরও একটু দেখবার জন্য বিল্ব তার জানলার বেদিতে উঠে দাঁড়াল।

সে প্রথমেই ধন্যবাদ দিল পুলিশকে। তার পা না মচকালে এই রাত্রি অন্যরকম হত। সন্ধের একটু আগে, রাস্তার দু-দিকে পুলিশ থাকার কারণে সে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করেছিল মৃত্যুকে, তার বুক শুকনো হয়ে একরকমের শাঁ-শাঁ শব্দ হচ্ছিল, আর এখন পৌনে এগারোটায় একটি সত্যিকারের নগ্ন নারী। তার জীবনে এই প্রথম, আগে বন্ধুরা সবাই গর্ব করেছে, কিন্তু বিল্ব মাথা নিচু করে থাকত, সে শুধু ছবিতে ছাড়া...আজ এত কাছে এত সুন্দর, পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর আর কি আছে, বিল্ব নিশ্বাস বন্ধ করে আছে, বুকের ভেতরের দুপদুপ শব্দ বোধ হয় ওরা শুনতে পেয়ে যাবে, শুনতে পেল...

মেয়েটি হঠাৎ ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই বিল্ব আর পারল না, সে নিজের ডান বাহুর নরম জায়গাটা কামড়ে ধরল খুব জোরে হঠাৎ।

ভারত স্বাধীন হওয়ার বছর দশেক পরে হঠাৎ দুমদাম করে নিত্য নতুন আইন প্রণীত হতে থাকে। লাল গোলাপপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর খুবই বিশুদ্ধ ও উদার হবার দিকে ঝোঁক। এই নব আইনের সুসংবাদ বিদেশি পত্রিকায় ছাপা হয়।

সেই সময় এমন একটি আইন পাশ হয়েছিল, যার সঠিক অর্থ তখনও কেউ বোঝেনি, এখনও বোঝে না, অবশ্য এখন আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। যা নিবারণ করা উদ্দেশ্য ছিল, এখন তা দিন-দিন শশীকলার মতন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইনটির নাম 'প্রিভেনশান অব ইমমরাল ট্রাফিক অ্যাক্ট'। সেই সময় একটি সংবিধান সংশোধন বিলে মে কিংবা শ্যাল ব্যবহৃত হবে, এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল প্রচুর। ব্রিফলেশ ব্যারিস্টারগণ তখন লোকসভার সদস্য হয়ে ইংরেজি ভাষা নিয়ে প্রচুর সময়ক্ষেপ করতেন। তারই 'অবদান' আমাদের আইনটি। আমাদের বাংলা কাগজগুলিতেও প্রথম পৃষ্ঠায় বড়-বড় অক্ষরে বিনা অনুবাদে এই ইংরেজি বাক্যবন্ধই প্রকাশিত হল। ইমমরাল ট্রাফিক, এই কবিত্বময় উৎপ্রেক্ষার মানে কী? সঠিক মানে না বুঝেই উত্তর কলকাতায় আশুতোষ অয়েল মিলের পাশের প্রসিদ্ধ বেশ্যালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অফিস ফেরত ট্রামযাত্রীদের মনে হয় এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সোনাগাছিতে শুরু হল এক্সোডাস। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে যেমন একবার দেশে ধুম পড়ে গিয়েছিল যে, যেখানে যত বিধবা আছে সবাইকে ধরে-ধরে বুঝি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিয়ে দিয়ে দেবে, ফলে যত দিদিমা, ঠাকুমা, পিসিমার দলও ফোকলা দাঁতে কান্না জুড়ে দিয়েছিল, ওগো একি ঘোর কলি কাল হল গো এবং সবাই লুকিয়েছিল ঠাকুরঘরে, সেই রকম এবার যত রাজ্যের ছুঁড়ি আর বেশ্যার দল ভাবল, গভর্নমেন্ট বুঝি তাদের গোবর খাইয়ে 'প্রাচিত্তির' করবে, ফলে বাদলের সময়কার পিঁপড়ের মতন সবাই পালাল গিয়ে নানা গর্তে। স্বয়ং গভর্নমেন্ট পর্যন্ত এ ব্যাপারে হতবাক।

বাংলার অনেক গ্রাম্য-গঞ্জের দরিদ্র পরিবারে ফিরে এল সমৃদ্ধশালিনী কন্যারা। অনেকে তাদের

নোকর, তবলচি বা দালালদের মধ্যে কোন একজনকে মাস মাইনের চুক্তিতে স্বামী সাজিয়ে, ভদ্রলোক স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর ভাড়া নিল অচিহ্নিত পাড়ায়। সেখানে শুরু হল অনভ্যস্ত গৃহস্থালি। বৌবাজারের প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের এক প্রৌঢ়া একদিন ধৈর্য হারিয়ে সটান হাজির হল মুচিপাড়া থানায়। সেখানকার ও.সি. সদ্য টেবিলের ওপর দাঁত খুলে রেখেছিলেন, হঠাৎ দেখলেন তাঁর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক আকুল মূধর্জা রমনী, চোখের নিচে ঘুম-হীনতায় কালো, চিবুকের নিচে খানিকটা করুণ ছায়া। সেই রমণী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে চেরা গলায় বলল, হ্যাঁগা সকলে বলাবলি করছে আমাদের পুলিশে ধরবে। তা ধরছে না কেন, আর কতদিন লজ্জা করবে? সাতদিন কেটে গেল, একটা খদ্দের আসে না, শেষে কি না খেয়ে মরব? ধরতে হয় ধরো বাবা, আর কেন দেরি করছ? এ বয়সে আমি আর কোথায় যাব?

মুচিপাড়া থানার ও.সি. তাঁর দারোয়ানকে ডেকে তৎক্ষণাৎ এই স্ত্রী-লোকটিকে বিদায় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি কৌতুকপ্রবণ। তিনি তাড়াতাড়ি দাঁত পরে নিয়ে লালবাজারে টেলিফোন করলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ স্যার, এইরকম ভাবে যদি সবাই আসে, বউবাজারের রেড লাইট এরিয়ার সবাই যদি এসে পড়ে, তাহলে হাজত থেকে সব ক্রিমিনালদের ছেড়ে দিয়ে...তাও জায়গা হবে না...অন্তত হাজার ছয়েক...আমিও কাগজে পড়েছি...। শোনা যায় লালবাজারের বিভিন্ন দফতর ঘুরে শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ করা হয়েছিল পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এই নিয়ে একটু মাথা ঘামালেন। ইমমরাল ট্রাফিক, হুঁ। হেভিয়াস কর্পাস আছে। কোর্টে প্রোডিউস করে কোন চার্জশিট দেওয়া হবে? তিনি পরামর্শ চাইলেন আই জি-র কাছে। আই জি বলটা ছুঁড়ে দিলেন তাঁর ওপরওয়ালা হোম মিনিস্টারের কোর্টে। হোম মিনিস্টার ছুটলেন চিফ মিনিস্টারের ঘরে। অকৃতদার চিফ মিনিস্টার বিখ্যাত কটুভাষী। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত?

—কার স্যার?

—তোমার বয়েস জিজ্ঞাসা করিনি, মেয়েছেলেটির। বিভিন্ন ছুঁয়ে-ছুঁয়ে টেলিফোনে এই প্রশ্নটি যখন মুচিপাড়া থানায় এসে পৌঁছল তখন পারুলবালা বসে আছে ওসির সামনের চেয়ারে। ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর জমাদাররা সবাই ঘরের মধ্যে ভিড় করে আছে, সকলেরই ঠোঁটে হাসি। পারুলবালার বয়েসের বার্তা ঘুরে যেতে পনেরো মিনিট সময় লাগল। এই অবসরে মুখ্যমন্ত্রী যোজনা কমিশনের ফাইল দেখলেন ও কৃষ্ণনগরে গুলি চালনা বিষয় তথ্য নিলেন। তারপর মুখ তুলে বিরক্তভাবে বললেন, পঞ্চাশ বছর? বুড়ি বেশ্যা মাগিরা তো চিরকাল ঝিগিরি করে, তাই করতে বলে দাও...অফ দা রেকর্ড...সরকার কি বুড়ি বেশ্যাদের ধরে-ধরে তারপর সারা জীবন বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে? এ দেশটা কি রাশিয়া হয়ে গেছে? অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডাক।

অ্যাডভোকেট জেনারেল অসুস্থ ছিলেন, বাড়ি থেকে তিনি জানালেন কেন্দ্রীয় নতুন আইনটির পূর্ণ বয়ান এখনও পাওয়া যায়নি। শুধু সংবাদপত্রের রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছুই বলা যায় না।

মুচিপাড়া থানায় পারুলবালা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। শেষতম সংবাদের ভিত্তিতে ওসি তাকে জানালেন যে, এখনও গ্রেফতারের সময় হয়নি। বাছা, তুমি ফিরে যাও, যখন সময় হবে তোমাকে জানাব।

পারুলবাবা দীর্ঘশ্বাস না ফেলে গজগজ করতে-করতে বেরিয়ে গেল। এক খিলি পান কিনে সে চেপে বসল একটি রিকশায়। বাড়ি পৌঁছে সে দোতলায় নিজের ঘরে রিকশাওয়ালাকে ডেকে নিয়ে এল এবং বন্ধ করে দিল দরজা।

বিল্ব তিন চারবার বিছানা ছেড়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে এসেছিল বাঁ দিকের জানলার কাছে। ওদিকে অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না। কোনও শব্দ নেই। তবু কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটি ওখানে স্থির হয়ে আছে। একটি মঞ্চের দুটি ভাগ। এক ভাগে যে মেয়েটি ছিল মাতৃস্নেহে কোমল, অত্যন্ত জেদি-

কান্নার শিশুকে যে মুহূর্তে শান্ত করে দিয়েছিল সেই মেয়েটিই নিজের ঘরে এসে বিদ্যুতের মতন নগ্ন হয়ে গেল, পূর্ণ আলোয় সে তার স্তন, কোমর, যোনি ও ঝকঝকে উরু মেলে ধরল বিশ্বর দিকে, মেয়েটি জানে না, সে এক নবীন যুবাকে নিয়ে গেল কোথা থেকে কোথায়!

বিশ্ব দেখেনি, ওই মেয়েটির স্তনদ্বয় খানিকটা অতিরিক্ত পৃথুলা। লক্ষ করেনি ওর তলপেটের ফাটা ফাটা দাগ। যে রূপের ঝাপটা লেগেছিল তার চোখে, তাতে তার মনে হয়েছিল, সুধাসাগর সেঁচে অকস্মাৎ আবির্ভূতা হয়েছিল ওই নারী। তার একুশ বছর জীবনের প্রথম দৈব উপহার। আজই বিকেলে তার বীরত্ব ও মৃত্যুকে এড়াবারও কৃতিত্বের জন্য এই উপহার তার প্রাপ্য ছিল। সে কৃতজ্ঞতায় নতজানু হয়ে বসে পড়ে। সে বঞ্চনা চেনে না। তার পায়ের ব্যথা উপে গেছে। সে তার কম্পিত শরীরটি নিয়ে প্রভূত আনন্দে লুটোপুটি খায়।

যুদ্ধের দুটি বছর পূর্ব বাংলায় গ্রামে কাটিয়ে বিশ্ব পড়াশুনোয় খানিকটা পিছিয়ে যায়, কিন্তু পল্লীনিসর্গের একটি অমর স্মৃতি বুকে গেঁথে রাখে। স্কুলে সে তার সহপাঠিদের মধ্যে ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্ক, সতেরো বছরে ক্লাশ টেন। সরস্বতী পুজো কমিটির আসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি। সে রোগা ও লম্বা, কখনও লাজুক, কখনও বাচাল, কোনও বন্ধুর বোনের সঙ্গে তার নিভৃত ঘনিষ্ঠতা হয়নি, চিঠি বিনিময় হয়নি! তার জগৎ নারীবর্জিত। সমস্ত নারী শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায়। সেজন্য তার খুব একটা অভাব বা দুঃখবোধ ছিল না, সে নির্লজ্জভাবে ছিল নিজের প্রেমিক, সে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিজেকে ভালোবাসত। সে ভালো ছাত্র ছিল না, খারাপও ছিল না, অথচ সে বেশ পরিচিত ছিল। স্ট্রাইকের সময় লোহার গেটের সামনে সকলকে ছাড়িয়ে দেখা যেত তার ঝাঁকড়া-চুলো মাথা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই, বয়ঃসন্ধিকালের ঠিকে অসভ্যতাগুলো সে একেবারেই শেখেনি, সে একটি খারাপ কথা উচ্চারণ করত না কোনওদিন, খিস্তিপ্রবণ বন্ধুদের দিকে সে রক্তচক্ষে তাকাত।

ক্লাস সেভ্‌ন থেকে ওপরের ক্লাসের সব ছাত্রের সরস্বতী পুজোর চাঁদা দু-টাকা করে। নিজের ক্লাসে যে যা দেয়। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জন্য খাতা আছে, নিচের ক্লাসে বিশ্ব আর তিনটি ছেলে গিয়ে রুমাল পেতে ঘুরেছে, এগারো-রুমাল সিকি আধুলি বিকেলবেলায় গোনা স্কাউটরুমে বসে। গণনার সময় তার বন্ধু শুভব্রত কঠোরভাবে বিশ্বকে বলেছিল, এইভাবে গোন! অর্থাৎ পাঁচ সিকিতে একটাকা। পাঁচ আধুলিতে দু-টাকা। এইভাবে তারা চার বন্ধু সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রত্যেকে সাতান্ন টাকা করে উপার্জন করে। এই ব্যাপারটির জন্য বিশ্ব শুভব্রতর কাছে চওড়াভাবে কৃতজ্ঞবোধ করেছিল। কারণ, বাড়ির ছেলে হিসেবে সে ছিল একেবারে নিঃস্ব, হা-ঘরে। এই প্রথম নিজের টাকা খরচ করার মৌলিক উত্তেজনায় সে সাতটি কবিতা লিখতে পারে। তার মধ্যে একটি কবিতার উপমায় ছিল গৌতম বুদ্ধের চোখ।

স্কুলটি ব্রাহ্ম পরিচালিত বলে মূল ভূখণ্ডে পুজোর অনুমতি ছিল না। বড় করে মণ্ডপ বাঁধা হয়েছিল বাইরে। আগের রাত্রে ছেলেরাই মণ্ডপ সাজাবে। সেই উপলক্ষে বিশ্ব বাড়ি থেকে অনুমতি পেয়েছিল সারা রাত বাইরে কাটাবার। কুমোরটুলি থেকে কিনে আনা হল রঙিন কাগজের শিকলি, শোলার ফুল ও জরির ডাক-সাজ। আড়াইশো লাল-নীল টুনি বাল্‌ব। পট করে ট্যাক্সি ভাড়া করে ওরা কয়েকজন ধর্মতলায় এসে নিজামে গরুর মাংসের কাবাব-রোল খেল। সম্পূর্ণ আয়না মোড়া পানের দোকান থেকে খেল মশলা-সোডা, কেউ-কেউ খেল পান এবং সিগারেটও, বিশ্ব নয়। সে বিউগ্‌ল বাজায়, সিগারেটে দম কমে যাবে।

তারপর রাত্রির রাস্তায় এলোমেলো ঘোরাঘুরি। শেষ শীতের নরম বাতাস, পথে লোক নেই, তবু আলোগুলি জ্বলে, হঠাৎ এক-একটা রিকশা পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়, কোনও বাড়ির চার তলার ঘরে একটি স্ত্রীলোক উঁচু গলায় হাসে—এইসব কিছুর মধ্যে রয়েছে তীব্র আনন্দ।

গায়ের আলোয়ান কোমরে জড়িয়ে বেঁধে বিল্ব লাফাতে থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনের বকুলগাছের ডাল সে ছোঁবে। পারে না। তার পায়ের তলায় পিষে যায় ঝরা-বকুল।

রাত আর কত হবে, আড়াইটে তিনটে, বিল্ব হঠাৎ দেখেছিল প্রতিমা মণ্ডপে সে একা। সব কিছু সাজানো গোছানো শেষ, কয়েক জন বন্ধু ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেছে তাদের কাছাকাছি বাড়িতে। নির্মল আর শুভব্রত দারোয়ানের খাটিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে আছে বাইরের ফুটপাথে। বিল্ব একবার গিয়ে ওদের দেখল, ওরা দুজনে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রয়েছে একই আলোয়ানের তলায়, সেটা বিল্বরই। সে তো আর ঘুমন্ত বন্ধুদের গা থেকে আলোয়ান খুলে নিতে পারে না। সে তাহলে কী করে ঘুমোবে?

পরদা সরিয়ে বিল্ব ফিরে এল মন্ডপে। এখন সে ইচ্ছে করলে হঠাৎ গানের রেকর্ড চালিয়ে সকলের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। দয়াবশত সে ইচ্ছে করল না। যেখানে পুরোহিতের বসবার কথা, সেখানে বিল্ব বসল কুশের আসন পেতে। ভেতরটা ঝলমল করছে আলোয়। আর হোয়াইট শার্টিনের শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেবী সরস্বতী। পায়ের তলায় পদ্ম ও বিসদৃশ রকমের বড় রাজহাঁস। হাতে বীণা। তার চোখ ঠিক বিল্বর দিকে। বিল্ব যেদিকেই মাথা ঝোঁকায়, মূর্তির চোখ সেদিকেই যায়। এত আলো, এত স্তব্ধতা, এত বেশি রকমের রাত্রি, তার মধ্যে বিল্বর কাছাকাছি আর কেউ নেই। শুধু এই এক মাটির নারী। তাঁর গর্জনতেল-মাখা ঠোঁট, তার নিথর নিবদ্ধ চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, রক্তাভ হাতের পাঞ্জা, নকল মুক্তোর শোভিত কুচযুগল তার কোমরের নিখুঁত খাঁজ ও উরু।

বিল্বর সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি লাগল। একবার চকিতে তার মনে পড়ল ঘাটশিলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা ছোটমাসির বান্ধবী দময়ন্তী নামের এক নারীকে, তার বুক ব্যথা করতে লাগল।

বিল্বর মনে হল, এই নিখিল বিশ্বে তার আর কেউ নেই। যদি কাল সকালেই সে মরে যায়, তার জন্যে কেউ কাঁদবে না। সেজন্যই বেঁচে থাকা সব কিছুকে ছিনিয়ে নেওয়ার লোভ জাগল তার। সে ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে সেই গর্জনতেল-মাখা ঠোঁটে চুমু খেল। তারপর মুখটা সরিয়ে নিয়ে দেখল তখনও সেই মূর্তির মুখ হাসি-হাসি, তখনও তার চোখে চোখ।

কেউ দেখার নেই জেনেও বিল্ব ভয়ে-ভয়ে একবার তাকাল পেছনে। পরদা ফেলাই আছে। বিল্বর সারা শরীরের মধ্যে আগুনের ফুলকি ছোটাছুটি করছে। এবার সে নিবিড় আলিঙ্গন করে চুমু খেল সরস্বতীর ঠোঁটে। বুকে হাত রাখল। বাতাবী লেবুর মতন বুক। বিল্ব নিজের মুখ রাখল সেখানে। তারপর পাগলের মতন চুমু খেতে লাগল কোমরে, উরুতে, আর সেই জায়গায়।

বিল্ব টিউশনি করতে যায় নিউ আলিপুরে। আর দেড় মাস বাদে অনার্স পরীক্ষা শুরু হবে। শুভব্রত ট্রাম আন্দোলনে জেলে গেছে। বিল্ব একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সিকিটা অচল বলে ভবানীপুরের কাছে ট্রাম থেকে নামিয়ে দিল তাকে। আর পয়সা না থাকলেও বিল্ব পরবর্তী ট্রামে ওই অচল সিকি দেখিয়ে আরও খানিকটা যেতে পারত। তার পরের ট্রামে আরও খানিকটা। কিন্তু সে উঠল না। হাঁটতে লাগল। ছিপছিপে বৃষ্টি ছিল সারা সন্ধে, এখন বেশ জোর বৃষ্টি শুরু হল, বৃষ্টির বড়-বড় ফোঁটা ঠিক যেন ঝাঁটার মতো সাফ করে দিল ব্যস্ত রাস্তাটি। এলগিন রোড পার হয়ে এসে ক্যাথিড্রালের পাশ দিয়ে বিল্ব শুধু একলা পথিক। নীল রঙের প্যান্ট, সাদা হাওয়াই শার্ট, পায়ে রবারের চটি, সামান্য খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বিল্ব হাঁটছে, দুরন্ত হাওয়ায় মাখানো বৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে তাকে, তবুও বিল্ব হাঁটছে আস্তে-আস্তে, তার বুকভরা অকারণ অভিমান, তার পেটে দাউ-দাউ করছে খিদে, সে বিড়বিড় করে কথা বলছে আপন মনে, তার যেন একটুও বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।

বিল্বর এক বন্ধুর নাম দেবজ্যোতি। সে সাবান খায়, টুথপেস্ট খায়, কাঁচা ফুলকপি খায়, কপিইং পেনসিলের শিস খায়, নিজের পেচ্ছাপ খায়, সর্ষের তেল খায়, সেদ্ধ বেগুনের বোঁটা খায়, বেগুনের ভেতরের পোকা খায়, ছেলেদের ঠোঁটে চুমু খায়, পানিফলের খোসা খায়, ইত্যাদি। এঃ

প্রত্যেকটা সত্যি বিল্বর নিজের চোখে দেখা।

বিল্বর বন্ধু দেবজ্যোতি একজন ক্ষণজন্মা সাধু। সে বি.এস-সি পড়ে। থাকে সে রামমোহন হস্টেলের তিনতলার রাস্তার দিকে, ডানদিকের ঘরে। আই এস-সি পরীক্ষার সময় দেবজ্যোতি টুকলি করার মানসে ছোট্ট ছোট্ট কাগজে পিঁপড়ে হেঁটে যাওয়ার অক্ষরে পাঁচখানা প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটাও আসেনি। কিন্তু হঠাৎ এসে পড়েছিল ইনভিজিলেশান টিম। সেই কাগজগুলোকে গোলা পাকিয়ে দেবজ্যোতি টুক করে গলার মধ্যে ছুঁড়ে দিল এবং চিউইংগামের মতো অনেকক্ষণ বেশ তরিবত করে খেল। বিল্বর ঠিক পাশের সিটে।

তারও আগে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময়, যখন তাদের গায়ে সদ্য কলেজের গন্ধ, গ্রীন হর্ন, তখন বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে প্রথমবার যেই চিংড়িমাছ ডিসেক্ট করতে দেওয়া হল, অমনি ছাত্রদের মধ্যে একটা রঙের কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। (উল্লাসের কোলাহলের বদলে রঙের কোলাহল লেখা হল। 'সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন) বেস মেমারির মতন, কিছু-কিছু জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারক্রমে এসে যায়। অর্থাৎ চিংড়িমাছের পিঠ চিরে মামুলি শিরা-উপশিরাগুলি ডেমনস্ট্রেটরকে দেখিয়েই যে সেটা নিয়ে ছুটে যেতে হয় কাছেই মধুদার চায়ের দোকানে, সে-কথা ছাত্ররা জেনে গিয়েছিল প্রথম দিনেই। বেশ বড়-বড় বাগদা চিংড়ি। মধুদার চায়ের দোকানে সেগুলো ভেজে দিলেই বিনে পয়সায় ফ্রায়েড প্রন। এরকম চলছিল। ডিসেকশনের পর চিংড়িমাছগুলো ছাত্ররা খেয়ে ফেলল না কোথাও ফেলে দেওয়া হল, তাতে কারুর কিছু যায় আসে না, তবু কলেজ কর্তৃপক্ষ একদিন দুষ্টুমি করলেন। সেদিন কাঁচা চিংড়িগুলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে তারপর দেওয়া হল ছেলেদের পাতে। অর্থাৎ ট্রে-তে। এই উপলক্ষে একটা ধর্মঘট ডাকা যায় কিনা এরকম একটা বেতার তরঙ্গ চলছিল ছাত্রদের ভুরুতে-ভুরুতে, তখন মাইক্রোসকোপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল রুমের ঠিক মাঝকানে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি বলল, আরে ধুর। আমাকে অ্যাসিড দেখাচ্ছে। তারপর সে আস্ত, অ্যাসিডে ভেজানো কাঁচা চিংড়িমাছটা টক করে ছুঁড়ে দিল মুখের মধ্যে।

এর পরপরই যে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রদের চিংড়িমাছ শাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞান অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনও হাত নেই। তার কারণ ফরেন এক্সচেঞ্জ। যোগাযোগটা কাকতলীয়। সমুদ্রে স্তরে-স্তরে আছে নানান তরঙ্গ। সেই তরঙ্গে ভেসে-ভেসে চিংড়ি ঝাঁক-ভ্রমণ করে জলের পৃথিবী। বঙ্গোপসাগরে এলে কেন যেন তাদের শরীরটা বেশ মিষ্টি হয়ে যায়। এদের রক্তে হিমোগ্লোবিন নেই, আছে হিমোসায়ানিন, তাই এদের রক্তের রং লাল নয়, নীল। এরা দশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের কাছাকাছি রোদকে ভালোবেসে ফেলে। বর্ষার সময়, এই বঙ্গোপসাগরের জলের লবণ আর সব সাগরের চেয়ে কম। সেই জলে সাঁতার কেটে কেটে চিংড়িরা মানুষের খাদ্য হওয়ার জন্য নিজেদের আরও সুন্দরী করে তোলে প্রতিদিন। বঙ্গোপসাগরের চিংড়ির সুনাম রটে যায় দিগ্বিদিকে। পশ্চিম পৃথিবীর সাহেবসুবোদের ককটেল পার্টিতে এরা সগৌরবে নিজেদের স্থান করে নেয়, সেখানে এদের নাম হয় শ্রিম্প। কলকাতার বাজারে এদের দাম বাড়তে থাকে, বাড়তে-বাড়তে একদিন অদৃশ্য হয়ে যায়। সুতরাং ছাত্রদের আর চিংড়িশাস্ত্র দরকার নেই, তার বদলে তারা ব্যাং কাটুক।

হস্টেলে দেবজ্যোতির রুমে প্রায়ই খুব ঝাঁঝাল আড্ডা বসে। তার রুমমেট মহীতোষ বড়ই শান্ত ও পেটরোগা। মহীতোষ ঘন-ঘন দেশে চলে যায় বলে তার বিছানায় এসে দিনের বেলা শুয়ে থাকে বিল্ব লম্বা শরীরটা দ-এর মতন গুটিয়ে।

একদিন ওই ঘরে যখন তুমুল আড্ডা, দেবজ্যোতি সর্বসমক্ষে কোমরের বেল্ট ও প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল। যেন ঘরের মধ্যে কেউ নেই, আপনমনে সে বলল, বাথরুমে যাব। তারপর

খালি গায়ে আন্ডারওয়্যার পরে দাঁড়িয়ে সেই আন্ডারওয়্যারের দড়ি আলগা করতে-করতে সে উচ্চকণ্ঠে জানাল, দেখবি? একটা জিনিস দেখবি?

সে তার বাঁ-হাতটা পেছনের দিকে চামচের মতন বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, দেখবি, আমি আমার ইয়েও খেতে পারি।

দেবজ্যোতির মুখখানা অন্যরকম হয়ে যেতেই সকলে 'ওরেস শালা' বলে ঘরে থেকে বেরিয়ে গেল হুড়মুড় করে।

সকলের ওই ভীত-প্রস্থানই প্রমাণ করে তারা সত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে দেবজ্যোতি পারবে। সেসব পারে।

কাশীর বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গস্বামী নিজের যে পশ্চাৎ-ফসল দিয়ে বিখ্যাত প্রাতরাশ করতেন বলে শোনা যায়, দেবজ্যোতিও তাই খেয়ে চেয়েছিল। তার অসাধ্য কিছু নেই। এই দেবজ্যোতিকে হিংসে করে বিম্ব।

সদর দরজাটা খোলাই রাখতে হয়। তারপর একটি ছোট্ট চৌকো উঠোন। তারপর আর একটি দরজার এপাশে টানা অলিন্দ। কেউ বাড়িতে এলে বা কেউ গেলে, বোঝা যায় ওই দরজার শব্দে। কখনও আস্তে শব্দ হয়, ব্যস্ত শব্দ, কখনও বা ফেরিওয়ালার খুট-খুট। বিম্বর ধ্যান ভেঙে যায়। তার জ্বর, কপালে জলপট্টি, চিৎ হয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকে, অনেকক্ষণ স্তব্ধতা ও একাকিত্ব মিলেমিশে যাওয়ার পর সে দেখতে পায় অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ, দিঘির পাশ দিয়ে একটা সরু পায়ে চলা পথ, এক বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে দিয়েও নির্দ্বিধায় সেই পথ চলে গেছে, তারপর এক লিচুবাগান, বাদুড়ে ঠোকরানো লিচু ছড়িয়ে আছে কত। বিম্ব ওরকম জায়গায় কখনও যায়নি, কোনওদিন সে দেখেনি এক বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্য দিয়ে মানুষের পায়ে-পায়ে তৈরি রাস্তা, তবু কেন চোখ বুজে ওই দশা? এ কি কোনও নির্মাণ? কিন্তু এক মুহূর্ত আগেও তো সে ভাবেনি।

খুব জোরে দরজায় শব্দ। বাবা। বিম্বর বাবা এ পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষদের একজন। মাসে একবার দু-বারের বেশি বিম্বর সঙ্গে মুখোমুখি দেখাই হয় না। কথা-বিনিময়ে হলে সেটা ঐতিহাসিক ঘটনার মতন গণ্য।

এইজন্য বিম্বর জ্বর ভালো লাগে। জ্বরের মধ্যে শরীর ও মাথাটা কেমন যেন পলকা হয়ে যায়, তখন চোখ বুজে শুয়ে থাকলে, সে নিজে নয়, তার মস্তিষ্ক নয়, তার বন্ধ চোখের মধ্যে ছানার জলের-মতন পাতলা নীল যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার দৃশ্যের পর দৃশ্য তৈরি করে, তখন তার শরীর অদৃশ্য হয়ে যায়, সে মিশে থাকে ওই অভূতপূর্ব দৃশ্যের মধ্যে। এটা তার এক তীব্র নেশা। মাঠভরা সর্ষেখেতে ফুল ফুটে আছে, ঠিক একটা হলুদ জোয়ার, তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে একটি বালক, এই দশ-এগারো, এটা তার খেলা নয়, সে পালাচ্ছে কোথাও—অথচ এটা বিম্বর স্মৃতির পৃষ্ঠা নয়, সে কখনও দেখেনি অতখানি ফুটন্ত সর্ষের খেত, ওই ছেলেটির মুখও অবিকল কোনও অচেনা অন্য ছেলের মতন, তবু কেন চোখ বুজলেই সমুদ্রের ঢেউয়ে দাপাদাপি করার মতন, এক বালক সর্ষেখেতের মধ্যে ছুটতেই থাকে, ছুটতেই থাকে।

কখনও কখনও দরজায় শব্দ হয়, অথচ কেউ আসে না। কারুর পায়ের শব্দ নেই। বিম্ব উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তারপর সে নিরালা দুপুরে খাট থেকে উঠে বাইরে আসে, জলপট্টি খসে পড়ে যায় কপাল থেকে।

সে দেখে দরজাটা কিরকির শব্দে খুলে যাচ্ছে একটু-একটু। কেউ নেই। হাওয়ায়। 'হাওয়া কি কেউ না?'

একদিন সকালের দিকে একজন রোগামতন লোক সরাসরি একেবারে বিম্বর ঘরে এসে উপস্থিত। প্রায় ষাট ছোঁওয়া বয়েস, ধুতির ওপর ফুল শার্ট, মুখখানি খুব ছোট্ট, ঠোঁট লাল, নির্লজ্জ

বাঙাল ভাষায় তিনি জিগ্যেস করলেন, এটা হরিনাথের বাসা?

বিল্ব শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিল, উঠে বসতে হল।

লোকটি চেয়ার টেনে নিয়ে আবার বললেন, তোমার নাম কী? ও তুমি হরিনাথের বড় পোলা? বাবা আছে বাসায়?

বিল্ব বুঝতে পারল, ইনি কোনও গুরুজন শ্রেণির লোক। বাঙালদের অসংখ্য আত্মীয় থাকে। লোকটি নিশ্চয়ই প্রণাম চাইছে, পা দু-খানা জোড় করা। বিল্ব অগ্রাহ্য করে গেল ব্যাপারটাকে। বসুন, বাবাকে ডাকছি।

সরাসরি ডাকার কথা বিল্ব মানে না। সে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, প্রথম ঘরটিতে তার ছোট বোন কৃষ্ণাকে পেল, বলল বাবাকে ডাক, কে একজন এসেছে।

এইসব ক্ষেত্রে, এরপর বিল্ব গায়ে জামাটি চড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের বাড়িতে বসবার ঘর নেই। আত্মীয়স্বজনরা যায় ওপরে। এই ধরনের আগন্তুক আসে খুব কম। কারণ, সবাই জানে বিল্বর বাবাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। তিনি সকাল সাড়ে ছ'টায় বেরিয়ে পৌনে দশটায় ফেরেন, আবার এগারোটায় বেরিয়ে ফেরেন রাত দশটায়। ছুটির দিন বিল্ব একদণ্ড বাড়িতে থাকে না। তখন দশটা বেজে দশ।

বিল্ব জামা পরবার আগে দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়, সিগারেটের প্যাকেট-ট্যাকেট আর অসমীচীন কোনও বই বাইরে ছড়ানো আছে কি না। সিগারেট দেশলাই টেবিলের ওপর, লোকটি দেশলাইটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ওগুলো সরাতে পারলে হত। তার আগেই লোকটি বললেন, আমারে এক গেলাস জল খাওয়াবা?

জল এনে দেওয়ার আগেই সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামলেন বাবা। বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, অমূল্যদা?

লোকটি দুই হাত তুলে একটি আর্তনাদ করলেন, হরিনাথ! তারপর ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে খুব দাপটের সঙ্গে কেঁদে উঠলেন।

এই নাটকীয় ঘটনা বিল্বকে একটু থমকে দেয়।

বিল্বর বাবা বাক্-কৃপণ, গম্ভীর এবং আবেগ গোপন করতে ভালোবাসেন। একজন বয়স্ক মানুষের কান্নায় তিনি ছেলের সামনে একটু বিব্রত বোধ করে ঠিক যন্ত্র-পুতুলের মতন একবার ডানদিকে একবার বাঁ-দিকে তাকালেন। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে ব্যক্তিত্বে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে বললেন, বসুন অমূল্যদা, বসুন, কবে এলেন, সব শুনি—

তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, তোর মাকে বল, একটা চা করে দিতে। 'চা' শব্দটা উচ্চারণ করে তিনি তিন মুহূর্ত থেমেছিলেন। অর্থাৎ শুধু চা যেন না দেওয়া হয়।

লোকটি বললেন, আমি চা খাই না। আমি চা খাই না। আমি আজ তোমার এখানে ভাত খেয়ে যাব।

সংবাদটি মাকে জানিয়ে বিল্ব বাড়ি থেকে প্রস্থান করল।

পরবর্তী ঘটনাবলী খণ্ড-খণ্ড ভাবে সে তার মা ও ভাইবোনদের কাছ থেকে জেনেছিল।

অমূল্য নামের ওই লোকটি পূর্ববঙ্গে তাদের গ্রামের মুদি। কলকাতায় কোনও মুদির সঙ্গে কোনও মধ্যবিত্ত ক্রেতার ওরকম আলিঙ্গন ও কান্নাকাটি খুবই কষ্ট-কল্পনার বিষয়, কিন্তু গ্রাম-সম্পর্ক আলাদা। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল এবং সেই সকালে তিনি বিল্বদের পরিবারের ভারসাম্যটি টলিয়ে দিলেন।

খেতে বসবার ঠিক আগে তিনি পকেট থেকে বার করলেন অনেক দিনের বিবর্ণ লম্বা লাল কাগজের ফালি। এই দ্যাখ হরিনাথ, তোমার বাবার সই, এই দ্যাখ তোমার দাদা দেবনাথের, সব

সনতারিখ দিয়ে লেখা, ওঁরা বলেছিলেন সুদিন এলে শোধ করে দেবেন, হায় সুদিন! হরিনাথ, আজ আমি নিজেই পথের ভিখারি, নইলে কোনওদিন কি তোমাকে এসব কথা বলেছি? মাত্র তিন হাজার দুশো বাইশ টাকা। এককালে আমি কতজনকে এরকম...

হরিনাথ স্থিরভাবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চওড়া মুখে কোনও দুঃখবোধ ফোটে না! তিনি সারাদিন ধরে ক্লান্ত থাকেন, সবসময়। অমূল্য মুদির কথা এমনই অস্বাভাবিক ও অবাস্তব যে তিনি কোনও প্রতিবাদও করতে পারছিলেন না। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঋণ...হরিনাথ ছাত্র বয়েস থেকেই কলকাতায়, পরে চাকরি পেয়ে নিজের বাবা-দাদাকে টাকা পাঠাতেন মাসে-মাসে, বাবা বহুদিন নেই, দাদা এখন হরিদ্বারে সন্ন্যাসী, নিজের এখন বড় সংসার, ছেলেমেয়ে, ছোট ভাই, বিধবা দিদি, সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে রাত দশটা অবধি পরিশ্রম।

আপনি খেতে বসুন অমূল্যদা।

আগে কথা দাও। আমার কিছু নেই, বেলেঘাটার এক বস্তিতে উঠেছি, ঘরবাড়ি সব আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, তোমরা যদি কিছু-কিছু দাও, এখানে আবার একটা দোকান...

আমার পক্ষে তা এখন অসম্ভব, অমূল্যদা।

তুমি বামুনের ছেলে হয়ে পিতৃঋণ অস্বীকার করবে, হরিনাথ? অন্তত মাসে মাসে দুশো টাকা কি দেড়শো টাকা...

আপনি খেতে বসুন অমূল্যদা। দেরি হয়ে গেছে, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

আগে একটা কিছু কথা দাও। তোমাকে কতটুকু বয়েস থেকে দেখেছি। কোলেপিঠে নিয়ে আদর করেছি। আজ সেই তোমার কাছে আমাকে টাকা চাইতে হচ্ছে, এ যে কত বড় লজ্জার, কিন্তু আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি হরিনাথ, আমি এক পয়সা সুদ ধরিনি...

আমি নিজেই যে বড় বিপদের মধ্যে রয়েছি, অমূল্যদা!

আমার থেকে বেশি বিপদ? তোমার তবু চাকরি-বাকরি আছে, আমি এসেছি একবস্ত্রে, তুমি যদি না দিতে চাও, আমি মামলা-মকদ্দমা করতে যাব না, সে সামর্থ্য নেই, সবই ছেড়ে দেব তোমার ধর্মের ওপর।

একটা দীর্ঘশ্বাস। কাঁধ দুটো একটু নুয়ে যাওয়া। বসুন অমূল্যদা খেতে বসুন, দেব। যা আমার সাধ্য দেব কিছু-কিছু আস্তে-আস্তে...

দু-দিন পরে, সন্ধেবেলা কফি হাউসে খুব তর্কাতর্কি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মুণ্ডপাত করেছে বিশ্ব, শঙ্খ ঘোষ নামের এক তরুণ কবির কবিতা মুখস্থ শুনিয়েছে, তারপর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে তেলেভাজা ও মুড়ি, আবার হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির দিকে, রাত দশটা আন্দাজ নিজের ঘরে বসে সিগারেট ধরিয়ে, সন্ধেবেলা তর্কের সময় যে-সব ক'টা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি, এখন মনে-মনে জ্বলন্ত ভাষায় সেগুলিই বলে যাচ্ছে...

মাঝের দরজায় দড়াম করে শব্দ, জুতোর মশমশ। প্রতি রাত্রে এই শব্দ সোজা দোতলায় উঠে যায়, আজ থেমে গেল বারান্দায়।

খোকা, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।

বিশ্ব সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল খাটের নিচে। ডান হাতটা পাখার মতন করে ধোঁয়া তাড়িয়ে উঠে এল চট করে।

বাবার গলার আওয়াজ অন্য দিনের তুলনায় ভাঙা-ভাঙা। চোখের দৃষ্টিও অন্য দিনের মতন খর নয়। ক্লান্ত কাঁধ।

তোর পড়ার খরচ আর আমি টানতে পারব না, খোকা। আমার সামর্থ নেই। চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর। রথীনবাবু বলছিলেন, ওঁদের অফিসে একজন স্টেনোগ্রাফার নেবে...

আ লবস্টার ইজ আ লেডি ফিস

সে মাসের গল্পভারতী পত্রিকার সাতান্ন পাতা খুলে দেবজ্যোতি বলল, এই দেখ আমার নিজের কাকা এই কাগজে লিখেছে। কাকার লেখা প্রায়ই ছাপা হয়।

বিল্ব জিগ্যেস করল, প্রবন্ধ?

না, রম্যরচনা বলে একে। কাকা বলছিলেন, আজকাল এই নতুন নামটা বেরিয়েছে, রম্যরচনা।

বিল্ব লেখাটার দ্রুত চোখ ছুটিয়ে গেল। চিংড়িমাছ লেডিও নয়, মাছও নয়। এই বিষয়ে প্যানপেনিয়ে পাঁচ পাতার লেখা। লেখকের নাম দেবপ্রিয় মজুমদার।

পত্রিকাটা আমাকে দু-একদিনের জন্য দিবি দেবজ্যোতি? নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাটা পড়ব।

তোদের বাড়িতে এ পত্রিকা রাখে না?

আমাদের বাড়িতে কোনও পত্রপত্রিকাই রাখা হয় না।

'দেশ' ও রাখিস না?

বললাম তো, আমরা খবরের কাগজও রাখি না।

তোরা এত গরিব কেন রে বিল্ব? গরিবদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। গরিবদের মন ছোট হয়।

বিল্ব হাসল। দেবজ্যোতির মা নেই,বাবা নেই। ওর কাকা আর দুই মামা ভাগাভাগি করে হস্টেলে থাকবার খরচ দেয়, মাকে মেরে ও জন্মেছিল, মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানেই না।

তোদের বাড়ির সকলের নাম বুঝি দেব দিয়ে?

হ্যাঁ। আমার বাবার নাম ছিল দেবদুর্লভ, হ্যা, হ্যা হ্যা হ্যা, নামটা শুনলে তো কী মনে হয়? সত্যিই দেবদুর্লভ নাম ছিল। আমার জ্যাঠামণির নাম দেবনন্দন, দুই জ্যাঠতুতো দাদার নাম দেবশঙ্কর আর দেবাশিস।

বেচারা তোর কাকা।

কেন?

সবচেয়ে খারাপ নামটা পেয়েছেন।

দেবপ্রিয় নামটা খারাপ?

দেবানাং প্রিয়, দেবপ্রিয়। ডিকশানারি খুলে দেখে নিস, ওর মানে হল মূর্খ।

সত্যি?

বললাম তো, দেখে নিস।

তুই সায়েন্স পড়তে এলি কেন বিল্ব? আর্টস পড়তে পারলি না?

একটা ছিল রাজপ্রাসাদ, বুকের মধ্যে
পায়ে চলার পথ
হালকা নীল অরণি বন, খানিক দূরে নদী
উর্বশী উরুর মতো রৌদ্রমাখা জল...

এই পর্যন্ত লিখে বিল্ব থামল। উর্বশীর উপমাটি দিয়ে সে খুব রোমাঞ্চিত। অনেকদিন আগে সে অভিধানের মধ্যে একটি দু-অক্ষরের অসভ্য.কথা দেখে শিউরে উঠেছিল। ছাপার অক্ষরের মধ্যে যেন ঝাঁক-ঝাঁক বুলেট থাকে। হঠাৎ এসে বুকে লাগে। ওইরকম একটা সাংঘাতিক কথা দিব্যি অভিধানের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে শুয়ে আছে। সেই রকমই উর্বশীর উরু, একটু আগেও মনের মধ্যে ছিল না। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, পারস্য-ছুরিকার মতন ঝকঝকে উর্বশী এইমাত্র জলের মধ্যে

নগ্ন করলেন তাঁর উরুদেশ...বিল্ব নিজের পা-জামার দড়ি আলগা করে দিল...রোদ্দুর দিয়ে উর্বশী মাজছেন তাঁর উরু। আশ্চর্য, এই সঙ্গেই বিল্বর মনে পড়ল চাইবাসার হাটে সে দেখেছিল এক সাঁওতাল রমণী, এক ঝলকের জন্য হঠাৎ তার উন্মুক্ত উরু, সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে ছেকাছেনি ভাষায় কথা বলতে-বলতে সে চলে গেল রোরো নদীর দিকে।...উর্বশীর রং কি সাঁওতাল রমণীর মতন শ্যামলিম, না, তা হতে পারে না, যাকগে, ওই যা ঠিক আছে।

লাইনগুলো প্রথম থেকে আর-একবার সে পড়ল। প্রথম কমা-টা রাজপ্রাসাদের পরে, না বুকের মধ্যের পরে দিলে ভালো হয়? রাজপ্রাসাদটা বুকের মধ্যে না পথটা রাজপ্রাসাদের বুকে? দু-বার দু-জায়গায় কমা-টা সরিয়ে শেষ পর্যন্ত সে তুলেই দিল একেবারে। কমা-র দরকার নেই।

অরণি বন? সত্যের খাতিরে লিচুবাগান দেওয়া উচিত। তা হলে ছন্দও ঠিক থাকে। কিন্তু কিসের সত্য? বাস্তবে তো ওরকম কোনও লিচুবাগান দেখেনি বিল্ব। আর দেখলেই বা কী, যা দেখবে তা যে লিখতে হবে, এমন কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। অরণি বন লেখার জন্য তার খুব লোভ হচ্ছে। থাক না। অরণি বন কথাটা হয়? গ্রামাটিক্যাল কারেক্ট? অরণি কাষ্ঠ শুকনো হয় না? কিনতু সব গাছের কাঠ কি অরণি হয়? তা হলে অরণি কাষ্ঠ বলে কেন? আম কাঠ জাম কাঠের মতন অরণি কাঠ। তাহলে অরণি বন হবে না কেন?

লিচুবাগান-এর মধ্যে ল আর ন আছে। তার আগে হালকা নীল এর মধ্যেও তাই। সুতরাং ধ্বনির দিক থেকে মানায়। 'হালকা নীল লিচুবাগান,' হ্যাঁ, এটাই ভালো—

অরণি বন কাটতে গিয়েও থমকে গেল বিল্ব।

অরণি বন-এর মধ্যে আছে দুটো দু-রকম ন। হালকা নীল-এর পরে আরও দুটো ন'-এর ধ্বনি...

মা ডেকে বললেন, এই খোকা, বাজারে যাবি না?

যাচ্ছি।

বিল্ব উঠে পড়ল। বাজারের থলি আর টাকা। মা বললেন, কাঁচা হলুদ আর আদা আনতে যেন ভুল না হয়। চৈত্র মাস পড়ে গেছে। পক্স হচ্ছে চারদিকে।

বাজার করতে বিল্বর মোটেই খারাপ লাগে না। কবিতা লেখার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। অন্তত চার আনা পয়সা উপার্জন হবে। ধর্মপথে, কেননা, বিল্ব মাকে ঠকাবে না, ঠকাবে দোকানদারদের।

ডুমুর সবসময় কাঁচা কিনতে হয়, পাকা ডুবুর অস্বাস্থ্যকর। কাঁচাকলা গাছের থোড় নিতে নেই। মোচার ফুল দাঁতে কেটে স্বাদ নিয়ে দেখতে হয়, নইলে তেতো মোচা গছিয়ে দেয়। মাছের গা চকচকে না হলে বুঝতে হবে. সে মাছ টাটকা নয়।

অরণি বন না লিচুবাগান?

অরণি বনের পর আছে খানিক দূরে। খানিক-এ আর একটা ন। এটাই ভালো।

অবশ্য, লিচুবাগান লিখলে, খানিকটা কেটে অল্প করা যায়। হালকা নীল লিচুবাগান। অল্প দূরে নদী এখানে একটা অতিরিক্ত ল পাওয়া যাচ্ছে। ল ধ্বনি ভালো, না ন?

বাঁশপাতা মাছ সাতটাকা কিলো হলে, সাড়ে তিনশো কত হয়? বিল্ব মাছওয়ালার দিকে তীব্র চোখে চেয়ে আছে। দু-টাকা পঁয়তাল্লিশ। পাঁচ পয়সা খুচরো নেই, দু-টাকা চল্লিশে হবে?

পাঁচ পয়সা আয় হল। এভাবেই অন্তত চার আনা।

কী যেন নিতেই হবে? আদা, আর? পেঁয়াজ, না? রসুন, না? মনে পড়ছে না। কতবেল? পাঁচফোড়ন? না, না। কুমড়ো ফুল? বকফুল, দুতছাই। অরণি বন না লিচুবাগান?

কাঁচা হলুদ। কোথায় পাওয়া যায় কাঁচা হলুদ? মশলার দোকানে না সবজির দোকানে?

চেনা দু-জনের সঙ্গে দেখা হল বাজারের মধ্যে। পাড়ার লোক। এমন হয়। টুকটাক কথাবার্তা

চালিয়ে যাচ্ছে বিল্ব, আর ভেতরে-ভেতরে বিড়বিড় করছে অরণি বন না লিচুবাগান? দুদিন বাদেই হয়তো এই কবিতাটি এতই অপছন্দ হবে তার যে সে ছিঁড়ে ফেলবে, কেউ জানতেই পারবে না এর অস্তিত্ব তবু আজ সকালবেলা মাথার মধ্যে থেকে এর মুক্তি নেই।

বারোটার সময় বিল্ব এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে যাবে, খেতে বসেছে। মা বাঁশপাতা মাছ ভাজছেন। এদিকে বিল্বর ডাল তরকারি খাওয়া হয়ে গেছে, থালায় আধখানা চাঁদের মতন ভাত। চাকরিটা পেলে বিল্ব নিয়েই নেবে, কী হবে আর পড়াশুনো করে? বোগাস! চাকরি মানেই স্বাধীনতা! কথাটা শুনতে অদ্ভুত চা-ক-রি! অথচ তার সঙ্গে স্বা-ধী-ন-তা! হেঃ।

কড়াইতে তেল ছাড়া হয়েছে, তেল গরম হবার একটা শব্দ, তারপর ছ্যাঁক করে বাঁশপাতা মাছ ছাড়া হল, আর কতক্ষণ লাগবে? বেশি দেরি হলে...ঠিক বারোটার মধ্যে...অথচ মাছ না খাইয়ে মা...

বিল্ব অধৈর্য হয়ে থালায় আঁকিবুকি কাটতে লাগল আঙুল দিয়ে। অরণি বন না লিচুবাগান?

শোভাবাজারের রাজা উপাধিধারী বিখ্যাত দেবদের আগ্রহে একসময় কাছাকাছি এলাকায় বহু জ্যোতিষী ও কবিরাজদের বসতি হয়েছিল। যেমন ঠাকুর, মল্লিক বা দত্ত প্রভৃতি সম্ভ্রান্তদের সৌজন্যে স্থাপিত হয়েছিল সোনাগাছি। গ্রে স্ট্রিটে তখনও কিছু জ্যোতিষী ও কবিরাজ রয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে একজন লাডলিমোহন।

ব্রিটিশ আমল থেকেই কলকাতায় কিছু ছেলে-ধরা প্রতিষ্ঠান ছিল। এদের আবার পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা। ছাত্ররা যাতে রাজনীতির দিকে না ঝোঁকে সেই উদ্দেশ্যে প্রভুভক্ত, আই, সি, এস গুরুসদয় দত্ত শুরু করেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলন। সেই একই উদ্দেশ্যে বেডেন বাওয়েল প্রতিষ্ঠিত বয়েজ-স্কাউট আন্দোলনও এদেশে খুব ছড়ায়। ছেলেমেয়েরা যাতে অন্যদিকে মন না দেয়, মা-বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারে। ওদিকে জোরদার মুসলিম লিগ, এদিকে গজিয়ে উঠল আর.এস.এস.। স্বাধীনতার পর এগুলি চলতে লাগল আর এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মিনমিনে স্বদেশিবোধ নিয়ে মণিমেলা, সব পেয়েছির আসর, ভ্রাতৃ সংঘ, মিলন সংঘ, আমরা সবুজ ইত্যাদি। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে কিশোর বাহিনী কুচকাওয়াজ, প্রভাতফেরী আর সমস্বরে গান, কয়েকজন দাদার দাদাগিরি।

বিল্ব পর্যায়ক্রমে এর মধ্যে প্রায় সবকটি প্রতিষ্ঠানেই ঘোরাঘুরি করেছে। কিছুদিনের জন্য যায়, ছেড়ে দেয়, আবার যায়, তারপর হঠাৎ অন্য একটিতে। প্রথমে সে ছিল বয়েজ স্কাউটে, সেখান থেকে এক আড়কাঠি তাকে নিয়ে আসে আর.এস.এস.-এ। গান্ধি হত্যার পর পুরো নামটি গুপ্ত করে শুধু সংঘ বলা হত। এক একটি স্থানীয় ইউনিটের নাম শাখা। এখানে একটি লাঠির মাথায় তোলা হয় গেরুয়া পতাকা, নিচের বেদিতে থাকে একটি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ, একটি গুম্ফবান বলিষ্ঠ ব্যক্তির সেই ছবির গলায় মালা। এই ব্যক্তির নাম হেডগেয়র, ইনি মারাঠি, ইনি শিবাজীর আদর্শে ভারতে আবার হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এখানে শোনানো হত বীর সাভারকরের জীবনীর চুটকিলা এবং শেখানো হত লাঠি ও তলোয়ার খেলা। ওই তলোয়ার খেলার দিকেই বিল্বর প্রধান আকর্ষণ। চামেচা, বাহেরা...। আসল তলোয়ার নয়, ছিপছিপে, তেল মাখানো বেত এবং চামড়ার ঢাল। চামেচা, বাহেরা...একটি ক্লাস এইটের ছেলে সেই বেতের তলোয়ার হাতে নিয়েই রানা প্রতাপ। হো নীল ঘোড়া কা সওয়ার কিংবা রিচার্ড দা লায়নহার্টেড...ছদ্মবেশে ঘুরতে-ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে এক ডাকাতের সামনে...রব ইন দা উড...

সংঘের হেড কোয়ার্টারের নাম 'নিবাস'। একদিন সেখানে গিয়ে বিল্ব দেখল সত্যিকারের ঢাল-তলোয়ার। সে সারা শরীরময় উত্তেজনা নিয়ে বলল, আমি তলোয়ারটা একবার হাতে নিতে পারি? একটি গম্ভীর কণ্ঠ তাকে জানাল, নিতে পারো, কিন্তু তার আগে তোমার আঙুল কেটে দু-ফোঁটা রক্ত দাও। সঙ্গে-সঙ্গে বিল্ব বাড়িয়ে দিল তার বাঁ-হাত। সেই গম্ভীর কণ্ঠ আবার জানাল, উঁহু, বাঁ-

হাত নয়, দক্ষিণ হস্ত। এই অবিচারে বেশ ক্ষুব্ধ হল বিল্ব। বাঁ-হাত আর ডান হাতের রক্ত কি আলাদা? শুধু-শুধু ডানহাত কাটার কোনও মানে হয়? সে পিছিয়ে গেল লাজুকভাবে। তখন দু-তিনজন হামবাগ তাকে বলল, ছিঃ, তুমি ভীরু, কাপুরুষ, তুমি ভারতমাতার সন্তান হওয়ার...। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিল্বকে দিতে হল ডান হাতটা, ধারাল ক্ষুর এগিয়ে এল তর্জনীর দিকে, বিল্ব ভয়ে চোখ বুজল এবং চেঁচিয়ে উঠল, আঃ। সে কাপুরুষই, তবু এরপরও সে রক্তমাখা হাতে চেপে ধরল তলোয়ারটি।

কিন্তু হিন্দু বীর হওয়া তার হল না। দু-মাস বাদেই তার বন্ধু শুভব্রত তাকে নিয়ে গেল কিশোর বাহিনীতে। সেখানে একটি রোগা লম্বা চেহারার যুবক মাঝে-মাঝে এসে খুব দৌড়াদৌড়ি করে খেলত সকলের সঙ্গে। বেশ কিছু পরে সে যক্ষ্মায় মারা গেলে জানা গিয়েছিল, সেই সুকান্ত ভট্টাচার্যই একজন বিরাট কবি।

বয়েজ-স্কাউটে থাকার সময় বিল্ব গান শিখেছিল ঃ জন্ বাউনস্ বডি লাইজ আ মোর্নিং ইন দা গ্রেভ...হিজ সোল ইজ মার্চিং অন।

সংঘের গান ঃ হাম হিন্দু হোকে হৃদয়মে হরদম নিশানা ভাগোয়া বরকর আ হ্যায়...

কিশোর বাহিনীতে ঃ নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম। জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম লাগল শেষে ধুম।

ব্রতচারিতে ঃ চল কোদাল চালাই / ভুলে মানের বালাই /ঝেড়ে অলস মেজাজ / হবে শরীর ঝালাই...

সব মিলিয়ে এক কালচারের জগাখিচুড়ি।

কিশোর বাহিনীতে থাকতে-থাকতেই বিল্ব কিছুদিনের জন্য অভিযাত্রী সংঘের মেম্বার হয়। তাদের পাড়ার একটি ছেলে তাকে বলেছিল, তোর স্বাস্থ্য তো ভালো, তুই আমাদের ক্লাবে বিউগ্‌ল বাজাবি?

বিউগ্‌ল শব্দটি তখন তলোয়ারের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর লাগে। যুদ্ধ...ওয়াটার্লুর ছাউনির সামনে মেঘলা ভোরবেলা...বুকের ওপর ডান হাত রেখে পায়চারি করছেন নেপোলিয়ন...অল্প দূরে এক তরুণ এনসাইন বাজাচ্ছে জাগরণ গীতি...বিল্ব রাজি হয়ে গেল।

এই অভিযাত্রী সংঘের সভাপতি লাডলিমোহন শাস্ত্রী। ইনি একই অঙ্গে দুই, অর্থাৎ জ্যোতিষী ও কবিরাজ। দারুণ রবরবা। গ্রে স্ট্রিটের ওপর দুই মহলা বাড়ি। সোম ও বৃহস্পতিবার ইনি ক্লাব নিয়ে মেতে থাকেন। ক্লাব মানে ব্যান্ড পার্টি, আট-দশটা কেট্‌ল ড্রাম, ছ'টা ব্যাগ পাইপ, একটা বিগ ড্রাম, একটা ঝাঁঝর ও একটা বিউগ্‌ল। গোটা কুড়ি-পঁচিশ ছেলে সোম ও বৃহস্পতি এগুলি নিয়ে প্র্যাকটিসের ধুমধাড়াক্কা করে পাড়ার লোকদের হাড় পিত্তি জ্বালিয়ে দেয়। ধুতির ওপর ফতুয়া পরা কোবরেজমশাই তাঁর ঝকঝকে চুলহীন মাথাটি ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে সেটা খুব উপভোগ করেন। বিলাতি সংগীতের প্রতি তাঁর এই অনুরক্তির কারণ ঠিক বোঝা যায় না। সপারিষদ শ্রীগৌরাঙ্গের মতন তিনি মাঝে-মাঝে হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে এসে দু-হাত তুলে নাচতে নাচতে বলেন, বাজাও, আরও জোরে, আরও জোরে। নাচতে-নাচতে তাঁর কোমরের ধুতির গিঁট আলগা হয়ে যেত। তখন একহাতে ধুতি মুঠো করে ধরে আর এক হাত তুলে...

কু-লোকে বলত, ওই সময় মোদকের নেশা করে তুরীয় অবস্থায় তিনি থাকতেন। কোকেন খেলে যে রকম দেয়ালের চুন চাটার ইচ্ছে হয়, সেইরকম মোদক খাওয়ার পর উচ্চগ্রামের বিলিতি শব্দের প্রতি আকর্ষণ জাগে কি না, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

অনেকের ধারণা, বিউগ্‌ল বাজালে টি বি হয়, তাই ক্লাবের কেউ ওটা নিতে চায়নি। টি বি-র ডাক নাম থাইসিস। তখন থাইসিস খুব বাজারে চলছে। অধিকাংশ রোমান্টিক বাংলা উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা এ রোগে ভুগছে। সোনার মতন উজ্জ্বল হলুদ রঙের বিউগ্‌লটি দেখে বিল্ব এমনই

মুগ্ধ হয়ে গেল যে রোগের ভয় তার মাথাতেই এল না। স্নেহময় আঙুলে সে ওই জিনিসটাকে আদর করে এবং প্র্যাকটিস করার কারণে সে ওটাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেল।

ভোরবেলা উঠে বিল্ব ছাদে চলে যায়। কিছুক্ষণ দূরের সবুজ গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে কটমট করে। স্থির দৃষ্টি, একটু পরেই তার চোখে জল আসে। এই রকম ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি ভালো হয়, পি, সি, সরকার তাঁর সরল জাদুবিদ্যা বইতে লিখেছেন, যারা সম্মোহন শিখতে চায় তাদের আগে এক ঘণ্টা চোখের পলক না ফেলে কোনও গাছের দিকে তাকিয়ে থাকা রপ্ত করতে হবে।

প্রথম-প্রথম বিউগ্‌লে কোনও শব্দ বেরুতে চায় না। ঠোঁটে চেপে ধরে যত জোরেই ফুঁ দেওয়া হোক, শুধু গালটাই ফুলে যায়, গালটা ফুলতে-ফুলতে এমন অবস্থা হয় যে মনে হয়, এক্ষুনি ফেটে যাবে। বিউগ্‌ল বাজবার কোনও নাম নেই। তারপর হঠাৎ একদিন ভ্যাঁ করে একটা শব্দ হয়। সাতদিনের মধ্যে বিল্ব শিখে যায় প্রথম গৎ, টি টিট টি টি-ই-ই, টি টিট্ টি টি ই-ই-ঈ, টি-টি-টি, টি-টিটি-টি-টিট টি-টি-ই-ই।

পরেশনাথের মিছিলে অভিযাত্রী সংঘ একবার তাদের ব্যান্ড বাজিয়ে এল। তারপর নেতাজির জন্মদিনে প্রভাতফেরিতে। দলের ঠিক মাঝখানে বিল্ব, সাদা ফুলপ্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেডস্‌, মাথায় হাই-ল্যান্ডার টুপি, ব্রাসো দিয়ে মাজা ঝকঝকে বিউগ্‌ল লাল সিল্কের কর্ড দিয়ে বাঁধা, দুলছে গলা থেকে, বিল্ব হাঁটছে স্লো মার্চে, বাজাবার সময় সে পা দুটো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেয় সামনের দিকে...রাস্তার দু-পাশের বারান্দাগুলি থেকে কত লোক তাকে দেখছে...। ওই যাচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিউগ্‌লার বিল্ব চ্যাটার্জি, কী স্মার্ট...।

ফেরা

ছোটমামার বিয়ে উপলক্ষে আবার যাওয়া হল দেশে। সেটা আসলে আর দেশ নয় ছিল পূর্ব বাংলা, হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। মামাবাড়ির সুখোজ্জ্বল স্মৃতি আছে বিল্বর। প্রথমেই মনে পড়ে, ধানগাছের পাতায় আঙুল কেটে যাওয়া। মাঠে গিয়ে, পোষা ছাগলকে খাওয়াবার জন্য কয়েকটা ধানপাতা টেনে ছিঁড়তে গিয়েছিল, ঠিক ধারাল ব্লেডের খোঁচার মতন আঙুল কেটে ঝরঝর করে রক্তপাত। সঙ্গে-সঙ্গে কাটা আঙুলটা মুখের মধ্যে। আর সেই রক্তমাখা ধানপাতাই কচি ছাগলটা খেয়ে নিল মুচমুচিয়ে। তার ন'দিন পর সেই ছাগলটার মাংস খেয়েছিল বিল্ব। হেসো দিয়ে ওই ধানগাছগুলোও কেটে নেওয়া হল কার্তিকের গোড়ায়। সেই ধানগাছ, সেই ছাগল, কেউ আর নেই। কিন্তু বিল্বর আঙুলে কাটা দাগ রয়ে গেছে।

একলা-একলা আলপথ ধরে হেঁটে যাওয়া! কিছুই না, দুপুরের আকাশের নিচে নির্জন ধানখেত, তার মধ্য দিয়ে এক বালক, উঁচু আলের ওপর দিয়ে পা টিপে-টিপে যাওয়া, ছট-ছট শব্দে লাফিয়ে যায় সবুজ ঘাস-ফড়িং, যাদের আর এক নাম কয়া, এমন কিছুই না, শুধু একলা দুপুরে, দু-পাশে ঢেউ খেলানো ধানখেতের মধ্য দিয়ে এমন কিছু না, কিন্তু ভীষণ আপন-আপন।

এবারে সব-কিছুই কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ফাঁকা-ফাঁকা। চর মুগুরিয়া স্টিমার ঘাটার লোকেরা কেমন যেন আড়চোখে তাকায়। কেউ কোনও কথা জিগ্যেস করে না। আগে এখানে নামলেই মনে হত এই তো এসে গেলাম নিজের বাড়িতে। এখন সব অন্যরকম। সবাই অচেনা মতন। বিল্বের একটুও ভালো লাগেনি।

বাবা আসতে পারেননি। বিল্ব এসেছে দুই মামার সঙ্গে। সবাই এখন কলকাতায়, শুধু

ছোটমামাই পূর্ব পাকিস্তানে জমিজায়গা পুকুর-বাগান-খাল-বিল নিয়ে রয়ে গেলেন। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন নয়-দশ বছরের মধ্যে ভারত পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে?

চর-মুগুরিয়া থেকে নৌকো। আগে নিজেদের নৌকো আসত, এখন কেয়ারা। নদীর দুধার যেন জনশূন্য মনে হয়! অথচ নদী অনেক স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। বিল্বর নটি বয় শু-তে কাদা লেগেছিল, গলুই-এর কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে সে একপাটি জুতো জলে ডুবিয়ে কাদা ধুচ্ছিল। কে জানত এত স্রোত, হুস করে টেনে নিয়ে গেল জুতোটাকে। আরে, আরে, আরে! নৌকোর অচেনা মাঝি হাসল। হলদে ছোপওয়ালা দাঁত। যাক, জুতোটা হারাবার ফলে তবু বিল্ব ওই লোকটিকে একবার অন্তত হাসতে দেখল। এখন একপাটি জুতো পরে সে কী করে বরযাত্রী যাবে? কাকে বলবে জুতো কিনে দেওয়ার কথা।

অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। এখন সব কিছুই নদী। মামাবাড়ির স্মৃতি মানেই একটি ঝলমলে বাড়ি। অজ পাড়াগাঁ, বিজলি নেই, কিন্তু পেট্রোমাকস আর হ্যাজাকের চোখ জুড়োনো আলোয় বাড়িটি দেখা যেত অনেক দূর থেকে। কতরকম লোকজন, কত আশ্রিত, নায়েব, গোমস্তা, হইচই।

আজ অন্ধকারে সবই নীরব। নৌকো নদী ছেড়ে ঢুকল খালে, তারপর এসে এক জায়গায় থামল। এ কোন অন্ধকার মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ সাঙ্গ হল যাত্রা? না, এটাই মামাবাড়ি, এখানেই নামতে হবে। হ্যাঁ। এই তো সেই হরিতকি গাছ। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ ছুটে এল না। কোনও সাদর অভ্যর্থনা নেই! দুই মামার হাত থেকে ঝলকে-ঝলকে টর্চের আলো ছুটে গেল। যেখানে একটি বিশাল আটচালা ছিল সেখানে শূন্যতা জিভ লকলক করছে। নায়েব-গোমস্তাদের ঘরগুলি ধূলিসাৎ। শুধু পড়ে আছে দোতলা বাড়িটা, তার গেটে লোহার ফটক।

ছোটমামার নাম ধরে ডাকা হল দু-বার। কেউ সাড়া দিল না। বাড়ি ভুল হয়েছে? না, হতেই পারে না, দুই মামার জন্ম এই বাড়িতে এমনকি বিল্বও এর প্রতিটি অণুকণা চেনে। অনেক বদলে গেছে, কিন্তু সেই বাড়িই। কিন্তু একটাও লোক নেই? ছোটমামা কোথায়? এত মানুষজনে গমগম করত যে বাড়ি...

নৌকো থেকে নেমে সবাই হাঁকডাক দিতে-দিতে এগিয়ে চলল। সঙ্গে বিয়েবাড়ির প্রচুর দামি-দামি জিনিস, তাই বড়মামার কোমরে গোঁজা রিভলভার, তিনি কোমরে হাত দিয়ে আগে-আগে যাচ্ছেন। লোহার গেট ধরে ঝাঁকুনি দিতে-দিতে তিনি ডাকলেন, মা! মা!

বারান্দার ওধার থেকে গেল একটা আলোর রেখা। আলোটা দুলছে। তারপর দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি, হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে মাটিতে পা ঘসে-ঘসে এগিয়ে আসছে, খুব ছোট চেহারা, হয়তো কোনও দাসী। তারপর লোহার গেটের ওপাশে সেই ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল, সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। মাথার চুল ধপধপে সাদা, দু-চোখে দৃষ্টি নেই। মনে হয়। হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বড়মামা আর্ত চিৎকার করে উঠলেন, মা!

বিল্বর বুকটা ধক্ করে উঠল। এই দিদিমা! মাত্র চার বছরে এতখানি বদলে গেছেন? এত বুড়ি? চার বছর আগেও বিল্ব কলকাতায় মামাবাড়িতে দেখেছিল। দারুণ স্বাস্থ্যবতী দিদিমা একাই পঞ্চাশজনের রান্না করতে পারেন। মাথার চুল পাকা ছিল না। সব সময় হাসিখুশি।

মা, বাড়িতে আলো জ্বালোনি কেন?

আর-সব কোথায় গেল?

রতন কোথায়?

বৃদ্ধা কম্পিত হাতে তালা খুললেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আয়! গেট সরিয়ে সবাই হুড়মুড় করে চলে এল ভেতরে। বৃদ্ধা তখন বারান্দা নিয়ে আবার এগোতে শুরু করেছেন। গম্ভীরভাবে।

মা, রতন কোথায়? বাড়িটা এত চুপচাপ কেন?

বিল্টুর দিদিমা কোনও উত্তর দিলেন না। একটা ঘরের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে উঁচু করলেন হ্যারিকেনটা। সেই হলদেটে আলোয় অসম্ভব কৃত্রিম দেখায় তাঁর মুখখানা। সারা মুখে মাকড়সার জাল। তিনি হ্যারিকেনটা দোলাচ্ছেন, কিংবা তাঁর হাত কাঁপছে, তিনি ধরে রাখতে পারবেন না বেশিক্ষণ।

বড়মামা দৌড়ে গিয়ে বললেন, মা কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন? রতন কোথায়?

বন্ধ ঘরের দরজাটা ঠেলে খুলে দিয়ে দিদিমা বললেন ওই যে!

খাটের ওপর ছোটমামা রতনের শায়িত শরীর। মুখে তখনও শুকনো রক্ত। ঘাড়ের পাশে গভীর ক্ষত, মাথাটা প্রায় চূর্ণ। কিন্তু চোখ দুটো আরও মেলা, অস্বাভাবিক সাদা দুটি চোখ স্থিরভাবে দেখতে ঘরের ছাদ। ঘরের মধ্যে বিকট পচা গন্ধ।

দিদিমা আবেগহীন গলায় বললেন, তোরা আসবি বলে ওকে রেখে দিয়েছি। আর সবাই ভয়ে পালিয়ে গেছে।

দুইমামা একসঙ্গে কেঁদে উঠলেন, মা, কী করে হল? কী করে হল? আমরা যে রতনের বিয়ের জন্য সব নিয়ে এসেছি। সেই মুহূর্তে দিদিমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে। ঝনঝন শব্দে ভাঙল হ্যারিকেনটা।

সেই প্রথম বিল্টুর মৃত্যু দেখা। মৃত ছোটমামার সাদা দুটি চোখ। বিল্টু কাঁদেনি, তার আগেই একটা বিকট খ্যা-র-র খ্যা-র-র শব্দে সে চমকে ভয় পেয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। বারান্দায় ঘুলঘুলিতে ডানা ঝটপটিয়ে কী যে একটা বড় ধরনের পাখি উড়ে চলে গেল বাইরে। একটা সাদা রঙের প্যাঁচা। ওই প্যাঁচাটাও যেন ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার চলে গেল। আর কখনও ফিরে আসবে না।

নিউ আলিপুরে

গড হ্যাজ গিভ্‌ন মি এনাফ! আই ক্যান সেন্ড মাই সান ইভন টু আজমির...

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের মতন গজরাতে লাগলেন বিনায়ক। তিনি ছ'ফিট ছাড়ানো সুপুরুষ, লাউঞ্জ সুট পরে আছেন, একটু আগে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে তিন পেগ কালো কুকুর পান করে এসেছেন, তাই ক্রোধটা একটু বেশি এখন। তাঁর ফরসা মুখে অপমানের প্রেতছায়া। তিনি আবার হুংকার দিয়ে বললেন, ছেলেফেলেরা মারামারি করেই, আমি নিজে, ইন মাই চাইল্ডহুড, কতবার হাত-পা ভেঙেছি খেলতে গিয়ে, আমার দুটো দাঁত নেই, এই দ্যাখেন আমার দুটো দাঁত ভাঙা, বিলাত থেকে ভালো করে বাঁধিয়ে এনেছিলাম...আর আমার ছেলে সামান্য মারামারি করেছে বলে, আপনি কী বলেন মাস্টারমশাই...

বিল্টু কী বলবে জানে না। সে চুপ করে আছে।

বিনায়ক বললেন, আমি ওকে আজমিরে পাঠাব। সে ক্ষমতা আমার আছে। এমনকি, ইংল্যান্ডে, বাবলু, তোকে আমি ইংল্যান্ড পাঠাব, এই বছরই।

রুচিরা স্বামীর বাহু ছুঁয়ে শান্তভাবে বললেন, অত মাথা গরম করছ কেন? এখন একটু বিশ্রাম নাও। বিনায়ক বললেন, কেন বিশ্রাম নেব, আ অ্যাম নট টায়ার্ড, কোন সাহসে দুই পয়সার পাদ্রিরা আমাকে এরকম অপমানের চিঠি পাঠায়? ইল-ম্যানার্স? তোরা ম্যানার্সের কী জানিস? বলেন মাস্টারমশাই, ওকে আজমিরে পাঠানো ঠিক হবে, না ইংল্যান্ডে?

বিল্ব আজমির তত্ত্বটা ঠিক জানে না। কী আছে আজমিরে? বিনায়কের ছেলে বাবলু তার ছাত্র। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে। খেলার মাঠে সে সাংঘাতিক মারামারি করেছে বলে ক্লাস টিচার চিঠি দিয়েছেন, বাবলুকে স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক, ওঁরা টি.সি. দেবেন।

বাবলুর মাথাতেও ফেট্টি বাঁধা। সে একটি বড় রকম হাঙ্গামাই বাধিয়ে এসেছে। কিন্তু তার সুকুমার দুরন্ত মুখখানিতে মিটিমিটি হাসি। তার বাবা তার পক্ষে আছে।

রুচিরা স্বামীকে বললেন, তুমি ছেলেকে বেশি লাই দিয়ো না। এমনভাবে মারামারি করে এসেছে, কেন করবে, ওর নিজেরও তো চোখটা আর একটু হলে...

বেশ করবে! ছেলেপেলেরা একটু মারামারি করবে না? মাস্টারমশাই, আপনি মারামারি করেননি?

রুচিরা বিল্বকে তুমি বলে ডাকেন। বিনায়ক আপনি। রুচিরা বললেন, বিল্ব, তুমি বরং আজ বাড়ি যাও, কতক্ষণ আর এই পাগলের চ্যাঁচামেচি শুনবে?

রুচিরা স্বামীর সম্পর্কে পাগল বিশেষণটি এমনভাবে দিলেন, যেন তার সঙ্গে খানিকটা বাৎসল্য মাখানো রইল। রুচিরাকে বিল্ব কোনও দিন তার ছাত্রর মা বলে ভাবতে পারে না। ঠিক যেন ইনগ্রিড বার্গম্যানের যমজ বোন। এই সব নারীদের ঠিক মা হিসেবে মানায় না। এদের জন্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

বিল্ব উঠে দাঁড়াল। বিনায়ক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন আমি আমার ছেলেকে রাখব না ওই পচা স্কুলে। আজমিরে কিংবা ইংল্যান্ডে পাঠাবই। আমার এক কথা।

বিল্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অর্থাৎ তার এই টিউশনিটা গেল। পঁচাত্তর টাকা। বন্ধুরা সবাই হিংসে করে বিল্বকে এইজন্য। নিউ আলিপুরে নতুন বাঙালি শিল্পপতির বাড়িতে বিল্বর অবাধ প্রবেশ-অধিকার, প্রত্যেকদিন চায়ের সঙ্গে সন্দেশ এবং পঁচাত্তর টাকা মাসে। তার বদলে বিল্বকে কিছুই করতে হয় না, ছাত্রের সুন্দরী মা এবং দিদিদের সঙ্গে গল্প করে যায়। ছাত্র এত দুরন্ত যে কিছুতেই পড়তে চায় না, অধিকাংশ দিনই আটটার আগে বাড়ি ফেরে না, তারপর পড়তে বসেই ঝিমোয়। তবু অসাধারণ মেধা ও প্রাণশক্তি বাবলুর, সে একটা কিছু হবেই জীবনে।

দরজার কাছে পৌঁছে বিল্ব জিগ্যেস করল, আজমিরে বুঝি কোনও বড় স্কুল আছে?

আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেই বিল্ব এক ঝলক ঝড়ের হাওয়া খেল। আকাশে লাল মেঘ। চতুর্দিকে নতুন বাড়ির সুগন্ধ। জলা জমি ভরাট করে এই নতুন বসতি। প্রত্যেকটা বাড়ি কত সুন্দর কায়দায়। বাস রাস্তায় পৌঁছবার জন্য বিল্বকে অনেকটা হাঁটতে হয়। হাওয়ায় ক্রমশ শব্দ বাড়ছে। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে। নতুন বাড়ির গোলোক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে বিল্ব দু-পটে হাত ঢুকিয়ে জোরে-জোরে হাঁটতে লাগল। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে? আজমির! আজমির! আপনি জানেন না? বিল্বকে আর এ পাড়ায় আসতে হবে না। পঁচাত্তর টাকা গেল। কোনওক্রমে বি.এস-সি পাশ করে সে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু ইন্টারভিউ আর ইন্টারভিউ! আপনি জানেন না?সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে। গড হ্যাজ গিভ্‌ন মি এনাফ, আই ক্যান সেন্ড মাই সান ইভন টু আজমির। রুচিরা দেবী কী সাংঘাতিক সুন্দরী, তাকালেই বুক কাঁপে—উনি কি লক্ষ করেছেন আমি প্রায়ই ওঁর দিকে গোপনে তাকিয়ে থাকি? কখনও উনি একটা হাত উঁচু করলে যদি ওর বগলে কচি ঘাসের মতন রোম দেখা যায়, মাথার ভেতরটা কীরকম অবশ-অবশ হয়ে যায়। আপনি জানেন না? সেখানে শুধু রাজকুমাররা পড়ে। আপনি জানেন না? আমি শালা কিচ্ছুই জানি না। আমি একটা গান্ডু! আমি শালা একটা বাঙাল, একটা নর্থ ক্যালকাটার গাঁইয়া ভূত।

একটা ইটে হোঁচট খেতেই বিল্ব অসহ্য ব্যথায় উঃ করে উঠল। বুড়ো আঙুলের নখটা উঠে

গেছে? না, কিন্তু লেগেছে সাংঘাতিক।

ব্যথা কমাবার জন্য একটু দম নিয়ে বিল্ব নতুন বাড়িগুলির দিকে ক্রুদ্ধ রক্তাক্ত চোখে তাকাল। সব বাড়ির জানলায়-জানলায় আলো। সব জানলায় নতুন পরদা। কোথা থেকে ভেসে আসছে পিয়ানোর শব্দ।

বিল্ব বিড়বিড় করে বলল, এই শোনো, নিউ আলিপুর। তোমাকে আমি একদিন ধ্বংস করে দেব। তোমার এইসব নতুন বাড়ি-ফাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেব। আমাকে চেনো না। আমি বিল্ব চ্যাটার্জি, সাবধান, আলিপুর, তোমাকে শেষ করে দেব আমি। শিগগিরই।

সিঁড়ির ওপরে দোতলাটা একটা আলাদা জায়গা। ওখানে বিল্ব কদাচিৎ যায়। ওখানে থাকে বাবা, মা, ভাইবোনেরা। সম্পূর্ণ সংসার। আর বিল্ব একা ওই সংসারের বাইরে, সে গুহাবাসী তার একতলার ঘরে।

নিচের বাথরুমের চিরুনিটা পলাতক। 'মানুষের গড়া দৈত্য' বইটির মলাটের ছবির মতন সারা কপালে চুল ঝুলিয়ে বিল্ব উঠে গেল ওপরে। সেখানকার বাথরুমটা বন্ধ।

ভেতরে কে?

দিদি। দেরি হবে? চিরুনিটা একটু—। কার চিরুনি? ঘরে দ্যাখ। বাবার ঘর। মা ও ছোট বোনের ঘর। দিদি আর ছোট ভাইয়ের ঘর। সব ঘরের সামনের দিকে টানা বারান্দা। শুধু দিদির ঘর ছাড়া আর সব ঘর চূড়ান্ত অগোছালো। যেখানে সেখানে লুটিয়ে আছে ছাড়া জামাকাপড়।

বিল্বর চুল মোটা-মোটা জট পাকানো। মেয়েলি চিরুনি তার পক্ষে সুবিধাজনক। ছোট বোনেরা স্কুলে, মা রান্নাঘরে। বিল্ব দিদির ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়াল। তিন বছর আগেও এই ঘরটা তার ছিল। এখানে সে স্বপ্নে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। এই ঘরের জানলা দিয়ে দেখা একটা ছোট পৃথিবী ছিল। এখন সব কিছুই অচেনা। অন্তত দু তিন মাসের মধ্যে বিল্ব এ-ঘরে একবারও ঢোকেনি। দিদির সঙ্গে বোধহয় একটাও কথা হয়নি দশ-বারো দিন।

বিল্ব ভাবল, আমিও এক সময় হাফ-প্যান্টের তলায় লম্বা-লম্বা ঠ্যাং বার করা অকোয়ার্ড চেহারার ছেলে ছিলাম। যে বয়েসে মামাবাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলেই উত্তেজনা জাগত। হেঃ। এই ঘরটা এক সময় আমার ছিল, এখন আর নেই। এই ঘরটা যার ছিল সে আর নেই। ওপরতলাটায় বড্ড বাড়ি-বাড়ি গন্ধ। বিল্বর আজকাল আর একদম পছন্দ হয় না। সকালবেলায় একবার শুধু বাজার করে দেওয়া ছাড়া এ-বাড়ির সঙ্গে বিল্বর আর কোনও সম্পর্ক নেই।

চুল আঁচড়ানো শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিল্ব দিদির খাটের ওপর বসে রইল। প্যান্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরা শরীরে একটু শিরশিরে ঠান্ডা আমেজ। ক-দিন ধরে নারকোল তেল জমতে শুরু করেছে। বিল্ব খেতে গেল না। বালজাককে কে একজন এসে বলেছিল, আপনার মায়ের অসুখ, আপনাকে একটু দেখতে চান। লেখা থেকে মুখ তুলে বালজাক বললেন, আঃ বিরক্ত কোরো না। যখন-তখন মায়ের সঙ্গে দেখা করা যায় না। মায়ের সঙ্গে দেখা করারও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে।

ঘটনাটা বেশ পছন্দ হয়েছে বিল্বর। আজ সকালেই পড়া। ঠিক সাহেবদের মতন কথা। বিল্বও মা আর দিদিটিদিদের সঙ্গে দেখা করার সময় নির্দিষ্ট করে রাখবে। আজ দিদির সঙ্গে। বিল্ব পায়ের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে বসল।

স্নান সেরে ঘরে ঢুকে সুদেষ্ণা প্রথমে বিল্বকে লক্ষ করেনি। বুক থেকে আঁচল ফেলে শাড়িটা ঠিক করে পরতে গিয়েই ঘুরে তাকাল। একটু অবাক হয়ে সে জিগ্যেস করল, কী রে?

বিল্ব উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তোর খবর কী রে দিদি?

বেশবাস পর্ব চটপট সেরে নিয়ে ভ্রূভঙ্গি করল সুদেষ্ণা। তার মানে?

এমনি, তোর খবর নিতে এলাম।

কিসের খবর?

পিঠেপিঠি ভাইবোন। একসময় ধারাবাহিক ঝগড়াঝাঁটি ছিল। আজকাল সুদেষ্ণা গম্ভীর হয়ে রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। বিল্ব নিজেই দেখেছে তার দিদিকে ধর্মতলার মোড়ে কৌটো ঝাঁকিয়ে চাঁদা তুলতে। সেই দৃশ্যটা বিল্বর চোখে ভেসে উঠতেই সে খানিকটা বিদ্রূপের হাসি ফোটাল। ফরোয়ার্ড ব্লক। কুইসলিং-এর পার্টি। ওরা এখনও মনে করে সেই ভদ্রলোক ফিরে আসবেন। 'আদেশ ছিল, দিল্লি চলো, দিল্লি মোরা জয় করেছি, আজ তুমি কোথা নেতাজি? আজ তুমি কোথা নে-তা-জি-ঈ-ঈ-ঈ-ঈ...।' ওদের গানের মধ্যে এখনও 'মোরা' শব্দটা থাকে। মোরা? আজ নয়, আজি। নেতাজির সঙ্গে মিলিয়ে। ভারি সুইট, তাই না? কারা লেখে এসব?

কিন্তু বিল্ব দিদির সঙ্গে রাজনৈতিক তর্ক তুলবে না।

বিল্বর চুপচাপ মুখ দেখে সুদেষ্ণা আর একটু বিরক্ত হয়ে বলল, কিছু বলছিস না যে? পয়সাকড়ি নেই আমার কাছে। কিছু দিতে পারব না।

সুদেষ্ণা একটা মর্নিং স্কুলে পড়াচ্ছে, এই তিন মাস হল। একশো পাঁচ টাকা মাইনে পায়। বিল্বর তুলনায় ইদানীং সে বেশ অবস্থাপন্ন।

না, পয়সা চাইতে আসিনি।

আমার কাছে তোর মোট সতেরো টাকা ধার, শোধ করে দিস।

দেব। সে কথা নয়। আমি ভাবলাম, তোর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকদিন কোনও কথাবার্তা হয় না। অথচ একই বাড়িতে আমরা থাকি। এ ধরনের অ্যালিয়েনেশান ভালো নয়। একটা যোগাযোগ থাকা উচিত।

সুদেষ্ণা কয়েক পলক ভুরু তুলে রইল। গলায় বাঁকা টান রেখে বলল, এ তো মনে হচ্ছে মুখস্থ করা কথা। কে শেখাল। সুরঞ্জন? সেও তো শুনছি আজকাল ইনটেলেকচুয়াল। তোদের পার্টিতে আজকাল এই তো সব ইনটেলেকচুয়ালের নমুনা।

বিল্ব এই প্ররোচনাও এড়িয়ে গেল। এবার সে ভালো মানুষের মতন হেসে বলল, তোকে আজ বেশ ভালো দেখাচ্ছে!

সুদেষ্ণা বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে, না? আমার খিদে পেয়েছে খেতে হবে। এক্ষুনি আমাকে বেরুতে হবে।

কোথায়?

তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?

ও, ভালো কথা মনে পড়েছে। তোর সঙ্গে আমার সত্যিই একটা জরুরি কথা আছে।

আমার এখন কোনও জরুরি কথা শোনার সময় নেই। আমি খেতে যাচ্ছি।

তুই রেগে যাচ্ছিস কেন আমার ওপরে! পাঁচ-দশ মিনিট সময় দিতে পারবি না আমাকে?

তুই জানিস খোকন, আমি পছন্দ করি না সুরঞ্জনের সঙ্গে তোর মেলামেশাটা .অথচ তুই আজকাল সবসময় তার সঙ্গেই ঘুরিস।

মাঝে-মাঝে দেখা হলে কথা বলব না?

মাঝে-মাঝে? মলয় গ্রিলে রোজ সকালে ওর সঙ্গে আড্ডা দিস।

তাও তুই লক্ষ করেছিস?

তুই তো এখন আর ছাত্র নেই। তবু এস.এফ.আই.-এর ছেলেদের সঙ্গে তোর মেলামেশা কেন? বুড়ো বয়সেও যারা ছাত্র-রাজনীতি করে—

এই বুড়ো বিশেষণটা যে তাঁকে নয়, সুরঞ্জনদাকে উদ্দেশ্য করেই, তা বিল্ব জানে। তবু সেটা নিজের গায়ে টেনে নিয়ে বলল, আমি কেন ছাত্র-রাজনীতি করতে যাব। আমি ফুল ফ্লেজেড পার্টি

মেম্বার, আমি রেগুলার কার্ড হোল্ডার।

তাহলে ওদের সঙ্গে সবসময় মিশিস কেন?

বিল্ব রাজনীতির তর্কে যাবে না। আবার সজাগ করল নিজেকে। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল, খেতে যাই।

জরুরি কথাটা কি শুনি?

বাবা সামনের জানুয়ারিতে রিটায়ার করছেন।

সে তো আমি জানিই।

ওরা এক্সটেনশন দেবে কিনা ঠিক নেই। নভেম্বর শেষ হলে বাবা দু-মাসের ছুটি নিয়ে নেবেন।

তাতে?

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে হাজার তিনেক টাকা পেতে পারেন। বাবা জিগ্যেস করছিলেন, ওই টাকাটা তিনি তোর বিয়ের জন্য রাখবেন, না বরানগরে একটা জমি...

বাবা এসব ব্যাপারে তোর মতামত নেওয়া শুরু করলেন কবে থেকে?

তা জানি না। কিন্তু বাবা আমাকে পরশুদিন রাত্রে এ-কথাটা জিগ্যেস করলেন।

আমাকে তো বলেননি। তুই যদি বাবার প্রতিনিধি হয়ে আমার মতামত নিতে চাস, তাহলে আমি বলছি, বরানগরের জমি সম্পর্কে আমার কোনওই বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার বিয়ের ব্যাপারে কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বিয়ে করি বা না করি, সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু এ-ব্যাপারে এ-বাড়ির কখনও একটাও পয়সা খরচা হবে না।

জানিস দিদি, প্রথম-প্রথম যখন ট্রামে চড়তাম, তখন দেখতাম একদল লোক ঠনঠনে কালিবাড়ি এলেই সেদিকে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। তখন ভাবতাম, আট-দশ বছরের মধ্যে এই লোকগুলো বদলে যাবে। তখন আর কেউ ঠিক ওরকম মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বুজে প্রমাণ করবে না। কিন্তু তা হয়নি। এখনও অন্য একদল লোক ঠিক ওইরকম ভাবেই....

তাতে কী হল?

এখনও বিয়ে বাড়িতে ম্যারাপ বাঁধে। দেড়শো-দুশো লোক খেতে বসে।

তুই কিছুই জানিস না খোকন। আমার বন্ধু সুতপা বিয়ে করল গত মাসে, সবসুদ্ধু খরচ হয়েছে বাইশ টাকা।

সে তো মিহিরদাও কফি হাউসে সবার কাছ থেকে একটাকা দু-টাকা করে চাঁদা তুলেছিলেন, সেই টাকায় বিয়ে করলেন সেদিনই সন্ধেবেলা। কিন্তু তিনমাস বাদে মিহিরদার বাবা আবার ধুমধাম করে লোকজন খাওয়ালেন।

সবাই তোদের মিহিরদা নয়।

বেশ, ভালো কথা।

তোকে আর-একটা কথাও বলে রাখছি, বাবাকে জানিয়ে দিস। এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে রেশনের টাকা আর ছোট দুটোর পড়ার খরচ আমিই চালাব।

সুরঞ্জনদার ওপর তোর এত রাগ কেন? মানুষটা কিন্তু খারাপ নন।

এটাই তা হলে তোর আসল কথা। এতক্ষণ চালাকি করছিলি? খোকন, তুই কিন্তু মার খাবি আমার কাছে। কোনওদিন এসব কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবি না। তুই সুরঞ্জনের হয়ে দালালি করতে এসেছিস আমার কাছে?

না, না!

তোর কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে যাই? বিল্ব একটু অসহায় বোধ করল। সুরঞ্জনের কথাটা হঠাৎ কেন বলতে গেল, সে নিজেই জানে না। কোনও কারণ ছিল না, সুরঞ্জনদাও

ওকে কিছু বলেননি। এমনিই মনে এল।

সুরঞ্জনদা বহুদিন দিদির প্রেমিক ছিলেন। সেই ছোটবেলা থেকে সবাই ধরেই নিয়েছিল, সুরঞ্জনের সঙ্গেই দিদির বিয়ে হবে, এমনকি মা-বাবাও। মাস ছয়েক হল কী যেন ঘটেছে, দিদি আর কথা বলে না সুরঞ্জনের সঙ্গে। সুরঞ্জনদা এ-পাড়া দিয়ে হাঁটবার সময় মাথা নিচু করে চলে যায়, তাকায় না এ-বাড়ির দিকে।

আগে সুরঞ্জনদাকে খুব একটা পছন্দ করত না বিল্ব। মেনে নিয়েছিল। একটু হামবাগ হামবাগ ভাব, বেশি চেহারা-কনশাস। প্রায়ই যে-সব বইয়ের নাম উচ্চারণ করত, সেগুলো সব নিজে পড়েনি। কিন্তু আজকাল কিছুদিন সুরঞ্জনদা বদলে গেছে অনেকখানি। আগের মতন বেশি কথা বলে না, ভদ্র হয়ে গেছে খুব। সবচেয়ে বড় কথা, বিদ্রূপ, রাগ বা দুঃখ—এর কোনও সুরেই সে কখনও বিল্বর সামনে তার দিদির নাম উচ্চারণ করে না। অন্যান্য বন্ধুদের জন্য, আজকাল মলয় গ্রিলে সকালের আড্ডায় বিল্বকে সুরঞ্জনদার টেবিলে বসতে হয়। কিন্তু সুরঞ্জনদা তাকে অস্বস্তিতে ফেলেনি একবারও।

দিদির সঙ্গে সুরঞ্জনদার কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছে বিল্ব জানে না, কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রায় সম্পূর্ণ। দিদির যে ভয়ানক জেদ বিল্ব তা জানে। তার দিদিকে দেখতে খুব ভালো নয়, খুব খারাপও নয়, তবে দিদিকে কেউ সাধারণ মেয়েদের দলে ফেলতে পারবে না। মুখের মধ্যে একটা তেজি-তেজি ভাব আছে। দিদি কখনও ইয়ার্কি করেও একটা মিথ্যে কথা বলে না।

বিল্ব মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, ব্যর্থ প্রেমের জন্যই কি সুরঞ্জনদার এই পরিবর্তন? ব্যর্থ প্রেম যেন ওই হামবাগ লোকটিকেও অনেক মহান করে তুলেছে। মুখের হাসিটাও বদলে গেছে অনেক। কথাবার্তার মধ্যে গভীরতার ছাপ পড়েছে, আর দুমদাম করে না-পড়া বইয়ের নাম উচ্চারণ করে না। প্রত্যাখ্যানের আঘাত মানুষের এতখানি? দুঃখ হয় বিল্বর, খুব দুঃখ হয়। তার এ পর্যন্ত এরকম কোনও অভিজ্ঞতা হল না। দু-চার মাসের জন্যও যদি কোনও মেয়ে তাকে ভালোবাসত, বিল্ব তাকে চিঠি লিখত অসংখ্য, তারপর না-হয় মেয়েটি পদাঘাত করে বিদায় করে দিত বিল্বকে। তবুও তাতেই মোড় ফিরে যেত তার জীবনের। সুরঞ্জনদা কথা বলতে-বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়, মুখে একটা বিষণ্ণ হাসি থাকে। অথচ বিল্বর জীবনে এখনও কোনও মেয়েই...

এই যে তার দিদি, এইরকম একটি মেয়েই যদি। তার দিদি সুদেষ্ণা যদি অন্য কোনও বাড়ির মেয়ে হত, তাহলে দিদির সঙ্গেই প্রেম করতে পারত বিল্ব। দিদি মানে সেই অন্য বাড়ির মেয়েটি আর কি! দিদি বাংলাটা ভালো জানে, দিদির মতন মেয়েকে চিঠি লিখেও আনন্দ ছিল, তবে বিল্বর মতন ফাজিল ছেলেকে দিদির মতন মেয়ে সহ্য করতে পারত না—বেশিদিন। বিল্ব নিশ্চয়ই গায়েটায়ে হাত দিয়ে আদর করতে যেত, আর দিদি নিশ্চয়ই তখন, মানে সেই অন্য বাড়ির মেয়েটা তখন...।

দিদি কি সুরঞ্জনদাকে কোনওদি চুমুটুমু খাওয়া অ্যালাউ করেছে? মনে তো হয় না, দিদি যা মরালিস্ট।

বিল্ব সুদেষ্ণার কাঁধে হাত রেখে বলল, দিদি, তুই জানিস না, তোকে আমি কত্ত ভালোবাসি?

থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না।

কালো দুর্গ

সপরিবারে সেই একবারই বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল পুরীতে। বিল্বর বয়েস তখন দশ বা এগারো। ছোট ভাইটা তখনও জন্মায়নি। আশ্চর্য, তার চেয়েও আরও ছোট বয়েসের অনেক কথা মনে আছে, কিন্তু পুরী ভ্রমণের বিশেষ কিছুই মনে নেই কেন? কিংবা, কিছু-কিছু দৃশ্য, যা তার মনে গেঁথে আছে,

সেগুলি নাকি আসলে ভুল। যেমন বিল্বরা পুরীতে যে বাড়িতে থাকত, ভাড়া নেওয়া হয়েছিল এক মাসের জন্য, সেই বাড়ির পাশ দিয়েই রেললাইন। মাঝরাত্রে ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেত চলন্ত মেলট্রেনের ঝমঝম শব্দ। এমন-কি সেই ট্রেনের আলো ঠিকরে পড়ত তাদের দোতলার ঘরের আয়নায়। অথচ মা-দিদিরা এই কথাটা শুনলে হাসে। পুরী শহরের মধ্যে ট্রেনলাইন নেই, সেই বাড়িটার পাশ দিয়ে ট্রেন যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সেই রকম পুরীর সম্পর্কে বিল্ব আরও একটি ভুল ছবি বাঁধিয়ে রেখেছে মনের মধ্যে। সে একটা পাথরে গড়া বিশাল মন্দির, খাড়া উঠে গেছে সমুদ্রের কিনারা ঘেঁসে, সমুদ্রের নীল ঢেউ ছলাত-ছলাত করে আছড়ে পড়ছে মন্দিরের দেওয়ালে। এতেও ওরা হাসে। বিশেষত, নীল ঢেউ শুনে। অথচ বিল্ব যে স্পষ্ট দেখতে পায়।

একটা ঘটনা অবশ্য খুব ভালো মনে আছে। সকালবেলা জল উঠে আসত অনেকখানি, প্রায় রাস্তা পর্যন্ত, বিকেলবেলা নেমে যেত অনেকে নিচে। প্রথম কয়েকদিন ঝিনুক খোঁজার পর ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে যাওয়ায়, বিল্ব সেই ভিজে বালির ওপর বসে খেলা করত একলা-একলা। সেই সময় বিল্বর রাজকাহিনি-পড়া অভিভূত মনে চিতোর দুর্গের ছবি বড় মোহ দিয়েছিল। সে দুর্গ বানাত। একদিন দুপুর থেকে বসে-বসে অনেকখানি জায়গা খুঁড়ে বানিয়েছে দুর্গ, ঠিক তার মনের মতন চিতোর, আর ঠিক সেই সময় তিনটি ঢ্যাঙা কিশোর স্বর্গদ্বারের দিক থেকে এল ছুটতে-ছুটতে। ডবল মার্চের ভঙ্গিতে। তারা থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক দেখল বিল্বর হাতে গড়া দুর্গ। তাদের চোখে ফুটে উঠল প্রশংসার ছায়া। তারপর তারা অট্টহাসি দিয়ে লাফিয়ে পড়ল। বিল্বর কীর্তি তছনছ করে দিয়ে আবার ছুটে চলে গেল সামনের দিকে।

প্রায় তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরে বালির ওপর কাত হয়ে শুয়ে বিল্বর বাবা বই পড়ছিলেন। ছেলের ওপর তাঁর চোখ রাখার কথা।

বিল্ব বেদনাময় কণ্ঠে ডাকল, বাবা।

তিনি কিছু দেখলেন না, পাশ ফিরলেন না, সাড়া দিলেন না। সজল বাতাস বোধ হয় তাকে ঘুম এনে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে বসে থাকার পর বিল্ব আবার সেই ভাঙা দুর্গ মেরামতের কাজে মন দিয়েছিল। সে তখন আর বিল্ব নয়, বাপ্পাদিত্য। সে তন্ময় হয়ে ডুবেছিল ওই কাজে, ছেলেমানুষরা যতটা তন্ময় হতে পারে, সে আর কোনওদিকে তাকায়নি, তাই সে চমকে উঠেছিল হাসির শব্দে।

সেই তিনটি ছেলে ডবল মার্চ করতে-করতে আবার ফিরে এসেছে। শেষ বিকেলের রোদে তাদের মুখ উদ্ভাসিত। তাদের চোখে কৌতুকছটা। তাদের একজন বলল, বাঃ!

ঠিক আগের মতন খলখলিয়ে হেসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ'খানা পায়ে তছনছ করে দিল সবটা। ওরা যা পছন্দ করে, তা-ই ভাঙতে চায়।

বিল্ব দু-বার ডাকল, বাবা, বাবা।

কোনও উত্তর পেল না।

বহিরাগত আক্রমণকারীদের মতন জয়ের গৌরবে ছেলে তিনটে আবার ছুটল সামনের দিকে। বিল্বর মধ্যে জেগে উঠল গোঁয়ার রানা, সে একাই ছেলে তিনটিকে তাড়া করে গেল, হাতের কাছে কোনও ইট বা পাথর না পেয়ে সে একটা মরা জেলি মাছ ছুঁড়ে মারল একজনের ঘাড়ে। তারপর একমুঠো বালি।

তিনটি ছেলেই বিল্বর চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়। তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব উপভোগের সঙ্গে বিল্বকে মেরে ধরাশায়ী করল, একজন তার খালি পায়ের পাতা দিয়ে একটা চাঁটি দিয়ে গেল বিল্বর গালে।

সব ব্যাপরাটাই ঘটে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। বিল্ব আর তার বাবাকে ডাকেনি।

ব্যথার চেয়েও প্রবল অভিমানে বিল্ব গড়াগড়ি দিচ্ছিল মাটিতে। সে আর কোনওদিন বাবাকে ডাকবে না। গুণ্ডারা এসে যদি তাকে মেরেও ফেলে তবু সে আর কখনও সাহায্য চাইবে না তার বাবার কাছে।

হঠাৎ আকাশে তাকিয়ে চমকে গেল বিল্ব। একটা দারুণ দৃশ্যের ঝাপটায় সে নিথর হল। শেষবেলার রক্তাক্ত আকাশে একটা বিশাল কালো মেঘের দুর্গ। এমনই জমকালো গাম্ভীর্য তার যে, বিল্ব নিশ্বাস ফেলতে ভুলে যায়। সে যখন বালি দিয়ে দুর্গ বানাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই আপন মনে আকাশে গড়ে উঠছিল আর একটি মহান, সুন্দর, অলীক। বড় গম্বুজ ও প্রাকারঘেরা যেন এক কষ্টিপাথরের দুর্ভেদ্য প্রাসাদ।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে বিল্ব একবার চারপাশে তাকাল। সে ভেবেছিল সে অন্যমনস্ক ছিল অতক্ষণ, কিন্তু বাকি সব লোক নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে মুগ্ধভাবে দেখছে আকাশে সেই ভাস্কর্য। কিন্তু না তো, আর তো কেউ আকাশেরা দিকে তাকাচ্ছে না। আর কেউ দেখতে পায়নি? ওই দুর্গ শুধু বিল্বর একার জন্য? বিল্ব বারবার আকাশ ও বেলাভূমির মানুষদের দেখতে লাগল পর্যায়ক্রমে। সত্যিই, আর সবাই অনবহিত। বিল্ব শুধু একা দেখেছে। রোমাঞ্চে তার শরীর কাঁপতে থাকে।

প্রাক্ কৈশোরে পুরীর টকটকে লাল আকাশে সেই কালো দুর্গ সত্যিই দেখেছিল বিল্ব। তার স্পষ্ট মনে আছে।

রাস্তার ওপাশে

মানিকতলার মোড়ে দেবজ্যোতির সঙ্গে দেখা। দুপুর একটা। বিল্ব তখন মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী করছিল কে জানে। দেবজ্যোতি তাকে দেখে বলল, ট্রামে উঠব ভেবেছিলাম, কিন্তু এইটুকু তো রাস্তা। চল, হাঁটি।

বিল্ব একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে প্যাকেটটা দেবজ্যোতির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিবি?

আমি সিগারেট খাই না। তুই খাস কেন?

বিল্ব কাঁধ ঝাঁকাল। যার মানে অবান্তর, অবান্তর।

দেবজ্যোতি বলল, সিগারেট খেলে জিভের স্বাদ খারাপ হয়ে যায়। তুই যদি কখনও টি টেস্টার হতে চাস—

না, হতে চাই না।

তুই তাহলে কী হতে চাস!

বিল্ব আবার কাঁধ ঝাঁকাল।

আমি জানি তুই কী হবি। গভের্নমেন্ট অফিসের ক্লার্ক কিংবা স্কুলমাস্টার। এইজন্য আমি গরিবদের দেখতে পারি না। তাদের কোনও অ্যামবিশান থাকে না। তারা কোনওরকমে টিকে থাকতে পারলেই বর্তে যায়।

তুই এত বেলায় কোথায় যাচ্ছিস, দেবজ্যোতি?

সায়েন্স কলেজ। প্রথম দুটো ক্লাস মিস হল। ও, একটা ভালো খবর আছে, তুই শুনিসনি নিশ্চয়ই। পরশুদিন আমার বড়মামা মারা গেছে।

দেবজ্যোতির বড় মামাকে বিল্ব চেনেই না, সুতরাং তাঁর মৃত্যুর খবরটা ভালো না খারাপ তা জানবে কী করে বিল্ব।

জ্বলজ্বলে হাসিমুখে দেবজ্যোতি বলল, এখন বাকি রইল আমার কাকা। এই কাকা মারা গেলেই

আমার আর কোনও গার্ডিয়ান থাকবে না, আমি একেবারে ফ্রি হয়ে যাব তখন আমার যা খুশি—

তোর কাকা মানে, সেই যাঁর নাম দেবপ্রিয় মজুমদার, যিনি লেখেন?

লেখাটা তো এলেবেলে. এমনিতে খুব বড় কাজ করেন। উনি হচ্ছেন অ্যাকচুয়ারি। কাকে বলে জানিস অ্যাকচুয়ারি? যারা সারা দেশের মানুষদের গড় আয়ু ঠিক করে। খুব খটোমটো অঙ্কের ব্যাপার। এত বড় দেশটার এত মানুষের মধ্যে কতরকম ক্লাস, কতরকম ফুড হ্যাবিট, রোজগারের ডিসপ্যারিটি. কোন কোন অসুখ এমন হাওয়ায় ভাসছে, আরও সব নানান ফ্যাকটার, এর মধ্যে থেকে ঠিক করতে হয় আগামী দশ বা পনেরো বছরের মধ্যে এদেশের অ্যাভারেজ মানুষ কত বয়স পর্যন্ত বাঁচতে অ্যালাউড, বুঝতে পারলি তো, গোটা লাইফ ইনসিওরেন্সের ব্যাপারটা এই হিসেবের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

না, বিল্ব বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করছে না।

দেবজ্যোতি আবার বলল, গত বছরে অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ানদের লাইফ স্প্যান কত ছিল জানিস? সাতচল্লিশ। ডেমোগ্রাফিক্যাল ইয়ারবুকে বেরিয়েছে, দেখে নিস। আমার কাকার বয়েস এখন সাতান্ন। সেইজন্য আমি একদিন বললুম অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ানদের চেয়ে আরও দশ বছর গ্রেস পেয়েছেন, আর কতদিন বেঁচে থাকবেন, কাকামণি?

উনি কি বললেন?

বললেন, চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি। দেখছ না এই যে রোজ দুটো করে সন্দেশ খাই?

তার মানে?

আরে ইডিয়েট, একথাটা কি সত্যি-সত্যি জিগ্যেস করেছি নাকি? মনে-মনে হচ্ছে এ-সব ডায়ালগ। আমার কাকামণির হেভি ডায়াবিটিস অথচ মিষ্টি খাওয়ার খুব লোভ, তাতেই বুঝে গেছি আর বেশি দিন নেই। কাকা মারা গেলেই আমি একদম ফ্রি-প্রপার্টি ফ্রপার্টি যা আছে সব বেচে দিয়ে প্রথমেই যাব নরওয়ে।

নরওয়ে?

হ্যাঁ দুর্দান্ত জায়গা, ছেলেবেলা থেকে আমি ভেবে রেখেছি নরওয়ে যাওয়ার কথা, ল্যান্ড অফ দ্য মিডনাইট সান।

এবার রাস্তা পার হতে হবে কিন্তু বিল্ব থমকে দাঁড়াল। ওপারে লাল রঙের বড় বাড়িটা। বিল্ব বলল, চলি রে দেবু।

তুই আয় না আমার সঙ্গে।

আমি কোথায় যাব? আমি সায়েন্স কলেজে গিয়ে কী করব?

চল না আমার পাশে বসে থাকবি। প্রফেসাররা কিছু বলবেন না। ভাববেন, অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলে।

না।

আরে চল না।

না।

দেবজ্যোতি বিল্বর হাত ধরে টানাটানি করে রাস্তার মধ্যে অনেকখানি নিয়ে গেল, বিল্ব আবার জোর করে ফিরে এল এপারে। দেবজ্যোতি বলল, আচ্ছা চল তোকে ক্লাস করতে হবে না। চা খাওয়াব, আমাদের ক্যান্টিনে ভালো সিঙাড়া পাওয়া যায়।

বিল্বর চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে ঠেলা দিচ্ছে অভিমান। সে এইমাত্র ঠিক করল কোনওদিন সে গেট পেরিয়ে ওই লাল বাড়িটার মধ্যে ঢুকবে না। এমনকি কখনও এপথ দিয়ে যেতে হলে সে বিপরীত ফুটপাথ দিয়ে হাঁটবে ওই লাল বাড়ির পাশ দিয়েও যাবে না। তাকাবেও না।

তাকে ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

চা খাবি না?

না, আমার অন্য কাজ আছে।

তুই এম এস সি-তে ভরতি হলি না কেন রে বিল্ব? ফর্মটর্ম সব নিয়ে গিয়েও ইচ্ছে হল না। আমার আর পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না।

তোদের গরিবদের নিয়ে আর পারা যায় না। একটা কেরানিগিরি জোটাবার জন্য হন্যে হয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেছিস নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ রে ঠিক ধরেছিল।

আমি যখন নরওয়ে যাব তোকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তুই যাবি?

উত্তর না দিয়ে বিল্ব হাসল শুধু।

ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে দেবজ্যোতি বলল, কাল পরশু দেখা করিস একবার—চলি, আর সময় নেই।

বিল্ব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়। দেবজ্যোতি ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তিনটি মেয়ে ও দুটি ছেলের একটি ছোট দঙ্গল সেই সময় ডান পাশ দিয়ে আসছিল তাদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে চলে এল দেবজ্যোতির কাছে। কী একটা কথায় তারা দুজনেই মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। তারপর সবাই ঢুকে গেল ভেতরে।

লোহার গেট ও উঁচু দেওয়াল দিয়ে সায়েন্স কলেজ বিল্ডিংটা রাস্তা থেকে আলাদা করা। ওর ভেতরে একটা অন্যরকম জগৎ আছে। বিল্বর কোনওদিন দেখা হবে না।

হে প্রবাসী

বিল্ব একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু সে-বাড়ির কোনও মানুষকে সে চেনে না। বিল্ব রাস্তা দিয়ে হাঁটে, এই রাস্তা তার অজানা। বিল্ব তার বাল্যকালের দিকে ফিরে তাকায়। সে নিজেকে দেখতে পায় না সেখানে। সে এখানকার কেউ নয়? কেউ যে সন্ধেবেলা ডাকে ফিরে এসো, ফিরে এসো! কারা ডাকছে, কোথায় যাওয়ার কথা। একলা-একলা ঘুরতে-ঘুরতে বিল্ব হারিয়ে যায়, খুব গভীরভাবে হারিয়ে যায়। একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিস করে বলে, এবার খুঁজে নিতে হবে নিজেকে, খুঁজে নিতে হবে।

অনির্বাণ আগুন

বড়লোকের বাড়িতে কোনও গরিব আত্মীয় অকারণে এসে উপস্থিত হলে কীরকম ব্যবহার পায়, তা কি নিরুপম জানে না? ভালো ব্যবহার! হ্যাঁ, শুধু ভালো ব্যবহার নয়, বেশি-বেশি ভালো ব্যবহার। খাতির-যত্ন!

আগেকার দিনে দূর-দূর ছাই-ছাই করত। মুখ ব্যাঁকাত। নিমকি আর লবঙ্গলতিকা খাইয়ে, দশ-পনেরো টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বিদায় করে দিত।

এখন ভদ্রতা সভ্যতা অনেক সূক্ষ্ম হয়েছে। মনে যাই থাকুক, মুখে প্রকাশ করবে না। কেউ যেন অনুদার মনে না করে। এমন আন্তরিকতা দেখাবে যে তাতেই গরিব আত্মীয়টি অস্বস্তি বোধ করবে।

নিরুপম এটাও আন্দাজ করতে পারে যে নিজেদের ঘরের দরজা বন্ধ করে, খুবই নিচু গলায় বিজুমামাকে লতুমামিমা বলেন, ওই ছেলেটা আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল কেন? কতদিন থাকবে? বিজুমামা আমতা-আমতা করে উত্তর দেবেন, এসেছে যখন, থাক না, এত বড় বাড়ি, এতজনের জন্য রান্না হচ্ছে। ও আর কতটুকু খাবে! লতুমামিমা বলবেন, খাওয়ার কথা হচ্ছে না, কাজের লোকেরাও তো খায়, কিন্তু ও আমাদের গেস্টদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে, অংশুর মেয়েদের সঙ্গে ক্যারাম খেলছে, এটা ওরা পছন্দ নাও করতে পারে!

নিরুপম যে গরিব ছেলে, সেটা কি তার গায়ে লেখা থাকে? হ্যাঁ, লেখা থাকে। ঠিক বোঝা যায়।

এটা নিরুপমের আপন মামাবাড়ি নয়। সেখানে সে কখনও যায় না। মা যেতে বারণ করেছেন। বিজুমামা তার মায়ের জ্যাঠতুতো ভাই। নিরুপমের বাবা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ওপরে উঠতে পারেননি। মা ছিলেন ধনী পরিবারের মেয়ে। এই বিশাল রায়চৌধুরী পরিবার আজও মাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

এই রায়চৌধুরী পরিবার ছড়িয়ে আছে সারা দেশে। কলকাতায় পাঁচ-ছ'খানা বাড়ি। কৃষ্ণকান্তপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়িটিতেই এক সময়, সেও অনেক বছর আগে, সবাই থাকতেন। বিজুমামার ঠাকুরদার নাম কৃষ্ণকান্ত, তাঁর নামেই গ্রামের নাম।

জমিদারির কাল শেষ হয়ে গেছে, এখন কে আর গ্রামে থাকে? পরিবারও ভাগ হয়ে গেছে, এখন সবাই কলকাতায় আলাদা-আলাদা বাড়িতে ছড়িয়ে আছে। গ্রামের বাড়িটা হয়ে গেছে এক বোঝা, মেরামতির অভাবে এদিকে-সেদিকে ভেঙে পড়ছে, শরিকরা কেউই সে জন্য টাকা দিতে চায় না। এ বাড়ি থেকে কোনও উপার্জন নেই, শুধু-শুধু টাকা খরচ করতে যাবে কেন?

এত বড় বাড়ি কেউ ভাড়াও নেবে না। রেলস্টেশন থেকে পাঁচ মাইল দূরে, ভালো রাস্তাও নেই, এ বাড়ি কেউ কিনতেও চায় না। গ্রামের লোকরা আবেদন করেছিল, কর্তারা বাড়িটা দান করে দিন, এখানে কলেজ খোলা হবে। সব শরিকরা তাতেও রাজি নয়। এত বড় একটা সম্পত্তি এমনি-এমনি দিয়ে দেওয়া হবে? শেষ পর্যন্ত খদ্দেরের অভাবে যদি কলেজ করতেই হয়, তবে তার নাম দিতে হবে কৃষ্ণকান্ত কলেজ। তাতেও বাধা আছে। পাশের গ্রামে একটা হাইস্কুল আছে, সেটাকেও কলেজে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে, সে স্কুলের নাম রাধারানী বিদ্যালয়। তারা নাম বদলাতে রাজি নয়। আলাদা একটি কলেজ স্থাপনের সামর্থ এ গ্রামের মানুষদের নেই।

হঠাৎ গত মাসে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটেছে। এক মাড়োয়ারি এই প্রাসাদ, তার সংলগ্ন

বাগান, পুকুর এক লপ্তে কিনে নিতে আগ্রহী, সে এখানে কোল্ড স্টোরেজ বানাবে, সে-ই স্টেশন পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি করে নেবে, সে রাস্তা দিল্লি রোডের সঙ্গেও জুড়ে যাবে। ইদানীং কোল্ড স্টোরেজের ব্যাবসা বেশ ভালো চলছে। হঠাৎ অনেক টাকা পাবার সম্ভাবনায় শরিকরা খুব খুশি।

নিরুপম এ বাড়িতে আগে কখনও আসেনি, মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছে। মা কম বয়েসে এ বাড়িতে থেকে গেছেন কয়েকবার। বাবাও নাকি একবার এসেছিলেন, একটা বিয়ের নেমন্তন্নতে নিজের বিয়ের আগে। বাবা তখন ছিলেন কলকাতায় চৌধুরী পরিবারের গৃহশিক্ষক।

মা যখন আসতেন, তখন নাকি এ বাড়িতে ভূত দেখা যেত মাঝে-মাঝে। মা নিজের চোখে দেখেননি, তবে একবার মা থাকতে-থাকতেই তাঁর এক মাসি এক মস্ত গোঁফওয়ালা জোয়ান চেহারার ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তখন এ গ্রামে বিদ্যুৎ আসেনি, ঝাড়লণ্ঠনের আলো, তাও এতগুলো ঘরের অনেক ঘরই অন্ধকার থাকত। এখন বিজলি বাতি এসে গেছে, ভূতটুত সব কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ভূতের গল্প শুনলে ভয় পায় না।

নিরুপম একেবারে রবাহুত হয়ে আসেনি।

তপনদার সঙ্গে যে বিজুমামার বন্ধুত্ব আছে তা সে জানত না। জানবে কী করে, বিজুমামাকে সে দেখেছে মাত্র দু-বার। শুধু গল্পই শুনেছে। মা আর বিজুমামা প্রায় সমবয়সী। এই বিজুমামা যৌবন বয়েসে একবার বাঘ মারতে গিয়ে শেয়াল মেরে এনেছিল। বিজুমামার ভালো নাম দিগ্বিজয় রায়চৌধুরী!

ললিতা মাসির মেয়ের বিয়েতে মায়ের বাপের বাড়ির লোকদেরও নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, নিরুপমও গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে। তখন তার সাতবছর বয়েস। সেখানেই বাপের বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে অনেক বছর বাদে মায়ের দেখা, অনেকেই মায়ের সঙ্গে কথা বলেননি, শুধু বিজুমামা একবার মায়ের সামনাসামনি পড়ে গিয়ে বলেছিলেন, কেমন আছিস বিনু? মা বলেছিলেন, ভালো খুব ভালো। তোরা সবাই ভালো আছিস তো?

বাচ্চা নিরুপম তখন পাশে দাঁড়িয়ে। তার মনে আছে সেই দিনটির কথা। তখনও সে জানত না, তার মায়ের সঙ্গে বাপের বাড়ির কিসের ঝগড়া। কেন তার মামাবাড়িতে যাওয়া নিষেধ? তার সব বন্ধুদের মামাবাড়ি আছে, শুধু তার নেই।

পরে বড় হয়ে জেনেছে আসল কাহিনিটি। রীতিমতো রোমাঞ্চকর। মা আর বাবা দারুণ রোমান্টিক ছিলেন। বাবা তখন সামান্য একজন স্কুলশিক্ষক, চৌধুরী বাড়ির কয়েকটি ছেলেমেয়েকে প্রাইভেট পড়াতেন। তাদের মধ্যে একজন ছাত্রী ছিলেন মা। তারপর মাস্টার ও ছাত্রীর প্রেম, সে প্রেমটা নাকি মায়ের দিক থেকেই বেশি। মা তখন কবিতা লিখতেন, বেশ কয়েকটা ছাপাও হয়েছিল।

লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম নয়, প্রথমে মন দেওয়া নেওয়া, তারপরেই বিয়ের প্রস্তাব। চৌধুরী পরিবারের পক্ষে রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সঙ্গে-সঙ্গে মাস্টারটির চাকরি ছাড়িয়ে দেওয়া হল, ছাত্রীটির বাড়ি থেকে বেরুনো একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তবু কী উপায়ে যেন চিঠি চালাচালি হচ্ছিল নিয়মিত। একদিন মা একবস্ত্রে ভোরবেলা বাড়ি থেকে পালালেন। বাবা তাকে নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটলেন জামশেদপুরের। যাতে চৌধুরী বাড়ির লোকেরা গুন্ডা কিংবা পুলিশ লেলিয়েও তাদের ধরতে না পারে। দুজনেই অবশ্য প্রাপ্ত বয়স্ক। জামশেদপুরে বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে বিয়ে হয়ে গেল। সেই দিন থেকে রায়চৌধুরী পরিবারের বিদিশা হয়ে গেল ত্যাজ্য কন্যা।

মা কি এরকম একজন গরিব মানুষকে বিয়ে করার জন্য পরে কখনও অনুতাপ করেছেন? নিরুপম তা জানে না। মা অবশ্য মুখে কিছু প্রকাশ করেননি কখনও।

বিজুমামার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল এই তো তিনবছর আগে। বাবার মৃত্যুর পর। যদিও এতগুলি বছর কোনও সম্পর্ক নেই, তবু মায়ের নির্দেশে তাঁর বাপের বাড়ির প্রত্যেককে নিয়মমাফিক শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। কেউ আসেনি। বাবার মৃত্যুর পরেও তাদের রাগ যায়নি। নিরুপম নিজে সেই প্রথম তার বিভিন্ন মামাবাড়ির দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। বিজুমামা অবশ্য ভদ্রতা করেছিলেন। নিরুপমকে ভেতরের ঘরে গিয়ে বসিয়ে বাবার কী অসুখ, কেমন চিকিৎসা হয়েছিল, মা এখন কেমন আছে, এইসব জানতে চেয়েছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। লতুমামিমা জোর করে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। তারপর বিজুমামা বলেছিলেন যে তাঁদের দুজনকেই বিশেষ কাজে ওই সময় রাঁচি যেতে হবে, সেইজন্যে শ্রাদ্ধের দিনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, বিদিশা যেন কিছু মনে না করে!

তপনদার সঙ্গে বিজুমামার বন্ধুত্ব গল্‌ফ খেলার সূত্রে। দুজনেরই গল্‌ফ খেলার নেশা। নিরুপম জীবনে কোনও গল্‌ফ কোর্সের ধারে কাছেও যায়নি। তপনদাকে সে অন্যভাবে চেনে। ছোট-বড় সকলেরই উনি তপনদা। পাড়ার পুজো কমিটির স্থায়ী প্রেসিডেন্ট। দুর্গাপুজোর সময় পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে উনি নাটক করান। নিরুপম অবশ্য কোনওবারই থিয়েটারে পার্ট পায়নি, স্টেজে উঠলেই তার পা কাঁপে, গলা চিঁচিঁ করে, এমনিতেই তার গলার জোর নেই। কিন্তু নিরুপম একটা গুরুদায়িত্ব পেয়েছিল। থিয়েটারের সময় সে প্রম্‌পটার। এইসব শখের থিয়েটারে প্রম্‌পটারের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। তপনদা সবসময় তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সেই তপনদার সঙ্গে একদিন বাজারের কাছে দেখা। তিনি বললেন, কী রে নিরু, তুই কৃষ্ণকান্তপুরে যাচ্ছিস না? অনেকেই তো যাচ্ছে!

নিরুপম প্রথমে বুঝতে পারেনি, সে ভেবেছিল কৃষ্ণকান্তপুরে বুঝি থিয়েটারের জন্য যাওয়া হবে।

তপনদা বুঝিয়ে দিলেন। কৃষ্ণকান্তপুরের জমিদারবাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তাই সে বাড়ির অন্যতম মালিক দিগ্বিজয় রায়চৌধুরী বন্ধুবান্ধবদের সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা পার্টি দিচ্ছেন। কলকাতা থেকে প্রায় পনেরো-কুড়িজন যাবে। সেখানে তিনদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা, খেলাধুলো চলবে।

তপনদা নিরুপমের মাকে চেনেন। মা পাড়ার বস্তির ছেলেমেয়েদের সন্ধেবেলা বাড়িতে পড়ান। তপনদা কী করে যেন জেনেছিলেন, মা ওই রায়চৌধুরী পরিবারের মেয়ে।

মামাবাড়ির সঙ্গে যে নিরুপমদের কোনও সম্পর্ক নেই, সে কথা নিরুপম তপনদাকে লজ্জায় বলতে পারেনি। বরং মিথ্যে করে বলেছিল, হ্যাঁ, আমাদেরও নেমন্তন্ন আছে, কিন্তু আমার এই পরশুদিন জামশেদপুর যাওয়ার কথা।

তপনদা বলেছিলেন, আরে জামশেদপুর পরে যাবি। এই বাড়িটা তো আর দেখতে পাবি না। ভেঙে ফেলবে। চল-চল, আমার সঙ্গে চল, আমি গাড়িতে যাচ্ছি, তোর জায়গা হয়ে যাবে।

নিরুপমের লোভ হয়েছিল। ও বাড়ির কত গল্প শুনেছে। একটা ঝাড়লণ্ঠন আছে, সেটা বাতাসে দুললে যে টুংটাং শব্দ হয়, তাতে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা স্পষ্ট বোঝা যায়। একটা বাঘের মুন্ডু স্টাফ করা আছে, রাত্তিরবেলা তার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। বড় দিঘিটার ধারে একটা কামান আছে, তার গায়ে কী যে লেখা, আজও কেউ পড়তে পারেনি। সেই দিঘিটারই ঠিক মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের স্তম্ভ আছে, তার ওপরে ডানাওয়ালা গরুড়ের মূর্তি। ওই স্তম্ভের তলায় নাকি গুপ্তধন আছে। দিঘিটা এত গভীর, কেউ ডুব দিয়ে তলা পর্যন্ত যেতে পারে না। দু-একজন চেষ্টা করেছিল, তারা আর ভেসে ওঠেনি।

নিরুপম রাজি হয়ে গেল। সে ধরেই নিয়েছিল, একটু-আধটু অপমান সহ্য করতে হবে ঠিকই, কিন্তু একেবারে তাড়িয়ে দেবে না। গরিবের ছেলেদের তো নানারকম অপমান সহ্য করতেই হয়

যখন তখন, ওসব তার গা-সহা হয়ে গেছে। বাবার এক বন্ধু, নির্মলকাকা আগে দেখা হলে কত ভালো ব্যবহার করতেন! বাবার সঙ্গে কলেজে পড়তেন নির্মল সিংহ, বাবার মৃত্যুর আগে এ বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। এখন তিনি একটা বিদেশি কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়েছেন। তাঁর এখন চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাই নিরুপম একদিন দেখা করতে গিয়েছিল। সে বি-কম পাশ করে বসে আছে, একটা ছোটখাটো চাকরি কি পেতে পারে না? সেই নির্মলকাকার বাড়িতে আড়াই ঘণ্টা বসেছিল নিরুপম, তবু তিনি এক মিনিটের জন্যেও দেখা করতে পারেননি, এতই ব্যস্ত! সে বাড়িতে একজন সেক্রেটারি গোছের লোককে নিরুপম বার-বার বলেছিল, আপনি নির্মলকাকাকে আমার কথা বলেছিলেন, আমার বাবার নাম অতুল চ্যাটার্জি! সেই লোকটি বলেছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছি, আপনার স্লিপও দিয়েছি। তিনি না ডাকলে আমি কী করব বলুন! উনি আপনার নির্মলকাকা? লোকটি বাঁকাভাবে হেসেছিল, যেন নির্মল সিংহের মতন একজন হোমড়াচোমড়া লোক একটি বেকার ছেলের কাকা হতে পারেন না!

মাকে বলতে সাহস করেনি নিরুপম। মা নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন। মায়ের অহংকার খুব বেশি। কেউ-কেউ মাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, আজকাল মেয়েরাও সম্পত্তির অংশ পায়। মা মামলা করলেই রায়চৌধুরী পরিবারের সম্পত্তির কিছু ভাগ পেতে পারেন। মা সেসব কথায় কান দেন না। বাপের বাড়ি থেকে তিনি কিছুই নিতে চান না।

তা হলে কৃষ্ণকান্তপুরের ওই বাড়িটাতে মায়েরও কিছুটা অংশ আছে! মা নিতে চান বা না চান, নিরুপম নিজের অধিকারেই সেখানে যেতে পারে। তবু সে মাকে বলল, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঝাড়গ্রাম বেড়াতে যাচ্ছে।

তপনদার একটা জোঙ্গা জিপ আছে। জিপ না হলে অত খারাপ রাস্তা দিয়ে পৌঁছনো যেত না। সঙ্গে শুধু নীপা বউদি, ছেলেমেয়েদের আনেননি।

রায়চৌধুরীরা মাঝারি ধাঁচের জমিদার ছিল, গ্রামের লোকে কিন্তু বাড়িটাকে বলে রাজবাড়ি। দূর থেকেই দেখা যায়। জিপটা যখন গেটের সামনে থামল, নিরুপমের বুকটা ধক করে উঠেছিল। গল্প শুনে-শুনে বাড়িটার একটা ছবি নিরুপমের মনে গেঁথে গিয়েছিল, কিন্তু আসল বাড়িটা যেন তার চেয়েও বিশাল, সত্যিই সিনেমায় দেখা রাজবাড়ির মতন। লোহার গেটের পর অনেকখানি বাগান, তারপর থাক-থাক সিঁড়ি উঠে গেছে, ওপরে লম্বা চাতাল।

নিরুপম ভাবল, তার মা এই বাড়ির মেয়ে? অথচ, বিয়ের পর ভবানীপুরের ভাড়াবাড়িতে, দু-খানা ঘরের স্যাঁতসেঁতে ফ্ল্যাটে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলেন?

ওপরে চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন বিজুমামা। জমিদারি চলে গেছে অনেক দিন হল। তবু এ বংশের পুরুষদের চেহারা দেখবার মতন। বিজুমামা লম্বা-চওড়া মানুষ, টকটকে ফরসা রং, পাকানো গোঁফ, মাথায় বাবরি চুল। একখানা ড্রেসিং গাউন জাতীয় পোশাক পরে আছেন, মুখে চুরুট।

নিরুপম মামাবাড়ির চেহারা পায়নি। সে রোগা পাতলা, মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রং ফরসাও নয়, কালোও নয়। গোঁফ রাখেনি, তার বাবারও গোঁফ ছিল না। বিজুমামা বললেন, আরে এসো এসো, তপন! নীপা, কোনও কষ্ট হয়নি তো? এই বর্ষায় রাস্তাটা আরও খারাপ হয়ে গেছে! নীপা বউদি বললেন, কী দারুণ বাড়ি! এরকম বাড়িতে থাকব ভেবেই কী ভালো যে লাগছে!

ওঁদের পাশে নিরুপমকে দেখে বিজুমামা কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গে ভুরু কোঁচকালেন। চিনতে পারেননি বোঝাই যাচ্ছে।

নিরুপম তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, ভালো আছেন বিজুমামা? আমি নিরুপম, আপনার বোন বিদিশার ছেলে!

বিজুমামা একটু ঝুঁকে জিগ্যেস করলেন, কার ছেলে?

নিরুপম আবার বলল, আপনার বোন বিদিশা। আমার বাবার নাম অতুল চ্যাটার্জি।

বিজুমামা স্নেহের ভাব দেখিয়ে নিরুপমের কাঁধে দু-বার চাপড় মারলেন। লতুমামিমা কাছেই ছিলেন। তিনিও প্রথমে চিনতে পারেননি, পরিচয় পেয়ে খুশির ভাব দেখিয়ে বললেন, তোমাকে সে-বার যখন দেখি, তখন তোমার মাথার চুল ছিল না, তাই প্রথমটা চিনতে পারিনি। এসো, এসো—

অন্য অতিথিরা আগেই সবাই এসে গেছে। সব মিলিয়ে কুড়ি-বাইশজন, বাচ্চাদের নিয়ে। কেউ-কেউ কাজের লোকদেরও সঙ্গে এনেছেন।

এত বড় বাড়ি হলেও বেশির ভাগ ঘরই ব্যবহারযোগ্য নয়। কাজের লোকরা একতলায় থাকে, দোতলায় অতিথিরা। তিনতলায় দু-খানা মাত্র ঘর, সে দুটোর অবস্থাও খুব খারাপ।

নিরুপমকে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে, তা নিয়ে বিজুমামা ও তাঁর স্ত্রী একটুক্ষণ নিচু গলায় আলোচনা করলেন। লতুমামিমা বললেন, একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, অন্ধকার হলেও ভাঙাচোরা নয়, নিরুপম স্বচ্ছন্দে সেখানকার একটা ঘরে থাকতে পারে। ড্রাইভারদের ঘরটা অনেক বড়, চারখানা চৌকি পাতা আছে, তার মধ্যে দুটো চৌকি এখনও ফাঁকা।

বিজুমামা মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন। অন্য অতিথিরা কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে যাবে যে নিরুপম তাঁর ভাগ্নে। ছেলেটা যে প্রথমেই মামা বলে ডেকে ফেলেছে। সুতরাং এ বাড়ির ভাগ্নেকে ড্রাইভারের সঙ্গে শুতে দেখলে অতিথিরা অবাক হবে!

কিন্তু দোতলায় যে আর কোনও আস্ত ঘর নেই!

বিজুমামা বললেন, তিনতলার ঘরদুটো কি একেবারেই ব্যবহার করা যায় না? চলো তো গিয়ে দেখা যাক। নিরুপম, তোর ব্যাগটা নিয়ে আয়!

একটা ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, প্রায় ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। অন্য ঘরটার দেওয়ালে বড়-বড় ফাটল। ওপরে বটগাছ গজিয়ে গেছে, একটা জানলার সবকটা কাচ ভাঙা, বৃষ্টির সময় নির্ঘাত জল ঢোকে, কিন্তু ছাদটা ঠিক আছে। ভেতরে প্রচুর জিনিসপত্র ডাঁই করা রয়েছে, একটা খাটও আছে।

বিজুমামা বললেন, একটু সাফটাফ করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কী রে নিরুপম, তুই এখানে থাকতে পারবি না?

নিরুপম ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

বিজুমামা হাঁক-ডাক করে তিন-চারজন ভৃত্য জড়ো করালেন। নিরুপম নিজেও হাত লাগাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানা মোটামুটি বাসযোগ্য হয়ে গেল!

বিজুমামা নিরুপমকে বললেন, ছাদের ওপর ঘর, একলা থাকতে হবে, কী রে নিরুপম, তুই ভূতের ভয় পাবি না তো?

লতুমামিমা বললেন, ধ্যাত! ভূত আবার কী? আজকালকার ছেলেমেয়েরা ভূতটুত মানে নাকি?

বিজুমামা বললেন, যারা ভূতে বিশ্বাস করে না তারাও ভূতের ভয় পায়! সবাই নেমে যাওয়ার পর নিরুপম ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াল। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে লাল রঙের ছটা। মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে এখনও লুকিয়ে আছে আলো।

ঘরখানা নিরুপমের বেশ পছন্দ হয়েছে। একলা একখানা ঘরে থাকা তার অনেক দিনের শখ। ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে দুটি মাত্র ঘর, ছোট বোনটা থাকে মায়ের সঙ্গে এক ঘরে, আর একটা ঘর নিরুপমের নিজস্ব নয়, বরং তার ছোট ভাই দিন-দিন সেটা বেশি করে দখল করে নিচ্ছে, তার জিনিসপত্রই বেশি। রাত্তিরবেলা নিরুপম আলো জ্বেলে বেশিক্ষণ পড়াশুনো করতে গেলেই মুশকিল হয়, পাশের খাটে ঘুমিয়ে থাকে ছোট ভাই, সে ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বকে।

এখানে শুধু একখানা ঘর নয়, এত বড় ছাদটাও পাওয়া গেছে। প্রায় একটা ফুটবল গ্রাউন্ডের

মতন। পাঁচিলের পাশে দাঁড়ালে দেখা যাচ্ছে কত বড় সেই দিঘিটা। তার এক পাশে একটা বাড়ি, মনে হয় যেন আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

কতরকম গাছপালা, তাদের ওপর পড়েছে শেষ সূর্যের আলো। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরই নিরুপমের মনে হল, এখানে সে যেন আগে এসেছে! এই পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে ওই দিঘি, ওই পোড়ো বাড়িটা, ওই বাগান সে দেখেছে আগে।

॥ ২ ॥

ছাদের ঘরটার আর সবই ভালো, কিন্তু একটা মুশকিল হল, দোতলা বা একতলায় কী ঘটছে, তা টের পাওয়া যায় না। দোতলার বারান্দায় চা-জলখাবারের ব্যবস্থা, কিন্তু দুপুর ও রাত্তিরের খাওয়ার জন্য একতলায় যেতে হয়। সেখানে শ্বেতপাথরের এমন একটা লম্বা টেবিল আছে, যাতে অন্তত তিরিশজন মানুষ একসঙ্গে বসে খেতে পারে।

খেতে যাওয়ার জন্য নিরুপমকে কেউ ডাকতে আসেনি। সে গরিব আত্মীয়, নিমন্ত্রিতও নয়, তাকে ডাকার কথা কারুর মনে পড়েনি। নিরুপম একটা লাজুক, মুখচোরা ধরনের, সে নিজে থেকে নিচে নেমে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছিল। এ বাড়িতে কত রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হয় কে জানে!

এদিকে খিদে পেয়েছে বেশ। ছাদে খানিকক্ষণ পায়চারি করে খিদে আরও বেড়ে গেল। এক সময় সে গুটি-গুটি নেমে এল নিচে। দোতলায় কোনও সাড়াশব্দ নেই। একতলায় ডাইনিং রুমে অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। নিরুপম সে ঘরে ঢুকতেই তপনদা বললেন, আরে তুই কোথায় গিয়েছিলি? গ্রাম ঘুরতে বেড়িয়েছিলি বুঝি? আমাদের আদ্দেক খাওয়া হয়ে গেল!

বিজুমামা সস্নেহে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বললেন, নিরুপম, তোকে কত খোঁজাখুঁজি করা হল, গ্রামের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলি?

নিরুপম কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু লাজুকভাবে একটু হাসলেন। সে তো ছাদেই ছিল, তবে কোথায় তাকে খোঁজাখুঁজি করা হল?

চেয়ার খালি আছে, একটাতে বসে পড়ল নিরুপম। তার সঙ্গে অন্যদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হল না, কিন্তু কথাবার্তা শুনে-শুনে সে অনেকের পরিচয় আন্দাজ করে নিল।

বিজুমামার বন্ধুরা সবাই প্রৌঢ়, দেখলেই বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন পরিবারের মানুষ। একজন হচ্ছেন ব্যারিস্টার বিমান মিত্র, যিনি অর্ধেক ইংরেজি না মিশিয়ে বাংলা বলতে পারেন না। আর একজন, এক কালের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পি কে গুহ, এখন একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। অংশুমান জৈন নামে একজন মাড়োয়ারি বড়লোক রয়েছেন, তিনি পরিষ্কার, নির্ভুল বাংলা বলেন। এঁদের স্ত্রীদের বয়েসও চল্লিশের কম নয়। কেউ-কেউ সঙ্গে ছেলেমেয়েদের এনেছেন, সবাই ছোট-ছোট, প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করে না। শুধু একটি মেয়ের বয়েস কুড়ি-বাইশ বছর। নিরুপমের মতন সাতাশ বছরের যুবক একটিও নেই।

খাওয়াদাওয়া চলল প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে। পরোটা, সাদা ভাত, পোলাউ, তার সঙ্গে দু'রকম মাছ, খাসির মাংস, চাটনি, দই, কাঁচাগোল্লা। রীতিমতন ভোজ। খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে গল্প। বিজুমামা শোনালেন সেকালের জমিদারির বিলাসিতার কাহিনি, তিনি নিজে এসব দেখেননি, বাবা-কাকাদের কাছে শুনেছেন বোধহয়। এককালে ওই বড় দিঘিটায় কত মাছ ছিল তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে আড়ংঘাটা নামে গ্রামে আর একটা জমিদারি ছিল, সেখানকার

জমিদার সূর্যকান্ত কুণ্ডুর সঙ্গে রায়চৌধুরীদের ঝগড়া ছিল না মোটেই বরং বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তবে ভেতরে-ভেতরে একটা সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতাও ছিল নিশ্চয়ই। বিজুমামার ঠাকুরদা প্রভঞ্জন রায়চৌধুরীর সঙ্গে সূর্যকান্ত কলকাতায় রেস খেলতে যেতেন।

একদিন সূর্যকান্ত প্রভঞ্জনকে বললেন, আপনাদের কৃষ্ণকান্তপুরে নাকি বেশ ভালো বকফুল পাওয়া যায়? একদিন বকফুল ভাজা খেতে যাব!

প্রভঞ্জন বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আসুন, যে-কোনও দিন। সপরিবারে আসুন।

সূর্যকান্ত একটু বাঁকা হেসে বললেন, যে-কোনও দিন? ঠিক আছে, তাই যাব!

তিনি এলেন, এক প্রবল ঝড়-বৃষ্টির দিনে, রাত সাড়ে ন'টায়, সঙ্গে দেড়শোজন লোক!

কৃষ্ণকান্তপুরে সত্যিই অনেক বকফুলের গাছ আছে। কিন্তু একজন জমিদারকে তো শুধু বকফুল ভাজা খাওয়ানো যায় না। নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে হবে, তাও দেড়শোজন লোকের।

প্রভঞ্জন ঘাবড়ালেন না। তক্ষুনি তাঁর পাইক গিয়ে জেলেপাড়া থেকে সাতজন জেলেকে ডেকে আনল, বৃষ্টির মধ্যেই পুকুরে বেড়া-জাল টেনে তোলা হল অনেকগুলি রুই কাতলা। এর মধ্যে গ্রাম থেকে জোগাড় করা হল ছ'খানি খাসি। রাত বারোটার মধ্যে খাওয়ার রেডি, ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ-মাংস তো আছেই, তার সঙ্গে এক-পাহাড় বকফুল ভাজা!

গল্প শেষ হতেই শান্তনু সরকারের মেয়ে সুনীতা জিগ্যেস করল, বকফুল কী?

বড়রা সবাই হেসে উঠলেন। তপনদা বললেন, দেখেছ, এখনকার ছেলেমেয়েরা বকফুল কাকে বলে তা জানেই না!

ব্যারিস্টার বিমান মিত্র বললেন, ওদের আর দোষ কী? ইন ফ্যাক্ট্ আই হ্যাভ নেভার টেস্টেড বকফুল ভাজা!

তপনদা বললেন, মুচমুচে করে ভাজলে চমৎকার লাগে। এখনও পাওয়া যায়? আমি কাল খাব!

বিজুমামা বললেন, পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। খোঁজ করতে হবে।

শান্তনু সরকার বললেন, পুকুরে এখনও ওরকম মাছ আছে?

বিজুমামা হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, নাঃ! নিজেরা দেখাশুনো না করলে কি আর ওসব থাকে? পাঁচভূতে এসে সব লুটেপুটে খেয়ে নিয়েছে।

এরপর সবাই মিলে যাওয়া হল বাগানে। আকাশ মেঘলা, জ্যোৎস্না নেই, কিছু-কিছু ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

সুনীতা একবার কিসে যেন হোঁচট খেয়ে বলে উঠল, ওরে বাবা, সাপ নেই তো?

অন্যান্য মহিলারাও ভয় পেয়ে গেলেন। সবাই পা তুলে শব্দ করতে লাগলেন নানারকম।

সাপ থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

বিজুমামা বললেন, তা হলে ভেতরে চল। কাল সকালে আসা যাবে। মেয়েরা দৌড় দিল ভেতরের দিকে। ব্যারিস্টার বিমান মিত্র জিগ্যেস করলেন, গত দু-বছরের মধ্যে কেউ এখানে সাপের কামড়ে মরেছে? সেরকম কোনও রেকর্ড আছে?

বিজুমামা বললেন, না, সেরকম কিছু শুনিনি!

ব্যারিস্টারসাহেব আবার বললেন, আপনাদের ফ্যামিলিতে কেউ স্নেক বাটে মারা গেছে?

বিজুমামা বললেন, না।

ব্যারিস্টারসাহেব বললেন, দেন ইট ইজ ওকে! শুধু-শুধু ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

ভেতরে এসেও কিছুক্ষণ গল্প চলল।

নিরুপম সেসব গল্পে ঠিক যোগ দিতে পারছে না। প্রথম দিন আলাপেই সবাই তাকে আপন

করে নেবে কেন? সে শুধু তপনদার কাছে বিদায় নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওপরে ওঠার দু-খানা সিঁড়ি বারান্দার দু'দিকে। আলো ছিল না, তার টেনে বাল্‌ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে-সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল নিরুপম; তার বদলে উঠছে অন্য সিঁড়িটা দিয়ে। এক-একটা তলাই বেশ উঁচু। দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে গিয়ে সে দেখতে পেল ওপর থেকে তরতর করে নেমে আসছে একটি তরুণী। একটা লাল ডুরে শাড়ি পরা, আটপৌরে ধরনের, আঁচলটা কোমরে বাঁধা, অন্তত একশোজনের মধ্যেও চোখে পড়বার মতো লাবণ্যমাখা মুখ।

তরুণীটি নিরুপমকে দেখতে পেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। গভীর বিস্ময় ফুটে উঠল তার দু-চোখে। কী যেন বলতে গিয়েও বলল না, আবার নেমে গেল নিরুপমের পাশ দিয়ে।

নিরুপমও কম অবাক হয়নি। এ মেয়েটি কে? অতিথিদের কেউ নয়, খাবার টেবিলে ছিল না। সাধারণ কাজের মেয়ে বলেও মনে হয় না। কাজের লোকেরা প্রায় সবাই খাবার ঘরের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল। না, কাজের মেয়ে হতে পারে না কিছুতেই, শুধু সুন্দর মুখ নয়, সিঁড়ি দিয়ে নামবার ভঙ্গি, তাকানো, এতেও বোঝা যায়।

মেয়েটি একা-একা ছাদে এসেছিল কেন? নিরুপমকে দেখে সে কী বলতে চেয়েছিল?

সে একতলায় সিঁড়ির বাঁকে মিলিয়ে গেছে, তাকে আর দেখা গেল না। নিরুপম নিজের ঘরখানায় চলে এল। দরজাটা বন্ধ করা যায়। কিন্তু যে জানলার কাচগুলো সব ভাঙা, সেটা কিছু করার উপায় নেই। সেপ্টেম্বর মাস, শরৎকাল এলেও আকাশের মেঘ সাদা হয়নি, যে-কোনওদিন বৃষ্টি হতে পারে। দেখা যাক।

অনেক জিনিস সরানো হলেও এখনও কিছু-কিছু জিনিস রয়ে গেছে ঘরে। একটা ভাঙা চেয়ার, ব্যাডমিন্টনের ছেঁড়া র‍্যাকেট, খাটের নিচে কয়েকটা ছবি। একটা পাল্লা-ভাঙা আলমারি, অন্য পাল্লাটার গায়ে বড় আয়না।

দেওয়ালেও কয়েকটা ছবি ঝুলেছে, তার মধ্যে দু-খানা প্রাকৃতিক দৃশ্য, আর একটা বেশ বড় বাঁধানো ছবি, উলটে রাখা।

নিরুপম সে ছবিখানা সোজা করে দিল। একজন পুরুষের অয়েল পেইন্টিং। এক কোনে জল ঢুকে খানিকটা জায়গা নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু মুখটা স্পষ্ট বোঝা যায়। পুরুষটির বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি মনে হয় না, বিজুমামার ধাঁচেরই মুখখানা। ফরসা, চওড়া কপাল, মোটা গোঁফ। চোখ দুটি জ্বল-জ্বল করছে, ঠিক যেন জীবন্ত। এ ছবিটা কার? মা নিশ্চয়ই চিনতে পারতেন।

নিরুপম ছবিটা সোজা করে দিল। তারপর ঘরের অন্য কোনে গিয়ে দেখল, ছবির মানুষটি যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে। এক-একটা ছবি এরকম হয়, ডানদিক বা বাঁ-দিকে গিয়ে দেখলেও মনে হয় ছবির দৃষ্টিও বদলে যাচ্ছে। অনেক দুর্গা ঠাকুরের মুখও এরকম।

খাটের তলা থেকে অন্য ছবিগুলো বার করে দেখল নিরুপম। মনে হয়, বিদেশি শিল্পীদের আঁকা বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট। দুটিতে নগ্ন নারীর মূর্তি, খুবই অস্পষ্ট যদিও। জলে ভিজে একেবারে যা-তা অবস্থা। আর একটা ছবি ভার্জিন মেরির কোলে বাচ্চা যীশু। তাও কষ্ট করে চিনতে হয়। এ ছবিগুলো একেবারেই বাতিল করে দিতে হবে, শুধু ফ্রেমগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

খানিকবাদে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল নিরুপম। বিছানার গদি একেবারে ছেঁড়াখোড়া ছিল, কোনওরকমে ঠিকঠাক করে তার ওপরে একটা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে। নিরুপমের অসুবিধে হচ্ছে না।

মেয়েটির কথা আর একবার মনে পড়ল।

অন্য সময়ে এ বাড়িতে একজন বৃদ্ধ ম্যানেজার থাকেন, বয়েস প্রায় আশি। তাঁর ছেলেমেয়ে-

বউ কেউ নেই। তিনি বিজুমামাকে তুমি-তুমি বলে কথা বলেন। তিনি বলছিলেন, পনেরো বছর বয়েসে বাবার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিলাম, মায়া পড়ে গেছে, তাই একা-একা আগলে পড়ে আছি। এবার আমাকে ছুটি দাও, আমি কাশী চলে যাব।

ম্যানেজারবাবুর সংসারে কেউ নেই, তাহলে মেয়েটি কে হতে পারে? কাল দিনের বেলা নিশ্চয়ই জানা যাবে।

একটা ব্যাপারে নিরুপমের কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছে। ছাদে ওঠার পর থেকেই তার মনে হচ্ছে, সে এখানে আগে এসেছে। নিচের খাবার ঘরের অত বড় টেবিলটা দেখেও সে অবাক হয়নি, সে যেন সেটাও দেখেছে আগে। এমনকি বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুর মুখটাও চেনা-চেনা লাগছে।

কোনও জায়গা সম্পর্কে অনেক গল্প শুনলে, তারপর সেই জায়গাটায় সশরীরে গেলে চেনা লাগতেই পারে। মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছে, তাও ঠিক। কিন্তু সেরকম যেন নয়। দু-দিকে দুটো সিঁড়ির কথা তো মা কখনও বলেনি। তবু নিরুপম কী করে দু-বার দু-দিকের সিঁড়ি ব্যবহার করল স্বাভাবিকভাবে? দ্বিতীয় সিঁড়িটা দিয়ে না উঠলে সে ওই মেয়েটিকে দেখতে পেত না।

মেয়েটি খুব সম্ভবত এ ঘরে ঢোকেনি। অন্তত তার ঢোকার কোনও চিহ্ন নেই। অত রাতে সে ছাদে বেড়াতে এসেছিল? আর একটুক্ষণ কেন থাকল না, তাহলে তার সঙ্গে নিরুপমের ভাব হতে পারত।

ঘুম এসে গেল, ঘুমিয়ে পড়ল, কতক্ষণ ঘুমোল সে জানে না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। এ ঘরে ফ্যান নেই, কিন্তু গরমও লাগছে না। তবু ঘুম ভাঙল কেন? কে যেন এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। ঘরটা একেবারে মিশমিশে অন্ধকার নয়, আবছা মতন, তাতে বোঝা যায়, ঘরে কেউ নেই। তাহলে কে আসবে?

দু-এক মিনিট পরেই প্রচণ্ড শব্দে কয়েকবার মেঘ ডেকে উঠল। তার মধ্যে বিদ্যুৎ চমক। সেই বিদ্যুতের আলোয় চোখ পড়ল ছবিটার দিকে। ছবির পুরুষটিই জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

নিরুপম অবশ্য সেটা গ্রাহ্য করল না। ছবি আবার তাকায় নাকি? বিদ্যুতের আলো পড়লে এরকম জ্বলজ্বল করবেই। বিছানা থেকে উঠে নিরুপম ভাঙা জানলাটা দিয়ে আকাশ দেখল। হ্যাঁ, বেশ, মেঘ জমেছে।

বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা খুবই। আসুক বৃষ্টি, একতলায় ড্রাইভারদের সঙ্গে শোওয়ার বদলে এ ঘর অনেক ভালো।

বাতাস বইছে জোরে, ছাদের দরজাটা খোলা, তার এক পাল্লায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। একবার সেটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল, আবার খুলে গিয়ে শব্দ হতে লাগল সেরকম। এই শব্দ চলতে থাকলে ঘুম আসবে কী করে?

আলো জ্বেলে নিরুপম বাইরে বেরিয়ে এল। দরজাটার কাছে গিয়ে দেখল, সেটা সিঁড়ির দিক দিয়ে বন্ধ করা যায়, ছাদ থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। ছাদে দেওয়াল ভাঙা অনেক ইট-চাঙড় পড়ে আছে, সেরকম একটা চাঙড় তুলে এনে সে দরজা বন্ধ করে চাপা দিল। এবার নিশ্চিন্ত!

উঠে দাঁড়াতেই সে অন্যরকম একটা শব্দ পেল। খুব শীতে মানুষ যে-রকম ফু-র-র-র ফু-র-র- শব্দ করে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখল, পাঁচিলের ওপাশে, ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে।

নিরুপম দারুণ কিছু সাহসী না হলেও সে এটুকু অন্তত জানে যে জীবন্ত মানুষের কোনও ক্ষতি করার ক্ষমতা ভূতের নেই। ভূত মানুষের গলা টিপে ধরেছে, এটা গাঁজাখুরি গল্প। ভূত মানে

তো অশরীরী, তারা মানুষকে ছোঁবে কী করে? অনেকে ভয়েই মরে।

বিজুমামা বলেছিলেন, যারা ভূত বিশ্বাস করে না, তারাও ভূতের ভয় পায়। নিরুপমেরও বুকটা একবার কেঁপে উঠল ঠিকই।

তবু সে দুর্বল গলায় জিগ্যেস করল, কে? কে ওখানে?

সেই মনুষ্যাকৃতিটি এখনও ফুরফুর শব্দ করে যাচ্ছে।

নিরুপম আস্তে-আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল।

এরকম রাত্তিরবেলা, বহুকালের পুরোনো বাড়ি, ফাঁকা নির্জন ছাদ, এরকম সময় মানুষ যেন ইচ্ছে করেই চোখে ভুল দেখে।

নিরুপম দেখেছিল, ছাদের কার্নিসে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই অস্বাভাবিক ব্যাপার। কার্নিশের এ ধারে, ছাদে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তত অস্বাভাবিক মনে হত না। বাঁশটা কার্নিশের এধারেই বাঁধা, অন্যদিকের পাঁচিলের গায়েও একটা বাঁশ, বোধহয় এক সময় কাপড় শুকোবার জন্য মাঝখানে একটা দড়ি বা তার ছিল, এখন সেটা নেই। এদিকের বাঁশটার ডগায় একটা ঘুড়ি আটকে আছে, সেটা নিরুপম বিকেলেও দেখেছে। সেই ঘুড়িটাতেই ফু-র-র ফু-র-র শব্দ হচ্ছে, কোথা থেকে একটা কাপড়ের টুকরো এসে জড়িয়ে যাওয়াতে মানুষ-মানুষ দেখাচ্ছে!

নিরুপম কয়েকবার লাফিয়ে ঘুড়িটাকে ধরে ছিঁড়ে ফেলল। এবার সে আপনমনে হেসে ভাবল, দূর ছাই, এটা ও ভূত নয়? একবার একটা ভূত দেখা গেলে মন্দ হত না!

ঘরে ফিরে এসে আলো নেভাতে গিয়েই সে আবার চমকে উঠল। আলমারির পাল্লাটার গায়ের আয়নায় কার মুখ?

ওঃ, দেওয়ালের সেই ছবিটার। কিন্তু আশ্চর্য, ছবির চেয়েও আয়নার মুখটা একেবারে জীবন্ত মনে হয়েছিল! নিরুপম আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আড়াল পড়ে গেল সেই মুখ।

সে ছবিটার দিকে ফিরে তাকাল। ছবির মুখটায় এখন যেন রাগ-রাগ ভাব, চোখ দুটো বেশি জ্বলজ্বল করছে। শোওয়ার ঘরে এরকম একটা ছবি টাঙিয়ে রাখার কী মানে হয়? দেখতে মোটেই ভালো লাগে না। সেইজন্যেই কেউ ছবিটা উলটে রেখেছিল।

নিরুপমও ছবিটা উলটে দিল। তারপর তাকালো আয়নার দিকে। এখন সেখানে কোনও মুখ নেই।

আলো নিভিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল সে। ছাদের দরজাটায় আবার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। অতবড় চাঙড়টা সরে গেল কী করে? যাক গে, ও নিয়ে আর কিছু ভাবলে চলে না।

আবার প্রচণ্ড জোরে মেঘের শব্দ হল, নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও বাজ পড়েছে।

নিরুপম একটা সিগারেট ধরাল। তার বেশ ভালোই লাগছে। ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে অন্যরকম একটা রাত।

॥ ৩ ॥

ঘুম ভেঙে গেল বেশ সকালে। জানলা দিয়ে আলো এসে চোখে পড়েছে। রাতে বৃষ্টি হয়েছে দু-এক পশলা। কিন্তু খাটটা ওই ভাঙা জানলা থেকে কিছুটা দূরে, বৃষ্টির ছাঁট আসেনি।

প্রথমেই নজরে এল, দেওয়ালের ছবিটা আবার সোজা হয়ে গেছে, সেই মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিরুপমের ভুরু কুঁচকে গেল। তার স্পষ্ট মনে আছে, ছবিটা সে উলটে দিয়েছিল। নিজে-

নিজেই সোজা হয়ে গেল?

উঠে গিয়ে সে ছবিটা খুলে নামাল। একটা সাধারণ নরকোল দড়ি দিয়ে সেটা ঝোলানো ছিল, দড়িটা আলগা মতন, জোর বাতাসে নিজে-নিজেও উলটে যেতে পারে।

এবার সে দড়িটায় একটা গিট বেঁধে ঝুলিয়ে দিল আবার উলটো করে। এবার টাইট হয়েছে, নিজে-নিজে ঘুরবে না!

নিরুপমের গলাটা ব্যথা-ব্যথা করছে। নিশ্চয় ঠান্ডা লেগে গেছে শেষ রাতে। দু-বার গলা খাঁকারি দিল।

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলো, পুব আকাশে সূর্যের রং এখনও ডিমের কুসুমের মতন নরম লাল। কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাট থেকে তো আকাশই দেখা যায় না প্রায়। সূর্য তো দূরের কথা। এত তাড়াতাড়ি জাগেও না নিরুপম।

সূর্যের দিকে মুখ করে সে প্রণামের ভঙ্গিতে একটা শ্লোক উচ্চারণ করতে লাগল।

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহা দ্যুতিম /
ধ্বান্তারিং সর্ব পাপঘ্ন প্রণতোস্মি দিবাকরম...

বলতে-বলতে নিরুপমের হাসি পেয়ে গেল। গলার এ কী অবস্থা। খুব গম্ভীর-গম্ভীর শোনাচ্ছে। তার গলা সে নিজেই চিনতে পারছে না। নুন-জল দিয়ে গার্গল করতে হবে। কিন্তু কে তাকে গরম জল করে দেবে? নিচে গিয়ে চাইলে ঠাকুর-চাকররা তাকে পাত্তাই দেবে না। ওরা চট করে বুঝে যায়, মালিক পক্ষের কাছে কার খাতির আছে, কার নেই!

পরক্ষণেই তার মনে হল, কেন তাকে খাতির করবে না? সে কি কেউ না? তার মায়ের ভাগ আছে এ বাড়িতে।

এখন তার চা খাওয়া দরকার। অন্য সবাই জেগেছে কি না কে জানে! নিজের বাড়িতে তার ছোট বোন প্রত্যেকদিন ঠিক সাড়ে ছ'টায় এক কাপ চা করে এনে দেয়, সে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খায়। গরিবদেরও কিছু-কিছু বিলাসিতা থাকে।

নিরুপম নিচে নেমে এল। দোতলাটা এখনও নিঝুম। বেড়াতে এসেছে, সাত তাড়াতাড়ি জাগতে যাবে কেন? একতলায় কিছু-কিছু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

নিরুপম একেবারে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। যদি কালকের সেই মেয়েটির দেখা পাওয়া যায়। দুজন রান্নার লোক উনুনের ছাই সাফ করছে। এখানে তো গ্যাস নেই। এখনও কয়লার উনুন। একজনকে চায়ের কথা বলতে, সে জানাল, উনুন ধরাতে খানিকটা দেরি হবে!

স্টোভও নেই, এক কাপ চা হবে অত বড় উনুনে? নিরুপম একতলার এদিক-ওদিক ঘুরেও কোনও মেয়েকে দেখতে পেল না। সে ঠিকই ধরেছিল, ওই মেয়েটি ঝি বা রাঁধুনি শ্রেণির নয়। তা হলে কে?

বাগানে বেরিয়ে এসে খানিকটা সময় কাটাতে লাগল। বাগানের সবদিকে অবহেলার চিহ্ন। এত বড় বাগান ঠিকঠাক রাখার জন্য অন্তত তিনজন মালি রাখা দরকার। একজনও নেই বোধহয়।

এ বাড়ি ভেঙে কোল্ড স্টোরেজ হবে। তখন নতুন রাস্তা হবে, এ বাগানটাই বোধহয় থাকবে না। কেনই বা থাকবে! কোল্ড স্টোরেজ মানে অনেক টাকা, বাগান থাকা মানে জায়গা নষ্ট।

নিরুপম কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। এখানে কলেজ হতে পারে, হাসপাতাল হতে পারে, তবু তো বাড়িটা থাকবে! কত স্মৃতি আছে এ বাড়ির।

অবশ্য তার মতামতে কী-ই বা আসে যায়! মা কিছুতেই তাঁর দাবি জানাবেন না।

ঘুরতে-ঘুরতে নিরুপম দিঘিটার ধারে চলে এল। ঘাটের কাছে এসে সে কিছু না ভেবেই

ডানদিকে বেঁকল। মাঝে-মাঝে ঝোপঝাড় হয়ে আছে। তা ঠেলে এগোতে-এগোতে একটা গম্বুজ ঘর চোখে পড়ল, প্রায় ভগ্নদশা। তার মধ্যে উঁকি মারতেই চোখে পড়ল কামানটা।

নিরুপমের শরীর রোমাঞ্চিত হল। মায়ের কাছে সে এই কামানের গল্প শুনেছে বটে, কিন্তু সেটা দিঘির ঠিক কোন দিকে তা তো সে জানত না। সরাসরি ডানদিকে চলে এল কী করে?

কামানটার গায়ে আঁকিবুঁকি কাটা আছে এক জায়গায়। মনে হয়, ফার্সি ভাষায় কিছু লেখা আছে, অর্থাৎ নবাবী আমলের। এ ভাষা পড়ার বিদ্যে এখন এ তল্লাটে কারুর না থাকারই কথা। দিঘির পাড়ে একটা কামান বসিয়ে রাখার মানে কী? নিশ্চয়ই আগে অন্য কোথাও ছিল, পরে এখানে এনে রাখা রয়েছে। চোরেরা যে চুরি করে নিয়ে যায়নি, এই যথেষ্ট। গান-মেটালের দাম আছে।

মা যেমন বলেছিলেন, দিঘিটার ঠিক মাঝখানে একটা স্তম্ভও রয়েছে ঠিকই, তার ওপরে হাত জোড় করে গরুড় মূর্তি। তার নাক-কান ভাঙা। ওর তলায় গুপ্তধন আছে? নিরুপম ভালোই সাঁতার জানে, দুপুরবেলা ডুব দিয়ে দেখতে হবে।

ফিরে এসে নিরুপম দেখল, বাড়ির কর্তারা কিংবা অতিথিরা কেউ এখনও জাগেনি, কিন্তু উনুন ধরিয়ে চা বানিয়ে ফেলা হয়েছে নিরুপমের জন্যে নয়, ঠাকুর-চাকররা নিজেরা খাবে, কাপে নয়, কলাই করা বাটিতে চুমুক দিচ্ছে চায়ে। নিরুপমকেও তারা একটা বাটি বাড়িয়ে দিল, সে গম্ভীর গলায় বলল, আমাকে কাপে দাও? কাল সকালে আমাকে ওপরের ঘরে চা দিয়ে আসবে!

চা খেয়ে, নিচেই প্রাতঃকৃত্য সেরে, নিরুপম উঠে এল ছাদে। সেই বাঁশের পোলটার গায়ে এখনও একটা সাদা কাপড়ের টুকরো জড়ানো। ঘুঁড়িটা ছেঁড়া। সাদা কাপড়ের টুকরোটা কোথা থেকে উড়ে এসেছিল কে জানে!

নিজের ঘরে ঢুকেই আবার সে চমকে গেল। আলমারির পাল্লার আয়নায় সেই গোঁফওয়ালা পুরুষটির মুখ। সঙ্গে-সঙ্গে সে উলটোদিকে ফিরে দেখল, দেওয়ালে ছবিটা নেই। ছবিটা কোথায় গেল? ছবিটা নেই, অথচ আয়নায় সেটা দেখা যাচ্ছে কী করে?

এ রহস্যেরও সমাধান করতে দেরি হল না। দড়ি ছিঁড়ে ছবিটা নিচে পড়ে গেছে। নারকোল-দড়িটা এতদিন কোনওক্রমে টিকে ছিল। পড়ার পর ছবিটা সোজা হয়ে গেছে আবার, তারই প্রতিফলন হয়েছে আয়নায়। খানিকটা তেরছাভাবে।

এ ছবিটা তো খুব জ্বালাচ্ছে। নিরুপম ঠিক করল, এ ছবিটা ঘর থেকে সরিয়ে দিতে হবে! ফেলে তো দিতে পারে না। চালান করে দেবে খাটের নিচে।

ছবিটা কাছে নিয়ে সে আর একবার দেখল। কে ইনি, তা সে জানে না। এ বংশেরই উল্লেখযোগ্য কেউ হবে নিশ্চিত, নইলে এত অল্প বয়সে অয়েল পেইন্টিং আঁকানো হবে কেন? বেশ সুপুরুষ, আর তেজী মুখের ভাব। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এর চোখ দুটিতে।

ছবিটা সে খাটের নিচে অন্য ছবির সঙ্গে রেখে দিল। রাত্তিরে পরা পাজামা-পাঞ্জাবি পালটে সে পরে নিল প্যান্ট শার্ট। নিচে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে হবে। কটার সময়, নিরুপম ঘড়ি পরে না, রোদ্দুরের রং দেখে সময় বোঝে। অনেকটা মেলে।

সাড়ে ন'টার সময় নিচে নেমে এসে নিরুপম দেখল ডাইনিং রুমে সবাই এসে গেছে। টেবিলের ওপর বড়-বড় পরাতে ডাঁই করা টোস্ট, ওমলেট আর সুজির পায়েস। বড়োরা অনেকেই বাসি জামা-কাপড় ছাড়েনি, চুল আঁচড়ায়নি, বেশ আলস্যের মেজাজ। ছোটরা হুটোপাটি করছে। আরও খাবার আসছে রান্নাঘর থেকে।

নিরুপমের দিকে কেউ লক্ষ্যও করল না। লতুমামিমার সঙ্গে চোখাচোখি হল, তবু তিনি মুখ ফিরিয়ে গল্প করতে লাগলেন ব্যারিস্টার গিন্নির সঙ্গে। তপনদা বিজুমামার সঙ্গে কী যেন একটা

আলোচনায় মেতে উঠেছেন।

নিরুপমের হঠাৎ কী মনে হল, সে আবার উঠে গেল ওপরে। সিগারেট-দেশলাই আনা হয়নি, সে আজ ডাইনিং রুমে বসেই সিগারেট টানছে। অন্যরাও তো খায়। সে এমন কিছু ছোট নয়!

সিগারেট-দেশলাই পকেটে ভরবার পর, সে খাটের নিচ থেকে গোঁফওয়ালা লোকটির ছবিটাও টেনে বার করল। এই লোকটি কে, তা না জানা পর্যন্ত তার কিছুতেই স্বস্তি হচ্ছে না।

ছবিটা নিয়ে সে সোজা বিজুমামার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল বিজুমামা, এটা কার ছবি?

উত্তর দেওয়ার বদলে বিজুমামা অবাক হয়ে নিরুপমের দিকে তাকালেন, তারপর জিগ্যেস করলেন, তোর গলায় কী হয়েছে?

নিরুপম অপ্রস্তুতভাবে বলল, কাল রাত্তিরে ঠান্ডা লেগে গেছে! তপনদা বললেন, খুব ভারি হয়ে গেছে গলার আওয়াজ। বিজুমামা বলল, চেনাই যাচ্ছে না!

তারপর ছবিটা নিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, এটা কোথায় পেলি? কোথায় ছিল?

নিরুপম বলল, ওপরের ঘরের দেওয়ালে। ওলটানো অবস্থায় ছিল! বিজুমামা খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, ধূর্জটি নারায়ণ, আমাদের ঠাকুরদার ছোট ভাই। আমরা বলতাম, খুড়ো ঠাকুর! খুব শৌখিন আর চালিয়াৎ ছিলেন।

তারপর ছবিটা তিনি নিরুপমকে ফেরত না দিয়ে নামিয়ে রাখলেন পাশে।

বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবু কিছু বলবার জন্যে বিজুমামার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আড়চোখে নিরুপমের দিকে তাকালেন।

বিজুমামা নিরুপমকে অগ্রাহ্য করে আবার কথা শুরু করলেন তপনদার সঙ্গে। তিনি বললেন, বাঙালির চিরকালের জলখাবার, বিশেষত ছুটির দিনে, লুচি আর আলু পেঁয়াজের তরকারি। সঙ্গে খানিকটা মোহন ভোগ। কিন্তু এখনকার বাচ্চারা লুচি খেতেই চায় না। টোস্ট খেতেই হবে। তাই তো পাউরুটি আনিয়েছি অনেক দূর থেকে।

ব্যারিস্টারসাহেব বললেন, আমিও টোস্ট প্রেফার করি। কিংবা স্যান্ডুইচ। লুচি-টুচি বড্ড মেসি!

তপনদা বললেন, আগে আমরা অসুখ হলে টোস্ট খেতাম। লুচির সঙ্গে টোস্টের তুলনা হয়! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা গরম-গরম লুচি, পাশের ঘর থেকে পর্যন্ত গন্ধ পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে একটু ঝাল-ঝাল মাংস।

বিজুমামা বললেন, খাঁটি ঘি আর পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? এখন তো বাদাম তেলে ভাজা লুচি। আগেকার আমলে কত্তারা আধ কড়াই ভরতি ঘি-তে ভাজা লুচি খেতেন, একবার ভাজা হলে সেই ঘি ফেলে দেওয়া হত!

নিরুপম আশা করেছিল, বিজুমামা ওই ছবিটা দেখে আর একখানা গল্প ফাঁদবেন, কিন্তু সেদিকে গেলেন না।

নিরুপম অন্যদিকে সরে গিয়ে একটা প্লেটে খাওয়ার তুলে নিল। অন্য সবাই ছোট-ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্পে মেতে আছে। কেউ তার সঙ্গে গল্প করছে না। এত লোকের মধ্যেও সে একা।

এক সময় এই একাকিত্ব তার অসহ্য লাগল। খাবার-দাবার শেষ হয়ে গেছে, কেউ-কেউ দ্বিতীয় বার চা খাচ্ছে। বিজুমামা চুরুট টানছেন, ব্যারিস্টারসাহেব পাইপ। নিরুপম সিগারেট ধরাবার কথা ভেবেও ধরাল না। তার বদলে সে একটা চমকপ্রদ কাণ্ড করল।

চেয়ারের ওপরে পা দিয়ে সে ডাইনিং টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর হাততালি দিয়ে বলল, সাইলেন্স! সবাই একটু চুপ করুন। আমি একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাচ্ছি।

তার গম্ভীর গলা শুনে সবাই চুপ করে গেল একসঙ্গে। সিলিং থেকে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে।

ইলেকট্রিক এসে গেলেও অনেক ঝাড়লণ্ঠন সরানো হয়নি। নিরুপমের হাতে একটা চামচ। সেটা দিয়ে সে ঝাড়লণ্ঠনটা খুব জোরে দুলিয়ে দিল।

প্রিজম্‌গুলোতে ঝনঝন ঝন শব্দ হতে লাগল। তারপর দুলুনি কমে এলে এক-একটায় আলাদা শব্দ হতে লাগল, জলতরঙ্গে যেমন শোনা যায়, স্পষ্ট সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা!

সবাই মুগ্ধ, কেউ-কেউ বলল, অদ্ভুত তো! বিজুমামা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, হ্যাঁ, এই ঝাড়লণ্ঠনটা এরকম, ভুলেই গিয়েছিলুম...তুই জানলি কী করে নিরু?

লতুমামিমা তীক্ষ্ণস্বরে জিগ্যেস করলেন, নিরুপম, তুমি কি এ বাড়িতে আগে এসেছ? আমরা যখন থাকি না...

নিরুপম দু-দিকে মাথা নেড়ে নেমে পড়ল। সে লজ্জা পেয়ে গেছে। লোকজনের সামনে এরকম দেখানেপনা তার স্বভাবে একেবারেই নেই! সে কী করে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ওরকম নাটকের মতন চিৎকার করল!

ঝাড়লণ্ঠনের গল্পটা সে তার মায়ের কাছে শুনেছিল। কিন্তু দোতলাতেও কয়েকটা ঝাড়লণ্ঠন আছে। খাবারের ঘরেরটাই যে সেটা, সে কী করে আন্দাজ করল? নিজেই বুঝতে পারছে না!

নিরুপম প্রায় পালিয়েও গেল সেখান থেকে।

উঠোনের উলটোদিকের কোনের ঘরে ম্যানেজারবাবু ঢুকেছেন, সেও ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। ইনি যেন তাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

ম্যানেজার বললেন, বসো বাবা, বসো! তুমি তো বিদিশা দিদিমণির ছেলে? তোমার মাকে কত ছোট দেখেছি। এ বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে কত দৌড়াদৌড়ি করেছে! তোমার মায়ের এখন বয়েস কত হবে? বড় জোর বছর পঞ্চাশেক, তাই না?

নিরুপম বলল, হ্যাঁ।

—তোমার বাবার কথা, তিনি চলে গেছেন, সে খবরও পেয়েছি! আহা, কতই বা বয়েস হয়েছিল! এমন ভালোমানুষ...তোমার মা কি কোনও কাজটাজ করেন?

—হ্যাঁ, মা লাইফ ইনসিওরেন্সে কাজ করেন। মা-ই তো সংসার চালাচ্ছেন, আমি এখনও চাকরি পাইনি। প্রাইভেটে এম. কম. দেব।

—ইস, এ বাড়ির কত্তারা কী রকম হৃদয়হীন ছিলেন! বিয়েটা কিছুতে মেনে নিতে পারল না গো! অথচ তোমার বাবা তো পাত্র হিসেবে খারাপ ছিলেন না। শিক্ষিত, সৎ, চেহারাও ভালো, জাতেও নিচু নয়।

—আমার বাবা ছিলেন গরিব ইস্কুল মাস্টার।

—গরিব তো কি হয়েছে? আদর্শবাদী পুরুষ, টাকা পয়সার পেছনে ছোটেননি কখনও। আমি গ্রামে পড়ে থাকলে কী হয়, সব কথাই কানে আসে। জানো তো, গরিব ঘরের ছেলে বড়লোকের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করলে তারপর সেও প্রাণপণে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে। যে-কোনও উপায়ে। তোমার বাবা কি ইচ্ছে করলে তা পারতেন না? কোনও-কোনও মাস্টার অসৎপথে গিয়ে বড়লোক হয়।

—আমার বাবা তা পারতেন কিনা জানি না। সেরকম চেষ্টা করেননি, এটা ঠিক।

—তোমার মাকেই বা চাকরি করতে হবে কেন? রায়চৌধুরীদের এখন পড়তি অবস্থা হলেও অনেক জায়গায় টাকাপয়সা লগ্নি করা আছে। কলকাতায় ক'খানা বাড়ি। অনেকে তো কিছুই কাজকর্ম করে না, বাড়ি ভাড়ার টাকা আর সুদের টাকায় বসে-বসে খায়। তোমার মাকে একটা মাসোহারা দিতে পারে না? তার ন্যায্য পাওনা।

—দিলেও মা নেবেন না। এতকাল কোনও সম্পর্ক রাখেননি, আমার মা খুব জেদী।

—আহা গো, শুনলেও আনন্দ হয়! মানুষের তো আত্মসম্মানটাই বড় কথা। টাকাপয়সা কারুর আছে, কারুর নেই, কিন্তু যে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে, সেও তো খাঁটি মানুষ! তুমি বিদিশা দিদিমণির ছেলে, তোমায় দেখে বড় ভালো লাগল। এখানে এসেছ, বেশ করেছ।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—আমার বয়েস এখন একাশি। এসেছিলাম চোদ্দ না পনেরো বছর বয়েসে, তবেই বুঝে দেখো।

—বাব্বাঃ, এতগুলো বছর এই এক বাড়িতে। নিশ্চয়ই মায়া পড়ে গেছে। এটা ভেঙে ফেললে আপনার কষ্ট হবে না?

—তা তো হবেই। কিন্তু আমার কথা কে আর শুনছে। আমি তো সামান্য কর্মচারী। আগেকার কত্তারা তবু আমার পরামর্শ নিতেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো আমাকে ভালো করে চেনেই না।

—আমার মা আপনাকে কী বলে ডাকতেন?

—ম্যানেজারকাকা।

—তা হলে আপনি আমার ম্যানেজারদাদু হলেন। আচ্ছা ম্যানেজারদাদু, আপনি তো অনেক সময় একা থাকেন। রাত্তিরবেলা আপনার ভয় করে না?

—ভয় করবে কেন? এ বাড়ির প্রতিটি ইট-কাঠ আমার চেনা। একা-একা সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াই।

—না, মানে, পুরোনো বাড়ি, অনেকে বলে ভূতটুত আছে।

—আমি তো ভূত বলি না, অতৃপ্ত আত্মা। অতৃপ্তি নিয়ে কেউ মরলে আবার ফিরে-ফিরে তো আসতেই পারে।

—আপনি কখনও দেখেছেন!

—হ্যাঁ দেখি, একটু সরে দাঁড়াই। ক্ষতি তো কিছু করে না। ক্ষতি করবে কেন, তারা দেখতে আসে, চলে যায়! তুমিও যদি কিছু দেখেটেখে ফেলো, ভয় পেও না! ভয়ের কিছু নেই, কেউ তোমার ক্ষতি করবে না!

—ম্যানেজারদাদু, এ বাড়িতে কী একটি মেয়ে আছে, বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, পাতলা, ছিপছিপে, একটু কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, গায়ের রং বেশ ফরসা।

—না, ওরকম তো কেউ নেই!

—বাইরের কেউ এসে ঢুকেও পড়বে না নিশ্চয়ই?

এর উত্তর না দিয়ে ম্যানেজারবাবু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন নিরুপমের মুখের দিকে। একটু পরে আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, ও নিয়ে কিছু ভেবো না। শোনো, তোমাকে একটা কাহিনি বলি। তোমার মা যা করেছিলেন, এ বংশে আগেও একবার সেইরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল।

নিরুপম বেশি-বেশি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, তাই নাকি? বিয়ে নিয়ে গন্ডগোল?

ম্যানেজার বললেন, তুমি যাঁর ছবিটা নিচে নিয়ে এলে, কুমার ধূর্জটিনারায়ণ, তাঁকে তো আমি দেখেছি। প্রভঞ্জন রায়চৌধুরীর ছোট ভাই, অমন মানুষ খুব কম দেখা যায়। সবাই ধরে নিয়েছিল প্রভঞ্জন রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর ধূর্জটিনারায়ণ হবেন জমিদার। দুই ভাইয়ে এক সময় ভাবও ছিল খুব। ধূর্জটিনারায়ণ লেখাপড়া শিখেছিলেন, তা ছাড়া খেলাধুলোতেও ভালো, সাঁতার, কুস্তি, তলোয়ার চালানো শিখেছিলেন, শখ করে। পাত্র হিসেবে খুবই যোগ্য, অনেক জমিদার বাড়ি থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসছিল, এমনকি কুচবিহারের রাজবাড়ি থেকেও তাঁকে জামাই করতে চাওয়া হয়েছিল। কুচবিহারের রাজার এক শালা কলকাতায় এক নেমন্তন্ন বাড়িতে ধূর্জটিনারায়ণকে দেখে পছন্দ করে ফেলেছিলেন খুব। কিন্তু ধূর্জটিনারায়ণ বিয়ে করতে রাজি নন। বিয়েতে তাঁর মন নেই। হঠাৎ একদিন

নিজেই তিনি পাত্রী ঠিক করে ফেললেন।

নিরুপম জিগ্যেস করল, গরিব বাড়ির মেয়ে?

ম্যানেজার বললেন, রায়চৌধুরীদের তুলনায় গরিব তো বটেই। তবে নেহাৎ হা-ঘরের পরিবারের নয়। মেয়েটির বাবার তাঁতের কাপড়ের ব্যাবসা। অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল। আসল হচ্ছে জাতের অমিল। তখনকার দিনে জাতের সামান্য অমিল নিয়ে কী যে বাড়াবাড়ি করা হত, তা তোমরা এখনকার ছেলেরা কল্পনাও করতে পারবে না। এই জাতের নামে বজ্জাতি করেই তো হিন্দুসমাজ ডুবতে বসেছিল। এই রায়চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ, আর মেয়ের পদবী সাহা, তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের তুলনায় খুবই নিচু জাত মনে করা হতো, বিবাহ একেবারে অচল। সুতরাং প্রবল আপত্তি উঠল, বুঝতেই পারছ!

নিরুপম জিগ্যেস করল, ধূর্জটিনারায়ণ ওই সাহাবাড়ির মেয়েকে পছন্দ করবেন কী করে? গল্পে পড়া যায়, নদীর ঘাটে কোনও সুন্দরী মেয়েকে স্নান করতে দেখলে জমিদাররা পছন্দ করে ফেলতেন, হুকুম দিতেন এ মেয়েকে আমার চাই! সেই ভাবে?

ম্যানেজার বললেন, ধূর্জটিনারায়ণ সে চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। এই জমিদার বংশটার আর যাই দোয থাক, মেয়েদের নিয়ে বেলেল্লা করার দোষ ছিল না। অন্তত আমি যতদিন আছি, সেরকম কিছু দেখিনি। এঁরা বরং খানিকটা নীতিবাগীশ। না, নদীর ঘাটে নয়, মেয়েটিকে ধূর্জটিনারায়ণ দেখেছিলেন এক জঙ্গলের মধ্যে। ওনার পাখি শিকারের শখ ছিল। এদিকে তো তখন অনেক বন-জঙ্গল ছিল, প্রায়ই বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে যেতেন। দলবল নিয়ে না, একা! সেইরকমই একদিন জঙ্গলে পাখি মারছেন, এক সময় দেখলেন, ঝোপঝাড় ঠেলে একটি ষোলো-সতেরো বছরের কন্যা আর একটি দশ-বারো বছরের বালক এগিয়ে আসছে। মেয়েটির নাম প্রীতিলতা, ছেলেটির নাম বলাই। মেয়েটির হাতে একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ, তাতে আলতা দিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা, 'এখানে পাখি মারা নিষেধ!'

নিরুপম জিগ্যেস করল, তখনকার দিনে, সাহা বাড়ির মেয়ে লেখাপড়া জানত?

ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ গো। ওই সাহাদের বাড়িতে লেখাপড়ার চল ছিল। ছেলেরা ইস্কুলে যেত, মেয়েরা যেত না বটে, দাদাদের কাছে পড়তে লিখতে শিখে নিত। তারপর শোন, ধূর্জটিনারায়ণ সেই লেখা দেখে হেসে জিগ্যেস করল, পাখি মারা কে নিষেধ করল? এই জঙ্গল কি তোমাদের? এই জঙ্গল তো জমিদারের সম্পত্তি! তা শুনে সেই মেয়ে কী বললে জানো? বন্দুকধারী সেই জমিদারের চোখের দিকে তাকিয়ে সরলভাবে বলল, কিন্তু আকাশের মালিক তো জমিদার নয়! পাখিরা আকাশে উড়ে বেড়ায়, তাদের কেন মারবেন? ধূর্জটিনারায়ণ বললেন, তা হলে তুমি বুঝি আকাশের মালিক? তাই বারণ করতে এসেছ? প্রীতিলতা তাই শুনে মুখ নিচু করলেন, ছলছলিয়ে এল চোখ। আপন মনে বলল, পাখিরা তো মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। তবু কেন মানুষ তাদের মারে? বলাই তার হাত ধরে টেনে বলল, চল, দিদি চল। প্রীতিলতা কান্নাভেজা চোখে ধূর্জটিনারায়ণের দিকে একটা দৃষ্টি হেনে ফিরে যেতে লাগল, আর ওই কান্না দেখেই মজে গেলেন ধূর্জটিনারায়ণ।

নিরুপম হেসে বললেন, আপনি তো বেশ ভালো গল্প বলতে পারেন। এর কতটা সত্যি আর কতটা এখন বানাচ্ছেন?

ম্যানেজার বললেন, একটুও বানাচ্ছি না। সেই সময় আমারও বয়েস বেশি না। ধূর্জটিনারায়ণ আমার সঙ্গে বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন, তিনি নিজে আমাকে সব বলেছেন। আমার বাবা তখন ম্যানেজার, আমার বিশেষ কিছু দায়িত্ব ছিল না। আমি ধূর্জটিনারায়ণকে কিছু-কিছু সাহায্য করেছিলাম। তোমার যদি শুনতে ইচ্ছে না করে, তা হলে থাক!

নিরুপম ব্যস্ত হয়ে বলল, না, পুরোটা আমাকে শুনতেই হবে! তারপর কী হল বলুন।

ম্যানেজার বললেন, প্রীতিলতার কান্না দেখে ধূর্জটিনারায়ণ সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি জীবনে আর পাখি শিকার করবেন না। প্রীতিলতা আর বলাইয়ের সঙ্গে তিনি ওদের বাড়িতে গেলেন। তারপর থেকে প্রায়ই যেতে লাগলেন। তাই নিয়ে পাঁচ-কথা রটতে লাগল। যে বাড়িতে ওরকম সোমত্ত মেয়ে আছে, সে বাড়িতে জমিদারের ছেলে যাওয়া-আসা করলে লোকে অকথা-কুকথা বলবেই। তা ধূর্জটিনারায়ণেরও কানে এল, তখন তিনি প্রীতিলতার বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানালেন। অমনি ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। একে জমিদার-নন্দন, তায় ব্রাহ্মণ, তার সঙ্গে এ গ্রামেরই এক সাহাবাড়ির মেয়ের বিয়ে তো অকল্পনীয়। সবাই ছি-ছি করতে লাগল, ধূর্জটিনারায়ণের মা তখনও বেঁচে, তিনি শাপ দিলেন, তাঁর দাদা প্রভঞ্জন রাগের চোটে বলে উঠলেন, তাঁর ছোট ভাই যদি মরেও যায়, সেও ভালো, তবু সাহাদের মেয়ে এ পরিবারের বউ হতে পারবে না। ধূর্জটিনারায়ণেরও দারুণ জেদ। তিনি ও মেয়েকে বিয়ে করবেনই। এমনকি জমিদারিতে নিজের ভাগ ছেড়ে দিয়ে দূরে চলে যেতেও রাজি। তাঁর দাদা তাতেও রাজি নন। এ বিয়েতে বংশের গায়ে যে কলঙ্ক লাগবে, তা কোনওদিন মুছবে না। তোমার বাবা তো শুধু গরিব ছিলেন, কিন্তু জাতের অমিল ছিল না, এই জাতই যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

নিরুপম জিগ্যেস করল, পাত্রীপক্ষ রাজি ছিল?

ম্যানেজার বললেন, রাজি না হওয়ার কারণ নেই। ধূর্জটিনারায়ণ দুশ্চরিত্র নন, জমিদারের ছেলে হয়েও মদ্যপান করতেন না, খেলাধুলো আর পড়াশুনো নিয়ে থাকতেন, পাত্র হিসেবে আদর্শ। তবে শেষের দিকে প্রীতিলতার বাবা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী হয়তো তাঁদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তাই মেয়েকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে চাইছিলেন। প্রীতিলতা বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিল, এ বিয়ে না হলে সে জীবনে আর বিয়েই করবে না! তখন একদিন মাঝরাত্তিরে ধূর্জটিনারায়ণ গোপনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, সেপাই সান্ত্রীদের চোখে ধুলো দিয়ে আমি সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। প্রীতিলতাকেও আগে থেকে জানানো ছিল, দুজনে চলে যাবেন বহুদূরে!

নিরুপম বলল, বাঃ তারপর ওঁরা বিয়ে করে কোথায় সেট্‌ল করলেন?

ম্যানেজার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আচ্ছন্ন গলায় বললেন, ওঁদের বিয়ে হয়নি।

নিরুপম বললেন, সে কি! এর পরেও বিয়ে হল না, মানে?

ম্যানেজার বললেন, তোমার মা যা পেরেছিলেন, ধূর্জটিনারায়ণ তা পারেননি। ওঁর ভাগ্যে ছিল না। সেই রাতেই, প্রীতিলতার সামনেই ধূর্জটিনারায়ণ খুন হয়ে গেলেন। কেউ একজন পেছন থেকে তাঁকে গুলি করেছিল!

নিরুপম আঁতকে উঠে বলল, সে কি? কী সাংঘাতিক ব্যাপার। কে গুলি করল?

ম্যানেজার বললেন, আততায়ী ধরা পড়েনি। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এই খুনের কিনারা করতে পারেনি। কেউ-কেউ বলে, মহিম নামে সেসময় এক দুর্দান্ত ডাকাত ছিল, তারও নাকি নজর পড়েছিল প্রীতিলতার ওপর, সেই মহিমই খুনটা করে পালিয়ে যায়। মহিম ছাড়া অত সাহস আর কার হবে! আবার কেউ-কেউ এমন কথাও বলেছে...তা তোমাকে বলছি, মামাদের সামনে যেন কখনও উচ্চারণ কোরো না, কেউ-কেউ বলেছে, এই কলঙ্ক আটকাবার জন্য এই বংশের কর্তারাই ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে ধূর্জটিনারায়ণকে খুন করিয়েছিলেন। ধূর্জটিনারায়ণের নাম এ পরিবারে আর কেউ উচ্চারণ করে না। ছবিটা কোনওক্রমে থেকে গিয়েছিল, দেখবে, এবারে নষ্ট করে ফেলবে!

নিরুপম জিগ্যেস করল, আর প্রীতিলতা? তার কী হল?

ম্যানেজার বললেন, সে কথা রেখেছিল। আর বিয়ে করেনি তো বটেই, দেড় বছরের মাথায় সে আত্মহত্যা করে। এরপর কী আর তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল?

ম্যানেজারের গলা ধরে এল, তিনি ধুতির খুঁট তুলে চোখ মুছলেন। আপনমনে বললেন, কতকাল কেটে গেছে, এখনও আমি ভুলতে পারি না। অপঘাতে দুজনেরই মৃত্যু, হয়তো ওদের আত্মা এখনও মুক্তি পায়নি। কত না অতৃপ্তি নিয়ে গেছে। বড় দুঃখী আত্মা। কী জানি, হয়তো দুজনে এখনও দুজনকে খুঁজে বেড়ায়।

॥ ৪ ॥

ছাদে বাথরুম নেই, নিরুপমকে একতলায় এসে ওসব সারতে হয়। দোতলার অতিথিরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পুকুরে স্নান করে না, তাদের জন্য বালতি-বালতি গরম জল যায়। নিরুপম ঠিক করল, সে পুকুরে নামবে।

তোয়ালে নিয়ে বাইরে এসে দেখল, তপনদা কোথা থেকে একটা ঘোড়া জুটিয়েছেন, ছোটখাটো ঘোড়া, তার পিঠে চেপে বাগানে চক্কর দিচ্ছেন, ছোট ছেলেমেয়েরা দৌড়োচ্ছে তাঁর পেছনে-পেছনে। তারাও ঘোড়ায় চাপতে চায়।

নিরুপম একবার মাত্র দার্জিলিঙে গিয়ে ঘোড়ায় চেপেছিল। সেটা একবার একটু জোরে দৌড়োতেই বেশ ভয় লেগেছিল তার। আর ঘোড়ায় চড়ার শখ নেই।

পুকুরঘাট থেকে খানিকটা দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে ছিপ ফেলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন ব্যারিস্টারসাহেব। বিজুমামা ও আরও কয়েকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে। সকলেরই হাতে বীয়ারের বোতল। হাসাহাসি, গল্প চলছে। নিরুপম ভাবল, ওরকম জোরে-জোরে কথাবার্তা বললে মাছ ওঠে নাকি? লবডঙ্কা হবে!

সে জলে নেমে পড়ল। জল তেমন পরিষ্কার নয়। মাঝে-মাঝে শালুক ফুটে আছে, কিছু পানা ভেসে বেড়াচ্ছে। সাঁতরে সে মাঝখানের গড়ুর স্তম্ভটার কাছে চলে এল। ভাঙা মূর্তিটা জড়িয়ে ধরে একটুক্ষণ দম নিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, বিজুমামা, এর নিচে নাকি গুপ্তধন আছে? বিজুমামা বললেন, লোকে তো বলে শুনেছি, তুই জানলি কী করে? নিরুপম বলল, চেষ্টা করে দেখা যাক, কিছু পাওয়া যায় কিনা।

সে ডুব দিল।

স্কুলে পড়ার সময় সে বালিগঞ্জ লেকে সাঁতার কাটতে যেত। তারপর অনেকদিন অভ্যেস নেই। পুকুরটা বেশ গভীর। খানিকটা গিয়ে সে আর দম রাখতে পারছে না। বুকের ভেতরটা আঁতু-পাঁতু করছে। তাড়াতাড়ি উঠে এল ওপরে।

বিজুমামা হেসে বললেন, অত সোজা নয়। অনেকেই চেষ্টা করে তলায় পৌঁছতে পারেনি।

নিরুপম তেমন কিছু সাহসী নয়। হঠাৎ তার খুব সাহস এসে গেল কী করে কে জানে! তার মনে হল, সে নিশ্চয়ই পারবে। তার মতন সাঁতার কাটতে আর কেউ পারে না পৃথিবীতে।

সে আবার ডুব দিল।

নামছে, নামছে, অনেকটা নামছে, বুকে চাপ লাগছে, তবু সে ফিরবে না। এক সময় মাটিতে হাত লেগে গেল। দণ্ডটাকে ঘিরে প্রচুর শ্যাওলা জমে গেছে। নিরুপম খুব তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে খুঁড়তে লাগল। একটা কিছু লাগলও হাতে। ইট নাকি? ভাববার সময় নেই, সেটা নিয়েই সে উঠতে লাগল ওপরে।

নিরুপম হাত তুলতেই বিজুমামা বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠলেন, ওটা কী? ওটা কী?

সেটা একটা লোহার বাক্স। অনেকটা গয়নার বাক্সের মতন।

নিরুপম সাঁতরে ঘাটের দিকে আসছে, দলে-দলে অন্যরাও ছুটে আসছে গুপ্তধন দেখতে। বিজুমামা আগ্রহের চোটে কোমরজলে নেমে দাঁড়িয়েছেন।

নিরুপম বাক্সটা বিজুমামার হাতে তুলে দিয়ে ঘাটতলায় বসে হাঁপাতে লাগল।

অনেকদিন জলের তলায় থাকার জন্য কৌটোটার মুখ আটকে গেছে। অনেক টানাটানি করেও খোলা যাচ্ছে না। বিজুমামার হাত থেকে একবার তপনদা নিলেন, একবার শান্তনুবাবু, একবার ব্যারিস্টারসাহেব।

তারপর লতুমামিমাই সেটা খুলে ফেললেন। ভেতরে থিকথিক করছে কাদা। লতুমামিমা তাঁর ফরসা সুন্দর আঙুল সেই কাদায় ডুবিয়ে খুঁজতে লাগলেন ভেতরে কী আছে।

ভেতরে কিছুই নেই, শুধু কাদা। সব কাদা বার করে ফেলা হল, তবু কিছু পাওয়া গেল না।

ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, আহা-হা ভেবেছিলুম ভেতরে অনেক টাকাপয়সা থাকবে।

তপনদা হাসতে-হাসতে বললেন, মাটি টাকা, টাকা মাটি! সব টাকা মাটি হয়ে গেছে!

ব্যারিস্টারসাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, কিন্তু এরকম একটা মাটি ভরতি বাক্স পুকুরে ফেলা হবে কেন? হোয়াই?

বিজুমামা বললেন, এবার মনে পড়েছে! আগে যখন কলকাতায় যাওয়া-আসা কম ছিল, তখন এ বাড়ির কর্তাদের কেউ মারা গেলে তাঁকে পোড়াবার পর খানিকটা চিতাভস্ম এই পুকুরের মাঝখানে ফেলে দেওয়া হত। গঙ্গায় ফেলার বদলে!

লতুমামিমা ব্যাজার মুখে নিরুপমকে বললেন, তুমি শুধু-শুধু এটা তুলে আনলে কেন? যাও, যেখানে ছিল, সেখানে আবার রেখে এসো!

নিরুপম বলল, আমি আবার যাব? মোটেই না। এইখান থেকেই ছুঁড়ে ফেলে দিন!

নিরুপম ভাবল, এটা কার চিতাভস্ম? ধূর্জটিনারায়ণের?

যাই হোক, গুপ্তধন পাওয়া যাক বা না-যাক, নিরুপম যে পুকুরের মাঝখানে অতখানি গভীরে ডুব দিয়ে একটা জিনিস তুলে এনেছে, সাঁতারের কৃতিত্ব দেখিয়েছে, এতেই সে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল, ছোটদের কাছে বনে গেল হীরো।

খাওয়ার টেবিলে বিভিন্ন জনে কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। খাওয়ার পরে ছেলেমেয়েরা জোর করে তাকে ক্যারাম খেলতে বসাল। নিরুপমের টিপ কোনওদিন ভালো ছিল না, আজ কিন্তু বেশ ভালো খেলে ফেলল।

কিছুক্ষণ বাদে নিরুপম উঠে পড়ল। এখন কিছুক্ষণ বিছানায় গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

দুপুর সাড়ে তিনটে। নিরুপম উঠছে দ্বিতীয় সিঁড়িটা দিয়ে। দোতলা পার হওয়ার পর ছাদের দরজাটা হঠাৎ জোর শব্দ করে খুলে গেল। হুড়মুড় করে নেমে এল কালকের সেই তরুণীটি। আজ তার পরনে একটা বেশ ঝলমলে লাল রঙের শাড়ি। খুবই যেন ব্যস্ত। প্রথমে সে নিরুপমকে যেন দেখতেই পায়নি। হঠাৎ চোখাচোখি হতেই থমকে গেল। দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, তুমি?

নিরুপম কিছু বলার আগেই সে পাশ কাটিয়ে ঝড়ের বেগে নেমে গেল।

নিরুপম কিছুক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। ব্যাপারটা কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। এ বাড়িতে এরকম মেয়ে নেই, এ কথা ঠিক।

বাইরের একটি মেয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে? চোর নাকি? ছাদের ঘরে তো চুরি করার মতন কিছু নেই। তা ছাড়া, এরকম চেহারার মেয়ে কিছুতেই চোর হতে পারে না।

মেয়েটা তাকে দেখে অবাক হচ্ছে কেন?

ঘরে গিয়েও তার শুতে ইচ্ছে করছে না। বরং নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মারতে

ইচ্ছে হল। মেয়েটা কোথায় গেল, কেন সে দেখল না? ওর সঙ্গে-সঙ্গে নিচে নেমে গেলেই হতো। মেয়েটা তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না?

মেয়েটা তাকে জিগ্যেস করেছিল, তুমি? সেইজন্যে কথা বলতেও বাধা ছিল না। সেও জিগ্যেস করতে পারত, আপনি কি আমায় আগে দেখেছেন?

কিন্তু আকস্মিকভাবে মেয়েটিকে দেখেই সে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। মেয়েটির চেহারা ও চাহনিতে কিছু একটা ছিল, যা ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়।

নিরুপম বেরিয়ে পড়ল। গ্রামটা ঘুরে দেখা দরকার। প্রথমে কোন দিকে যাবে?

কেন যেন তার মনে হল, বড় দিঘিটার ওপারের বাগানটাতেই যাওয়া ভালো। ডানদিক দিয়ে, না বাঁ-দিক দিয়ে? সে ডানদিক দিয়েই গেল।

দিঘিটার ওপরে আম-জাম-কাঁঠালের বেশ বড় একটা বাগান, প্রায় জঙ্গলের মতন। কিন্তু এখন গাছপালা দেখায় মন নেই, সে বেশ জোরে-জোরে হাঁটছে। কোথায় যেন তাকে যেতে হবে।

বাগানের মধ্যে সরু পায়ে চলা রাস্তা। সেই রাস্তাটা এক জায়গায় দু-ভাগ হয়ে গিয়ে ক্রমশ চওড়া হয়েছে। ইংরিজি ওয়াই অক্ষরের মতন। অচেনা জায়গায় এরকম রাস্তায় এসে সংশয়ে পড়তে হয়। কোন দিকটা ধরবে? তার মনের মধ্যে কে যেন বলে দিচ্ছে, বাঁদিকে যাও, নিরুপম, এ বার বাঁ-দিকে।

জঙ্গল ছাড়িয়ে, দু-দিকে মাঠ, সদ্য ফসল কাটা হয়েছে। মাঝখান দিয়ে উঁচু রাস্তা। নিরুপম বেশ কিছুক্ষণ হাঁটল। এখানে কিছুই দেখবার নেই, বাড়িঘরও নেই। তাহলে সে এদিকে এল কেন? তবু যেন চুম্বকের মতন টান অনুভব করছে।

এরপর এক জায়গায় সাত-আটখানা বাড়ি। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি, মুরগি দৌড়াদৌড়ি করছে এদিক-ওদিক। নিরুপম কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হেঁটে চলল হনহনিয়ে।

তারপর সে দৌড়োতে শুরু করল। বিশেষ কিছু দেখার জন্যে সে বেরোয়নি, তবু এত তাড়া কিসের? কেন দৌড়োচ্ছে, তা নিরুপম নিজেই জানে না!

আবার কিছু ছাড়া-ছাড়া গাছপালা, তারপর একটা ছোট নদী কিংবা খাল, তার পাড়ে একটা দোতলা পাকা বাড়ি। হলদে রঙের, বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার। বাড়ির সামনে মোরাম বিছানো রাস্তা, দুপাশে ছোট বাগান।

একদিকে ফুলের গাছ, আর একদিকে বেগুন, কাঁচালঙ্কা, ঢ্যাড়োশ।

তারকাঁটা দিয়ে বাগানটা ঘেরা। নিরুপম তারকাঁটা ধরে দাঁড়াল।

নিজেকেই সে প্রশ্ন করল, আমি এখানে এলাম কেন?

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর পেয়ে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি তরুণী, হাতে জলের ঝারি। বাগানের গাছে জল দিতে লাগল সে।

মেয়েটিকে দেখেই নিরুপমের প্রায় দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এই তো সেই মেয়ে? সিঁড়িতে একেই দু-বার দেখেছে!

তা হলে অলৌকিক কিছু নয়, জলজ্যান্ত একটি মেয়ে! এই মেয়েটি অতদূরে জমিদার বাড়িতে গিয়ে চুপি-চুপি ঢুকে পড়ে? ছাদে কেন যায়? কিছু তো নেয় না!

তারকাঁটার বেড়া থেকে একটু সরে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল নিরুপম। তার বুক ধড়ফড় করছে। এ ভাবে একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়, অথচ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতেই হবে!

কী করে কথা বলবে? গ্রামদেশে একটা উটকো লোক কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে? মেয়েটা একবার চেঁচিয়ে উঠলেই অনেক লোক ছুটে এসে তাকে দারুণ ধোলাই দেবে। এখানে

চোরের মতন দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয়।

মেয়েটি দু-তিনবার এদিকে মুখ ফেরাবার পর নিরুপমের আরও ধাঁধা লেগে গেল। এ তো মেয়ে নয়! খুবই মুখের মিল আছে, আবার তফাতও আছে, সে মেয়েটির বয়েস সতেরো-আঠারো মনে হয়, এর বয়েস বাইশ-তেইশ হবে। সে মেয়েটি যেন একটু বেশি লম্বা, কাপড় পরার ধরনও অন্যরকম।

তা হলে কি সেই মেয়েটি এর ছোট বোন? নিশ্চয়ই তাই হবে। এত মিল দুজনের।

হঠাৎ একটা উপায় মনে পড়ে গেল নিরুপমের। জল খেতে চাইলে কোনও বাঙালি বাড়িতে প্রত্যাখ্যান করে না। জল চাওয়াটা অপরাধ নয়। সত্যিই তার গলা শুকিয়ে গেছে।

মেয়েটি এদিকে তাকাচ্ছে না। নিরুপম সাহস করে বলে ফেলল, এই যে শুনছেন।

এ বার মেয়েটি মুখ ফেরাল। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল তার।

নিরুপম বলল, মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করছি। আমি ঘুরতে-ঘুরতে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়িটা কোন দিকে একটু বলে দেবেন?

মেয়েটির ভুরু সোজা হয়ে গেল। বেশ সপ্রতিভভাবেই বলল, রায়চৌধুরীদের বাড়ি? ডানদিকের রাস্তাটা দিয়ে যান, একটা ছোট গ্রাম পড়বে, তারপর, সেই মাঠে গেলেই দূর থেকেও দেখা যায়।

নিরুপম আচ্ছা ধন্যবাদ বলে চলে যাওয়ার ভান করেও ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, এদিকে কি কাছাকাছি টিউবওয়েল আছে? খুব তেষ্টা পেয়ে গেছে।

মেয়েটি বলল, জল খাবেন? ওই যে গেট আছে, ভেতরে আসুন! নিরুপম বলল, না, না ভেতরে যাওয়ার দরকার নেই।

মেয়েটি বলল, বাইরে কারুকে দাঁড় করিয়ে জল দেওয়া যায় বুঝি?

নিরুপম কুণ্ঠিতভাবে গেট খুলে ভেতরে এল। বিনীতভাবে বলল, টিউবওয়েলটা দেখিয়ে দিলে আমি নিজেই খেয়ে নিতে পারতাম।

মেয়েটি নিরুপমকে বৈঠকখানায় বসিয়ে ভেতরে চলে গেল। সে ঘরের এক পাশের একটা চৌকিতে ফরাস পাতা, অন্যদিকে কয়েকটি চেয়ার, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একটু পরেই মেয়েটি একটি পেতলের রেকাবিতে দুটি মিষ্টি ও কাচের গেলাসে জল নিয়ে এল।

নিরুপম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ কী? না, না।

মেয়েটি পাতলাভাবে হেসে বলল, গেরস্তবাড়িতে বুঝি কারুকে শুধু জল দেয়? তাছাড়া আপনি জমিদার বাড়ির লোক, আমরা আপনার প্রজা।

নিরুপম বলল, না, না, না আমি জমিদার বাড়ির লোক নই, দূর-সম্পর্কের একটু আত্মীয়তা আছে, এখানে বেড়াতে এসেছি। তাছাড়া, আজকাল আবার জমিদার-প্রজার সম্পর্ক আছে নাকি?

মেয়েটি বলল, আপনি বেড়াতে এসেছেন? কোথায় থাকেন?

নিরুপম বলল, কলকাতায়। ভবানীপুরে।

মেয়েটি বলল, আমিও কলকাতায় থাকি। লেকটাউনে। এখানে অনেক দিন পর এলাম। গত পরশু ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, এত ভালো লাগছে, যেতেই ইচ্ছে করছে না।

—এটা আপনাদের বাড়ি নয়?

—আমাদের বাড়ি। ব্যাবসার জন্য বাবা কলকাতায় থাকেন, আমরাও কলকাতাতেই পড়াশুনো করেছি। এখন তো গ্রামে কেউ থাকতেই চায় না। কিন্তু এলে খুব ভালো লাগে।

—আপনার ভাই বোন সবাই কলকাতায়?

—আমার এক দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, আর দু-ভাই, বোন নেই।

—এ বাড়িতে তা হলে কে থাকে?

—আমার এক কাকা। তিনি বিয়ে করেননি। আপনাকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। মনে হয়, আগে কোথাও দেখেছি।

—কলকাতায় বাসে-ট্রামে দেখা হতেই তো পারে।

—ঠিক সেরকম নয়। আপনার ছবি কি কাগজে-টাগজে ছাপা হয়?

—না, না, আমি সেরকম বিখ্যাত কেউ নই। খুবই সাধারণ মানুষ। আমার নাম নিরুপম চ্যাটার্জি।

—আমার নাম বাসবী সাহা।

নিরুপমের শরীরটা আবার ঝিমঝিম করে উঠল। সাহাদের বাড়ি। প্রীতিলতাও ছিল সাহা। এ মেয়েটি তার কে হয়? এর কোনও ছোট বোন নেই। এ বাড়িতে আর কোনও মেয়ে নেই! সিঁড়িতে তা হলে কাকে দেখা যায়?

সে বাসবীকে জিগ্যেস করল, আপনি ওই জমিদার বাড়িতে কখনও গেছেন?

বাসবী বলল, দূর থেকে অনেকবার দেখেছি। ভেতরটা একবার ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কারুকে তো চিনি না।

নিরুপম বলল, বেশির ভাগ সময় তো খালিই পড়ে থাকে। একজন বুড়ো ম্যানেজারবাবু আছেন, তাঁকে বললেই দেখিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই। আপনি আমার সঙ্গেও যেতে পারেন। যাবেন?

বাসবী বলল, এখন? মা একটা মন্দিরে পুজো দিতে গেছেন, মাকে না বলে তো যাওয়া যাবে না। ছোট ভাইটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

নিরুপম বলল, আমি কাল সকালে এসে আপনাদের নিয়ে যেতে পারি। হেঁটেই যেতে হবে অবশ্য। বাসবী বলল, গ্রামে এসে হাঁটতে ভালো লাগে। আপনি কতদিন থাকবেন?

নিরুপম যে জোর করে বেশি সময় কাটাতে চাইছে, তা নয়। বাসবীই কথা বলতে যেন আগ্রহী। কলকাতাতে পড়াশুনো করেছে, তার অযথা লজ্জা নেই, অচেনা একজন পুরুষের সঙ্গে সে সহজভাবে কথা বলতে পারে।

কথার পিঠে কথা, নানান কথা। দুজনের বেশ ভাব হয়ে গেল। বাসবী মাঝে-মাঝেই নিরুপমের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকছে। যেন মনে করার চেষ্টা করছে, নিরুপমকে আগে কোথায় দেখেছে সে।

নিরুপমও সিঁড়িতে দেখা সেই মেয়েটির সঙ্গে বাসবীর মিল খুঁজে যাচ্ছে। মিল আছে যথেষ্ট, অথচ কিছুতেই এই দুজন এক হতে পারে না। এর থুতনিতে একটা তিল আছে, তার ছিল না।

প্রায় একঘণ্টা গল্প করার পর নিরুপম বিদায় নিল। বুকের মধ্যে অসংখ্য প্রজাপতির মতন ফুরফুরে আনন্দ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর আগে কোনও মেয়ের সঙ্গেই তার ঠিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি। মনে-মনেও তার কোনও প্রেমিকা নেই। বাসবীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে একটু বাদেই আড়ষ্টতা কেটে গেল।

এই বাড়িটা সে খুঁজে পেল কী করে? বাসবীকে বললেও কি সে বিশ্বাস করত যে নিরুপম কৃষ্ণকান্তপুরের আর কিছুই দেখেনি, সোজা এই বাড়িতে এসে থেকেছে। কে যেন তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। হয়তো আধঘণ্টা পরে এলে সে আর বাসবীকে দেখতে পেত না। ভাগ্যিস বাসবী শখ করে সেই সময়েই বাগানের গাছে জল দিতে বেরিয়েছিল।

সিঁড়িতে দেখা মেয়েটি একটা ধাঁধা হয়ে রইল।

বাড়িতে ফিরেই সে ম্যানেজারবাবুকে খুঁজল। তিনি তখন আহ্নিকে বসেছেন।

দু-মহলা বাড়ি, সামনের দিকে ঠাকুরদালান। বহুদিন পুজোটুজো হয় না। একটা দুর্গা প্রতিমার খড়ের কাঠামো পেছনের দিকে হেলে আছে। আরও কিছু ভাঙা জিনিসপত্র রাখা হয়েছে ডাঁই করে। সাদা-কালো চৌখুপ্পি কাটা মার্বেল পাথরের মেঝে। একটা পুরোনো বাঘছাল পেতে ধ্যানে বসেছেন ম্যানেজারবাবু।

নিরুপম সেখানে একটা থামে ঠেসান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ম্যানেজারবাবু মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করার পর চোখ মেলল। নিরুপম কাছে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, পুকুরের ওপারের বাগানের পেছন দিকে, অনেকটা মাঠ পেরিয়ে, একটা ছোট নদীর ধারে হলদে রঙের বাড়িটাই কি সেই সাহাদের বাড়ি?

ম্যানেজার আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

নিরুপম আবার জিগ্যেস করল, আপনি সে বাড়িতে গেছেন কখনও?

ম্যানেজার আবার সেরকম ভাবে মাথা নাড়লেন।

নিরুপম দারুণ ব্যগ্রভাবে বলল, আপনি প্রীতিলতাকে দেখেছিলেন?

ম্যানেজার এবার বললেন, দেখেছি, বেশ কয়েকবার। ধূর্জটিনারায়ণ আমাকে চিঠি দিয়ে পাঠাতেন। সে কতকাল আগের কথা, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ তো হবেই! তার মুখখানা স্পষ্ট মনে আছে।

নিরুপম বলল, তার চুল কি কোঁকড়া-কোঁকড়া ছিল?

ম্যানেজার উঠে দাঁড়ালেন, নিরুপমের কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ়স্বরে বললেন, বাবা নিরুপম, তুমি ওসব কথা অত ভাবছ কেন? ওসব কবে চুকেবুকে গেছে, আবার খুঁচিয়ে তুলে লাভ কী? ওই সাহাদের বাড়িতে যাওয়াটাও তোমার ঠিক হয়নি।

নিরুপম জোর দিয়ে বলল, প্রীতিলতা এখনও কি এ বাড়িতে আসে? মানে তার আত্মা মানুষের রূপ ধরে...আপনাকে বলতেই হবে! আপনি কখনও দেখেছেন?

ম্যানেজার বললেন, আসে কিনা আমি জানি না। আসতেও পারে, শুনেছি এরকম হয়, অতৃপ্ত আত্মা কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমি এ বাড়িতে প্রীতিলতাকে কখনও দেখিনি। সত্যি বলছি, দেখিনি!

নিরুপম ওঁর হাত চেপে ধরে বলল, তবে আপনি কাকে দেখেছেন? নিশ্চয়ই কারুকে দেখেছেন!

ম্যানেজার ধীরস্বরে বললেন, ধূর্জটিনারায়ণকে কয়েকবার দেখেছি এইখানে, এই ঠাকুরদালানে। তবে সে হয়তো আমার মনের ভুল। মনের ভুল থেকেই চোখের ভুল হয়। কত ইচ্ছে করে, ভগবানকে একবার দেখি। অন্তত মনের ভুলেও একবার চোখের সামনে দেখি। তা দেখতে পাই না।

॥ ৫ ॥

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে নিরুপম ভালো করে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে, তিনখানা ইট এনে ঠেকিয়ে রাখল। আর জোরে হাওয়া দিলেও খুলবে না। সারা ছাদ একবার ঘুরে দেখে নিল, ঘুঁড়ি-টুড়ি কিছু আটকে নেই, সাদা কাপড় নেই। আজ নিশ্চিন্তে ঘুম হবে।

ঘরে ঢুকে সে একটা সিগারেট ধরাল, সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল বাসবীর কথা। মাঝে-মাঝেই মনের মধ্যে ফুটে উঠছে তার মুখ। বাসবীর সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছিল সেই প্রত্যেকটি কথা আবার সে উচ্চারণ করছে মনে-মনে, এর নামই কি প্রেম? যাঃ, একদিন মাত্র আলাপে প্রেম হয় নাকি? তা ছাড়া, সে একজন বেকার যুবক, দিনে তিনটে টিউশনি করে, চালচুলো নেই, বাসবী তাকে পাত্তা

দেবে কেন?

তবু মনে পড়াটা তো আটকানো যায় না। মনে পড়লেই একটা তিরতিরে সুখের অনুভূতি হয়। বাসবী বিশেষ করে কাল সকালে তাকে আবার যেতে বলেছে।

তার এই ঘোরটা ভাঙল অন্য একটা অনুভূতিতে।

ঘরের মধ্যে যেন কেউ এসেছে। একটা পুরুষ-পুরুষ গন্ধ। ধূর্জটিনারায়ণের ছবিটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে, তবু তার উপস্থিতি যেন এখানে টের পাওয়া যাচ্ছে।

নিরুপম আপনমনে হাসল। ওই যে ম্যানেজারবাবু বলেছেন, ধূর্জটিনারায়ণকে তিনি মৃত্যুর পরেও কয়েকবার দেখেছেন, সেই কথাটা তারও মনে গেঁথে গেছে! সত্যি-সত্যি দেখা যায় নাকি? সবই মনের খেলা!

কিন্তু ধূর্জটিনারায়ণ-প্রীতিলতার গল্পটা শোনার আগেই সে সিঁড়িতে একটি মেয়েকে দেখেছে। সেটা কী ব্যাপার? সেটাও তার মনের ভুল হবে কী করে?

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বটে, তবু নিরুপমের ঘুম আসছে না।

এক-একবার মনে পড়ছে বাসবীর কথা। আবার মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে কেউ আছে। কারুর নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে না, নিঃশ্বাসেরও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তবু অস্বস্তি হচ্ছে ঠিকই।

খানিকবাদে ঝড় উঠে গেল। ভাঙা জানলাটা বন্ধ করার কোনও উপায় নেই। হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে। এর মধ্যে কি ঘুমোনো যায়?

ছাদের দরজাটায় দুম-দুম করে শব্দ হচ্ছে। এই রে, দোতলা থেকে কেউ ডাকতে এসেছে নাকি? দোতলায় কিছু হয়েছে? কেউ ডাকছে তার নাম ধরে? ঝড়ের সময় এরকম মনে হয়। কিন্তু দোতলা থেকে যদি কেউ এ সময় ছাদে আসতে চায়, তাই দরজা খুলে দিল।

কেউ নেই!

সিঁড়ির আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়িটা এখন দেখাচ্ছে অন্ধকার গুহার মতন।

মনের ভুল, না কেউ তাকে ভয় দেখাচ্ছে? কিন্তু কিছু না দেখা গেলে নিরুপম শুধু-শুধু ভয় পাবে কেন?

সে এ বার দরজার দুটো পাল্লা খুলে দিয়ে, ভেতরে ইট দিয়ে আটকে দিল। খোলা থাক দরজা।

এত জোড়ে ঝড় বইছে যে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। সে দৌড়ে চলে এল ঘরের মধ্যে। জানলাটাকে আটকাবার জন্য একটা বুদ্ধি মনে এল। খাটের তলা থেকে ছবিগুলো টেনে বার করে জানলা জুড়ে বসিয়ে দিল। এ বার ঠিক আছে।

কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। একটু বাদেই হাওয়ার ধাক্কায় ছবিগুলো দড়াম-দড়াম করে পড়ে যেতে লাগল। ছবিগুলো বাঁধবার তো কোনও উপায় নেই। এই বুদ্ধিটা খাটল না।

ঝড় আর কতক্ষণ হবে? ঝড় যখন আটকানো যাবে না, ততক্ষণ জানলার ধারে বসে ঝড় দেখাই ভালো। তারপর কোনও একসময় ঘুম এসে যাবেই।

সে একটা গান গাইবার চেষ্টা করল, 'ওরে, আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে ঝড় নেমে আয়...'। নিরুপম মোটামুটি গান গাইতে পারে, কিন্তু এখন বেসুরো হয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা লেগে মানুষের গলা ভাঙে, কিন্তু নিরুপমের গলা মোটা হয়ে গেছে।

এরপর আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হতে লাগল।

নিরুপম ঘরের আলো জ্বালেনি, জানলার ধারে বসে সিগারেট টানতে-টানতে বাইরের ঝড় দেখছে। ঝড়ের তাণ্ডবে নুয়ে-নুয়ে পড়ছে দূরের গাছপালা, উড়ে যাচ্ছে শুকনো পাতা। বৃষ্টি এখনও নামেনি। বিদ্যুতের চমক আর মেঘের গর্জন চলছে সমানে।

নিরুপম হঠাৎ হাত দিয়ে টের পেল, তার নাকের নিচে অনেক লোম। লোম মানে কী, বেশ পুরুষ্টু একটা গোঁফ! দাড়ি কামানো শুরু করার পর থেকে নিরুপম কখনও গোঁফ রাখেনি। রাতারাতি এত বড় গোঁফ গজিয়ে যেতে পারে নাকি? গালে হাত বুলিয়ে দেখল, তার জুলফি দুটোও অনেক বড় আর মোটা হয়ে খানিকটা নিচে নেমে এসেছে। মনের ভুল? ভালো করে হাত বুলিয়ে দেখল, সত্যি তার মুখে গোঁফ আর মোটা জুলফি। হরতনের গোলামের মতন হয়ে গেছে মুখখানা।

এবার খানিকটা ভয় পেয়ে নিরুপম ধড়মড়িয়ে গিয়ে আলো জ্বালল। আয়নায় দেখল মুখ। সে মুখ একেবারে পরিষ্কার, গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই, জুলফিও আগের মতন।

সে একটুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভুলে এতখানি হয়? আবছা অন্ধকারে সে হাত দিয়ে স্পষ্ট টের পেয়েছে, তার মুখে অতবড় একটা গোঁফ। হরতনের গোলামের মতন নয়, ধূর্জটিনারায়ণের ছবির মতন। তবে কি সে এখনও অবচেতনে ধূর্জটিনারায়ণের কথা ভেবে চলেছে?

ঝড়ের বেগ কমে এসেছে। আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল। ঘুম না হয় না হোক। কাল সকালেই আবার বাসবীর সঙ্গে দেখা হবে। সাহাদের বাড়ির মেয়ে! আশ্চর্য ব্যাপার, সাহা হোক বা ঘোষ-বোস বা চ্যাটার্জি-ব্যানার্জি যা-ই হোক, তাতে কী তফাত হয়? মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবহার, স্বভাব—এই নিয়েই তো বিচার হওয়া উচিত। ধূর্জটিনারায়ণ প্রীতিলতা সাহাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কেউ বা হতে দিল না, কেউ তা হতে দিত, শেষপর্যন্ত দু'জনেরই প্রাণ গেল!

এই রে, নাকের নিচে আবার গোঁফ গজাচ্ছে। জুলফিও বেড়ে গেল। নিরুপম জানে, আয়নায় দেখতে পাচ্ছে না, তবু হাত দিলে মনে হচ্ছে, সত্যি। রীতিমতন গোঁফে তা দিচ্ছে নিরুপম। এখন মনে হচ্ছে, এরকম গোঁফ রাখলে মন্দ হতো না। মুখখানা বেশ ভারিক্কি দেখাত! জমিদার বংশের কিছুটা রক্ত তো তার শরীরেও আছে।

ঘুম ভাঙল আবার আলো চোখে পড়ায়। প্রথমেই নিরুপম মুখে হাত দিয়ে দেখল। গোঁফ-টোফ কিছু নেই! ওটা তা হলে স্বপ্ন! আয়নাতেও মুখ দেখে নিশ্চিত হয়ে গেল। নিরুপম যেমন ছিল, তেমনই আছে।

তবে গলার ব্যথা-ব্যথা ভাবটা সারেনি। আরও ঠান্ডা লেগেছে নিশ্চয়ই! গলার আওয়াজটা আরও ভারি হয়ে গেছে!

কখন যাবে বাসবীর কাছে? এত সকালে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অন্তত ন'টা না বাজলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না।

কাজের লোকরা কি ওপরে চা দিয়ে যাবে? দেবে না বোধহয়। কেন দেবে না? তার রাগ হতে লাগল, দোতলার অতিথিরা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে চা খায়। দোতলা থেকে হাঁকডাক করলে নিচে শোনা যায়, এখান থেকে শোনানো যাবে না।

নিরুপম দাড়ি কামাতে বসে গেল। বাপ রে, কাল রাতে কীরকম মোটা গোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল! একবার খানিকটা ভয়-ভয় করছিল ঠিকই। এরকম অভিজ্ঞতা মানুষের হয়? সকালবেলা সবই অলীক মনে হচ্ছে।

আজকের রাতটাই শেষ, কাল ফিরে যাওয়া হবে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে কনকদুর্গার মন্দির দেখতে যাওয়া হবে। দেড়শো বছরের পুরোনো মন্দির, সেখানে এই সময় একটা মেলা হয়। নিরুপমের একটুও যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। আজ আর দৌড়ল না, ধীরেসুস্থে হাঁটতে লাগল সময় নিয়ে। চারদিক দেখতে-দেখতে। যাতে খুব তাড়াতাড়ি না পৌঁছে যায়।

বাগানের গেটে দাঁড়াতেই একটি তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন, আসুন!

দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বাসবী। তার হাসিমাখা মুখ দেখে নিরুপমের মনে হল, এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হয় না।

বাসবী তক্ষুনি নেমে এল নিচে। সে তার মা, ছোট ভাই আর কাকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সকলের ব্যবহার বেশ সহজ, আন্তরিক। বৈঠকখানা ঘরে বসে গল্প হল কিছুক্ষণ, এখানে এসেও নিরুপমকে মুড়ি-বেগুনি ও চা খেতে হল।

বাসবীর ছোট ভাইয়ের নাম বিপুল। সে ক্লাস নাইনে পড়ে, কলকাতায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সুপারম্যানের খুব ভক্ত। সকলের সঙ্গে বসে থেকেও সে মাঝে-মাঝে কমিকসের পাতা ওলটায়।

নিরুপম তাকে বলল, চলো, এখানকার জমিদার বাড়িটা একবার দেখে আসবে নাকি?

বাসবী উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, চলুন, চলুন, পুরোনো আমলের বাড়ি দেখতে আমার ভালো লাগে।

বিপুল তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না বুঝে নিরুপম আবার বলল, ওখানে একটা কামান আছে! দুটো সিঁড়ির মুখে ঢাল-তলোয়ার আছে।

বাসবী মাকে জিগ্যেস করল, তুমিও যাবে? চলো না!

মা বললেন, না, আমি অত হাঁটতে পারব না।

বাসবীর কাকার নাম প্রমথনাথ। তিনি গম্ভীরভাবে বাসবীকে বললেন, তোদেরও যাওয়ার দরকার নেই।

বাসবী অবাক হয়ে বলল, কেন?

প্রমথমাথ বললেন, আমাদের পরিবারের কেউ ও বাড়িতে যায় না। আমি এ গাঁয়ে জন্মেছি, এতদিন আছি, আমি কখনও ধারেকাছেও যাইনি।

বাসবী বলল, কেন যাওনি? জমিদারদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হয়েছিল?

প্রমথনাথ বললেন, সেসব কথা এখন থাক!

সবাই চুপ করে গেল।

নিরুপম অস্বস্তি কাটাবার জন্য বলল, আমি কিন্তু রায়চৌধুরীদের বংশের কেউ নই। আমার মা ও বাড়ির সকলের অমতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার বাবাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর থেকে মা আর ওঁদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি। আমি এই প্রথম অন্যদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি!

প্রমথনাথ বললেন, না, না, না, তাতে কী হয়েছে? ও বাড়ির লোক হলেও...অনেককাল আগের ব্যাপার, ওসব কি কেউ মনে রাখে? ও বাড়ির দিগ্বিজয়বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, দেখা হলে কথাও হয়। শুধু এই একটা ব্যাপার, আমার বাবা বলে গিয়েছিলেন, এ বাড়ির কেউ কখনও জমিদারদের বাড়িতে যাবে না!

মা বললেন, তাহলে বাপু যাওয়ার দরকার কী?

বাসবী মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

মা বললেন, কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল জানো তো? আমার মেয়ে ভূতের ভয় পেয়েছিল।

বাসবী সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, মোটেই আমি ভয় পাইনি! এমন মনে হচ্ছিল...

মা হাসতে-হাসতে বললেন, আহা-হা, মাঝরাত্তিরে দরজা খুলে দৌড়ে চলে এলি না?

বাসবী বলল, সেটা ভয়ে নয়। কীরকম যেন মনে হচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কেউ আছে। কেউ চেয়ে আছে আমার দিকে। কিছুই দেখতে পাইনি। শুধুই মনে হচ্ছিল।

মা বললেন, ওই জন্যেই তো তোকে ওই ঘরে একা শুতে বারণ করি। তবু তুই শুনবি না।

বাসবী নিরুপমের দিকে চেয়ে বলল, জানেন, দোতলার কোনের যে ঘরটায় আমি শুই, এতদিন আমায় কেউ বলেনি, ওঘরে একজন গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। আমার ঠাকুরদার এক বোন। মা, কেন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন?

মা বললেন, তা আমি কী জানব? সে আমার বিয়ের আগের কথা।

প্রমথনাথ চুপ করে আছেন। মুড়ি চিবিয়ে খাচ্ছেন আপনমনে। বোঝা গেল, তিনি সেই অতীতের দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে চান না।

নিরুপমের শরীরে রোমাঞ্চ হল। ধূর্জটিনারায়ণ আর প্রীতিলতা! দুজনের অতৃপ্ত আত্মাই ফিরে-ফিরে আসে? বাসবী সে কাহিনী জানে না?

বাসবী বলল আবার ফিরে এসে তো ওঘরে একাই শুলাম। তখনও মনে হচ্ছিল, কেউ আমাকে দেখছে। কিন্তু আমি ভয় পাইনি। বরং মনে হচ্ছিল, সে আমার খুব আপন। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মা বললেন যাক, ও নিয়ে আর ভাবতে হবে না। একবার মনের মধ্যে গেঁথে গেলে আরও কত কী দেখবি। আজ রাতে বিপুল তোর সঙ্গে শোবে!

বাসবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, না! আমি কচি-খুকি নই। আমাকে পাহারা দিতে হবে না!

প্রমথনাথ বিষয়টা পালটাবার জন্যে নিরুপমকে বললেন, এ গ্রামের আর কিছু দেখলেন? নদীর ধারে অনেককালের একটা ভাঙা নীলকুঠি আছে। এখন অবশ্য ঝোপঝাড় হয়ে গেছে।

এরপর আরও গল্প অনেকক্ষণ। নদীর ধারে বসা হল। এগারোটা আন্দাজ ফিরে এল নিরুপম।

দুপুরে পুকুরে স্নান করতে গেল বটে, কিন্তু আজ আর সাঁতারের কৃতিত্ব দেখাল না। ছুটে ডুব দিয়ে উঠে এল। অল্পবয়েসিরা ক্যারাম খেলার জন্য ডাকাডাকি করছিল, সে রাজি হয়নি। কিছুই ভালো লাগছে না। মন শুধু বলছে, বাসবী-বাসবী। বিকেলে কি আবার ওদের বাড়ি যাওয়া? বাড়াবাড়ি মনে হবে? বাসবী অবশ্য একবার অন্যদের অলক্ষে তাদের কলকাতার ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছে। নিরুপমের সঙ্গে সে আবার দেখা করতে চায়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে কণকদুর্গার মন্দিরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে, নিরুপম জানিয়ে দিল, সে যাবে না। ওপরে উঠে সে শুয়ে পড়ল। কাল রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি, আজ সে ঘুমোবে!

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, তবু তার ঘুম ভাঙে না। অঘোরে ঘুমচ্ছে। আজ ঝড় ওঠেনি, তবু ছাদের দরজা কয়েকবার দড়াম-দড়াম করে আওয়াজ করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

জেগে উঠে নিরুপম প্রথমে বুঝতে পারল না। এটা রাত্তির না সকাল। তার কাছে ঘড়িও নেই। কখন ঘুমিয়েছে, প্রথমটা মনে করতে পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, আকাশে তারা ফুটেছে।

তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এ কেমন বাড়ি, সে অসময়ে ঘুমিয়ে থাকলেও কেউ তাকে ডাকবে না? চা-জলখাবার খাওয়া নিশ্চয়ই এতক্ষণে শেষ হয়ে গেছে! কেউ তাকে গ্রাহ্যই করছে না!

নিরুপম ঠিক করল, সে আর রাত্রেও খেতে যাবে না। যদি কেউ ডাকতে না আসে, সে নিচেও নামবে না কিছুতেই। এক রাত্তির না খেলে কী হয়।

রাত যত বাড়ছে, নিরুপমের রাগও তত বাড়ে খিদেও পেয়েছে বেশ। খিদে ছাড়া অস্থির-অস্থির লাগছে শরীর। এক্ষুনি কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে! সে ছাদে জোরে-জোরে পায়চারি করতে লাগল। ক্রমশ আরও জোরে। তার চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে, আকাশ ঘুরছে। দূরের গাছপালাগুলো দুলছে! একসময় থেমে গেল।

পৃথিবীটা আবার শান্ত হওয়ার পর সে আপনমনে বলল, খিদে পেয়েছে, খাব না কেন? সে না খেয়ে থাকলেও কেউ কিছু জিগ্যেস করবে না। সে নিচে নামতে লাগল।

খাবার ঘরে কোলাহলে কানপাতা দায়। খাওয়ার দিকে মন নেই, সবাই গল্পে মেতে আছে। মেলায় কে কী কিনেছে সেই গল্প। দুটি বাচ্চা মেলা থেকে কেনা মুখোশ পরে আছে। বিজুমামার সঙ্গে ব্যারিস্টার সাহেব ও তপনমামার কী যেন চলছে খুব তর্কাতর্কি।

টেবিলের ওপর খাবার সাজানো। নিরুপম একটা প্লেট তুলে নিয়ে কিছু খাবার নিল। খেতে লাগল একা-একা। অত খিদে পেয়েছিল, তবু খেতে ভালো লাগছে না। সব খাবার ঠান্ডা হয়ে গেছে। অন্যদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, তারা খেতে বসেছে অন্তত আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট আগে। নিরুপমের কথা কারুর মনেও পড়েনি। লতুমামিমা একবার তাকে দেখলেন, তবু কিছু বললেন না। প্রকাশ্যে খারাপ ব্যবহার করে না, এইরকম সূক্ষ্মভাবে ওরা অপমান করে।

অনিচ্ছার সঙ্গে খানিকটা খেয়েই নিরুপম প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

তারপর বলে উঠল, বিজুমামা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

এত জোরে সে বলল, এত গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর, সে সবাই চমকে চুপ করে গেল।

বিজুমামা অন্যদের সঙ্গে কথা থামিয়ে এদিকে মুখ ফিরিয়ে খুবই অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, তোর গলায় কী হয়েছে রে? একেবারে অন্যরকম শোনাচ্ছে!

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিরুপম পালটা প্রশ্ন করল, আপনারা কি এ বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছেন?

বিজুমামা এবার চোয়াল কঠিন করে বললেন হ্যাঁ, সেরকমই তো ঠিক হয়েছে।

নিরুপম প্রায় ধমকের সুরে বলল, কক্ষনো বিক্রি করা উচিত নয়। এতকালের পুরোনো বাড়ি, এমন চমৎকার আর্কিটেকচার। এ বাড়ি নষ্ট করা অন্যায়!

নিরুপমের স্পর্ধা দেখে কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলেন বিজুমামা। যেন নিরুপম নয়, তার মধ্য থেকে কথা বলছে অন্য কেউ। ম্যানেজারবাবু সেই সময় ঘরে ঢুকলেন, তাঁরও মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। নিরুপমের গলায় তিনি শুনতে পাচ্ছেন তাঁর চেনা কারুর কণ্ঠস্বর।

বিজুমামা এবার চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, এ বাড়ি নিয়ে আমরা কী করব, না করব, তা নিয়ে তোকে মাথা গলাতে কে বলেছে? নিরুপম বলল, আলবাৎ মাথা গলাব! এগুলো হেরিটেজ বিল্ডিং, ন্যাশনাল প্রপার্টি।

বিজুমামা বললেন, ওরকম বললেই হল? বাড়ির মালিকরা ঠিক করবে, তারা বাড়ি নিয়ে কী করবে। তোকে আর অত পাকামি করতে হবে না। তোর কথা বলার অধিকার নেই।

নিরুপম রক্তচক্ষে বিজুমামার দিকে তাকাল। টেবিলে এত জোরে একটা ঘুঁষি মারলে যে ঝনঝন করে কেঁপে উঠল থালাবাসন। গর্জন করে সে বলল, অধিকার নেই মানে? আপনার যেমন অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার আছে।

বিজুমামার হাই ব্লাড প্রেসার আছে, লাল হয়ে গেছে মুখ। তা দেখে ভয় পেয়ে লতুমামিমা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললেন, তুমি চুপ করো। তুমি কিছু বোলো না। আমি বলছি।

তারপর নিরুপমের দিকে তাকিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, শোনো নিরুপম, কার অধিকার আছে না আছে, তা পরে ঠিক হবে। কিন্তু এই বাড়ি মেইনটেইন করতে গেলে বছরে অন্তত পাঁচ লাখ টাকা লাগে। সে টাকার ভাগ কিন্তু কেউ দিতে চায় না। তুমি দেবে নাকি?

নিরুপম বলল, মেইনটেইন না করতে পারলে সরকারকে দান করে দিলেই হয়। কিংবা রামকৃষ্ণ মিশনকে। এখানে কলেজ হতে পারে, হাসপাতাল হতে পারে। তবুও তো বাড়িটা থাকবে, লোকে দেখবে।

এবার তপনদা বললেন, অত জোরে কথা বলছিস কেন, নিরুপম? একটু আস্তে বল। তবে আমি তোর সঙ্গে একমত। এ বাড়িটা দেখার আগে বুঝতে পারিনি। সত্যি এ বাড়িটা ভেঙে ফেলা অন্যায়। এগুলো দেশের সম্পদ!

পাইপ মুখে দিয়ে ব্যারিস্টার মিত্র সাহেব বললেন, দ্যাট্স রাইট। ইওরোপে এইরকম হেরিটেজ বিল্ডিং ভাঙার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইন ফ্যাক্ট, এ বাড়িটাকে একটা ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশনের ব্যবস্থা করতে পারো। তাতে কিছু ইনকাম হবে, তা দিয়েই মেইনটেইন করা যাবে। আমি একটা প্ল্যান করে দিতে পারি—

যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে কথা শুরু করেছিল, সেইরকমভাবেই অন্যদের কথার মাঝখানে উঠে চলে গেল নিরুপম।

হাত-মুখ এখনও এঁটো। নিচের কলে ধুতে গিয়ে টের পেল, তার মুখখানা আবার লোমশ হয়ে গেছে। নাকের নিচে মোটা গোঁফ, জুলফি দুটো বড়-বড়।

তাতে সে অবাক হল না। দপদপিয়ে উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। তার শরীরের শক্তি যেন বেড়ে গেছে। অদ্ভুত একটা ছটফটানি বোধ করছে সে।

দোতলা পেরিয়ে তিনতলায় উঠতে যেতেই সে শুনতে পেল একটা কান্নার শব্দ। একটি মেয়ের কান্না। কিন্তু কারুকে দেখা যাচ্ছে না। নিরুপম এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল, কেউ নেই, তবু শোনা যাচ্ছে কাতর কান্না।

নিরুপম নিজের ঘরে এসে, আলো জ্বেলে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে গিয়ে আলমারির আয়নার দিকে তাকাল। শুধু গোঁফ আর জুলফি নয়, মাথার চুল বাবড়ি হয়ে গেছে। সে পরেছিল সাধারণ পা-জামা-পাঞ্জাবি, এখন তার পরনে শেরওয়ানি ও ভেলভেটের জামা, গলায় মণি-মুক্তোর মালা, কোমরে ঝুলছে কোষবদ্ধ তলোয়ার।

সে এখন আর নিরুপম চ্যাটার্জি নয়, পুরোপুরি ধূর্জটিনারায়ণ রায়চৌধুরী। এই পরিবর্তনটাও সে বুঝতে পারল না। নিরুপমের মনেই নেই যে তার নাম নিরুপম।

সিগারেট টানার কথাও মনে পড়ল না। আয়নার দিকে তাকিয়ে সে ঘন-ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। তার মুখে সাঙ্ঘাতিক ক্রোধের চিহ্ন।

তারপর সে শুনতে পেল ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। টগবগ-টগবগ করে কোথায় একটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে।

সেই শব্দ শুনেই সে সবেগে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। হুড়মুড় করে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। খাবার ঘর থেকে সবাই তখন দোতলায় উঠে এসেছে, সে কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না।

দরজার ঠিক বাইরে বাগানে বাঁধা রয়েছে তপনদার সেই ঘোড়া, জিন পরানোই রয়েছে। বাঁধন খুলে সে দক্ষ অশ্বারোহীর মতন এক লাফে চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে।

তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে আর কেউ দেখল না, দেখলেন শুধু বৃদ্ধ ম্যানেজার। তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেলে, হাত জোড় করে মাথাটা কাঁপাতে লাগলেন অনবরত।

ঘোড়া ছুটিয়ে সে চলল দিঘির ডানপাশ দিয়ে, আমবাগান পেরিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তায়। সাহাদের বাড়ির কাছে এসে, বাগানের গেট থেকে সে দু-বার ডাকল, প্রীতিলতা, প্রীতিলতা!

সে বাড়ির দোতলার একটা ঘরের আলো জ্বলে উঠল। জানলায় দেখা গেল এক নারীমূর্তি টকটকে লাল বেনারসি পরা, সর্বাঙ্গে ফুলের গয়না। সেই নারী নেমে এল তরতরিয়ে, বাগান দিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে চলে এল গেটের কাছে।

ধূর্জটিনারায়ণ ঘোড়া থেকে নেমে প্রীতিলতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, প্রীতিলতা,

আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। তুমি আমার হবে?

প্রীতিলতা কম্পিত গলায় বলল, আমি তো আর কোনও পুরুষকে চিনি না। তোমাকে না পেলে আমিও বাঁচতে চাই না।

ধূর্জটিনারায়ণ রবলল, আজ রাত্রেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

কনকদুর্গার মন্দিরে গিয়ে পুরুতকে জাগাব। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, চোরের মতন নয়, সারা গ্রামকে জানাব, আমার বাড়িতে লোকদের জানিয়ে যাব।

প্রীতিলতা ভয় পেয়ে বলল, ওরা যদি তোমাকে যেতে না দেয়? ধূর্জটিনারায়ণ বলল, কার সাধ্য আমাকে আটকায়। প্রীতিলতা বলল, তার থেকে বরং আমরা অনেক দূরে চলে যাই না কেন? বহু দূরে, যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

ধূর্জটিনারায়ণ বলল, কেন আমরা পালাব? কিসের ভয়ে। ওই জাতপাতের বিচারের মাথায় আমি লাথি মারি! তুমি হবে রায়চৌধুরী বাড়ির বউরানি, ও-বাড়িতে আমারও অধিকার আছে। এসো—

দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। অনেকদিন পর, কয়েকটি প্রজন্ম পেরিয়ে দুটি দুঃখী, অতৃপ্ত আত্মা মিলিত হল।

ধূর্জটিনারায়ণ প্রীতিলতাকে বসিয়ে নিল ঘোড়ার সামনের দিকে। নিজেও উঠে বসে ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। প্রথমে রায়চৌধুরীদের বাড়িতে গিয়ে জানাবে। সেখান থেকে কেউ-কেউ যদি সঙ্গে যেতে চায় তো ভালো, কেউ না গেলেও ক্ষতি নেই, গ্রামের অনেক লোক তাকে ভালোবাসে, তারা সমর্থন করবে অবশ্যই।

রায়চৌধুরীদের বাড়ির সামনে যখন ওরা পৌঁছল, তখন ওপরে গানবাজনা চলছে। অতিথিদের আজই শেষ রাত, আজ অনেকক্ষণ জেগে থেকে আমোদ-ফুর্তি হবে।

ঘোড়া থেকে নেমে গটগটিয়ে এল ধূর্জটিনারায়ণ, প্রীতিলতার একটা হাত সে ধরে আছে। মাথায় ঘোমটা দিয়েছে প্রীতিলতা।

ধূর্জটিনারায়ণ বলল, এই দ্যাখো, এটা ঠাকুরদালান। ওপরে যাওয়ার দুটো সিঁড়ি আছে। ডানদিকের সিঁড়িটা দিয়ে গেলে দোতলায় দু-খানা ঘর আমার নিজস্ব। এখন থেকে হবে আমাদের ঘর। ছাদের একখানা ঘরে আমার লাইব্রেরি।

প্রীতিলতা বলল, আমার ভয় করছে। ধূর্জটিনারায়ণ বলল, কিসের ভয়? দাঁড়াও বড়দাকে ডাকি। অমনি একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। দুজনেই চমকে পেছন ফিরে দেখল, ঠাকুরদালানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা-চওড়া লোক, তার মুখের আধখানা মুখোশে ঢাকা। হাতে একটা দো-নলা বন্দুক।

সে বন্দুকটা তুলে বলল, হারামজাদা, তুই এই বংশের নাম ডোবাবি? তুই মর!

ধূর্জটিনারায়ণ খাপ থেকে তলোয়ারটা বার করল। কিন্তু বন্দুকের সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করা যায় নাকি? প্রীতিলতা ছুটে এসে দু-হাত তুলে ধূর্জটিনারায়ণকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে বলল, না, না, ওকে মেরো না! মেরো না, আমি চলে যাচ্ছি।

বন্দুকধারী এক-পা এগিয়ে এসে বলল, সর, দূর হয়ে যা! নইলে তুইও মরবি!

প্রীতিলতা আবার চিৎকার করে বলল, আমাকে মারো। ওকে মেরো না।

তখনই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ম্যানেজারবাবু। তিনি বললেন, কে? কে ওখানে?

সঙ্গে-সঙ্গে আলো নিভে গেল। একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

ওপরের বারান্দাতেও বন্ধ হয়ে গেল গানবাজনা। কেউ একজন বলল, যাঃ লোডশেডিং! কেউ একজন বলল, মোমবাতি কোথায়? মোমবাতি! আর কেউ বলল, লন্ঠন নেই? হ্যাজাক বাতি নেই?

বিজুমামা বললেন, ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু, কী হয়েছে?

ম্যানেজার বললেন, কার যেন গলা শুনতে পেলাম! এই ঠাকুর দালানে, তারপরই বাতি নিভে গেল!

বিজুমামা বললেন, সে কি? বাইরের লোক ঢুকে পড়েছে নাকি? সদর বন্ধ নেই?

তিনি হাঁকডাক শুরু করলেন, ওরে দিবাকর, ওরে ফৈজু, তোরা সব কোথায় গেলি? দরজা বন্ধ কর, আলো জ্বাল!

একটা হ্যাজাক বাতি, একটা লণ্ঠন, কয়েকটা মোম জ্বলে উঠল। দলবল নেমে এল নিচে। যথেষ্ট আলো হয়েছে। তাতে দেখা গেল, মেঝেতে উপুড় হয়ে আছে নিরুপম, একটা থামে ঠেস দিয়ে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে বাসবী।

কোথায় ধূর্জটি নারায়ণ? কোথায় প্রীতিলতা? সেই বন্দুকধারীও নেই। যেন একটা নাটকের দৃশ্য বদলে গেছে। নিরুপমের পরনে সেই সাধারণ পাঞ্জাবি-পাজামা। বাসবী পরে আছে একটা হলদে ডুরে শাড়ি, শরীরে কোনও অলঙ্কার নেই।

বিজুমামা বললেন, ও কে? নিরু নাকি? ওই মেয়েটি কে? নিরুপম আস্তে-আস্তে উঠে বসল। তার মুখখানা বিবর্ণ, রক্তশূন্য হয়ে গেছে। শরীরে যেন একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই।

ঠিক নিজের গলায় সে বিনীতভাবে বলল, বিজুমামা, এই মেয়েটির নাম বাসবী সাহা। ওকে আমি বিয়ে করতে চাই। আপনাদের দেখাতে এনেছি।

কাছে গিয়ে সে বাসবীর একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে রইল।

একদা ঝড়ের রাতে

সন্ধে থেকেই টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বিকেলবেলা গুড়ুম-দাড়ুম মেঘগর্জন শুনে মনে হয়েছিল খুব এক চোট ঝড়বাদলের পালা শুরু হবে। কিন্তু সেরকম ভারী বর্ষণ হল না, আকাশ ছিঁচকাঁদুনে হয়েই রইল।

এইরকম সন্ধ্যায় গান-বাজনার আসর জমে না। শ্রোতারা বেরুতে চায় না বাড়ি থেকে। সুলতানপুর যুবকল্যাণ সমিতির পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানটি বর্ষাকালের বদলে শীতকালে হবে কি না তাই নিয়ে ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস যেহেতু একুশে জুন, তাই ওই দিনটিতেই উৎসব করার পক্ষে মত দিয়েছিল বেশিজন।

খোলা জায়গায় অনুষ্ঠান করার প্রশ্নই ওঠে না। প্যান্ডেল তৈরি করার খরচও অনেক। সেইজন্য স্থানীয় একটা সিনেমা হল ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভাড়া ঠিক নয়, ওই সিনেমা হলের মালিকের ছেলে বাদশা হকও এই ক্লাবের একজন সদস্য। তাকে ধরে প্রায় বিনা পয়সায় হলটি পাওয়া গেছে।

একজন মন্ত্রী, একজন সাহিত্যিক ও ক্লাবের সভাপতির ভাষণের পর গান-বাজনার অনুষ্ঠান। শুরু হলই চল্লিশ মিনিট দেরিতে, বক্তৃতাপর্ব চলল প্রায় দেড় ঘণ্টা। সে সময় দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা মাত্র জন তিরিশেক, এরপর বোম্বাইয়ের এক গায়িকার নেচে-নেচে গান শোনানোর সময় হল মাঝামাঝি ভরেছিল, তারপর আকাশে আবার গুমগুম শুরু হতেই লোকজন কমতে লাগল।

বিশাখা সরকারের অনুষ্ঠান সবচেয়ে শেষে। গ্রিনরুমে তিনি বিরস মুখে বসে আছেন। উদ্যোক্তারা বলেছিল সাড়ে আটটার মধ্যে তাঁকে ছেড়ে দেবে। এরা কেউ কথা রাখে না, সময়ের ঠিক রাখা বাঙালিদের ধাতে নেই। যে-যুবকদুটি তাঁকে নিয়ে এসেছে, তাদের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। অন্য একজনকে তিনি একবার ডেকে বলেছিলেন, এই যে ভাই, আমাকে কখন স্টেজে তুলবে?

ছেলেটি হাতজোড় করে বলেছিল, আপনি দিদি স্টার অ্যাট্রাকশন। আপনাকে আগে দিলে অর্ধেক লোক চলে যাবে। আর-একটু বসুন দিদি!

স্টার অ্যাট্রাকশন না ছাই! প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে ফাংশন করে বেড়াচ্ছেন বিশাখা। এক-একটা অনুষ্ঠানের এক-একরকম চরিত্র। কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে যদি শুধু রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান হয়, তাহলে সেখানে বিশাখা সরকারের নামেই অনেকে টিকিট কিনে আসবে এটা ঠিক। কিন্তু পাঁচমিশেলি অনুষ্ঠানে বম্বের গায়িকার চটকদার হিন্দি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত পাল্লা দিতে পারবে না।

মফস্‌সল রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ কদর নেই। তবু আজকাল ছোট-ছোট শহর থেকে ডাক আসে। যদি ডাকে, ঠিকমতন টাকা দেয়, তাহলে বিশাখা সরকারের মতন শিল্পীরা আসবেন না কেন?

গ্রিনরুমের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখলেন বিশাখা। ভেতরে-ভেতরে খুব অস্থিরতা বোধ করছেন। এখান থেকে গাড়িতে কলকাতায় ফিরতে অন্তত একঘণ্টা তো লাগবেই। মফস্‌সলে আসার এই এক ঝামেলা, কিছুতেই ঠিক সময় বাড়ি ফেরা যায় না। এরা চার হাজার টাকা দিয়েছে। এক সন্ধের জন্য চার হাজার টাকা কি ছাড়া যায়?

হিন্দি গানের ওই গায়িকার রেট পঁচিশ-তিরিশ হাজারের কম নয়। ওরা সারারাত ধরে নাচ-গান করলেও ক্লান্ত হয় না। খাটতে পারে খুব। যেখানে-সেখানে রাত কাটায়। বিশাখা নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারেন না। যত রাতই হোক, ফিরতেই হবে।

পিলে-চমকানো শব্দে কোথাও বাজ পড়ল। তারপরই বেড়ে গেল বৃষ্টির তোড়। এতক্ষণ বাদে আকাশ যেন উপুড় করে জল ঢেলে দিচ্ছে।

বিশাখা যখন মঞ্চে এলেন, তখন শ্রোতার সংখ্যা কুড়ি-বাইশজনের বেশি নয়। অতবড় হল একেবারে ফাঁকা।

এইরকম পরিবেশে গান গাইতে ইচ্ছে করে?

কিন্তু অগ্রিম টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া শিল্পী হিসেবে একটা দায়িত্ব আছে, একজন শ্রোতাকেও বিমুখ করা যায় না।

হারমোনিয়ামের সামনে পা মুড়ে বসলেন বিশাখা। শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে নিলেন গলায়। খুললেন গানের খাতা। সব গানই তাঁর মুখস্থ থাকে, তবু খাতাটা খোলা না রাখলে কিছুটা নার্ভাস লাগে।

যে ক'জন লোক বসে আছে, তারাও কি সবাই শ্রোতা? মাইকওয়ালা, ডেকরেটারের লোকজনও বসে আছে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। একজন-দুজন ঘুমোচ্ছে। বিশাখার মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে গেছে, তবু তিনি ভাবলেন, তাঁর গান গাইবার কথা, গান গেয়ে যাবেন। দর্শক-শ্রোতাদের দিকে তাকাবেনই না।

চোখ বুঁজে তিনি কয়েক মুহূর্ত আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেন।

তারপর শুরু করলেন গান।

প্রথম গানটি শেষ করার পর কেউ হাততালি দিল না। কেউ শুনছে কি শুনছে না, তাও বোঝা গেল না।

বিশাখা মাইক থেকে মুখ ফিরিয়ে একবার কেশে নিলেন। চারখানা গান গাওয়ার চুক্তি, পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবেন।

তৃতীয় গানটি শেষ হওয়ার পর তিনি খাতার পাতা ওলটাচ্ছেন, হল থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'!

বিশাখা মুখ তুললেন না। এতক্ষণ কেউ একজন একটু সাড়াশব্দ করল! কান দেওয়ার দরকার নেই। বিশাখা আগে থেকে যে গানটি ঠিক করে এসেছেন, সেটাই গাইবেন।

পরের গানটি শেষ হওয়া মাত্র আবার সেই গলা শোনা গেল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'।

বিশাখা এবার খাতা বন্ধ করতে-করতে বললেন, আজ আর না। অনেক রাত হয়ে গেছে।

তবু লোকটি অনুনয় করে বলল, ওই গানটা আপনার গলায় একবার শুনতে ইচ্ছে করছে।

সামনের সারিতে পাঁচ-ছ'জনের মাঝখানে বসে আছে লোকটি। বছর বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস হবে, গায়ের রং খুব ফরসা। কুর্তা-পাজামা পরা।

বিশাখা গান শিখেছেন শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে। তিনি প্রায়ই বলতেন, সব জায়গায় মনে রাখবে, অন্তত একজন শ্রোতা থাকে, যে গানের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কাজও বোঝে, সামান্য ভুল হলেও ধরতে পারে। তার কথা মনে রেখে গাইতে হয়।

চারখানা গান গাইবার কথা থাকলেও অনেক জায়গায় শ্রোতাদের অনুরোধে সাত-আটখানা গানও গাইতে হয়। সেখানে শ্রোতাদের আন্তরিকতা বোঝা যায়। এখানে সেরকম পরিবেশই নেই।

তবু বিশাখা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই গানটি গাইলেন। গাইতে-গাইতে তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন, তেমন ভালো হচ্ছে না। মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার চঞ্চলতা। এক-এক সময় গানে সুর-তাল-লয় সব ঠিক থাকে, তবু প্রাণ থাকে না।

এবার ফরসা ছেলেটি বলল, দিদি, আর-একটা গান গাইবেন?

বিশাখা শান্তভাবে বললেন, গাইব।

ছেলেটি কোনও বিশেষ গানের জন্য অনুরোধ জানাবার আগেই তিনি হারমোনিয়ামে সুর তুললেন।

মন-প্রাণ একাগ্র করে এ-গানটি বিশাখা নিজের জন্য গাইতে লাগলেন। 'চিরসখা হে ছেড়ো না...'। কোনও অনুষ্ঠানে যদি শেষ গানটি নিখুঁত না হয়, তাহলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। সারারাত ঠিক মতন ঘুম হয় না।

এবার হারমোনিয়াম বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাতজোড় করে নমস্কার জানালেন। কয়েকজন হাততালি দিল, তাদের মধ্যে ফরসা ছেলেটিকেই শুধু দেখতে পেলেন বিশাখা।

হারমোনিয়াম বিশাখার নিজস্ব। অন্যের হারমোনিয়ামে তিনি গান গাইতে পারেন না। উইংসের পাশে একজন স্বেচ্ছাসেবককে দেখে তিনি ব্যস্তভাবে বললেন, ভাই, শিগগির হারমোনিয়ামটা গাড়িতে তুলে দাও।

স্বেচ্ছাসেবকটি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুলে দিচ্ছি। আপনি একটু ভেতরে আসুন দিদি, সামান্য কিছু জলখাওয়ার...

বিশাখার গা জ্বলে গেল। রাত দশটার সময় জলখাবার? এতক্ষণ এক কাপ চাও দেয়নি। এখন ঠান্ডা সিঙারা আর চপ আর গাদাখানেক মিষ্টি দেবে, তা ছুঁয়েও দেখতে ইচ্ছে করে না। কেউ-কেউ একটা খাওয়ারের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দেয়, বিশাখা সেটা বাড়ি ফিরে দারোয়ানকে দিয়ে দেন।

তিনি বললেন, আমার আর এক মুহূর্ত দেরি করার উপায় নেই। গাড়ি রেডি আছে তো?

গাড়ি মানে ট্যাক্সি। ট্যাক্সির মালিক বোধহয় স্থানীয় কেউ। সেই ট্যাক্সিতেই বিশাখাকে কলকাতা থেকে আনা হয়েছে।

বিশাখা হলের পেছন দিকে চলে এলেন। সেখানে অনেকটা ফাঁক জায়গা গাড়ি পার্কিং-এর জন্য। এখন সেখানে শুধু সেই হলুদ ট্যাক্সিটাই রয়েছে। বৃষ্টি এত জোরে পড়ছে যে চতুর্দিক যেন ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

দরজা থেকে ওই ট্যাক্সিটার কাছে যেতে হলেই যে বিশাখাকে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে যেতে হবে!

দু-তিনজন সঙ্গে এসেছে, তারা চেঁচিয়ে উঠল, ছাতা! ছাতা

এরকম বৃষ্টির মধ্যেও কারুর কাছে ছাতা নেই।

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, দিদি, আপনি আজ খুব ভালো গেয়েছেন। শেষ গানটা শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

এরকম সময় প্রশংসা শুনতেও ভালো লাগে না। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। একটা ছাতা কেউ জোগাড় করতে পারছে না?

প্রশংসাকারী সেই ফরসা ছেলেটি। সে আবার বলল, আমার নাম টনি, আমার কাছে আপনার অনেক রেকর্ড আছে। আপনি একটা রেকর্ডে অটোগ্রাফ করে দেবেন?

যুবকটি বিশাখার চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। তাকে আপনি সম্বোধন করার প্রশ্ন ওঠে না। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, অতক্ষণ বসে ছিলাম, তখন আসতে পারোনি? এখন কিচ্ছু হবে না, আমাকে এক্ষুনি রওনা দিতে হবে।

টনি বলল, এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কী করে? রাস্তা ভালো নয়। বৃষ্টি একটু কমুক বরং...

একজন একটা ছাতা নিয়ে এসেছে। টনির কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বিশাখা বাইরে পা বাড়ালেন।

একজন তাঁর মাথায় ছাতা ধরেছে, বাকি কয়েকজন ভিজতে-ভিজতেই এল গাড়ির কাছে।

ট্যাক্সিটার সব দরজা বন্ধ। ভেতরে ড্রাইভার নেই। সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠল, ড্রাইভার! ড্রাইভার বলাই কোথায় গেল?

ড্রাইভারের কোনও পাত্তাই পাওয়া গেল না। সে এত বৃষ্টি দেখে কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই

ঘুমোচ্ছে আরাম করে।

টনি বলল, এত বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভার যেতে সাহস করবে না। দিদি, এই পাশেই আমাদের বাড়ি। একটু বসে যান।

অন্যরা বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদি, এর মধ্যে যেতে পারবেন না। টনিদের বাড়িতে বসুন।

রাগ করেও লাভ নেই। ড্রাইভার ছাড়া তো গাড়ি চলবে না।

বিশাখা অসহায়ভাবে বললেন, শেষ পর্যন্ত কি সারা রাতই আমাকে এখানে থেকে যেতে হবে নাকি?

উদ্যোক্তাদের একজন বলল, না-না। ড্রাইভারকে খুঁজে আনছি। যত রাতই হোক আপনাকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আমাদের একজন সঙ্গে যাবে। আসুন, আমাদের সঙ্গে আসুন। একটু বসবেন, চা-টা খাবেন।

অগত্যা বিশাখাকে যেতেই হল ওদের সঙ্গে। পাশেই একটা রাস্তা, সেখানে কাদা চটচট করছে। শুধু ছাতাতেও এত বৃষ্টি আটকানো যায় না। শাড়ি ভিজে যাচ্ছে বিশাখার, জুতো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

টনির বাড়ি পাশেই, মানে খুব কাছে নয়। গ্রামের লোকদের কোনও দূরত্ববোধ নেই। তিন-চার মিনিট হাঁটতে হল। তারপর একটা গেট পেরিয়ে বাগান। বাগানের ওপাশে বাড়িটার সদর দরজার দু-পাশে রক, কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়।

প্রথম সিঁড়িটায় পা দেওয়া মাত্র হড়কে গেল। বিশাখা বেশ জোরেই পড়ে যেতেন, শেষ মুহূর্তে টনি তাঁর হাত ধরে ফেলল।

শরীরটা কুঁকড়ে গেল তাঁর। গায়ে কেউ হাত দেওয়া তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। অনেকে কথা বলতে-বলতে হাত জড়িয়ে ধরে, তাতেও তিনি খুব বিরক্ত হন। তবে টনি না ধরলে তিনি যে বিশ্রীভাবে আছাড় খেতেন, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। পা-টা মুচকে গেল নাকি?

তাঁকে এনে বসানো হল একটি বৈঠকখানা ঘরে।

দেখলে মনে হয়, বাড়ির মালিক বেশ অবস্থাপন্ন। কিন্তু রুচি খুব স্থূল। ঘরের মধ্যে একগাদা জিনিসপত্র, টি.ভি., টু-ইন-ওয়ান, বড় আয়না, স্টিলের আলমারি, পাথরের টেবিলে পেতলের ফুলদানিতে কাগজের ফুল। দেওয়ালে ক্যালেন্ডারের ছবি বাঁধানো।

চা ও খাবারের অনুরোধ কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে বিশাখা বললেন, আমি শুধু এক গেলাস জল খাবো।

সবাই সবার পরিচয় করাতে শুরু করল বিশাখার সঙ্গে। কে ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, কে প্রাক্তন ট্রেজারার, এসব জেনে বিশাখার লাভ কী?

এইটুকু বোঝা গেল যে এই টনি নামের ছেলেটির দাদার নাম বাদশা হোক, সে ওই সিনেমা হলটা ওদের বাবার হয়ে দেখাশুনো করে। বাদশা হক এখানে নেই, সে বম্বের হিন্দি গায়িকাকে পৌঁছাতে চলে গেছে আগেই।

টনি গোটা তিনেক লং প্লেয়িং রেকর্ড আর সাত-আটটা ক্যাসেট নিয়ে এসে বলল, এই দেখুন, এই সবগুলো আপনার!

বিশাখা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আগে এসব দেখলে খুশি হতেন। মফস্‌সলেও তাঁর গানের এমন ভক্ত আছে, এটা জানলে ভালো লাগবার কথা। কিন্তু গত দু-বছরে বিশাখার নতুন কোনও ক্যাসেট বেরোয়নি। কমপ্যাক্ট ডিসক বার করার প্রস্তাব কেউ দিল না, এজন্য তাঁর মনের মধ্যে হতাশার ভাব এসেছে। গায়িকা হিসেবে তাঁর দিন কি ফুরিয়ে এল?

একটা কলম নিয়ে তিনি অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ক্যাসেটে সই করলেন।

জলের গেলাস এল তিন-চার মিনিট পরে। তারপর কয়েক কাপ চা-ও এল। কয়েকজন লোক চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

বিশাখা বললেন, বৃষ্টি থামল না?

একজন বলল, দিদি, আজ রাতটা এখানেই থেকে যান না। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

টনি বলল, আলাদা ঘর আছে। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম।

বিশাখা দৃঢ়ভাবে বললেন, না।

তারপর উঠে দরজার কাছে গিয়ে বৃষ্টির তেজ দেখার চেষ্টা করলেন।

মহিলা শিল্পীরা সাধারণত মফস্সলের ফাংশানে একা যান না, সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক কিংবা নিজের তবলচি অন্তত থাকে। বিশাখার কোনও নির্দিষ্ট তবলচি নেই, রবীন্দ্রসংগীতের জন্য লাগেও না। বরাবরই তিনি একা যান, যখন আরও কম বয়েস ছিল, শুধু গায়িকা নন, সুন্দরী যুবতী হিসেবেও আকর্ষণীয়া ছিলেন, তখনও।

এখন মধ্যগগন পার হয়ে এসেছেন, সবাই দিদি বলে। কেউ-কেউ মাসিমা বলেও ডাকে।

অনেকবারই দেখা গেছে, নিয়ে যাওয়ার সময় যেমন ব্যস্ততা থাকে, ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তেমনই ঢিলেমির ভাব থাকে উদ্যোক্তাদের। আজ অবশ্য এত বৃষ্টি নেমেছে, সেটা কারুর দোষ নয়, কিন্তু ট্যাক্সির ড্রাইভারকে পাওয়া যাবে না কেন? বৃষ্টির মধ্যে কি গাড়ি চলে না?

মিনিট পাঁচেক পর একজন খবর নিয়ে এল, ট্যাক্সি ড্রাইভারের খুব পেটব্যাথা, চার-পাঁচবার টয়লেটে গেছে, সে যেতে পারবে না, বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

রাগে-দুঃখে বিশাখার আঙুল কামড়াবার ইচ্ছে হল। যেন তিনি ফাঁদে পড়ে গেছেন। এখান থেকে পালাবার কোনও উপায় নেই।

সবাই মিলে তখন আবার বলতে লাগল, দিদি, থেকে যান, থেকে যান।

টনি চুপ করে বিশাখার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। এবার সে একজনকে বলল, ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এসেছিস তো! ঠিক আছে, আমিই দিদিকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। উনি যখন এখানে থাকতে চান না।

বিশাখা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, চলো।

এরই মধ্যে রাত এগারোটা বেজে গেছে। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে যাবে টনি, আবার ফিরবে, অনেক রাত হয়ে যাবে।

তবু ওর সমবয়স্ক দুজন বলল, তুই একা-একা ফিরবি? আমরাও যাচ্ছি তোর সঙ্গে।

টনি বলল, না, আর কারুকে যেতে হবে না। এত রাতে গিয়ে আমি আর ফিরব না। কালীঘাটে আমার বন্ধুর পেট্রোল পাম্পে থেকে যাব।

তৈরি হওয়ার জন্য বাড়ির ভেতরে চলে গেল টনি।

বসবার ঘরে এ-বাড়ির কোনও মহিলা উঁকিঝুঁকি মারেননি। কোনও মহিলার সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। একটি কিশোরী অনেকক্ষণ ধরে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে এককোণে। মনে হয় সে অন্য বাড়ির মেয়ে।

আর একটু পরে টনি ট্যাক্সিটাকে নিয়ে এল এ-বাড়ির কাছে, বিশাখা উঠে পড়লেন।

মাইনে করা ড্রাইভার ছাড়া, মালিক শ্রেণির কোনও পুরুষ যদি একা গাড়ি চালায়, তাহলে মহিলাদের তার পাশে বসাই নিয়ম। বিশাখাও সামনের সিটে বসলেন।

গাড়িটা স্টার্ট নেওয়ার পর তিনি টনিকে জিগ্যেস করলেন, তোমার কি গাড়ি চালাবার অভ্যেস আছে?

টনি হেসে বলল, ভয় পাবেন না। আমার দশ বছরের লাইসেন্স আছে। এই ট্যাক্সিটাও আমি অনেকবার চালিয়েছি। এটা আমার কাকার ট্যাক্সি।

বাড়ির ফেরার সম্ভাবনায় খানিকটা মেজাজ প্রসন্ন হয়েছে, বিশাখা তাই ভদ্রতা করে বললেন,

আমার জন্য এত রাতে তোমাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে। কিন্তু আমার একটা ফেরার ব্যবস্থা ঠিকমতন করে রাখা উচিত ছিল না? ট্যাক্সি ড্রাইভারটির কোনও দায়িত্বজ্ঞান নেই। পেটব্যথা এমনই এক জিনিস, সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, তা বোঝার উপায় নেই!

টনি বলল, তা যা বলেছেন। ওই বলাই ড্রাইভারটা লোক সুবিধের নয়, আমার পক্ষে কিন্তু ভালোই হল, আপনার মতন একজনকে পৌঁছে দেওয়া তো ভাগ্যের কথা। এতটা পথ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব!

—তুমি কলকাতায় আজ রাতটা থেকে যাবে?

—কালীঘাটে আমার এক বন্ধুর পেট্রল পাম্প আছে। ট্যাক্সিটা সেখানে তুলে দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব।

—পেট্রোল পাম্পে শোওয়ার জায়গা আছে?

—তা জানি না। এত রাতে আমার বন্ধুও থাকবে না। কর্মচারীরা আমাকে চেনে। গাড়ির মধ্যেই শুয়ে থাকব। কয়েক ঘণ্টার তো কারবার।

—গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকবে? মশা কামড়াবে না?

—এই রে, সে কথা তো ভেবে দেখিনি! আমাদের সুলতানপুরে খুব মশা, কলকাতাতেও মশা আছে বুঝি?

—আছে মানে, খুব বেড়েছে। মশার কামড়ে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হচ্ছে।

—কত ট্যাক্সি ড্রাইবার তো গাড়িতে শুয়েই রাত কাটায়।

—তুমি তো ট্যাক্সি ড্রাইভার নও! তোমাদের অত বড় বাড়ি, তুমি কী করো টনি?

—সেরকম কিছু করি না। আমাদের পারিবারিক বিজনেস আছে কয়েকটা, ওই সিনেমা হল, চালের কল, বাজারে একটা রেডিও-টিভি-র দোকান, এই সবই টুকটাক দেখি।

হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে, রাস্তা একেবারে জনমানবহীন। বৃষ্টির তেজ এখনও খুব। গাড়ির সব কাচ তোলা।

টনি নিজের পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে কয়েকবার উসখুস করে তারপর বলেই ফেলল, দিদি, একটা কথা বলব, রাগ করবেন না? একটা সিগারেট খেতে পারি? আপনি কিছু মনে করবেন?

বিশাখা বললেন, তুমি কী সিগারেট খাও, প্যাকেটটা দেখি!

টনির কাছ থেকে প্যাকেটটা নিয়ে তিনি খানিকটা লজ্জিতভাবে বললেন, ভাগ্যিস তুমি ওই কথাটা বললে। একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরে আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল। লোকজনের সামনে তো খেতে পারি না। মেয়েরা সিগারেট খেলে, বিশেষত আমাদের মতন রবীন্দ্রসংগীত গায়িকাকে সিগারেট খেতে দেখলে সবাই খুব শক্‌ড হয়। আমাদের ইমেজ খারাপ হয়ে যায়। আমি বেশি খাই না। তবে প্রোগ্রাম শেষ করার পর বাড়ি ফেরার পথে—। আজ এত দেরি হচ্ছিল—

টনি বলল, আমাকে যদি ইঙ্গিতে একটু জানাতেন, পাশের ঘরে ব্যবস্থা করে দিতাম, দরজা বন্ধ করে আপনি বিশ্রাম নিতেন।

সিগারেট ধরাবার পর নিজের দিকের জানলার কাচ একটু নামিয়ে দিলেন বিশাখা। একটু ছাঁট আসছে, গ্রাহ্য করলেন না। বৃষ্টি তাঁর ভালো লাগে। বহুবার শখ করে বৃষ্টিতে ভিজেছেন।

তিনি টনির দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের বাড়িতে থেকে যাওয়ার জন্য সবাই বারবার অনুরোধ করছিলে। আমি আজকের রাতটা থেকে গেলে তোমাদের সবারই খুব সুবিধে হত জানি। কিন্তু অচেনা কারুর বাড়িতে থাকতে আমার খুব অস্বস্তি হয়। নিজের বিছানায় না শুলে আমার ঘুম হয় না।

টনি বলল, তাতে কী হয়েছে? আমার গাড়ি চালাতে ভালোই লাগে। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনারা

ফাংশন ছাড়া অন্য সময় এমনি-এমনি গান করেন না?

বিশাখা বললেন, কেন করব না? রোজ বাড়িতে নিয়মিত রেওয়াজ করি। শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, ক্লাসিক্যাল গানে গলা সাধি। টপ্পা গাই।

—বাড়ির বাইরে অন্য কোথাও?

—অনেক ঘরোয়া আসরে যেতে হয়। পয়সা-টয়সার ব্যাপার নেই। সেইসব জায়গায় বরং মুড এলে অনেক বেশি গান গাইতে ইচ্ছে করে। ছোট আসরে গান ভালো জমে।

—একবার রবীন্দ্র সদনে আপনি চোদ্দোটা গান গেয়েছিলেন।

—সে তো বছর পাঁচেক আগে। তুমি সেদিন ওখানে ছিলে নাকি?

—না, কাগজে পড়েছি। ম্যাডাম, আপনার সম্পর্কে যেখানে যা বেরোয়, সব পড়ি।

—বেশ তো দিদি বলছিলে, হঠাৎ ম্যাডাম-ম্যাডাম শুরু করলে কেন?

—দিদি বলাটা ঠিক হচ্ছিল কি না বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, দিদিই বলব। দিদি, এরকম চলন্ত গাড়িতে আপনি কখনও গুনগুন করে গান করেন না?

—ও, তুমি আমাকে দিয়ে এখন আবার গান গাওয়াতে চাও! তুমি দেখছি সত্যি গান ভালোবাসো। নিজে গান করো নাকি?

—না, না। আমার গলায় সুর নেই। একটু-আধটু বাঁশি বাজাতে পারি। সে কিছু নয়। রোজ রাত্তিরে কয়েকটা গান না শুনে আমি ঘুমোতে যাই না।

বিশাখা কী গান গাইবেন, ভাবতে লাগলেন।

অন্য একটা কথা মনে পড়ায় তাঁর হাসি পেয়ে গেল।

দৃশ্যটা তো বেশ রোমন্টিক। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে একজন বেশ সুদর্শন পুরুষ। পাশে বসে আছে নায়িকা। পথঘাট নির্জন। বাংলা সিনেমায় এরকম সিচুয়েশানে নায়িকার গলায় একটা গান থাকবেই থাকবে।

কিন্তু এখানে পুরুষটির চেয়ে তাঁর বয়েস অন্তত কুড়ি বছর বেশি। মাথার চুলে পাক ধরেছে বলে মেহেদি লাগাতে হয়। পুরুষটি তাঁকে প্রথমেই দিদি বলে সম্বোধন করেছে। দিদি কেন, তিনি টনির মায়ের বয়সিও হতে পারেন।

নাঃ, এখন গান গাইতে ইচ্ছে করছে না। টনির বদলে শুভ্রাংশু কিংবা বিজনের মতন কোনও বন্ধু যদি এসব বৃষ্টির রাতে সঙ্গে থাকত, তাহলে বিশাখা নিজে-নিজেই গান গেয়ে উঠতেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন, টনি, তোমার ভালো নাম কী?

টনি বলল, সবাই আমাকে টনি বলে। বাড়িতেও। আমার পুরো নাম মোজাম্মেল হক। ইস্কুলের বন্ধুরা আমাকে মোজা-মোজা বলে খ্যাপাত। অনেকেই আমাদের আরবি নাম মনে রাখতে পারে না।

বিশাখা বললেন, সেজন্য আমাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। তোমরা কথা বলবে বাংলায়, আচার-আচরণ ব্যবহার-ট্যাবহার সবই বাঙালিদের মতন, নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেবে, আর নাম রাখবে আরবিতে। এটা কেমন ব্যাপার?

টনি চুপ করে রইল।

বিশাখা আবার বললেন, ইন্দোনেশিয়া, চিনেও তো মুসলমান আছে। তারা ওইসব দেশের ভাষাতেই নাম রাখে।

টনি বলল, আমি তো আর নিজের নাম রাখিনি।

বিশাখা বললেন, গত মাসে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ওরা এখন কী সুন্দর-সুন্দর নাম রাখে। একটা বাচ্চা ছেলের নাম সাহস। সাহস রহমান। শুনতে কী ভালো লাগে! আর একটা মেয়ের নাম তৃণা মুরশেদ। এইসব নাম শুনলেই মনে থাকে। তোমার ডাকনাম টনিই বা কী করে হল?

ইংরেজি নাম কি গ্রামের দিকে কেউ রাখে?

টনি বলল, ছোটবেলায় আমার খুব জ্বর হত। খুব ভুগতাম, তাই আমাকে নিয়মিত টনিক খাওয়ানো হত। ডাক্তারবাবু বলতেন, এই ছেলেটাকে আমি টনিক বলে ডাকব। সেই থেকে টনি।

বৃষ্টি বেশ কমে এসেছে। গড়িয়া মোড়ের কাছাকাছি এসে পড়ায় এখন রাস্তায় গাড়িও দেখা যাচ্ছে কিছু-কিছু। বিশাখা পুরো কাচ নামিয়ে দিলেন।

টনি বলল, আপনি আমাদের বাড়িতে এক কাপ চা-ও খেলেন না। পিসিমা লুচি ভেজে দেওয়ার কথা বলছিলেন, আপনাকে সে কথা বলতে সাহসই করিনি। এমন উগ্র মেজাজে ছিলেন!

বিশাখা বললেন, আমি রাত্তিরে শুধু খানিকটা সুপ আর দুটো টোস্ট ছাড়া কিছু খাই না। সন্ধে ছ'টার পর কোনওদিন চায়ে চুমুক দিইনি। সব কিছুরই তো একটা সময়-অসময় থাকে? রাত দশটায় কেউ চা খায়? আমাকে তোমরা সাড়ে আটটার মধ্যে ছেড়ে দেবে বলেছিলে।

টনি বলল, বৃষ্টির জন্য সব গোলমাল হয়ে গেল।

—হিন্দি গান তোমরা আগে দিলে কেন? ওই গায়িকাকে তোমরা শেষের জন্য রাখলে ওর টানেই অনেক লোক বসে থাকত।

—ওনার আর একটা প্রোগ্রাম ছিল সোনারপুরে। তখন না বসালে উনি জোর করে চলে যেতেন।

—ওর জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, তাই না? সে গাড়ির ড্রাইভারের পেটের অসুখ হয় না! আমাকে রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য ডাকলে কেন? ওসব জায়গায় ক'জন রবীন্দ্রসংগীত শোনে?

—আমার খুব ইচ্ছে ছিল...বেশি লোক থাকেনি, সেজন্য খুব দুঃখিত দিদি। কিন্তু আপনার গান খুব ভালো হয়েছে।

—বুঝেছি। তুমিই আমার নাম সাজেস্ট করেছিলে। তোমরা সিনেমা হলের মালিক। বিনা পয়সায় হল দিয়েছ, তাই তোমার কথা কমিটি উপেক্ষা করতে পারেনি। তুমি রবীন্দ্রসংগীত এত ভালোবাসো, তোমাদের বাড়িতে বুঝি গান-বাজনার চর্চা ছিল?

—সেরকম কিছু ছিল না, বাবা বাড়ির মধ্যে গান-বাজনা পছন্দ করেন না...তবে আমাদের বাড়িতে একজন রবীন্দ্রসংগীত গাইত—

টনির কথা শেষ হল না। সামনের রাস্তা জুড়ে তিন-চারখানা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, কিছু লোকজনের ভিড়। এত রাতে ট্রাফিক জ্যাম?

টনি অস্ফুট স্বরে বলল, মনে হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আপনি একটু বসুন দিদি।

দরজা খুলে সে নেমে গেল।

বিশাখা আবার অস্থিরবোধ করলেন। বৃষ্টি থেমে গেলেও এখনও গুমোট ভাব আছে। ফাংশানের জন্য বিশাখা একটা সিল্কের শাড়ি পরে এসেছেন, এখন গায়ে চিটচিট করছে, কতক্ষণে বাড়িতে গিয়ে এই শাড়ি ছেড়ে একটা সুতির শাড়ি পরবেন, সেজন্য ছটফট করছে মন।

বাড়িতে অবশ্য বিশাখার জন্য কেউ অপেক্ষা করে নেই।

মিনিট পাঁচেক বাদে টনি ফিরে এল। কপাল কুঁচকে বলল, খুব মুশকিলের ব্যাপার, দুটো ট্রাকে একেবারে মুখোমুখি কলিসান, দুজন ড্রাইভারই দারুণ ইনজিওরড, পুলিশ না এলে সরানো যাবে না।

বিশাখা ঝাঁঝালো গলায় বললেন, ততক্ষণ আমাদের বসে থাকতে হবে?

টনি বলল, থানায় লোক গেছে।

—আর কোনওদিন আমি তোমাদের ওই সুলতানপুরের মতন এলেবেলে জায়গায় গান গাইতে যাব না।

—বাঃ, এটা তো আমাদের দোষ নয়।

—নিশ্চয়ই তোমাদের দোষ। কেন আমায় সাড়ে আটটার মধ্যে ছেড়ে দাওনি? ওই হিন্দি গায়িকাকে খাতির করার জন্য তোমরা ব্যস্ত ছিলে।

—সবচেয়ে নামকরা শিল্পীকে শেষকালে দিতে হয়। সেই ভেবে আমরা—

—মোটে কুড়িজন শ্রোতা! তোমাদের টাকাটা জলে গেছে, আমারও পণ্ডশ্রম। যথেষ্ট হয়েছে, সামান্য ক'টা টাকার জন্য আমি আর মফস্সলে কখনও যাব না। আমি নেমে যাচ্ছি।

—নেমে যাবেন মানে? কোথায় যাবেন?

—হেঁটে যাব। সারারাত এই গাড়ির মধ্যে বসে সেদ্ধ হব নাকি?

—হেঁটে যাবেন কী, এখনও অনেক দূর। একটা চান্স নেওয়া যাক। দিদি, আপনি শক্ত হয়ে বসুন। ঝাঁকুনি লাগতে পারে।

গাড়িতে আবার স্টার্ট দিয়ে জোরে একটানা হর্ন বাজাতে শুরু করল টনি। তারপর রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা নেমে পড়ল পাশের মাঠে। এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, এক জায়গায় ইঁটের গাদা, সেসব কিছু গ্রাহ্য করল না টনি, জোর স্পিডে চালাতে লাগল। গাড়িটা লাফাচ্ছে, এদিক-ওদিক দুলছে, উলটেও যেতে পারে।

ভয় পেলেন না বিশাখা। খানিকটা ঝুঁকি, খানিকটা বিপদের গন্ধ তাঁকে সুখকর উত্তেজনা দেয়। একসময় একজন তাঁকে পাশে নিয়ে দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালাত। তখন গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করত বিশাখার।

টনির দিকে ফিরে তিনি মুগ্ধভাবে হাসলেন। ছেলেটা সত্যিই ভালো গাড়ি চালায়।

॥ ২ ॥

থিয়েটার রোডে এগারোতলা বাড়িটির সামনে পৌঁছতে আর কোনও বিঘ্ন হল না। বিশাখার অ্যাপার্টমেন্ট আটতলায়। লিফ্‌টম্যানরা রাত দশটার পর চলে যায়। হারমোনিয়ামটা ওপরে তুলতে হবে। একটা ফুলের তোড়াও সঙ্গে রয়েছে।

টনি নেমে দাঁড়িয়ে বলল, দিদি, আপনি ফুলগুলো নিন, আমি হারমোনিয়ামটা নিয়ে যাচ্ছি।

রাত প্রায় বারোটা। এ-বাড়িতে আর কোনও লোকের সাড়াশব্দ নেই। গেটে দারোয়ান ঝিমোচ্ছে। টনি বিশাখার সঙ্গে এসে লিফটে উঠল।

আটতলায় পৌঁছে বিশাখা হাতব্যাগ থেকে চাবি বার করলেন। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে আলো জ্বাললেন।

টনি চটি খুলে হারমোনিয়ামটা নিয়ে ভেতরে আসতে যাচ্ছিল, বিশাখা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আর আসতে হবে না, দরজার পাশে ওই টুলটার ওপর রেখে দাও। আমি নিয়ে নেব।

তারপর দরজার পাল্লায় হাত দিয়ে কৃত্রিম ভদ্রতার সুরে বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাকে কষ্ট করে এতদূর আসতে হল, খুব দেরি হয়ে গেছে, তুমি সাবধানে যেও।

বিশাখা দরজাটা বন্ধ করবেন, টনি তবু দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিশাখার মুখের দিকে।

বিশাখা একটা ছোট হাই তুলে আবার বললেন, ঠিক আছে! গুড নাইট।

টনি বলল, দিদি, একটা কথা জিগ্যেস করব? আমি ভেতরে গেলে, আপনার হারমোনিয়ামটা ভেতরে রেখে এলে কি আপনার বাড়ি অপবিত্র হয়ে যেত?

বিশাখা যেন কেঁপে উঠলেন। রক্তিমাভা এসে গেল তাঁর মুখে। বিস্ফারিত চোখে কয়েক

মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন টনির দিকে। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, তোমাকে একটা থাপ্পড় মারব! তুমি আমাকে এরকম অপমান করলে! আমি এরকম তুচ্ছ ব্যাপারে পাপ-পুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাব? আমি সারাজীবন রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে পড়ে আছি, রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে আদর্শ করেছি, আমি এলেবেলে কোনও সংস্কার মানতে যাব? কেন বললে ওই কথা!

টনি অপরাধীর মতন মুখ নিচু করে বলল, মাপ করবেন, আপনাকে অপমান করতে চাইনি। আপনি আমাদের বাড়িতে থাকলেন না, কিছু খেলেন না, আপনার বাড়িতেও আমাকে চৌকাঠের ওপারে যেতে দিলেন না। তাই ভাবলাম, হয়তো আপনি...

বিশাখা বললেন, তোমাদের বাড়িতে কেন থাকিনি, খাইনি, তার কারণ অনেকবার বলেছি। আমার বাড়িতে আমি হুট করে কোনও অচেনা পুরুষ মানুষকে ঢুকতে দিই না। আমি একা থাকি, কার মনে কী আছে তা বুঝব কী করে? তা ছাড়া এত রাত হয়ে গেছে, এই কি ভদ্রতা করার সময়? তুমি দুম করে একটা আঘাত দিলে আমাকে? কোনও একা মহিলা এত রাতে কোনও পুরুষকে ভেতরে আসতে বলে?

টনি বলল, আপনি একা থাকেন, বুঝতে পারিনি। আবার মাপ চাইছি। আচ্ছা চলি। আপনার অনেক অসুবিধে হয়েছে, সেজন্য ক্ষমা করবেন।

বিশাখা খপ করে টনির একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ভেতরে নিয়ে এলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে রাগে গরগর করতে-করতে বললেন, যাও, এবার আমার সারা ফ্ল্যাটটা ঘুরে তোমার ধুলো পায়ে নোংরা করে এসো। তোমার যা খুশি করো। আমাকে তুমি ওই কথা বলতে পারলে? আমার ছেলের বন্ধু ফারুখ আর আতিকুজ কতদিন এখানে রাত্রে থেকেছে, আমি দুর্গাপুরে ছিলাম, ওরা নিজেরা রান্না করে খেয়েছে, আমার খুব শখের ডিনার সেটের একটা প্লেট ভেঙেছে—

টনির একেবারে কাঁচুমাচু অবস্থা। মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরোচ্ছে না।

বিশাখা হুকুমের সুরে বললেন, বসো! ওই সোফাটায় বসো!

টনি ধপ করে বসে পড়ল। মিনমিন করে বলল, আপনি যে একা থাকেন, সত্যি বুঝতে পারিনি।

বিশাখা বললেন, চাবি দিয়ে দরজা খুললাম, দেখলে না? বুদ্ধি নেই?

বিশাখার বসবার ঘরটি নিখুঁতভাবে সাজানো। একদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি, অন্যদিকের দেওয়ালে কোনও আধুনিক শিল্পীর পেইন্টিং। একটাও অতিরিক্ত আসবাব নেই। দেরাজ খুলে একটি ব্র্যান্ডির বোতল বার করে ঢকঢক করে খানিকটা চুমুক দিলেন বিশাখা।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, বাড়ির মধ্যে আমি বাপু ইমেজ-টিমেজ রক্ষা করতে পারব না। রাত্তিরের দিকে আমি খানিকটা মদ খাই। সে তুমি যা-ই মনে করো। হ্যাঁ, ভালো কথা। আমার রাগারাগি দেখে তুমি তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলে। নিশ্চয়ই কিছু খাওনি! সারারাত না খেয়ে থাকবে?

টনি বলল, না, না, কোনও অসুবিধে নেই। এখনও কিছু-কিছু পাঞ্জাবির দোকান খোলা থাকে। রুটি-তড়কা-মাংস সব পাওয়া যায়।

বিশাখা বললেন, পাঞ্জাবির দোকান! মাংসতে একগাদা মশলা দেয়। আগের দিনের মাংস থাকলে পরের দিন অন্য মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তড়কা বারবার গরম করতে-করতে বিষ হয়ে যায়। ওগুলো খাবে?

টনি বলল, আমি অনেকবার খেয়েছি। ওগুলো খেতে আমার ভালো লাগে।

বিশাখা বললেন, যত রাজ্যের অখাদ্য। অস্বাস্থ্যকর জিনিসগুলোই খেতে বেশি ভালো লাগে। তারপর যখন অ্যাসিডিটির রোগ ধরে যাবে—। শোনো, আমার অনেকখানি সুপ তৈরি করা আছে। পাঁউরুটিও আছে। আমার সঙ্গে ওগুলো খাবে?

টনি অর্ধেক ওঠার ভঙ্গি করে ব্যস্তভাবে বলল, না, না, দিদি, আপনি ভাববেন না। আমি অনেক জায়গায় খাওয়ার পেয়ে যাব।

বিশাখা বললেন, যদি শুধু সুপ খেতে না চাও, ডিম ভেজে দিতে পারি।

টনি হাতজোড় করে বলল, কিছু দরকার নেই। আমি এবার যাচ্ছি। আপনি এবার বিশ্রাম নিন।

বিশাখা তর্জনী তুলে বললেন, চুপটি করে বসে থাকো। একদম উঠবে না। আমি শাড়িটা বদলে আসছি। এর মধ্যে চলে যাবে না কিন্তু। ইচ্ছে করলে সিগারেট খেতে পারো।

বিশাখা দ্রুত পায়ে চলে গেলেন বাথরুমে।

মিনিট দশেক বাদে যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর অন্যরকম চেহারা। খোঁপা খুলে পিঠের ওপর ছড়ানো চুল। একটা আটপৌরে ডুরে শাড়ি পরা। মুখের মেকআপ ধুয়ে গেছে।

এক সময় বিশাখার রূপের বেশ খ্যাতি ছিল। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়েই তাঁকে সিনেমায় নামানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন দুজন পরিচালক, বিশাখা রাজি হয়নি। অভিনয়ের থেকে গানের প্রতিই তাঁর ভালোবাসা ছিল বেশি। গ্ল্যামারের জগৎ তাঁকে আকর্ষণ করেনি, গান গেয়ে খ্যাতি কিংবা অর্থ উপার্জনের কথাও তাঁর মনে আসেনি তখন, গান ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ।

এখন বয়েসের হিসেবে তাঁকে প্রৌঢ়ই বলা উচিত, কিন্তু শরীর থেকে যৌবন এখনও চলে যায়নি। এক-একদিন উচ্ছল হয়ে দু-এক পাক নাচ শুরু করলে তাঁকে যুবতী বলেই মনে হয়। যদিও সাজগোজের দিকে তাঁর তেমন মনোযোগ নেই। বাড়িতে খুব সাধারণভাবে থাকেন, কোনও পত্র-পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেন না।

টনি কাচের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছে, বিশাখা বললেন, কোনও বই যেন আবার চেয়ে বসো না। আমি কারুকে বই দিই না। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীদের নিজের হাতে সই করা বই আছে।

রান্নাঘরে ঢুকে গ্যাস জ্বালালেন।

টনি আবার বলল, দিদি, আমি যাই। আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন, নিজের হাতে রান্না করবেন?

বিশাখা বললেন, নিজের হাত ছাড়া পরের হাত পাবো কোথায়? ফ্ল্যাট বাড়িতে অল্পবয়েসি কাজের মেয়ে রাখলে তাদের আবার চরিত্র রক্ষার দায়িত্ব নিতে হয়। একটা মেয়ে ছিল। সে এক ড্রাইভারের সঙ্গে ভেগে গেল। ভালোই করেছে। ঝি-গিরি করার চেয়ে ড্রাইভারের বউ হওয়া ভালো নয়? বেশি বয়েসি মহিলা রাখলে তারা প্রায়ই রোগে ভোগে, সে এক ঝামেলা। সেরকমও ছিল একজন, আমাকেই তার সেবা করতে হত। এখন একটা ছেলেকে রেখেছি, সারাদিন কাজ করে, সন্ধের পর নিজের বাড়ি চলে যায়। রাত্তিরে ভেতরে ঢুকতে দিই না। প্রায়ই তো কাগজে দেখি, একলা মনিব পেলে চাকররা গলা টিপে মেরে ফেলে রেখে যায়। আমার ছেলে থাকে কানপুরে। আমি একলা নির্ঝঞ্ঝাটে ভালোই আছি।

টনি বলল, আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?

—কিচ্ছু না। চুপটি করে বসে থাকো। তুমি মদ-টদ খাও?

—জি না। কখনও খাইনি।

—বেশ, গুড বয়। তোমার বাড়িতে কে-কে আছে টনি?

—বাবা আছেন, তিন ভাই, দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।

—মা নেই?

—আমার ছোটবেলায় মা চলে গেছেন।

—তুমি বিয়ে করোনি?

—জি না।

—কেন করোনি?

—মানে, করিনি, মানে হয়ে ওঠেনি।

—বয়েস তো খুব কম নয়। কত বয়েস তোমার?

—চৌতিরিশ।

—ঠিকই আন্দাজ করেছি। তুমি আমার থেকে ঠিক কুড়ি বছরের ছোট। আমার ছেলের চেয়ে তুমি পাঁচ বছরের বড়। আমার একটিই ছেলে। ইঞ্জিনিয়ার। তুমি নিশ্চয়ই প্রথম থেকেই ভাবছ, আমি একা থাকি কেন? অন্য লোকজন কোথায়? আমার স্বামীর সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে। অন্য আত্মীয়-স্বজন আছে, আমার বাবা বেঁচে আছেন, কিন্তু আমি একা থাকাই পছন্দ করি।

দুটি বাটিতে সুপ, গোটা ছয়েক টোস্ট ছাড়াও টনির জন্য একটা ডাবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে ফেলেছেন বিশাখা। সেগুলি খাওয়ার টেবিলে সাজালেন। নিজের জন্য একটা গেলাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে তিনি বললেন, এসো টনি। বসে পড়ো। জোয়ান ছেলে, এতে তোমার পেট ভরবে না হয়তো, রাত্তিরটা চলে যাবে।

টনি বলল, না, না, এই তো যথেষ্ট। আমি বেশি খাই না।

বিশাখা বললেন, আমার পতিদেবতাটি খুব মদ্যপ ছিলেন। তিনিই আমাকে ব্র্যান্ডি খাওয়া ধরিয়েছেন। আমি কিন্তু কখনও নেশা করিনি। ফাংশনে গান গাওয়ার একটা একজারশান তো আছেই, দু-তিন চুমুক ব্র্যান্ডি খেলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যায়। তুমি আমাকে দেখে শক্‌ড হওনি তো?

টনি বলল, আজ্ঞে না, আমি নিজে খাই না, কিন্তু অন্য কেউ খেলে আপত্তি করব কেন?

বিশাখা বললেন, কোনও মহিলাকে আগে খেতে দেখেছ?

টনি বলল, দেখিনি, কিন্তু শুনেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি একবার। গত বছরে একটি ফিলমের শুটিং হয়েছিল আমাদের ওদিকে, বম্বে থেকে ফিলম পার্টি এসেছিল, সন্ধের সময় পার্টি হত। একদিন দেখেছিলাম হিরোইনরাও ড্রিংক করছে।

বিশাখা মুচকি হেসে বললেন, ড্রিংক! মদ বলতে নেই। সফট ড্রিংক, হার্ড ড্রিংক, এইরকম সবাই বলে, শুনতে ভালো শোনায়। টনি, তুমি মদ খাও না, দেখতে শুনতে ভালো, বাড়ির অবস্থাও বেশ সচ্ছল মনে হল, তবু বিয়ে করোনি এখনও, খুব আশ্চর্য লাগছে। তোমার জন্য পাত্রী দেখব? আমার কাছে অনেক মেয়ে গান শিখতে আসে, কী বলো, ঘটকালি শুরু করব?

টনি মুখ নিচু করে বলল, না, আপনার কাছে যারা গান শিখতে আসে, তারা তো সবাই হিন্দু?

বিশাখা ভুরু তুলে বললেন, তোমার বুঝি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে?

টনি বলল, একটি হিন্দু মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। মেয়েটিও রাজি ছিল। কিন্তু মেয়েটির বাবা এমন খেপে গেলেন যে মেয়েটিকে জোর করে সিঙ্গাপুরে তার দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বিশাখা টেবিলে এক চাপড় মেরে বললেন, শালা!

তারপর রাগে গরগর করতে-করতে বললেন, এসব কথা শুনলেই গা জ্বলে যায়। টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে পা দিতে চলেছি, মহাকাশে মানুষ সাঁতার কাটছে, স্পার্ম ব্যাঙ্ক থেকে বাচ্চাকাচ্চা জন্মাচ্ছে। এখনও ধর্মটর্ম জাতপাতের বিচার! ছিঃ! সেই মেয়েটার বাবাকে গিয়ে আচ্ছা করে ধোলাই দিতে পারলে না? ব্যাটার নাম বলো, আমি গিয়ে ওকে টিট করে আসব।

টনি বলল, এখন আর কোনও লাভ নেই। ওরা বোধহয় সেই মেয়েটির ওখানে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

—তুমি 'বোধহয়' বলেছ। ঠিক জানো না। সে যাক গে! আমার চেনাশুনাদের মধ্যে এরকম বিয়ে আকছার হচ্ছে। আমার স্বামীর এক বন্ধু মুসলমান, তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে, প্রত্যেকেই হিন্দু বিয়ে করেছে। এইরকম বিয়েই তো এখন দরকার। তোমার জন্য অন্য মেয়ে দেখছি আমি।

—না, দিদি, দরকার নেই।

—তোমার বাড়িতে হিন্দু মেয়ে আনার ব্যাপারে আপত্তি নেই তো? তাহলে বলো। আমি তো বাংলাদেশেও প্রায়ই যাই, ওখানে কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে দেখি, বাংলাদেশে তোমার জন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে আসতে পারি।

—আমি এখন আর বিয়ের কথা ভাবছিই না।

এই কথাটা বলার সময় টনির গলায় এমন একটা শূন্যতা ফুটে উঠল যে বিশাখা চমকে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে।

তারপর নরম গলায় বললেন, মেয়েটি তোমাকে খুব দাগা দিয়েছে, তাই না? তাকে ভুলতে পারছ না? আর সে হারামজাদি দিব্যি বাবার কথা শুনে সিঙ্গাপুরে চলে গেল? চিঠি লেখেনি?

—দুটো চিঠি লিখেছিল। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। মেয়েরা তো এখনও অনেকটা অসহায়। সে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত, গান গেয়েছে, কতদিন একসঙ্গে ভাত খেয়েছে, আমার এক দিদি তাকে দেখতেন ছোট বোনের মতন। তাদের বাড়িতে আমি প্রথম যেদিন গেলাম, সেইদিনই গণ্ডগোল লাগল।

—সেই মেয়েটি গান গাইত?

—জি, রবীন্দ্রসংগীত, রেডিওতে গেয়েছে কয়েকবার।

—তার কাছ থেকেই তুমি রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসতে শিখেছ। আর ওই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরে তুমি রবীন্দ্রসংগীত ভালোবাসো বলেই ওই পচা ফাংশনে আমাকে ডাকা হয়েছিল। আমি অবশ্য টাকা পেয়েছি। গান গাওয়াটা আমার জীবিকা। নিজে রোজগার করি বলেই আমি স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। অনেক জায়গায় যাই। কিন্তু তোমার মতন মানুষ বড় একটা দেখি না।

হঠাৎ আলো নিভে গেল। লোডশেডিং।

বিশাখা চরম বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ধুত্তোর ছাই!

টনি লাইটারটা বার করে জ্বালাল।

বিশাখা বললেন, আমাদের বিল্ডিং-এ জেনারেটার আছে। কিন্তু এত রাত হয়ে গেছে, এখন আর চালাবে না। দেখি, মোম-টোম কোথায় আছে।

টনি বলল, খাওয়া তো শেষ হয়ে গেছে। এবার আমি তাহলে—

মোম খুঁজতে-খুঁজতে অন্যমনস্কভাবে বিশাখা বললেন, যাবে? কী করে যাবে?

টনি বলল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব।

মোম একবার জ্বালার পরেও নিভে গেল। খোলা জানলা দিয়ে আসছে বাতাসের ঝাপটা। আবার বৃষ্টি নেমেছে।

বিশাখা বললেন, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে? হ্যাঁ, তা যেতে পারো। তারপর কোনও পেট্রল পাম্পে গিয়ে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে শুয়ে থাকবে গাড়ির মধ্যে। নির্ঘাত মশার কামড় খেতে হবে। মেনিনজাইটিস ম্যালেরিয়া হচ্ছে চতুর্দিকে, ঝটাপট লোক মরে যাচ্ছে।

টনি হেসে বলল, গাড়ির সব কাচ তুলে দেব। বৃষ্টির ছাঁটও তো আটকাতে হবে।

—কাচ তুলে বৃষ্টি আটকানো যায়, মশা আটকানো যায় না।

—আপনি অত চিন্তা করবেন না। পাঁচ-ছ'ঘণ্টার তো ব্যাপার।

—মানুষই মানুষের জন্য চিন্তা করে। অমানুষরা করে না। শোনো টনি, এই অন্ধকার আর

বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে তোমার যাওয়ারই বা দরকার কী? আমার ছেলের ঘরে তো বিছানা পাতাই আছে। তুমি সেখানেই শুয়ে থাকো।

—না, না, তার দরকার নেই।

—দরকার-অদরকারের তো প্রশ্ন হচ্ছে না। একটা বিছানা খালি রয়েছে, তুমি শুধু-শুধু গাড়ির মধ্যে শুয়ে থাকতে যাবে কেন?

—দিদি, আপনি আমাকে নিজের হাতের রান্না খাইয়েছেন, এতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে। আমি আর আপনার ওপর...আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি যাই।

—শোনো, শোনো টনি। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে তোমাকে আটতলা নামতে হবে। সেটা সহজ নয়, হোঁচট খেয়ে পড়তে পারো। নিচে দারোয়ানরা গেট বন্ধ করে দিয়েছে, তোমাকে চেনে না, নানারকম জেরা করতে পারে। আমি যে তোমার সঙ্গে নিচতলা পর্যন্ত গিয়ে দারোয়ানদের বলে আসব, তারও উপায় নেই, সিঁড়ি ভেঙে আবার আটতলায় ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতসব ঝঞ্ঝাটের কী দরকার! তুমি পাশের ঘরে শুয়ে থাকো, ভোরবেলা উঠে চলে যাবে। যত রাতেই শুই, ভোরবেলা আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি তোমাকে ডেকে তুলে দেব।

—আপনার অসুবিধে হবে না?

—এর মধ্যে অসুবিধের কী আছে? তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝে গেছি, তুমি আমাকে খুনটুন করবে না। চলো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমার ট্যাক্সিটা যে রাস্তায় পড়ে রইল?

—ও পুরোনো গাড়ি, কেউ নেবে না।

বিশাখার ছেলে অনির্বাণের ঘরটাই সবচেয়ে বড়। একটা কাচের আলমারিতে অনেক কাপ, শিল্ড। ব্যাডমিন্টন খেলার প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে অনির্বাণ। কয়েকজন খেলোয়াড়ের ছবি দেওয়ালে সাঁটা।

বিছানার ওপর বেডকভার চাপা দেওয়া। অনির্বাণ বছরে তিন-চারবার কলকাতায় আসে। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। মাঝে-মাঝে বাবার কাছেও যায়। বিশাখার স্বামী বিশ্বরঞ্জন আবার বিয়ে করেছেন। তিনি থাকেন সল্টলেকে।

বিশাখা টনিকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি প্যান্ট-শার্ট পরেই শোবে? এ মা, তোমার প্যান্টে তো দেখছি কাদা লেগেছে! এক কাজ করো, ওই দেওয়াল আলমারিটা খুলে দ্যাখো, আমার ছেলের এটা স্লিপিং সুট ঝুলছে। ওটা পরে নাও। তোমাকে ফিট করে যাবে। রাত্তিরে যদি জলতেষ্টা পায়, ফ্রিজ থেকে জলের বোতল নিয়ে নিও। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। গুড নাইট।

বিশাখা নিজের ঘরে এসে ছিটকিনি তুলে দিলেন।

টনি তাঁর হাঁটুর বয়েসি। সে তাঁর ফ্ল্যাটে রাত কাটালে কী এমন হয়! কেউ জানলে অবশ্য এ নিয়েও বিশ্রী কথা বলতে পারে। তা বলে জেনেশুনে একটা নিরীহ, ভদ্র ছেলেকে এই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে পেট্রল পাম্পে রাত কাটাবার জন্য পাঠানো যায়? অন্য কারুর জানার দরকার কী? ভোরবেলা টনি চলে গেলে কেউ টের পাবে না।

শাড়ি ছেড়ে একটা পাতলা নাইটি পরলেন বিশাখা। ক্রিম ঘষতে লাগলেন গালে। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাবলেন, টনি ছেলেটি ব্যর্থ প্রেমিক। সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ মন। ব্যবহার অতি ভদ্র। যে হিন্দু মেয়েটিকে টনি ভালোবেসেছিল, সেই মেয়েটি জোর করে বাপের বাড়ি থেকে চলে আসতে পারল না? একবার রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেলে তার বাবা কী করত? বিশাখা নিজেও মা-বাবার ঘোর অমতে বিশ্বরঞ্জনকে বিয়ে করেছিলেন। এক দুপুরবেলা বাড়ি ছেড়ে এসে আর ফিরে যাননি। জাত বা ধর্মের অমিলটমিল ছিল না। বিশাখার বাড়ির মূল আপত্তি ছিল, বিশ্বরঞ্জন এক পুলিশ অফিসারের ছেলে। বিশাখার বাবা পরাধীন আমলের রাজনীতি করা মানুষ, পুলিশের ওপর

প্রবল রাগ। কিন্তু বিশ্বরঞ্জন নিজে তো পুলিশ নয়। ইংরেজির ভালো ছাত্র ছিল। ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় চাকরি পেয়েছিল। পুলিশের ছেলে হওয়াটা কি অপরাধ? বিয়েটা শেষ পর্যন্ত টিঁকল না। সে অন্য কথা।

বিশাখা ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন।

॥ ৩ ॥

পাতলা ঘুমের মধ্যে যে-কোনও শব্দই খুব জোর মনে হয়। সেরকম শব্দ পেয়ে বিশাখা ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

প্রথমে ভাবলেন স্বপ্ন। পরমুহূর্তেই বুঝলেন স্বপ্ন নয়। দরজায় কেউ দুমদুম করে ধাক্কা দিচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যে বিশাখার মনে পড়ল, আজ রাতে তিনি একলা নন, টনি নামে এক সদ্য পরিচিত যুবককে আশ্রয় দিয়েছেন। টনি এত জোরে দরজা ধাক্কাবে কেন?

বিপদের কথাই প্রথমে মনে আসে। তাহলে কি টনি ভদ্রবেশী গুন্ডা ও লম্পট? বিশাখার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চায়? হাতে মস্ত বড় একটা ছুরি নিয়ে ঘাতকের মতন দাঁড়িয়ে আছে টনি?

আতঙ্কে ঘেমে উঠলেন বিশাখা।

আর একবার আওয়াজ হতেই তিনি বুঝলেন, তাঁর শয়নকক্ষে নয়, ফ্ল্যাটের মূল দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। এত রাতে কে ধাক্কা দেবে? কলিংবেল না বাজিয়ে এমন বিশ্রীভাবে ধাক্কা দেবেই বা কেন? কোনও ডাকাত? কিংবা কলকাতা শহরে হঠাৎ দাঙ্গা বেধে গেছে? হিন্দু গুণ্ডারা টের পেয়ে গেছে যে বিশাখা তাঁর ফ্ল্যাটে একটি মুসলমান যুবককে আশ্রয় দিয়েছেন? ওরা টনিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে মারবে?

সুইচ টিপে আলো জ্বালতে গিয়ে টের পেলেন। এখনও লোডশেডিং চলছে।

মোমবাতিটা খুঁজতে গিয়ে সেটা হাতের ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঢুকে গেল ড্রেসিং টেবিলের তলায়।

দরজায় এখনও ধাক্কা চলছে।

প্রথমে টনিকেই ভয় করেছিলেন। এখন মনে হল, যদি চোর-ডাকাত হয়, তাহলে টনিই তাঁকে বাঁচাবে।

তিনি নিজের দরজার ছিটকিনি খুললেন।

টনিও দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে লাইটার। সেই অল্প আলোয় দেখা গেল, তার মুখেও ভয়ের ছায়া।

দরজার আওয়াজ থেমে গেছে। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে বাইরে। তাহলে একজন নয়, একাধিক মানুষ!

খাওয়ার টেবিলে আর একটি মোমবাতি বসানো আছে। টনি সেটা জ্বালল। বিশাখা ফিসফিস করে বললেন, দরজা যদি না খুলি? ভেঙে ফেলবে? পুলিশে ফোন করব?

আবার দরজায় ধাক্কা এবং কেউ ডাকল, মা।

বিশাখার বুকটা ধক করে উঠল। এবার তিনি ছুটে গিয়ে দরজার লক ও ছিটকিনি খুলতে-খুলতে বললেন, কে রে? খোকা?

দরজার বাইরে অনির্বাণ ও তার পাশে একজন।

খুশিতে ঝলমলে মুখে বিশাখা বললেন, খোকা, তুই কোথা থেকে এলি? এত রাত্তিরে?

অনির্বাণের সমস্ত শরীর ভেজা। মাথায় একটা রুমাল বাঁধা। সে প্রায় ছ'ফুট লম্বা। কিছুদিন হল দাড়ি রেখেছে।

সে বলল, আর বোলো না। ট্রেন সাড়ে তিন ঘণ্টা লেট। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। কোনওরকমে একটা ট্যাক্সি যদিও পেলাম, সেটা আবার খারাপ হয়ে গেল এলগিন রোডের কাছে। তারপর এতটা রাস্তা হাঁটতে-হাঁটতে...মা, আমার এক বন্ধু সঙ্গে এসেছে। এর নাম অবিরল সাকসেনা।

ভেতরে ঢুকে, দরজার পাশেই টুলে বসে জুতো ও মোজা খুলছে অনির্বাণ, বিশাখা জিগ্যেস করলেন, তোরা কি কানপুর থেকে এলি?

অনির্বাণ বলল, না, এখন জামসেদপুর থেকে। অফিসের কাজে জামসেদপুর আসতে হয়েছিল, ভাবলাম এত কাছে এসেছি যখন দু-দিনের জন্য কলকাতা ঘুরে যাই—

কথা বলতে-বলতে আড়ষ্টভাবে থেমে গেল অনির্বাণ। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে দেখতে পেয়েছে স্লিপিং সুট পরা একজন অচেনা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে।

বিশাখা পেছনে একবার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ও খোকা, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এর নাম টনি। আজ সুলতানপুরে একটা প্রোগ্রাম ছিল, ফিরতে-ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর লোডশেডিং, ঝড়বৃষ্টি, এই ছেলেটি এসেছিল আমাকে পৌঁছে দিতে, এত রাতে কোথায় যাবে, তাই ওকে থেকে যেতে বলেছি।

অনির্বাণ এ-কথায় মনোযোগ না দিয়ে বন্ধুকে বলল, আও অবিরল, অন্দরমে আও।

অবিরল ছেলেটি খপ করে বিশাখার পায়ে হাত দিয়ে বাংলায় বলল, মাসিমা, কেমন আছেন?

বিশাখা জিগ্যেস করলেন, খোকা, তোরা খেয়ে এসেছিস? খিচুড়ি বসিয়ে দিতে পারি। বেশিক্ষণ লাগবে না।

অনির্বাণ বলল, না, না, ওসব হাঙ্গামা করতে হবে না। ট্রেনে খাওয়ার দিয়েছে।

অবিরল বলল, যদি খুব কষ্ট না হয় মাসিমা, এক কাপ চা খেতে পারি। খুব ভিজেছি।

অনির্বাণ বলল, অবিরল বড্ড চা খায়।

বিশাখা বললেন, কোনও অসুবিধে নেই, এক কাপ চা করতে আর কতক্ষণ লাগবে?

টনি খানিকটা অস্বস্তিভরা মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে কেউ কথা বলছে না। সে এখন ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়তেও পারে না। যতদূর মনে হয়, এই ফ্ল্যাটে দুটিই শয়নকক্ষ। যার বিছানায় টনি শুয়েছে, সে ফিরে এসেছে। মায়ের কাছে তো ছেলে হঠাৎ যে-কোনও সময়েই আসতে পারে।

টনির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অনির্বাণ। এই অচেনা মানুষটি যে তারই স্লিপিং সুট পরে আছে, তা চিনতে তার দেরি হয়নি।

বিশাখা বললেন, একবার খবর দিলি না! আমি যদি বাড়িতে না থাকতাম? অনেক সময় অনুষ্ঠান করতে আমাকে দুর্গাপুর, আসানসোলেও যেতে হয়, রাতে ফেরা হয় না।

অনির্বাণ বলল, সকালে ফোন করেছিলাম, তুমি বাড়ি ছিলে না, তোমার নতুন কাজের লোক ভীম না ভীষ্ম কী যে নাম, সে ধরেছিল। সে তোমায় কিছু বলেনি?

বিশাখা বললেন, সকালে আমার গানের ক্লাস ছিল। রাজুর সঙ্গে আজ আমার দেখাই হয়নি। কিছু একটা বলে যাবে তো। অন্তত দারোয়ানকেও যদি বলে যেত।

অনির্বাণ খানিকটা অবাকভাবে মায়ের দিকে তাকাল। একটু ক্ষুণ্নভাবে বলল, আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না।

বিশাখা বললেন, এসেছিস, খুব ভালো করেছিস। অবিরল তো খুব ভালো বাংলা জানে। অবিরল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বসো—

অবিরল বলল, আমার জন্ম কলকাতায়। আই আই টি-তো আমার বেশির ভাগ বন্ধু ছিল বাঙালি।

বিশাখা চা তৈরি করতে-করতে জিগ্যেস করলেন, টনি, তুমিও চা খাবে?

টনি মাথা নেড়ে বলল, না।

টেবিলের ওপর রয়েছে অর্ধেক খালি ব্র্যান্ডির বোতল, বিশাখা সেটা ড্রয়ারে রাখতে ভুলে গেছেন।

অনির্বাণ সেটা দেখতে পেয়ে টেবিলের কাছে বোতলটা আড়াল করে দাঁড়াল।

এই ফ্ল্যাটে দুটিই বেডরুম। অনির্বাণের ঘরের খাটটা বেশ বড়, তাতে স্বচ্ছন্দে দুজন শুতে পারে। সেই ঘরে টনিকে শুতে দেওয়া হয়েছে। বসবার ঘরে একটা লম্বা সোফায় একজন শোওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

বিশাখা ভাবছেন, টনিকে ছেলের ঘরে শুতে দিয়েছেন, এখন তাকে উঠে এসে সোফায় শুতে বলাটা কি ভালো দেখাবে? না হলে, অনির্বাণ আর তার বন্ধু দুজনে শোবেই বা কোথায়?

অনির্বাণ কায়দা করে বোতলটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিল, যাতে তার বন্ধু দেখতে না পায়। তার মা যে মাঝে-মাঝে ব্র্যান্ডি পান করেন, কিন্তু নেশা করেন না, তা অনির্বাণ জানে। সেটা সে দোষের কিছু মনে করে না। কিন্তু বাইরের কেউ দেখলে সেটা অন্যরকম ভাবতে পারে।

অনির্বাণ এবার চলে গেল নিজের ঘরে।

বিশাখা অবিরলকে চা দিতে-দিতে জিগ্যেস করলেন, তোমরা কোনও ব্যাগ-ট্যাগ আনোনি?

অবিরল বলল, না মাসিমা। আবার তো আমাদের জামসেদপুর হয়েই ফিরতে হবে। ওখানে সব রেখে এসেছি। কাল ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ আছে, সেই খেলাটা দেখে যাব। আমি কলকাতায় থাকার সময় ফুটবল খেলতাম খুব।

ঘরের ভেতর থেকে অনির্বাণ চেঁচিয়ে জিগ্যেস করল, মা, আলমারিটার চাবিটা কোথায়?

বিশাখা ভেতরে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা শূন্য ফুলদানি তুলে নিয়ে উলটে দিলেন। সেখান থেকে টপ করে একটা চাবি খসে পড়ল।

বিশাখা বলল, তোর চাবি এখানে থাকে, মনে নেই?

অনির্বাণ দেওয়াল আলমারি খুলে পোশাক বার করতে লাগল।

বিশাখা বললেন, টনির সঙ্গে আমার আজই আলাপ, আমাকে পৌঁছে দিতে এল। রবীন্দ্রসংগীত খুব ভালোবাসে, খুব ভালো ছেলে—

বিশাখার কথাগুলো কৈফিয়তের মতন শোনাচ্ছে। তাই তাঁকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে অনির্বাণ গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করল, ওই ভদ্রলোক আমার বিছানায় শুয়েছিলেন?

বিশাখা বললেন, হ্যাঁ, আর কোথায় শোবে? এখন ওকে বাইরে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুই আর তোর বন্ধু এখানে শো, আমি চাদর পালটে দিচ্ছি।

অনির্বাণ খানিকটা বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, এখন আর ওঁকে সরাবার দরকার কী? আমি আর অবিরল বসবার ঘরে ম্যানেজ করে নেব।

বিশাখা বললেন, তোদের দুজনের অসুবিধে হবে। ও একা বরং—

অনির্বাণ দুটো পা-জামা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে বিশাখা বললেন, টনি, তুমি আর শুধু-শুধু রাত জাগবে কেন, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

টনি বলল, একটা বালিশ দিন, আমি এই সোফায়—

বিশাখা ছেলের দিকে তাকালেন।

অবিরল বাথরুমে গেছে, অনির্বাণ বলল, না, না, আপনি ও-ঘরের বিছানায়...আমরা দুই বন্ধু গল্প করতে-করতে এখানেই দিব্যি কাটিয়ে দেব।

বিশাখা বললেন, সে তো তোরা বিছানায় শুয়েও গল্প করতে পারিস। আমার মনে হয় সেটাই

ভালো। অবিরল প্রথম এসেছে।

টনি বলল, আপনাদের যদি অসুবিধে হয়, তাহলে আমি এখনও চলে যেতে পারি। বৃষ্টি থেমে গেছে।

অনির্বাণ বিস্মিতভাবে বলল, আপনি চলে যাবেন কেন? আমরা এখন ফিলডে কাজ করি, মাঠে-ঘাটে শুয়ে থাকি, আমাদের অভ্যেস আছে।

টনি এবার দৃঢ়ভাবে বলল, তাহলে আমি সোফাতেই শোবো।

আর বেশি তর্কাতর্কিতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। সোফার ওপর পরিপাটিভাবে চাদর পেতে, বালিশ দিয়ে টনির জন্য বিছানা করে দিলেন বিপাশা।

অবিরল আর অনির্বাণ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মা যদিও জানেন যে ছেলে সিগারেট খায়, তবু মায়ের সামনে সিগারেট ধরাতে পারে না অনির্বাণ। বন্ধুর মায়ের সামনে অবিরলও বা কী ভাবে সিগারেট টানবে?

বিশাখাও নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ছেলে বাড়িতে এলেই তাঁর মনটা খুশি-খুশি হয়ে ওঠে। খড়্গপুরে পড়বার সময় অনির্বাণ যখন-তখন বাড়িতে আসত। অনির্বাণের কলিংবেল টেপার বিশেষ একটা ধরন আছে। সেই শব্দ শুনলেই বিশাখা একটা ভালোলাগা বোধ করতেন। এখন আর কানপুর থেকে যখন-তখন আসতে পারে না অনির্বাণ। তার আসার কথা ছিল আগামী মাসে।

আজও নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে বিশাখা। তবু গলার কাছে কেমন যেন খানিকটা অস্বস্তি জমে আছে। বাড়িতে আজ অন্য একজন অতিথি আছে, সেটা কি পছন্দ হয়নি ছেলের? ও সঙ্গে একজন বন্ধু নিয়ে এসেছে, এই বয়সের ছেলেরা বন্ধুদের নিয়েই মত্ত থাকে। বন্ধু নিয়ে এলে আগে থেকে খবর দেওয়া উচিত। অনির্বাণ অবশ্য ফোন করেছিল। কাজের ছেলেটা কিছু বলেনি। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন।

টনিকে যে বিছানা থেকে সরিয়ে এনে সোফায় শুতে দেওয়া হল, তাতে ও কী কিছু মনে করেছে? অতিথিকে খাতির করা উচিত। অবশ্য অনির্বাণের বন্ধুও তো অতিথি!

যত নষ্টের মূল আজকের ঝড়-বৃষ্টি।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগলেন বিশাখা। অনির্দিষ্ট অস্বস্তিটা যাচ্ছে না বলে ঘুমও আসছে না।

স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের সময় ছেলে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাঁকেই সমর্থন করেছে। এজন্য ছেলের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন বিশাখা, কিন্তু তার মাতলামির সঙ্গে যুঝে ওঠা আর সম্ভব ছিল না। প্রতি রাতের ঝগড়া প্রায় মারামারির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত। বিশাখার গান একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দু-একবার বিশাখা আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, তবু ডিভোর্সের ব্যাপারে অনেকে বিশাখাকে দায়ী করে। কেউ-কেউ এমন ইঙ্গিত করেছে যে বিশাখা নানা জায়গায় গান গেয়ে বেরিয়ে সংসারের প্রতি অবহেলা করেছে। দূরে-দূরে ফাংশনে গিয়ে বাইরে রাত কাটিয়েছে। সেইজন্যই দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় খেয়েছে।

এখন সমাজ বলতে সেরকম কিছু নেই। মুখে-মুখে যে কথা ছড়ায় তাকেই আলগাভাবে সমাজ বলা যায়। সেই সমাজ এখনও পুরুষদের দোষ দেখে না। গান গাওয়াটা যে বিশাখার জীবিকাও বটে, তা অনেকে মানতে চায় না। গানটা যেন শখের ব্যাপার। গান গেয়ে বিশাখা যা উপার্জন করেছে, তা কি সংসারের কাজেই লাগায়নি? জীবিকার জন্য অনেক পুরুষকে বাইরে-বাইরে ঘুরতে হয়, তাতে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষতি হয় না? সেকথা কেউ ভাবে না।

অনির্বাণ কলেজ জীবন থেকেই বাবার বাড়াবাড়ি দেখেছে। বাবাকে সে ভালোভাবে কখনও

পায়নি। মাকে সে আঁকড়ে ধরেছিল। নিজেই সে একদিন বিশাখাকে বলেছিল, মা, চলো তুমি আর আমি আলাদা কোথাও থাকি!

বিশাখা একসময় শালিক পাখির ডাক শুনতে পেলেন।

এ-বাড়ির সামনে দুটো বড়-বড় ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। তার ডালে বসে সাতসকালে কয়েকটা শালিক কিচিরমিচির শুরু করে দেয়। রোদ যাতে চোখে না লাগে সেজন্য জানলার পরদা টানা থাকে। কিন্তু শালিকের ডাকে বিশাখার রোজ ঘুম ভেঙে যায়।

আজ আর তো ঘুম হলই না। বেশি বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকার অভ্যেস নেই বিশাখার।

দরজা খুলে বাইরে এসেই দেখলেন, সোফাটা ফাঁকা। টনি যে বাথরুমেও যায়নি তা বোঝা যায়। অনির্বাণের স্লিপিং সুটটা ছাড়া রয়েছে। টনির জুতো নেই। ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই সে চলে গেছে।

কিছু না বলে চলে গেল?

পরক্ষণেই বিশাখা ভাবলেন, ভালোই হয়েছে! অনির্বাণদের সামনে ও স্বাভাবিক হতে পারছিল না। সকালেই বা কী কথা বলত?

রোজ এই সময় বিশাখা দ্রুত বাথরুম সেরে নিয়ে গলা সাধতে বসেন। দু-একদিন গলা সাধা বাদ পড়লেই গলা ভারী হয়ে যায়। শুধু তো গান গাওয়া নয়, গান শেখাতেও যেতে হয় সপ্তাহে তিন দিন একটা স্কুলে। গান শেখাতে গেলেই গলার ওপর চাপ পড়ে। এই বয়েসটাই বিপজ্জনক। এইরকম বয়েসের পর থেকেই অনেকের গলা বেসুরো হতে শুরু করে। ক্লাসিকাল গানের গায়ক-গায়িকাদের গলা মচকায় না অনেক দিন, তাঁরা যে নিয়মিত গলা সাধেন। বিশাখা টানা তিন বছর এক ওস্তাদের কাছে ক্লাসিকাল গানের তালিম নিয়েছেন।

আজ অনির্বাণ আর ওর বন্ধু ঘুমোচ্ছে। ওরা ছুটি কাটাতে এসেছে, বেলা করে ঘুমোক। তানপুরার আওয়াজে ওদের ঘুম ভেঙে যেতে পরে, আজ থাক।

খুট করে একটা শব্দ হল, অনির্বাণ দরজা খুলে বাইরে এল। খালি গা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, চোখে এখনও ঘুমের আমেজ।

বিশাখা জিগ্যেস করলেন, এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি যে?

সে কথায় উত্তর না দিয়ে অনির্বাণ জিগ্যেস করল, তুমি এখানে বসে আছ কেন?

বিশাখা বললেন, আমি তো রোজ ভোরেই জাগি। ছেলেটা আসতে দেরি করে, নিজেই চা করে খাই। তুই এখন চা খাবি?

অনির্বাণ বলল, তোমার তো একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমাকে তাহলে একটু পরে দিও।

বিশাখা বললেন, আমি এখনও চা খাইনি তো!

টেবিলের ওপর গত রাতের চায়ের কাপগুলো রয়েছে। এখনও তোলা হয়নি। অনির্বাণ সেদিকে চকিতে তাকাল একবার।

তারপর সোফাটার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, উনি চলে গেলেন?

বিশাখা একটু ব্যস্তভাবে বললেন, হ্যাঁ, কখন যে গেল টেরও পাইনি। চা-টা কিছু খেয়ে গেল না, আমাকে কিছু বলেও গেল না।

অনির্বাণ বলল, ভালো করে আলাপই হল না ভদ্রলোকের সঙ্গে। তোমার কাছেও এঁর কথা আগে কখনও শুনিনি। তোমার সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?

বিশাখা বললেন, বাঃ রে, কালকে যে বললুম, কাল সন্ধেবেলা ওদের ওখানে গান গাইতে গিয়েছিলুম। সেখানেই প্রথম দেখেছি। আমাকে পৌঁছে দিতে এল—

ব্যাখ্যাটা নিজের কানেই যেন খানিকটা অবাস্তব শোনাল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে কেউ

কি একজন মানুষকে বাড়িতে থাকতে দেয়? কাল একটা বিশেষ পরিস্থিতি ছিল, কথায়-কথায় ছেলেটির ওপর মায়া পড়ে গেল, ওকে ফিরে যেতে দিলে খানিকটা নির্দয়তা প্রকাশ পেত না?

ছেলেকে সব ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

তিনি বললেন, ওর নাম টনি হক, একটা মুসলমান প্রধান জায়গায় ওদের ফ্যামিলির বেশ প্রতিপত্তি আছে। সাধারণত ওইসব জায়গায় রবীন্দ্রসংগীত...ওই ছেলেটা এত রবীন্দ্রসংগীতের ভক্ত—

অনির্বাণ জিগ্যেস করল, তোমার ব্রেকফাস্টের জন্য কিছু আছে, না আমি বাজার করে আনব?

বিশাখা বললেন, ডিম আছে, পাঁউরুটি আছে, কলা আর কিছু ফলটল আনিয়ে নেব? তোকে যেতে হবে না।

অনির্বাণ বলল, অবিরল ভেজিটেরিয়ান। ডিমও খায় না।

বিশাখা বললেন, তা হলে লুচি করে দিতে পারি। সঙ্গে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা। দুপুরে ছানার ডালনা করে দেব, আর খুব ভালো সোনামুগ ডাল আছে, আর পাঁপড় যদি খায়—

অনির্বাণ বলল, দুপুরে বাড়িতে খাব কি না ঠিক নেই। তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

বিশাখা বললেন, শোন, গত সপ্তাহে আমি দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম একটা ফাংশনে। সেখানে কার সঙ্গে দেখা হল জানিস? তোর সঙ্গে সুজয় পড়ত, সেই সুজয় তো এখন লন্ডনে, তার ছোট বোন মিলি। দুর্গাপুরে চাকরি করছে, একা-একা থাকে। নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। প্রথমে চিনতে পারিনি, কত ছোট্ট দেখেছি, একদিন মোটে লেক মার্কেটে সুজয়ের সঙ্গে দেখেছিলাম, এখন কী সুন্দর দেখতে হয়েছে। তোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

অনির্বাণ বলল, কার?

বিশাখা বললেন, সুজয়ের?

অনির্বাণ বলল, নাঃ!

বিশাখা হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, ওই মিলি তোকে চিঠিটিঠি লেখে না?

অনির্বাণ ভুরু কুঁচকে বলল, আমাকে চিঠি লিখবে কেন?

বিশাখা বললেন, একবার তোর জন্মদিনে মিলি কার্ড পাঠিয়েছিল আমার মনে আছে।

অনির্বাণ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, পাঠিয়েছিল বুঝি? আমার মনে নেই।

বিশাখা বললেন, একসময় তো তুই সুজয়দের বাড়িতে খুব যেতিস। তোর প্রাণের বন্ধু ছিল। বিদেশে গেলে কেউ আর চিঠি লেখে না। মিলি মেয়েটাকে দেখে আমার কী ভালো লাগল। যেমন সুন্দর, তেমনি কথাবার্তায় সপ্রতিভ। আমার এখানে আসতে বলেছি। হ্যাঁরে, তোকে তো কাজের জন্য দুর্গাপুরেও মাঝে-মাঝে যেতে হয়?

অনির্বাণ বলল, সে কখনও-সখনও।

বিশাখা বললেন, এবার গেলে মিলির সঙ্গে অবশ্যই দেখা করিস। ওকে যদি তোর পছন্দ হয়—

অনির্বাণ বলল, আবার তুমি ওইসব শুরু করেছ?

বিশাখা বললেন, বাঃ, আমার বুঝি ভাবতে ইচ্ছে করে না? তুই অত দূরে থাকিস, একা-একা...। দিনের-পর-দিন কারুর একা-একা থাকতে ভালো লাগে?

অনির্বাণ চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ উঠে চলে গেল বাথরুমে।

বিশাখা চা তৈরি করে বসে রইলেন, তখনও বাথরুম থেকে বেরুল না অনির্বাণ। ঠান্ডা হয়ে গেল চা।

এরপর অবিরল জেগে উঠতেই ছেলের সঙ্গে আর আলাদা করে কথা বলার সময় পাওয়া গেল না।

লুচি-আলুর দম খেয়ে বেরিয়ে গেল দুজনেই। অনেক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুপুরে খেতে আসতে পারবে না। ফিরতে-ফিরতে রাত ন'টা হবে।

আজ গানের ইস্কুল নেই। বিশাখাকে বাইরে বেরুতে হবে না। তবু কিছু লোকজন আসে। বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠানের আবেদন। বিনা পয়সার আবদারই বেশি। বিভিন্ন ধরনের চ্যারিটি শো। তারা পয়সা তো দেয়ই না, গাড়ি ভাড়াটাও খরচ না করতে পারলে বাঁচে। তাও পাঁচমিশেলি অনুষ্ঠান, যাতে রবীন্দ্রসংগীতের কদর নেই।

খুব চেনাশুনো না থাকলে বিশাখা এখন আর কোনও চ্যারিটি অনুষ্ঠানে যেতে চান না। এককালে অনেক গিয়েছেন। এখন তাঁর নিজের গলার কথা চিন্তা করতে হবে না? তাঁর স্বামী নেই, গলা নষ্ট হয়ে গেলে তাঁকে খাওয়াবে কে?

ছেলের উপার্জনের ওপর তিনি কোনওদিন নির্ভরশীল হতে চান না। অনির্বাণ বিয়ে করলে তিনি ঠিক করেই রেখেছেন, ওদের সংসারে থাকবেন না কোনওদিন। কানপুর থেকে অনির্বাণ যদি বদলি হয়ে কলকাতাতেও আসে, তাও ছেলে-বউকে তিনি আলাদা ফ্ল্যাট নিতে বলবেন। তাতে শাশুড়ি-পুত্রবধূর মনোমালিন্যের সম্ভাবনা থাকে না, বরং ভালো থাকে। তাঁকে বাকি জীবন একাই কাটাতে হবে।

বিবাহবিচ্ছিন্ন মহিলার পক্ষে একা থাকা সহজ নয়।

বিশ্বরঞ্জনের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর তার দু-তিনজন বন্ধু খুব সহানুভূতি দেখাতে এসেছিল বিশাখাকে। সহানুভূতির চেয়েও এক ডিগ্রি বেশি। শান্তনু যখন-তখন আসতে শুরু করেছিল, রীতিমতন প্রেম-প্রেম ভাব। বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে শান্তনুর, দুটি ছেলেমেয়ে। সে ভেবেছিল বিশাখাকে ফাউ হিসাবে ভোগ করবে।

একদিন দরজা পুরো না খুলে বিশাখা শান্তনুকে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছে কখনও আর একলা আসবে না। তোমার বউকে সঙ্গে নিয়ে এসো, তাহলে ঢুকতে পারবে।

ডিভোর্সের পর পুরুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। বিশাখা ঠিক করেছিলেন, পুরুষ মানুষের সঙ্গ ছাড়াও মেয়েরা যে বেঁচে থাকতে পারে, সেটা সবাইকে দেখাবেন।

ঘৃণা কিংবা রাগ মনের মধ্যে পুষে রাখলে গান হয় না। একটু মেজাজ খারাপ থাকলেই গানের মধ্যে সেটা ঠিক বোঝা যায়। অনেক চেষ্টায় মনকে শান্ত করেছেন বিশাখা। অনেকের সঙ্গেই এখন হেসে কথা বলেন বিশাখা, তবে সবাই জেনে গেছে, বিশাখার সঙ্গে বেশি বেশি ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। বিশাখার এখন একমাত্র প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাজের ছেলেটা আসার পর তাকে বেশ এক চোট বকলেন বিশাখা। কেন সে কাল অনির্বাণের টেলিফোনের কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিল! অনির্বাণ আসছে জানতে পারলে বিশাখা অতদূরে অনুষ্ঠান করতে যেতেনই না। ওদের টাকা ফেরত দিয়ে দিতেন।

একটু পরে বিশাখার খেয়াল হল, বেশি রাগারাগি করা ঠিক হচ্ছে না। যদি ছেলেটা দুম করে কাজ ছেড়ে দেয়, বিশাখা বিপদে পড়ে যাবেন। দেশে এত গরিব, তবু চট করে কাজের লোক পাওয়া সহজ নয়।

কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করে বিশাখা বললেন, রাজু, তুই ক'খানা লুচি খেয়ে নে। তারপর একটু বাজার করে আন তো বাবা। একজন নিরামিষ খাবে। তোর দাদাবাবুর আবার নিরামিষ একেবারে রোচে না। দুরকম করাই ভালো।

বিকেলবেলা, কোনও গানের অনুষ্ঠান নয়, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের একটা মিটিং ছিল তপনদার বাড়িতে। অনির্বাণরা যদিও ন'টার সময় ফিরবে বলেছে, তবুও বিশাখা গেলেন না সেই মিটিং-এ। এমন কিছু জরুরি নয়।

রাত্তিরের রান্না দুপুরবেলাতেই সেরে রাখা ভালো। রাজুর বদলে নিজেই রান্না করতে লাগলেন বিশাখা। আজ আর তাঁর শুধু সুপ খেলে চলবে না। আজ ছেলের সঙ্গে বসে খেতে হবে।

সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় ফোন করল অনির্বাণ। মা, আজ আর থাকা হচ্ছে না, আমি আর অবিরল রাত্তিরের ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি জামসেদপুর।

বিশাখা প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, অ্যাঁ! কেন?

অনির্বাণ বলল, অবিরল আর থাকতে চাইছে না। ও বলছে কাল সকাল থেকে হাত লাগালে জামসেদপুরের কাজটা আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব। তাতে অনেক সুবিধে হবে। কানপুরেও কাজ আছে।

বিশাখা বললেন, অবিরল চলে যেতে চায় যাক, তুই থেকে যা।

অনির্বাণ বলল, তা হয় নাকি? দুজনে একসঙ্গে এসেছি।

বিশাখা বললেন, একসঙ্গে এলে কি আলাদা ফেরা যায় না?

অনির্বাণ বলল, ও কাজ করবে আর আমি ফাঁকি মারব? দুজনেই তো না বলে পালিয়ে এসেছি।

বিশাখা নিরাশ হয়ে বললেন, না গেলেই নয়? বাড়ি ফিরছিস তো?

অনির্বাণ বলল, শুধু-শুধু আর উলটো দিকে অতটা যাব না। অশোকের বাড়িতে আছি। এখান থেকেই হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা দেব।

বিশাখা আবার চেঁচিয়ে বললেন, সে কি? তোরা খেয়ে যাবি না? কত রান্না করলাম তোদের জন্য। তোর বন্ধুকে ভালো কিছু খাওয়ানোই হল না। এখানে এসে খেয়ে তারপর যা।

অনির্বাণ বলল, তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। রাত্তিরের দিকে আর ভালো ট্রেন নেই। অশোকের মা আমাদের অনেক কিছু খাইয়ে দিয়েছেন। তুমি খাওয়ার জন্য চিন্তা করো না।

বিশাখা বললেন, আমি তোদের জন্য বসে রইলাম, আর তোরা অশোকের মায়ের কাছে খেয়ে নিলি? আবার কবে আসবি?

অনির্বাণে বলল, দেখি কবে আসতে পারি। ছুটি পাওয়া মুস্কিল। যদি সামনের মাসে একটা সুযোগ হয়।

একটু থেমে অনির্বাণ বলল, তোমাকে জানাব। আসার আগে তোমাকে জানিয়ে দেব।

ফোন ছেড়ে কয়েক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বিশাখা।

অবিরলের সঙ্গে যাওয়াটাই বড় হল, মায়ের সঙ্গে একটা দিনও কাটিয়ে যাওয়ার সময় নেই ছেলের। মা নিজের হাতে রান্না করে বসে আছে, খেয়ে নিল অন্য বাড়িতে।

একজন খুব নামকরা গায়কের স্ত্রী মীনাক্ষীকে বিশাখা বউদি বলেন। আপন বউদির মতন। সেই মীনাক্ষী বউদি একদিন বলেছিলেন, স্বামীকে হারাবার ব্যথা তোর আস্তে-আস্তে সয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেকেও তো হারাতে হবে। ছেলে বড় হয়েছে। সে কি তোর কাছে আর থাকবে? সে ক্রমশই দূরে সরে যাবে। সেটা সইতে পারবি তো?

অনির্বাণ আবার আসবার আগে-আগে থেকে জানাবার কথাটা কেন অত জোর দিয়ে বলল?

বিশাখা আপন মনে গাইতে লাগলেন, কিছুই তো হল না—

জল গড়িয়ে এল তাঁর দু-চোখ দিয়ে।

॥ ৪ ॥

দিন তিনেক পর একদিন সকালবেলা টনি এসে হাজির। দরজা খুলে দিল রাজু।

টনি সঙ্গে একজন লোক নিয়ে এসেছে, সে ভেতরে ঢুকে কয়েকটা চাঙাড়ি নামিয়ে রাখল। টনি তাকে বলল, ইদ্রিশ, তুই নিচে গিয়ে গাড়িতে বসে থাক।

রাজুর ডাক শুনে শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বিশাখা। হালকা নীল শাড়ি পরা। এই রংটা তাঁর প্রিয়, মাথার চুল খোলা, একটু আগে তানপুরা নিয়ে রেওয়াজ শেষ করেছেন।

টনি বলল, নমস্কার দিদি, কেমন আছেন?

বিশাখা জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, এসব কী?

রাজু চাঙাড়িগুলো খুলতে-খুলতে আহ্লাদের সঙ্গে বলল, অনেক জিনিস, এতবড় একটা কাতলা মাছ, কী টাটকা, এক্ষুনি যেন লাফাবে, এক ভাঁড় ক্ষীর, আর এগুলো মোয়া, জয়নগরের মোয়া, এক ছড়া মর্তমান কলা।

কপালে ভাঁজ ফেলে বিশাখা জিগ্যেস করলেন, এসব এনেছ কেন? তোমার বিয়ের তত্ত্ব নাকি?

একগাল হেসে টনি বলল, না দিদি। আপনার জন্য এনেছি। আপনি খাবেন।

এবার বেশ রাগ করে বিশাখা বললেন, এত কে খাবে? আমার বাড়িতে কোনও লোক আছে? না, না, এসব আমি পছন্দ করি না। ফেরত নিয়ে যাও।

টনি বলল, আপনার ছেলে নেই?

বিশাখা বললেন, সে তো এসেছিল একদিনের জন্য। সে কি আমার কাছে থাকে? আমি বিশেষ কিছুই খাই না। কে এসব আনতে বলেছে?

টনি বলল, দিদি, এর প্রত্যেকটিই আমাদের বাড়ির জিনিস। কিছুই কেনা নয়। মাছটা আমাদের বড় পুকুরের। তিনটে পুকুর আছে। বাড়িতে অনেক দুধ হয়। সেই দুধের ক্ষীর। মোয়াগুলো আমার এক পিসি বানিয়েছেন। খেয়ে দেখবেন, খুব ভালো স্বাদ।

বিশাখা বললেন, আমি কি রাক্ষস নাকি যে এত খাব? এসব তো রাজুর ভোগে লাগবে! না, না, তুমি ফেরত নিয়ে যাও।

টনি বলল, উপহার কি ফেরত দিতে হয়? রাগ করছেন কেন? নিজের বাড়ির জিনিস দিদিকে খাওয়াতে ইচ্ছে করে না? সেদিন আপনি আমার জন্য কত কী করলেন, আমাকে নিজে রেঁধে খাওয়ালেন, রাত্তিরে থাকতে দিলেন, আর আমি এই সামান্য কয়েকটা জিনিস আপনার জন্য আনতে পারি না?

রাজুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে। সত্যি-সত্যি ফেরত দিতে হলে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিশাখার কথা অগ্রাহ্য করে টনি রাজুকে বলল, এগুলো তুলে রাখো তো ভাই।

তারপর বিশাখার কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সে সোফাটায় বসে পড়ল। একদিন যে এখানে রাত কাটিয়ে গেছে, সে পরে এসে বিনা অনুমতিতে বসতেই পারে।

বিশাখা বললেন, সেদিন তুমি কিছু না বলে চলে গেলে?

টনি বলল, জানি, অন্যায় করেছি। সেই জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছি। সেদিন মনে হল, আপনার ছেলে আর তার বন্ধু এসেছে, আপনি ওদের সঙ্গেই সময় কাটাবেন, তাই আমি আর দেরি না করে—

বিশাখা বসেননি, দাঁড়িয়ে আছেন। টনির ভঙ্গি মনে হচ্ছে, সে গল্প-গুজব করতে এসেছে, সহজে উঠবে না। চায়ের প্রত্যাশা করছে। যে মানুষ অত জিনিসপত্র নিয়ে আসে, তাকে খানিকটা আপ্যায়ন করাই রেওয়াজ।

বিশাখা এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করেন না।

উপহার ফেরত দিলে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায়, তাহলে থাক। তিনি তো আনতে বলেননি। কিন্তু এই সুবাদে টনি যদি ঘন-ঘন এ-বাড়িতে আসতে চায়, সেসব চলবে না।

তিনি বললেন, রাজু, এক কাজ কর, এই দাদাকে কিছু খেতে দে। ফ্রিজে সন্দেশ আছে। এই জিনিসগুলো, এত জিনিস, আমি তো মোটে এক পিস মাছ খাব। দু-বেলা মাছ খাই না। ক্ষির বড়জোর এক চামচ। তুই জিনিসগুলো ভাগ করে ফেল, অর্ধেকটা তুই বাড়িতে নিয়ে যাবি, আর

বাকি অর্ধেক মীনাক্ষী বউদির কাছে পৌঁছে দিয়ে আয়। ওঁদের বাড়িতে অনেক লোক, ওঁরা আনন্দ করে খাবেন। জয়নগরের মোয়াগুলো রেখে দে, ছেলেমেয়েরা আসে, তাদের দিবি।

তারপর টনির দিকে ফিরে বললেন, তুমি বসো, চা-টা খাও। আমি খুব ব্যস্ত, দশ মিনিটের মধ্যে আমাকে বেরুতে হবে, স্নান করতে যাচ্ছি।

বিশাখা চলে গেলেন বাথরুমে। দরজা বন্ধ করতে-করতে তাঁর মনে পড়ল, বিশ্বরঞ্জন ক্ষীর খেতে খুব ভালোবাসত। প্রায়ই কৃষ্ণনগর থেকে ভালো ক্ষীর আনাত লোক মারফত। টনি এতখানি ক্ষীর এনেছে, একে তাকে দিয়ে দিতে হবে। তা বলে নিজের প্রাক্তন স্বামীর কাছে তো ক্ষির পাঠানো যায় না। বিশ্বরঞ্জন দ্বিতীয় বউকে নিয়ে দিব্যি সুখে আছে।

বিশাখা কোনওদিনই মিষ্টি পছন্দ করেন না, তাঁর ছেলে বাবার কাছ থেকে মিষ্টি খাওয়ার ধাত পেয়েছে। অনির্বাণ যখন ছোট ছিল, তখন দুপুরবেলা চুপি-চুপি ফ্রিজ খুলে সন্দেহ-টন্দেশ খুঁজত। সেসব না পেলে কন্ডেন্সড্ মিল্কই চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলত অনেকখানি। কানপুরে ভালো ক্ষীর পাওয়া যায় কিনা কে জানে!

বিশ্বরঞ্জন নাকি ডিভোর্সের পর অনেক বদলে গেছে। সে আর আগের মতন বেশি মদ খায় না। সন্ধের সময় বাড়ি ফিরে আসে। বউয়ের সঙ্গে সময় কাটায়। এসব খবর বিশ্বরঞ্জনের বন্ধুদের মারফত ঠিক বিশাখার কানে এসে যায়। নতুন বউ তো, বয়েসেও অনেক ছোট, তাকে নিয়ে মশগুল হয়ে আছে বিশ্বরঞ্জন। বিশাখা ওর কাছে পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। বিশাখার গানও সহ্য করতে পারত না। মাতাল অবস্থায় প্রায়ই বিকৃত গলায় বলত, গানের ছুতো করে তুমি বাইরে রাত কাটাও। তোমার গান আমি গলা টিপে বন্ধ করে দেব!

বিশ্বরঞ্জনের সঙ্গে কখনও-সখনও দেখা হয়ে যায়। কোনও-কোনও বন্ধু দুজনকেই নেমন্তন্ন করে। মুখোমুখি দেখা হলে দু-একটা কথাও হয়, ছেলে সম্পর্কে। ওর নতুন বউ ইন্দ্রাণীর সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, তার সঙ্গেও হেসে কথা বলতে হয়, এটাই সভ্যতার নিয়ম। তেইশ বছরের বিবাহিত জীবন ছিল যে পুরুষটির সঙ্গে, সে এখন বিশাখার কেউ নয়।

নাঃ, এজন্য বিশাখার মনে কোনও যন্ত্রণাবোধ নেই। সেই প্রত্যেক রাত্তিরে ঝগড়া, মারামারি আর গালাগালির স্মৃতি মনে পড়লেও তিনি শিউরে ওঠেন। ডিভোর্স করে তিনি বেঁচে গেছেন, দারুণ একটা মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন।

শোওয়ার ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখলেন বিশাখা। বসবার ঘর ফাঁকা। টনি চলে গেছে। যাক বাঁচা গেল। তাঁর এক্ষুনি কোথাও বেরুবার কথা নেই, ওটা মিথ্যে কথা। এরকম কিছু-কিছু সাদা মিথ্যে কথা মাঝে-মাঝে বলতেই হয়। এখন তিনি শুয়ে-শুয়ে বই পড়বেন। রবীন্দ্ররচনাবলী গোড়া থেকে আবার পড়তে শুরু করলেন বিশাখা।

টনিকে তিনি আবার দেখতে পেলেন পরের দিন। কলামন্দিরে অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে শুধু সাতজন রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীর গান হবে। এত বয়েস হল, কত জায়গায় গান গেয়েছেন, তবু এই ধরনের অনুষ্ঠানের দিনে স্নায়ু যেন খানিকটা দুর্বল হয়ে যায়। অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসেই। যদিও, এখনও খবরের কাগজের সমালোচনায় বিশাখার নামে প্রশংসাই বেরোয়। তাঁর নামে টিকিট বিক্রি হয়।

হল পুরোপুরি ভরেনি। আজও ঝড়বৃষ্টির দিন। শীতের সময় এই সব অনুষ্ঠান খুব জমে। বর্ষার সময় দর্শক-শ্রোতা কমে যায়।

তৃতীয় সারির ঠিক মাঝখানে বসে আছে টনি। তার দিকে চোখ পড়বেই। আজ পরে আছে প্যান্ট-শার্ট, তার শার্টের রং লাল। কোনও অনুষ্ঠানে খুব চেনাশুনো কেউ সামনের দিকে বসে থাকলে, চোখাচোখি হলে খুব সামান্য হাসি দিতে হয়। অন্যরা বুঝতে পারে না, শুধু সে বোঝে।

টনিও ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে বলে বিশাখা ঠোঁটে একটু ঢেউ খেলালেন।

প্রত্যেকের তিনখানা গান গাইবার কথা। বিশাখার তৃতীয় গানটি শেষ হওয়ার পরই কয়েকজন শ্রোতা আর একখানার জন্য অনুরোধ জানাল। এক একজন এক একটি গানের কথা বলছে। আরও সময় নেওয়া উচিত কিনা বুঝতে না পেরে বিশাখা তাকালেন উইংসের দিকে।

সেখান থেকে ঘোষক মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

কোন গানটা গাইবেন বিশাখা? সবক'টি গানই তাঁর জানা। অনুরোধকারীদের মধ্যে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে টনির গলা। সে বলছে, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—।'

টনির অনুরোধ মেনে নিয়ে সেই গানটিই ধরলেন। সেটা শেষ হওয়ার পর লোকে যখন আবার অনুরোধ করল, তখন তা অগ্রাহ্য করে উঠে এলেন বিশাখা। শ্রোতারা বারবার অনুরোধ জানালে খানিকটা গর্ব হয় ঠিকই, অহংকারে সুড়সুড়ি লাগে, কিন্তু তিনি বেশি সময় নিলে অন্যদের সময় কম পড়ে যাবে, সেটাও ঠিক নয়।

অনেক জায়গায় নিজের গান শেষ করেই বাড়ি চলে যান বিশাখা। আজ যাবেন না। আজ একেবারে শেষে সুচিত্রা মিত্রের গান আছে। ওঁর গান না শুনে কি যাওয়া যায়? অনেকদিন আগে, শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে আসার পর সুচিত্রা মিত্রের কাছে এক বছর গান শিখেছিলেন বিশাখা। সুচিত্রাদিও বিশাখাকে খুব স্নেহ করেন।

গ্রিনরুম থেকে স্পষ্ট শোনা যায় গান। বিশাখা ধরেই নিলেন, টনি গ্রিনরুমে দেখা করতে আসবে। হয়তো বাড়ি পৌঁছে দিতেও চাইবে, অতটা প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। অন্য একজনের সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন ঠিক হয়ে আছে।

টনি কিন্তু দেখা করতে এল না। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও টনিকে দেখা গেল না বাইরে।

পাঁচদিন পর আর একটি অনুষ্ঠানে ব্যারাকপুরে সুকান্ত হলে। এখানেও একেবারে প্রথম সারিতে বসে আছে টনি।

কলামন্দিরের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল কাগজে। এরা তো সেরকম কিছু বিজ্ঞাপন দেয়নি। টনি কী করে খবর পেল? আজও লাল শার্ট করে এসেছে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ছেড়ে দিল নাকি ছেলেটা? ওর আর কোনও শার্ট নেই? লাল রঙের শার্ট ঠিক চোখে পড়ে।

আজও শ্রোতাদের আর একটা, আর একটা চিৎকারের সময় টনি অনুরোধ জানাল, 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার—।' বারবার ওই একই গান শুনতে চায় কেন?

আজও টনি অনুষ্ঠানের শেষে দেখা করল না।

সেই যে টনি একদিন সকালে অনেক জিনিসপত্র উপহার এনেছিল, তারপর থেকে আর একদিনও বাড়িতে আসেনি। বুদ্ধিমান ছেলে, সে বুঝে গেছে যে বিশাখা ঠিক পছন্দ করেননি। কিন্তু নানান অনুষ্ঠানে তাকে দেখা যেতে লাগল, সে টিকিট কেটে গান শুনতে আসে। এমন জায়গায় বসে, যাতে বিশাখা ঠিক দেখতে পান, চিৎকার করে আর একটা গান শোনার জন্য সে অনুরোধ জানায়, কিন্তু বিশাখার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের চেষ্টা করে না আর।

ব্যাপারটা খানিকটা দুর্বোধ্য লাগে বিশাখার। অনুষ্ঠানের পর দু-চারটি কথা বলতে তাঁর আপত্তি নেই, বাড়িতে না এলেই হল। কিন্তু টনি আর একেবারেই দেখা করে না কেন? বিশাখা কি সেরকম কিছু খারাপ ব্যবহার করেছেন?

যাকে বাড়িতে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করেছিলেন, এখন তার সম্বন্ধেই মনে হয়, মাঝে-মাঝে এলে মন্দ কী? উপহার-টুপহার আনবার দরকার নেই, এমনি কিছুক্ষণ গল্প করা যেতে পারে। সপ্তাহে তিনদিন সকালের দিকে তিনি ফাঁকাই থাকেন। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলোতে টনির সঙ্গে চোখাচোখি হলেও কথা হয় না একটাও।

সকালবেলা একজন অচেনা লোক এল। কানপুর থেকে অনির্বাণ একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে তার হাতে। লোকটি অনির্বাণের অফিসেই কাজ করে।

সেই প্যাকেটে রয়েছে একটা সুন্দর সিল্কের স্কার্ফ। তিন লাইন চিঠিতে অনির্বাণ জানিয়েছে যে কানপুরে মহিলা সমিতি একটা প্রদর্শনী করেছিল, সেখান থেকে অনির্বাণ এই স্কার্ফটা কিনেছে মায়ের জন্য। এই সহকর্মীটি কলকাতায় যাচ্ছে বলে পাঠাবার সুবিধে হল।

বুকের মধ্যে কুলকুল করে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। ছেলে পাঠিয়েছে মায়ের জন্য। সে যে মায়ের কথা ভেবেছে, এটাই তো যথেষ্ট।

হয়তো ব্যাপারটা সেরকম নয়। অফিসারদের বউরা মহিলা সমিতি করে, মাঝে-মাঝে প্রদর্শনী করে। সেই মহিলারা অনির্বাণকে কিছু একটা কেনার জন্য পেড়াপেড়ি করেছে। অনির্বাণ অবিবাহিত বলে মহিলারা বেশি জোর করবে। তাই অনির্বাণ এটা কিনতে বাধ্য হয়েছে। এই গরমকালে স্কার্ফ ব্যবহার করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তবু মেয়েদের ব্যবহার্য এই স্কার্ফটা অনির্বাণ মায়ের কথা ভেবেই কিনেছে।

অনেকদিন ছেলেকে চিঠি লেখা হয়নি। চিঠি লেখার ব্যাপারে বিশাখার খুব আলস্য। আজকাল তো টেলিফোনেই কথাবার্তা সেরে নেওয়া যায়। এখন ফোন করে প্রাপ্তি সংবাদ জানাবেন না চিঠি লিখবেন? চিঠিই ভালো।

কাগজ-কলম গুছিয়ে নিয়ে সবেমাত্র চিঠি লিখতে বসেছেন বিশাখা, এই সময় এসে উপস্থিত হলেন মনোজিৎ ঘোষাল। বিখ্যাত থিয়েটারের অভিনেতা, রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। বিশাখারই সমবয়েসি। লম্বা-চওড়া পুরুষ, চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু কলপ লাগান না। দুজনের বন্ধুত্ব আছে, আবার ঝগড়াও হয়।

মনোজিতকে দেখে বেশি খুশি হয়ে উঠল রাজু। তার মামাতো ভাই মনোজিতের বাড়িতে কাজ করে। ও-বাড়িতে তার যাতায়াত আছে।

মনোজিৎ সোফায় বসে পড়েই বলল, এই রাজু, ভালো করে চা বানা। চিনি দিবি না। বিস্কুট-ফিস্কুট কী আছে বার কর!

তারপর বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললেন, হলদিয়ার ফাংশনে যাওয়ার জন্য তোমাকে বলতে এসেছিল, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ?

বিশাখা বললেন, হ্যাঁ।

মনোজিৎ বললেন, তোমার কাছে তো সিগারেট থাকে। একটা দাও। কেন ফিরিয়ে দিলে?

বিশাখা সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মফস্‌সলে আমার যেতে আর ভালোলাগে না। ফেরা যায় না, থাকার জায়গা নিয়ে গণ্ডগোল হয়, আমি অন্য কারুর সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারি না। সবসময় দেখেছি, আমার ঘরে অন্য কোনও মেয়েকে ঢুকিয়ে দেবে।

মনোজিৎ বললেন, সেটাই আসল কারণ? নাকি টাকায় পোষায়নি?

বিশাখা বললেন, সেটাও একটা কারণ। মোটে এক হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। অত কম টাকায় যাব কেন? বেশি টাকা পেলে তবু কষ্ট সহ্য করা যায়।

—এটা সরকারি অনুষ্ঠান। বাজেট বেশি নেই। কিন্তু খুব বড় অনুষ্ঠান হবে তিনদিন ধরে। রেডিও টিভি কভারেজ হবে। অনেকেই যাচ্ছে, কম টাকায় রাজি হয়েছে।

—আমি রাজি নই। সরকারি অনুষ্ঠান, চ্যারিটি, এসব অনেক গেছি। আর ভালোলাগে না। গান গাওয়াটা এখন আমার জীবিকা।

—আমি ওদের বলে তোমারটা বাড়িয়ে দু-হাজার করে দেব। থাকার জন্য একলা ঘর পাবে। খুব ভালো, নতুন বাংলো।

—নাঃ আমি যাব না, মন ঠিক করে ফেলেছি।

মনোজিৎ চওড়া করে হাসলেন। জোরে-জোরে সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, তুমি বরাবরের জেদি মেয়ে। তুমি হলদিয়ায় না গেলে কী হবে জানো? আমি কিছু ছেলে লেলিয়ে দেব তোমার

পেছনে। এরপর তুমি যে ফাংশনেই গান গাইতে যাবে, ওইসব ছেলেরা চ্যাঁচামেচি করে তোমার গান থামিয়ে দেবে। তোমার সব অনুষ্ঠানের বারোটা বেজে যাবে।

রাগে ঝলসে উঠে বিশাখা বললেন, ভয় দেখাচ্ছ? ঠিক আছে, তোমার ছেলেরা চ্যাঁচামেচি করলেও অন্য লোকরা যদি বাধা না দেয়—

মনোজিৎ বললেন, কেউ ভয়ে বাধা দেবে না। ছেলে-ছোকরাদের সবাই ভয় পায়।

বিশাখা বললেন, যদি তাই হয়, তাহলে আমি গান ছেড়ে দেব! আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কেউ কোথাও আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

মনোজিৎ বললেন, বেশ। তাহলে ধরে নাও, তোমার গানের কেরিয়ার আজ থেকে শেষ। কইরে রাজু, এখনও চা হল না। বিশাখা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো একটু আমার সামনে।

কড়মড় করে বিস্কুট চিবিয়ে, সপ-সপ করে চা শেষ করলেন মনোজিৎ। তারপর বললেন, শনিবার ফাংশন। এখান থেকে গাড়িতে যাওয়া হবে। শুক্কুরবারের সব কাগজে বিজ্ঞাপনে বড়-বড় করে তোমার নাম ছাপা হবে। তুমি ঠিক এগারোটার সময় তৈরি হয়ে থেকো, একটা গাড়ি তোমায় তুলে নিয়ে যাবে।

বিশাখা ঝাঁঝাল গলায় বললেন, এটা কী হচ্ছে মনোজিৎ? তুমি সি.পি.এম.-এর পান্ডা হয়েছ বলে আমার ওপর জুলুম খাটাবে? আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে? আমি কিছুতেই যাব না, দেখি কী করে নিয়ে যাও!

হা-হা করে হেসে উঠলেন মনোজিৎ। সরলভাবে তাকিয়ে রইলেন বিশাখার দিকে।

তারপর বললেন, রাগলে তোমাকে এখনও ভারি সুন্দর দেখায়। তুমি যখন বিশ্বরঞ্জনকে বিয়ে করলে, তখন ওর ওপর আমার খুব হিংসে হয়েছিল। তুমি কি ঠাট্টাও বোঝো না? তোমাকে আমি জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারি? তোমার বিরুদ্ধে আমি সত্যি-সত্যি ছেলেদের লেলিয়ে দেব নাকি? আমি গান ভালোবাসি না? কেউ যদি তোমার ফাংশনে গোলমাল করে, আমি নিজে তাকে ঠ্যাঙাব! এবার ভুরু দুটো সোজা করো তো। অমন কটমট করে তাকিয়ে থেকো না।

বিশাখা বললেন, খবরদার, বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেবে না।

মনোজিৎ বললেন, তুমি বারণ করলে দেব না।

কাপ-প্লেট তুলে নিতে এসে রাজু বলল, বড়বাবু, আমাকে হলদিয়া নিয়ে যাবেন?

মনোজিৎ বললেন, কেন নিয়ে যাব? তুই গান গাইতে পারিস? নাচতে জানিস, ম্যাজিক দেখাতে পারিস, কবিতা লিখিস? আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি যদি অন্য কাজে লাগানো যায়।

রাজু বিশাখাকে বলল, বউদি গ্যাস ফুরিয়ে গেছে, খবর দিয়ে আসব?

বিশাখা ইতস্তত করে বললেন, এর মধ্যে গ্যাস ফুরিয়ে গেল? স্টোভ আছে তো, বিকেলে খবর দিয়ে আসিস!

মনোজিৎ বললেন, না, না, এখনই খবর দিয়ে আসুক না। পেতে কত দেরি হয়। যদি না পাস, আমাকে বলিস।

রাজু দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার পর বিশাখা বললেন, আমার বাড়ির কাজের লোক, তুমি তাকে হলদিয়ায় নিয়ে যাওয়ার কথা দিলে, এখন বাইরে পাঠালে—আমার মতামতের বুঝি মূল্য নেই?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মনোজিৎ বললেন, তোমার ফ্ল্যাটটা এমন, বসবার জায়গার পাশেই রান্নাঘর, এখানে বসে যা কথাবার্তা বলবে, সব রাজু শুনবে। এটা ঠিক নয়। মাঝে-মাঝে ওকে ছুটি দাও না?

বিশাখা বললেন, দুপুরের পর ও থাকে না। খেয়েদেয়ে চলে যায়।

মনোজিৎ বললেন, বাঃ! এ পাড়াটা বেশ নিরিবিলি। আমি যদি দু-একদিন তোমার বাড়িতে

দুপুরে চলে আসি, আমাকে একটু ঘুমোতে দেবে? শুধু ঘুমোবো, তোমাকে ডিসটার্ব করব না।

বিশাখা বললেন, এ আবার কেমন ধরনের কথা? তোমার নিজের বাড়ি নেই? তোমার স্ত্রী রয়েছেন—

মনোজিৎ ক্লান্তভাবে বললেন, আমাদের বাড়িতে অনেক লোক। সবসময় লোক। একটু পলিটিকস করতে গেলেই অনেক লোকজন ঘিরে থাকে। আমি একটু বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাই না। চলে আসব তোমার এখানে?

বিশাখা বললেন, না। তুমি এখানে ঘুমোতে এলে লোকে কী বলবে?

বিশাখার দিকে কয়েক পলক বিচিত্রভাবে চেয়ে থেকে মনোজিৎ হঠাৎ হেসে বললেন, লোকে কী বলবে না বলবে, তা তুমি গ্রাহ্য করো?

বিশাখা বললেন, আমার নিজের যেটা ইচ্ছে হয়, তাতে আমি অন্যের মতামত গ্রাহ্য করি না। তোমার ঘুমোবার অন্য জায়গা খুঁজে নাও।

মনোজিৎ বললেন, ঠিক আছে! আসব না। কিন্তু হলদিয়ার ব্যাপারে আমি যদি তোমার কাছে ব্যক্তিগত অনুরোধ করি, সেটাও তুমি রাখবে না? তোমার ওপর আমার এটুকুও জোর নেই?

বিশাখা বললেন, এরকম অন্যায় অনুরোধ তুমি করবে কেন?

মনোজিৎ বললেন, অন্যায় কিন্তু নয়, মাঝে-মাঝে কম টাকায় দু-একটা অনুষ্ঠানে যেতেই হয়। সবাই যায়। অত রিজিড হলে চলে না। শোনো, তুমি তো লতা মুঙ্গেশকার কিংবা কণিক-সুচিত্রার মতন অত বড় গায়িকা নও। মাঝারি। তোমার নামে হাজার-হাজার টিকিটও বিক্রি হবে না—

বিশাখা বললেন, সেই জন্যই তো, আমি গেলাম কি গেলাম না, তাতে কিছু আসে যায় না।

মনোজিৎ বললেন, তুমি রিফিউজ করেছ বলেই উদ্যোক্তাদের মানে লেগেছে। আর সবাই যাচ্ছে, তুমি কেন যাবে না? সেই জন্য আমাকে ধরেছে। চলো লক্ষ্মীটি, না হলে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না।

বিশাখা চুপ করে রইলেন।

মনোজিৎ ঝুঁকে পড়ে বিশাখার হাত ধরে মিনতি করে বললেন, চলো-চলো, দেখো তোমার খারাপ লাগবে না। ঝকঝকে নতুন বাংলো নদীর ধারে, সেখানে তুমি থাকবে, তোমার জন্য আলাদা ঘর।

বিশাখা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে।

মনোজিৎ নিজে উঠে পড়ে বিশাখাকেও হাত ধরে দাঁড় করালেন। বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ! গুড গার্ল।

তারপর বিশাখার কাঁধে হাত রেখে গাঢ় চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, নির্জন ফ্ল্যাট, আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। আমরা কি এখন একটু প্রেম করতে পারি না?

বিশাখা বললেন, এটাও বুঝি ঠাট্টা?

মনোজিৎ বললেন, না, না, এটা সিরিয়াস! আমরা কি অনেক দিন আগেই প্রেম করতে পারতাম না?

বিশাখা বললেন, না, তুমি আমার প্রেমিক নও। তোমার কত বান্ধবী, প্রত্যেককেই বুঝি এই কথা বলো?

মনোজিৎ বললেন, যদি সবাইকে বাদ দিয়ে দিই? এখন থেকে শুধু তোমার জন্য?

বিশাখা বললেন, বড় দেরি হয়ে গেছে মনোজিৎ! তুমিও এখন আর নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে না।

মনোজিৎ একটু সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বিশাখাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে যেতে-যেতে বললেন, তোমার সঙ্গে আর কয়েকটা জরুরি কথা ছিল। আজ থাক, পরে আর একদিন বলা যাবে।

॥ ৫ ॥

হলদিয়ার অনুষ্ঠান বিকেল চারটেয় শুরু। চলল রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। বিশাখা গান গাইলেন সাড়ে সাতটার সময়, এখানেও দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেলেন টনিকে।

গান শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এসে একজন স্বেচ্ছাসেবককে বললেন, শ্রোতাদের মধ্যে একেবারে সামনের দিকে লাল শার্ট পরা একজন বসে আছে। তাকে একবার আমার নাম করে ডেকে আনুন তো!

ধরা পড়া চোরের মতন সঙ্কুচিতভাবে এসে দাঁড়াল টনি।

মঞ্চের পেছন দিকে সরে গিয়ে বিশাখা জিগ্যেস করলেন, তোমার কী ব্যাপার বলো তো? অনেক ফাংশনে তোমাকে দেখি, কিন্তু পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াও কেন?

টনি বলল, আমি আপনার গান শুনতে আসি। আপনার গান ভালো লাগে। আপনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না।

বিশাখা বললেন, তুমি শুধু আমার গান শোনার জন্য হলদিয়ায় এসেছ?

টনি মাথা নাড়ল।

বিশাখা বললেন, আচ্ছা পাগল তো তুমি! এখানে এত বড় জলসা, কত জন শিল্পী, আমাকে মাত্র দু-তিনখানা গান গাইতে বলা হয়েছিল। আমি তিনখানাই গেয়েছি। সে তিনটে গানই আমার ক্যাসেটে আছে, এরকম বড় ফাংশনে শ্রোতারা চেনা গানই শুনতে চায়। তোমার কাছে তো আমার ক্যাসেটই আছে। শুধু-শুধু এত দূর আসার কোনও মানে হয়? তা ছাড়া এখানে আমি নাও আসতে পারতাম, শেষ মুহূর্তে রাজি হয়েছি।

টনি বলল, কাগজের বিজ্ঞাপনে আপনার নাম দেখেই আমি এসেছি।

বিশাখা হেসে ফেলে বললেন, সত্যিই পাগল। তোমার আর কোনও কাজকর্ম নেই বুঝি। আর এই লাল জামাটা ছাড়া আর কোনও জামা নেই তোমার?

টনিও এবার লাজুকভাবে হাসল।

বিশাখা বললেন, আমার এত বড় ভক্ত, তোমাকে আমি একটা জামা কিনে দেব!

টনি বলল, না, না, আমার জামা আছে।

বিশাখা হাঁটতে শুরু করে বললেন, তা আছে জানি। তোমাকে একটা উপহার দেব।

ফাংশন পুরো দমে চলছে, উদ্যোক্তারা সবাই ব্যস্ত, কার কাছে গাড়ি চাইতে হবে কে জানে? তবে বিশাখাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে যে গেস্ট হাউজে, সেটা বেশি দূরে নয়। সাইকেল রিকশায় যাওয়া যায়, হেঁটেও যাওয়া যায়, ভারি চমৎকার, পাতলা ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ আজ পরিষ্কার।

গান-বাজনার পর যাত্রা হবে। তাই প্যান্ডেলে কয়েক হাজার লোক। এত বড় ফাংশনে রবীন্দ্রসংগীত জমানো শক্ত, তবু বিশাখার গানের সময় কোনও গোলমাল হয়নি, তাঁর ধারণা আজ তিনি ভালো গেয়েছেন, তাই মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে আছে। তা ছাড়া, একজন ভক্ত ঘুরে-ঘুরে সব অনুষ্ঠানে গান শুনতে যায়, এটা শুনলে কার না ভালোলাগে।

খানিকটা পরীক্ষা করার জন্যই তিনি টনিকে জিগ্যেস করলেন, তোমাকে আমি ডেকে নিয়ে

এলাম, তুমি আরও গান শুনতে নিশ্চয়ই? যাও, এরপর মান্না দে-র গান আছে।

টনি বলল, এসব গান আর শুনব না। ক্যাসেটে আপনার গান অনেকবার শুনেছি, তবু সামনাসামনি শুনলে প্রত্যেকবারই নতুন মনে হয়।

—তুমি রাত্তিরে কোথায় থাকবে টনি?

—একটা হোটেলে, ঠিক করে এসেছি।

—এখানে হোটেল আছে বুঝি?

—বাঃ, হোটেল থাকবে না? অনেক হোটেল আছে।

—আমি হলদিয়ায় আগে আসেনি। নতুন শহর গড়ে উঠছে, দেখতে বেশ লাগে। সব বাড়িই প্রায় নতুন। তোমার হোটেল কত দূরে?

—খানিকটা দূর আছে, সাইকেল রিকশায় যাওয়া যায়। আমার হোটেলটা দেখে আসবেন? বেশিক্ষণ লাগবে না।

—নাঃ, হোটেল দেখে কী করব? আমি গেস্ট হাউজে ফিরব।

—আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি?

—চলো।

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে এক জায়গায় থমকে গেলেন বিশাখা। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডানদিকে। সেদিকের প্রান্তর দুধের মতো সাদা, বাড়িঘর নেই। একটা গাছও নেই।

তিনি আপন মনে বললেন, ওদিকে কী?

টনি বলল, ওই তো নদী।

বিশাখা বললেন, গঙ্গা? এত কাছে? ও মা বুঝতেই পারিনি!

তারপর বালিকার মতন উচ্ছল হয়ে বললেন, চলো, চলো, নদীর ধারে গিয়ে একটু বসি। কাল ভোরে ফিরে যাব, নদী দেখাই হত না। কোনও মানে হয়!

দ্রুত পায়ে পৌঁছে গেলেন নির্জন নদীর ধারে। ফাংশনের মাইকের আওয়াজ এ পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে বিন্দু-বিন্দু আলো।

সিমেন্টের বেঞ্চ করা আছে, তার একটাতে বসলেন। একটু ফাঁক রেখে বসল টনি, সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলল, একটা খাবেন?

বিশাখা বললেন, খাব? কেউ দেখবে না তো?

এদিক-ওদিক তাকিয়েও কোনও লোক চোখে পড়ল না, তিনি একটা সিগারেট ধরালেন।

টনির দিকে ফিরে বললেন, তুমি সব ফাংশনে আমার গান শুনতে যাও, কিন্তু আমার বাড়িতে আর আসো না কেন? সেদিন তোমাকে খুব বকেছি, তাই না?

টনি বলল, কই না, বকেননি তো!

—তাহলে আর একদিনও এলে না কেন? সেদিন আমার মেজাজ ভালো ছিল না।

—আমার মনে হয়েছিল, সকালে আপনি ব্যস্ত থাকেন। তা ছাড়া, আমাকে একজন বলেছে, সকালে মেয়েরা চুল না আঁচড়ে, শাড়ি-টাড়ি না বদলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। আমি তো এসব জানতাম না, নইলে একদিন সকালে আপনার রেওয়াজ করার সময় আমার একটু শুনতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল!

—আমি সকালে উঠেই সাজপোশাক করি না, মুখে পাউডার মাখি না। তুমি আসতে পারো একদিন সকালে, রেওয়াজের সময় চুপচাপ বসে থাকবে, ওইসব জিনিস-টিনিস আনবে না। রবিবার বাদ দিয়ে এসো—।

—দিদি, এখন একটা গান গাইবেন?

—এই রে, আবার এইসব শুরু করলে? আমি যখন-তখন গান করি না। খানিকক্ষণ আগেই

তো গাইলাম ক-খানা।

—না, মানে, নদীর ধারে, 'অশ্রু নদীর সুদূর পারে' গানটা।

—ওসব হবে না, গান-টান হবে না। এই তো বেশ লাগছে।

টনি উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। তার কাঁধের ঝোলা ব্যাগে হাত দিয়ে জিগ্যেস করল, তাহলে...আপনার একটা ছবি তুলব?

বিশাখা বললেন, তোমার সঙ্গে ক্যামেরা রয়েছে বুঝি? এখানে ছবি উঠবে?

টনি বলল, ফ্ল্যাশ আছে। এরকম জায়গা তো আর পাব না, এখানে আপনার একটা ছবি তুলে রাখলে—

বিশাখা বললেন, ঠিক আছে, তোলো—

একখানা নয়। পাঁচখানা ছবি তুলল টনি। নানান দিক থেকে। বিশাখাকে একেবারে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে পটভূমিকায় রাখল নদী। জ্যোৎস্নায় সে নদী যেন এখন দুধের নদী।

বিশাখা বললেন, ক্যামেরাটা দাও, এবার তোমার একটা ছবি তুলে দিই।

টনি বলল, আমার ছবি, না, খুব ভালো হত আপনার সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলতে পারলে, আমি বাঁধিয়ে রাখতাম।

কিন্তু দুজনের একসঙ্গে ছবি কী করে তোলা হবে, তার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি দরকার।

টনি অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

জায়গাটা একেবারে নির্জন মনে হলেও আসলে ঠিক তা নয়। একটু দূরে কী যেন একটা নড়ে উঠল।

টনি দৌড়ে গেল সেদিকে।

এক জোড়া ছেলে-মেয়ে এত ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছে যে দূর থেকে মনে হয় একজন। একটিই মাথা।

টনি কাছে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ওরা জড়াজড়ি করে আছে। পায়ের শব্দ পেয়ে দুজন ছিটকে সরে গেল।

এত কাছে এসে কিছু একটা বলতেই হয়। টনি বলল, মাপ করবেন, আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি, মানে, একটা ছবি তুলতে হবে, আমার ক্যামেরায় যদি একটা ছবি তুলে দেন—

গুন্ডা কিংবা পুলিশ যে নয়, তাতেই স্বস্তি বোধ করল যুবকটি। উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুলে দিচ্ছি।

ক্যামেরা হাতে নিয়ে যুবকটি বেশি কায়দা করতে লাগল। একটু ওপাশে সরে আসুন। মুখটা তুলুন, না-না, অতটা নয়,...

জ্যোৎস্নায় বিশাখার বয়েস বোঝা যাচ্ছে না। সে নিশ্চয়ই বিশাখাকে ভেবেছে টনির প্রেমিক। সে ফক্কুড়ি করে বলল, অত দূরে-দূরে কেন, লজ্জা পাচ্ছেন বুঝি, আরও ক্লোজ হয়ে আসুন, একজন কাঁধে হাত দিন।

টনি অবশ্য বিশাখার কাঁধে হাত দিতে সাহস করল না। বিশাখা টনির শরীরের সংস্পর্শ থেকে একটু দূরে রইলেন।

ছবি তোলা শেষ হতেই বিশাখার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল। তাঁর তেষ্টা পেয়েছে।

তিনি টনিকে বললেন, আমাকে গেস্ট হাউজ পর্যন্ত পৌঁছে দাও।

বেশি দূর হাঁটতে হল না, একটু এগোতেই একটা সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল রিকশায় স্পর্শ বাঁচানো সম্ভব নয়। মফস্‌সলের রিকশাগুলো ছোট-ছোট হয়। টনিকে তার একটা হাত রাখতে হল বিশাখার পিঠের ওপর দিয়ে। অনেকদিন বিশাখা কোনও পুরুষের সঙ্গে রিকশা চাপেননি।

গেস্ট হাউজে পৌঁছে বিশাখার সঙ্গে-সঙ্গে টনিও নামল। বিশাখা পয়সা বার করতে যেতেই

টনি ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি দিচ্ছি।

বিশাখা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। এখন এই ছেলেটিকে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার কি কোনও মানে হয়? ওর সঙ্গে তো অনেকক্ষণ গল্প করা হয়েছে। এখন একলা থাকতেই বিশাখার ভালো লাগবে।

তিনি বললেন, রিকশাটা ছাড়বে কেন, এটা নিয়েই তুমি হোটেলে চলে যাও।

টনি প্রত্যাশার চোখে তাকিয়ে ছিল। আরও কিছুক্ষণ বিশাখার সঙ্গ পাওয়ার আশা করেছিল হয়তো, তবু বলল, হ্যাঁ, সেই তো ভালো, আমি এই রিকশাতেই চলে যেতে পারি। দিদি, একদিন আপনার বাড়িতে যাব কিন্তু। ছবি দিয়ে আসব।

বিশাখা বললেন, হ্যাঁ, এসো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলেন বিশাখা। কাছাকাছি অন্য ঘরগুলো সব এখনও তালা বন্ধ। কলকাতা থেকে বারো জনের একটি দল এসেছে, অন্যরা এখনও ফেরেনি। পুরো দোতলাটা এখনও নিস্তব্ধ।

বিশাখা আবার ভাবলেন, টনিকে নিজের ঘরে না ডেকে ভালোই হয়েছে।

ঘরে ঢুকেই বিশাখা ব্যাগ থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা বার করলেন। এইরকম সময়ে দু-ঢোঁক ব্র্যান্ডি পান করার খুব তেষ্টা পায়। সঙ্গে একটা সিগারেট। দিনের শেষ সিগারেট।

এখন ক'টা বাজল? বিশাখা হাতঘড়িটা ফেলে গিয়েছিলেন। ড্রেসিং টেবিলের ওপর থাকার কথা। একটু খোঁজাখুঁজি করে পেলেন না। আছে নিশ্চয়ই কোথাও। সকালবেলা পাওয়া যাবে।

মনোজিৎ বলে রেখেছেন, ফাংশন শেষ হলে তাঁর ঘরে আড্ডা বসবে।

নিজেদের মধ্যে আবার গান-টান হবে। সে কত রাত পর্যন্ত চলবে কে জানে! বিশাখার অত উৎসাহ নেই। তিনি রাত জাগতে ভালোবাসেন না। কাল খুব ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়তে পারলে ভালো হয়। এগারোটায় গানের ক্লাস আছে।

রাত্রে কিছু খাওয়ারও ইচ্ছে নেই বিশাখার। বেশি রাতে এইসব হোটেল-ফোটেলের খাওয়ার খেলেই অম্বল হয়। তার চেয়ে কিছু না খাওয়া ভালো। মনোজিতরা আসবার আগেই বিশাখা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন। ডাকলেও সাড়া দেবেন না।

সিগারেট ধরিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ালেন। এখান থেকেও নদী দেখা যায়।

আপন মনে গান ধরলেন বিশাখা। অশ্রু নদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায়....।

এ গানটা হঠাৎ মনে পড়ল কেন? কে যেন বলেছিল? কে যেন? ওঃ হো, একটু আগে টনি শুনতে চেয়েছিল এই গানটা।

গাইতে-গাইতে বিশাখা ভাবলেন, টনির অনুরোধে নদীর ধারে এই গানটা একবার গেয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। অত করে শুনতে চাইল বেচারা। ভক্তের এটুকু চাওয়া মেটাতে কৃপণতা করা ঠিক হয়নি। ও চায়, একদিন বিশাখা শুধু ওর জন্যই একটা গান গাইবেন। আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।

॥ ৬ ॥

ঠিক আটটার সময় টেলিফোন করলেন মনোজিৎ। বললেন, বিশাখা, তুমি বাড়িতে আছ তো, আমি তোমাদের পাড়াতেই এক জায়গায় আছি। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে তোমার ওখানে পৌঁছে যাব।

. রাজু এখন নেই, অ্যাপার্টমেন্টে বিশাখা একা। যে-সব দিন কোনও অনুষ্ঠানে যেতে হয় না, বিশাখা একাই থাকেন। টিভি দেখেন। কোনও প্রোগ্রামই পছন্দ না হলে গান শোনেন ক্যাসেটে। উচ্চাঙ্গসংগীত।

মনোজিৎ এসে যদি কিছু খেতে চান, সুপ আর টোস্ট ছাড়া আর কিছু দেওয়া যাবে না। বাড়িতে আজ ডিমও নেই। মনোজিৎ খেতে ভালোবাসেন।

ঠিক পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন মনোজিৎ। পাজামার ওপর বোতাম খোলা পাঞ্জাবি পরা। দেখা যাচ্ছে তাঁর লোমশ চওড়া বুক।

ঘরে ঢুকেই মনোজিৎ বললেন, তোমার কাছে তো একটা ব্র্যান্ডির বোতল থাকে, সেটা বার করো তো। আজ অনেকক্ষণ রিহার্সাল দিয়েছি, গলা শুকিয়ে গেছে।

বিশাখা বললেন, কী করে জানলে যে আমার কাছে ব্র্যান্ডির বোতল থাকবেই?

মনোজিৎ বললেন, মদ আর সিগারেট। তোমার স্বামীর ওই দুটোরই খুব নেশা ছিল। তোমার ওপরও নেশা দুটো চাপিয়ে গেছে। তুমি স্বামীকে ছেড়েছ, নেশা দুটো ছাড়তে পারোনি।

বিশাখা মুখের রেখা কঠিন করে বললেন, আজ সকাল থেকে সিগারেট খাইনি একটাও। আর কোনওদিন খাব না। যে অর্থে মদ খাওয়া বলে, সে অর্থে আমি মদও খাই না। আমার স্বামী ছিল নেশাখোর, মাতাল হয়ে পড়ত রোজ। আমি ওষুধের মতন খানিকটা ব্র্যান্ডি খাই। কোনওদিন বেশি খাইনি। কোনও পার্টিতে-ফার্টিতে গিয়ে কখনও মদ ছুঁই না। হয়তো ব্র্যান্ডি খাওয়াও একদিন ছেড়ে দেব।

মনোজিৎ বললেন, না, না, কোনওটাই আমি ছাড়তে বলিনি।

বিশাখা বললেন, তুমি বললেই বা তোমার কথা আমি শুনতে যাব কেন?

মনোজিৎ বললেন, আরে খালি তর্কই করছ যে, বোতলটা দেবে না?

বিশাখা সরে গিয়ে দেরাজ থেকে বোতল বার করলেন। গেলাস ও জল এনে বললেন, আজ দিচ্ছি, কিন্তু যখনই তোমার ব্র্যান্ডি খাওয়ার ইচ্ছে হবে, অমনি আমার বাড়িতে চলে আসবে তা কিন্তু চলবে না। এটা শুঁড়িখানা নয়।

হা-হা করে হেসে উঠে মনোজিৎ বললেন, ব্র্যান্ডি খাওয়ার জন্য আসিনি। তোমাকে দেখতে এসেছি। মাঝে-মাঝে তোমার সুন্দর মুখখানি না দেখলে মন কেমন করে।

বিশাখা বললেন, ন্যাকামি করো না!

গেলাস না নিয়ে বোতল থেকেই লম্বা চুমুক দিয়ে আঃ শব্দে তৃপ্তির শ্বাস ছাড়লেন মনোজিৎ। তারপর বললেন, জরুরি কাজে এসেছি। দুটো ব্যাপার। প্রথমটি আগে সেরে নেওয়া যাক। পাঞ্জাবির পকেট থেকে তিনি একটা হাতঘড়ি বার করে বললেন, এই নাও!

বিশাখা চমকে উঠে বললেন, পাওয়া গেছে?

মনোজিৎ বললেন, পাওয়া যাবে না মানে? তুমি হলদিয়ায় আমার অনুরোধে গান গাইতে গেলে, সেখানে তোমার ঘড়ি চুরি গেল, সেটা তো আমারই পক্ষে অপমানের কথা। গেস্ট হাউজের সবক'টা বেয়ারাকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে বললাম, লেডিজ ঘড়ি চুরি গেছে, তোমাদের সকলের বউকে আমরা জেরা করব। যদি কারুর বাড়িতে পাওয়া যায়, স্বামী-স্ত্রী দুজনকে জেলে ভরে দেব!

—অমনি কেউ স্বীকার করল?

—মুখে কেউ স্বীকার করেনি। তিনদিন পর, তুমি যে ঘরে ছিলে, সেই ঘরেরই সোফার তলায় খুঁজে পাওয়া গেল ঘড়ি। যে চুরি করেছে, সেই রেখে এসেছে।

—কিংবা আমার হাত থেকেও পড়ে যেতে পারে।

—ওই ঘর আগে সার্চ করা হয়েছে অনেকবার। সোফা-টোফা সরিয়ে যাকগে, পাওয়া গেছে, তাতেই আমার মানরক্ষা হয়েছে।

—আমার আরও দুটো ঘড়ি আছে। ঘড়ি আমি সবসময় পরিও না। কিন্তু এই ঘড়িটা আমার ছেলে প্রথম চাকরি পেয়ে আমাকে কিনে দিয়েছিল। তাই এটার একটা বিশেষ দাম আছে।

—সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু!

—থ্যাঙ্ক ইউ মনোজিৎ। এটার জন্য তোমাকে অনেক ঝক্কি পোহাতে হয়েছে।

—তোমার জন্য আমি যে-কোনও কাজ করতে পারি বিশাখা। তোমার নতুন কোনও ক্যাসেট বেরুচ্ছে?

—এখন? না। পুজোর সময় বেরুবার কথা আছে।

—তোমার আগের ক্যাসেটটা তুমি আমায় দাওনি। আমি কিনেছি।

—দেখা হলে দিতাম। তা ছাড়া যতদূর জানি, তুমি রবীন্দ্রসংগীতের খুব একটা ভক্ত নও।

—সকলের গলায় ভালোলাগে না। তোমার গান ভালো লাগে। বারবার শুনি।

—কী ব্যাপার বলো তো, হঠাৎ আমার এত প্রশংসা?

—যারা একা থাকে, তাদের মাঝে-মাঝে প্রশংসা, খোসামোদ এইসব শোনা দরকার। নইলে জীবনটা অনর্থক মনে হতে পারে। শিল্পী মাত্রেরই মাঝে-মাঝে খানিকটা প্যামপারিং দরকার। এই বিশাখা, তুমি আমাদের নতুন নাটকটা দেখবে না?

—দেখব। নিশ্চয়ই দেখব। কবে শুরু হচ্ছে?

—প্রথম শো হবে একত্রিশ তারিখে, তোমাকে কার্ড পাঠাব। আর একটু ব্র্যান্ডি খেতে পারি?

—হ্যাঁ, পারো। তুমি যে বললে, দুটো জরুরি ব্যাপার আছে? দ্বিতীয়টা কী?

মনোজিৎ চুপ করে গেলেন। সিগারেট টানতে লাগলেন আপন মনে।

বিশাখা নিজে আজ ব্র্যান্ডি খাচ্ছেন না। উৎসুকভাবে চেয়ে রইলেন মনোজিতের দিকে।

মনোজিৎ বললেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয় ব্যাপারটাই বেশি জরুরি। কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। তুমি ভেবো না, আমার ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা লোভ থেকে আমি ব্যাপারটা তোমাকে জানাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে, সেটাই যথেষ্ট। আমার স্ত্রী-র সঙ্গে তোমার ভালো ভাব আছে, তাই আমি জানি, তুমি কোনওদিনই আমার সঙ্গে প্রেম করবে না। তোমার স্বামীটাকে অবশ্য আমার কোনওকালেই পছন্দ নয়। সে যাই হোক, তোমার ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমি চিন্তা করি।

বিশাখা বললেন, অনেকখানি ভূমিকা করছ। আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।

মনোজিতের মতন সপ্রতিভ মানুষও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। আমতা-আমতা করে বললেন, তুমি একা থাকো, মানুষ কতদিন একা থাকতে পারে? তোমার এমন কিছু বয়েসও হয়নি। তোমার যদি একজন বয়ফ্রেন্ড থাকে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বিশাখা মুচকি হেসে বললেন, তুমি আবার আমার বয়ফ্রেন্ড আবিষ্কার করলে কোথা থেকে?

মনোজিৎ বললেন, তোমার বয়ফ্রেন্ডকে আমি চিনি। ছেলে খারাপ নয়, তবে বয়েস তো বেশি নয়, তাই ঠিক দায়িত্বজ্ঞান হয়নি। বাজারে তোমার তো একটা মান-সম্মান আছে, পাবলিক ইমেজ আছে, তাই এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে লোকে হাসাহাসি করে। কাগজেও ছাপা হয়ে যেতে পারে। রাত্তিরে তাকে এখানে থাকতে দাও কেন?

দপ করে জ্বলে উঠলেন বিশাখা। তীব্র চোখে তাকিয়ে বললেন, আমার বয়ফ্রেন্ড, রাত্তিরে থাকতে দিই, এসব কী বলছ তুমি?

মনোজিৎ বললেন, সুলতানপুরের বাদশা হককে আমি অনেকদিন চিনি। আমাদের পার্টির লোক। ওর ভাই, ওই যে কী যেন নাম, মোজাম্মেল, একটা ডাক নাম আছে, সেই নামেই সবাই চেনে, টনি, হ্যাঁ, টনি, সে তোমার বন্ধু নয়? সে এখানে প্রায়ই এসে রাত্রে থাকে না? সে নিজের মুখে বলেছে।

বিশাখার মুখখানা পাথর হয়ে গেল।

খুব রাগের সময় তাঁর কান্না পায়, বুক ব্যথা করে। এখন তাঁর মনে হল, পুরো পৃথিবীটাই খারাপ লোকে ভরা।

তিনি অস্পষ্ট করে বললেন, সে আমার বন্ধু, আমি তাকে রাত্তিরে এই ফ্ল্যাটে—

মনোজিৎ বললেন, কখনও থাকেনি? সে মিথ্যে কথা বলেছে? তুমি বলো, তাহলে আমি সে হারামজাদাকে ধরে পেটাব!

বিশাখা বললেন, মাত্র একবারই, ঝড়বৃষ্টির রাতে, ওদের গ্রামে ফাংশন ছিল, আমার ফেরার উপায় ছিল না, টনি আমাকে পৌঁছে দিতে এল, তারপর অত রাতে সে আবার ফিরে যাবে, তাই আমি তাকে বলেছিলাম, রাত্তিরটা এখানে থেকে যেতে। বয়েসে কত ছোট, সে আমাকে দিদি বলে।

—সে তোমার জন্য প্রায়ই উপহার আনে, মাছ-টাছ, আরও কত কী।

—সে এই সবও বলেছে?

—এসব চাপা থাকে না, বুঝলে? খবর ঠিক রটে যায়। বাড়ির কাজের লোকরাও খবর ছড়ায়।

—সে রাতেও সে একলা থাকেনি। একটু পরেই আমার ছেলে এক বন্ধুকে নিয়ে এসে পড়েছিল।

—হ্যাঁ। তোমার ছেলের কথাই বেশি করে ভাবছি। তার কানে যদি যায়! তুমি আর-একটা বিয়ে করলে সে নিশ্চয়ই মেনে নিত। কিন্তু রাত্তিরবেলা হঠাৎ এসে যদি দেখে মায়ের সঙ্গে আর একজন পুরুষ মানুষ—

—টনি আমার ছোট ভাইয়ের মতন।

—দেখো বিশাখা, হলদিয়ায় তুমি ওর সঙ্গে...তুমি যেখানেই যাও, টনি তোমার সঙ্গে যায়, একথা বলেছে দু-একজন। হলদিয়ায় তুমি ওর সঙ্গে নদীর ধারে গেছ, সাইকেল রিকশা করে ঘুরেছ, তাও কয়েকজন দেখেছে। জানোই তো লোকে রসালো গল্প বানাতে ভালোবাসে—

—লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না।

—তা না করলেও, তোমার ছেলের কথা চিন্তা করবে না? অনির্বাণ এর মধ্যে ওর বাবার কাছে একদিন গিয়েছিল, তুমি জানো?

—খোকা ওর বাবার কাছে গিয়েছিল?

—যাবে না কেন? তুমি তোমার স্বামীকে ডিভোর্স করেছ, ছেলে তো তার বাবাকে ডিভোর্স করেনি। ছেলে তার বাবার কাছে মাঝে-মাঝে যেতেই পারে। কিন্তু তোমার কাছে না এসে যদি বাবার সঙ্গেই দেখা করে যায়—

—তা হতেই পারে না। অসম্ভব।

—বিশুদা আমাকে নিজে বলেছেন, ওঁর সল্টলেকের বাড়িতে অনির্বাণ গিয়েছিল একদিন।

—খোকা আমাকে সে কথা বলবে না? আমি বিশ্বাস করি না। দাঁড়াও, এক্ষুনি খোকাকে জিগ্যেস করছি।

টেলিফোনের কাছে ছুটে গিয়ে কানপুরের নাম্বার ঘোরালেন বিশাখা। ওদিকে রিং হয়ে গেল অনেকক্ষণ। কেউ ধরল না। রাত মাত্র সওয়া ন'টা, অফিসের পর অনির্বাণ হয়তো ক্লাবে গেছে। কোনও বন্ধুর বাড়িতেও যেতে পারে।

বিশাখার দু-চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

মনোজিৎ উঠে এসে বিশাখার কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বললেন, বিশাখা, আমি তোমার বন্ধু। তুমি জানো, আমি মরালিস্ট নই। তোমার যদি একজন পুরুষ-বন্ধু থাকে, তাতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করি, কিন্তু তোমার একজন সঙ্গী থাকা ভালোই তো তবে, তোমার ছেলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়, তার বন্ধুরা যাতে তার মা সম্পর্কে খারাপ কিছু না ভাবে, এইজন্যই আমি বলছিলাম।

মনোজিৎ চলে যাওয়ার পর বিশাখা আরও দুবার ফোনে কানপুর ধরার চেষ্টা করলেন,

অনির্বাণকে পেলেন না। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন নির্জন ঘরের মধ্যে।

একটু বাদেই দরজায় বেল বাজল। বিশাখার ধারণা হল, মনোজিৎ আবার ফিরে এসেছেন। মনোজিতের নানান রকম কৌতুক করার স্বভাব। এসে নিশ্চয়ই বলবেন, না, না, অনির্বাণ তোমাকে না জানিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা করেনি। ওটা আমি বানিয়ে বলেছি, দেখছিলাম তোমার রিঅ্যাকশান কেমন হয়—

মনোজিৎ নয়, এসেছে টনি—

ঝলমলে মুখে টনি বলল, দিদি, ছবিগুলো আজই পেলাম। কী দারুণ ভালো ছবি উঠেছে!

ছবি দেখাওয়ার জন্য টনির পক্ষে এমন ভুল সময় আর হয় না।

বিশাখা টনিকে ঢুকতে না দিয়ে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, এত রাত্তিরে কেন এসেছ? তোমার মতলব কী?

টনির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

মিনমিন করে বলল, ছবিগুলো পেয়ে মনে হল আপনাকে আজই দেখাই। একটা থিয়েটার দেখতে এসেছিলাম, বিকেলেই ছবিগুলো পেয়েছি।

বিশাখা বললেন, আমার ঘরে এসে বসবে। ছলছুতো করে রাত্তিরে এখানে থেকে যেতে চাইবে। তারপর সবাইকে বলে বেড়াবে যে তুমি আমার সঙ্গে এক বিছানায় রাত কাটিয়েছ!

টনি মর্মাহতভাবে বলল, এ কী বলছেন দিদি!

বিশাখা বললেন, আর দিদি দিদি করতে হবে না। তোমার সব শয়তানি আমি বুঝে গেছি। তুমি ভেবেছ, আমি একা থাকি, আমি সস্তার মেয়ে মানুষ। জিনিসপত্র উপহার দিয়ে আমাকে ভোলাবে। বাজারে রটিয়ে বেড়াবে—

টনি প্রায় কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়ে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি আপনার নামে খারাপ কথা বলব—

—তুমি আমার এখানে রাত কাটিয়েছ, তা লোককে বলে বেড়াওনি?

—না, কখনও না। আমি স্বপ্নেও এরকম ভাবি না।

—মিথ্যে কথা। আলবাত বলেছ। তুমি যে এত খারাপ, আমি বুঝতেই পারিনি।

—দিদি, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি শুধু আমার বড় ভাইকে...মানে সেদিনের পরদিন সকালে আমার বড় ভাই, আমার দাদা বাদশা হক বারবার জিগ্যেস করেছিলেন, তুই অত ঝড়-বাদলের রাতে গাড়ি চালিয়ে গেলি, ফিরলি না। রাত্তিরে থাকলি কোথায়? তখন আমি আপনার নাম করে বলেছি যে উনি এত ভালো, আমাকে খেতে দিলেন, অত বৃষ্টির মধ্যে কিছুতেই ছাড়লেন না, ওঁর ওখানেই থাকতে দিলেন।

—আমার ছেলে আর তার বন্ধুও যে সে রাতে ছিল, তা বলেছিলে? না, বলোনি। তোমার দাদা রসিয়ে-রসিয়ে অন্যদের কাছে গল্প করেছে যে আমার ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকে না, তুমি আমার সঙ্গে এক বিছানায়—

—না-না, ছি-ছি!

টনির হাত থেকে ছবির প্যাকেটটা কেড়ে নিলেন বিশাখা।

ছেঁড়ার চেষ্টা করেও ছিঁড়তে পারলেন না। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বারান্দার ওধারে।

বললেন, নষ্ট করো সব ছবি। কোনওদিন আর আমার বাড়িতে আসবে না। তোমার মুখ আর সারাজীবন আমি দেখতে চাই না। খবরদার, আমার পেছনে ঘুরঘুর করবে না, আমার কোনও ফাংশনে যাবে না। তাহলে আমি পুলিশ দিয়ে তোমায় অ্যারেস্ট করাব। দূর হয়ে যাও। গেট আউট।

টনির মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশাখা হাঁপাতে লাগলেন।

আবার দু-চোখে বইছে জলের ধারা।

॥ ৭ ॥

ইচ্ছে করলেই যে-কোনও দিনের ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় না। তবে আজকাল প্লেনের অনেক সুবিধে হয়েছে। দুপুরেবেলাতেই লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত প্লেনের টিকিট পেয়ে গেলেন। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করলেন কানপুর পর্যন্ত।

এখন আর চোখে জল নেই, তবু ভেতরে-ভেতরে গুমরোচ্ছে কান্না।

শ্রীরামপুরে একটা অনুষ্ঠান, পরের দিন রেডিওতে রেকর্ডিং ঠিক করা রয়েছে অনেক আগে থেকে, সেসব গ্রাহ্য করলেন না বিশাখা। কারুকে কিছু জানিয়েও আসেননি। এখন তাঁর একমাত্র চিন্তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনির্বাণের সঙ্গে দেখা করা।

সকালেও টেলিফোনে অনির্বাণকেও ধরতে পারেননি।

অনির্বাণ তার বাবার সঙ্গে দেখা করে গেছে? বিশাখা নিজেই কতবার ছেলেকে বলেছেন, কলকাতায় এলে একবার অন্তত বিশ্বরঞ্জনের সঙ্গে দেখা কবার জন্য। অনির্বাণ যেতে চায় না। ছাত্রজীবনে বরাবরই সে হোস্টেলে থেকেছে, বাবার প্রতি তার কোনও টান জন্মায়নি। সে বরাবরই মায়ের পক্ষে। ডিভোর্সের পর অনির্বাণ বলেছিল, মা, তুমি এতগুলো বছর একসঙ্গে ছিলে কী করে? তোমার সহ্যশক্তি আছে বটে!

ছেলের কথা চিন্তা করেই যে বিশাখা আগে ডিভোর্স চাননি, তা কি ছেলে বোঝেনি?

সেই অনির্বাণ বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল মাকে না জানিয়ে? সেই রাতে বাড়িতে টনিকে দেখার পর থেকে সে তার মাকে ভালোবাসে না? অনির্বাণও ভুল বুঝল?

কানপুর ঘিঞ্জি শহর হলেও একপ্রান্তে বেশ কিছু নতুন বাড়ি উঠেছে। এই অঞ্চলটি পরিষ্কার। সামনে বাগানওয়ালা একটি ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি অনির্বাণের কোয়ার্টার। বিশাখার সেখানে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে সাতটা হয়ে গেল। আজও নিশ্চয়ই অনির্বাণ বাড়ি ফেরেনি।

বিশাখা জানেন, অনির্বাণের কাছে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক কাজ করে, আর বাগানের জন্য আছে পার্টটাইম মালি, যত রাতই হোক, বিশাখা অপেক্ষা করবেন ছেলের জন্য।

শুধু একটা হ্যান্ডব্যাগ এনেছেন বিশাখা, গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বাগানে ঢুকতে-ঢুকতে তাঁর বুক টিপ-টিপ করতে লাগল।

যদি ছেলে খারাপ ব্যবহার করে? তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না। ছেলে যদি মাকে পাপীয়সী ভাবে, তাহলে আর বেঁচে থাকার কী মানে হয়!

ভেতরে গান বাজছে।

অনির্বাণ একবার এ-বাড়ির ছবি পাঠিয়েছিল, তাই বিশাখার অচেনা মনে হয় না। ছবিতেও দরজার পাশে বুগেনভিলিয়া ছিল।

দরজা খুলে দিল অনির্বাণ নিজেই। অবাক হওয়ার বদলে যেন খানিকটা ভয় পেয়েই সে বলল, এ কী মা, তুমি হঠাৎ...কী করে এলে?

বিশাখা ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন, চলে এলাম, তোকে অনেক চেষ্টা করেও ফোনে পাইনি, আমার খুব দরকার—

মায়ের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে অনির্বাণ বলল, ভেতরে এসো। এই সময় কোন ট্রেনে এলে? কী হয়েছে?

প্রথমেই কারুর মৃত্যুর কথা মনে হয়। কিংবা বিষম অসুখ।

বসবার ঘরে এসে বিশাখা বললেন, আমার ভালো লাগছিল না, কিছুই ভালো লাগছিল না, আমি তোর এখানে থাকব। তুই আমাকে থাকতে দিবি?

অনির্বাণ বলল, বাঃ, থাকো না! তাহলে তো ভালোই হয়। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাজ

হয়েছে আমাদের কারখানায়, একটা ছোটখাটো অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সেইজন্য ফোনে পাওনি। কী হয়েছে বলো তো?

বিশাখা ছেলের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, খোকা, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? সত্যি করে বল। আমি সত্যি কথাটা শুনতে চাই।

অনির্বাণ এবার অবাক হয়ে বলল, কেন, রাগ করব কেন? এই কথা বলবার জন্য তুমি ছুটে এলে? তোমাকে আমি একটা স্কার্ফ পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছ তো?

—হ্যাঁ। তোকে একটা চিঠি লিখব ভেবেছিলাম, লেখা হয়নি। তুই আমার ওপর রাগ করিসনি? হ্যাঁ রে, তুই এর মধ্যে একবার কলকাতায় গিয়েছিলি? তোর বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছিস?

—যাঃ বাজে কথা! এর মধ্যে আবার কলকাতায় গেলাম কবে? সময়ই নেই! এ মাসের শেষের দিকে যাব ভাবছি।

—তুই যাসনি? তোর বাবার সঙ্গে দেখা করিসনি?

—বাবার সঙ্গে তো দেখা হল সেবারে। ওই যে আবার বন্ধু অবিরল গিয়েছিল আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা কী হল জানো, অবিরলের এক কাকা থাকেন সল্টলেকে। অবিরল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল আমাকে নিয়ে, ও ভালো চেনে না। সল্টলেকে ঠিকানা খোঁজা কত শক্ত তা তো জানোই। বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখি একটা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বাবা। ও-বাড়িতে তো আমি কখনও যাইনি। নিজের বাবাকে দেখে কি কেউ মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারে? বাবা নিজেই আমাকে ডাকলেন। বাবা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ি খুঁজছি। মজার ব্যাপার না? অবিরলের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিতে হল, ভেতরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসতেই হল। বাবার সেকেন্ড ওয়াইফকে আমি কোনওদিন মা বলিনি, কিছুই বলিনি, সে ভদ্রমহিলার সঙ্গেও পরিচয় হল।

—এসব কথা আমাকে কিছুই জানাসনি।

—কখন জানাব? সেদিন তো বাড়িতে ফেরাই হল না। সোজা স্টেশনে চলে এলাম। টেলিফোনে কি সব কথা বলা যায়? তোমাকে না জানিয়ে আমি বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব সাধ করে, একথা তুমি বিশ্বাস করতে পারলে? তুমি আমাকে চেনো না?

—শুনেও তাই বিশ্বাস করতে পারিনি। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও...হ্যাঁ রে, সেদিন কেন বাড়ি ফিরলি না? আমি রান্না করে রেখেছিলাম। কোনও কারণে বিরক্ত হয়েছিলি?

—না, মা, সেদিন ফিরে অনেক সুবিধে হয়েছে। অবিরল ঠিকই বলেছিল। এ-মাসের শেষে তো আবার যাওয়ার কথা ছিলই—

—সেদিন আমার ফ্ল্যাটে একটি ছেলেকে থাকতে দিয়েছিলাম। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তার ফেরার অসুবিধে ছিল। তুই কি ভেবেছিলি, সে মাঝে-মাঝেই আমার ওখানে থাকে?

—এরকম উদ্ভট কথা ভাবতে যাব কেন? তুমিই তো বললে, সেইদিনই সে প্রথম থাকছে।

—ওকে দেখে, ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, তোর অন্য কিছু মনে হয়েছিল কি? তোর বন্ধু কিছু ভেবেছে?

—অবিরল কেন ও নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে? অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, তোমার যদি একজন বন্ধু থাকে, তাতে আপত্তি করবার তো কিছু নেই। মনে করবারই বা কী আছে?

—ওই মুসলমান ছেলেটি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট।

—আঃ মা, মুসলমান না হিন্দু, তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়? হ্যাঁ, এখনও মাথা ঘামায়, যারা বোকা অথবা খুব বদমাশ, মতলববাজ। বন্ধু, বন্ধুই। হিন্দু-মুসলমান যাই হোক। আর বয়েসে ছোট মানে কী? পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরুষরা পঁচিশ-তিরিশ বছরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে না? বিয়ে

তো কতই হচ্ছে ওরকম। বেশি বয়েসের মেয়েরাই বা কম বয়েসের ছেলেদের ভালো বন্ধু থাকলে আমি খুশিই হব।

—ওই ছেলেটি, টনি, ও আমার বন্ধু নয়। আমাকে দিদি বলে। আমার একজন ভক্ত।

—ওরকম ভক্তও থাকা ভালো। তোমাকে সঙ্গ দেবে। এর পরের বার কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করব।

বিশাখা চুপ করে গেলেন।

অনির্বাণ হেসে বলল, সেদিন আমি একটা বোকামি করেছি। ভাবলে আমার এখনও হাসি পায়। টেবিলের ওপর তোমার ব্র্যান্ডির বোতলটা ছিল, সেটা দেখে আমার মনে হল, অবিরল যদি দেখে, যদি ভাবে আমার মা মদ খায়, তাই চুটি-চুপি সরিয়ে দিয়েছি। পরে ভেবে দেখেছি, ওটা লুকোবার কোনও দরকার ছিল না। অবিরলের বাবা প্রত্যেকদিন ড্রিংক করেন। আমরা গেলে আমাদের ড্রিংস অফার করেন। তা আমাদের বাবা শ্রেণির লোকরা যদি রেগুলার ড্রিংক করতে পারে, তাহলে মায়েদেরও কেন সেই অধিকার থাকবে না? আমি জানি, তুমি সেভাবে ড্রিংক করো না, মাতাল হও না, তাতে দোষের কী আছে? লজ্জার কী আছে? এসব ধারণা পালটানো দরকার। অনেক ওষুধেও অ্যালকোহল থাকে, বিধবারা খায়। পরে আমি অবিরলকে সব খুলে বলেছি।

বিশাখা আর কথা বলছেন না। তাঁর বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে। ঘাম জমেছে কপালে।

অনির্বাণ জিগ্যেস করল, মা, তুমি এতটা জার্নি করে এলে, হাত-মুখ ধোবে না? আজ আমাদের ক্লাবে রাত ন'টায় একটা ভালো সিনেমা দেখাবে। চলো, তোমাকে সিনেমায় নিয়ে যাব।

বাথরুমে গিয়ে বিশাখা আবার কেঁদে ফেললেন। ছেলে রাগ করেনি, ছেলে দূরে সরে যায়নি!

অনির্বাণ টনির ব্যাপার নিয়ে বিন্দু-বিসর্গও ভুল বোঝেনি। বরং সে চায় টনির মতন একজন বন্ধু বা ভক্ত থাকুক।

কিন্তু টনিকে বিশ্রী অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন বিশাখা। তার কোনও দোষ ছিল না, তবু সে অপমান সহ্য করে মাথা নিচু করে চলে গেছে। আর সে আসবে না। আর কোনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সে 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গানটি শোনাবার জন্য অনুরোধ জানাবে না।

বিশাখাকে একলাই কাটাতে হবে দিনের-পর-দিন। টনি তাঁর একাকীত্বকে আরও কঠিন, আরও অসহ্য করে দিয়ে গেল।

মায়াকাননের ফুল

লেখকের কথা

এই লেখাটি পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক-পাঠিকাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে। মনে হবে অজস্র ছাপার ভুল। আসলে ইচ্ছে করেই অনেক বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলো একটু একঘেয়ে। অনেক সময় সেগুলো বাদ দিলেও পুরো বাক্যের মানে বোঝা যায়। যেমন আমরা মুখের কথায় অনেক সময়।

লেখক খানিকটা বলে দিচ্ছেন বাকিটা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নেবেন। অর্থাৎ লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করছেন। এইভাবে, একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হতে পারে। তবে, বলাই বাহুল্য, এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোনও দাবি নেই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোনও ধর্নুভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কোথায় যাব? কোনও একটা নতুন জায়গায়।

যেতে হবে ট্রেনে। আগে থেকে টিকিট-ফিকিট কিছুই। ইচ্ছেই তো জাগল বিকেলে। সারা ট্রেনটি মানুষের জমজমাট। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে। কোনও কামরাতেই আর একজনও অতিরিক্ত মানুষের জায়গা হবে না। শুধু ফার্স্টক্লাসের বগিগুলো এখনও কিছু ফাঁকা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকি দেওয়ার অভ্যেস থাকলেও ফার্স্ট ক্লাসে নেই। এরকম ঝুঁকি নিতে সাহস ঠিক।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট। যা হোক কিছু একটা করা।

স্টেশন থেকে কোনও দিন ফিরে যাইনি। শেষ মুহূর্তে না কোনও কামরায় লাফিয়ে উঠেও অন্তত।

শুনেছি, কাকে যেন ঘুষ দিলে থ্রি-টায়ার বা টু-টায়ার কামরায় টিকিট পাওয়া যায় যে-কোনও সময়ে। কিন্তু যাকে সেই ঘুষটা দিতে হবে তাকে খুঁজে বার করব কী উপায়ে? ঘুষখোরদের কি মুখ দেখে চেনা যায়? তা ছাড়া ঘুষ দেওয়ার সঠিক পন্থাটা কী? টাকাটা কি আগে থেকেই বাড়িয়ে দিতে হয়, না ওরা নিজেরাই? ওদের মধ্যে যে একটি মাত্র সৎলোক আছে, যদি আমি ঠিক তার সামনেই পড়ে যাই? যদি সে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, আপনি আমাকে অপমান?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি আমি এ পর্যন্ত কোনও কারুকে ঘুষ দিইনি। কারুকে নিতেও দেখিনি। এমনকী, এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, এরকম একটা বড় শহরে, অথচ আমার চোখের সামনে একটাও মৃত্যু ঘটেনি, দুর্ঘটনাও না। আর সবাই দেখেছে, আমারই দেখা হয়নি। কোনও নিষ্ঠুর রমণীও আমার চোখে পড়েনি। কত কী যে বাকি আছে!

—দাদা, আগুনটা।

পাশ ফিরে দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ফরসা চেহারার লোক, মুখে সিগারেট গোঁজা, হাতটা আমার সিগারেটের দিকে। লোকটির নাক ও চোখে স্পষ্ট মঙ্গোলীয় ছাপ। এমন হতে পারে, তিব্বতরাজ একবার যখন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তখন তার সৈন্যবাহিনীর কারুর সঙ্গে এদের পরিবারের রক্তের সংমিশ্রণ। এরকম হঠাৎ মনে আসে।

ধীরেসুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা। ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত লক্ষ রাখলাম লোকটির দিকে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অন্য কারুর কাছ থেকে আগুন চায়, সে নির্ঘাত কৃপণ। কেননা কাছেই দেশলাই কিনতে। এটাও আমার এক মুহূর্তের চিন্তা। পরে ভুল প্রমাণিত।

দেশলাইটা ফেরত দিতে লোকটি হনহন করে চলে গেল সামনের দিকে। ধুতি-পরা লোকের এত জোরে হাঁটা কি ঠিক?

বাচ্চাদের ঝুমঝুমির যেরকম আওয়াজ, স্টেশনের মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে সেইরকম একটা আওয়াজ সবসময়। তা ছাড়া, একইসঙ্গে এখানে ব্যস্ততা ও মন্থরতা। বেঞ্চগুলোতে যারা জায়গা পেয়েছে তারা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেয়। গরম দেশে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও প্রকাশ্যে ঘুমোতে লজ্জা পায় না। এই সন্ধে বেলাতেও। আমার একটু ভালো লাগে না এসব দেখতে।

জানলাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনও জানলার পাশে যদি কোনও সুন্দরী। যে কোনও একটা কামরায় উঠতেই হবে, তখন মোটামুটি একটু চোখের আরাম যাতে। সেরকম কেউ নেই। হঠাৎ নাকি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের গলার হার টেনে ছিঁড়ে নেয় আজকাল। মেয়েরা তাই ভেতরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আমার খুব কাছেই দুটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ নধর, পাকা হলুদ রঙের। লক্ষ রাখি, কলার খোলা ওরা কোথায়। ছেলেবেলায় বয়স্কাউট ছিলুম তো। কেউ প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তার ওপর ফেললে তার সামনেই তাকে অপমান করার জন্য আমি খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে পা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে।

ছেলে দুটির কলা খাওয়া এখনও শেষ হয়নি, এর আগেই একটা অন্যরকম দৃশ্য। ওদের সামনে দাঁড়ানো একটি ভিখিরি। বেশ বৃদ্ধ ও লম্বা। ওরা প্রথমে তার দিকে নজরই দেয় না। তারপর একসময় বিরক্ত। একজন তার হাতের অতিরিক্ত একটি কলা বৃদ্ধটির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও।

এটা নতুন কিছু নয়। এর পরের টুকু।

ভিখিরিটি যেন কুঁকড়ে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, না, না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনাদের মুখের গ্রাস।

—আরে নাও না, নাও না, বলছি তো।

—আমায় মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে।

ভিখিরিটি দ্রুত সেখান থেকে পা চালিয়ে। আমি সেদিকে একটু চিন্তিতভাবে। অদ্ভুত তো! এই ঘটনাটা দেখে আমার কিছু একটা মনে হওয়া উচিত ছিল। চোখের সামনের যে-কোনও ঘটনা সম্পর্কেই আমরা তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে। এই ভিখিরিটিকে দেখে আমার খুশি হওয়া উচিত না বিরক্ত? ভদ্র ভিখিরি হিসেবে এ অনন্য, কিংবা অন্য ভিখিরিদের চেয়েও অনেক বেশি বোকা?

তারপর হাসি পেল। ভিখিরিও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ

ঘণ্টা বাজল। এবার ট্রেন। আমি সোজা সামনের কামরার দিকেই পা বাড়াচ্ছিলুম, এমন সময় সেই মঙ্গোলিয়ান-মুখ ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে জিগ্যেস করল, আপনি কোথায় যাবেন?

—কেন বলুন তো?

—একটা টিকিট আছে, এক্সট্রা...আমাদের একজন লাস্ট মোমেন্টেও এল না।

—কোথাকার টিকিট?

—ডেহরি অন শোন...আপনি যা দাম দিতে চান, মানে আপনি যদি অতদূরে নাও যান...এখন তো আর ফেরত দেওয়ার সময় নেই...

—আমি ডেহরি অন শোনেই যাব। কত টাকা দিতে হবে।

—আগে উঠে পড়ুন, উঠুন, গাড়ি এক্ষুনি

লোকটি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। দরজার সামনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে সেই ভিখিরিটা। কেউ-কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, আরে বাবা, সরো, সরো—

আমি কোনওক্রমে ভেতরে ঢুকে। আস্ত একটি বাঙ্ক আমার জন্য। টিকিট ও রিজার্ভেশন কার্ড হাতে দিয়ে লোকটি বলল, একেবারে ওপরেরটা। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, কিছু না।

—আপনি ডেহরি অন শোনেই যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

বস্তুত এইখান থেকেই গল্পের শুরু। ডেহরি অন শোনে আমার চেনা কেউ নেই, কোনও দিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবিইনি। একেবারে নিরুদ্দেশে কেউ বেরিয়ে পড়ে না, বিশেষত আমি পরীক্ষাতেও ফেল করোনি, প্রেমেও ব্যর্থ হইনি এখনও। মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম, সমীরের ওখানে যদি...খুব বেশি দূর নয়।

কিন্তু অত্যন্ত ভিড়ের ট্রেনে যদি কেউ আমাকে হঠাৎ একটা টিকিট দেয়, তবে আর সেখানে

না যাওয়ার কোনও যুক্তি আমার নেই। ব্যাপারটাকে আরও যুক্তিযুক্ত করার জন্য আমি কাঁধের ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে, ফের দরজার কাছে এসে সেই লম্বা মতন ভিখিরিটাকে দশ পয়সা। সে যখন নমস্কার করতে আসে, আমি লক্ষ করি, তার ডান হাতে ছ'টা আঙুল।

মঙ্গোলিয়ান-মুখ লোকটির নাম অরবিন্দ ভৌমিক। তার বন্ধুর আসার কথা ছিল, কেন আসতে পারেনি, সেজন্য ঈষৎ দুশ্চিন্তিত মুখে আমায় প্রশ্ন করল, বলতে পারেন, বেলেঘাটার দিকে আজ কোনও গণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

এটা আমি সত্যিই জানি যে সকালবেলা বেলেঘাটার একজন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছে। দুপুরবেলা রেডিওতে।

—আপনার বন্ধুর নাম কী?

—অশেষ মজুমদার, চিনতে পারবেন বোধ হয়, জাস্টিস চন্দ্রভূষণ মজুমদার—যিনি আবার ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে...তাঁর মেজো ছেলে...আমার ফার্স্ট ফ্রেন্ড

একটু থেমে কী যেন চিন্তা করে আবার বলল, অশেষ কোনওদিন কথা দিয়ে ফেইল করে না। যাক গে, আপনাকে কিন্তু ট্রেনে এই নামেই মানে, চেকার যদি আসে—নাম জিগ্যেস করে না অবশ্য, তবু যদি, আপনি তো হলে ওই নামটা—

—কোন নাম?

—আমার বন্ধুর নাম যা বললাম।

এমনও হতে পারে, অশেষ মজুমদারই আজ বেলেঘাটায়। রেডিওতে যেন ওইরকমই একটা নাম। ট্রেনে আমাকে ওই নামেই। কিন্তু অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বয়েসের তফাতের জন্যই—

চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় কেউ বুকের কাছে জামায় হাপর দিয়ে ঘাম শুকোবার। বাইরে আলো অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেই ওপরের বাঙ্কে উঠে বসা চলে না, রাত মাত্র আটটা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে ঘুমের তোড়জোড়।

অরবিন্দ ভৌমিক একা নয়, তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। তিনি উলটোদিকে চক্ষু বুজে। অরবিন্দ ভৌমিক বলল, মা, তুমি একটু এদিকে এসে বসো তো—ওনাকে একটু বসার।

একজন মাসিক পত্রিকা পাঠরত যুবকের পাশে আমি এসে। তারপর পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে। সামান্য খুচরো সাত পয়সার হিসেব মেলানো যায় না। সে বলল, ঠিক আছে।

আমি সেটা মানতে রাজি নই। ভিখিরিটিকে দশ পয়সা না দিলে ঠিকই হিসেব মিলে যেত—একথা অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে। সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, কাল সকালে

—আপনি আচ্ছা লোক তো—মোটে সাতটা পয়সা

সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলেই একটা দেশলাই কেনা যায়। আমি পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই ফের হাত সরিয়ে। ওর মায়ের সামনে

কিন্তু ওর মায়ের সামনে কি আমি সিগারেট খেতে পারি? মনস্থির করতে পারি না। বৃদ্ধা যখন সরু চোখে আমারই হাতের দিকে। আমি ম্যাজিশিয়ানের কায়দায় সিগারেট দেশলাই লুকিয়ে। একটা অস্বস্তি।

আমার পাশের যুবকটি অন্যমনস্কভাবে ফস করে সিগারেট জ্বালিয়েই ধোঁয়া ছাড়ল সোজা সামনে। এর কোনও বাধা নেই। এ তো অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধুর টিকিটে যাচ্ছে না।

এবার কামরাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে। আমাদের কিউবিকলে ছ'জন মানুষের মধ্যে বাকি দুজন : একজন বছর তিরিশেক বয়েসের বউ ও একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ফ্রক

পরা মেয়ে। এদের আমি আগেই দেখেছি, কিন্তু সরাসরি চোখের দিকে তাকাইনি। এখন আমরা সহযাত্রী, এখন কোনও বাধা নেই।

—আপনি ডেহরি অন শোনে কোথায় যাবেন?

এর উত্তর আমি একটু আগেই ভেবে ঠিক করে। আলগাভাবে বললাম, ওখান থেকে আবার ট্রেন বদলাব।

—কোনদিকে? ডাল্টন গঞ্জের দিকে।

যেন ওইসব অঞ্চল আমার কতই চেনা, এই ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ি। তারপর ব্যস্তভাবে বলি, একটু আসছি।

অরবিন্দ ভৌমিক আমার বন্ধু নয়, আমার অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসার তো কোনও প্রয়োজন নেই। তবু যেন কেন আমার একটু কৃতজ্ঞ ভাব। একটা টিকিট দিয়েছে বলে? টিকিটটা ওর নষ্ট হতই। কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের অত ভিড়ের মধ্যে শুধু আমাকেই নির্বাচন।

অকারণেই একবার বাথরুমের দিকে ঘুরে ফিরে। অন্যান্য কিউবিক্‌লের যাত্রীরা এরই মধ্যে বিছানাপত্র গোছাতে ব্যস্ত, মাত্র আটটা বেজে পনেরো কুড়ি। অনেকে খাওয়ারের কৌটো খুলে। চারজন যুবক তাস খেলায়। সমস্ত কামরাটি ঘুরে এসে আমি একটি কালো সিল্কের বোরখা পরা, ইদানীং মুখটুকু খোলা, মুসলমান রমণীকেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আখ্যা দিই। আমাদের জায়গাটা থেকে সে অনেকটা দূরে। ভোরবেলা উঠেই এঁর মুখ দর্শন করতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতেই মনে পড়ল, সারারাত কি এই জন্য আমাকে বারবার উঠে আসতে হবে? সিগারেট ছাড়া তো আমি বেশিক্ষণ। তাছাড়া এত হাওয়ায় সিগারেট ঠিক জমে না।

চাঁদের হালকা ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। অসুন্দর শহরতলিও এখন একটু-একটু রহস্যময়। বিশেষত খাল বা পুকুরের জল যখন অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে ওঠে। জলের প্রতি আমার বড় বেশি টান। অচেনা জল দেখলেই ভালোবাসতে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শৈশব।

মনে হয়, জলের ওপাশে ওই যে প্রান্তর, যেখানে অন্ধকার আরও গাঢ়, সেখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গ হয়তো। তার ওপাশেই স্বর্গ। এসব ছেলেবেলায় কথা। পকেটে সবসময় একটা গুলিসুতোর ডিম থাকত, যদি কখনও সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়—

ফিরে এসে দেখলাম, সকলেই বিছানা পেতে ঠিকঠাক। মাসিক পত্রিকা হাতে যুবকটি বলল, আপনি বসবেন তো বসুন না—

তাহলে ওদের বিছানার ওপরেই বসতে হয়। বিছানাটি বধূটির। ইংরেজ-ভদ্রতার সঙ্গে বলি, না, না, আমি ওপরেই।

একদম নিচের দুটি বাঙ্কে মহিলা ও বৃদ্ধা। মাঝখানের দুটিতে কিশোরী ও মাসিক পত্রিকা। আমার ওপাশে অরবিন্দ ভৌমিক।

চটি খুলে ওপরে আগে রেখে তারপর কসরৎ করে ওঠা। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেই অরবিন্দ ভৌমিক বলল, আপনি বিছানা আনেননি?

আমি আরও কী-কী আনিনি তার একটি তালিকা তক্ষুনি শুনিয়ে দেওয়া উচিত। তার বদলে একটু সাদা-মাটা হাসির সঙ্গে জানালাম, না, দরকার হয় না।

—আমাকে সঙ্গে একটা এক্সট্রা বালিশ আর চাদর আছে

অনেক মানুষই বোঝে না যে অপরের কাছ থেকে কোনওরকম দয়া বা সাহায্য নেওয়া কারুর কারুর পক্ষে কীরকম অস্বস্তিকর। আমি আপন মনে থাকতেই বেশি।

—না। সত্যিই কোনও দরকার নেই।

—আরে নিন না। শুধু-শুধু কষ্ট করবেন কেন?

নিতেই হল। অপরের চাদর ও বালিশে কীরকম যেন অন্য লোক অন্য লোক গন্ধ। যদিও হোটেল কিংবা ডাকবাংলোতে একথা মনে হয় না। ধন্যবাদ বলার বদলে আমার মুখটা আড়ষ্ট হয়ে। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স খালি হয়ে গেছে। সেটা অ্যাশট্রে হিসেবে। এখানে সিগারেট ধরাতে কোনও অসুবিধে নেই। এবার বেশ আরাম বোধ। ট্রেনে শুয়ে-শুয়ে যাওয়া কী সৌভাগ্য! এখানে প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ মাপের শোওয়ার জায়গা। অতিরিক্ত মাত্র সাড়ে চার টাকা। অন্য কামরাগুলোতে বহুলোক দাঁড়িয়ে। অনেকে দু-পায়ের ওপর সমান ভার রাখতেও পারেনি।

কোনও নতুন জায়গায় যাওয়ার আগেই সেই জায়গাটা কল্পনায় দেখে নেওয়া আমার অভ্যেস। ডেহরি-অন-শোন জায়গাটা কেমন? স্টেশনের ওপর দিয়ে অনেক বার গেছি কিন্তু কোনও বারই। এখন কেনই বা আমি যাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, জায়গাটা কীরকম? স্টেশনের পাশেই একটা বিশাল গুলমোহর গাছ। ব্রিজের গা দিয়ে নদীতে নামার জন্য সিমেন্টের সিঁড়ি। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি মারাত্মক রকম ভাঙা। সিঁড়িতে সামান্য রক্তের দাগ। আমি স্পষ্ট দেখতে। শুকনো রক্ত। একদল ছেলে দুপদাপ করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জানতে হবে তো রক্তের ছোপটা কীসের।

কিশোরী মেয়েটি এর মধ্যে ঘুমিয়ে। অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে চোখোচোখি এড়াতে গেলে আমাকে ওরই দিকে তাকাতে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। অরবিন্দ ভৌমিক যাচ্ছে তার মায়ের সঙ্গে, আর এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। কীরকম যেন অদ্ভুত কম্বিনেশন। মাসিক-পত্রিকা-পড়া যুবকটির সঙ্গে বিবাহিতা মহিলা ও কিশোরীটির সম্পর্ক কী? মহিলাটি ও যুবকটি ভাই বোন? এরা এত কম কথা বলে কেন। কিশোরী মেয়েটি, বিশেষত, কী দারুণ গম্ভীর! ট্রেন যাত্রার চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই। এই বয়েসের সকলেই তো। হোক না অচেনা, তবু ঠিকঠাক সম্পর্ক না মিললে মনটা কীরকম যেন অপ্রসন্ন হয়ে।

কি একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তুমুল হইহই। বহুলোক জোর করে কামরায়। শুয়ে-থাকা মানুষগুলো চিৎকার করে উঠল, দরজা, দরজা। কেউ নিজে থেকে উঠছে না। কামরা প্রায় ভরে গেছে বাইরের লোকে। তখন শুয়ে-থাকা মানুষের হুকুম, এই নিকালো, নিকালো, দেখতো নেই হ্যায়, রিজার্ভ কম্পার্ট—

—কে দরজা খুলেছে কে? দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয়নি? অ্যাঁ?

আমি চোরের মতন গুটিশুটি মেরে চুপচাপ। শেষবার আমিই সিগারেট খাওয়ার সময় দরজা খোলা রেখে। কেউ কি টের পেয়েছে যে আমিই?

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাঁচামেচি ও হল্লা। যারা উঠে এসেছে তারা কেউ নামবে না। তাদেরও তো যেতেই। কণ্ডাকটর গার্ড উধাও। বচসা চলতে-চলতেই ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে। তখন আদি যাত্রীরা যে-যার নিজের বাঙ্কে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই একটু বেশি লম্বা হয়ে যায়, যাতে আর একটুও জায়গা না থাকে, আর কেউ সেখানে বসতে।

ফর্সা জামাকাপড় পরা নবাগতরা দাঁড়িয়েই থাকে, তাদের মুখমণ্ডলে অভিমান ও রাগ। অন্যরা মেঝেতেই। আমার ঠিক চোখের নিচেই এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি। এদের কাপড় যদিও অত্যন্ত পরিষ্কার, তবু এরা মেঝেতেই এবং মুখে কোনও অভিমান নেই। দুটি পুঁটলির ওপর ওরা দুজন। ওদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। যেন বিহুলতার সমুদ্র থেকে এই মাত্র স্নান করে এসেছে।

অরবিন্দ ভৌমিক মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ঘুমের দফা গয়া। মালপত্তরের ওপর নজর রাখতে হবে, বুঝলেন! কত চোর ছ্যাঁচোড় আছে এর মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিশোরী মেয়েটি এখন জেগে। সম্পূর্ণ খোলা চোখ, তার ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব। এই

বয়সে হয়। এত হৈচৈ-এর মধ্যেও ও একটিও কথা বলেনি।

মেয়েটির নাম কী?

আমার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই স্বল্পবাক কিশোরীটির একটি নাম না দিলে, এর চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। হলুদ রঙের স্কার্টের বদলে যদি ও শালোয়ার কামিজ পরে থাকত, তা হলে আমি যেমন ওকে অগ্রাহ্য।

বার বার ওর দিকেই আমার চোখ। শুধু ওর রূপের জন্যই নয়। ওর নীরবতা। এই বয়েসের সব মেয়েরই শরীরে একটা হঠাৎ-আসা লাবণ্য বড় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর রূপ তার চেয়েও কিছু বেশি। কিন্তু এই বয়েসটা তো উচ্ছলতারও। ও কেন এত চুপ।

চোখ বুঝে মেয়েটির একটা নাম বসাবার চেষ্টা করছি এমন সময় কান্নার শব্দ। চমকে নিচের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি না। কে? কোন দিকে? তারপর শব্দ অনুসরণ করে। কিশোরী মেয়েটিই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মধ্যের যুবকটি হাত বাড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, রমু, কী হয়েছে?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে দেয়। যুবকটি আবার বলে, এই রমু, কী হয়েছে?

বুঝতে পারি সমস্ত কামরা উৎকর্ণ হয়ে আছে মেয়েটির উত্তর শোনার জন্য। একতলার বধূটিও উঠে দাঁড়িয়ে।

অতি ব্যস্ততায় আমার এক পাটি চটি পড়ে গেল নিচে। সাঁওতাল যুবকটির গায়ের ওপরে।

সাঁওতাল যুবকটি তার সুন্দর বড় চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। তাতে বিস্ময় কিংবা বিরক্তি আছে বোঝা যায় না।

আমি মরমে মরে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বলি, ভাই, কিছু মনে করো না।

চটিটা আমার হাতের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওর গায়েই। ছি-ছি। এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য আমি সেই মুহূর্তে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি নিচে নামবার আগেই সাঁওতাল যুবকটি আমার চটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে আমি আরও বেশি লজ্জিত বোধ। অপরের জুতো হাতে নেওয়া মোটেই সুচারু ব্যাপার নয়। কেন ও আমার জুতো। আমি ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলি, ভাই, কিছু মনে করোনি তো!

এ কথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না। এ সব ভদ্রলোকি ভাষা। যেমন আমি ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছি। কাল সকাল থেকে আমি ওকে আপনি।

ঠিক। অনেক কিছুই কাল থেকে শুরু করব, এইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার বহুদিনের দুর্বলতা।

আমার নিচের বাঙ্কের যুবকটি ওকে একটু ঠ্যালা মেরে বলল, এই, একটু হঠ যাও তো।

তারপর কিশোরী মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, এই রমু, তোর কী হয়েছে? বল না কি হয়েছে?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে এখন নীরব। অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে ভয় বা দুঃখ পেয়ে এরকম কান্না। কিন্তু মেয়েটি তো জেগেই। এক মিনিট আগেই দেখেছি। ওর খোলা চোখ। ওর এখনকার নীরবতাই আরও বেশি কৌতূহল উদ্দীপক।

—রমু, কাঁদছিলি কেন?

মেয়েটি এবার বলল, কিছু না। তারপর সে অন্যদিকে মুখ। এই সময় ট্রেন একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যায়, বিরাট শব্দ। যেন সমস্ত লৌহসভ্যতার তারস্বরে চিৎকার।

—তোর পেট ব্যথা করছে?

—না।

—তাহলে কাঁদছিলি কেন?

—একতলার বাঙ্কের মহিলাটি উঠে এসে শান্ত হুকুমের সুরে বললেন, কী হয়েছে আমাকে বল তো।

—কিছু হয়নি বলছি তো।

—আমার দিকে মুখ ফেরা।

কিশোরী মেয়েটি মুখ ফেরাল। তখনও তার চোখের দু-পাশে অশ্রুরেখা। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। এই চোদ্দো-পনেরো বছরের মেয়েটির কি এমন দুঃখ, যাতে রাত্রে ট্রেনের কামরায় একা-একা সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, এই দুঃখের অতলতা আমি ছুঁতে পারব না। আমি সতর্ক হয়ে রুমাল। অন্য কারুর কান্না দেখলে হঠাৎ আমারও চোখে।

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, যদি পেট-টেট ব্যথা করে...আমার কাছে ওষুধ আছে।

দেখা যাচ্ছে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এর কাছে অনেক কিছুই মজুত। অবশ্য ওর কথায় কেউই ভ্রূক্ষেপ। মহিলাটি মৃদু ধমকের সুরে মেয়েটিকে বললেন, ছিঃ, এরকম কোরো না!

যুবকটি ও মহিলাটি দুজনেই গম্ভীর। খুব একটা ব্যস্ততা বা উদ্বেগের চিহ্ন তো। ভেবেছিলাম ওঁরা মেয়েটির হঠাৎ কেঁদে ওঠার কারণ জানার জন্য। কিন্তু এখন মহিলাটি বললেন, কেঁদে কী হবে? ওরকম ভাবে কাঁদতে নেই!

মেয়েটি হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বলল, ঠিক আছে, তোমরা শোও।

মহিলাটি চলে গেলেন নিজের বিছানায়। যুবকটি তখনও দাঁড়িয়ে। সমস্ত কামরার লোক যে ওদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, এটা জেনে সে একটু বিব্রত। ফস করে একটা সিগারেট জ্বেলে সে বলল, রমু ঘুমিয়ে পড়—

যেন ঘুমটা কারুর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না। তার গাম্ভীর্য ও কান্না, এই দুটি মিলিয়েই এই কিশোরী মেয়েটিকে বেশ খানিকটা উঁচু করে।

অরবিন্দ ভৌমিকের নাক সশব্দে। কামরায় হুড়হুড় করে অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়ায় ও বলেছিল, চোর ছ্যাঁচোড় থাকতে পারে। সারারাত জেগে নজর রাখতে হবে।

কিশোরী মেয়েটি চিত হয়ে শুয়ে। হাত দুটি আড়াআড়ি করে চোখের ওপরে। কান্না লুকোবার জন্য কিংবা আলো আড়াল করার জন্য, কে জানে। আমি ওর পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তন্ন তন্ন করে। পায়ের নখে রক্তকুঙ্কুম। পরিচ্ছন্ন গোড়ালি। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তার সুডৌল পায়ের গোছ দেখে সাহেবরা প্রশংসা করত। হলুদ রঙের স্কার্ট। কোমরে একটা বেল্টের মতন স্ট্র্যাপ থাকায় কোমরটি যথেষ্ট সরু দেখায়। তার বুকের স্বাস্থ্য ভালো। তার গলা দেখলে টিনকাটা মাখনের মতো মনে আসবেই। ধারালো চিবুকে খানিকটা জেদি ভাব। ঠোঁটে যেন লেগে আছে অভিমান। কিংবা ওটা আমার কল্পনা। রমু। ওর পুরো নাম কী? রমা কিংবা রমলা নাম তো ওকে মানায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও এখনও ঘুমোয়নি। কী ওর দুঃখ?

পাশের কিউবিকলে কীসের যেন বাগবিতণ্ডা। উৎকর্ণ হই। নতুন কিছু না, জায়গা দখলের লড়াই। আমাদের এদিকে নিচের দুটি বাঙ্কেই স্ত্রীলোক বলে কেউ জোর করে বসতে আসেনি। অন্য জায়গায় ছাড়বে কেন? এদিকের মেঝেতে সাঁওতাল দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে এখন সবাই মোটামুটি মালপত্রের ওপর একটা না একটা বসার জায়গা।

পুঁটলি থেকে খাওয়ার বার করে সাঁওতাল দম্পতি এখন ডিনার সেরে নিচ্ছে। কয়েকটা লাড্ডু। ইটের মতন শক্ত চেহারা। সেগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে খুব নিম্ন স্বরে কথা। আগে লক্ষ করিনি, মেয়েটি গর্ভবতী। তাই ওর চোখে মুখে এত অলস লাবণ্য। আমি লোভীর মতন ওদের খাওয়া। আমার খিদে পায়নি, শুধু দেখতে ভালো লাগছে এমনি! পরের জন্মে আমি সাঁওতাল হব।

এইরকম গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় মেঝেতে বসে লাড্ডু খাব।

ট্রেনে আমার সহজে ঘুম আসে না। যদি জানলার কাছে বসার জায়গা একটা! অন্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আর একবার কিশোরটির দিকে। কি জানি বোঝা যায় না। নিশ্বাসের স্পন্দনে তার বুক উঠছে নামছে না। কি সুন্দর এই বয়েস, যেন সবেমাত্র ভোর হল। ভোরবেলার মতন একটি কিশোরী পা ফেলে আসছে যৌবনের দিকে। একমাত্র তাকেই মানায়, আমি বললুম সুন্দর, তাই এ পৃথিবী সুন্দর হল উঠল। তবু সে একা আপনমনে কেঁদে ওঠে কেন? আর কিছু না, তার ওই রহস্যটার জন্যই তার খুব কাছাকাছি যেতে।

খুব সাবধানে বাঙ্ক থেকে নিচে। চটি জোড়াটা হাতে। আমি চলে এলাম বাথরুমের দিকে। এখানে মেঝেতে অনেক লোকজন বসে আছে। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে বাথরুমে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার।

একটু বিরক্তভাবে আমি বললাম, অন্য কোনও কামরায় আর জায়গা নেই?

একজন বিদ্রূপের সুরে বলল, তাহলে আর এখানে এসেছি কেন, এখানে কি বেশি মধু আছে? আপনি শোওয়ার জায়গা পেয়েছেন, শুয়ে থাকুন না।

শুধু শুধু এদের কাছে ধমক। কী দরকার ছিল, আমার মাথা ঘামাবার! সত্যিই তো অন্য কামরায় জায়গা থাকলে কেনই বা এখানকার মেঝেতে। আমরা অনেক সময় জেনেশুনেও এরকম অবাস্তব প্রশ্ন।

আমি বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই আর একজন বলল, ভেতরে লোক আছে।

অগত্যা একটা সিগারেট। আমার বিদ্রুপকারীই ফস করে হাতে বাড়িয়ে বলল, একটু আগুনটা।

লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে। এই রকম রোগা লোকরা বেশির ভাগ সময় রেগে থাকে। শারীরিক শক্তির অভাবটা কণ্ঠস্বর দিয়ে।

—কত দূর যাবেন?

—আর দুটো স্টেশন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?

আমি উৎসুকভাবে তাকাই। লিকলিকে ছেলেটি সিগারেটটা গাঁজার কল্কির স্টাইলে ধরেছে আঙুলের ফাঁকে। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। প্রশ্ন করল, আপনি কি রাজবল্লভপাড়ায় থাকেন?

—না তো।

—আপনার দাদা এরিয়ান্স ক্লাবে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলে না?

—না, আপনি ভুল করেছেন।

—কিন্তু আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে।

ছেলেটির দুটি তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে ও অন্য কারুর সঙ্গে। এরকম আমার প্রায়ই হয়। আমার চেহারা এতই সাধারণ যে অনেকেই ভাবে, আগে কোথাও।

তখন মনে পড়ল, আমি অশেষ মজুমদারের টিকিটে। ইচ্ছে হলো এই কৌতূহলী ছেলেটিকে বলি, আমার নাম অশেষ মজুমদার, আমি খুব সম্ভবত আজ সকালেই বেলেঘাটায় নিহত হয়েছি!

এই কৌতুক আমি নিজেই মনে মনে উপভোগ। ঠোঁট-চাপা হাসি নিয়ে আমি ওকে জানাই, আমার কোনও দাদা নেই। রাজবল্লভপাড়ার নাম শুনেছি বটে, কখনও যাইনি। আপনি আমাকে দেখে থাকতে পারেন।

—কোথায় বলুন তো, কোথায় বলুন তো—

—কার্জন পার্কে। ওখানে আমি ম্যাজিক দেখাই।

ছেলেটি সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে। তারপর বলে, ট্রেন লেট করবে মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দরজা এই সময় খোলে।

ফিরে এসে আমি আবার আমার বাঙ্কে। বইটা খুললাম। তারপরেই তাকালাম পাশে। কিশোরী মেয়েটি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটি খোলা। সেখানে নিঃশব্দে অশ্রু। আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করি। কেন একটি মেয়ে একা-একা শুয়ে কাঁদবে? ওর সঙ্গের পুরুষ ও মহিলাটি এখন ঘুমন্ত। আমি ওর অচেনা, আমি তো ওকে কিছু জিগ্যেস করতে। যদি আর একটু ছোট হতো, যদি খুকি বলে সম্বোধন করা যেত। কিন্তু এখন ওর বিপজ্জনক বয়েস, অচেনা লোকের বেশি কৌতূহল কেউ সুনজরে দেখে না।

মেয়েটি পাশ ফিরল। মনে হয় ওর শরীরটা কেঁপে-কেঁপে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টায়। কিংবা এটা আমার দেখার ভুল। কাঁপছে না। কেউ যদি স্নেহময় হাত ওর মাথায় বুলিয়ে এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে।

আমি কতদিন কাঁদিনি? বই পড়তে পড়তে কিংবা সিনেমা দেখার সময় প্রায়ই আমার চোখে জল আসে। সে অন্য। নিজের কোনও দুঃখে? মনে পড়ে না।

বইটা চোখের সামনে মেলা, আমি পড়ছি না। আমার সমস্ত কৌতূহল ওই মেয়েটির দিকে। ও এখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমার ওই রকম বয়সে, সদ্য স্কুল থেকে কলেজে, তখন আমি ম্যাজিসিয়ান হওয়ার স্বপ্ন। ম্যাজিসিয়ান হয়ে দেশ-বিদেশে। পি সি সরকারের বই নিয়ে হিপনটিজম। যাদুসম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী ভোরবেলা ছাদে উঠে দূরের সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টে। ওতে চোখের জোর বাড়ে। শ্রেণিবদ্ধ নারকেল গাছগুলির পাশেই যে বাড়ি তার ছাদে একটি মেয়ে হাতে একখানি বই নিয়ে গোল হয়ে ঘুরত। ভোরবেলা ঘুরে-ঘুরে পড়া মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল তার। এবং আসলে সে-ই জানত ম্যাজিক। অবিলম্বে সে আমাকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে।

এর চার-পাঁচ বছর বাদে নন্দিতা যখন সুশোভনকে বিয়ে করতে চায়, এবং আমাকে জানায়, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি দাতা কর্ণের চেয়ে বড়। আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি, এমনকী আমার প্রেমিকাকেও। একদিন মাত্র আমি কথার ছলে সুশোভনের সামান্য নিন্দে করেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করে। আমি এত নিচে নামতে পারি না। পৃথিবীতে আর যাকেই হোক, সুশোভনকে কোনও দিন নিন্দে করার অধিকার আমার নেই। সে আমার প্রেমিকার স্বামী। সে চিরকালের সম্মান পাবে।

ট্রেন কোন একটা স্টেশনে যেন। অস্পষ্ট শব্দ। ট্রেন কি অনেকক্ষণ থেমে আছে? এখন কত রাত? না, আবার চলছে...

নন্দিতার বিশেষ সাধ ছিল কোনও একদিন আমার সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায়। তারপর যখন ও নিজেই যায় আমি তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়...একদিন একটা সাপ...

তন্দ্রার মতো এসেছিল। মনে হয় যেন এক মুহূর্ত আগে চোখ বুজেছি, আসলে বেশ কিছুক্ষণ। বইটা পাশে ঝুলছে, আর একটু হলেই। বইটা তুলতে গিয়ে চোখ পড়ল। মেয়েটি তার জায়গায় নেই। কোথায় গেল? রাত প্রায় দুটো। আমি ওর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শূন্য বাঙ্কটার দিকে চোখ। সারা কামরা ঘুমন্ত। আমারও আবার ঘুম-ঘুম আসছিল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে না এলে। এটা যেন আমারই দায়িত্ব।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই। এতক্ষণ কী করছে ও? বাথরুমের দরজা বন্ধ? এত রাত্রে ও যেখানে খুশি যেতে পারে। আমি বাধা দেওয়ার কে?

আমি আবার ঘুমোবার। চোখ বুজলেই একটা হালকা লাল রঙের আভা। চোখের ওপরেই আলো। পাশ ফিরলাম। এবারে বেশ মনোমতন অন্ধকার। যেন একটা ঘন জঙ্গল। প্রত্যেকদিন এই জঙ্গলটাকে দেখি। একদিন আমি ওখানে। হঠাৎ মনে হয় কোনও একটা জরুরি জিনিস বোধহয় বাড়িতে ফেলে। কী? টাকা, টুথব্রাশ, একটা ডটপেন, পাজামা, তোয়ালে—আর কী লাগতে পারে?

আগামীকাল কী কারুর সঙ্গে দেখা করার। কিছু যেন একটা ভুল হয়ে। পেছনে, কলকাতায়, ফেলে এসেছি কোনও ভুল। কাল সকালে যদি মনে পড়ে, তখন অন্তত আড়াইশো মাইল।

মাস তিনেক আগে, যখন আসামে গিয়েছিলাম, শিলচর থেকে ডিমাপুর যাওয়ার পথে, কি যেন স্টেশনের নামটা, কি যেন, ওরাং...না, না, ডিভ্রিভ...না, না লালডেঙ্গা...না নাম মনে পড়েছে, হারাংগাজাও, কী চমৎকার নাম, যেন আমার পূর্বজন্মের জন্মস্থান, সেখানে, যেন, সেখানে একজন খুনে ডাকাত, হাতে হাতকড়া, আমাকে বলেছিল, আমাকে, পাশেই দাঁড়ানো দুটি পাহাড়ি তরুণী, তারা...

ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সত্যিই ঘুমিয়ে। এরকম উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে দেখলাম, ওদিকের দ্বিতীয় বাঙ্কটা তখনও ফাঁকা। মেয়েটি গেল কোথায়? এতক্ষণ!

খুব ব্যস্ত হয়ে আমি নেমে। ওর সঙ্গী যুবক ও মহিলাটি নিশ্চিন্ত ঘুমে। আমি প্রথমেই যাচ্ছিলাম বাথরুমের দিকে। তার দরজাটা খোলা। ঢকাস ঢকাস শব্দ হচ্ছে, তবু আমি একবার তার ভেতরে উঁকি।

মেঝেতে অনেক লোক বসেছিল, এখন একজনও নেই। মাঝখানের কোনও স্টেশনে নিশ্চয়ই সবাই। খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, হ্যাণ্ডেল ধরে, বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে।

আমি থমকে একটু দূরে। মেয়েটি যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে চায়, তা হলে আমার আপত্তি করার কি আছে? বিশেষত অচেনা মেয়ে। কিন্তু যে মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে একা একা কাঁদছিল, সে যদি চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজায়। আমি মনস্থির করতে পারি না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়ালে বিপদের স্পর্শ আছে, গুরুজনরা বকে, কিন্তু ওই বয়েসে আমিও।

একটু দূরে আমি বিসদৃশ। অন্য সবাই ঘুমিয়ে, আমি একটি কিশোরী মেয়ের কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি। খুব সহজভাবে যদি ওর সঙ্গে ভাব করা যায়, সেটাই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কখনও সহজ হতে পারি না।

হঠাৎ মনে হল, মেয়েটি বুঝি আরও ঝুঁকছে সামনের দিকে। হ্যান্ডেল ছেড়ে দেবে। আমি দৌড়ে এসে।

এইরকম সময়ে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কম্পন হয়। বাতাস লাফিয়ে ওঠে, তোলপাড় শুরু হয়, যেন এক্ষুনি দম বন্ধ। আমি পৌঁছোবার আগেই যদি মেয়েটি—

দরজা থেকে সে অনেকটা ঝুঁকে ছিল, আমি দ্রুত এসে তার একটা হাত। সে বোধহয় টের পায়নি আমার উপস্থিতি আগে। তবু কোনও চমক ফোটেনি তার চোখে। সে তার নীরব মুখ আমার দিকে।

আমি ব্যস্তভাবে বলি, কী হচ্ছে কী?

মেয়েটি বলল, কী?

—এখানে,...দরজার সামনে...এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—এমনিই...কেন?

হয়তো সবটাই আমার ভুল। অতিরিক্ত কল্পনা। অন্যের জীবনের যে-কোনও ঘটনাই আমি নাটকীয় ভাবে দেখতে। নাটকীয় শব্দটা স্বাভাবিক নয় এই অর্থেই কেন যে আমরা। অথচ কত নাটক জীবনের মতনই স্বাভাবিক।

মেয়েটির বদলে আমিই লজ্জা। আত্মহত্যায় উদ্যত একটি কিশোরীকে হঠাৎ রক্ষা করায় আমার গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আত্মহত্যার কোনও চিন্তাই ওর মনে না এসে থাকে, এমনিই দরজার কাছে।

আমার লজ্জাকে আমি ঈষৎ দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে বলি, এত রাত্রে দরজার

কাছে, এই সময় দরজা খোলা রাখা

—কেন, তাতে কী হয়েছে?

আমি আগেই তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় সে সম্পূর্ণ আমার দিকে ফেরে। তার ভুরুতে একটু রাগের চিহ্ন।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বললাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম।

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হল, রাত দুপুরে কোনও কিশোরীর হাত ধরে এটা ক্ষমা চাইবার ভাষা নয়। এ অন্যরকম ভাষা। এক এক সময়, আমি যে ভালো, এটা প্রমাণ করাই কত যে শক্ত হয়ে ওঠে।

অগৌণে নিজেকে শুধরে নিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, দরজা খোলা দেখে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল, আমার ঘুম আসছিল না, খুব গরম।

—তবু এখানে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—হঠাৎ ঝাঁকুনিতে অনেক সময় বিপদ হয়। আমি তোমার জন্য ভয়...

—আমার জন্য? কীসের ভয়? আপনি কেন আমার জন্য ভয় পাবেন?

—বাঃ, এ রকম অবস্থায় যে-কেউ...সত্যিই তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম, তুমি এতখানি ঝুঁকে...

—আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া আমি মরে গেলেই বা কার কি আসে যায়?

কৈশোরের এই অভিমান কী অপূর্ব সুশ্রী। একমাত্র এই বয়েসটাই পারে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে তোমার বন্ধু করে নেবে? আমাকে তোমার গোপন কথা?

কিন্তু প্রকাশ্যে অচেনা কারুকে এরকমভাবে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি জিগ্যেস করলাম, তোমার নাম কী?

যেন সে নাম জানাতে চায় না, এইরকম মুখের ভঙ্গি। একটু ইতস্তত। তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে, যেন হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, অনুরাধা বসুমল্লিক।

ওর ডাকনাম রমু শুনে আমি ভেবেছিলাম, ওর নাম রমলা বা রমা এই ধরনের। সব সময় এই অনুমান খাটে না। তবে, অনুরাধা নামটিও ওকে মানায়নি। অনুরাধা নামে যে আর দুটি মেয়েকে আমি চিনি, তারা বেশ নরম ও শান্ত। তারা মাঝরাতে একা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াবে না।

—তুমি এবার শুতে যাও।

—যাচ্ছি।

সত্যিই সে যখন ফিরে যেতে লাগল তার বাঙ্কের দিকে, তখন আমি বেপরোয়াভাবে জিগ্যেস করলাম, তোমাকে একটা কথা...তুমি কাঁদছিলে কেন!

মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়াল। সোজাসুজি তাকাল আমার মুখের দিকে। অচঞ্চল দীপশিখার মতো সেই বালিকা তেজের সঙ্গে বলল, আমি বলব না। কেন সবাই জানতে চায়?

আমি আমার প্রাপ্য পেয়েছি। অন্যান্য কৌতূহলের জন্য। মেয়েটির চেয়ে বয়সে অনেক বড় হয়েও আমি অপরাধীর মতন নত-মস্তকে।

সে তবু দাঁড়িয়েই রইল। যেন আমাকে আরও শাস্তি। হ্যাঁ, আরও শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি একজনের পবিত্র গোপনকে উচ্ছিষ্ট করতে। অন্য কেউ যদি এরকমভাবে আমার। অবশ্য কান্না অনেক প্রশ্ন আনে। আনবেই।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে, যেন আমার ওপর দয়া করেই বলল, আমার খুব চেনা একজন পরশুদিন মারা গেছে।

আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী .বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা-একা তা বেশিক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টের। আমি চুপ করে।

—আজ তাকে পোড়াবার কথা। হয়তো এতক্ষণে—

তক্ষুনি সব ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দুটি মাত্র কারণেই শুধু, মৃত্যুর দুদিন পরে কারুকে পোড়াবার ব্যবস্থা হয়। আত্মহত্যা অথবা খুন। এ ক্ষেত্রে যে কোনটা, তাও বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরে দুঃখের সঙ্গে ক্রোধ মিশে থাকার জন্য। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। মেয়েটিকে ওর আত্মীয়-স্বজন জোর করে দূরে কোথাও। এই জন্যই সকলে এত গম্ভীর।

আমি বললাম, কে মেরেছে? পুলিশ।

—হ্যাঁ।

—ওর নাম কী?

—ওর নাম...না, বলব না, আপনি কে? কেন এইসব কথা জানতে চাইছেন? আপনার কি আসে যায়?

ডিটেকটিভ, স্কুলমাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই মানুষের চরিত্র সবচেয়ে ভালো বোঝে, কে যেন বলেছিলেন এই কথা? স্কুলমাস্টাররা বছরের-পর-বছর এত শিশুকে বড় হয়ে উঠতে দেখে যে মানুষের মোটামুটি সবক'টা টাইপ তার জানা। ডিটেকটিভ আর লেখকরা বেশি উঁকি দেয় মানুষের গোপন জীবনে। বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে যে তফাত তা তাদের চোখে অনেকটা।

ট্রেনের গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছিল, এই সময় একটা আলো ঝলমল প্ল্যাটফর্মে। অনুরাধা আর কোনও কথা না বলে ফিরে গেল বাঙ্কের দিকে। আমি দরজার কাছেই একটুক্ষণ।

স্টেশনটা প্রায় জনহীন। সবক'টা আলো জ্বলছে, এর মধ্যে সব কিছুই ঘুমন্ত। আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। দূরের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টে কেউ উঠছে বা নামছে। অনেক মালপত্র। যে দিকে তাকাও, মনে হবে জীবন কত স্বাভাবিক। মধ্যরাত্রির ট্রেন কোনও অখ্যাত স্টেশনে থামলে এরকমই দৃশ্য, প্ল্যাটফর্মে মানুষ ঘুমোয়, একটা কুকুর অনর্থক ছুটে যায়, ফু-র-র-র করে বেজে উঠল গার্ডের হুইস্‌ল্—সবই ঠিকঠাক। আর এই সময় কলকাতায় শ্মশানে একজন কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে অসময়ে, যে চেয়েছিল কিছু বদলাতে, আর অনেক দূরে, ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি মেয়ের হঠাৎ-হঠাৎ কান্না—কান্না তাকে বিশুদ্ধ করবে, না জীবনটাই বদলে দেবে এমন এক দিকে।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আমি দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ। সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে নিই। কেউ জাগেনি। সাঁওতাল বধূটির মাথা হেলে পড়েছে তার স্বামীর কাঁধে। স্বামীটির মুখ ঘুমের মধ্যেও বেশ দায়িত্ববান।

মেয়েটি শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ। আমি তার বাঙ্কের কাছে দাঁড়ালাম। খুব কাছে। যেন আমি একবার তার কপালে হাত। যদি সে মুখ ফেরাত, আমি তাকে আরও দু-একটি কথা। এরকমভাবে দাঁড়ানো মোটেই। অন্য কেউ দেখলে। কিন্তু অনুরাধা আমার উপস্থিতি টের পেলেও মুখ ফেরাচ্ছে না। আমি অগত্যা নিজের বাঙ্কে বেশ সশব্দেই। তবু ওর মুখ অন্যদিকে। ওর সঙ্গে আমার খুব চেনা হয়ে গেল আজ থেকে।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকালের আলো এসেছে জানলা দিয়ে। খুব গাঢ় আলো নয়, শহরে নিজের বাড়িতে শুয়ে থেকে এরকম সকাল আমি চোখে দেখি না।

অনুরাধা ও তার সঙ্গী দুজন বিছানা গুটিয়ে পরিষ্কার। পরবর্তী স্টেশনের জন্য প্রস্তুত। আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, আমিও ওদের সঙ্গে। মেয়েটির সম্পূর্ণ গোপনীয়তা হরণ করার জন্য আমার ভেতরে একটা দুর্দমনীয় চোরের মতন। কেনই বা নামব না। আমি তো যেখানে খুশি।

কিন্তু মেয়েটি যদি ভাবে আমি ওকে অনুসরণ করে। ভাবে ভাবুক। অন্যের সামান্য একটু ভাবনার জন্য আমি কি নিজের। এক কামরার লোক অনেক সময় কি একই স্টেশনে নামে না? তবে, মুশকিল হচ্ছে এই, আমি কাল অরবিন্দ ভৌমিককে বলেছিলাম ডেহরি-অন-শোনেই—। ওরাও শুনেছে নিশ্চয়ই।

অনুরাধা এখন নিচের বাঙ্কে বধূটির পাশে বসে আছে, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সম্ভবনা নেই। দিনের আলোতে বুঝতে পারি, সঙ্গের যুবক ও বধূটির মুখও খুব বিমর্ষ।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসে, তবু আমি মন স্থির করতে না পেরে। অরবিন্দ ভৌমিকও জেগে উঠে মিটিমিটি তাকাল আমার দিকে। আমি এই স্টেশনে নামতে গেলেই নির্ঘাত চেঁচিয়ে নানারকম প্রশ্ন। কেন যে কিছু না ভেবেচিন্তে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

গাড়ি একেবারে থামবার আগেই ওরা দরজার কাছে গিয়ে। থামল, দরজা খুলল, আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওরাও প্ল্যাটফর্মে। ওদের আর আমি দেখতে পেলাম না। এই স্টেশনে বেশ চ্যাঁচামেচি। আমি ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে।

অরবিন্দ ভৌমিক অবধারিতভাবে প্রশ্ন করল, কোথায় যাচ্ছেন?

—চা খেতে!

নিচে নেমে এসে ওদের আর কোথাও কোনওদিকেই। ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। এখনও আমি ইচ্ছে করলে হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে এসে। ভিতরের দোলাচল কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। যাক স্টেশনের নামটা জানা রইল, দু-একদিনের মধ্যেই আমি আবার।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে একটু শান্তি এলো। বেশ ভালো চা। টাকা ভাঙিয়ে পরপর দু-ভাঁড়। তারপর কী মনে হল, আরও এক ভাঁড় হাতে নিয়ে উঠে এলাম কামরায়, সেটা অরবিন্দ ভৌমিকের মুখের সামনে

অরবিন্দ ভৌমিক বলল, একি, আপনি আবার কষ্ট করে আমার জন্য

—আপনার মায়ের জন্য আনবো কি?

—না, না, উনি বাইরে কিছু খান না

আমি আবার নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনে জল ভরছে। দেরি হবে। একটু পায়চারি করার জন্য পা বাড়াতেই। আমাদের কামরাতেই অন্য একটি জানলার পাশে সেই মুসলমান রমণী। কালো সিল্কের বোরখাটা এখন মুখ থেকে নামানো। আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা। কী অসম্ভব রূপ। ভোরবেলায় ফোটা শিশির-ধোওয়ায় কোনও সাদা ফুলের সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। কারণ, ফুলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি সুন্দর হতে পারে, তা আমি কয়েকবার। মুখখানা দেখলেই মনে হয়, অন্তত এক যুগ এঁর কোনও অসুখ হয়নি।

নারীটিকে কয়েক পলক দেখে আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে। আমার একটু একটু মনখারাপ। তখন বুঝতে পারি, কোনও-কোনও সুন্দর জিনিস দেখলে কষ্ট হয়, কবিরা কেন একথা। এ এক অনির্বচনীয় কষ্ট, শিলিগুড়ি শহর থেকে জীবনে প্রথম তুষারমৌলি দেখে আমার অনেকটা এরকম। পর্বতশৃঙ্গ কিংবা সমুদ্রের চেয়েও যে নারীর রূপ তুলনার অধিক পাওয়া যায়, কাপুরুষরা একথা স্বীকার করতে পারে না। আমার ইচ্ছে হয় প্রণাম জানাতে। আমি এই সুন্দরের অংশভাগ।

পরক্ষণেই মনে মনে একটু অনুতাপ বোধ। আমার মন এত বিক্ষিপ্ত! একটু আগেই আমি একটি কিশোরীর দুঃখের জন্য, আর এখন আমি আবার নির্লজ্জভাবে অপর নারীর রূপ। অনুতাপ থেকে ক্রোধ জন্মায়। অনুরাধার কান্নার জন্য সমস্ত পৃথিবী দায়ী। এর শোধ তুলতে হবে। অনুরাধা, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার আমার।

এই স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন। এখনও ইচ্ছে করলে ব্যাগ নামিয়ে এনে। ছোট শহরে হয়তো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু ওর দুঃখের শোধ তোলার জন্য কি করতে পারি। শুধু লুকোবার

জন্য আমি দশদিককে অন্ধ হতে বলি।

পুনরায় আমি গতি মেলাই ট্রেনের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে। ডেহরি-অন-শোন-এ এসে আমি বিনা আড়ম্বরে বিদায় নিই অরবিন্দ ভৌমিকের কাছ থেকে। তার সব রকম সাহায্যের আহ্বান আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। আমার প্রথম কাজ নদীর ঘাটে। স্বপ্নটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে।

সিঁড়ি একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি কোনও রক্তের দাগ খুঁজে তো। অথচ, তন্দ্রার মধ্যে কেন দেখেছিলাম দু-তিনটি সিঁড়িতে লেগে আছে পুরোনো রক্তের ছোপ। কী এর মানে? দু-তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও। হয়তো অন্য কোনও রক্ত, আমার স্বপ্নের মধ্যে—স্বপ্ন অনেকরকম কোলাজ্ সৃষ্টি করে।

বিশাল সেতু, সেই তুলনায় নদীটি এখন একটু ছোট। আমি একেবারে ধারে নেমে গিয়ে নদীর জলেই চোখ মুখ। এমনভাবে কোনওদিন প্রক্ষালন করিনি। বেশ ঠান্ডা জল। স্নানটাও সেরে নিলে। জামা, প্যান্ট খুলে ফেললাম, কেউ তো দেখবার নেই, ব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বার করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একেবারে বেশি জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। আরে বেশ স্রোতের টান আছে তো। দু-একবার হাত ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই জড়তা কাটে। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, প্রমাণিত হল এবার। ব্যাপারটা পুরো ঠিক নয় যদিও! চাইবাসায় একটা সাইকেল পেয়ে, বছর দশেক অনভ্যাসের পরও অতি উৎসাহে চড়তে গিয়ে আমি প্রথমবার এক আছাড়।

কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি আমার ব্যাগ ও জামা কাপড়ের কাছে একটি ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে। ছেলেটিকে তো একটু আগেও দেখিনি, যেন অন্তরীক্ষ থেকে হঠাৎ টুপ করে। বেশ চতুর চোখ মুখ। ছোঁড়াটা যদি আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিঠটান দেয়, আমি কি সাঁতরে পাড়ে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরতে? আমি জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় ভেজা গায়ে একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ছুটছি, এই দৃশ্য।

ছেলেটির দিকে চোখ রেখে আমি চিত ও ডুবে নানারকম সাঁতারের কসরত দেখাই। তারপর পাড়ের দিকে। সিঁড়িতে এসে বসার পর বেশ অবসন্ন লাগে। সাঁতারে দুরন্ত ব্যায়াম। অনেকদিনের অনভ্যাস। যদিও আবার ইচ্ছে হয় জলে নামতে।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে-মুছতে আমি জিগ্যেস করি, এই, তোর নাম কী?

সে আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। বাচ্চা ছেলেদের একটা ব্যাপার আছে, তারা কখন কোন কথায় উত্তর দেবে-না-দেবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর।

পরে মনে হল, এটা বাংলায় প্রশ্ন করার জায়গা নয়। সুতরাং।

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা।

—ছোটেলাল।

—ঘর কাঁহা হ্যায়?

—নেহি হ্যায়।

—কেয়া, ঘর নেহি হ্যায়?

—নেহি হ্যায়।

অবাক হতে গিয়েও সামলে নিই। দেশের পঞ্চাশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই যে ঘর থাকে না, এ নতুন কথা? ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। ঠিকই ধরেছিলাম, ছেলেটা আমার ব্যাগটা চুরি করে পালাতেও।

—কাঁহা রয়তা হ্যায়?

ছেলেটি রেলস্টেশনের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, উধার। বুঝলাম রেলস্টেশনের পরগাছা। প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশনেই কিছু কুকুর ও কিছু বেওয়ারিশ বাচ্চা থাকে।

জামা-প্যান্ট পরে নিতে নিতেই বেশ খিদে চনচন করে। স্নান করলেই তৎক্ষণাৎ আমার

এরকম খিদে। দিনের যে-কোনও সময়েই হোক।

ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, চিরুনি আনতে ভুলে। বাঁ-হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে-চালাতে জিগ্যেস করি, আচ্ছা ছোটেলালজি, হিয়াঁ খানা মিলতা হ্যায়?

—হাঁ, মিলতা।

—কাঁহা?

—বহুৎসা হোটাল হ্যায়।

আমার এই প্রশ্নগুলি অবান্তর। যে ছেলেটা নিজে রোজ খেতে পায় কিনা সন্দেহ, সেও হোটেলের খোঁজ রাখে। এবং আমি তাকে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে জিগ্যেস করি, হিয়াঁ পর কিঁউ আয়া?

সে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করে না। আমি তবু হিন্দি বলার উৎসাহে আবার বলি, তুমহারা পিতা মাতা কোই হ্যায়?

আমার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার ইজেরটা খুলে ফেলে। কোমরে একটা ঘুনসি বাঁধা। তরতর করে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং জলের পোকার মতন সাঁতার কাটে। সে যে আমার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতার জানে, এটা দেখানোই যেন তার। এক একবার ভুস করে মাথা তুলছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথম নজরে দেখেই বুঝেছিলাম, অতি পাজি ছেলে।

ওকে জব্দ করার একমাত্র উপায়, ওর দিকে নজর না-দেওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপরের দিকে। ছেলেটা চেঁচিয়ে কী যেন বলে। আমি শুনতে চাই না। ও যদি গালাগালও করে আমাকে, বিনা কারণেই, আমার সাধ্য নেই, ওকে শাস্তি দেওয়ার! হঠাৎ আমার সামনেই কী রকম অবলীলাক্রমে ইজেরটা!

হোটেল খুঁজে দু-খানা চাপাটি আর এক প্লেট পাঁঠার মাংস নিয়ে। মাংসটা এমনই ঝাল আর মুখরোচক যে আর এক প্লেট না নিয়ে পারি না। সঙ্গে লেবুর আচার। জীবনে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কী? ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে-করতে বেরিয়ে আসি বাইরে। সেখান থেকেই দেখা যায় ছেলেটা এখনও জলে দাপাদাপি। ওকে বকবার কেউ নেই। এত কম বয়েসের এমন স্বাধীন ছেলে আগে দেখিনি কখনও।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কয়েকটা নৈরাশ্যজনক খবর। শোন্ নদীর ধারে অপূর্ব সুন্দর ডাকবাংলোটিতে থাকবার জায়গা নেই। হোটেলগুলির চেহারা সুবিধের নয়, তা ছাড়া হোটেলে থেকে বিলাসিতা করার মতন পয়সা।

ফিরে এসে রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে। যে-কোনও দিকের ট্রেন এলেই। কুলির কাছ থেকে জানা গেল, ডাল্টনগঞ্জের দিকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে। ডাল্টনগঞ্জই বা খারাপ কি? ওখানে পরিতোষ থাকে না? ঠিকানা জানি না অবশ্য, তবে স্থানীয় বাঙালিদের কাছে।

ডাল্টনগঞ্জের মতো যোগারূঢ় নামের জায়গাগুলি চাক্ষুষ দেখার আগে কিছু বিস্ময় রেখে দেয়। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইওরোপের একটু টুকরো। সার-সার ঢালু ছাদওয়ালা বাংলো।

পৌঁছে দেখলাম, সেসব কিছুই না। ধুলোয় ভরা রাস্তা, কুদৃশ্য বাড়ি, বিহারের সমতলভূমির যে-কোনও এলেবেলে শহরের মতন। এইসব শহরের চেয়ে শহরতলি অনেক সুন্দর হয়, যেখানে ভূমি স্পর্শ করে দিগন্ত, একটা অচেনা নামের ছোট নদী, মকাই খেতের পাশে মোষের পিঠে বালক, তন্বী রমণীর মাথায় সোনার মতন উজ্জ্বল পেতলের কলসি।

শহরের মধ্যে টায়ার সারাবার দোকান আর কচৌরি মিঠাই, ডাক্তারখানার শো-কেসে মদের

বোতল। একটি ছোট রেডিওর দোকানের মালিককে বাঙালি বলে চিনতে পারা যায়। তিনিও চেনেন পরিতোষকে। পরিতোষের স্ত্রী পুজোর সময় ষোড়শী নাটকে নাম ভূমিকায়। রেডিও দোকানের মালিকই একটা সাইকেল রিকশাকে ডেকে।

স্থানীয় জেলখানা পেরিয়ে এসে সাইকেল রিকশা একটা বাড়ির সামনে। সদর দরজায় মস্ত বড় তালা। পাশের বাড়ির অপর সরকারি অফিসার, মাদ্রাজি, জানালেন, পরিতোষ দু-দিন আগে সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রীকেও সঙ্গে।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, একটা কোনও থাকার জায়গা না পেলে।

মাদ্রাজি ভদ্রলোক সরু চোখে আমার আপাদমস্তক। উনি লুঙ্গির ওপর হাওয়াই শার্ট পরে আছেন, মাথার চুল অবিকল শিশুদের মতন পাশ থেকে সিঁথি কাটা। অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার সহ্য হয় না। আমি মাটি থেকে আমার ঝোলাটা। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু ন-ড-এ মেশানো ইংরেজি শোনার জন্য।

—আর ইউ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়'জ ইয়াংগার ব্রাদার?

অপ্রত্যাশিতরকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যানার্জি না বলে বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আগেও লক্ষ করেছি, উচ্চশিক্ষিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয়রাই সবচেয়ে কম সাহেবিয়ানা অভ্যেস করে।

না, আমি পরিতোষের ছোট ভাই নই। গত রাত্রে আমি ট্রেনে অশেষ মজুমদার। আজ আবার অন্য পরিচয়, ক্ষণতরে লোভ হয়, তবু কোনওক্রমে নিজেকে সংবরণ।

—না, কেন বলুন তো?

—মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাইয়ের বেড়াতে আসার কথা ছিল। তাই আমাদের কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন।

—আমি পরিতোষের বন্ধু। এবং আমার আসার কোনও কথা ছিল না।

—বন্ধু? মানে উনি কি জানেন, আপনি হঠাৎ এসে পড়তে পারেন?

অধিকাংশ মানুষেরই কোনও পরিচয়পত্র থাকে না। উনি যদি জেরা করেন, আমি পরিতোষের কতদিনের বন্ধু, কতখানি ঘনিষ্ঠতা, কী ভাবে তার প্রমাণ? হঠাৎ এসেছি খবর না দিয়ে, পরিতোষ গেছে সফরে, সরকারি অফিসাররা তো এরকম প্রায়ই। উনি আমাকে ঘরের চাবিটা দেবেন কিনা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আজকাল কতরকম তঞ্চক-বঞ্চক।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মতন একটা। আমি সঙ্গে-সঙ্গে বললাম, পরিতোষ কখনও কফিতে চিনি খায় না।

মাদ্রাজি ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। ঠিক বুঝতে। উনি হয়তো আমাকে জেরা করতে (চেয়েছিলেন কিংবা চাননি)।

তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর থেকে চাবি এনে। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে তালা। আলোর সুইচ। তারপর আমার দিকে ফিরেই বললেন, আপনার বন্ধু দু-দিন বাদেই ফিরবেন।

আমার রাত্রে থাকার একটা জায়গার দরকার ছিল। আমি ওঁকে তিনবার ধন্যবাদ।

উনি চলে যেতেই আমি দরজা ভেজিয়ে সোজা ঝপাং করে পরিতোষের বিছানায়। নিভাঁজ চাদরপাতা এরকম বিছানা দেখলেই আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, ইট মাস্ট বি ওয়ান্ডারফুল টু বি অ্যালাইভ। কেন একথাটা আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি নিজেও জানি না। অনেক সময় একা একাও ইংরেজিতে। অকস্মাৎ পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে একটা বন্য নদীর মতন খাসা দৃশ্য দেখেও আমরা বলি, বিউটিফুল। বেশ জোর দিয়ে।

একটু পরেই দরজায় শব্দ ও সামান্য ফাঁক হল। সেই ভদ্রলোক। একটু আগেই আমি ওর

নাম শুনেছি এবং ইতিমধ্যেই ভুলে। শেষটা যেন মনে হয়েছিল নেডুচেনঝিয়ান! এরকম কোনও নাম হয়? কিংবা ভুল শুনেছি। প্রথম নামটা কী যে? খুব অন্যায় নাম ভুলে যাওয়া।

ভদ্রলোক আমাকে রাত্রে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন ওঁদের বাড়িতে। আমি ভয়ে শিউরে। ভয়টা আসলে অভদ্রতার। ভদ্রলোক সত্যি অতি ভদ্র, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা যায়। কী করে এঁকে প্রত্যাখ্যান।

দক্ষিণ ভারতীয়দের আর সবকিছুই আমি ভালোবাসি, সঙ্গীত পর্যন্ত কিন্তু ওদের রান্না খাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর। আগাগোড়া নিরামিষ খাদ্য আমার দু-চক্ষের বিষ। পৃথিবীর সমস্ত নিরামিষ জিনিসের মধ্যে আমি একমাত্র পছন্দ করি বিধবা নারীদের।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন? তাতে কি। আর একবার খাবেন, আমাদের সঙ্গে। ভেরি লাইট ফুড। আমার ওয়াইফ বললেন—না, সত্যিই আজ আর কিছু খেতে পারব না। একদম পেট ভরা

—তা হলে আসুন, এক কাপ কফি খাবেন অন্তত।

এরপর আর না বলা যায় না। ওরা ভাবছেন, আমি একলা-একলা ঘরের মধ্যে, সেই জন্যই কিছু অন্তত ভদ্রতা না করলে। সহকর্মী বন্ধু খানিকটা সৌজন্য তার প্রাপ্য।

উনি জিগ্যেস করলেন, আমি যাদ স্নান করতে চাই, গরম জল লাগবে কিনা। তা হলে ওর বাড়ি থেকে।

—না, না, না।

—খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করা যায়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওয়াস করে তার পর আসুন। ডোন্‌ট হেজিটেট টু আস্‌ক ফর এনিথিং—

অনেকের অভ্যেস আছে সন্ধের পর স্নানের।

বিশেষ করে ট্রেন জার্নির পর। আমি অনেকটা গাঁজাখোরের মতন বেশি স্নান-টান এড়িয়ে। দিনে একবারই যথেষ্ট। বিশেষত কাজ সকালেই শোন্ নদীতে সাঁতার কেটে।

এক হাঁড়ি গরম জলে ঠান্ডা জল মিশিয়ে আমি কোনওক্রমে মুখে হাতে। ঘড়ি। বাকি জলটা গড়িয়ে ফেলে দিলাম। তারপরও পাঁচ-সাত মিনিট বাথরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে, স্নান করতে যতটা সময়।

এইসবগুলো সত্যিই মজার ব্যাপার। কেউ কি সত্যি দেখছে আমি বাথরুমের মধ্যে স্নান করছি কি না? তবু আমি স্নানের অভিনয়। অকারণেই পরিতোষের আফটার শেভ লোশন থেকে খানিকটা গালে। বাথরুমে পরিতোষের স্ত্রী শ্রীলেখার ব্যবহার্য কোনও জিনিসই নেই। মেয়েলি গন্ধও না। সিনেমা হলে গিয়ে কতবার আমার মেয়েদের বাথরুমটার ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে।

উনি বাইরের দরজার কাছেই। জিগ্যেস করলেন, ফিলিং ফ্রেশ? আমি অমায়িক হাস্যে উত্তর।

পাশাপাশি দুটি ছোট একতলা হুবহু এইরকম। কিন্তু পরিতোষের তুলনায় মিঃ নেডুচেনঝিয়ানের (?) বাড়ি কত ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝে তেল চকচকে। মঙ্গোলিয়ান ও আর্যদের তুলনায় দ্রাবিড়দের পরিচ্ছন্নতাবোধ অনেক বেশি। এ ছাড়াও অবাক হওয়ার মতন একটা জিনিস।

কফি প্রস্তুত। বসবার ঘরে নিচু খাটের ওপর নকশা-কাটা মাদুর। তার ওপর ছোট্ট-ছোট্ট লাল মখমলের তাকিয়া। পাশে একটি টেবিল। কিন্তু সবচেয়ে যা দেখে আমি প্রথমে খুব অবাক, তা হল দোলনায় বসা একটি নারী। ঘরের ঠিক মাঝখানেই ঝুলছে দুটি দোলনা। বসবার ঘরে এরকম দোলনা আমরা আশা করি না। বাচ্চাদের জন্য নয়, রীতিমতন বড়দের। পরে মনে পড়ল, মহারাষ্ট্রের কোনও-কোনও বাড়িতে এমন দেখেছি। চেয়ার টেবিলের চেয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ নয়।

দোলনায় বসেছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ঘাগরা ধরনের লাল শাড়ি, গাঢ় নীল ফুল-কাটা পাড়। কাঞ্জিভরম শাড়ির নাম বিজ্ঞাপনে দেখেছি, এইটাই? মহিলার গায়ের রং তেঁতুল বিচির মতন বেগুনি-

কালো, সেই রকমই মসৃণ। অত্যন্ত সুশ্রী মুখখানি আরও লাবণ্যময়ী হয়েছে একটি নাকছাবিতে। কতদিন পর একজন নাকছাবি পরা নারীর সঙ্গে কথা বলব সামনা-সামনি।

আমি বললাম নমস্কার।

দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বসুন!

পরিষ্কার বাংলা। মেয়েরা অনেক চটপট ভাষা শিখতে। ভদ্রলোক বাংলা একেবারেই। ইস্, এঁর নাম নেডুচেনঝিয়ান কিংবা ওই টাইপের কিছু না হয়ে নাইডু বা রামস্বামী জাতীয় সহজ কিছু হতে পারত না? কিংবা কোনও ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামে, তা হলে মনে রাখা।

মহিলাটির নাম, স্বামী বললেন পদ্‌মা, উনি নিজে বললেন, পদ্মা। কোথায় পদ্মা নদী, এখন বিদেশে, আর কোথায় দক্ষিণ ভারতে সেই নাম। অবশ্য বাংলাদেশেও তো কাবেরী নামে। নদীর নামে নামের মেয়েরা স্বভাবতই একটু উচ্ছল। এই নারীটির সারা শরীরে বাজনা।

পদ্মার স্বামী আর আমি দোলনায় বসলাম। টেবিলের ওপর কফি পট আর বিয়ার মগের মতন বড়-বড় কফির কাপ। কিছু চানাচুর ও সেমুই ভাজা। যা ভেবেছিলাম তাই, সারা বাড়িতে নিরামিষ গন্ধ। নিরামিষ খেয়েও এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কী করে? নিরামিষ খেয়েও নারীরা রূপসি হয়। আর্যরা ছিল প্রায় সর্বভুক এবং অতি মাংসাশী, অথচ ভারতের বেশিরভাগ মানুষই নিরামিষাশী। আসলে সাহেব ও আরবরাই খাঁটি আর্য।

আমরা যেমন বেশির ভাগ সময় চা, এরা তেমনি কফি। কারণ খুব সাধারণ। যে কারণে উত্তর ভারতে বেশি অ্যামবাসেডর গাড়ি, দক্ষিণ ভারতে ফিয়াট। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা বেশি মাছ খেলেও এরা।

দোলনায় দুলতে-দুলতে কফি। এবার কলকাতায় ফিরেই বসবার ঘরে একটা দোলনা। বেশ জোরে-জোরে দুলতে লাগলাম, কফি উছলে পড়ছে না। খাটের ওপর বসে আছেন পদ্মা, হাতে চানাচুরের প্লেট। আমি দুলে সেখানে গিয়ে খপ করে এক মুঠো চানাচুর তুলেই আবার। সঙ্গে-সঙ্গে খিলখিল হাসি। ইস, এখানে না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

পদ্মা জিগ্যেস করলেন, আপনি এখানে কোনও কাজে এসেছেন?

—না, এমনিই। বেড়াতে।

—বেড়াতে? এখানে বেড়াতে?

পদ্মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে আবার হাসির কী আছে রে বাবা!

স্বামীটি বললেন, এখানে কেউ বেড়াতে আসে? কী আছে দেখবার? তবু যদি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যেতেন; কিংবা যদি রিজার্ভ ফরেস্ট যেতে চান—

—কেন, জায়গাটা খারাপ?

পদ্মাই আবার বললেন, খুব বাজে। খুব বাজে। আমার বিচ্ছিরি লাগে।

অবাঙালি নারীর মুখে বাংলা বেশ মিষ্টি। বিচ্ছিরি শব্দটাও সুন্দর।

আমি হেসে বললাম, কেন এখানে তো কোয়েল নদী আছে।

পদ্মা তাঁর ঠোঁট ওলটালেন অবজ্ঞায়। এই ভঙ্গিটি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু আমি বেশি বেশি না দেখে। জানি না, ব্যবহারে কোথায় কি ভুল হয়ে। নিজেদের জন্মস্থান থেকে এত দূরে, মাতৃভাষায় কথা বলার একটিও লোক নেই, বিহারে এই ক্ষুদ্র শহরে নেই কোনও উত্তেজনা, ওদের ভালো না লাগবারই তো। পছন্দ মতন খাদ্যও কি। এখানে কি ক্যাপসিকাম পাওয়া যায়? শুধু কোয়েল নদী দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

স্বামীটি, এর নাম আমি রাখলাম স্বামীনাথন, বললেন—সন্ধের পর এখানে কিছুই করার নেই। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলে তবু একটু আড্ডা হয়। কিন্তু ওঁরা প্রায়ই বাইরে বাইরে।

পদ্মা বললেন, অন্য সময়ে আমরা কী করি জানেন, দুজনে মিলে তাস খেলি।

সত্যিই এটাকে আনন্দের জীবন বলা যায় না। শুধু চাকরির জন্য দুটি স্বাস্থ্যবান নারী পুরুষ দিন-দিন শাকচচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কোনও সন্তান। বাড়িতে নেই কোনও শিশুর শব্দ-কিংবা ভাঙা খেলনা।

স্বামীনাথন আমাকে জিগ্যেস করলেন, আপনি কী সার্ভিসে আছেন।

—সার্ভিস?

—গভর্নমেন্ট না পাবলিক এন্টারপ্রাইজে? কিংবা বোধহয় নিজের বিজনেস।

এক মুখ হেসে বললাম, বেকার।

স্বামীনাথন বললেন, বাঃ! এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে!

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মা আমার বেকার থাকার কথাটা তেমন পছন্দ করলেন না। বোধহয় ভাবলেন, বাঙালিরা বড্ড বেশি বেকার থাকে। বাঙালিদের উদ্যম নেই। শুধু রাজনীতি।

তিনি জিগ্যেস করলেন, কেন এখনও সার্ভিস নেননি কেন?

পাছে আমি বিব্রত বোধ করি, তাই স্বামীনাথন তাড়াতাড়ি বললেন, হি মাস্ট বি ইয়াংগার দ্যান মি, এখনও অনেক সময় আছে, যতদিন ফ্রি থাকা যায়।

এবার আমি পদ্মার দিকে তাকিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, আমি একজন রাইটার।

—রাইটার? আপনি কী লিখেন?

—পোয়েট্রি?

স্বামী-স্ত্রী একবার চোখাচোখি। আশাই করেননি। এরকম নির্লজ্জভাবে। যেন কেউ বলছে আমি বেকার, কিন্তু মাঝে-মাঝে চুরি করি।

পদ্মা জিগ্যেস করলেন, আপনি গান করেন?

তেমনি সহাস্য মুখে আমি, না।

—তবে কবিতা লিখে কী করেন?

—কাগজে ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে।

—একটা শোনান না।

—বাংলা।

—তা হোক। তবু শোনান।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম, 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—' ইত্যাদি লাইন আষ্টেক এখনও মুখস্থ আছে, শুনিয়ে দিলাম। একই কথা।

স্বামীনাথন বললেন, এবারে মনে পড়ছে, আপনার কথা আমি মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তার এক বন্ধু পোয়েট্রি লেখে, খুব বোহেমিয়ান!

বুঝলাম, আমি নয় পরিতোষ নিশ্চয়ই শক্তির কথা। প্রতিবাদ না করে, মৃদু-মৃদু হাসি মুখে চুপ করে তাকিয়ে। দোলনায় জোরে-জোরে দোলা।

এরপর কিছুক্ষণ পরিতোষ আর শ্রীলেখার কথা। আমিও সোৎসাহে। আমি যে ওদের বন্ধু তার নির্ভুল প্রমাণ।

দু-কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ওঠা উচিত। দোলনা থেকে নামতেই পদ্মা বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন?

আমি অন্তত সাত-আটরকম তাসের খেলা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে নতুন কিছু খেলা আছে কিনা জানি না।

—কী খেলা?

—ফিস, রামি?

—জানি।

—খেলবেন?

—এখন? অনেক রাত হয়ে গেছে না! এমনই আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম।

স্বামীনাথন বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট ফিল স্লিপি—আমরা অনেক রাত পর্যন্ত।

—আমার আপত্তি নেই।

অবিলম্বে নিচু খাটের ওপর তাস খেলায়। ওঁরা ওঁদের রাত্তিরের খাওয়ার দুটি প্লেটে সাজিয়ে পাশে নিয়েই। নিরামিষে এঁটো হয় না।

রামির তাস বিলি হতেই আমি বললাম, রামি খেলা তো স্টেক ছাড়া জমে না!

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললেন, একজ্যাকটলি। রোজ আমরা দুজনে স্টেকেই খেলি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে, এত বাজে লাগে...। আজ আমরা একজন পোয়েটকে পেয়েছি, তাকে হারাব।

—লেট আস সি।

একটুক্ষণের মধ্যেই তাস খেলা বেশ। ওঁরা দুজনেই পাকা খেলোয়াড়। মেয়েটিরই নেশা বেশি। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকবার পুরো হাত হারলাম। মুশকিল হচ্ছে আমার পুঁজি কম। বেশি টাকা নিয়ে না বসলে বাজির খেলায় পৌরুষ দেখানো যায় না।

খেলতে খেলতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গত রাত্রে ছিলাম ট্রেনে, অচেনা লোকদের সঙ্গে। আজ আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে তাস। আমার ডাল্টনগঞ্জে পরিতোষের কাছে আসার কোনও কথাই। কলকাতা ছেড়ে বেরুবার সময় ক্ষীণ ইচ্ছে ছিল চাইবাসায় সমীরের কাছে। কিন্তু এখানে না এলে এই দম্পতির সঙ্গে।

আমার ঠিক উলটোদিকেই বসেছে পদ্মা, ডান পাশে স্বামীনাথন। পদ্মার চোখের পল্লবগুলি অনেক দীর্ঘ, হাতের আঙুলগুলি এত কোমল মনে হয়। পা দুটো মুড়ে বসেছে বলে তার একটি সম্পূর্ণ উরু। কোনও স্বাস্থ্যবতীর মাংসল উরুর সঙ্গে কি পারস্যের ছুরির উপমা দেওয়া যায়? পাখির নীড়ের সঙ্গে যদি চোখের।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অনুরাধার মুখ। একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে মিলিয়ে। বাড়ির লোক ওকে জোর করে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। ওর নীরবতা ও দুঃখ আমার মধ্যে এমন একটা ছাপ ফেলেছে। যেন আমাকে যেতেই হবে ওই ছোট্ট শহরটিতে, আবার দেখতে হবে ওই কিশোরীকে যতক্ষণ না ওর গোপনীয়তা। অনুরাধা, আমি যাবো তোমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, তবুও।

একটু পরেই স্বামীনাথন হারতে লাগলেন। ভুলভাল তাস ফেলে ফেলে। তাঁর স্ত্রীর মৃদু বকুনি। আমি পরপর দুবার পদ্মাকে পুরো হাত সমেত হারিয়ে দিতেই সে বেশ উত্তেজিত। সে হারতে ভালোবাসে না। তাকে রাগিয়ে দেওয়ার জন্যই আমি প্রাণপণ মনোযোগে। তবু আমিও হারলাম। পরের বারও। পরাজয় উসুল করার জন্য আমি তার বুক ও নগ্নকোমরে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে সে আবার দ্রুত তাস বিলি। স্বামীকে বলে, নাও, নাও, তুমি এত স্লো।

এক মিনিট পরেই স্বামীনাথনের হাত থেকে তাসগুলি ঝরঝর করে। বসে থাকা অবস্থাতেই তার নাক ডাকে। তারপর মাথা হেলে পড়ে পাশে।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে। পদ্মার চোখ হাত। কাঁধের ডৌল। খসে পড়া আঁচল। পারস্যের ছুরি।

পদ্মা বলল, একি, আর খেলা হবে না?

আমি হাতের তাসগুলো উল্টে দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তির ভঙ্গি। পরক্ষণেই ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। শাড়ির আঁচলটা

পাকিয়ে সরু করে স্বামীনাথনের নাকের মধ্যে। আমার চোখে চোখ, যেন আমরা একই ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

নাকে খোঁচা খেয়ে স্বামীনাথন ধড়মড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায় কি যেন, মনে হয় যেন বিরক্তিসূচকই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গিতে হিন্দিতে বললেন, সরি, ভেরি সরি, নিদ আ গয়া।

ঘুমের ঘোরে উনি ভুলে গেছেন আমি হিন্দিভাষী নই। বিহারে থাকার জন্য আচমকা ওই ভাষাতেই।

আমি বললাম, আপনার ঘুম এসে গেছে, এখন খেলা বন্ধ থাক।

পদ্মা আদুরে অনুনাসিক গলায় বলল, না, রাত তো বেশি হয়নি, এর মধ্যেই ঘুম।

স্বামীনাথন চোখ কচলে বললেন, ঠিক আছে, আর একটু যদি খেলতে চাও।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মানুষকে একটু দুর্বল। মানুষের মুখে বুদ্ধির ছাপটার নামই তো ব্যক্তিত্ব, ঘুমের সময় বুদ্ধি ছুটি নেয়।

স্বামীনাথন এক ফাঁকে উঠে বাথরুমে। পদ্মা আবার তাস বিলি করছে, আমি দেখছি ওর আঙুল, রক্তাভ নখে স্বাস্থ্যের আভা। নারীটি বেশ ছটফটে, এই মফস্‌সলের জীবন ওর জন্য নয়। যেমন—।

—আপনি সাউথ ইন্ডিয়ায় কোথাও গেছেন?

পদ্মার এই প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠি, আমি তখন অন্য কথা। আমি এখানে ছিলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—আপনি বুঝি খুব।

—হ্যাঁ।

—বেশ মজার তো। ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না।

মেয়েরা আবার এমন অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা—

—কীরকম?

উত্তর দেওয়া হল না। স্বামীনাথন ফিরে এলেন। আমার একটা লঘু ইয়ার্কির কথা মনে এসেছিল, যা কোনও স্বামীর সামনে বলা যায় না। বললে কোনও দোষ নেই, কিন্তু আড়ালেই।

তাস তুলে নিলাম। আরও কিছুক্ষণ খেলা। কিন্তু আর ঠিক জমছে না। স্বামীনাথন বড়-বড় হাই। বেচারাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। হারছেও খুব। স্বামীর ঘুম তাড়াবার জন্য একবার পদ্মা রেকর্ড প্লেয়ারে একটা গান চালিয়ে দিল, এম এস শুভলক্ষ্মী। তাতেও সুবিধে হল না, যখন কারুকে ঘুমে পায়।

মাঝে মাঝে পদ্মা মৃদু ভর্ৎসনা করছে স্বামীকে। তখন আমি নীরবে। চোখ চলে যায় পদ্মার দিকে। ওর কোমর ও পেটের অনেকখানি নগ্ন। কোনও নারীর পোশাক যদি হ্রস্ব হয়, সেদিকে তাকানো কি অসমীচীন? তাহলে পোশাক হ্রস্ব কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নারীদের কোমর আমার কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয়দৃশ্য, আমি স্বীকার করছি, বারবার সেই দিকে চোখ।

স্বামীনাথন আর একবার ঢুলে পড়তেই আমি নিজেই বললাম, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না, আমারও এবার।

স্বামীনাথন লজ্জিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওরা দুজনেও।

পদ্মা বলল, আপনারও ঘুম পেয়েছে?

—হ্যাঁ, মানে, খেলা আর জমছে না।

—আপনি বললেন না তো, মেয়েরা কি এমন পারে যে ছেলেরা পারে না?

আমি এমনভাবে হাসলাম, যার তেষট্টি রকমের মানে হতে পারে। এমন কি চৌষট্টি রকমও।

ওকে একটু ধাঁধায় রাখলে ক্ষতি কি।

বিদায় নেওয়ার জন্য সময় না নিয়ে আমি দ্রুত দরজার কাছে। স্বামীনাথন জানালেন, কাল সকালে আমার কফি। রাত্রে কিছু দরকার হলে যে-কোনও সময়।

দরজার ওপরে একটা হাত তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা বলল, আমার মোটেই এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করে না—

এ ব্যাপারে মীমাংসার ভার ওর স্বামীর ওপরে দিয়েই আমি বাইরে। আসলে আমার পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেতে। ওদের বাড়ির নিরামিষ খাওয়ার প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিলাম, রাতটা না খেয়েই। কিন্তু এখন দাউদাউ আগুন।

রাত্রি দশটা বাজে। এখনও কোনও কোনও পাঞ্জাবির হোটেল। দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায়। বেশি দূর যেতে হল না, পেট্রোল পাম্পটার পাশেই বৃদ্ধ সর্দারজি তাঁর দোকান খুলে বসে ছিলেন যেন শুধু আমারই প্রতীক্ষায়। ভাত নেই, কিন্তু রুটি। তরকা। আলু-মটর, আলু-পনীর। না, ফিশ কারি, মাটন কারি, ফাউল কারি—সব শেষ। এখানেও নিরামিষ খেতে হবে? আজ রাতে আমার নিরামিষ ভবিতব্য? আন্ডা হ্যায় তো? ঠিক হ্যায়, ভাজো। রুটির সঙ্গে তিন তিনটে ডিমভাজা। খাওয়ার পর শরীরে বেশ একটা।

ফেরার পথে নিস্তব্ধ রাস্তায় শুধু আমার জুতোর শব্দ। শরীরে আরাম দিচ্ছে মদালসা বাতাস। কোথাও একটা রাতপাখির ডাক। হঠাৎ ওপরে চোখ যায়। বিশাল উদ্যান। এর নিচে আমি কী অসম্ভব ছোট ও একা। নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধে আমি যেন আরও চুপসে যাই। কিংবা যেন আমি আর নেই, অদৃশ্য হয়ে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য, নির্জন, তার ওপরে মাতৃস্নেহের মতন জ্যোৎস্না। প্রথম যে চাঁদে পা দিয়েছিল তার নাম নীল আর্মস্ট্রং। আমার নামে নাম। মৃত্যুর আগে আমি বলে যাবো, আমিও সুন্দরকে।

খুব মন্থরভাবে হাঁটতে-হাঁটতে এক সময় বাড়ির কাছে। স্বামীনাথনদের দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ, আলো নিভে গেছে। এর মধ্যেই কি? পদ্মা বলেছিল। এখন আবার গিয়ে ডাকা যায়? কেনই বা ডাকব? 'কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে?'

আমার অর্থাৎ পরিতোষের ঘরের দরজার কাছে একটা কুকুর। আগে তো ছিল না। চেহারাটা বেশ ভয়াবহ। এদিক-ওদিক একটা ইটের টুকরোর জন্য। সেটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গলায় ঘাউ-ঘাউ করে। বিশ্রীভাবে ভেঙে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। এই সঙ্গে কি স্বামীনাথনরা জেগে উঠবে? কুকুরটাকে রাগাবার জন্য আমি আরও দুবার পাথর ছুঁড়ে। ওটা আসলে ভীতু, তাই অত গলার জোর, ছুটে পালাল।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট। আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এখনও সামনে দীর্ঘ রাত। পরিতোষ কল্পনাও করতে পারবে না, এই সময় আমি তার বিছানায়। অনেক দিন আগে পরিতোষের কাছে যখন এসেছিলাম, তখন ওর ছোটখাটো ছিল, সেবার আমাদের সঙ্গে দীপকও, কত কষ্ট করে যে তিনজন সেই খাটে। এখন এত বড় বিছানায় তিন-চারজন অনায়াসেই। বড় বিছানা বলেই আমার খুব একা-একা লাগতে।

আমি জীবনে কী চাই! জীবন আমার কাছ থেকে কী? জানি না, জানি না, জানি না। কতগুলো বছর কেটে গেল, কিছুই জানি না। জানার কী খুব দরকার? আজ সকাল পর্যন্ত আমি কী চাই তা জানতাম। আমি চেয়েছিলাম অনুরাধা নাম্নী একটি মেয়ের দুঃখের। কে অনুরাধা? ট্রেনে কিছুক্ষণের জন্য। অসম্ভব গভীর মনে হয়েছিল তার দুঃখ। ওই মেয়েটির বদলে যদি একটি ছেলের দুঃখ? তা হলেও? সত্যি জানি না, জানি না, জানি না। জানার কি খুব?

পরিতোষের ঘরে বইটই বিশেষ নেই। রাত্রে একটা বইকে অন্তত সঙ্গী করে না শুলে। র‍্যাকের ওপরে দুটো সরু মোটা টাইম টেবল, কয়েকটা সিনেমার পত্রিকা। নিচের তাকে গীতবিতান, দুটি

বাংলা উপন্যাস (পড়া), তিনখানা আমারই বন্ধুদের লেখা কবিতার বই, একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকখানা ইংরেজি পেপার-ব্যাক, একটা ডায়েরি, সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এর মধ্যে কোনও বইটাই ঠিক আকৃষ্ট। অথচ একটা বই চাই-ই। আমি চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে যে-কোনও একটা।

গীতবিতানটিই উঠে এল। গীতবিতান পড়তে-পড়তে ঘুমের চর্চা! তবু পাতা উলটে-উলটে। বইয়ের মাঝখানে গানের চেয়েও আকর্ষণীয় অন্য কিছু। টুকরো-টুকরো করে ছেঁড়া কাগজ। মনে হয় চিঠি। এত ছোট টুকরো করা হয়েছে মনে হয় হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই। তবু যত্ন করে রাখা কেন বইয়ের ভাঁজে? চিঠিটা যে ছিঁড়েছে সে পরে নিশ্চয়ই মত বদলছে। ছেঁড়া চিঠি বলেই মনে হয় অনেক কিছু গোপন। আমি টুকরোগুলো সাজাবার চেষ্টা করি। আমি ভুল...সেদিন বিকেলে...জানি কেউ...ভয় নেই...তোমার মু...ভারি তো এক...আমার ছো...বনের কিছুই...সেও তো দু...বর্ধমানে...তোমার বু...নেক আশা...

না, অসম্ভব, এ টুকরোগুলো মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার। জেল খানার কোনও কয়েদিকে যদি এ কাজ দেওয়া যায় তার বেশ ভালোই সময় কেটে যাওয়ার। আমার আর ধৈর্যে। চিঠিটা কি শ্রীলেখার? সেগুলি গীতবিতানের মধ্যেই রেখে দিয়ে আর একটা বই। ইংরেজি পেপারব্যাক, মলাটে পুরোপুরি খোলামেলা মেয়ে, যারা রেলস্টেশনের বুকস্টল আলো করে থাকে। এটাই আপাতত।

মাঝে-মাঝে খুটখাট শব্দ। ইঁদুর আছে নাকি! খাটের নিচে উঁকি মেরেও কিছু। হয়তো মূষিকরূপী চপল ইন্দ্রিয়। কী ভীষণ একা লাগছে। হোটেলের ঘরে থাকলে একটা। আমার বইতে চোখ। মন্দ না, মেয়েটির নাম সুজি, সে কারুকে ভালোবাসতে পারে না—

বাইরে কীসের যেন ছপছপ শব্দ। কেউ যেন জল ছেটাচ্ছে। বৃষ্টি নাকি? না তো, মাঝে-মাঝে হাত দিয়ে জল ছেটানোর মতন, আমার ঘরটার ঠিক পাশেই। আমি পায়ে পায়ে বাইরে চলে এলাম, শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে। সেখানে একটা বাগান, ছোটখাটো হলেও, অনেক ফুলগাছ।

সেই দিকে এসে অদ্ভুত দৃশ্য। জ্যোৎস্না যামিনী, সেই জ্যোৎস্নার বাগানে এক নারী, তার কাঁধে একটা জলভরা কলসি। আপন মনে ঘুরে ঘুরে জল ছেটাচ্ছে। প্রথমে গাটা ছমছম। অপ্রাকৃত মনে হয়। মানুষ, না অলীক? তবে ভয়েরও নেশা নেশা ভাব। আরও বেশি ভয় পেতে ইচ্ছে। আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে। কে?

নারীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। গাছে গাছে জল-ছড়া দিতে দিতে। একবার সে আমার দিকে মুখ। হাসল। কালো রঙের মুখে অত্যন্ত ফর্সা হাসি। পদ্মা।

—এ কী?

—আপনি ঘুমোননি?

—না, শব্দ শুনে উঠে এলাম। কী করছেন?

—বলেছি তো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

—কী করছেন এখানে?

—গাছে জল দিচ্ছি?

—এত রাত্রে রাত্রে কেউ গাছে জল দেয়?

—দেয় না বুঝি?

—কখনও দেখিনি।

—আমি দিই। রোজ রাত্রে। তাই তো ফুলগুলো এমন।

—আপনার ভয় করে না?

পদ্মা উত্তর না দিয়ে কুলকুল করে হাসল। আবার জল দিতে-দিতে অন্য দিকে। আমি একদৃষ্টে।

বাগানে জল দেওয়ার জন্য ঝারি পাওয়া যায়, তার বদলে ওর কাঁখে কলসি। ঠিক কোনও গ্রাম্য মেয়ের মতন। ওর কোমরের গড়নটা কি অপূর্ব। ঠিক পাথর কেটে কোনারকের মূর্তিগুলি যেমন। আমি বড় কোমর-লোভী, দু-চোখ ভরে ওর কোমর। ঘাগরার ওপরে ব্লাউজ, উড়নিটা রেখে এসেছে।

জল ছড়াতে ছড়াতে ও আমার কাছেই। আমি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললাম, আমাকে একটু জল দেবে। আমার তেষ্টা লেগেছে।

ও হেসে কি যেন উত্তর। মনে হল, না।

আমি বললাম, একটু জল দেবে না? তুমি বুঝি শুধু গাছকেই জল দাও, মানুষকে দাও না?

ও এবার কলসি উপুড় করে দেখিয়ে বলল, নেই।

—আর নেই? আমার যে তেষ্টা পেয়েছে?

—খুব?

—হ্যাঁ।

আমাকে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে ও বলল, এই নাও!

ততক্ষণে ও ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলেছে, বন্দি একটা বলের মতন বেরিয়ে এসেছে ওর স্তন।

আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে ও খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, এই নাও।

আমি সেই মুহূর্তে একটি শিশু। প্রথমে জিভ ছোঁয়ালাম ওর স্তনবৃন্তে। কী গরম। তারপর সম্পূর্ণ মুখটা চেপে। ও আমার মাথায় হাত। আমার শরীর কাঁপছে। সেই শক্ত অথচ কোমল, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণস্তনে আমার মুখ ও চোখ। ততক্ষণে শিশু থেকে পুরুষ, আমি দু-হাতে ওর কোমর। যেন ওকে কতদিন থেকে চিনি, অথচ আজই প্রথম শরীরের চেনা।

নিজেকে বিযুক্ত করে একবার ওকে দেখা। বৃষ্টির মতন জ্যোৎস্না ঝরে-ঝরে পড়ছে ওর মাথায়। ওর সামনে পেছনে, দু-পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ, ও দাঁড়িয়ে আছে ঋজু হয়ে, একটি স্তন শুধু অনাবৃত।

ও হাত বাড়িয়ে বলল, এসো। আমি ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতেই ও মুখটা সরিয়ে। আমার মাথাটাও জোর করে নিচের দিকে। ফের ওর বুকে। যেন আমি ওকে তৃষ্ণার কথা বলেছি বলে ও তৃষ্ণা মেটাতে চায়। কিন্তু পুরুষমানুষের তৃষ্ণা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে-বসে ওর দুই উরু জড়িয়ে ধরে ওর কোমরে এক লক্ষ চুম্বন। কিংবা এক লক্ষের থেকে একটা দুটো কম হতে পারে।

ও বলল, এখানে নয় আর। এসো।

দৌড়ে গেল আমারই ঘরের দিকে। আমিও পিছু-পিছু। ঘর পেরিয়ে বাথরুমে। দাঁড়াও আসছি। আমি শুনলাম না। আমিও ভেতরে। বাথরুমের দরজার পাশে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমন চুম্বন আমি জীবনে আগে কখনও। আমি উর্বশীর ঠোঁট থেকে অমৃত নিচ্ছি। একবার দুবার তিনবার, আরো দাও, আরো দাও—

খুট খুট খুট খুট শব্দ। হাত থেকে বইটা মাটিতে। আলো জ্বালা, দরজা খোলা। আমি কোথাও যাই নি? পদ্মা কোথায়? সে যে এখানেই এই মাত্র। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি? কিন্তু আমার ঠোঁটে যে এখনও চুম্বনের। শরীরে সেই উষ্ণতা। তা হলে! আবার সেই খুট খুট খুট খুট। কীসের শব্দ? মূষিকরূপী ইন্দ্রিয়? কপালে ঘাম জমেছে। স্বপ্ন এত তীব্র হয়। আমি কি জল ছড়ানোর শব্দ শুনিনি!

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে। ঘুরে পেছন দিকটায়। সত্যিই একটা বাগানের মতন আছে। বেশ কিছু গোলাপ গাছ। আমি তো এদিকটায় আগে আসিনি, বাগান দেখিনি, তাহলে কি করে স্বপ্নে? বাগানের মধ্যে ঢুকে আমি নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। মাটি ভিজে ভিজে।

গোলাপগুলির পাপড়িতে ও পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জল। সত্যিই জল ছড়িয়েছে একটু আগে মনে হয়। তাহলে কোথায় সেই এক বুক খোলা নারী, যে এখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্নান।

স্বামীনাথনদের বাড়ির দিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। কোনও জীবনের চিহ্ন নেই। একইসঙ্গে আমার লজ্জা ও দুঃখ। ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি লজ্জিত বোধ করতাম। সত্যি নয় বলেই বিষম দুঃখ, বিষম দুঃখ।

ফিরে এলাম ঘরে। এখানেও কোনও চিহ্ন নেই। দরজা খোলাই ছিল যদিও। বাথরুমের মধ্যে। এখানেও কেউ। তখন আমি সেই বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এক কাল্পনিক নারীকে তিনবার প্রগাঢ় চুম্বন। ওষ্ঠ থেকে অমিয়। তার উরু চেপে ধরে পায়ের কাছে। স্বপ্নের চেয়েও এই জেগে থাকা কাল্পনিক প্রণয়লীলা কম তীব্র হয় না। এর পরেও বিরাট অতৃপ্তি নিয়ে আমি ফিরে আসি বিছানায়। তারপর পাজামার দড়ি খুলে।

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম। বিছানায় উঠে বসেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয় আমাকে। আজ সারাদিন কীভাবে? পরিতোষ দু-তিন দিনের মধ্যে ফিরবে না। শ্রীলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন। এই দু-তিনদিন আমি? এখানে থেকে যাওয়া যায় অবশ্য, কোনও অসুবিধে নেই, পরিতোষের ভাঁড়ারে চাল-ডাল আছে, আমি নিজেই খিচুড়ি ফুটিয়ে। কিংবা কাছেই একটা পাঞ্জাবি হোটেল। কিন্তু কী করব একা একা? অথচ একা থাকতেই তো আসা, নইলে কলকাতা ছেড়ে। যেখানে হাজার পরিচিত মানুষ।

কালকের স্বপ্নটাই যত গণ্ডগোল। এরপর পদ্মার কাছে মুখ দেখাতে। সামান্য পরিচয়, তাতেই এমন অবৈধ। দুপুরে স্বামীনাথন অফিসে যাবে। তখন কি পদ্মা ঘুমোয়। সেই সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হতে পারে না? যদি হয়? অনেক সময় অসম্ভবও তো। ওর হয়তো কোনও অতৃপ্তি আছে, যেরকম ছটফটে ভাব—। আসলে তা-ও নয়। যেটা ওর সারল্য, যেটা ওর পবিত্র মনের চঞ্চলতা, সেটাকেই আমি অতৃপ্তি ভেবে।

হঠাৎ নিজেকে আমার একটা লম্পটের মতন। সকালবেলা উঠেই এক নিরীহ দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী সম্পর্কে। যেন কোনও মহিলা অপরের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই ব্যভিচারে রাজি হবে। ইডিয়েট! আমি নিজের গালে ঠাস করে এক চড় কশালাম। তবু মনের মধ্যে একটু ছুঁকছুঁকে ভাব। তখন নিজেকে আরও শাস্তি দেওয়ার জন্য সকালবেলা সিগারেট খাবই না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং আরও ঠিক করলাম স্বামীনাথন-পদ্মার সঙ্গে দেখা না করেই।

পরিতোষরা গেছে ছিপাদহের দিকে। আমি ওদের খোঁজে অনায়াসেই। এদিককার পথঘাট আমার খুব অচেনা নয়। হিটারে গরম জল চাপিয়ে ততক্ষণে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে। এত ভোরে বহুদিন দাড়ি কামাইনি।

সদর দরজাটা তালা লাগিয়ে দাঁড়ালাম। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। স্বামীনাথনরা এখনও। একটা খামের মধ্যে চাবিটা ভরে, সেই খামেরই গায়ে কয়েক লাইন লিখে সেটা ওদের লেটার বক্সে। যাক, নিশ্চিন্ত। এবার বড় রাস্তায়।

মনের মধ্যে একটা কাপুরুষ-কাপুরুষ ভাব। যেন আমি পালিয়ে, হেরে। কোথায় পালাচ্ছি? আত্মসংযমীকে বীরপুরুষ বলা উচিত না? কেউ তো ব্যাপারটা জানল না। না হলে হয়তো কিছু প্রশংসা। তার বদলে, মনে-মনে বলছি, শালা, ভীতু কোথাকার—পদ্মা মেয়েটার ছলাকলা দেখেও।

বাস ছাড়তে এখনও দেরি আছে। একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে। যাবে বেতলায়, পথেই ছিপাদহ। দু-টাকায় রফা। আমি উঠে ড্রাইভারের পাশে।

ট্রাকটা বহুদূর থেকে আসছে, সারারাত ধরে। ড্রাইভারের চোখদুটো লাল। গলায় একটা

মাফলার। তার পাশে বসে ক্লিনার, একটা অসম্ভব রোগা ছেলে, দেখলে কিছুতেই ঠিক বয়েসটা। ক্লিনার শব্দটাই কি রকম রোগা-রোগা।

পেছনে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে বসেই ঢুলছে। ড্রাইভারের পেছনে একটা চৌকো ফুটো, সেখান দিয়ে আমি মাঝে-মাঝে ওদের দিকে। দৃশ্যটা কীরকম যেন করুণ করুণ ওরা সারারাত্রি এইভাবে! ড্রাইভারের মুখখানা এমনই রুক্ষ, যেন মনে হয় দস্যুদলের সর্দার।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস। অনেকগুলো মাছি ভনভন ভনভন। অসম্ভব দ্রুত চলছে ট্রাকটা, তবু মাছি। ড্রাইভার মাঝে-মাঝে স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে হাত ছেড়ে, মুখের সামনের মাছিগুলিকে। ভয়-ভয় করে। যে-কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট। এত মাছি কেন? তাড়ি-টাড়ি খেয়েছে নাকি? সেই গন্ধে মাছি? তাহলে তো আরও সাংঘাতিক।

ক্লিনার ছেলেটাও ঘুম-ঘুম। মাঝে-মাঝে আমার কাঁধের ওপর। ছেলেটার কষে লালা। ক্রিমির দোষ আছে নিশ্চিত। আমি হাতে দিয়ে ওকে সরিয়ে।

সবে আলো ফুটছে। দু-পাশে হালকা জঙ্গল। ল্যাজ গুটিয়ে একটা শিয়াল। বাঁ-পাশে শিয়াল দেখা কীসের যেন লক্ষণ? শুভ না অশুভ? আমি দূরে চলে যাচ্ছি ক্রমশ। পদ্মাকে আর জীবনে কখনও হয়তো। কী সুন্দর কোমর! বাঁধিয়ে রাখার মতন। ওই সৌন্দর্য দুরেই থাক। স্পর্শের বদলে চোখে।

একটা ছোট নদীর ওপর সরু ব্রিজ। ট্রাকের গতি ক্রমে কমে। ভোরের হালকা আলোয় ক্ষীণ নদীটি অপরূপ। এইসব অচেনা পাহাড়ি নদী দেখলেই আমার মনে হয়, এরা বড্ড একা। দিনের-পর-দিন চুপচাপ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। কেউ কি কখনও এখানে গাগরীতে জল ভরতে? দাপাদাপি করে না শিশুরা। বালির ওপর দিয়ে তিরতিরে জলধারা।

নদীটি অবশ্য তখন একা ছিল না। ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। হাত উঁচু করে। ট্রাকটা বেশ জোরে ব্রেকের শব্দ। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে। তারপর দুর্বোধ্য হিন্দিতে ড্রাইভারকে কি যেন। ড্রাইভারও উত্তরে সেই রকম। তারপর লোকটি একতাড়া নোট। ড্রাইভার সেগুলো না গুণেই জেবের মধ্যে ভরে আমাকে বলল, একটু উঠুন তো বাবুজি।

উঠে দাঁড়ালাম। সিটের গদি সরাতেই ভেতরে একটা বাক্সের মতন। তাতে কয়েকটা পুঁটলি। ড্রাইভার দুটো পুঁটলি তুলে রাস্তার লোকটার হাতে। সঙ্গে-সঙ্গে একঝাঁক মাছি সেই পুঁটলি দুটো অনুসরণ করে।

মনের মধ্যে একটা খটকা। কি এমন মাছি-ভনভনে বস্তু, যার বিনিময়ে অতগুলো টাকা? আমার কৌতূহলী চোখ একবার ড্রাইভারের দিকে, একবার সেই লোকটার।

আরও দু-একটা বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাক আবার। এখনও কয়েকটা মাছি। কী যেন আমার মনে পড়বার কথা। কেউ একবার বলেছিল, ট্রাকে যদি মাছি থাকে।

উলটোদিক থেকে একটা সরকারি জিপ। ট্রাক ড্রাইভার আমার দিকে একবার আড়চোখে। সেই দৃষ্টিতে অপরাধ। তৎক্ষণাৎ আমার মাথার মধ্যে চিড়িক করে। আফিং। নিশ্চিত আফিং। ধানবাদে সেই যে একবার। চৌধুরীদা ছিলেন একসাইজের লোক।

ট্রাকটা জিপটাকে পথ ছাড়লো না। নিজেই জোরে বেরিয়ে।

আমি আমার কাঁধ থেকে ক্লিনারের মাথাটা ঠেলে তুলে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এ লোকটাও আফিং খেয়েছে নাকি?

ড্রাইভার সচকিতভাবে জিগ্যেস করল, কেয়া?

—মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে ভি আফিং খায়া?

ক্লিনারটা চোখ খুলে মিটিমিটি হাসছে। বোধহয় আমার হিন্দি বলার কসরৎ দেখেই। আর একটু কৌতুকের জন্য আমি বললাম, আফিংকা কারবার মে কিতনা নাফা হোতা হ্যায়?

ড্রাইভারের মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরল। রক্তচক্ষু। লোকটির কোনও কৌতুকবোধ। কর্কশ গলায় বলল, আফিং কা কেয়া বাত হ্যায়!

—ওঁ চিজ কেয়া? আফিং নেহি?

—উও তো তামাক হ্যায়।

—ভোরবেলা রাস্তায় খাড়া হোকে, ইতনা রুপিয়া দেকে আদমি লোক তামাক খরিদ করতা হ্যায়? তব ইতনা মচ্ছর কাঁহে?

—মচ্ছর?

মচ্ছর মানে মশা না মাছি? বোধহয় মশা-ই। তা হলে মাছির হিন্দি কি? যেমন বোলতার হিন্দি জানি না। এই নিয়ে তারাপদর রসিকতা, আপলোক বোলতা কো বোলতা নেহি বোলতা হ্যায় তো কেয়া বোলতা হ্যায়?

সেই রসিকতাটা ওদের শোনাব-শোনাব, তখন ক্লিনারটি হঠাৎ রেগে-মেগে এক চিৎকার, এই জন্যই বলছিলাম, বাঙালি বাবুদের কক্ষনও তুলতে নেই।

ড্রাইভারটি তাকে জানাল, সুরত দেখে আগে বুঝিনি যে এ বাঙালি।

সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেক। উতার যাইয়ে।

—অ্যাঁ?

—উতার যাইয়ে।

বলে কী এরা? এই মাঠের মধ্যে নেমে যাব? এরা আফিং চোরা চালান করে, তাতে আমার কি? আমি কি কোনও আপত্তি? শুধু একটু রসিকতার জন্য।

ড্রাইভারটির চোখ দেখে রীতিমতন ভয়ে গা-ছমছম। গুটিগুটি নেমে পড়তেই। ক্লিনারটি আমার হাত চেপে ধরে বলল, রুপিয়া?

কোনও তর্কের মধ্যে না যাওয়াই। দু-টাকাই ওদের। এবং বললাম, নমস্তে। বাকি সব টাকাও যে কেড়ে নেয়নি, সে তো ওদের দয়া। শুধু মাঝরাস্তায় এমনভাবে ফেলে।

একবার ভেবেছিলাম ট্রাকের নম্বরটা। পকেট থেকে কলম বার করেও মতবদল। পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই। পুলিশকে না জানিয়ে কেউ কক্ষনও চোরা কারবার করে নাকি? মাত্র দু-টাকা অতিরিক্ত লাভের জন্য যে আমাকেও এরা ট্রাকে জায়গা। অতিরিক্ত দুঃসাহসী না হলে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সকালে প্রথম সিগারেট। ইচ্ছে করলে এখনও পরিতোষের বিছানায়। শুধু-শুধু একটা স্বপ্নের জন্য।

কাছাকাছি বাড়িঘর কিছু নেই। বিরাট ফরাসের মতো মাঠ। পরবর্তী কোনও ট্রাক বা বাসের জন্য কতক্ষণ? তার চেয়ে বরং হাঁটতে-হাঁটতেই। ছিপাদহ আর কতদূর?

আধঘণ্টা মতন হাঁটার পর দূরে একটা কালো গাড়ি। প্রায় মাঝ রাস্তাতেই হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাহ্য করল না গাড়িটা, একরাশ ধুলো উড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে আমি সরে না দাঁড়ালে হয়তো চাপা দিয়েই। আমার চেহারাটা কি যথেষ্ট বিপন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়?

আবার হেঁটে-হেঁটে এক-দিগন্ত মাঠ পার হওয়ার পর দ্বিতীয় দিগন্তে কিছু ঘরবাড়ি। খাপরার চাল। ছোট একটি গ্রাম। যদি ওখানে চা। স্বামীনাথন কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, চমৎকার মানুষ। ওরা দুজনেই চমৎকার। শুধু আমারই দুর্ভাগ্য।

একটি ঘরের দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি এত সাদা যে মনে হয় ওর বয়েস অন্তত দু-শো বছরের কম নয়। প্রথমে তাকে আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার। তার মুখে কোনও

ভাবান্তর নেই। ঘরের দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনার সরকারি বিজ্ঞাপন।

জিগ্যেস করলাম, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?

বৃদ্ধটি নির্বিকার। নিরুত্তর।

দু-তিনবার প্রশ্ন করে একই। তখন জানতে চাইলাম ছিপাদহ কতদূর।

বুড়োটা নিশ্চয়ই কালা। কিংবা কোনও উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। দুচ্ছাই, এত বুড়ো-ফুড়ো দিয়ে কোনও কাজ হয় না। বাড়িতে কি আর কেউ নেই? উঁকিঝুঁকি দিয়েও আর কারুকে।

খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ি। শালিক পাখির মতন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে দুটি শিশু। একজন মাঝবয়সি লোক পেঁয়াজের খেতে কোদাল দিয়ে। পাশেই একটি চালার নিচে একটি গরু বাঁধা। যথারীতি খড়ের বাছুর। একজন স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়ি নিয়ে সেই দিকে।

অল্প খানিকটা জমিতে নধর পেঁয়াজকলি। আমি সেখানে। পুরুষটি একবার শুধু মুখ তুলে। কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করে আবার। তার পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু একটিও স্বাস্থ্যবান পুরুষ দেখি না।

—ইধার চা-কা দুকান হ্যায়?

লোকটি সিধে হয়ে আমার দিকে ভালোভাবে। কোদালের ফলাটা কি চকচকে!

—আপনি কোথা থেকে আসছেন? (হিন্দিতে)

—এইসাই ঘুমতা হ্যায়।

—ঘুমতা হ্যায়?

লোকটির বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝতে পারি। সদ্য সকালে একজন ফিটফাট বাবু চেহারার লোক এই গ্রামে। সচরাচর তো।

—এদিকে চায়ের দোকান নেই?

—না, বাবু।

—আপলোগ চা নেই পিতা?

—হাটে গেলে কোনও-কোনও দিন খাই। এদিকে তো কোনও দোকান নেই।

অনেকখানি হেঁটে আমি একটু ক্লান্ত। সকালবেলা চায়ের জন্য বুকের ভেতরটা টাস-টাস। চা না খেলে সিগারেট জমে না।

চ্যাঁ-চোঁ-চ্যাঁক-চ্যাঁক আওয়াজে দৃষ্টি ফিরিয়ে। স্ত্রীলোকটি দুধ দুইছে। গরুটি শান্তভাবে। মুখে জাবর, ডান উরুতে দুটি মাছি, সেই জায়গার চামড়াটা কুঁচকে-কুঁচকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়া দেখতে বেশ। স্ত্রীলোকটি এ কাজে বেশ নিপুণা। এই জন্যেই মেয়েদের আর এক নাম দুহিতা। অনেকদিন আমি এরকম কাছে থেকে দুধ দোয়া।

হাঁড়িটা প্রায় ভরো-ভরো। অনেকটা দুধ তো। এরা গরিব হলেও বেশ একটা ভালো গরু।

—আপলোগ ইতনা দুধ কেয়া করতা হ্যায়? বেচতা হ্যায়?

—হ্যাঁ বাবু, বিক্রি করি।

—কাঁহা?

—ছিপাদহে।

—ছিপাদহ কিতনা দূর হ্যায় হিয়াসে?

—লোকটি হাত তুলে বলল, কাছেই।

সে দেখাল দূরের এক 'ধূধূ'র দিকে। এদের 'কাছেই' মানে অন্তত দু-তিন মাইল। কিন্তু আর উপায় কি?

মধুর শব্দে দুধ দোয়া তখনও। হঠাৎ শেষ হল। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে শিশু

দুটিকে। শিশু দুটি সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে। স্ত্রীলোকটি একটা পোয়ামাপের কাঁসার গেলাস হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে ওদের একজন-একজন করে। বাচ্চা দুটি চোখের নিমেষে। স্ত্রীলোকটি তারপর এক গেলাস পুরুষমানুষটিকে। আমি খুবই অবাক হয়ে। এরকমভাবে কাঁচা দুধ খেতে কারুকে দেখিনি। তাও গেলাসটা কলসির মধ্যে ডুবিয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ের লেখকরা এ দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

পুরুষটি হঠাৎ আমাকে জিগ্যেস করল, বাবুজি, আপনি কি একটু দুধ খাবেন? লাল রঙের গরু, এর দুধ খেলে খুব তাগত হয়।

আমি শশব্যস্তে বললাম, নেহি, নেহি, বহুত মেহেরবানী আপকা—

লোকটি তখন খুবই পেড়াপেড়ি। স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে আর এক গেলাস। আমি বারবার আপত্তি জানিয়েও।

একটা খাটিয়া আনা হল আমার জন্য। আমি গেলাসটা হাতে করে একটুক্ষণ। বলতে পারতাম, দুধটা যদি একটু গরম করে। সঙ্কোচ হল। এরা যদি কাঁচা দুধ খেতে পারে তাহলে আমিই বা।

আস্তে-আস্তে চুমুক। প্রথমে একটু বুনো-বুনো গন্ধ। কিংবা কাল্পনিক। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লেগে যায়। স্ত্রীলোকটি ব্যগ্রভাবে আমাকে।

স্ত্রীলোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক কিংবা পঁচিশ-ছাব্বিশও ঠিক বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যটি দৃঢ় কিন্তু মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম। চোখ দুটিতে বিস্ময় এবং স্নেহ এখনও তবু।

হঠাৎ আমার চোখে জল এসে যায়। এক অভূতপূর্ব মমতাময় ভালো লাগার স্পর্শ। কোথায় একটা অচেনা গ্রামে, একটা অচেনা বাড়িতে, জীবনে প্রথম টাটকা কাঁচা গরুর দুধ ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে। এদের অত আন্তরিকতা। এতটা কি আমার পাওনা ছিল? আমি কার জন্য কি করেছি? যদি কখনও অন্য কারুর জন্য। যদি কখনও অনুরাধাকে।

অনুরাধার কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে টনটন। আর কি কখনও দেখা? ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে সে কোথায় হারিয়ে। কেন তাকে আমি এমনভাবে হারাতে। সে যে আমার খুবই আপন।

দুধটার জন্য পয়সা দেব কিনা এই নিয়ে মনের মধ্যে। ভারতীয় আতিথ্য বলে একটা কথা আছে। দারিদ্র্য তার চেয়ে আরও অনেক বেশি ভারতীয়। একটুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর বলি, এক অনজানে মেহমান কে লিয়ে আপলোগ কা বহুতসা দুধ খরচা হো গিয়া—

আমার হিন্দি শুনে এরা হাসে না—ভাষা নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কথাটা সবটা বুঝতে না পারলে দু-এক পলক মুখের দিকে।

লোকটি একটু পরে জানালো যে, ওর ভাবী তো এক্ষুনি ছিপাদহে যাবে দুধ বেচতে, সুতরাং আমিও তার সঙ্গে। আমাকে রাস্তা চিনিয়ে।

এতক্ষণ বাদে আমি ওর নামটা। আশ্চর্য, ওর নাম সাহেবরাম। দু-তিনবার শুনেও বুঝতে পারিনি। সাহেবরাম? কী আশ্চর্য মিলন। এখনও ঠাকুর দেবতার নামেই এদের নাম রাখার রেওয়াজ। এর একসঙ্গে দুই দেবতা।

আমি তার মাটি-রঙা পিঠে আমার একটা হাত। কি ঠান্ডা! এদের গা এত ঠান্ডা হয় কেন?

স্ত্রীলোকটি আঁচলটা গাছকোমর। হাঁড়ির মাথায় একটা পাতলা কাপড় বেঁধে বলল, চলুন।

সে মাঠের মাঝখান দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ চেনে। আমি তার পিছু-পিছু। দুজনেই নিঃশব্দ। সে এত দ্রুত যায় যে আমাকেও হনহন করে।

একটা ছোট্ট ডোবার পাশে দুটি তালগাছ। অল্প ছিরছিরে জল। তালগাছ দুটি যেন দুই প্রহরী। কিংবা বন্ধু। চিরকাল জল দেখলেই আমার। একবার দৌড়ে গিয়ে পা ডুবিয়ে।

—মায়ি, একটু দাঁড়াবে?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াল ঠিকই, ভুরুতে বিরক্তির রেখা। হয়তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে দুধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এল। এ তো দুধে জল মেশাল না? আমার সামনেই তো সবকিছু। দুধে জল মেশাতে জানে না। শিখিয়ে দেব? এই ডোবার জলই বা মন্দ কি? হাসি পেল। এসব বাঙালি-চিন্তা।

ডোবার জলে পা ছোঁয়াতেই খুব আরাম। কাছেই দু-তিনটে ব্যাং। যেন এদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, দেখা না করে চলে গেলে খুবই। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে। পা দিয়ে জল ছলচ্ছল শিশুর মতন। অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটানো যেত। তবু উঠে আসতে।

আবার যাত্রা। এর মধ্যেই মাইল খানেক অন্তত। সারাটা পথ কোনও কথা না বলে কি?

—মায়ি, তুমি রোজ দুধ নিয়ে যাও?

—জি।

—কখন ফেরো?

—তিন বাড়িতে দুধ মেপে দিয়ে ফিরে আসি।

—যেদিন বৃষ্টি হয়? সকালে যদি বৃষ্টি হয়?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি ওকে অকারণে ধাঁধা জিগ্যেস করছি। ছেলেমানুষি।

কিন্তু আকাশ হঠাৎ কালো। কোথা থেকে মেঘ। যদি হঠাৎ এক্ষুনি বৃষ্টি নামে, আমরা দু'জন কোথায়? কাছাকাছি আর বড় গাছও নেই। সেই ডোবাটার কাছেই ফিরে যেতে। দুজনে দুটো তালগাছে হেলান দিয়ে। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি এল না। মাঠ ভেঙে আমরা বড় রাস্তায়। অদূরে কিছু-কিছু বাড়িঘর। এবং চায়ের দোকান। আর আমি চা না খেয়ে এক পা-ও। আমার পথপ্রদর্শিকাকে কি এক কাপ চা?

মায়ি, চা খাবে?

এবার মুখটা পাশের দিকে ফিরিয়ে সে অদ্ভুত লজ্জার সঙ্গে হাসি চেপে। মুহূর্তে সে খুকির মতন। এই মুখখানা যদি কোনও ছবিতে।.

ফুলুরি ভাজছে। চায়ের সঙ্গে-সঙ্গে। এখন যদি আমার পথের সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে চা ও বিশ্রম্ভালাপ। জানি, তা হয় না। শহরে জন্মায়নি বলেই এই নারী ইহজীবনে কোনও চায়ের দোকানে।

আমার কাছ থেকে কোনওরকম বিদায় না নিয়েই সে হনহনিয়ে। এটাই স্বাভাবিক। আমি ওর নাম জিগ্যেস করিনি। এই নাম না জানা রমণীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু সারা জীবনের জন্য।

পরপর দু-গেলাস চা। ছোট-ছোট গেলাস, ঠিক জমে না। ফুলুরিও বিস্বাদ, সম্ভবত তিল তেলে। দোকানে আমিই একমাত্র। উনুনে বড্ড ধোঁয়া।

সরকারি বিশ্রাম ভবনের সন্ধান জেনে উঠে দাঁড়িয়ে। বেশি দূর নয়। এখানে অনেকেই কাঠের কারবারি। কয়েকটা বেশ ভালো বাড়ি। সার-সার ট্রাক বিশ্রামরত। শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধ। আমার ক্লান্ত পা।

বাংলোটা একদম উঁচুতে। কাঠের গেটের পরে খানিকটা বাগান। তারপর চওড়া বারান্দা, সেখানে পরিতোষ আর তার স্ত্রী, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। চমকে দিতে হবে। নিঃশব্দে কাঠের গেট খুলে আমি গুটিগুটি।

হয়তো পিঠে কিল মেরেই বসতাম, তার আগেই। পরিতোষ তো নয়। অচেনা স্বামী-স্ত্রী। কোনও সাড়া শব্দ না করে এতটা কাছে চলে আসা খুবই। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ।

লোকটি কোনও প্রশ্ন করার আগেই আমি পরিতোষের নাম।

লোকটি স্নায়ু শিথিল করে ইংরেজিতে জানাল, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ব্যানার্জি তো একটু আগেই...

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পরিতোষের সম্পর্কে। আজ সকালেই ওরা গেছে বেতলা। সেখানেও থাকতে পারে, অথবা। আমি কি এখন পরিতোষের খোঁজে বেতলায়? বেতলায় চমৎকার জঙ্গল। জিপ নিয়ে ঘুরলে হরিণের পাল, কখনও বাঘ কিংবা হাতিও দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেখানেও গিয়ে দেখি ইতিমধ্যে আবার? এখন এইভাবেই পরিতোষকে খুঁজতে-খুঁজতে আমার সারা জীবন।

একটু হাসি পায়। ঠিক যেন গেছোবাবা। আমি যাই উত্তরে তো সে দক্ষিণে। আমি টালা গেলে সে চেতলায়। তা ছাড়া আমি পরিতোষকে এত খুঁজছিই বা কেন? কলকাতা থেকে বেরুবার সময় তো।

মনস্থির করে ফেলি। এবার ফেরার পালা।

অচেনা দম্পতি ভদ্রতা-মেশানো চা আমার জন্য। আমি প্রত্যাখ্যান। আমি ওঁদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন আমায় এখনই পরিতোষের খোঁজে।

বাংলো ছেড়ে হেঁটে এসে রাস্তার ওপরে। আর ট্রাক নয়। এদিক দিয়ে বাস যায় জানি। একঘণ্টা দু-ঘণ্টা পর পর।

একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ। ঘড়ি নেই, কতটা সময় কাটলো জানি না। কটা সিগারেট খরচ হল সেই অনুযায়ী সময়। এক প্যাকেটে যদি দু-ঘণ্টা চলে তাহলে সেই হিসেবে সাতটা সিগারেট প্রায় দেড় ঘণ্টা। একা থাকলে অবশ্য একটু বেশি ঘনঘন।

যেন আমার জীবনের দেড় ঘণ্টা আয়ু ছিপাদহের এক গাছতলায় খরচ করার কথা ছিল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ঝগড়ায় মত্ত এক ঝাঁক ছাতারে পাখি। এই দৃশ্যটিও নির্দিষ্ট আমারই জন্য। পরপর তিনটি নারীচরিত্র বর্জিত মোটরগাড়ির ঠিক এই সময়েই এই রাস্তা দিয়েই।

একটু-একটু বিরক্তির ভাব আসতেই আমি তাড়াতাড়ি সতর্ক। না বিরক্ত হলে চলবে না তো। পদ্মপাতায় টলটল করছে জল, কখন গড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, এর মধ্যে আবার বিরক্তির সময় নষ্ট? তার বদলে গুনগুন করে একটা গান। ধারে কাছে কেউ না থাকলেই আমি ভরসা করে একটু গান গাইতে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি কিশোরী মেয়ের অভিমানী মুখ। কেন এই মুখটা ভুলতে পারছি না? ট্রেনে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য। এরকম তো আরও কতবার। অনুরাধা, শুধু এই নামটা জানি, আর ওর সম্পর্কে কিছুই না। হলুদ ফ্রক পরে শুয়েছিল বাঙ্কের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জলের ধারা। ওর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হওয়ার কথাই নয়। তবু যদি এখনও। হয়তো এখনও।

বহুদূরে বাসের চেহারা। আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে। তখন চোখে পড়ল, খুব কাছেই, উলটো দিক থেকে হেঁটে আসছে কলসি মাথায় সেই স্ত্রীলোকটি। সাহেবরামের ভাবী। দুধ বিক্রি শেষ। দু-একবার আমার দিকে চোখ। কোনও কথা নেই।

আমি চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলাম, কি মায়ি, ঘর যা রহা হ্যায়?

যেন কতকালের চেনা। সে নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে। আমি তার গাম্ভীর্য ভাঙার চেষ্টা করি। হালকা গলায় আবার বলি, সব দুধ খতম? থোড়া সে দেওনা হামকো?

সে এবারও কথা বলে না। তবে হাসে। একটা হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, নেই, নেই।

ওর সঙ্গে ওদের গ্রামে আবার ফিরে গেলে কেমন হয়? থেকে যাব সাহেবরামদের বাড়িতে। খাটব সবজি খেতে। সকালবেলা কাঁচা দুধ। বিকেলে মহুয়া। একটা ইস্কুল খুলে মাস্টারবাবু হয়ে

বাকি জীবনটা?

বাস এসে ওকে আড়াল করে দাঁড়ায়। আমি আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায়। এই গ্রামে তিন দিনের বেশি চারদিন থাকতে হলেই পাগল হয়ে। ওসব কল্পনাতেই।

আঃ, বাসটা কি এইসময় একটু খালি থাকতে পারত না? একটা বসবার জায়গা? গিসগিসে ভিড়। এত লোক সকালে উঠেই কোথায় যায়? আমি দেড়ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে তীব্র মানুষ-মানুষ গন্ধ। যদি রাক্ষস হতাম, সবক'টাকে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই একজোড়া বরবধূ। বউটি বসবার জায়গা পেয়েছে, বর দাঁড়িয়ে। বরের কপালে তখনও চন্দনের ফোঁটা। যেন বাসরশয্যা থেকে সোজা উঠে এসে। দৃশ্যটার মধ্যে খানিকটা যেন ট্যাজিক সুর মেশা। নতুন বউয়ের মুখটা অবিকল নতুন বউয়ের মতন। হয়তো পরশু দিন পর্যন্ত ও ছিল কুলি-রমণী, আবার কাল পরশু থেকে। মাঝখানে এই একটা দুটো দিন ওর মুখটা একেবারে আলাদা। ওদের জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ অর্থাৎ অন্তত একটা টাঙ্গা যদি। শুধু আজকের জন্য। আজ ওদের খানিকটা আলাদা সম্মান। তবু কেন বাসে? হয়তো দূরত্ব আরও বেশি।

ডাল্টনগঞ্জ আসতেই নেমে। এখান থেকে আবার ট্রেন। বেশ গরম। একবার স্নান করতে পারলে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা কলে দুজন লোক। আমি লোকজনের চোখের সামনে কিছুতেই।

চট করে পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে? স্বামীনাথনরা যেরকম সহৃদয়, আমাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই খুব খাতির যত্ন। অনায়াসে ওখানে স্নানটান করে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে।

সেদিকে পা বাড়িয়েও ছিলাম। আবার থমকে। এখন দুপুর! স্বামীনাথন নিশ্চয়ই অফিসে। দুপুরবেলা একা পদ্মা। শরীরে আলতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে খেলে। হয়তো মেয়েটি খুবই ভালো, সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, শুধু-শুধু আমার লোভ। নির্জন দুপুরে একটি ভালো মেয়েকেও আমি।

ফিরে এলাম। কয়েক মিনিট বাদে আবার। মনটা চঞ্চল হয়ে অবাধ্য। গেলে ক্ষতি কি? মেয়েটি বড্ড সুন্দর। শুধু চোখে দেখতেও। কিন্তু তা হয় না। চোখ অস্থির গর্জন করবে। শরীর যেন চুম্বক, কিছুতেই কাছাকাছি না এসে।

অতিকষ্টে নিজেকে দমক করতেই। একটা যেন দারুণ বীরত্ব। আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে যাওয়ার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেখানেও।

স্নান হল না। একটা দোকানে খেয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে লম্বা ঘুম।

ডেহরি-অন-শোন পৌঁছোতে-পৌঁছোতে রাত। এক্ষুনি বম্বে মেল। টিকিট কেটে উঠলেই সোজা কলকাতা। এবারের মতন ভ্রমণ শেষ।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ। আমাকে অন্য কোথায় যেন। না গিয়ে উপায়ে নেই, যেতে হবেই-হবেই, হবেই-হবেই। কথা দেওয়া আছে। কার কাছে? নিজের কাছেই, আবার কার?

একটা শেয়ারের ট্যাক্সি তখনই ঔরঙ্গাবাদের দিকে। উঠে জায়গা করে। চোখ খর করে সবসময় বাইরে। পেরিয়ে না যায়। জায়গাটা ঠিক যদি চিনতে না পারি। না চিনলে আর আপসোসের। সুলেমানপুরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রোখকে, রোখকে।

কেউ জানে না কেন আমি সুলেমানপুরে। অন্য লোকরাও অবাক। একজন জিগ্যেস করলো, এখানে কার কাছে যাবেন? উত্তর দিলাম না। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ট্যাক্সিটা দূরে মিলিয়ে। আর কোনও উপায় নেই। এবার আমি একা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এ জায়গায় আগে কখনও আমি। কারুকে চিনি না। শুধু একটা নাম

জানি, অনুরাধা। এই নামটা শুধু সম্বল করে কোথায় যাবো, কোথায়?

তবু এখানেই।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে।

এই শহরে এখন কে আমাকে আশ্রয়? কোথাও কোনও হোটেল কিংবা। রাত্তিরটা অন্তত।

যে-কোনও একটা বাড়িতে গিয়ে কি? যদি বলি, আমি পথিক, যদি আমাকে একটু। সেসব দিন এখন আর নেই। অচেনা লোককে কেউ অতিথি করে না। শুধু তারাই আশ্রয় দেয় যারা পয়সা নেয়। রূপকথার গল্পের মতন কোনও বাড়ির জানলা থেকে এখন কেউ যদি আমাকে হাতছানি দিয়ে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার দু-ধারে সারি-সারি বন্ধ দোকান। সম্ভবত বাজার। একটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীণ আলো। টুকরো-টুকরো কথাবার্তা।

—শুনছেন! এই যে, শুনছেন!

প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। কথাবার্তা থেমে। আমি আবার টিনের দরজায় ঢকঢক শব্দ।

—কে?

একটু খুলবেন।

দরজা সামান্য ফাঁক। এটা একটা ভাতের হোটেল। টেবিলের ওপর চেয়ারগুলো ওলটানো। এক কোণে নিজেদের লোকেরা খাওয়ার-টাওয়ার নিয়ে—

—কী চাই?

—কিছু খাওয়ার পাওয়া যাবে?

—না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

—শুনুন না, একটু খুলুন—

একটি মহিষাকৃতি লোক এগিয়ে এসে বলল, কি বলছেন কী?

সেই বিরাট লোকটির সামনে আমি প্রায় চুপসে। কোনওরকমে মিনমিন করে বললাম, আমি একটু থাকা আর খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলাম।

—কোথা থেকে আসছেন?

—এমনিই ঘুরতে-ঘুরতে। এখানে আর কোনও হোটেল নেই?

—না, ঔরঙ্গাবাদে চলে যান।

—সে তো অনেক দূর। আপনার এখানে একটু থাকার জায়গা।

লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব ভালোভাবে। সন্দেহাকুল চোখ। অধিকরাত্রে অজ্ঞাতকুলশীল।

—এখানে কী জন্য এসেছেন?

চট করে উত্তর দিতে পারি না। সম্বল মাত্র একটি নাম। অনুরাধা বসুমল্লিক।

একটি কিশোরীর নাম করে কি কোনও খোঁজ?

—এদিকে জমির খোঁজে এসেছিলাম।

—জমি?

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম এদিকে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাক্সি ব্রেকডাউন হয়েছিল, পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখলে কি জমি-কেনা মানুষ বলে? তবু যদি ওরা ভাবে আমার সঙ্গে অনেক টাকা। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি আবার বলি, জমি কিনে একটা ফ্যাক্টরি হবে, আমার মামার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

—জাঠমলের কাছে খোঁজ করুন।

—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় থাকা যায়? আপনার হোটেলে ঘর নেই?

—এটা থাকার হোটেল নয়, শুধু খাওয়ার।

দুজন অল্পবয়েসি বেয়ারাও বাইরে এসে। একজন বলল, ডাকবাংলোতে যান।

—কত দূরে?

—দু-আড়াই মাইল।

—এত রাত্রে সেখানে যাব কী করে? গিয়েও যদি জায়গা না পাই? আপনার ওই টেবিল দুটোর ওপরে যদি শুয়ে থাকি?

ভবিষ্যৎ ফ্যাকটরি মালিকের ভাগ্নের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাশা করা যায় কি না, ওরা সেটা ঠিক বুঝতে। এ ওর মুখের দিকে। দীর্ঘকায় লোকটি বলল, ওটার ওপরে এই ছেলেরা শোয়।

—আর কোনও জায়গা নেই? যদি একটু সাহায্য করেন।

ওরা নীরব। আমি যেন বেশি বাড়াবাড়ি। সামান্য রাত্রে ঘুমোবার জন্য! বৃষ্টি নেই, মাঠে-ঘাটে গাছতলাতেই তো। আমার তো নেই বাটপাড়ের ভয়! আসলে হয়তো, এই রিকেটি হোটেলের নড়বড়ে কাঠের টেবিলে শোওয়ার জন্যই আমার লোভ। ওই জায়গাটাই আমার চাই। এরকম অসঙ্গত লোভ আমার মাঝে-মাঝেই। যেন ওই জায়গাটা না পেলে কিছুতেই আজ আমার ঘুম।

ছেলে দুটি স্থানচ্যুত হতে চায় না। একজন বলল, পদমজির বাড়িতে ইরিগেশানের বাবুরা ছিল কিছুদিন।

—দ্যাখ তো সেখানে ঘর খালি আছে কিনা।

একটি ছেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে। পদে-পদে হোঁচট খাওয়ার ভয়। কোথা থেকে কোথায়। কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আর আজউ সুখের বিছানা ছেড়ে এই মাঠের মধ্যে। এই অনিশ্চয়তায় আমার দারুণ আরাম।

একটা লম্বা স্কুলবাড়ির মতন। অনেক ডাকাডাকি করে পদমজিকে। টকটকে লাল চোখ। আশু মুখুজ্যের মতন গোঁফ। বোঝা যায় সন্ধে থেকেই গাঁজা।

ছোট ছেলেটি আমার সমস্যা বুঝিয়ে বলায় সে কোনওরকম বিস্ময় দেখায় না। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, তিনরূপিয়া চার আনা রোজ।

রেট যথেষ্ট বেশি। সাধারণ হোটেলেই চার টাকা। তবু দরাদরি না করে একটা দশ টাকার নোট। এবং কিছু চিন্তা না করে বললাম, তিন রোজকা।

ঘরটা বিস্ময়কর রকমের পরিষ্কার। ধপধপে সাদা দেয়াল, মাঝখানে একটি খাটিয়া। সব মিলিয়ে বেশ একটা শুকনো টাটকা ভাব। এতটা আশা করিনি।

ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে আমি অবিলম্বে শুয়ে। আজ রাতের মতন পেটে কিল মেরে।

কোথায় কখন থাকি, তার ঠিক নেই। তবু এই ঘরটা কেন তিন দিনের জন্য? যেন এখানে একটা চুম্বক আছে। আমাকে টেনে রাখছে।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট গোলমাল। গাঁজাখোরদের হল্লা। কখনও একটি স্ত্রীলোকের সরু কণ্ঠস্বর। তবু আমি না উঠে। অচেনা জায়গায় বেশি কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।

সকালে উঠেই চায়ের জন্য। এখানে চা পাওয়া যায় না। যেতে হবে বাজারে। একবারেই বেরিয়ে পড়া যাক! মুখ-টুক ধুয়ে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে।

চা খাওয়ার পর আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলি। শুধু একটা নাম। ওতে কোনও লাভ নেই। যুবকটিরও পদবি যদি। সুতরাং সারা শহরটা টহল মেরে। যদি হঠাৎ।

শহরটা ছোট। বাজার আর কিছু খুচরো দোকান, ছড়ানো-ছেটানো বাড়ি। একটা তিরতিরে নদী। রেলস্টেশন ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

মন্থরভাবে প্রতিটি রাস্তা দিয়ে। প্রতিটি বাড়ির দিকে সতর্ক চোখ। দরজার দিকে, জানলার দিকে। বাড়ির পেছনের উঠোনে। যে কেউ আমাকে ভাবতে পারে পুলিশের লোক।

কেন আমি এরকম করছি? কেন ওই মেয়েটিকে? নিজেই জানি না। মেয়েটিকে খুঁজে পেলেই বা কী লাভ? জানি না। আমি তাকে কী বলব? জানি না। হঠাৎ কেউ আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে কী উত্তর? জানি না।

অন্তত তিনবার গোটা শহরটা চষে ফেলে। এখানে বাঙালিই প্রায় চোখে পড়ে না। এমন হতে পারে ওরা এর মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে। কিংবা এই রেলস্টেশনে নেমে দূরের কোনও গ্রামে। তাহলে আমি এখানে কী করছি? তিন দিনের জন্য ঘর ভাড়া।

একটা বাড়ির দিকে আমার বারবার চোখ। পুরোনো বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালে আইভি লতা। বাড়িটার গেটে বাংলা অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী কুঠী'। এরা বাঙালি। সুতরাং এখান থেকে কোনওরকম খবর হয়তো। কিন্তু চোধুরীদের সঙ্গে বসুমল্লিকের কি আত্মীয়তা? জানি না। একজন প্রৌঢ় লোককে সে বাড়ির সামনে কয়েকবার। বেশ রাশভারী চেহারা। বাড়িটার পেছনে ঘন ঘন মুরগির ডাক। বেশ কয়েকটা মুরগি আছে বোধহয়।

প্রৌঢ় লোকটিকে জিগ্যেস করলে? কিন্তু কী জিগ্যেস? একটি মেয়ের নাম? সে আমার কে হয়? যদি আমাকে লম্পট হিসেবে? মহা মুশকিল দেখছি।

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরে বাজারের দোকানে। খেয়ে পদমজির ঘরে ঘুম। কিন্তু গাঢ় ঘুম হয় না। অনেকরকম স্বপ্ন, এলোমেলো। একবার অনুরাধাকেও। সেই দুঃখ ও রাগ মেশানো মুখ। অনুরাধার সঙ্গে দেখা হলেও ও কী আমাকে চিনতে? কী জানি, ভয়। কেনই বা চিনবে? আমি ওর কে? এমনকি ভালো মতন আলাপ তো?

বিকেলে আবার। জানি পণ্ডশ্রম, তবুও নেশার মতন। পৃথিবীতে আমার এখন একমাত্র কাজ অনুরাধা বসুমল্লিকে খুঁজে বার করা। না হয় শুধু একবার তাকে দেখেই। হয়তো সে এখানে নেই। তবু এখানে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সেই জন্যই শহরটা চুম্বকের মতো।

ঠিক সন্ধের আগে আমি যুবকটিকে হঠাৎ। সে একটা ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছিল। আমি তাকে এক পলক দেখেই। কিন্তু সেও কি আমাকে? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে।

আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে দুমদুম যেন বাইরের লোকও শুনতে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে নিরাশ হওয়ার ঠিক পরেই এই আশাতীত। এত বেশি আনন্দ যে অনেকটা ভয়ের মতন। দারুণ ভয় ও দারুণ আনন্দের প্রতিক্রিয়া যেন একই রকম।

ডাক্তারখানায় কেন? কার অসুখ? অনুরাধার? তা হলে সে বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই। কিছুতেই দেখা হবে না। আমি যদি ডাক্তার হতাম, ইস!

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যুবকটি আবার একটি দোকানে। আমি খানিকটা দূরে। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। যেন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা। সিগারেট ধরিয়ে বারবার আড়চোখে।

যুবকটি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই, আমিও তার পেছন-পেছন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। হয়তো যুবকটি আমাকে দেখলেও। ট্রেনের কামরার সঙ্গীদের কে মনে রাখে। আমি রেখেছি, আমি তো রাখবোই!

আসলে আমি সারাদিন খুবই বোকামি। একটি মেয়ের বদলে একটি ছেলেকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ। আমি যদি ছেলেটিকেই কোনও-না-কোনও দোকানে। কিংবা বাজারে। একটা ছেলে তো আর সারাদিন বাড়িতে। আসলে ছেলেটির কথা আগে আমার মনেই। সবসময় অনুরাধার মুখ।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে যুবকটি যে বাড়ির সামনে আসে, সেই বাড়ির কাছ দিয়ে আমি আগে অন্তত পাঁচ-ছ'বার। এই তো সেই বাড়িটা। সেই চৌধুরী কুঠী। কুকুরের মতন শুঁকে-শুঁকে

আমি তাহলে ঠিক বাড়িতেই। ইস, একটা বেলা শুধু-শুধু।

বাড়িটা হলুদ রঙের একতলা। সামনে ছোট বাগান। বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি, মোটামোটা থাম। গেটটা ভাঙা। রাত্তিরে যে-কোনও চোর অনায়াসেই। বাড়িটার চারপাশে অবশ্য দেওয়াল।

সামনেই রাস্তার ওপাশে মাঠটা ঢালু হয়ে। একটা বিরাট তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ওপাশে হেলান দিয়ে একজন মানুষ যদি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার পা ব্যথা করে। অস্বস্তি ও লজ্জা।

অন্ধকারে কোনও দৃশ্য নেই। চোখের সামনে শুধু পাতলা বা গাঢ়। মাঠের দিকে চেয়ে থাকার কোনও মানে। শুধু বাড়িটাতেই আমার। বাড়িটা নিস্তব্ধ এবং বাইরের দিকে আলো নেভানো। কতক্ষণ আর কতক্ষণ এইখানে। এবং কীভাবে? কীভাবে আমি অনুরাধাকে? কোনও উপায়ই তো চোখে। অস্বস্তিতে শরীরটা কেন কাঁপার মতন। বুকের মধ্যে ব্যথার মতন, গলার কাছে বাষ্পের মতন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য আমি আরও বেপরোয়া হয়ে। সন্তর্পণে চোরের মতন গেট খুলে বাগান পেরিয়ে। সারা বাড়ি শব্দহীন। এ বাড়ির লোকেরা কি, সন্ধেবেলাতেও কেউ বেড়াতে বেরোয় না?

রীতিমত অন্ধকার, তার মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির পেছন দিকে। পায়ে কিছু একটা লাগলে আমি নিজেই চমকে। যদি ধরা পড়ি তা হলে কি? আমি অনুরাধার গোপনীয়তার ভাগ নিতে।

দাঁড়িয়ে থাকি, নিশ্বাসও প্রায় বন্ধ। সত্যিই এখন গা কাঁপছে। ফিরে যাব, ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মতো কাজ। আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশি সাহস। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিরাট শব্দ করে দরজা খুলে একজন কেউ বাইরে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ কী কোনওরকম সন্দেহ?

ভারী গলায় একজন বলল, এই, দুটো চেয়ার দিয়ে যা তো বাইরে! জয়ন্ত, জয়ন্ত, এদিকে এসো।

—আসছি কাকাবাবু!

—এখানে বসা যাক। বেশ হাওয়া দিয়েছে!

আমি প্রায় মড়ার মতন। লোক দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে। এখন আমি কী করে? বাড়িটার চারদিকে পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে যদি শব্দ-টব্দ।

বাড়ির দেওয়ালে হাত দিলে ঠান্ডা লাগে। পুরোনো দিনের নোনাধরা দেওয়াল। ইচ্ছে করে গালটা ছোঁয়াই এবং কাঁদি। এরকম বোকামি কি কেউ? যদি এ বাড়িতে কুকুর?

লোক দুটি বাইরে বসে সশব্দে গল্প। অপরজন জয়ন্তের কাকা। তারই বাড়ি বোধহয়। তিনি জয়ন্তকে মুরগিপালন বিষয়ে কিছু। অনেকদিন পোলট্রি করেছেন মনে হয়। জয়ন্তর হুঁ হ্যাঁ শুনলে বোঝা যায় তার কোনওই আগ্রহ।

যাক, তা হলে এখনও সন্দেহ করেনি কিছু। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ওরা আবার ভেতরে। সে কতক্ষণে কে জানে।

খানিকটা দূরে একটা জানলায় আলো। আমি পা টিপে-টিপে সেই দিকে। জানলার নিচের দিকটা বন্ধ, ওপরের দিকটা খোলা। আমার মাথার চেয়েও উঁচুতে। ডিঙি মেরেও কিছুতেই। অথবা যদি দেওয়াল বেয়ে। না, না, তাতে ঝুঁকি অনেক বেশি। একটা ইট জোগাড় করতে পারলেও।

ভাঙা দেওয়ালে অনেক আলগা ইট। অন্ধকারের মধ্যে খুব সাবধানে একটা। তারপর সেই ইটের ওপর পা দিয়ে।

এক পলক দেখেই নিচু করে নিই মাথা। খাটের ওপর সেই মেয়েটি। অনুরাধা। সত্যি? না স্বপ্ন? খুব কাছে গিয়ে, চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে। তারপরেই আবার সরে। চোখ বুজে একটুক্ষণ হৃদয়ঙ্গম। হ্যাঁ, সত্যিই তো অনুরাধা। অসুস্থ কিনা জানি না। বুকের ওপর বই খোলা। আজ ফ্রক

নয়, শাড়ি। কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! যেন শাড়িতে মোড়া এক গুচ্ছ চাঁপা ফুল। ওই এক ঝলকেই আমি দেখেছি তার কোমর। বিলিতি ছবির মতন। যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সুন্দর অনুরাধা।

এখানে আমি চোরের মতন। সত্যিই কি চোর? কিছু তো নিতে আসিনি। আমাকে রূপচোর যদি বলে। সেটা কি দোষের? জানি না। ওকে আর একবার দেখার জন্য আমার বুকের মধ্যে সাংঘাতিক।

আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা ছিল। হঠাৎ এই সময় তা ভেদ করে বেরিয়ে এল লক্ষ্মীছাড়া চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হতেই আমার ভয়। এতক্ষণ হাত-পাগুলো অন্ধকারের মধ্যে। এখন নিজেকেই নিজে দেখতে পাই।

কোথায় লুকোব? যদিও এখনও আর কেউ। একটা ব্যাপার বুঝে গেছি, এ বাড়িতে কুকুর-টুকুর অন্তত। উঃ, যদি কুকুর থাকত, তাহলে এতক্ষণ আমাকে সাধারণ চোরের মতন।

অদূরে বারান্দায় লোকদুটি এখনও কথাবার্তায়। এখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। কী করে যে মুরগিপালন থেকে বিদ্যাসাগরমশাই প্রসঙ্গে? অ্যাট্রোশাস! জয়ন্তর কাকা বোঝাচ্ছেন, কার্মাটারে বিদ্যাসাগরমশাই সাঁওতালদের কাছ থেকে ভুট্টা কিনে আবার তাদেরই সেইগুলো খাওয়ার জন্য। সেই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে...উঃ। কী ভুল! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার কার্মাটারে। আমি চেঁচিয়ে ওনার ভুল শুধরে? তাহলে হয়েছে আর কি!

আরও কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালা জানলার ওপাশেই অনুরাধা। ওর সঙ্গে ও কোনও কথা। আমার অধিকার নেই। দেখার? আবার পা টিপে-টিপে জানলার কাছে। ইটের ওপর আঙুলের ভর দিয়ে। জানলার শিক ধরতে সাহস হয় না। দেওয়ালে।

অনুরাধার কি অসুখ? নীল শাড়ি, অনাবৃত বাহু, পায়ের দুটি পাতা, কোমরের কাছে খানিকটা নগ্ন। বুকে ঢেকে রাখা দুটি স্থলপদ্ম। আমি চোখ দিয়ে শুধু এই সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে কী বিষাদ। ট্রেনে আমি ওকে শয়ান অবস্থায় কাঁদতে। একটি কিশোরীর চাপা দুঃখের মতন এমন তীব্র, মধুর, স্পর্শকাতর আর কী আছে পৃথিবীতে? কিশোর বয়সে আমারও এরকম কতবার।

দারুণ লোভ হচ্ছে ওরসঙ্গে একটু কথা বলতে। জানি, তা সম্ভব নয়। তবু লোভ। জানলা দিয়ে ওর নাম ধরে? নিশ্চয়ই চমকে উঠে, ভয়ে পেয়ে। তা ছাড়া আমি ওর কে? ও আমার এত আপন।

নিশ্বাসও বন্ধ করে থাকি। যাতে কোনওরকম শব্দ। দেখে-দেখে আশ মেটে না। যদি একবার পাশ ফিরতো, তাহলে মুখখানা আরও ভালো করে। ওর মাথা জানলার দিকে। আঙুলগুলো সোনার মতন, ওই আঙুলে হাজারবার ঠোঁট বুলোলেও।

অনুরাধা বইয়ের একটা পাতা ওলটালো। অর্থাৎ জেগেই। তাহলে এখন কাঁদছে না। বই পড়তে-পড়তে এখনও প্রায়ই আমার চোখ দিয়ে জল। সে অন্যরকম কান্না।

পায়ের তলা থেকে ইটটা পিছলে। একটি বিশ্রী শব্দ। সঙ্গে-সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে বসে পড়ার জন্য। তারপরেই প্রায় উ করে চেঁচিয়ে। কোনওরকমে মুখ চেপে। খানিকটা কাঁটা তার, এমন খোঁচা মেরেছে উরুতে। আস্তে-আস্তে তারটা সরিয়ে।

অনুরাধা শব্দ শুনেছে। স্পষ্ট বুঝলাম খাট থেকে ও। তারপর জানলার কাছে। আলোর মাঝখানে ওর সিলুয়েট। সামনের দেওয়ালটা যেন স্ক্রিন। জানলার শিকগুলোর জন্য হঠাৎ মনে হয় কারাগারে এক বন্দিনী। ও কি চিৎকার করে? তা হলেই তো আমি। না, না, অনুরাধা, আমি চোর নই, আমি তোমার শত্রু নই, তুমি আমাকে।

একটুক্ষণ ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই। চুলগুলো খোলা। হাত দিয়ে কপালের চুল। চিৎকার করে উঠল না শেষ পর্যন্ত। আসলে রাত তো বেশি হয়নি, এই সময় কেউ সাধারণত চোরের কথা।

আবার সরে গেল জানলা থেকে। আর না। এবার আমাকে পালাতেই। আর বেশি ঝুঁকি নিলে।

কিন্তু কী করে? সামনে এখনও লোকদুটি। সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জয়ন্তর কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, রঘু, জল দিয়ে যা!

জল? সন্ধেবেলা জল? শুধু জল? তাহলে তো আরও কতক্ষণ কে জানে!

সুতরাং পাঁচিল টপকেই। খুব বেশি উঁচু নয়। আমার মাথাসমান। মাঝে-মাঝে আইভি লতা। শব্দ না করে কোনওক্রমে। খুব আস্তে-আস্তে অনুরাধার জানলার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পাঁচিলে ধরবার মতন কিছুই নেই।

এক হতে পারে, বাড়ির পেছন দিকে যদি কোনও খালি জায়গা। আমি পাঁচিলের গা-ঘেঁষে-ঘেঁষে। বাড়ির পেছন দিকেও প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে রান্নাঘর। ভাগ্যিস আমার উলটোদিকে। রান্নাঘরে আলো, সেখানেও এক রমণী। বারান্দায় দুটি জ্বলজ্বলে চোখ। ভয়ের কিছু নেই, একটা বেড়াল। বেড়াল তো আর মানুষ দেখলে কুকুরের মতন।

সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে। এবার পায়ের নিচে মাটি নরম। চটিজোড়া খুলে আগেই হাতে। এখন যদি এক দৌড়ে। সামনে দিকটা ফাঁকা মতন।

একটু দৌড়োতে গিয়েই আবার পায়ে কি যেন। নিচু হয়ে দেখলাম গোলাপ কাঁটা। এবং অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় একটা বাগান। অনেক গোলাপ ও বেলফুলের চারা। অনেক ফুল এখানে। গোলাপের রংও সাদা। কিংবা জ্যোৎস্নায় রং বদলেছে। একটা গন্ধের ঢেউ।

কাঁটাটা না বার করলে। হঠাৎ আমি কীরকম বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফুলের বাগানে এক চোর। তার পায়ে কাঁটা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ছে তার মাথায়। কোন নিয়তি আমাকে এখানে? আমি কি এর যোগ্য? আমার চোখ জ্বালা করে ওঠে। আমার জীবনে কত ব্যর্থতা, কত কিছুই পাইনি, তবু কেন এই অপরূপ কুসুমগন্ধ!

কাঁটাটা খানিকটা ভেঙে গিয়ে ভেতরে। একটা গোল মুখওয়ালা চাবি পাওয়া গেলে। যাই হোক, এখন আর কি করা! এইভাবে এখানে কতক্ষণ? একটা বেলফুলের গায়ে টোকা দিয়ে তার শিশির। একটা গোলাপের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কারুর ঠোঁট।

উঠে দাঁড়াতেই দেখি উলটোদিক থেকে একটা লোক। খালি গা, মালকোঁচা ধুতি?

—কে?

এক মুহূর্ত আমি চুপ করে। বাগানের ওপাশে কয়েকটা ছোট-ছোট ঘর। এক পাশে একটা বাঁশের গেট। খোলা। ওইখানে আমার মুক্তি।

—কে, কে ওখানে?

উত্তর না দিয়ে আমি সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়।

—আবার এসেছে। দাদাবাবু! দাদাবাবু!

লোকটাও দৌড়ে গিয়ে গেটের কাছে। আমি ডান দিকে বেঁকে। যদি আর কোনও ফাঁকা জায়গা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু! হারামজাদা আবার এসেছে!

আমাকে পালাতেই হবে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই একঝাঁক মুরগি একসঙ্গে কঁক-কঁক করে। চমকাবারও সময় নেই। ওদিকে জয়ন্ত আর তার কাকাও। হাতে লাঠি আছে কি?

—ধর-ধর ব্যাটাকে?

খালি গা লোকটা এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ডান্ডা। ওদিকে আর কোনও সুবিধে হবে

না। আমি একদম মার সহ্য করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

অতএব সামনের দিক দিয়েই আবার ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে। যত ইচ্ছে কাঁটা ফুটুক। পায়ের নিচে কি দু-একটা গাছের চারা? তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

জয়ন্ত আর কাকা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ধরার জন্য। খালি হাত। ওদের যে-কোনও একজনকে এক ধাক্কা দিয়ে। এখন বারান্দাতে অনুরাধাকে।

যেন একটা ইঁদুরকে তিনটে বিড়াল। আমি এদিক-ওদিক ছুটেও ফাঁক পাচ্ছি না। অনুরাধাই একটা দরজার খিল এনে জয়ন্তর দিকে।

আমি হঠাৎ বাগানের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আমাকে মারবেন না! আমি চোর নই!

সঙ্গে-সঙ্গে, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ওই কথাই আবার ইংরেজিতে। আমার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে।

জয়ন্তর কাকাই সাহস করে এগিয়ে এসে আমার কলারে হাত। খুব রাগী মুখ। যদি চড় মারে, সেইজন্য আমি সাবধান হয়ে।

—কে তুমি? এখানে কী করছ?

—বলছি, বলছি।

একটু হাঁপাচ্ছিলাম। দম নেওয়ার জন্য একটু সময়।

—দয়া করে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলুন!

—কে তুমি?

—ভেতরে গিয়ে বলব!

ভেতরে নয়, বারান্দা পর্যন্ত। রান্নাঘর থেকে মহিলাটি, ভেতর থেকে আরও একজন মহিলা। খালি-গা লোকটা ডান্ডা হাতে আমার পাশে। সে জানাল, এ তো সে হারামজাদা নয়।

আরও একজন নিয়মিত চোর আছে। ওদের বোঝানো দরকার, আমি জীবনে এই প্রথম। জয়ন্ত আমাকে চিনতে পারেনি। অনুরাধা এখনও আমার মুখটা ভালো করে। ও কি চিনতে পারবে না?

চটিজোড়া হাত থেকে নামিয়ে আমি জয়ন্তর কাকাকে খানিকটা হুকুমের সুরেই, জামাটা ছেড়ে দিন!

জয়ন্ত জিগ্যেস, কে আপনি?

তুমি থেকে আপনিতে। এটা নিশ্চয়ই ইংরেজির জন্য।

—দয়া করে জোরে কথা বলবেন না। আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে চলে যাব।

—ইচ্ছে করে? এটা কি বাজার?

—আপনারা বাঙালি বলেই।

—বাঙালি তো কি হয়েছে?

—বলছি, একটু সময় দিন!

জয়ন্তর কাকা আবার মারমুখী। ইনি আমার ইংরেজি শুনেও তেমন গুরুত্ব। ছেলে ছোকরাদের কেউই আজকাল। বয়সটাই অপরাধ।

—এখানে ঢুকেছো কেন?

—পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। একটু আগে আপনাদের বাড়ির দু-খানা বাড়ি আগে দোতলা বাড়ি থেকে একটা লোককে বেরুতে দেখেছি। আই বি'র লোক। আমাকে দেখলেই ধরবে। তবে আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমি চোর বা ডাকাত নই।

অনুরাধা এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে। মুখটা ভালো করে দেখে, ওঃ।

আমি সামান্য হেসে, হ্যাঁ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে, ট্রেনে! কবে! রমু, তুই একে চিনিস?

অনুরাধা ঘাড় নেড়ে এবং মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করে জানাল, না।

আমার শেষ আশাও। চিনতে পারল না? অথচ আমি যে ওকে সারা জীবনের মতন। আমার ভয় পাওয়ার কথা ছিল, তার বদলে অভিমান।

জয়ন্ত আমার দিকে ফিরতেই আমি হাত তুলে। তাকে আর কথা বলতে দিই না।

—এক গেলাস জল পেতে পারি? খুব তেষ্টা পেয়েছে।

জয়ন্তর কাকা বললেন, রঘু, জল এনে দে।

—আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি!

একথায় জয়ন্ত যেন একটু চমকে। আবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর জিগ্যেস, আপনার নাম কী?

—অশেষ মজুমদার।

পায়ে কাঁটাটার ব্যথা। একটু বসতে পারলে। রঘু জল এনে সামনে উঁচু করে। শুধু একটা ঘটি। গেলাস নেই, উঁচু করে আলগোছে খেতে হবে নাকি, ভিখিরিরা লোকের বাড়িতে এসে যেমনভাবে। সেই রকমভাবে খেতে গিয়ে জামা-টামা একেবারে ভিজিয়ে।

খুড়োমশাই এবার রঘুকে ধমক, গেলাস আনতে পারিসনি!

—ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে।

তবু খুব তৃষ্ণার্তের মতন অনুরাধার দিকে একবার। ওর চোখে চোখ। কী ওই চোখের গভীরে? মানুষ এখনও কি শিখেছে চোখের প্রকৃত ভাষা!

—আপনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন কেন?

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আই বি'র লোকটিকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে।

—কোন দিক দিয়ে এলেন।

আমি বাগানের দিকে গেটের দিকে আঙুল।

—ওদিকে তো রাস্তা নেই, ওদিকে তো মাঠ।

—পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে। সামনের বারান্দায় আপনারা বসেছিলেন তো।

—কতক্ষণ আগে?

—মিনিট পনেরো। পায়ে কাঁটা না ফুটলে এতক্ষণে হয়তো চলেই যেতাম।

কাঁটা ফোটার কথাটা কেউই গ্রাহ্য। জয়ন্ত আর তার কাকা চোখাচোখি। যেন আরও কিছু প্রশ্ন। মহিলাটি এবার সেটা।

—দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ছেলে পুলিশের ভয়ে পালাবে কেন?

কাকা বললেন, আমিও তো সেইটাই বুঝতে পারছি না।

কাকাকে উত্তর না দিয়েই আমি ভদ্রমহিলার দিকেই। তাঁর মুখে খানিকটা রাগ। আমি কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে, আপনি জানেন না। কেন ছেলেরা পালায়? এটা উনিশ শো সত্তর সাল, তাও একথা জিগ্যেস করছেন? কলকাতায় থাকলে আমি এতদিনে মরে যেতাম!

অনুরাধা এবার জিগ্যেস, আপনি তপন আচার্যকে চেনেন?

—চিনতাম। সে মারা গেছে।

—কবে?

মনে-মনে খানিকটা হিসেব। কবে কলকাতা থেকে ট্রেনে। তার আগের পরশুদিন।

—১৪ই মার্চ। ওর গুলি লেগেছিল।

অনুরাধার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে জ্বর। এর জন্যই ওষুধ আনত জয়ন্ত। অনুরাধা এক পায়ের আঙুল দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চেপে ধরেছে।

—তপন আমার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আমার বন্ধুর মতন ছিল। চমৎকার ছেলে। হিরের টুকরো ছেলে—

জয়ন্ত আমাকে থামিয়ে অনুরাধাকে, এই রমু, তুই ঘরে যা—।

—না, কেন?

—তোর এখনও গায়ে জ্বর, শুয়ে থাক, উঠে এসেছিস কেন?

—কিছু হবে না।

জয়ন্ত এবার আমাকে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন!

ওদের শোওয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে ঢুকে তারপর বসবার ঘরে। জয়ন্তর কাকা চাইছিলেন বাইরের বারান্দায়। আমি কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা স্পষ্ট।

অনুরাধা এ-ঘরে আসেনি। তিনজন তিনটে চেয়ারে। জয়ন্তর কাকা বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর গেলাসটা। গেলাসে শুধু জল নয়।

—আপনি চা খাবেন?

—খেতে পারি!

—তপন আচার্য আমাদের বিশেষ চেনা ছিল।

এখন আমার পক্ষে নীরব থাকাই। মনে-মনে আমি তপন আচার্যর চেহারাটা। হিরের টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাধার মতন মেয়ে যখন তার জন্য।

জয়ন্তর কাকা খানিকটা আফসোসের সঙ্গে, কেন যে ছেলেরা এরকম পাগলামি শুরু করেছে? এরকমভাবে কি দেশটা বদলানো যায়?

জয়ন্ত, আমারও মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল পথ। শুধু-শুধু কতকগুলো ভালো ভালো ছেলে।

আমি তখনও নীরব। আমি অপরাধী। আমি ওরকম পাগলামিও তো। আমাকে পুলিশ কখনও। তবু আমি আন্তরিকভাবে তপনের বন্ধু হয়ে যেতে।

শুধ চা নয়, সঙ্গে মিষ্টি। সেই রাগী মহিলাই।

জয়ন্ত আবার আমাকে, এখানে কোথায় উঠেছেন?

—কোথাও না।

—তাহলে হঠাৎ কীভাবে?

—ডেহরি-অন-শোনে ছিলাম। সেখানে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মনে হল, যদি কলকাতায় খবর চলে যায়। আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেছি। তারপরেই আই বি লোকটাকে রাস্তায়—ও যে আই বি'র লোক সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট, কলকাতায় দেখেছি, মুখ চেনা।

—আপনি এখানে থাকতে পারেন।

না, না, ওই লোকটা যখন এখানে আছে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

—আপনি তখন বললেন, ট্রেনে আগে দেখা হয়েছিল।

—হ্যাঁ। আপনারা যখন কলকাতা থেকে আসছিলেন, আমিও সেই কামরায় ছিলাম। আমি ওই মেয়েটিকে, বোধহয়, আপনার বোন, ওকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখেছিলাম।

একটা সত্যি কথা বললে অনেক মিথ্যের পাপই। কথাটা বলতে পেরে আমি অনেকটা হালকা। আমি অনুরাধাকে আগে দেখেছিলাম, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার। আমার যা পাওয়ার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি।

যেন পুরোনো পরিচয় বেরিয়ে পড়ল, তাই আড়ষ্টতা অনেকখানি। জলের গেলাস হাতে মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে। তিনি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, আপনি ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আরও যেন কারা।

—ওরা আমার কেউ নয়।

জয়ন্ত এবার ঈষৎ হাস্যে, রঘু আপনার মাথায় এক ঘা ডান্ডা বসালেই হয়েছিল আর কি!

জয়ন্তর কাকা ঠোঁট থেকে গেলাস নামিয়ে, এক ব্যাটা চোর যে এখানে প্রায়ই আসে। মুরগি চুরি করে।

—আমাকে দেখে কি মুরগিচোর।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ, না, না, তবে অন্ধকারের মধ্যে তো বোঝা যায় না।

আরও একটু পরে জয়ন্ত, আমার দিকে তাকিয়ে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন?

—জানি না।

যেন আমি চির-পলাতক। এটা আমার ছদ্মবেশ। তবু মনে-মনে আমি সেইরকমই। এক-একদিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়।

—কীসে যাবেন?

—ট্রেনে। রাত্তিরে কখন ট্রেন আছে?

জয়ন্তর কাকা ফতুয়ার পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার করে। অনেকদিন আমি এরকম ঘড়ি। কাকার বদলে ওঁর ঠাকুরদা হওয়া উচিত ছিল।

—একটা তো রাত্তির সাড়ে আটটায়। আর মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই! অবশ্য এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিনই লেট করে! আর একটা ট্রেন রাত তিনটেয়।

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। আর বেশিক্ষণ এদের আতিথেয়তা।

—আমি সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাব।

—কেন, রাতটা থেকে যান এখানে। বাড়ির মধ্যে কেউ আসবে না। এখানে এখনও অতটা—হয়নি। নিরিবিলি জায়গা।

—না, আমার পক্ষে রাত্রে যাওয়াই সুবিধে।

—বসুন, কিছু খাওয়ার-টাওয়ার খেয়ে যাবেন। বললাম তো, ট্রেনটা লেট করে।

—এই তো চা মিষ্টি খেলাম।

—ভাত হয়ে গেছে বোধহয়।

—না, ক্ষমা করুন। আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব! আমাকে যেতেই হবে।

—তপন দেড় মাস বাড়ি-ছাড়া ছিল। কখন কী যে খেয়েছে-না-খেয়েছে।

—আমি জানি, তপন মরার সময় একটুও কষ্ট পায়নি। এক সেকেন্ডেই।

—রমুর খুব বন্ধু ছিল। ওর মনে এমন ধাক্কা লেগেছে।

—আমি এখন যাই।

দরজার কাছে অনুরাধা। আগের কথাগুলো কি ও?

অনুরাধার হাতে খানিকটা তুলো ও একবাটি গরম জল। অন্য দু'জন অবাক চোখে। অনুরাধা আমাকে, আপনার পায়ের কাঁটাটা বেরিয়েছে?

আর কেউ মনে রাখেনি। শুধু অনুরাধাই।

—না, খানিকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে!

—কই দেখি? আমি বার করে দিচ্ছি।

আমি একেবারে আঁতকে। তা হয় কখনও? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

—না, না, তার কিছু দরকার নেই। পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

অনুরাধা ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখল একবার। তারপর আবার মুখ নিচু করে, অনেকটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা আপনি আপনি বেরোয় না।

অন্য পুরুষ দুজন একটু অস্বস্তিতে। ঠিক কী করা উচিত। তারপর জয়ন্তই উঠে এসে, দেখি, আমাকে দেখান তো, কোথায় কাঁটা ফুটেছে।

যাতে সেটা মিথ্যে না ভাবে, সেই জন্যই আমাকে সেটা তুলে। ঠিক মাঝখানে কাঁটার মুখটা।

জয়ন্তই সেটা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য। তাকে বাধা দিয়ে অনুরাধা, তুমি সরো ছোড়দা, আমি তুলে দিচ্ছি।

—রমু, তুই ঠান্ডার মধ্যে মাটিতে বসলি কেন? এই টুলটা নে না।

—কিছু হবে না। দেখি, আপনি ওই চেয়ারে বসুন।

এটা আমার প্রতি হুকুম। আমি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জয়ন্তর কাকা তখন। বসুন না। কাঁটাটা তুলে ফেলাই ভালো। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত ঘা হবে।

এবার আমাকে চেয়ারে বসতেই। আমার বাঁ-পা থেকে চটি খুলে। অনুরাধা তার নরম নবনী-হাতে আমার বিশ্রী ধুলো মাখা পায়ের পাতা তুলে নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে। গরম তুলো ভিজিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে-মুছতে জানতে চায়, ব্যথা লাগছে?

এই যদি ব্যথা হয়। তবে সুখ কার নাম?

তবু যদি চোরের চেয়েও বেশি আড়ষ্ট মুখ করে। এবার সত্যিই আমি কিছু চুরি। এ তো আমার পাওনা নয়।

পরম যত্নে অনুরাধা আমার পা-টা রেখেছে ওর কোলে। তারপর মুখ ঝুঁকিয়ে কাঁটাটা। আমি শুধু ওকে দেখতে এসেছিলাম। তার বদলে এই স্পর্শ। কী মসৃণ চিবুক, গভীর নদীর স্রোতের মতন কাঁধ, পিঠের ওপর লুটানো বর্ষার মেঘের মতন চুল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই কি অলীক? আমি কি সত্যিই এখানে। এই ঘরে?

কাঁটাটার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। অনুরাধার মুখ দেখলে মনে হয় ওই কাঁটা যদি আজ সারা রাতেও না ওঠেও, তা হলেও।

আমি আত্মা মানি না। তপন আচার্য কি একেবারেই হারিয়ে? কোথাও কি তার আত্মা? তপন, তুমি কি কোথাও আছো? তাহলে এসো, দেখে যাও, এই সেবা। এই সেবা আমার জন্য নয়। তপনের কোনও বন্ধুর জন্য, আসলে তপনের জন্য। অনুরাধা যার পা থেকে কাঁটা তুলছে, সে ঠিক তোমারই মতন আর একজন, আমি নয়, আমি ছদ্মবেশি।

—এই যে উঠেছে!

অনুরাধার মুখে যে হাসি ফুটেছে, তার তুলনা কীসে? ওই ওষ্ঠের ওই হাসিটুকু আমাকে চিরকালের জন্য দেবে? আমি ছবির মতো বাঁধিয়ে।

ওর চোখে চোখ রেখে আমি নীরব প্রশ্ন, তুমি আমাকে ট্রেনে দেখেছিলে, চিনতে পারোনি? মধ্যরাত্রে তুমি দরজা খুলে।

অনুরাধা নীরব চোখে উত্তর, হ্যাঁ, পেরেছি।

—তখুনি আমি হাত বাড়িয়ে, দাও, কাঁটাটা আমাকে দাও।

সেটা হাতের তালুতে নিয়ে। বেশ ধারাল। একটা কাগজে মুড়ে সেটা বুক পকেটে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলে, বাঃ একটুও ব্যথা নেই। দৌড়তে পারব। আমি চলি।

ওইরকম সেবা নেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ থাকতে আরও লজ্জা। যদি ছদ্মবেশটা হঠাৎ। চিরপলাতক তো এক জায়গায় এতক্ষণ সময় কখনও।

অনুরাধা অবাক হয়ে, এক্ষুনি যাবেন?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

জয়ন্তর কাকা, যদি অবশ্য সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতেই হয়।

—হ্যাঁ যাই।

—সামনের রাস্তা দিয়ে যাবেন?

—যদি পেছনের দিক দিয়ে যাই?

—তাহলে অবশ্য একটা মাঠ পেরুলেই বাজার পেয়ে যাবেন।

দরজার কাছে গিয়ে আবার আমি দাঁড়িয়ে শুধু অনুরাধার দিকে। ওকে যে কথাটা বলার জন্য এসেছিলাম। এই তো সেই মুহূর্ত। আমি অবিচল কণ্ঠে, আপনাদের একটা কথা জানা দরকার। আমি তপন আচার্যকে খুব ভালো করে চিনি। শেষ সময়েও তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। মৃত্যুর আগেও সে একটুও ভয় পায়নি। একবারও ভেঙে পড়েনি। সে ছিল বীর। তার পথটা ভুল বা ঠিক যাই হোক। সে ছিল খাঁটি আদর্শবাদী। সে মানুষের ভালো চেয়েছিল। তার জন্য সকলের গর্ব হওয়া উচিত। আমি যখনই তার কথা ভাবি...

কথা শেষ হল না, অনুরাধা এর মধ্যেই কান্নায়। শরীরটা কেঁপে-কেঁপে। কী অসম্ভব কাতর কণ্ঠস্বর। তবু বোধহয় এর মধ্যে একটু আনন্দও। আমার এই সামান্য মিথ্যের জন্য যত পাপ হয় হোক। আর না। এবার যেতেই হবে, এক্ষুনি।

ওরা এল আমাকে এগিয়ে দিতে। আবার ফুলবাগান পেরিয়ে। জ্যোৎস্নার আদর খাচ্ছিল বাগানটা। এবার আমি খুব সাবধানে প্রত্যেকটা গাছ বাঁচিয়ে।

গেটের কাছে এসে জয়ন্তর কাকা অন্ধকার মাঠের একদিকে হাতটা বাড়িয়ে।

—এই কোণাকুনি চলে যান।

—আচ্ছা, চলি—

সত্যিকারের পলাতকের মতন আমি সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়োতে। অনুরাধার কণ্ঠস্বর আমাকে পেছন দিক থেকে ছুঁলো। সাবধান! সাবধানে যাবেন কিন্তু!

একটু বাদেই আমি অন্ধকারে ওদের চোখের আড়ালে। বেশ কয়েকবার আমি পেছন ফিরে ফিরে ওদের। বাঁশের গেটের কাছে তিনজন। আমি শুধু অনুরাধাকেই। একটু বাদে আর কিছুই।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমি একসময় আবার একা। এরপর যেন আমি অনবরত ছুটতে-ছুটতে। আমি পলাতক। সে কখনও থাকে না। তাকে অন্ধকার মাঠ ঘাট ভেঙে অনবরত। মাঝখানের এই একটা ঘণ্টা কি স্বপ্ন? পকেট থেকে কাঁটাটা আবার। একটু আগে এই কাঁটাটা আমার শরীরের মধ্যে। কাঁটাটি তো সত্যি। ফুলের কাঁটা। কাঁটা আছে, ফুলও ছিল।

ছোট পৃথিবীর সীমানা

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। সীমা একটা মোটা বই কোলে নিয়ে বসেছিল জানলার ধারে, কিন্তু বইয়ের পাতায় তার মন ছিল না। রাস্তার দিকে চোখ আর কান। এবার সে উঠে গেল বারান্দায়, কিন্তু রেলিং-এর কাছে গিয়ে ঝুঁকল না। একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজেকে খানিকটা আড়াল করে উঁকি দিল।

ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। প্রথম নামল একজন যুবক, তারপর মিলি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ। হাতেও একটা ব্যাগ। মাথা ঝাঁকিয়ে ছেলেটিকে কী যেন বলেই দৌড় লাগাল বাড়ির মধ্যে। যুবকটি গাড়ির সামনের সিটের বদলে পেছনের সিটে গিয়ে বসল।

মিলি সবকটা সিঁড়ি লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে। সীমা মনে-মনে সিঁড়িগুলো গুনতে লাগল। তিনতলা পর্যন্ত মোট চুয়ান্নটা। দরজা বন্ধ, তবু যেন সীমা প্রত্যেক সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

দরজায় পরপর তিনবার বেল টিপল মিলি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার। মিলি এত ছটফট করলেও ব্যস্ততা দেখাল না সীমা। আস্তে-আস্তে গিয়ে দরজা খুলল।

মিলি সঙ্গে-সঙ্গে জিগ্যেস করল, মা, ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

ঠিক অস্বীকার করল না সীমা, একটু হাসল।

মিলি চটি দুটো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে খোলে। ধপাস করে ব্যাগ দুটো নামিয়ে রাখল। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে ফেলে বলল, বড্ড খাটাচ্ছে। আজ অনেক রাত হয়ে গেল। ক'টা বাজে বলো তো?

সাড়ে ন'টা।

সীমা জিগ্যেস করল, কিসে এলি? ট্যাক্সি?

মিলি বলল, ট্যাক্সির ভাড়া বেঁচে গেল। একজন গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সীমা মুখটা ফিরিয়ে নিল। খচ করে একটা অপরাধ বোধ তাকে বিঁধে গেল। সে তো জানেই যে মিলি ট্যাক্সিতে আসেনি, তবু জিগ্যেস করল কেন? মিলি মিথ্যে কথা বলে কি না, সেটা পরীক্ষা করার জন্য? সীমা নিজেও তো মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে।

মিলি ততক্ষণে নিজের ঘরে গিয়েই একটা ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই তার গান শোনা চাই। মাইনের টাকার অনেকখানিই সে ক্যাসেট কিনে খরচ করে।

সীমা জিগ্যেস করল, খাবার গরম করব? নাকি তুই এখন চান করতে যাবি?

মিলি দরজার কাছে এসে বলল, একটু পরে খাব। খিদে নেই। আমি গরম করে নেব।

—খিদে নেই কেন? আজ তো টিফিনও নিয়ে যাসনি!

—সন্ধেবেলা অনেকগুলো চিংড়িমাছ ভাজা খেয়েছি।

—ওমা! অফিসে চিংড়িমাছ কোথায় পেলি?

বেশ জোরে হেসে উঠল মিলি। কাছে এসে জড়িয়ে ধরল মাকে।

সীমার চেহারায় মা-মা ভাব নেই, তাকে এখনও মিলির দিদি বলে মনে হয়। একটাও চুল পাকেনি সীমার। চামড়ায় টান ধরেনি। শুধু তার চশমাটা একটু ভারিক্কি ধরনের। সীমার রং বেশ ফরসা, মিলি অবশ্য তার বাবার রং পেয়েছে, একটু চাপা রং তবে তার মুখচোখের ঝকঝকে ভাবের জন্য রঙের কথা মনে পড়ে না।

মিলি বলল, পাশের চাইনিজ রেস্তোরাঁ থেকে বুঝি খাবার আনানো যায় না? তুমি কি ভাবলে, আমি কারুর বাড়িতে চিংড়িমাছ ভাজা খেতে গেছি?

সীমা বলল, ও, চাইনিজ ফ্রায়েড প্রণ? ওগুলো ঠিক চিংড়িমাছ মনে হয় না।

মিলি জিগ্যেস করল, আমি ট্যাক্সিতে আসিনি, অন্য লোকের গাড়িতে এসেছি, কার সঙ্গে এসেছি তা জিগ্যেস করলে না?

মুখে কিছু না বলে সীমা শুধু ভুরু তুলল।

মিলি দুষ্টুমি হাসি দিয়ে বলল, মেয়ে বেশি রাত করে অফিস থেকে ফিরছে। কেউ একজন গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে কে? নিশ্চয় অফিসের বস্‌। বসের সঙ্গে গোপন প্রেম, গল্পের বইতে এরকম থাকে না? আমার কপালে কি দুঃখ, আমার বস্‌ নতুন বিয়ে করেছে, বউকে ভয় পায়, আমার সঙ্গে তুই-তুই বলে কথা বলে!

—সুব্রত তোকে পৌঁছে দিয়ে গেল?

—সুব্রতদার দায় পড়েছে! সুব্রতদা পালিয়েছে এক ঘণ্টা আগে। আমি অফিসের অন্য একটা গাড়িতে এলাম। জানো মা, নিচের বাসুবাবু গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, গাড়িটা থামতেই ভেতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলেন, আমি কার সঙ্গে ফিরছি! আমি ওকে একদিন এমন ঝাড়ব, বাপের নাম খগেন করে দেব!

—অ্যাই, ছিঃ, ওরকমভাবে কথা বলে না!

—আমি কার সঙ্গে ফিরি না ফিরি, তাতে ওর কী আসে যায়?

—আজ কিন্তু তোর সত্যি বড্ড দেরি হয়েছে। লোকে তো ভাবতেই পারে, এতক্ষণ তুই অফিসে কী কাজ করিস!

—ও, তার মানে তোমারও সেই কথাই মনে হয়? তুমিও বুঝি ভাবো, আমি অফিসের নাম করে অন্য কোথাও কাটিয়ে আসি?

—মোটেই তা ভাবি না। কিন্তু তুই সকাল সাড়ে ন'টায় বেরোস, আর ফিরতে-ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা বেজে যায়। এ কীরকম অফিস। অন্য কেউ তো এতক্ষণ অফিসে থাকে না!

—তোমার কি ধারণা, অফিসে আমি এতক্ষণ একলা থাকি? আরও সাত-আটজন থাকে, অমিত, বিক্রম এরা সবাই ছিল আজ। অমিতকে এক-একদিন রাত এগারোটা পর্যন্তও থাকতে হয়।

—ওরা তো ছেলে। ওরা তবু থাকতে পারে!

—মা, আমি যে কাজটা করি, সেটা আমাকে মেয়ে বলে দেওয়া হয়নি। মেয়েরা যে কাজ করে, ছেলেরাও সেই কাজই করে। সমান মাইনে দেয়। তা-হলে মেয়েরা আগে-আগে চলে আসবে আর ছেলেরা বেশিক্ষণ থাকবে কেন? ছেলেরাই বা সেটা মানবে কেন?

—যাই বলিস, মেয়েদের এতক্ষণ অফিসে থাকাটা ভালো দেখায় না।

—চাকরি ছেড়ে দিতে বলছ? আমি বাড়িতে বসে-বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব?

সীমা আর কোনও উত্তর না দিয়ে ঢুকে গেল রান্নাঘরে। আলোটা জ্বালাল।

দুখানা ঘরের ফ্ল্যাট, মাঝখানে খানিকটা খাওয়ার জায়গা। রাস্তার দিকের বারান্দাটা বেশ সুন্দর, এখানে দাঁড়ালে সিংহানিয়াদের বাড়ির বাগানটা দেখা যায়। অনেকগুলো বড়-বড় নারকেল গাছ। রাস্তার উলটোদিকেই শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একটা মেস বাড়ি। ওদের কেউ-কেউ যখন পাগড়ি খুলে মাথার লম্বা চুল শুকোয়, তখন অদ্ভুত দেখতে লাগে। তবে ওরা লোক ভালো। ওদের জন্য এ পাড়ায় বিশেষ গণ্ডগোল হয় না।

বারান্দায় দুটো পাখির খাঁচা। একটাতে ময়না, অন্যটাতে চন্দনা। ময়নার খাঁচাটা ঢেকে রাখতে হয়, ওরা আলো সহ্য করতে পারে না। চন্দনাটা বেশ ডাকাবুকো ধরনের, সন্ধের পরেও জেগে

থাকে। অনেক দিনের পাখি, তবু এখনও যেন ঠিক পোষ মানেনি, গায়ে হাত দিয়ে আদর করলে আঙুল কামড়ে দেয়। খুব জোরে কামড়ায় না অবশ্য।

চন্দনাটা এখন চোখ বুজে আছে। মিলি কাছে এসে শিস দিয়ে ওকে জাগাবার চেষ্টা করল। ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরার মতন পাখিটা পেছন ফিরল মিলির দিকে।

মিলির শিস শুনে রাস্তা থেকে কে যেন শিস দিয়ে উত্তর দিল।

মিলি রেলিং-এ উঁকি দিয়ে নিচে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু যে শিস দিচ্ছে, সে আড়ালে আছে। এ পাড়ায় সমবয়সি ছেলেদের মিলি চেনে, একসময় সে অনেকের সঙ্গে খেলা করেছে, তারা কেউ এরকম শিস দেবে না। নিশ্চয়ই নতুন কেউ।

রান্নাঘর থেকে সীমা জিগ্যেস করল, তুই বাথরুমে যাবি না?

মিলি বারান্দা থেকে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সীমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সেই দৃষ্টিতে কী যেন রহস্য আছে।

সীমা কৌতূহল আর বিস্ময় নিয়ে জিগ্যেস করল, কী?

মিলি বলল, তা হলে চাকরি ছেড়ে দেব?

—আমি কি সে কথা বলেছি? ওদের বলতে পারিস না তোকে একটু আগে-আগে ছেড়ে দিতে।

—সেকথা আমি বলতে পারব না। মা, শোনো—

—কী?

মিলি আবার চুপ করে গেল।

সীমা এবার কিছু একটা আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে বলল, কী, কী হয়েছে? চুপ করে গেলি কেন? কী হয়েছে বল!

মিলি এবার হেসে বলল, আসলে সেরকম কিছুই হয়নি। তোমাকে একটা কথা বলব, অফিসের কাজের ব্যাপারে, কিন্তু তুমি সেটা কীভাবে নেবে, সেটাই আসল কথা!

—অফিসের কাজ?

—অফিস থেকে আমাকে হায়দ্রাবাদে পাঠাতে চাইছে। দিন চারেকের জন্য ঘুরে আসতে হবে।

—হায়দ্রাবাদে? তুই একা যাবি?

—কাজের জন্য পাঠালে তো সঙ্গে বডিগার্ড দেয় না। নিজের মাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না।

—তা বলে তুই হায়দ্রাবাদে একা-একা যাবি কী করে?

—একা যাওয়াটা খুব শক্ত ব্যাপার নাকি? প্লেনে যাব, আসব। অবশ্য ঠিক একা নয়। একজন ফটোগ্রাফার যাবে, হীরেন, তুমি ওকে দেখেছ, একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল।

—তোদের অফিসে তো আরও কত লোক আছে। তোকেই হায়দ্রাবাদ যেতে হবে কেন?

—মা, হায়দ্রাবাদে পাঠানোটা আমার শাস্তি নয়। পত্র-পত্রিকার অফিসে এরকম বাইরে যাওয়ার চান্স পেলে সবাই খুশি হয়। বাইরে থেকে কে কীরকম লেখা পাঠাতে পারে, তা দিয়ে মেরিটের বিচার হয়।

—আমি ভেবেছিলাম, পত্রিকার কাজ মানে অফিসে বসে-বসে লেখার কাজ। এত দূর-দূর জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়!

—দূরে-দূরে না ঘুরলে খবর আসবে কী করে?

—সেই কাজগুলো তো ছেলেরা করলেই পারে।

—তোমাকে তো আগেই বলেছি মা, আমাকে মেয়ে বলে চাকরি দেয়নি! যে-কোনও পুরুষের সমান যোগ্যতা আছে বলেই এই কাজটা পেয়েছি!

—তা বলে কোনও মেয়ে একা-একা হিল্লিদিল্লি ঘুরে বেড়ায় না!

—বাবা কলেজে পড়াতেন, তুমি ইস্কুলে চাকরি করো। তোমরা দুজনেই আরামের চাকরি করেছ, বছরের তিন-চার মাস ছুটি, কাজের দিনেও সারাদিনে কয়েক ঘণ্টা মাত্র। আরও কত লোককে কত শক্ত কাজ যে করতে হয়, সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণাই নেই। মেয়েরা কত জায়গায় যায়। আমাদের অফিসের পিংকি গত ইলেকশনের সময় ইউ পি গিয়েছিল, তখন ওখানে মারামারি চলছিল।

—পিংকির কথা বাদ দে। ওর ঘরসংসার নেই, কোনও কিছুই মানে না। তুই হায়দ্রাবাদে গেলে থাকবি কোথায়?

—কেন হোটেলে?

—সঙ্গে একজন ফটোগ্রাফার যাবে, সে আর তুই হোটেলে!

—দুজনে কি হোটেলে একঘরে থাকব নাকি? আমাদের কোম্পানি কৃপণ নয়, দুজনের আলাদা ঘর ভাড়া দেবে।

—শংকরকে বলেছিস?

—শংকরকে...বলেছি...মানে, শংকর জানে।

—শংকরের কোনও আপত্তি নেই?

—মা, শংকর আমার গার্জেন নয়, তুমি আমার গার্জেন। শংকর আপত্তি করতে যাবে কেন?

—কী জানি, তোদের ব্যাপার-স্যাপার আমি বুঝি না।

—আমি কিন্তু টিকিট কাটতে বলে দিয়েছি।

—ও, তুই তো ঠিকই করে ফেলেছিস আগে থেকে। তা হলে আর আমাকে জিগ্যেস করবার কী দরকার ছিল?

—এখনও টিকিট ফেরত দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে কালকেই চাকরি ছেড়ে দেওয়া যায়।

—হায়দ্রাবাদে না গেলেই বুঝি চাকরি ছেড়ে দিতে হবে?

—না, তা নয়। আমি হায়দ্রাবাদ না যেতে চাইলে আরও তিন-চারজন যেতে রাজি আছে। অফিসের কাজের কোনও ক্ষতি হবে না।

—তা হলে তোর যাওয়ার দরকারটা কী? তুই অত দূরে শুধু-শুধু যাবি, আমার ভালো লাগছে না।

—অফিস থেকে যদি আমাকে একটা ভালো কাজ দেয়, যেরকম কাজ পেলে সবাই খুশি হয়, অথচ যদি সে কাজটা করতে না চাই, তা হলে সেটাতে তো আমার অযোগ্যতাই প্রমাণিত হয়, তাই না? অন্যরা যা পারে, আমি তা পারি না। এরকম মনোবৃত্তি নিয়ে আমি চাকরি করতে পারি না।

হঠাৎ গলার আওয়াজ অনেকখানি উঁচু করে সীমা বলল, তোর যদি এত যেতে ইচ্ছে হয়, যাবি! আমি বারণ করলেও তুই শুনিবি না, তা আমি জানি!

মিলির দিকে আর না তাকিয়ে মিলির আগেই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সীমা।

গানটা থেমে গেছে, ঘরে গিয়ে ক্যাসেটটা উলটে দিল মিলি। তার মুখে একটা অন্যমনস্ক ভাব। ঘরের এটা-সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। দেওয়ালে একটা ছবি একটু ব্যাঁকা হয়ে ঝুলছে, সেটাকে সোজা করল অনেকক্ষণ ধরে।

মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে সে বাথরুমের দরজাটা দেখে নিচ্ছে। সে অপেক্ষা করছে মায়ের জন্য।

সীমা বাথরুম থেকে বেরুতেই মিলি বলল, মা, আমি একটু দোতলা থেকে আসছি।

সীমা বলল, এত রাত্তিরে ওদের ওখানে—

মায়ের কথা শুনতেই পেল না মিলি, ততক্ষণে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেছে।

দোতলায় বিপুলবাবুরা আছেন অনেক দিন ধরে। সীমার স্বামী বিনায়কের বন্ধু ছিলেন বিপুলবাবু। এ-বাড়িতে একটা ফ্ল্যাট খালি হওয়ায় বিনায়কই তার বন্ধুকে ডেকে এনেছিল। বিনায়ক মারা গেছে আট বছর আগে। দেখতে-দেখতে এতগুলো বছর কেটে গেল। বিনায়ক চলে যাওয়ার পর ভাড়াটা বেশি মনে হলেও সীমা এই ফ্ল্যাট ছাড়েনি। সীমার দাদা সেই সময় তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বিপুল আর ওর স্ত্রী মায়া সবসময় অনেক রকম সাহায্য করেছে।

ওদের ফ্ল্যাটে টেলিফোন আছে। মিলি নিশ্চয়ই ফোন করতেই গেল।

মেয়ের সঙ্গে ইদানীং মাঝে-মাঝেই ছোটখাট ঝগড়া হয় সীমার। আগে হতো না। এখন মিলি দিনের অনেকটা সময়ই বাইরে-বাইরে কাটায়, সেইজন্যই কি? বিনায়ক চলে যাওয়ার সময় মিলির সতেরো বছর বয়স। ওই বয়েসটা সাংঘাতিক, সদ্য স্কুল ছেড়ে তখন কলেজে যেতে শুরু করেছে মিলি। সীমা তখন যেন সবসময় মিলিকে ঘিরে রাখত। মিলিও মাকে ছেড়ে থাকত না। কলেজের সব গল্প মাকে এসে বলা চাই।

কিন্তু কলেজ আর চাকরি-জীবনের অনেক তফাত। মিলি এখন স্বাবলম্বী, সে মায়ের চেয়ে বেশি মাইনে পায়।

সীমা আগে থেকেই স্কুলে পড়াত, একার রোজগারে তাকে টেনেটুনে চালাতে হয়েছে, কিন্তু কষ্ট সহ্য করতে দেয়নি মিলিকে। বিনায়কের বাবার কাছ থেকেও কিছু টাকা পেয়েছিল সীমা, সে টাকা সবটা খরচ করেনি। মিলি এক্ষুনি চাকরিতে না ঢুকলেও চলে যেত। কিন্তু মিলি লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি করবে না কেন?

মেয়েটা বড় একগুঁয়ে আর চাপা স্বভাবের। দিন-দিন যেন দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে।

মিলি ফিরে এসে কোনও কথা না বলে বাথরুমে ঢুকল। কেন দোতলায় গিয়েছিল কিংবা কাকে ফোন করল, তা জিগ্যেস করতে পারল না সীমা।

এবার সে খাবার গরম করতে লাগল। বাথরুমে মিলির বেশি সময় লাগে না।

জিন্‌স আর টি-শার্ট পরে অফিস যায় মিলি, বাড়িতে শাড়ি পরে।

এখনকার দিনে সবই উলটো। মেয়ের পোশাক বিষয়ে অবশ্য কোনও আপত্তি জানায় না সীমা। সে নিজেও একসময় শালওয়ার-কামিজ পরত বাইরে বেড়াতে গেলে, সেগুলো এখনও রয়ে গেছে, কিন্তু বিধবা হওয়ার পর আর ওসব পরার প্রশ্নই ওঠে না। মিলি একদিন বলেছিল, মা, পাঞ্জাবি মহিলাদের স্বামী মারা গেলে তারা কি শালওয়ার-কামিজ পরা ছেড়ে দেয়?

রান্না সব করাই ছিল, কয়েকটা ছোট-ছোট বড়ি ভাজতে লাগল সীমা। মিলি এই বড়িভাজা খুব ভালোবাসে।

মিলি দোতলা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, এ কী, তুমি রান্না শুরু করেছ? এ বেলা আমার সব করার কথা নয়?

সীমা বলল, হয়ে গেছে।

মিলি টেবিলে দুটো কাচের প্লেট পাতলো। জলের বোতল, গেলাস নিয়ে এল।

দুজনে নিঃশব্দে খেতে লাগল একটুক্ষণ। অন্যদিন মিলি অবিশ্রান্ত কথা বলে।

একটু পরে সীমা জিগ্যেস করল, হায়দ্রাবাদে ক'দিন থাকতে হবে?

মিলি বেশ অবাক ভাব করে বলল, যাচ্ছি না তো! টেলিফোন করে সুব্রতদাকে না বলে দিলাম।

সীমা প্রায় আঁতকে উঠে বলল, এরমধ্যে না বলে এলি? আমি কি তোকে সত্যি-সত্যি বারণ করেছি?

—আমি কি সত্যি-মিথ্যে বুঝি না? তুমি তো বুঝিয়ে দিলে, তোমার মত নেই।

—আমি মোটেই সেরকম কিছু বলিনি। তুই একা-একা অতদূরে যাবি, আমার একটু ভয় করবে না? চিন্তা হবে না?

—একা থাকতে তোমার অসুবিধে হবে, সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল!

—আমার অসুবিধের কথা বলিনি। আমি একা থাকতে পারব না কেন? আমি তোর কথাই ভেবেছি। তুই তো কখনও একা কোথাও যাসনি, থাকিসনি।

—আগে যা করিনি, সেরকম অনেক কিছুই তো এখন করি। আগে কি কখনও রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরতাম? এয়ারপোর্টে গিয়ে অর্থমন্ত্রীর ইন্টারভিউ নিয়েছি আগে? এর আগে...

—যাক, বুঝেছি। তুই অমনি সুব্রতকে দৌড়ে টেলিফোন করতে গেলি?

আমাকে একবার জিগ্যেস করলি না? কাল সকালে বলে দিস—

—আর ফেরানো যাবে না, মা। অফিসের ব্যাপার নিয়ে ছেলেমানুষি চলে না। আমি যাব না বলে দিয়েছি।

খাওয়া বন্ধ করে সীমা অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মেয়ের দিকে।

॥ ২ ॥

ঘুম আসছিল না সীমার। মাথার মধ্যে একটা অস্বস্তিবোধ উইটিপির মতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এতগুলো বছর তার জীবনটা শুধু যেন মিলিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল, সেই বৃত্তটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য সীমার আগেই কি মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল না? আগে সে মিলিকে কখনও বকুনি দিত, চোখ রাঙাত, আবার আদর করত, বুকে জড়িয়ে ধরত। কিন্তু মা আর সন্তানের মধ্যেও এই সম্পর্ক যে চিরকাল চলতে পারে না, তা কি সে জানত না?

নিজের মায়ের প্রচণ্ড অমতে বিনায়ককে বিয়ে করেছিল সীমা। মা খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু সীমা কি তা গ্রাহ্য করেছিল? বরং সে ভেবেছিল, মা ভুল করছেন, মা যুক্তিহীনভাবে বিনায়ককে স্বীকার করতে চাইছেন না, সেজন্য মায়ের ওপর তার রাগ হয়েছিল। সে দূরে সরে গিয়েছিল। বিয়ের দু-বছরের মধ্যে সে একবারও বাপের বাড়ি যায়নি।

তন্দ্রার মতন এসেছিল, সীমা স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছিল নিজের মায়ের সঙ্গে। মা অনেক দিন নেই। কিছু একটা আওয়াজে চটকা ঘুম ভেঙে গেল। মিলির ঘরের দরজা খুলল। রাত্তিরে মিলি একবার বাথরুমে যায়।

আজ মিলির একটা কথা সীমাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

মিলি ভেবেছে যে সীমা একা থাকতে পারবে না বলেই মেয়েকে হায়দ্রাবাদে পাঠাতে আপত্তি জানিয়েছে!

মিলিকে কি সে সারাজীবন নিজের কাছে ধরে রাখবে নাকি? সে কি এত স্বার্থপর? বিয়ের পর মিলি চলে যাবে, সেজন্য নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে নিশ্চয়ই। শংকর ছেলেটিকে সীমার ভালোই লাগে। গত দশ-পনেরো বছর ধরে কিছু-কিছু ব্যাপার বেশ বদলে গেছে। ছেলেমেয়েরা অনেক

খোলামেলাভাবে মেলামেশা করে। আগের মতো বাড়িতে লুকোচুরি করতে হয় না। মেয়েরা অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। মেয়েরা অনেক দূরে-দূরে চাকরি করতে যায়। বিপুল-মায়াদের মেয়ে কেয়া বিয়ে করল প্রিয়ব্রতকে, এই তো মাত্র দু-বছর আগে, দুজনেই ব্যাংকের চাকরি করে। এর মধ্যে কেয়া ট্রান্সফার হয়ে গেল বিষ্ণুপুরে। কেয়া চাকরি ছাড়ল না। বিষ্ণুপরে সে ঘড়ভাড়া করে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দু-জায়গায়। আগে স্বামীরা চাকরির সূত্রে বিদেশে চলে যেত, এখন প্রিয়ব্রতর মতন স্বামীরা কলকাতায় থাকে, আর, কেয়ার মতন স্ত্রীরা বিনা দ্বিধায় দূরে চলে যায়।

আগে মেয়েরা স্কুল বা কলেজে চাকরি পেলেই খুশি হতো, এখন কেউ-কেউ সাংবাদিক হচ্ছে, ওদের তো যখন-তখন বাইরে যেতে হতে পারেই। মিলি কাজ করছে একটা ইংরেজি সাপ্তাহিকে, ওদের অফিস থেকে প্রায় কেউ-না-কেউ বম্বে-দিল্লি যায়। মিলিকেও যেতে হবে, এটা তো স্বাভাবিক। যুক্তি দিয়ে সবই বোঝে সীমা তবু একটু আশঙ্কাও থেকে যায়।

মিলি এখনও বাথরুম থেকে ফিরছে না কেন? অনেকক্ষণ সময় লাগছে।

সীমা ধড়মড় করে নেমে এল বিছানা থেকে। আলো না জ্বেলেই বাইরে যেতে গিয়ে ধাক্কা খেল দরজায়। বাথরুমও অন্ধকার। মিলির ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু সেখানে মিলি নেই।

বারান্দায় ছায়াটা দেখতে পেল সীমা। রেলিং-এর ওপর অনেকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে মিলি। সামনের রাস্তা একেবারে শুনশান। শহরে কোনও রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা দেখলে অন্যরকম লাগে। দূরের পথ দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল অনেক শব্দ করে। সেই শব্দের রেশ রয়ে গেল কিছুক্ষণ।

মিলির পাশে এসে দাঁড়াল সীমা। মৃদু গলায় জিগ্যেস করল, ঘুম আসছে না?

মিলি বলল, না।

—জল খেয়েছিস?

—হ্যাঁ। এক বোতল জল খেলাম। খুব তেষ্টা পাচ্ছিল।

—চিংড়ি মাছ খেয়েছিলি, নিশ্চয়ই অম্বল হয়েছে। জোয়ানের আরক দিচ্ছি খেয়ে নে!

—তা-ও খেয়ে নিয়েছি।

—সত্যি খেয়েছিস, না আমি এনে দেব?

—সত্যি খেয়েছি। তুমি উঠে এলে কেন?

—তুই আমার পাশে এসে শুবি? মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, ঘুম আসবে।

—এখানে দাঁড়াতে ভালো লাগছে। পাখার হাওয়ার চেয়েও এখানকার হাওয়া অনেক ভালো।

—মিলি, তুই কয়েকদিনের জন্য বাইরে গেলে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

মিলি এবার মুখ ফিরিয়ে মায়ের দিকে তাকাল। তারপর মুচকি হেসে বলল, তুমি একা থাকতে পারবে? তোমার ভূতের ভয় করবে না?

সীমাও হেসে বলল, ধ্যাৎ, কী যে বলিস!

—তুমি তো কখনও একা থাকনি!

—এখন থেকে অভ্যেস করব। হ্যাঁ-রে, মিলি, শংকর তোকে কিছু বলেনি?

—কী বলবে?

—মানে, তোরা কিছু ঠিক করিসনি?

—তুমি বিয়ের কথা বলছ? না, সেরকম কিছু ঠিক করিনি তো!

—কিছু ঠিক করিসনি? কেন? শংকরকে একদিন বাড়িতে ডাক না।

—ডাকতে পারি। ও খুব লোভী, তুমি ওকে রান্না করে পেট ভরিয়ে খাওয়াবে। কিন্তু ডাকব একটা শর্তে, তুমি ওর সামনে বিয়ের প্রসঙ্গ একদম তুলতে পারবে না।

—তুই পাগল নাকি, আমি সেসব কথা কেন বলব। তুই হায়দ্রাবাদ থেকে ঘুরে আয়, তারপর

শংকরকে একদিন নেমন্তন্ন কর বাড়িতে।

—চলো, মা, আজ তোমার পাশে গিয়ে শোবো। তুমি আমায় একটা গান শোনাবে। আগে যেমন গুনগুন করে গান গাইতে। আমি অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

সীমার হঠাৎ খুশিতে মন ভরে গেল। মিলিও যেন বালিকা হয়ে গেল হঠাৎ। বিনায়ক চলে যাওয়ার পর অনেকদিন মা ও মেয়ে এক বিছানায় শুয়েছে। সীমার গানের গলা ভালো। বিয়ের আগে সে দু-একটা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গান গেয়েছে। মিলি জন্মাবার পর আর চর্চা রাখেনি।

মিলি কিন্তু একটা গানও পুরো শুনতে পেল না, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাচ্চা মেয়ের মতন গুটিসুটি মেরে রইল সীমার বুকের কাছে। সীমা তাকে জড়িয়ে ধরে জেগে রইল অনেকক্ষণ।

সকালবেলা মা আর মেয়েতে প্রায় দেখাই হয় না। সীমার মর্নিং স্কুল, বেরুতে হয় পৌনে ছ'টার সময়। মিলি অনেকক্ষণ দেরি করে ঘুমোয়। সীমা চা খেয়ে বেরিয়ে যায়, মিলি টের পায় না। সীমা ফিরে আসতে-আসতে অফিসে চলে যায় মিলি।

মিলির জন্য একটা ফ্লাস্কে চা রেখে সীমা বেরিয়ে পড়ল। স্কুলটা হাঁটাপথ নয়, আবার ট্রামের জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেও বিরক্ত লাগে। আজ একটা রিকশা নিয়ে ফেলল সীমা। স্কুলে পৌঁছেই কিন্তু তার আপশোশ হল। স্কুল কমিটির একজন মেম্বার মারা গেছেন আগের রাতে, আজ তাই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। দু-চারজন টিচার টেলিফোনে খবর পেয়ে আসেইনি। সীমার নিজস্ব ফোন নেই।

বেশ কাছেই সেই মৃত মেম্বারের বাড়ি, দল বেঁধে একবার যেতে হল সেখানে। তারপর সীমা বাড়ি ফিরে এল সাড়ে আটটার মধ্যে। তার মনটা খুশি-খুশি লাগছে। মিলি রোজ অফিস ক্যান্টিনে খায়, আজ সীমা তার জন্য ভাত রেঁধে দেবে। কাল মেয়েটাকে খুব বকুনি দেওয়া হয়েছে।

দরজা খোলার পর দেখল খাবার টেবিলে বসে আছে একজন যুবক। বেশ লম্বা, ছ'ফুটের বেশি তো হবেই, মাথাভরতি চুল, নাকটা খাঁড়ার মতন। সারা বাড়িতে সিগারেটের গন্ধ। টেবিলের ওপর চায়ের পট।

মিলি বলল, মা, তুমি ফিরে এলে যে?

আসল কারণটা না জানিয়ে সীমা বলল, আজ ক্লাস নিতে ভালো লাগল না।

মিলি বলল, বেশ করেছ। রোজই যে ইস্কুলে যেতে হবে, তার কী মানে আছে? এই হচ্ছে হীরেন, তুমি একে আগে দেখোনি বোধহয়। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকে। সকালবেলাতেই কেন ছুটে এসেছে বলো তো?

বাড়িতে একজন অচেনা যুবককে দেখতে পাবে, সীমা একেবারে আশাই করেনি। ছেলেটি দিব্যি জমিয়ে বসেছে। প্রায়ই এসময় আসে নাকি? এরকমভাবে সকালবেলা কেউ মিলির কাছে এলে বাড়ির অন্য লোকেরা কী ভাববে?

সীমা কৌতূহলের চোখে ছেলেটির দিকে তাকাতেই সে বেশ সাবলীলভাবে বলে উঠল, নমস্কার, মাসিমা, ফিরে এসেছেন ভালো করেছেন। মিলি কীসব পাগলামি করছে বলুন তো! আপনি একটু বকে দিন।

সীমা জিগ্যেস করল, কী হয়েছে?

হীরেন বলল, মিলি হায়দ্রাবাদ যাবে না? আমার সাধারণত ন'টার আগে ঘুম ভাঙে না, আজ সুব্রতদা সকাল সাতটা থেকে তিনবার টেলিফোন করেছে। মিলিকে যা বলল, সে আপনি ভাবতে পারবেন না। মিলি যাবে সব ঠিকঠাক, ওর নামে অ্যাক্রেডিশান কার্ড হয়ে গেছে।

মিলি বাধা দিয়ে বলল, মোটেই সব ঠিকঠাক ছিল না। আমি বলেছি, মাকে জিগ্যেস করে, তারপর জানাব।

হীরেন খানিকটা ধমক দিয়ে, খানিকটা ভেংচে বলল, বাজে কথা বলিস না। কচি খুকি নাকি, মাকে জিগ্যেস করে তারপর জানাব! মাসিমা মোটেই আপত্তি করবেন না। তুই ভয় পাচ্ছিস, তাই বল! মাসিমা, আপনার কোনও আপত্তি আছে, বলুন?

সীমা বিহ্বলভাবে দু-দিকে ঘাড় নাড়ল।

হীরেন আবার বলল, বাইরে যেতে ভয় পেলে কখনও জার্নালিস্ট হওয়া যায়? এ কাজে এটাই তো আসল চার্ম। বুঝলেন মাসিমা, বাইরে ঘুরলে অভিজ্ঞতা তো হয়ই, কিছু একস্ট্রা টাকাও হয়। কোম্পানি যা দেবে, তার থেকে খানিকটা বাঁচিয়ে শপিং-টপিং করা যায়। অন্য কেউ এই চান্স পেলে লুফে নেবে, আর তুই ভয় পাচ্ছিস, মিলি?

মিলি বলল, আমি মোটেই ভয় পাইনি।

হীরেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা হলে মাসিমা, ওর ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে দিন। গরম জামা দিয়ে দেবেন, ওদিকে সন্ধের পর একটু ঠান্ডা হয়। কোনও চিন্তা করবেন না, আমি তো সঙ্গে থাকব।

হীরেনকে এগিয়ে দিতে মিলি সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে গেল।

মিলির হায়দ্রাবাদ যাওয়া নিয়ে সীমার মনে আর কোনও সংশয় নেই।

কিন্তু একটা কথা সে বুঝতে পারছে না, হীরেনের সঙ্গে মিলির এত ভাব যে ওরা তুই-তুই বলে কথা বলে। এই হীরেনের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে গিয়ে মিলি এক হোটেলে থাকবে। শংকরের তাতে কিছু মনে হবে না?

মিলি ফিরে আসবার পর সীমা বলল, শোন, একটা কথা মনে পড়েছে। হায়দ্রাবাদে তো ডাবলদা থাকে। তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলেই তো হয়। তুই ডাবলদার বাড়িতে থাকতে পারবি, হোটেলে থাকতে যাবি কেন?

মিলি ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, ডাবলদা মানে?

—তোর ডাবলমামা। অসিতরঞ্জন রায়, আমার নিজের খুড়তুতো দাদা। খুব বড় চাকরি করেন। তোর মনে নেই, একবার আমার জন্য একটা কাঞ্জিভরম শাড়ি এনেছিল। তোকে খুব ভালোবাসে।

—তার বাড়িতে আমি থাকতে যাব কেন?

—নিজের আত্মীয় থাকতে কেউ হোটেলে ওঠে? ডাবলদা, পিকুবউদি তোকে দেখলে খুবই খুশি হবে।

—দ্যাখো মা, অফিসের কাজে গিয়ে আত্মীয়-টাত্মীয়র বাড়িতে থাকা যায় না। ওঁদের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই, শুধু হোটেলের টাকা বাঁচাবার জন্য ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠব, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

এবারও মেয়ের কাছে হেরে গেল সীমা। মিলির যুক্তি অকাট্য।

সীমা অনেকদিন কলকাতার বাইরে যায়নি। তাই তার ধারণা, হায়দ্রাবাদের মতন অত দূরের জায়গায় যেতে হলে অনেক ব্যবস্থাপনা দরকার। সেসব কিছুই না। পরদিন মিলি একটি মাঝারি আকারের ব্যাগে কয়েকটা মাত্র পোশাক ভরে নিল, সেই ব্যাগটা নিয়েই অফিসে গেল। ওখান থেকেই সন্ধেবেলা এয়ারপোর্টে গিয়ে প্লেন ধরবে। যাওয়ার সময় মায়ের গাল টিপে মিলি বলে গেল, সাবধানে থাকবে।

বিকেল থেকেই ঘনঘন ঘড়ি দেখছে সীমা। ছ'টা চল্লিশ বাজতেই তার মনে হল, মিলির প্লেন ছাড়ল এইমাত্র। আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মিলি। চলে গেল অনেক দূরে।

অন্যদিনও মিলি এসময় বাড়িতে ফেরে না, কিন্তু আজ এরইমধ্যে মনে হচ্ছে বাড়িটা অসম্ভব ফাঁকা। রাত্তিরে মিলি ফিরবে না। মাত্র পৌনে সাতটা বাজে, ঘুমোবার আগে এখনও কত সময় পড়ে আছে।

মিলির ঘরে ঢুকে সীমা জিনিসপত্র গুছোতে বসল। মিলি সবকিছু এলোমেলো করে রাখে। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো। খাটের তলায় বই। মিলির একটা ব্লাউজ অনেকদিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটা রয়েছে একটা মোটা খাতার মধ্যে। আচ্ছা, খাতার মধ্যে কেউ ব্লাউজ রাখে? অনেকদিন আগেকার একটা চকলেটের বাক্স রয়েছে জামা-কাপড়ের আলমারিতে, চকলেটগুলো গলে চটচটে হয়ে আছে।

আলমারির মধ্যে একজোড়া স্কার্ট-ব্লাউজ রয়েছে, এগুলো এল কোথা থেকে? মিলি তো এসব পরে না। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে সীমার মনে পড়ল, হ্যাঁ, এগুলো মিলিরই তো, প্রথম-প্রথম কলেজে যাওয়ার সময় পরত। স্কার্ট পরলে মিলিকে খুব বাচ্চা দেখায়, কলেজে দু-তিনটি ছেলে ওকে খুকি-খুকি বলে আওয়াজ দিয়েছিল বলে তারপর থেকে মিলি আর এগুলো পরেনি।

এই স্কার্ট-ব্লাউজ বিনায়ক কিনে দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে মেয়ের ভাব ছিল বেশি। কোনও নতুন বই পড়লেই বিনায়ক মেয়েকে ডেকে গল্পটা শোনাত। বিনায়কের শখ ছিল, তার মেয়ে ব্যারিস্টার হবে! মিলির গ্রাজুয়েশানও সে দেখে যেতে পারল না। মিলি বরাবরই ইংরিজি ভালো লেখে। ব্যারিস্টারির দিকে তার কোনও আগ্রহই নেই, সে নিজেই ইংরিজি সাংবাদিকতার কাজ বেছে নিয়েছে।

মাত্র চার-পাঁচ দিনের জন্যে গেছে মিলি, কিন্তু কেন মনে হচ্ছে সে আর ফিরবে না?

এসব যুক্তিহীন চিন্তা। কেন ফিরবে না, নিশ্চয়ই ফিরবে। হ্যাঁ, কলকাতায় ফিরবে, কিন্তু সে কি তার মায়ের কাছে কোনওদিন ফিরে আসবে?

দরজায় কেউ বেল দিল। এইসময় একজন লোক ইস্তিরি করার জন্য শাড়ি-জামা নিতে আসে। আজ সারা দুপুর অনেক কাচাকাচি করেছে সীমা।

দরজা খুলে দেখল দোতলার বিপুল আর তার সঙ্গে আর একজন ব্যক্তি। বিপুলকে দেখে হাসতে গিয়েও পাশের লোকটির দিকে চোখ ফেলে গম্ভীর হয়ে গেল সীমা।

বিপুল বলল, কি করছিলে? দু-তিনবার বেল বাজালুম, সাড়া নেই।

দ্যাখো, প্রদীপকে নিয়ে এসেছি। প্রদীপকে মনে আছে তো?

মাঝারি উচ্চতা, ঈষৎ স্থূলকায় প্রদীপ বলল, নিশ্চয় ওর মনে আছে। আমাকে কেউ সহজে ভুলতে পারে না।

সীমা এবার বলল, কেমন আছেন? কবে এলেন?

প্রদীপ বলল, এই তো এলাম, কবে যেন, শনিবার, না রবিবার! তুমি তো একইরকম আছ, সীমা। তোমার চেহারাটা একটু বদলায়নি।

বিপুল বলল, সেটা ঠিক, সীমা এত স্ট্রাগল করেছে। কিন্তু ওর চেহারায় তার কোনও ছাপ পড়েনি।

আলাদা কোনও বসবার জায়গা নেই, খাবার টেবিলেই এসে সবাই বসে।

প্রদীপ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, কী যেন একটা বদল হয়েছে।

আগে এই জায়গাটা অন্যরকম ছিল।

বিপুল এ পরিবারের অভিভাবকের মতন। সে বলল, তোর ঠিক মনে আছে তো! রান্নাঘরের দিকটায় একটা দেওয়াল তোলা হয়েছে, নইলে বড্ড ধোঁয়া আসত এদিকে। আগের টেবিলটাও ছিল চৌকো ধরনের, তাই না, সীমা?

প্রদীপ বলল, হ্যাঁ, আরে রান্নাঘরের দিকের ওই পার্টিশানটা ছিল না, এখানে বসে-বসেই রান্নাঘরটা দেখা যেত। আমি বোধহয় ঠিক সাত বছর পর এলাম!

সীমা জিগ্যেস করল, চা করি?

বিপুল বলল, তা তো করবেই। মায়া একটা থিয়েটারে গেছে। কাজের মেয়েটাও নেই। প্রদীপকে

চা খাওয়াবার জন্যই তো তোমার এখানে নিয়ে এলাম।

প্রদীপ বলল, শুধু সেজন্য নয়, সীমাকেও দেখতে এসেছি। তোমার মেয়ে কোথায়?

বিপুল বলল, মিলি তো এখন চাকরি করছে। অনেক বড় হয়ে গেছে। একটা ইংরিজি সাপ্তাহিক পত্রিকার রিপোর্টার। ওর অফিস থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়।

সীমা ব৽লল, মিলি আজ ফিরবে না। অফিসের কাজে ও আজই হায়দ্রাবাদ গেল।

বিপুল অবাক চোখে তাকাল। খানিকটা ক্ষুণ্ণও হয়েছে সে। মিলি অতদূরে গেছে, একথা মিলি কিংবা সীমা তাকে জানায়নি।

সীমা খানিকটা বুঝতে পেরে বলল, অফিস থেকে তাড়াহুড়ো করে পাঠাল। আমি একটু আপত্তি করেছিলাম, বলেছিলাম, এ-সপ্তাহে না গিয়ে পরের সপ্তাহে যা—

প্রদীপ হেসে বলল, পত্র-পত্রিকার কাজে কি এ-সপ্তাহের বদলে পরের সপ্তাহে গেলে চলে? ততদিনের খবর একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়।

বিপুল বলল, মিলি ক'দিন বাইরে থাকবে?

সীমা বলল, বেশি না, চার-পাঁচ দিন। প্লেনে গেছে।

বিপুল বলল, তুমি একা থাকবে? কখনও তো থাকনি। নিচে আমাদের ওখানে গিয়ে মায়ার সঙ্গে শুতে পারো।

সীমা বলল, আমাকে কী ভাবেন বলুন তো! ছেলেমানুষ নাকি? বুড়ি হয়ে গেলাম একা থাকতে ভয় কী!

প্রদীপ বলল, বুড়িরাই একা থাকতে ভয় পায়। তুমি বুড়ি হওনি, তুমি ভয় পাবে না। মাঝে-মাঝে দু-চার দিন একা থাকতে তো ভালোই লাগে। এই ক'দিন দেখবে, তোমার একটু অন্যরকম লাগবে। অন্য সময় তুমি মিলির মা। তোমার নিজের কাছে সেটাই তোমার পরিচয়। একা থাকার সময় তুমি সেটা টের পাবে যে, তুমি সীমা, তোমার আলাদা একটা পরিচয় আছে।

বিপুল বলল, আজ এখনও রান্নাবান্না করোনি তো! শুধু নিজের জন্য কী রান্না করবে!

প্রদীপ বলল, এর মধ্যে তা হলে সীমা আমাদের একদিন রান্না করে খাওয়াক।

বিপুল বলল, শুধু-শুধু ওকে ঝামেলায় ফেলবি কেন? সীমাই বরং আমাদের সঙ্গে গিয়ে খাবে।

প্রদীপ বলল, বাঃ, বিনায়কের বউ একদিন আমাদের রান্না করে খাওয়াবে না? আমরা না হয় বাজার-টাজার করে দেব।

সীমা বলল, আপনাদের বাজার করতে হবে না। আমি একদিন খাওয়াব। কবে আসবেন বলুন।

বিপুল বলল, সে পরে ঠিক করা যাবে। প্রদীপ তো আছে চার-পাঁচ দিন। সীমা, তুমি এখন আমাদের সঙ্গে ওখানে চলো। একসঙ্গে আড্ডা দেবো, তারপর আমাদের সঙ্গে খেয়ে নেবে। প্রদীপের কাছে তেহেরানের অনেক মজার-মজার গল্প শুনতে পাবে।

সীমা তিনটে কাপে চা ঢালল। বিনায়কের দুই বন্ধু এসে পড়ায় তার শূন্যতাবোধটা অনেকটা কেটে গেছে। এরপর বিপুলদের ফ্ল্যাটে গিয়ে গল্প করতে তার খারাপ লাগবে না।

প্রদীপ জিগ্যেস করল, মায়া থিয়েটার দেখতে গেছে, তুমি যাওনি কেন, সীমা?

বিপুল বলল, সীমা তো বাড়ি থেকে বেরুতেই চায় না। মায়া কতবার বলেছে। সীমা সেই সকালবেলা একবার ইস্কুলে যায়। তারপর তো দেখি সারা সন্ধে মেয়ের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে।

প্রদীপ একটু ঠাট্টার সুরে বলল, একেবারে মেয়ে-অন্ত প্রাণ। কিন্তু মেয়ে তো এখন বড় হয়ে

গেছে।

বিপুল বলল, সীমা একার চেষ্টায় মেয়েটাকে তো মানুষ করে তুলেছে। খুব ভালো মেয়ে হয়েছে মিলি। সীমার খুব মনের জোর।

প্রদীপ বলল, তুমি সিনেমা-থিয়েটার কিছু দেখো না বুঝি?

সীমা বলল, দেখব না কেন? মিলিই তো প্রায় টিকিট কেটে আনে।

দরজায় আবার ঠকঠক হল। শাড়ি-জামার ইস্তিরির লোকটা এসেছে। দোতলা থেকে আর একটা বাচ্চা মেয়েও এসেছে। সে জানাল যে বিপুলকে টেলিফোনে কেউ ডাকছে।

বিপুল তাড়াতাড়ি চা শেষ করে বসল, প্রদীপ, তুই চা খেয়ে নে। সীমাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে চলে আয়।

বিপুল চলে যাওয়ার পর সীমা ইস্তিরিওয়ালাকে কাপড়-জামা বুঝিয়ে দিল। ইচ্ছে করে সে দেরি করল খানিকটা। প্রদীপ চুপ করে বসে আছে। সীমা ঘর থেকে বেরুচ্ছে, দরজার কাছে যাচ্ছে, তাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে সে।

একসময় দরজা বন্ধ করে টেবিলের কাছে ফিরে আসতেই হল সীমাকে। প্রদীপ তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

প্রায় মিনিট দু-এক কোনও কথা বলল না দুজনে।

তারপর প্রদীপ জিগ্যেস করল, কেমন আছ, সীমা?

সীমা বলল, ভালো!

প্রদীপ একটু হেসে বলল, আমার ওপরে এখনও রাগ আছে?

সীমা উদাসীন গলায় বলল, না!

আরও একটুক্ষণ চুপ করে রইল প্রদীপ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। তাতে খসখস করে কিছু লিখে বলল, আমি তাজ হোটেলে উঠেছি। এই আমার রুম নাম্বার। তুমি ইচ্ছে করলে একবার আসতে পার। এই গরমে আমি দুপুরের দিকটায় বেরোই না। তুমি এলে কিছু কথা বলতে পারি। এখানে আর বসব না। আর কেউ নেই, শুধু আমার সামনে বসতে তোমার অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারছি। হোটেলের ঘরেও অবশ্য আর কেউ থাকবে না। কিন্তু সেখানে তুমি গেলে বুঝব, নিজের ইচ্ছেতে এসেছ। আসতে পার, অন্য কোনও ভয় নেই।

কাগজটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল না সীমা। কোনও কথা বলল না। মুখ নিচু করে রইল।

প্রদীপ কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, ইচ্ছে হয় তো এসো।

হোটেলে যদি আসতে না চাও, অন্য কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। কিন্তু এখানে নয়।

সীমা তবু কোনও উত্তর দিল না দেখে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল প্রদীপ।

॥ ৩ ॥

মিলি একেবারে ঠিক দিনে পৌঁছল হায়দ্রাবাদে। পরদিনই অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পতন হয়ে গেল দিল্লির নির্দেশে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার মিলির আগে কলকাতার আর কোনও কাগজ পায়নি। মিলি এর আগে কোনও পলিটিক্যাল স্টোরি করেনি, সবাই তার লেখাটা পড়ল, তার নাম জানল।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কীভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়, সেসব ব্যাপারে কোনও যোগ্যতা ছিল

না মিলির। হীরেন তাকে সাহায্য করল খুব। হীরেন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার।

হোটেলে পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছে ওরা। পরের দিন খবর-টবর সব পাঠিয়ে ফিরতে-ফিরতে রাত হল অনেক। হোটেলে এখন আর খাবার পাওয়া যাবে না। দুজনেরই খিদে পেয়েছে সাংঘাতিক। খাবার পাওয়া যাবে না শুনে খিদে আরও বেড়ে গেল।

হীরেন বলল, হায়দ্রাবাদ শহরে কাবাব-টাবাবের অনেক দোকান খোলা থাকে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত। বেরিয়ে খাবার জোগাড় করব। তুই স্নান-টান করবি তো করে নে, ততক্ষণে আমি একটু তৈরি হয়েনি।

হীরেনের তৈরি হওয়া মানে বোতল খোলা। কাজের সময় সে খুবই মনস্ক, কিন্তু তারপরে তার বেশ খানিকটা মদ গেলা চাই।

মিলি স্নান সেরে, পোশাক বদল করে হীরেনের ঘরে এসে বলল, এই, যাবি না?

হীরেন বলল, খুব খিদে লেগেছে। চিজ খা। বাদাম খা। একটুখানি বোস।

আর একটা গেলাস নিয়ে হীরেন বলল, তুই জল, না সোডা দিয়ে খাবি?

মিলি বলল, আমি হুইস্কি খাই না। রাম থাকলে একটু খেতে পারতাম।

মিলির কথা গ্রাহ্য করল না হীরেন। দ্বিতীয় গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল। তারপর বলল, বাইরে এলে সবসময় খানিকটা চিজ, বাদাম, বিস্কিট এসব সঙ্গে রাখবি। কখন কী পাওয়া যাবে তার তো কোনও ঠিক নেই। জার্নালিস্টদের কি কখনও সময়ের ব্যাপারে ঠিক থাকে! এই নে!

মিলি বলল, বললাম যে আমি হুইস্কি খাই না। তোর কাছে রাম তো নেই!

হীরেন ধমক দিয়ে বলল, ধর, রাম আর হুইস্কি কী তফাত রে? এসব দিশি জিনিস সবই এক। নেশা করা নিয়ে ব্যাপার।

—তোর মতন আমি নেশা করতে চাই না।

—আমাকে কম্পানি দে। ধর গেলাসটা!

—বলছি তো খাব না!

—জেদি মেয়ে! ঠিক আছে, খেতে হবে না। চুপ করে বসে থাক। আমি আরও দুটো খেয়ে বেরুব।

—আরও দুটো খাবি? অত রাত্তিরে আমি আর বেরুতে চাই না। তা হলে আমি শুতে যাচ্ছি!

—দুটো খেতে কতক্ষণ সময় লাগে তোর ধারণা! দেখবি?

পরপর দু-চুমুকে হীরেন দু-পেগ হুইস্কি শেষ করল। ক্যামেরার ব্যাগটা চাপিয়ে বলল, চল।

—এগুলো নিয়ে যাচ্ছিস কেন?

—এই দামি ক্যামেরা আমি হোটেলে রেখে যাব? তোর মাথা খারাপ? টাকা-পয়সা কিছু রেখে যাচ্ছিস না তো? সবসময়ে সঙ্গে রাখবি!

এত দ্রুত হুইস্কি পান করেও হীরেনের পা টলে না। মাথা পরিষ্কার। হোটেলের নিচে এসে সে একটা ফটফটিয়া ভাড়া করল। তার চালককে বোঝাল যে, এখন দু-ঘণ্টা ঘুরতে হবে, আবার তাদের হোটেলে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে ভাড়া পাবে।

প্রথম দু-তিনটে দোকান দেখে হীরেনের পছন্দ হল না। তারপর একটা দোকান পাওয়া গেল, রাত বারোটার সময়ও সেটা বেশ জমজমাট।

বাইরের দিকে দুটো উনুনে কাবাব পরোটা তৈরি হচ্ছে। ভেতরে অনেক খদ্দের, রাস্তার ওপর বেঞ্চ পেতেও বসেছে কয়েকজন।

হীরেন বলল, বাঃ, এইটাই তো চমৎকার।

বাইরের বেঞ্চেই বসল দুজনে। নিজেদের জন্য এবং ফটফটিয়া চালকের জন্যও কাবাব-পরোটা

অর্ডার দিল হীরেন। তারপর তাকিয়ে দেখল, অন্যান্য খদ্দেরদের হাতে গেলাশ।

একজন বাচ্চা মতন বেয়ারাকে ডেকে চুপি-চুপি সে জিগ্যেস করল, ওরা কী খাচ্ছে?

ছেলেটি বলল, রাম।

হীরেন খুশি হয়ে বলল, দো পেগ লাগাও।

ছেলেটি জল মিশিয়ে দু-গেলাস রাম নিয়ে আসতেই মিলি বলল, পাগল নাকি? আমি খাব না।

হীরেন বলল, এই যে তখন বললি, হুইস্কির বদলে রাম খাবি?

মিলি বলল, তখন বলেছিলাম, কিন্তু এখানে বসে খাব নাকি?

হীরেন বলল, আরে তাতে কী হয়েছে? জার্নালিস্ট হয়েছিল, অত জায়গা নিয়ে বাছ-বিচার করলে চলে? নে, ধর, ধর।

গেলাসটা নিতেই হল মিলিকে। হীরেন সিগারেট জ্বেলে প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই মিলি চাপা ধমক দিয়ে বলল, এখানে আমি কিছুতেই সিগারেট খাব না।

অন্য খদ্দেরদের মধ্যে আর একটিও মেয়ে নেই। কয়েকজন ত্যারছা চোখে মিলিকে দেখছে।

গেলাসটাতে একটা চুমুক দিয়েই মিলির হাসি পেয়ে গেল। তার মা যদি কোনওক্রমে জানতে পারে যে মিলি রাত বারোটার সময় একটা অচেনা শহরে, রাস্তার ধারের দোকানে কতকগুলো গুন্ডামতন লোকের মাঝখানে বসে মদ খাচ্ছে, তা হলে মা একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবে!

একটা গেলাসই মিলি হাতে নিয়ে বসে রইল। সে কিছুতেই এর বেশি খাবে না। মেয়ে হয়েও সে যে-কোনও কিছুতেই ভয় পায় না, সেটাই যেন সে হীরেনের কাছে প্রমাণ করতে চায়।

হীরেন দুবার নিল। তারপর সবেমাত্র একটুখানি পরোটা-মাংস খাওয়া হয়েছে এমনসময় খানিক দূরেই প্রচণ্ড বোমা ফাটল কয়েকটা। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষজনের তুমুল চিৎকার।

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাল। কাছেই একটা বাজার, সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। একদল লোক রে-রে করে ছুটে এল এদিকে। হীরেন আর দেরি করল না, মিলির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে দৌড়ে ঢুকে গেল একটা সরু গলির মধ্যে। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে লাফ মারল। সেখানে রয়েছে একটা খড়ের গাদা। দুজনে প্রায় ডুবে গেল তার মধ্যে।

মিলির মুখে হাত চাপা দিয়ে হীরেন বলল, চুপ, কোনও শব্দ নয়। ভয় নেই।

হিরেনের বুকের সঙ্গে লেপ্টে থেকেও মিলি থরথর করে কাঁপছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাইরে চিৎকার—চেঁচামেচি মিলিয়ে গেল একেবারে। হঠাৎ সব চুপ।

হীরেন আগে একা উঠে দাঁড়াল। সামনে গিয়ে খানিকটা উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে এসে বলল, অল ক্লিয়ার। উঠে আয়।

মিলি হাত ধরে গলির বাইরে এসে দেখল কোথাও কোনও মানুষ নেই। দোকানটার ঝাঁপ বন্ধ। বেঞ্চিগুলোও তুলে ফেলেছে। সবাই একেবারে হাওয়া। শুধু দূরের বাজারের কাছে আগুন জ্বলছে। সেখানে আবার দুটো বোমা ফাটার শব্দ হল।

হীরেন বলল, শালা, খাওয়াটা হল না ভালো করে। মুখের গেরাশ কেড়ে নিল।

ফটফটিয়াওয়ালাও পালিয়েছে। গাড়ি-ঘোড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

মিলি ফ্যাকাসে গলায় জিগ্যেস করল, আমাদের হোটেলটা কোনদিকে? যাব কী করে?

হীরেন বলল, হোটেলে যাব মানে? দাঙ্গা লেগে গেছে, বুঝতে পারছিস না? এখন যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

মিলি শিউরে উঠে বলল, দাঙ্গা?

—হ্যাঁ, দাঙ্গা কি রোজ-রোজ হয় নাকি? এরকম একটা চান্স পাওয়া গেছে, এটাকে পুরো

কভার করতে হবে। তুই তো খুব লাকি রে মিলি। একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিবি।

—আমি দাঙ্গার রিপোর্ট করতে পারব না। আমি এক্ষুনি হোটেলে ফিরতে চাই।

—তুই ফিরতে চাস, চলে যা। হোটেলে বসেও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লেখা যায়। যা খুশি লেখা যায়। কিন্তু ছবির বেলায় তো চালাকি চলে না। স্পটে গিয়ে ছবি তুলতে হয়। আমি তো এখন ফিরতে পারব না।

—আমি একা হোটেলে যাব কী করে?

—সেটা আমি কী জানি ভাই। তোর কাজ তুই করবি, আমার কাজ আমাকে করতে হবে। এইরকম জায়গাতে থেকেও ছবি না তুলে ফিরলে সুব্রত আমাকে রক্ষে রাখবে।

বাজারের কাছে গোলমালটা এখন হিংস্রতা ও আর্ত চিৎকারে ভরে গেছে। খুব জোর মারামারি চলছে সেখানে। এখানকার সব বাড়ির জানলা-বন্ধ, কেউ আশ্রয় দেবে না।

হর্ন বাজাতে-বাজাতে খুব স্পিডে ছুটে আসছে একটা পুলিশের গাড়ি।

হীরেন এক লাফ দিয়ে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। দারুণ ঝুঁকি নিয়েছিল সে, গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষাতে কর্কশ শব্দ হল।

হীরেন হাত নেড়ে বলল, মিলি, শিগগির আয়! শিগগির!

এতসব কাণ্ড দেখে মিলির বুক টিপটিপ করছে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ। সে দৌড়ে এল গাড়ির কাছে।

হীরেন পুলিশের গাড়িটাতে উঠতে যেতেই একজন পুলিশ রুক্ষভাবে তাকে ঠেলে দিয়ে হিন্দিতে বলল, আপনারা এখানে কী করছেন?

হীরেন তার উত্তর না দিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, গাড়িতে উঠতে দিন! উঠতে দিন!

পুলিশটি এবার রিভালভার বার করে ধমক দিয়ে বলল, কে আপনারা? কী চাই?

সেটাও গ্রাহ্য না করে হীরেন বলল, গাড়িতে উঠতে দেবেন না নাকি?

আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে আপনাদেরও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অন্য একজন পুলিশ গলা বাড়িয়ে বললে, ওদের তুলে নাও। কিন্তু আপনাদের আমরা এখন বাড়ি পৌঁছে দিতে পারব না। এত রাত্রে কি ফুর্তি করতে বেরিয়েছিলেন?

হীরেন বলল, বাড়ি পৌঁছে দিতে তো বলিনি! আপনারা যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই যাব। এইরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় পুলিশের সঙ্গ কেউ কি ছাড়তে চায়?

পুলিশটি ঠাট্টার সুরে বলল, বটে! আপনার তো সাহস কম নয়!

আপনি হঠাৎ গাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আর একটু হলে চাপা পড়তে পারতেন!

হীরেন হো-হো করে হেসে উঠে বলল, পাগল নাকি? জার্নালিস্টরা কখনও চাপা পড়ে না। আজ পর্যন্ত কখনও শুনেছেন যে কোনও জার্নালিস্ট পুলিশের গাড়িতে চাপা পড়েছে?

—আপনারা জার্নালিস্ট?

—ইয়েস। ইনি আমার কলিগ মিস মিলি সান্যাল। আজই ইনি চিফ মিনিস্টারের ইন্টারভিউ নিয়েছেন। সরি, এক্স-চিফ মিনিস্টার। কাল সকালে গর্ভনরের সঙ্গে অ্যাপয়েমেন্ট আছে।

—আজ এই তো এইমাত্র এখানে দাঙ্গা শুরু হল। এর মধ্যেই আপনারা এখানে হাজির হলেন কী করে?

—জার্নালিস্টদের সব খবর রাখতে হয়।

মিলি এতক্ষণ বাদে একটু সামলে নিয়ে বলল, আমরা এখানে কাবাব খেতে এসেছিলাম। হঠাৎ শুরু হয়ে গেল।

—এই জায়গাটা রাত্তিরে এমনিতেই খুব নিরাপদ নয়।

—দোকানের লোকেরা আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো ব্যবহার করছিল।

এবার গাড়িটার একেবারে সামনেই পরপর দুটো বোমা পড়ল। গাড়িটা থেমে গেল সঙ্গে-সঙ্গে, পুলিশরা সবাই নেমে পড়ল লাফিয়ে। একেবারে বিনা নোটিসে গুলি চালিয়ে দিল একজন।

হীরেন বলল, নেমে পড়, নেমে পড়।

দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মিলি হীরেনকে জড়িয়ে ধরেছে। এর আগে কখনও সে এত কাছ থেকে গুলির আওয়াজ শোনেনি, এমনভাবে বোমা পড়তেও দেখেনি। হীরেনের কথায় সে কোনও সাড়া দিল না।

হীরেন খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, পুলিশগুলো তো সব কেটে পড়ল, এবার ব্যাটারা গাড়িটায় আগুন ধরিয়ে দেবে। সাধারণত তাই দেয়।

মিলি আরও জোরে জড়িয়ে ধরল হীরেনকে।

হীরেন সেই আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিতে-নিতে হেসে বলল, গাড়ি পোড়ালেও অবশ্য সাংবাদিকরা পোড়ে না। সাংবাদিকরা অমর।

উঠে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরাটা বাগালো।

সামনের রাস্তায় লাঠিসোটা ও লোহার রড-ধরা বেশকিছু লোককে তাড়া করে যাচ্ছে পুলিশ। কাছে দাউ-দাউ করে জ্বলছে কয়েকটা দোকান। গাড়ির ওপর থেকে ছবি তোলার বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না বলে হীরেন আস্তে-আস্তে নেমে গেল গাড়ি থেকে। আড়াল দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, মিলি, আমার পেছন-পেছন আয়। কোনও ভয় নেই।

খুব শোরগোল তুলে এসে পড়ল আরও দুটি পুলিশের গাড়ি আর দমকল।

হীরেন বলল, এবার থেমে যাবে। এত পুলিশের সঙ্গে লড়াই করার ধক ওদের নেই।

দাঙ্গাকারীরা সত্যি এবার পালাচ্ছে। পুলিশ তবু গুলি চালাল পাঁচবার। সম্ভবত আকাশের দিকে।

এরপর আর মিলির দিকে একদম মনোযোগ না দিয়ে সামনে ছুটে গেল হীরেন। শুধু কর্তব্যের টানেই নয়, ছবি তোলা তার নেশা। আগুনে পোড়ানো দোকান, আহত মানুষের একেবারে ক্লোজ-আপ তুলে আনল সে।

একটা পুলিশের গাড়িই ওদের পৌঁছে দিয়ে গেল হোটেলে।

নিজের ঘরের চাবি খুলতে-খুলতে হীরেন বলল, শালা নেশাফেশা ছুটে গেল একেবারে। পেটও ভরল না। আয় মিলি, আমার ঘরে একটু বসে যা। এখন শুয়ে পড়লেও তোর ঘুম আসবে না।

মিলি মনে-মনে সেটাই চাইছিল। তার সামনে দিয়ে একজন ছুরিবেঁধা মানুষকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তোলা হয়েছিল অ্যাম্বুলেন্সে, সেই দৃশ্যটা দেখার পর থেকেই তার গা গুলোচ্ছে। ভেতরে এসে সে ফ্লাস্ক থেকে জল খেল দু-গেলাস।

হীরেন বলল, একটা খুব ক্ষতি হয়ে গেল। এই দাঙ্গা-ফাঙ্গাগুলো লাগা উচিত বিকেলের দিকে। বেশ ভালোভাবে খবর আর ছবি পাঠানো যায়, পরেরদিন কাগজে টাটকা বেরিয়ে যায়। মাঝ রাত্তিরের ঘটনা, এখন খবর পাঠালেও ধরানো যাবে না আর ছবি পাঠাবার তো কোশ্চেনই নেই।

মিলি বলল, এই দাঙ্গা এখন ক'দিন চলবে তার কি কোনও ঠিক আছে? যদি বেড়ে যায়?

হীরেন বলল, যদি দাঙ্গা বেড়ে যায় আর সাত-আট দিন ধরে চলে, তা হলে আমাদের এই হোটেলে বন্দি হয়ে থাকতে হবে।

সারা মুখে শঙ্কা ছড়িয়ে মিলি বলল, অ্যাঁ! তখন আমরা কি করব?

ক্যামেরার ব্যাগ নামিয়ে রেখে হীরেন এগিয়ে এল মিলির কাছে। তার গলায় দু'হাত রেখে

বলল, তখন আমরা প্রেম করব।

মিলি বলল, এই, সত্যি কী করে আমরা যাব বল না?

হীরেন তার উত্তর না দিয়ে বলল, তোকে একটা চুমু খাব?

মিলি সাংঘাতিক অবাক হয়ে গেল। হীরেনের কাছ থেকে সে যেন এরকম কথা আশাই করেনি। হীরেন কখনও এরকম কথা বলে না। মেয়ে হিসেবে কখনও কোনও আলাদা ব্যবহার করে না। আজই পুলিশের গাড়িতে মিলি যখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, তখনও হীরেন কোনওরকম সুযোগ নেয়নি। অনেক সময় হীরেন সাবলীলভাবে মিলির কাঁধে হাত রাখে, মেয়েরা স্পর্শেই বোঝে তার মধ্যে কোনও লোভ কিংবা প্রেম আছে কিনা।

একটু সরে যাওয়ার চেষ্টা করে মিলি বলল, অ্যাই, কী ন্যাকামি হচ্ছে?

—একটু চুমু খাব না? তোর শুচিবাই আছে নাকি?

—শুচিবাই আবার কী? হঠাৎ এসব তোর মাথায় ঢুকল কেন?

—টায়ার্ড হয়ে এসেছি। একটা চুমু খেতে ইচ্ছে হয়েছে, তাতে দোষের কী আছে?

—টায়ার্ড হয়ে এসেছিস, জল খা। ওসব চলবে না, আমার আপত্তি আছে।

—অ, বুঝেছি। তুই তো আবার শংকরের সঙ্গে নটঘট বাধিয়ে বসে আছিস। আমাকে চুমু খেলে সতীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁরে মিলি, তোর কি ধারণা, শংকর তোকে বিয়ে করবে? ও গভীর জলের মাছ!

—তোর কী করে ধারণা হল যে আমি শংকরকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত?

—তুই বিয়ে করতে চাস না?

—আমি সে কথা কখনও ভেবেই দেখিনি।

—আমি এমন কোনও মেয়ে দেখিনি, যে একটা বেশ চৌকশ ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে, অথচ তাকে বিয়ে করার কথা ভাবে না।

—কখনও দেখিসনি? তা হলে ভালো করে চেয়ে দ্যাখ, তোর চোখের সামনেই রয়েছে।

—তুই তা হলে ব্যতিক্রম!

দূরে সরে গিয়ে হীরেন হুইস্কি বোতলটা হাতে তুলে নিল।

মিলি বলল, তুই এখন আবার মদ খাবি?

হীরেন বলল, বেশি না। মাত্র এক পেগ। চুমুর বদলে। খুব ভালো সাবস্টিটিউট। হুইস্কি কখনও বিট্রে করে না।

—তুই তা হলে গেল্ ওসব, আমি ঘরে যাচ্ছি।

—তুই চলে গেলে আমি কিন্তু বেশি খাব। বোতল শেষ করে ফেলব। বোস একটুখানি, প্লিজ।

—ঠিক পাঁচ মিনিট।

—শংকর ছেলেটা ভালো। খুব ট্যালেন্টেড, কিন্তু ছটফটে। মেয়েদের ব্যাপারে...

—অনুপস্থিত কারুকে নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়।

—আরে, একটু-আধটু পরচর্চা না করলে কি জমে? আমি কিন্তু শংকরের নামে নিন্দে করতে যাইনি।

—শংকর সম্পর্কে আমি অন্য কারুর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই না।

—আচ্ছা, ঠিক আছে।

একটা চেয়ারে বসে মিলি ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে চুলের জট ছাড়াতে লাগল। সারাদিন প্রচুর ঘোরাঘুরিতে অনেক ধুলো জমেছে।

এতক্ষণ পর হীরেন বলল, ওঃ, কী সংঘাতিক দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম আজ! পুলিশের গাড়িটা না এসে পড়লে কী হতো বলা যায় না।

॥ ৪ ॥

সকালে ঘুম ভাঙার পর সীমা টের পেল তার একটু-একটু জ্বর এসেছে। ছলছল করছে চোখ, গলাব্যথা, সারা শরীরে অস্থিরতা। স্পষ্ট ঠান্ডা লাগার উপসর্গ। সীমা পারতপক্ষে স্কুল কামাই করে না। আজ স্কুলে না গেলেও চলে। কিন্তু মনে পড়ে গেল, আজ দুপুরে বিশাখার বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন। সহকর্মিণীদের মধ্যে বিশাখা তার খুব ঘনিষ্ঠ। বিশাখার বাড়িতে যেতেই হবে। স্কুলে না গেলে বিশাখা চিন্তা করবে।

রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। এখন বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তবু উঠে পড়ল সীমা। পর-পর দু-কাপ চা খেল। চা খেতে-খেতে মনে হল, শরীর বেশ ভালো হয়ে গেছে, জ্বরটর আর আসবে না।

কিন্তু স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকতেই হু-হু করে বেড়ে গেল শরীরের উত্তাপ, মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হল যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। সীমা দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তাকাল বন্ধ দরজার দিকে। ছিটকিনি তোলা। সত্যি যদি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত এখানে, তা হলে কেউ টেরও পেত না।

আস্তে-আস্তে এসে সে ছিটকিনিতে আঙুল রাখল।

অনেক গল্প শোনা যায়, বাথরুমের মধ্যে কারুর হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক হল, কেউ দরজা খুলে ঢুকতে পারল না, সেখানেই সে মরে গেল।

ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই, বাথরুমের দরজা সে খোলা রাখতেও পারত, কিন্তু অভ্যাস।

এমনিতে সীমার তেমন অসুখ-বিসুখ হয় না। মিলি চলে যাওয়ার পরেই তার শরীর খারাপ হল। মিলি গেছে মাত্র একদিন আগে। অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদিন!

আস্তে-আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়ল আবার। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এরপর আর স্কুলে যাওয়া যাবে না।

শুয়ে-শুয়ে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল সীমার। কথাটা কাল বলেছিল প্রদীপ। এই কথাটা সে অনেক দিন আগেও একবার বলেছিল। এখানে, এই খাবার ঘরের টেবিলে বসে। বলেছিল, সীমা, তুমি বড্ড বেশি মিলির মা হয়ে গেছ। সবসময় তুমি মা হয়ে থাকবে কেন? তুমি তো একটি নারী। তোমার আলাদা একটা সত্তা নেই?

বিনায়ক হঠাৎ চলে যায়। দিব্যি স্বাস্থ্যবান, হাসিখুশি পুরুষ, ভবিষ্যতের কত পরিকল্পনা ছিল তার। বেয়াল্লিশ বছরে হার্ট-অ্যাটাকের পর মাত্র একঘণ্টা বেঁচেছিল। সীমাকে একটা কথাও বলে যেতে পারেনি।

সীমা শুধু মেয়ের কথা ভেবেই একেবারে ভেঙে পড়েনি।

মিলির তখন যা বয়েস, তার দিকে ভালো করে নজর না রাখলে অনেক বিপদের আশঙ্কা ছিল। তাই মিলির দিকেই সবটুকু মনোযোগ দিয়েছিল সীমা। নিজের কথা আর ভাবেনি।

বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে একবারে গুটিয়ে নিয়েছে সীমা সেই থেকে। বিশেষ কোথাও যায় না। মা আর মেয়ে মিলে একটা আলাদা ছোট জগৎ হয়ে গিয়েছিল। প্রদীপের কথা ঠিক, সে শুধু হয়ে গিয়েছিল মিলির মা।

সেই ছোট্ট জগৎটা ছেড়ে মিলি এখন বাইরে বেরিয়ে গেছে। সীমাকে এখন একা-একা পড়ে থাকতে হবে এখানে। সে বাইরে বেরুবার পথ ভুলে গেছে।

প্রদীপও ছিল বিনায়কের বন্ধুদের মধ্যে একজন। জার্মানি থেকে ফিরে প্রদীপ কলকাতায় ব্যবসা শুরু করেছে। বিনায়কের মৃত্যুর পর প্রদীপ খোঁজখবর নিতে আসত প্রায়ই। প্রদীপের স্বভাব ছিল বিচিত্র। এক-একদিন এসে বসে থাকত ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। সীমার অস্বস্তিবোধ হতো। মিলি কলেজে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে আর কেউ নেই, শুধু সে আর প্রদীপ।

শুধু অস্বস্তি নয়, দৃষ্টিকটু ব্যাপার। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ রাখতেই হয়। তাকে আর প্রদীপকে নিয়ে লোকে কথা বলতে শুরু করতেই তো পারে। জার্মানিতে হয়তো এরকম চলে, এদেশে চলে না। প্রদীপ তা কিছুতেই বুঝবে না। অথচ প্রদীপের ব্যবহার খুবই ভদ্র, কোনওরকম অশোভন আচরণ তার কাছ থেকে আশঙ্কা করা যায় না। তাকে হঠাৎ চলে যেতে বলবে কী করে সীমা।

তবু সীমা মাঝে-মাঝেই নানান ছুতোয় ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাখত, আকারে ইঙ্গিতে প্রদীপকে বলত, আপনি অফিসে যাবেন না? নতুন বিজনেস শুরু করেছেন, সবসময় খাটতে হয় না?

প্রদীপ হুঁ-হ্যাঁ করত। ওঠার লক্ষণ দেখাত না তবু।

জার্মান স্ত্রীর সঙ্গে ডির্ভোস হয়ে গেছে দু-বছর আগে, প্রদীপের বাড়িতে কেউ নেই। ওর বাবা-মা থাকতেন বরোদায়। কলকাতায় কোনও আত্মীয়-স্বজনও ছিল না। ওর নিঃসঙ্গতাটা অনুভব করা যেত। হয়তো সেই জন্যই সীমার নিঃসঙ্গতার কাছাকাছি এসে বসে থাকত প্রদীপ।

একদিন বেলা এগারোটা আন্দাজ প্রদীপ বসেছিল খাবার টেবিলে, সীমা রান্নাঘরে রান্না শুধু করছিল। পর পর তিন কাপ চা খেয়েছে প্রদীপ, তবু তার ওঠার নাম নেই, ওখান থেকেই সে দু-একটা কথা বলছিল সীমার সঙ্গে, সীমা রান্নাঘর থেকে উত্তর দিচ্ছিল।

একসময় প্রায় দশ-পনেরো মিনিট একেবারে চুপচাপ। সীমা মুখ ফিরিয়ে দু-একবার দেখেছিল, প্রদীপ একদৃষ্টিতে তার রান্না দেখছে।

হঠাৎ উঠে এসে প্রদীপ তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিল, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

সীমা একেবারে আমূল চমকে উঠেছিল।

প্রদীপ আগে কোনওদিন তার হাতও ধরেনি। কিন্তু এ স্পর্শ অন্যরকম।

সীমা বলেছিল, কোথায় যাব?

প্রদীপ বলেছিল, আমার সঙ্গে। তুমি আমার কাছে থাকবে।

হঠাৎ অপমানে মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল সীমার। কী বলতে চায় প্রদীপ? এ দেশে যৌবন থাকতে-থাকতে কোনও মেয়ে বিধবা হলে কিংবা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে, অনেকেই তাকে সহজলভ্য মনে করে। দু-বছরের মধ্যেই এ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছিল সীমার। কত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও ইঙ্গিত দিয়েছে, গোপনে একটু ফূর্তি করার জন্য।

প্রদীপও সেই দলে? মানুষ চেনা এত শক্ত।

প্রদীপ বলেছিল, তুমি একা-একা থাকবে কেন? আমিও তো একা-একা থাকি। আমার ভালো লাগে না। আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না?

সীমা একটু সরে গিয়ে তীক্ষ্ণভাবে বলেছিল, আমি তো একা থাকি না। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে থাকি।

প্রদীপ যেন সেকথা শুনতেই পেল না। সে সীমার চোখের দিকে চেয়ে আপনমনে বলল, তুমি রান্না করছ, স্টোভের আঁচে তোমার মুখখানা লালচে হয়ে গেছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎ ইচ্ছে করল তোমাকে আদর করতে। কিন্তু বিনায়কের স্ত্রীকে তো আমি এমনি-এমনি আদর করতে পারি না। তাই মনে হল, আমার দুজনেই এখন একা, আমরা বিয়ে করছি না কেন? সীমা, আমাকে

বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে?

এ-ও এক ধরনের আকস্মিকতা। সীমা থতমত খেয়ে কোনও কথাই বলতে পারল না।

প্রদীপ আবার বলল, এসো না, আমরা বিয়ে করি।

সীমা খানিকটা ভয় পাওয়া গলায় বলল, না, না, তা হয় না, আমার মেয়ে আছে।

প্রদীপ বলল, মেয়ে আছে? মিলি, হ্যাঁ, মিলিও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মিলি তো আমায় বেশ পছন্দই করে।

—না, না, না, তা হয় না।

—কেন হয় না?

—এরকম কথা আপনি আর কক্ষনো বলবেন না। আমি এরকম কথা চিন্তাও করি না।

—আমিও আগে চিন্তা করিনি। আজই হঠাৎ মনে হল। এটা তো খারাপ কিছু নয়। তোমার আপত্তি কিসের?

—আমি এ বিষয়ে আর কোনও আলোচনাই করতে চাই না।

—তুমি বাকি জীবনটা কীরকম ভাবে কাটাবে সীমা? আমিও একটা আশ্রয় চাই। তুমি যদি আমাকে আশ্রয় দিতে—

—আপনি যা চাইছেন, তা আমার কাছে পাবেন না। প্লিজ, এরকম কথা যখন আপনার একবার মনে হয়েছে, আপনি আর আমার কাছে আসবেন না।

—আমি তোমার কাছে আর আসব না?

—আমি আর আপনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারব না।

—আমি কথাটা বলে অন্যায় করেছি?

—দুপুরবেলা আমার একা থাকতেই ভালো লাগে।

প্রদীপ যেন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। সীমা যে তাকে অপমান করছে, তাকে চলে যেতে বলছে, সেটাও যেন সে বুঝতে পারছিল না।

একটু বাদে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, ও, আই অ্যাম সরি।

সেই অবাক ভাবটাই মুখে রেখে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর কোনওদিন আসেনি।

প্রদীপের কলকাতার ব্যবসা ঠিকমতো জমল না। সেসব গুটিয়ে ফেলে, সে আবার ফিরে গেল জার্মানি।

এতদিন পরে আবার দেখা।

প্রদীপের সেদিনের ব্যবহার নিয়ে পরে অনেক ভেবেছে। প্রথম দিকে প্রদীপের ওপর তার বেশ রাগই ছিল। প্রদীপের যোগ্যতা ছিল অনেক, বিনায়কের বন্ধুদের মধ্যে প্রদীপকে বেশ পছন্দই করত সীমা। কিন্তু প্রদীপ হঠাৎ অমনভাবে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে যেন অপমান করেছিল।

কিছুদিন পরে অবশ্য সীমার মনটা কিছুটা নরম হয়। প্রদীপ তো অন্য কোনওরকম অসভ্যতা কখনও করেনি। মিলির পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল। একা-একা সীমার কাছে বসে থাকত অতক্ষণ, কিন্তু কোনওরকম সুযোগ নেওয়ার তো চেষ্টা করেনি।

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াটা তো অন্যায় কিছু নয়। বিয়ে তো সামাজিক ভাবে স্বীকৃত একটা প্রথা। বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে সমাজ কখনও মাথা গলায় না। প্রদীপের প্রস্তাবে শুধু সীমা তার আপত্তি জানালেই তো পারত, উলটে তাকে অপমান করার তো কোনও প্রয়োজন ছিল না।

সীমা আপত্তি জানিয়েছিল কেন? পরলোকে সীমার বিশ্বাস নেই। ওপর থেকে বিনায়ক দেখবে এবং দুঃখ পাবে, এরকম কথা সীমা ভাবে না। ভারতীয় হিন্দু বিধবাকে সারাজীবন বিধবা থাকতে হবে, এমন নীতিও সে মানে না।

পুরুষরা যদি বউ মারা যাওয়ার পর আবার বিয়ে করতে পারে, মেয়েরাই বা পারবে না কেন? সীমার স্কুলের বান্ধবীদের মধ্যে দুজন এরকম বিয়ে করেছে, সীমা সে বিয়েতে গেছেও। তবে, নিজের ব্যাপারে তার কী বাধা ছিল? সবদিক ভেবে দেখলে, প্রদীপকে অপছন্দ করার কিছুই ছিল না। প্রদীপ সচ্ছল, সুপুরুষ, সবচেয়ে বড় কথা, অতি ভদ্র। মিলিকে সে ভালোবাসত, মিলির অযত্ন করত না। তবে?

সীমার মনে তখন একটাই চিন্তা ছিল। মিলি কী ভাবছে? মিলি তার বাবাকে অত ভালোবাসত, সে কি অন্য কারুকে বাবা বলে মেনে নিত? প্রদীপকে সে কাকা বলে ডাকত, হঠাৎ একদিন তাকে বাবা বলতে পারত কি?

ধরা যাক, মিলি সেটা মেনে নিল। আজকাল তো এরকমই হয়ই, ছেলে-মেয়েরা বুঝে যায়। কিন্তু মিলি কি ভাবত না যে তার মা লোভী, তার মা তার বাবার স্মৃতি বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না, আর একজন পুরুষকে অবলম্বন করল। মেয়ের কাছে ছোট হয়ে যেত সীমা, মেয়ে কি তাকে আর ভালোবাসতে পারত আগের মতন? শুধু সেইটুকু হারাতে চায়নি বলেই সীমা আর অন্য কিছু চায়নি।

এখন মিলি লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে। এখন ওদের ধ্যান-ধারণা সব অন্যরকম। মিলি প্রায়ই হালকা সুরে বলে, মা, তুমি আর একটা বিয়ে করলে না কেন? তোমার চেহারা এত সুন্দর...জানো মা, মাঝে-মঝে আমার মনে হয়, আমার ছেলেবন্ধুদের মধ্যে কেউ না তোমার প্রেমে পড়ে যায়।

প্রদীপ আবার ফিরে এসেছে এত দিন বাদে। এর মধ্যে সে বিয়ে করেছে কিনা তা জানে না সীমা। কাল সে প্রসঙ্গ ওঠেনি। তবে, কলকাতায় ও একাই এসেছে। প্রদীপ আবার তাকে মিলির মা হওয়ার বদলে আলাদা এক নারী হওয়ার জন্য ডাক দিল।

হোটেলে দেখা করতে বলেছে। অন্য কেউ এরকম একটা প্রস্তাব দিলে তাকে দুশ্চরিত্র মনে করা যেত। কিন্তু প্রদীপকে তা কিছুতেই বলা যায় না। দুপুরে হোটেলে একা-একা দেখা করার যে একটা অন্য দিক আছে, সেটা প্রদীপের মাথাতেই আসেনি, তাই সে অত সহজে ওই কথাটা বলতে পেরেছে।

একটু বাদে সীমা আবার উঠে বসল।

কপালে ঘাম জমেছে একটু-একটু। মাথার ঝিমঝিমুনি ভাবটা নেই। জ্বর ছেড়ে গেছে। শরীরও বেশ ভালো মনে হচ্ছে। এ কী ব্যাপার, হঠাৎ জ্বর হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, আবার সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে!

তবে এটা কি মানসিক?

আসলে আজ স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না, সেইজন্যই এমন হচ্ছে?

মিলি বাড়িতে নেই, আজ তার ছুটি নেওয়ার তো কোনও মানেই হয় না। তা ছাড়া দুপুরে নেমতন্ন আছে, তাকে বেরুতেই হবে। অবশ্য, শরীর সত্যি খারাপ হলে নেমতন্ন খেতে যাওয়ায় চলত না। এখন সীমা অনায়াসে তিন-চার দিন স্কুল কামাই করতে পারে।

তা হলে প্রদীপের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে যাওয়ার কথাটা ভেবেই তার জ্বর আসছিল?

না, হোটেলে সে যাবে না। সে প্রশ্নই ওঠে না।

প্রদীপ অপেক্ষা করে বসে থাকবে। তাকে কোনও খবর দেওয়া যাবে না। দোতলায় গিয়ে টেলিফোনে প্রদীপের সঙ্গে কথা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। কালকেই প্রদীপকে না বলে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন সীমা খুব আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিপুল হঠাৎ চলে গেল, ফ্ল্যাটে সে আর প্রদীপ একা, ঠিক আগের সেই দিনটার মতন সীমা ভেবেছিল, প্রদীপ বোধহয় সেকথা তুলবে।

প্রদীপ কী কথা বলতে চায় তাকে?

প্রদীপ বলেছে, সে আর এখানে একা আসবে না। সীমা সে-ই যে বারণ করেছিল অতদিন আগে, প্রদীপ তা ঠিক মনে রেখেছে। সীমাকেই যেতে হবে। এটা প্রদীপ অন্যায় কিছু বলেনি। কিন্তু সীমা যাবে না, যাবে না, যাবে না।

মিলিকে নিয়ে যে ক্ষুদ্র জগৎটা গড়েছিল সীমা, মিলি তার বাইরে চলে গেছে। কিন্তু সীমা যে বাইরে বেরুবার পথটাই ভুলে গেছে!

॥ ৫ ॥

হায়দ্রাবাদের দাঙ্গা চারদিনের মধ্যে একটুও না কমে বরং ছড়িয়ে গেল আরও। এমনই অবস্থা যে হোটেল থেকেও বেরুনো যায় না। হোটেলের ঘরে জানলা দিয়েই দেখা যায় যে ছুরি-বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে খুনে-গুন্ডারা। রাত্তিরবেলা দূরে দেখা যায় আগুন।

হীরেন এরই মধ্যে খুব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিনই একবার করে ছবি তুলে আনে। মিলিকে সে বেরুতে দেয় না। হীরেনের কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া যায়, তাই শুনে-শুনে মিলি রিপোর্ট লিখে পাঠায়। কিন্তু দাঙ্গার খবর প্রথম দিন যেমন গুরুত্ব পায়, পরের দিকে আর তত থাকে না। এর মধ্যে আবার কানপুরেও দাঙ্গা শুরু হয়েছে, তাই এখানকার খবরের গুরুত্ব কমে গেছে।

অফিস থেকে মিলি আর হীরেনকে টেলিফোনে জানানো হয় ফিরে আসতে। কিন্তু ওরা ফিরবে কী করে?

রেলস্টেশনের কাছে মারামারি সবচেয়ে বেশি, তাই স্টেশনে যাওয়া যাচ্ছে না। ট্রেন চলাচলও অনিয়মিত হয়ে গেছে। প্লেন আছে বটে, কিন্তু প্রচুর ভি আই পি এইসময় যাওয়া-আসা করছে বলে কোনও সিট নেই। মিলি আর হীরেন জেনেছে যে আরও তিনদিনের আগে ওদের টিকিট কনফার্মড করা যাবে না।

এদিকে আর একটা বিপদ হয়েছে। ওদের টাকা ফুরিয়ে আসছে।

অফিস থেকে ওদের পাঁচদিনের খরচ দেওয়া হয়েছিল। সে টাকা প্রায় শেষ। এরপর হোটেলে ভাড়া দেবে কী করে?

হীরেন অফিসে টেলিফোন করে সেকথা জানিয়েছিল। সুব্রতদা বলেছেন, টাকা পাঠাবার তো কোনও উপায় নেই। তোমরা যে-কোনওভাবে ম্যানেজ করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে এসো।

হোটেলের ঘরভাড়া তো দিতেই হবে, খাওয়ার খরচটা ওরা বাঁচাচ্ছে।

হোটেলের খাবারের দাম বেশি। তাই হীরেন কোনওক্রমে পাশের একটা দোকান থেকে রুটি, মাংস, তড়কা কিনে আনে, সস্তা হয়।

হীরেনের মদের স্টক শেষ। কোনও জায়গা থেকে মদ জোগাড় করতে না পেরে তার মেজাজ বেশ খাট্টা।

দুপুরবেলা এক ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়া শেষ করার পর হীরেন বলল, মিলি, এই দাঙ্গা যদি আরও চলে, তা হলে যে হোটেলে বাঁধা থাকতে হবে।

মিলির মুখচোখ শুকিয়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতি সে সহ্য করতে পারছে না। মারামারি, খুনোখুনির কথা শুনলেই তার গা গুলোয়।

হীরেন বলল, আমি একলা থাকলে তো অসুবিধের কিছু ছিল না। আমি যে-কোনও কায়দায় ঠিক বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু তোকে নিয়েই তো মুশকিল।

মিলি এ কথাটাও অস্বীকর করতে পারল না। রাস্তায় এখন একটিও মেয়ে দেখা যায় না।

স্টেশনের কাছে কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, তাদের মধ্যে দুজন মেয়েও ছিল। পুলিশ স্বীকার করছে যে আরও বেশ কয়েকজন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হীরেন বলল, ছেলেতে আর মেয়তে যে তফাত আছে, সেটা এবার বুঝলি তো? তোরা নারী-মুক্তি-ফুক্তি কত কী বলিস, এটা মানতে চাস না।

মিলি বলল, তার জন্য তো বর্বর পুরুষরাই দায়ী। মেয়েদের গায়ে আগুন লাগায়, মেয়েদের ছুরি মারে।

—পুরুষদের মারবে, আর মেয়েদের মারবে না, এটা বুঝি সমান অধিকার হল?

—বাজে বকিস না। শোন, পুলিশের গাড়ি আমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে না?

—পুলিশের গাড়ি আবার কবে থেকে ট্যাক্সির কাজ করে?

—বাঃ, জার্নালিস্টদের পুলিশ এটুকু সার্ভিস দিতে পারে না? তুই চেষ্টা করে দ্যাখ না?

—এখানে আমার বদলে তুই চেষ্টা করলে বেশি কাজ হবে। হাত দেখিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি থামাবি, তারপর অবলা সেজে যাবি, তাতে তাদের দয়া হতে পারে, তখন আমি তোর লেজুড় সেজে যাব। কিন্তু আমি খবর নিয়েছি, কলকাতার ট্রেন আজ ছাড়েনি। কালও ছাড়বে কিনা সন্দেহ।

—তা হলে কী হবে?

—এরপর হোটেলের ভাড়াও দিতে পারব না। খাওয়ার পয়সাও থাকবে না।

—হোটেল আমাদের কাগজের নামে ধার দেবে না? আমরা ফিরে গিয়ে ওদের বিল মিটিয়ে দেব।

—এই হোটেলের মালিক আমাদের কাগজের নামও শোনেনি। কোনওদিন চোখে দেখেনি। এরা সাউথ ইন্ডিয়ার কাগজ পড়ে। ধার-ফার দেবে না। শোন, আজ থেকে একটা কাজ করা যাক। একটা ঘর ছেড়ে দিই।

—তার মানে?

—শুধু-শুধু দুটো ঘরের ভাড়া দিয়ে কী হবে? একটা ঘরেই দিব্যি চলে যাবে। তুই খাটে শুবি, আমার মেঝেতে কার্পেটের ওপর একটা বালিশ পেলেই চলবে।

—দুজনে একঘরে শোব?

—আমার নাক ডাকে না।

—সেজন্য নয়।

—শোন মিলি, তুই সেদিন আমার চুমু খাওয়ার প্রস্তাব শুনে খুব একখানা লেকচার দিলি। তারপর বললি, শংকরের সঙ্গে তোর অ্যাফেয়ার। ব্যস, চুকে গেছে। আমি কি এরপর তোর ওপর জোর জবরদস্তি করব নাকি? আমাকে কি তোর সেরকম ক্যাডাভেরাস লোক বলে মনে হয়?

—আমি সে কথাও বলছি না।

—তবে? তুই খাটে শুবি, আমি কার্পেটে। প্রমিজ করছি, তোকে আমি টাচ করব না। হল তো? টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে, তবু দুটো ঘর ভাড়া দিতে হবে?

—আমার দুল জোড়া বিক্রি করা যায় না?

—আমার প্রস্তাবটাতে তোর আপত্তি কিসের? আমি প্রমিজ করছি, তা-ও তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

—হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে। আমার বিশ্বাস হলেও অন্যরা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তুই আর আমি এক ঘরে রাত কাটালাম, আমাদের মধ্যে কিছুই হল না, তবু অন্য কেউ শুনলে ঠিক একটাই কথা ভাববে।

—অন্য কেউ মানে, শংকর! তাই তো। সে জানবে কী করে?

—আমাকে জিগ্যেস করলে কি আমি মিথ্যা কথা বলব? যাকে ভালোবাসা যায়, তার কাছে এরকম একটা মিথ্যে বললে বাকি সবকিছুই মিথ্যে হয়ে যায়।

—কচি খুকি! এখনও কিছুই শিখিসনি। যতই প্রেম-ভালবাসা হোক, মিথ্যে না বললে জীবন চলে না। এরকম দু-চারটে মিথ্যে হচ্ছে জীবনের টক-নুন-ঝাল! সে যাকগে, তুই রাজি না কোনওমতেই?

—আমি দুল বিক্রি করে দিতে রাজি আছি।

—আমি ওসব বিক্কিরি-ফিক্কিরির মধ্যে নেই। আমি এখন বাইরে বেরুচ্ছি। দেখি কোনও বাঙালীর বাড়ি খুঁজে পাই কিনা। পেলে তাদের কাছে আশ্রয় চাইব। শুধু-শুধু হোটেল ভাড়া দিতে আমার গায়ে লাগছে।

—রাস্তায় এখনও গোলমাল শোনা যাচ্ছে। তুই এর মধ্যে বেরুবি? না, হীরেন, থাক, তোর এখন যাওয়ার দরকার নেই।

—আহা রে, কী দরদ আমার জন্যে! তুমি কি আমার প্রেমিকা নাকি?

—প্রেমিকা না হই, বন্ধু তো হতে পারি!

—আমার সঙ্গে বিশ্বাস করে এক ঘরে শুতে চাস না, তা হলে তুই কিসের বন্ধু? তুই যদি আমার প্রেমিকা হতিস, আর একজন একটা কোনও বিপদে পড়ে অন্য কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে বাধ্য হতিস, তা হলেও আমি কিন্তু তোকে বিশ্বাস করতাম। বারণ শুনল না হীরেন, ঠিক বেরিয়ে গেল।

মিলির মনে পড়ল, তার মা একজন মামার কথা বলেছিল। তার নাম-ঠিকানা কিছুই নিয়ে আসা হয়নি। তখন মিলি বলেছিল, হোটেল-ভাড়া বাঁচাবার জন্য আত্মীয়ের বাড়ি উঠবে কেন? এখন দেখা যাচ্ছে, ঠিকানাটা সঙ্গে আনলে খুব ভালো হতো। মায়ের কথা শুনল না তখন। অফিসের মাধ্যমে মাকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিপুল কাকার ফ্ল্যাটে ফোন করার চেষ্টা করেছিল মিলি, কিন্তু কিছুতেই ওই লাইনটা পাওয়া যাচ্ছে না।

হীরেন ফিরল দেড় ঘণ্টার মধ্যেই।

মিলি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল, হীরেনের ডাক শুনে খুলে দিল।

হীরেন বলল, শালা, কোথায় বাঙালি নেই! পৃথিবীর সব জায়গায় বাঙালি। এখানেও গিজগিজ করছে। আগে খোঁজ করিনি কেন? খাওয়া-থাকার খরচ ফ্রি হয়ে যেত। প্রবাসী বাঙালিরা খুব অতিথি-পরায়ণ হয়।

—কার খোঁজ পেলি?

—এখান থেকে খুব কাছেই থাকেন মিঃ চ্যাটার্জি, খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার, চমৎকার কোয়ার্টার। ওঁর স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়েও আছে। ভদ্রমহিলা বেশ অ্যাকমপ্লিশড্। আমাকে কিছুই বলতে হল না। আলাপ হওয়ার পর উনি নিজে থেকেই বললেন, হোটেলে রয়েছেন কেন, আমাদের এখানে এসে থাকুন না!

—তুই রাজি হয়ে গেলি?

—আমি তোর কথাও বলেছি। মিঃ চ্যাটার্জি আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই তোর ডেসপ্যাচ পড়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তোর ইন্টারভিউয়ের প্রশংসা করলেন। তোকেও ওঁরা নিয়ে যেতে চান। পাঁচটার সময় গাড়ি নিয়ে আসবেন। কিন্তু একটা মুশকিল আছে।

—আবার কি মুশকিল?

—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললেন, ওঁদের একটা গেস্টরুম আছে। দুটো খাট আছে। বুঝলি তো, একটা গেস্ট রুম। সেখানে আমরা দুজনে থাকব কি করে? তোর মতন এক শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ের

সঙ্গে আমি থাকতেই চাই না। তা হলে তোকে যেতে হয়, কিংবা আমাকে। ওঁদের কথাবার্তা শুনে মনে হল আমার চেয়ে তোকেই ওঁদের বেশি পছন্দ।

—না, না, তুই ব্যবস্থা করেছিস, তুই যা। আমি এখানে থেকে যাব।

হোটেলের একটা ঘরের ভাড়া আরও দুদিন পাওয়া যাবে।

—আমার আপত্তি নেই। মিঃ চ্যাটার্জির কথা শুনে মনে হল, মালটাল খায়। আমাকেও খাওয়াবে। ওটাও ফ্রিতে হয়ে যাবে। কিন্তু তা হলে এরপর তোর সম্পর্কে আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না। আমি ওঁদের বাড়িতে গিয়ে আরামে থাকব, দাঙ্গাবাজরা যদি হোটেল অ্যাটাক করে, তা হলে আমি কিছু জানি না।

—ওরকম ভয় দেখাসনি হীরেন। চলে গেলেও তুই কি আমার খোঁজখবর নিবি না?

—রাত্তিরে যদি কেউ জোর করে তোর ঘরে ঢুকে পড়ে?

—যাঃ, বাজে কথা বলিস না।

—কিছু বিশ্বাস নেই। এসব হোটেলে কিছু বিশ্বাস নেই। এখন তবু সবাই জানে যে তোর একজন বডিগার্ড আছে।

এইসময় দরজার কাছ থেকে একটা গম্ভীর গলা শোনা গেল, কে কার বডিগার্ড?

মিলি আর হীরেন চমকে মুখ ফিরিয়ে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, আরেঃ!

মুখে দু-দিনের দাড়ি, ময়লা জামা আর জিনসের প্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে শংকর। হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ।

ভেতরে এসে ব্যাগটা নামিয়ে রেখে শংকর জিগ্যেস করল, কী আলোচনা হচ্ছিল?

হীরেন জিগ্যেস করল, তুই কী করে এলি?

শংকর অবহেলার সঙ্গে বলল, ট্রাকে।

—কোথা থেকে?

—ব্যাঙ্গালোর থেকে।

—তার মানে?

—এর মানে বোঝা খুব কঠিন নাকি? তোর কী হয়েছে রে হীরেন, মালটাল পেটে পড়েনি বুঝি! ব্যাঙ্গালোর থেকে মাল-বওয়া ট্রাকে চেপে চলে এলাম। মাঝখানে শুধু একবার ট্রাক বদলাতে হয়েছে।

—দাঙ্গার মধ্যে ট্রাক চলে এল?

—এল তো। আমায় তো জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছিস। ট্রাকওয়ালারা কোনও কিছুতেই ভয় পায় না।

—তুই হায়দ্রাবাদে চলে এলি, অফিস থেকে তোকে এখানে পাঠাল?

—গাড়লের মতো কথা বলিস না। অফিস থেকে তিনজনকে এখানে পাঠাবে, হায়দ্রাবাদ কী এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা?

এতক্ষণ মিলি বলল, তা হলে তুমি হঠাৎ হায়দ্রাবাদে কেন?

শংকর মিলির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এলাম তোমার জন্য, এটাও কি বলে দিতে হবে? অফিস থেকে খবর পেলাম, তোমরা এখানে দাঙ্গার জন্য আটকে পড়েছ, হোটেলের নামটা জেনে নিয়ে সোজা চলে এলাম।

শংকর এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল যেন কাজটা সত্যি খুব সোজা।

মিলি আর হীরেন বুঝতে পারল, এতখানি পথ এই দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ট্রাকে চেপে এসে শংকর যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে।

হীরেন বলল, তুই যে হিন্দি সিনেমার হিরোর মতন একেবারে ঠিক টাইমে এসে গেলি। আমরা প্রায় ব্রোক। তোর কাছে টাকাকড়ি আছে তো?

শংকর জামার বোতাম খুলতে-খুলতে বলল, আছে। শোন, দু-দিন আমি চান করিনি। এখন চান করব। বারোটার সময় একটা ধাবায় কিছু খেয়েছি বটে, কিন্তু আবার খিদে পেয়েছে। একটা কিছু ভদ্রলোকের খাবার জোগাড় কর। আর চা।

হীরেন বলল, পয়সা যখন আছে তখন রুম-সার্ভিস বললেই তো হয়।

মিলি, ফোনে বলে দে।

শংকর স্নান করতে বাথরুমে গেল।

খানিক বাদে দাড়ি কামিয়ে ফরসা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে বেরিয়ে এসে বলল, আঃ! ঘুম পাচ্ছে। খাবারটা তোরা খেয়ে নে। আমার দরকার নেই। আমি এখন ঘুমোব।

আর বিনা বাক্যব্যয়ে সে শুয়ে পড়ল মিলির বিছানায়। এক মিনিটের মধ্যে তার নিশ্বাসের শব্দ শুনে মনে হল, সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার অনেকখানি ক্লান্তি জমে ছিল।

মিঃ চ্যাটার্জি যখন এলেন, তখন শংকর ঘুমন্ত, তাকে জাগানো হল না। টাকা বাঁচাবার আর প্রশ্ন নেই, তাই হোটেল না ছাড়লেও চলে। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি এত আন্তরিকতার সঙ্গে আতিথ্য দিতে চাইছেন যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। হীরেন তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল।

মিলিকে সে বলল, তোর তো এখন আর চিন্তা নেই, আসল বডিগার্ড এসে গেছে। শংকরই সব ম্যানেজ করবে। আমার কেটে পড়াই ভালো।

ঠিক হল যে পরের দিন দুপুরে মিলি আর শংকরও মিঃ চ্যাটার্জিদের বাড়িতে দুপুরে খেতে যাবে।

ওরা চলে যাওয়ার পরেও মিলি শংকরের ঘুম ভাঙাল না। কিছুক্ষণ শংকরের কাছে বসে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। শংকর একেবারে শিশুর মতন ঘুমোচ্ছে।

শংকর জাগল প্রায় রাত ন'টার সময়।

উঠেই বলল, মিলি, দারুণ খিদে পেয়েছে। শিগগির খাবারের অর্ডার দাও। আর তোমার কাছে বিস্কুট-ফিস্কুট কিছু থাকলে দাও।

হীরেন বিস্কুট আর চানাচুর রেখে গেছে মিলির কাছে। মিলি সেসব বার করে দিল।

শংকর চার-পাঁচটা বিস্কুট খেয়ে ফেলল প্রায় গোগ্রাসে। তারপর এক গেলাস জল খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বলল, হীরেনটা কোথায়?

মিলি মিঃ চ্যাটার্জির বাড়ির বৃত্তান্তটা শংকরকে জানাল।

শংকর ভুরু কুঁচকে বলল, হোটেল ছেড়ে অন্য লোকের বাড়িতে চলে গেছে? নিশ্চয় মাল খাওয়ার লোভে গেছে। ইডিয়েটটা ধৈর্য ধরতে পারল না? আমার কাছে যে বোতল আছে, সেটা জানলে বোধহয় যেত না।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে এসে মিলিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষি গলায় শংকর বলল, মিলি, মিলি, মিলি, মিলি! বড্ড মন কেমন করছিল তোর জন্য। প্রথম রাত্তিরে তোরা দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলি? খুব ভয় পেয়েছিলি, তাই না?

মিলি বলল, হ্যাঁ, অত রাত, ভেবেছিলাম হোটেলে ফিরতে পারব না।

—বেশ একটা অভিজ্ঞতা হল, কী বল? এরকম আরও হবে!

—আমি এই ধরনের রিপোর্টিং করতে চাই না। তুমি ট্রাকে করে এত দূরে চলে এলে? রাস্তায় যদি কিছু একটা হয়ে যেত!

—এক জায়গায় কী হয়েছিল জানিস? সন্ধেবেলায় রোড ব্লক করে রাস্তা আটকাতে চেয়েছিল।

ধরতে পারলে ট্রাকে আগুন লাগিয়ে দিত, আমাদেরও মারত-টারত নিশ্চয়ই। কিন্তু ট্রাকড্রাইভারটা খুব স্পিডে চালাচ্ছিল। আমি বললাম, চালাও, চালাও থেমো না। সে লোকটা করল কী, রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল ধানখেতে, সমান স্পিডে বেরিয়ে গেল। ট্রাকটা উলটে যাওয়ার চান্স ছিল, কিন্তু রিস্ক নেওয়াটাই ঠিক হয়েছে।

—উঃ, ভাবলেই বিচ্ছিরি লাগে। মানুষ কেন মানুষকে মারতে চায়?

—পৃথিবীটাই এরকম। এটা কার ঘর রে? তোর না হীরেনের?

—এটা আমার ঘর। হীরেনের ঘরটা ছিল বারান্দার কোণে। ও তো ঘরটা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তুমি ওটাই নিতে পারো। ওই ঘরের জানলা দিয়ে অনেকটা শহর দেখা যায়।

—এটা তোর ঘর। সিঙ্গল রুম। খাটটা তো বেশ বড়ই আছে দেখছি। আমি এখানেই তো থেকে গেলে পারি। আর একটা ঘর নেওয়ার দরকার কি?

—তোমার কাছে টাকা আছে। আর একটা ঘর নিতে পারো যখন—

শংকর হো-হো করে হেসে উঠল।

মিলিকে বুকে চেপে ধরে তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিতে-দিতে বলল, পাগলি! পয়সার প্রশ্ন আসছে কী করে? এক হোটেলে থাকব, অথচ দুজনে দুটো ঘরে শুতে যাব কেন?

মিলি বলল, হীরেন কাল সকালে আসবে। ও দেখবে, তোমার নামে কোনও ঘর বুক করা নেই। ও কী ভাববে?

—ও, হীরেনকে নিয়ে চিন্তা।

—কলকাতায় ফিরে ও সবাইকে বলে দেবে। আমার মায়ের কানে যদি পৌঁছোয়?

মিলিকে ছেড়ে দিয়ে শংকর নিজের ব্যাগ থেকে রামের বোতল বার করল। টেবিলে দুটো গেলাস ছিল, দুটোতেই ঢালল খানিকটা। জল-টল মিশিয়ে মিলির হাতে একটা গেলাস দিয়ে বলল, বোস, খুব সিরিয়াস কথা আছে।

শংকর বসল চেয়ারে, মিলি বিছানায়।

শংকর একটা সিগারেট ধরিয়ে দু-টান দিয়ে মিলির দিকে এগিয়ে দিল। মিলি সেটা নিয়ে নিল।

শংকর বলল, যোধপুর পার্কে একটা বেশ সুন্দর ছোট্ট ফ্ল্যাট পেয়ে যাচ্ছি আগামী মাস থেকে। ফিরে গিয়ে তুই দেখবি, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোর পছন্দ হবে। দু-খানা ঘর, রান্নাঘরটা চমৎকার। আমি বাড়ি ছেড়ে ওখানে চলে আসছি। আমাদের বাড়িতে অনেক লোক, জয়েন্ট ফ্যামিলি, জায়গা কম, আমি বাইরের লোকজনদের ডাকতে পারি না। আমি আলাদা ফ্ল্যাটে থাকব। আমার বাবাও রাজি হয়েছেন। এবার, মিলি দেবী, আমি ফর্মালি প্রপোজ করছি। আপনি কি আমায় বিয়ে করতে রাজি আছেন?

—বিয়ে?

—হ্যাঁ, বিয়ে, অনেক বাউন্ডুলেপনা করেছি ভাই। এখন একটু ঘর-সংসার করতে চাই। একটু শান্ত হয়ে না বসলে নিজস্ব কাজকর্ম কিছু করা যাচ্ছে না।

—এটা কি সিরিয়াস কথা, নাকি ইয়ার্কি? তোর মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। তুই সত্যি যোধপুর পার্কে ফ্ল্যাট নিচ্ছিস?

—হ্যাঁ, ইয়ার্কি নয়। ফাইনাল ডিসিশান। তা হলে মিলি দেবী, আজ রাত্তিরে আমরা হোটেলের এক ঘরে অনায়াসে শুতে পারি। কলকাতায় গিয়ে আমরা সবাইকে জানিয়ে দেব যে আমরা বিয়ে করছি। কেউ আর টুঁ শব্দটি করবে না।

—কিন্তু শংকর, আমি যে এখন বিয়ে করতে চাই না।

শংকর এমনই অবাক হল, যেন চেয়ার থেকে পড়ে যাবে।

চোখ দুটো গোলগোল করে বলল, তার মানে? তুই বিয়ে করতে চাস না আমাকে? তুই মন বদলে ফেলেছিস?

মিলি ঠোঁটে ঠোঁট চেপে একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল, এখনও মন ঠিক করতে পারিনি।

—মন ঠিক করতে পারিসনি? তার মানে, তোর জীবনে আরও কেউ আছে? মাই গড! না, না, না, না, আর যে আছে আমি তার নাম জানতে চাই না। কিন্তু আমি কোনও কমপিটিশানেও যেতে চাই না, মিলি! ঠিক আছে, আমি অন্য ঘরে চলে যাচ্ছি। হোটেলের ডেস্কে গিয়ে কথা বলে দেখি।

মিলি দ্রুত উঠে এসে শংকরের হাঁটু ধরে বসে পড়ল পায়ের কাছে।

কাতর মুখে বলল, না, না তা নয়। অন্য কেউ নেই। শংকর, আমি এখনও বিয়ের জন্যে ঠিক তৈরি নই।

শংকর ভুরু কুঁচকে বলল, এ আবার কী ধাঁধার মতন কথা!

মিলি বলল, আমার বাড়িতে প্রবলেম আছে। তুই তো আমার মাকে দেখেছিস? মা আর আমি একসঙ্গে থাকি। আমি এখন মাকে ছেড়ে থাকব কি করে?

—তুই কি বাচ্চা মেয়ে নাকি রে মিলি, যে মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না?

—তুই বুঝতে পারছিস না। আমি ছেড়ে থাকতে পারব, কারণ আমি তোকে পাচ্ছি। কিন্তু মা কি নিয়ে থাকবে? মা-র যে আর কেউ নেই। আমার কোনও ভাই-বোন নেই।

—তোর মা অত্যন্ত ফাইন লেডি। খুবই রিজিনেবিল। আমাকে অপছন্দ করেন না, সেটা আমি বুঝেছি। ওঁকে বললে উনি নিশ্চিন্তে রাজি হবেন। মেয়ে বিয়ের পর অন্য বাড়িতে চলে যাবে, তা কি উনি জানেন না? সে জন্য উনি তৈরি হননি মনে-মনে?

—আমার মা আমার চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ ধরনের। আমার ওপর সবসময় নির্ভর করে থাকেন।

—এটা তোর ভুল ধারণা। তোর একটা আলাদা নিজস্ব জীবন থাকবে, এটা নিশ্চয় উনি বোঝেন। তা ছাড়া খুব দূরে তো চলে যাচ্ছি না, একই শহরে থাকব, প্রায় রোজই দেখা হতে পারে।

—তবু মা কী করে একা থাকবে? না শংকর, আরও অন্তত কয়েকটা বছর না গেলে আমি বিয়ের কথা ভাবতে পারছি না।

—মায়ের জন্য কোনও মেয়ে বিয়ে করতে চায় না, এ তো বড় অদ্ভুত কথা! তোর মা শুনলে তিনিই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাবেন। চল, কলকাতায় গিয়ে তোর মায়ের সঙ্গে কথা বলব।

—মা তো রাজি হবেই। কিন্তু...আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যোধপুরে ফ্ল্যাটটায় দুটো ঘর, বিয়ের পর মাকেও আমাদের কাছে রাখতে পারি না?

—না, ভাই, সেটা সম্ভব নয়। বিয়ের পর শাশুড়িকে নিয়ে সংসার করা, সেটা অতি হাসির ব্যাপার। আমাদের বাইরের একটা জীবন আছে কিন্তু আমাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে আমরা একটা নিজস্ব ছোট্ট পৃথিবী গড়ে তুলব, সেখানে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই আপাতত। এটা তোর উদ্ভট প্রস্তাব, মিলি।

—তোর যদি শুধু মা থাকতেন, আর কেউ নেই, তা হলে তিনি তো তোর কাছেই থাকতেন, তখন তিনজনই হতো। মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম তো অনেক জায়গাতেই হয়। মেয়েরা তো শাশুড়ির সঙ্গে থাকে, ছেলেরা কেন শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না?

—ওসব তুলনা-ফুলনা দিয়ে লাভ নেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। তোর মা চাকরি করছেন। তিনি কোনও অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ছেন না। তুই রোজ তাঁর খোঁজখবর নিতে যাবি। উনিও

আসবেন মাঝে-মাঝে। এটা কি খারাপ ব্যবস্থা? একটা সময় ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে মা-বাবাদের দূরে সরে যেতেই তো হয়।

শংকরের উরুতে মাথা রেখে মিলি চুপ করে বসে রইল। তার চোখ জ্বালা করছে, তবু সে কান্না আসতে দিচ্ছে না।

শংকর চেয়ার ছেড়ে বসে পড়ল কার্পেটের ওপর।

মিলির কাঁধে হাত দিয়ে শংকর বলল, আর একটা কথা বলব? মুখ তোল, তাকা আমার দিকে।

মিলি মুখ তুলে বলল, কী?

শংকর বলল, তুই হয়তো অন্য একটা দিক ভেবে দেখিসনি। তোর বাবার মৃত্যুর পর তোর মা তোর জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করেছেন। তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, এ সবই ঠিক। নিজস্ব কোনও সাধ-আহ্লাদ রাখেননি। কিন্তু তুই কি মনে করিস, মা তোর বাবার স্মৃতি আঁকড়ে সারাজীবন পড়ে থাকবেন, তাঁর জীবনে আর কিছুই থাকবে না।

মিলি বলল, আমি মোটেই সেরকম মনে করি না। একজনের মৃত্যুর জন্য দুটো জীবন কেন নষ্ট হবে? মা আবার নতুন করে জীবন শুরু করলে আমি তা মেনে নিতাম। কিন্তু মা যে অন্য কারুর সঙ্গে মিলতেই চায় না।

—সেটা তোর জন্যও তো হতে পারে।

—আমার জন্য? আমি কতবার বলেছি—

—তোর বাবার মৃত্যুর সময় তোর মায়ের বয়েস বেশ কম ছিল। এখনও খুব বেশি না, তোর দিদি বলে মনে হয়, চেহারাও যথেষ্ট সুন্দর আছে। অন্য কারুর সঙ্গে তাঁর ভাব-ভালোবাসা কিংবা বন্ধুত্ব তো হতেই পারে।

—তা তো হতেই পারত। কিন্তু মায়ের মানসিক গঠনটাই যে সেরকম নয়। বড্ড ঘরকুনো, ঘর ছেড়ে বেরোতেই চায় না।

—কারণ, সেই ঘরে তুই ছিলি। তুই তাঁর বন্ধন। এখন তুই চলে এলে উনি মুক্তি পাবেন। তোর উচিত মাকে এখন সেই মুক্তি উপহার দেওয়া। এটাই হবে তোর প্রতিদান।

মিলি গভীর বিস্ময়ে শংকরের মুখের দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আস্তে-আস্তে সে উপলব্ধি করল ব্যাপারটা। তার মুখ হাসিতে ছেয়ে গেল।

মাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভেবে সে নিজেই যেন বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

শংকর তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তা হলে আজ থেকেই শুরু হল আমাদের বিবাহ-বাসর।

হৃদয়ের অলিগলি

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে প্রণবেশ ঘড়ি দেখল। দশটা দশ। খুব একটা বেশি রাত নয়। পারিবারিক শান্তি চুক্তি লঙ্ঘিত হয়নি। দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত সীমারেখা টানা আছে।

প্রণবেশ তিনতলার বারান্দার দিকে একবার তাকাল। কোনওদিন হঠাৎ ফিরতে খুব দেরি হলে প্রণবেশ দূর থেকেই ওই বারান্দায় দাঁড়ানো সুতপার উৎকণ্ঠিত মূর্তিখানি দেখতে পায়। আজ সেরকম কিছু হয়নি, কয়েকদিন ধরে বেশ শীত পড়েছে, শখ করে বারান্দায় দাঁড়াবার কথাও নয়, তবু প্রণবেশ দেখতে পেল সুতপাকে।

রেলিং-এর ওপর অনেকখানি ঝুঁকে আছে, যেন লাফিয়ে পড়তে চায়। হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল, ট্যাক্সি ছেড়ো না। আমি আসছি, আমি আসছি—।

সুতপা সম্পূর্ণ অনুভূতি দ্বারা চালিত এক নারী। বিশেষত হঠাৎ কোনও আবেগে আপ্লুত হলে তার মাথায় কোনও যুক্তিবোধ কাজ করে না। তখন তার মন সম্পূর্ণ একমুখী। এত রাত্রে সুতপা কোথায় যেতে চায়?

ট্যাক্সি ড্রাইভারকে প্রণবেশ অনুরোধ করল, ভাই, একটু দাঁড়ান।

বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে? কারুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? কোনও আত্মীয় মারা গেছে?

আজকাল গুনে-গুনে সিগারেট খায় প্রণবেশ, কিন্তু এইরকম পরিস্থিতি সিগারেট দাবি করে। সিগারেট জ্বালতে-জ্বালতে প্রণবেশের মনে পড়ল, কয়েকমাস আগেই এইরকম রাত্তিরবেলা সুতপাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার বাপের বাড়িতে। কার কাছ থেকে যেন টেলিফোনে খবর পেয়েছিল যে সুতপার দাদার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। গিয়ে দেখা গেল সারা বাড়ি ঘুমন্ত। অবনীশের গাড়িতে সকালবেলা একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ঠিকই, তার বাঁ-হাতের কবজিটা একটু মুচকে গেছে। কিন্তু তা এতই সামান্য যে, তার জন্য রাত দুপুরে কেউ দেখতে এলে হাসাহাসি শুরু হয়ে যায়।

এই পাড়াটা বেশ শান্ত। মূল রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরের দিকে। এ-বাড়িটির পাশেই আধখানা ফুটবল মাঠের মতন একটা ফাঁকা জমি, তার এককোণে খানিকটা ভিত গাঁথার পর বাড়ি তৈরি থেমে আছে, নিশ্চয়ই গণ্ডগোল আছে মালিকানা নিয়ে। যাই হোক, মাঠটা ফাঁকা আছে বলে বেশ হাওয়া পাওয়া যায়।

প্রায় ঝড়ের বেগেই নেমে এল সুতপা। আধো ঘুমন্ত পল্লিটির নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝারি ধরনের উঁচু গলায় সুতপা বলল, কোনওদিন ফিরে এসে দেখবে আমরা সবাই মরে গেছি। তোমার তো কিছু যায় আসে না! বাড়িতে যদি আগুন লাগে তা হলেও খবর দেওয়ার কোনও উপায় নেই তোমাকে—।

প্রণবেশ তীব্র চোখে চেয়ে রইল তার স্ত্রীর দিকে! যে-কোনও ঘটনার বর্ণনার আগেই সুতপা এই রকম ভূমিকা করে। এখন সুতপার চোখে যে বিশ্বব্যাপী অন্যায়ের প্রতিমূর্তি। সমস্ত দুর্ঘটনা বা বিপদের জন্য প্রণবেশই দায়ী। যদিও এসব সুতপার মনের কথা নয়। প্রত্যেকবারই পরে সে লজ্জা পায়।

একটু সময় দিয়ে প্রণবেশ অতি মোলায়েম গলায় জিগ্যেস করল, কী হয়েছে বলবে না?

এবারে সুতপার কণ্ঠস্বর চোখের জলে ভেজা।

বাবুন এখনও ফেরেনি। কেউ কোনও খবর দিতে পারছে না। শিগগির চলো।

এই ঘটনাকে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া যায় তা দ্রুত চিন্তা করার জন্য প্রণবেশ একটা টান দিল। বাবুন অর্থাৎ তাদের ছেলে সুগত। সতেরো বছর বয়সে ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। বয়সের তুলনায় বেশ সুঠাম স্বাস্থ্যবান চেহারা। পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নেওয়ার জন্য সে প্রায় প্রস্তুত হয়েছে। দশটার মধ্যে তার বাড়ি না-ফেরা কি খুব অস্বাভাবিক?

সুতপা ট্যাক্সির দরজা খুলে ফেলেছে, প্রণবেশ তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোথায় যাবে?

তার মানে? তুমি এইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি।

ছেলের জন্য খুব একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে না প্রণবেশের। আপাতত তার প্রধান কাজ সুতপাকে শান্ত করা।

কী হয়েছে, বলো না আগে? কোথায় গেছে বাবুন; কিছু বলে যায়নি?

কিচ্ছু বলেনি। সন্ধেবেলা বেরিয়ে গেল, হাতে একটা বই ছিল, আমি ভেবেছি লাইব্রেরিতে বই বদলাতে গেছে। রঘুকে নাকি বলেছে, কিশোরদের বাড়িতে যাবে।

কিশোরদের বাড়ি খোঁজ নিয়েছিলে?

সেখানে খোঁজ না নিয়ে কি শুধু-শুধু তোমার সঙ্গে এত রাত্তিরে ট্যাক্সিতে...তোমার তো কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই আমাদের জন্য, আমরা মরলুম কি বাঁচলুম, ছেলেটা বখে গেল কি না...তোমার মতন এমন নিষ্ঠুর মানুষ আমি কখনও দেখিনি! তুমি না যেতে চাও আমি একাই যাচ্ছি ওকে খুঁজতে।

প্রণবেশ ভিতরে-ভিতরে বেশ বিরক্ত বোধ করল। সেই সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, এখন তার খুব ইচ্ছে করছে প্যান্ট শার্ট খুলে পাজামা আর গেঞ্জি পরতে। প্রণবেশ মোজা পরে না বটে, কিন্তু সারাদিন জাঙিয়া পরে থাকারও একটা অস্বস্তি আছে।

সুতপা এই ধরনের কটু কথা মাঝে-মাঝে শয়নকক্ষে বলে বটে, কিন্তু এত রাত্রে পাড়ার মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে...। কেউ শুনছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন তার মাথা গরম করার সময় নয়।

সুতপার বাহু আলতোভাবে ছুঁয়ে যে যথাসম্ভব কৃত্রিম নরম গলায় বলল, এত অস্থির হয়ো না, সুমি। বাবুন বড় হয়েছে, নিশ্চয়ই কোথায়ও আড্ডা-টাড্ডা দিচ্ছে। আগে শান্তভাবে একটু ভাবতে দাও।

আড্ডা দিচ্ছে? এ পর্যন্ত ও কোনওদিন এত রাত পর্যন্ত বাইরে থেকেছে? আমাকে কিচ্ছু না বলে...সঙ্গে পয়সা-টয়সাও নেই, কোনও বিপদে না পড়লে...

আহা, আগেই বিপদের কথা ভাবছ কেন? চলো, বরং কয়েক জায়গায় ফোন-টোন করে দেখা যাক—

সুতপা আবার জলন্ত চোখে তাকাল স্বামীর দিকে। দু-সপ্তাহ ধরে তাদের টেলিফোনটি মৃত। সেজন্যও যেন প্রণবেশই দায়ী। তাদের পাশের ফ্ল্যাটেও ফোন আছে। কিন্তু সুতপা কখনও সেখান থেকে ফোন করতে চায় না। যদিও তাদের ফোন খারাপ হলে ওরা অবলীলাক্রমে এসে সুতপাদের ফোন ব্যবহার করে। পাশের ফ্ল্যাটের অরূপ আর লিলির সঙ্গে প্রণবেশ সুতপার এমনিতে বেশ মৌখিক বন্ধুত্ব আছে। দরকার পড়লে পরস্পরের টেলিফোন ব্যবহার করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবু সুতপার কোথায় যেন বাধা। আজ সে কয়েকবার ওই ফ্ল্যাট থেকে ফোন করতে বাধ্য হয়েছে, সেই জন্য তার আরও বেশি রাগ।

যেখানে-যেখানে বাবুন যায়, সব জায়গায় টেলিফোন করেছি।

তা হলে?

তা হলে আর কিছু করবার নেই? ছেলেটা মরুক বা যেখানে খুশি চলে যাক, আমরা চুপ করে বাড়িতে বসে থাকব?

থানাতে একবার খবর দেওয়া দরকার।

আমি ফোন করেছিলুম, থানাতেও।

কী বলল তারা?

সুতপা উত্তর দিতে পারল না। তার ঠোঁট কাঁপছে। থানার লোকেরা তাকে অপমান করেছে। বাবুনের বয়েস আর চেহারার বর্ণনা শুনে তারা সুতপার কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে কথা বলেছে ইয়ার্কির সুরে।

প্রণবেশ জানে, এইবার সুতপা ডাক ছেড়ে কাঁদবে। এখন আর কোনও যুক্তি শোনাবার সময় নয়। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির দরজা খুলে বলল, চলো, চলো।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিতেই প্রণবেশ যথোচিত উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিগ্যেস করলে, আগে কোথায় যাওয়া যায় বলো তো!

আগে চলো কাবুলদার কাছে যাই।

চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল প্রণবেশের। ইচ্ছে হল এখুনি সুতপার গালে সপাটে এক চড় কষাতে । কিন্তু এখন মেজাজ দমন করতে হবে। মাত্র তিন পেগ হুইস্কি খেয়ে এসেছে সে। অসমাপ্ত নেশায় মেজাজটা সাংঘাতিক দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও প্রশান্ত মহাসাগরের মতন উদার, আবার হঠাৎ জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। আরও খানিকটা নেশা করার জন্য বন্ধুরা তাকে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু প্রণবেশ ইচ্ছা করেই আগে-আগে উঠে এসেছে। কারণ, কাল বিকেলে তাকে বম্বে যেতে হবে, তার আগে কাল সারাদিনে তার কাজ সারতে হবে অনেকগুলো।

নীরস গলায় সে জিগ্যেস করল, কবুলদার কাছে গিয়ে কী হবে?

কাবুলদার সঙ্গে অনেক বড়-বড় পুলিশের লোকের চেনা আছে।

নিজের বুকে একটা থাবড়া মেরে প্রণবেশ বলল, আমার কাছে তো আর টাকা নেই তেমন...ট্যাক্সি ভাড়া...তুমি ব্যাগ আনোনি?

তোমার কাছে টাকা নেই? সকালবেলা একশো টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলে না? কাবুলদাই ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেবে।

এই রাত্রে শুধু ট্যাক্সি ভাড়া কেন, একটুকরো আকাশ চাইলেও কাবুলদা এনে দিতে পারে, সুতপার এইরকম ধারণা।

শোনো, সুমি, আমার যখন সতেরো-আঠারো বছর বয়েস ছিল, তখন আমিও এক একদিন রাত করে ফিরেছি।

তোমাদের সময় আর এখনকার সময়ে অনেক তফাত। বাবুন কোনওদিন আমায় না বলে এতক্ষণ বাইরে থাকেনি।

বাবুন এতদিন যা-যা করেনি, সেইরকম কিছু-কিছু কাজ এখন থেকে করবে। কারণ ও বড় হচ্ছে। সিগারেট খাবে, মেয়েদের চিঠি লিখবে।

ওই যে, ওই যে, ওই তো বাবুন না?

হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা একটি ছেলেকে। বাবুনেরই বয়েসি প্রায় সেইরকমই চেহারা, কি সে বাবুন নয়। অন্য কোনও বাড়ির ছেলে। তাহলে এই বয়েসি অন্য কোনও ছেলেও এত রাত করে বাড়ি ফেরে। অবশ্য এই ছেলেটি হয়তো বাড়ির লোককে জানিয়েই থিয়েটার-বাইস্কোপ দেখতে গিয়েছিল।

এত রাত্রে কাবুলদাকে বিরক্ত করা কি ঠিক হবে? বাবুনের এক বন্ধু আছে না, টুকটুক; ওরা দুজন সবসময় একসঙ্গে থাকে। টুকটুকের বাড়ি তুমি চেনো তো, বরং সেখানে আগে যাই, নিশ্চয়ই খবর দিতে পারবে।

টুকটুকরা কলকাতায় নেই। দার্জিলিং বেড়াতে গেছে, তুমি তো কিছু খবর রাখো না।

ছেলের বন্ধু কোথায় বেড়াতে গেল, সে খবর রাখবার সময় সত্যিই প্রণবেশের নেই।

সকালবেলা সে বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে, ছেলের সঙ্গেই বা তার দেখা কতক্ষণ?

ঝট করে প্রণবেশের মনে হল, তার কি পুত্রস্নেহ নেই? বাবুনকে সে ভালোবাসে না? এই যে এত রাত্রে বাবুনকে খুঁজতে যেতে হচ্ছে, এ জন্য তার এত রাগ আর বিরক্তি হচ্ছে কেন? সুতপার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দশ ভাগের এক ভাগও তার মনে জাগেনি। সুতপার পুত্রস্নেহ ইনস্‌টিংকটিভ, আর তার মাথায় কাজ করছে যুক্তি। যুক্তি দিয়ে সে বুঝতে পারছে, এখনও বাবুনের বিপদ নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করার সময় আসেনি। সারা রাত না ফিরলে অন্য কথা। এখন সেরকম কোনও রাজনৈতিক হাঙ্গামাও নেই। বছর দশেক আগে হলে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক ভয়ের ব্যাপার হত। তখন এই বয়েসি ছেলেদের প্রাণ নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।

আজ বাবুনকে খুব বকুনি-টকুনি দাওনি তো!

একদম না, বিকেল থেকে ওর সঙ্গে আমার কোনও কথাই হয়নি!

সাত-আট বছর আগে, তখন বাবুন সত্যিই ছেলেমানুষ, একদিন রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মায়ের ওপর অভিমান হয়েছিল খুব। সুতপার একটা দোষ আছে। অনেক মা যেমন নিজের ছেলেমেয়ের প্রশংসা করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সুতপা ঠিক তার উলটো। অন্যদের সামনে সে নিজের ছেলের নিন্দে করে বেশি। ও-বাড়ির সমবয়েসি দু-তিনজন ছেলে ঝগড়া মারামারি করলে সুতপা কার দোষ বা কী তা না শুনে প্রথম থেকেই নিজের ছেলেকে বকতে শুরু করে। সেইরকমই কোনও ঘটনায়, বিনা দোষে বকুনি খেয়ে খুব অভিমান হয়েছিল বাবুনের। বাড়ি থেকে বেরিয়েই ছুটতে শুরু করেছিল।

প্রণবেশ বাড়িতেই ছিল সেদিন। সুতপার চ্যাঁচামেচি শুনে সে বারান্দায় এসে দেখেছিল ছুটতে-ছুটতে পথের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বাবুন। তখন প্রণবেশেরও বয়স সাত-আট বছর কম, ছুটতে গেলে হাঁপ ধরত না। খালি পায়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুব জোরে দৌড়ে বেশ অনেকটা দূরে গিয়ে ধরে ফেলেছিল বাবুনকে। ওইটুকু ছেলের কী জেদ! সারা মুখখানা তার চোখের জলে মাখামাখি। কিছুতেই সে আর বাড়ি ফিরবে না, বাবার হাত সে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে চায়। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সে বলেছিল, না, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না। রাস্তার লোক ভাবতে পারত, প্রণবেশ বুঝি ছেলেধরা।

শেষ পর্যন্ত প্রণবেশ বলেছিল, তোর মা তোকে বকেছে তো? তোর মা আমাকেও খুব বকে। চল বাবুন, তুই আর আমি কেউই আর বাড়ি ফিরব না। চল, তোতে আমাতে হোটেলে গিয়ে চিকেন চাওমিন খাই। মা খাবে না!

সেই খালি পা অবস্থাতেই প্রণবেশ ট্যাক্সি নিয়ে পার্কস্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল। কিন্তু ভালো করে খেতেও চায়নি বাবুন। একটুখানি খাওয়ার পরেই বলেছিল, বাবা, এবারে বাড়ি চলো। মা কাঁদবে।

বাবুনের সেই কচি, সুরেলা কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল প্রণবেশের। এখন আর সেরকম নেই। বয়ঃসন্ধির গলা ভাঙার পর এখনও তার কণ্ঠস্বর ঠিক নিজস্বতা পায়নি, এখন বেশ লাগে তার কথা বলার আওয়াজ।

প্রণবেশ সুতপার হাত ধরতেই সুতপা সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, তুমি দিন-দিন নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছ! সেই যে সকালে বেরিয়ে যাও, তারপর আর সারাদিন বাড়ির কথা একবারও ভাবো না। সন্ধেবেলা তুমি কোথায় থাকো, কী করো, তোমাকে হঠাৎ দরকার পড়লে কোনও খবরও দেওয়ার উপায় নেই। সাড়ে ন'টার পর থেকেই আমি ভাবছি।

আমি তো স্টুডিওতেই ছিলুম।

মিথ্যে কথা। আমি তপনবাবুর বাড়িতে ফোন করেছিলুম, উনি বাড়িতেই ছিলেন। উনি বলেন, উনি আজ স্টুডিওতে যাবেন না, তোমারও যাওয়ার কথা নেই।

প্রণবেশ চুপ করে গেল।

স্টুডিয়োতে যাওনি, কোথায় গিয়েছিলে?

প্রণবেশ পাথরের মতন মুখ করে নিঃশব্দ হয়ে রইল।

ট্যাক্সিটা হাজরার মোড়ের কাছে আসতেই প্রণবেশ ড্রাইভারকে বলল, একটু আস্তে করুন, ভাই!

তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, কেউ হারিয়ে গেলে আগে থানায় খবর দেওয়াই নিয়ম। এখন কাবুলদার বাড়ি গিয়ে কি হবে? কাছেই তো থানা সেখানে আগে খোঁজ নিই, যদি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে কোথাও।

থানায় গেলে কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে? কেউ তোমার নাম শুনে চিনতে পারবে? কাবুলদাকে সবাই চেনে।

ছেলে বাড়ি ফেরেনি, এই উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে প্রবল ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলা কিছুতেই উচিত নয়। তাই প্রণবেশ চুপ করে গেল। সে তো জানেই, রাগের সময় সুতপার জ্ঞান থাকে না।

ট্যাক্সিটাকে ডান দিকে বেঁকতে বলা হল। বাকি পথ দুজনেই নিস্তব্ধ।

কাবুলদা দোতলার বারান্দাতেই জেগে দাঁড়িয়ে আছে। প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি পরা। হাতে চুরুট। নিশ্চয় সুতপা ওকে আগে থাকতেই টেলিফোন করেছে। সদর দরজা খোলা।

কাবুলদা ওপর থেকে বলল, ট্যাক্সিটা ছেড়ে দাও, আমি গাড়িতে পৌঁছে দেব।

ইচ্ছে থাকলেও ট্যাক্সিটা ছাড়ার উপায় নেই! ভাড়া মেটাতে হবে। সুতপা চলে গেল বাড়ির মধ্যে প্রণবেশ উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। টাকার কথাটা কি সুতপা বলবে না, তাকেই চাইতে হবে? প্রণবেশের গায়ের ওপর দিয়ে যেন শত-শত শোঁয়া পোকা হেঁটে যাচ্ছে।

এতক্ষণ বাদে প্রণবেশের গভীরভাবে মনে হল বাবুনের সত্যি-সত্যি কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? যদি তাই হয়, তা হলে এখন সারারাত ধরে কাবুলদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে হবে। সম্পূর্ণ দুটি বিপরীত রকমের দুশ্চিন্তা খেলে গেল প্রণবেশের মনে।

কাবুলদা বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কী হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো।

মরমে মরে গিয়ে প্রণবেশ বলল, সঙ্গে টাকা আনিনি, ট্যাক্সি ভাড়াটা...

ট্যাক্সির মিটার দেখতে এসে কোমর বাঁকিয়ে কাবুলদা ভেতরে তাকিয়ে ড্রাইভারকে দেখল। তারপর বলে উঠল, কে রে সুলেমান না?

ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ স্যার! ভালো আছেন স্যার?

মাথা ঝুকিয়ে কাবুলদাকে সেলাম জানাল সে। কাবুলদা বলল, কত হয়েছে। পয়সাটা তুই পরে এক সময় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাস। এখন যা পালা। তোর সেই শিরদাঁড়ার ব্যথাটা ঠিক হয়ে গেছে?

এইরকম অবস্থাতেও প্রণবেশের ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। রাজভবনের মালি থেকে এয়ারবাসের পাইলট পর্যন্ত কাকে না চেনে কাবুলদা? সকলের যে নাম মনে রাখে শুধু তাই নয়, শিরদাঁড়ার ব্যথা, পায়ের কড়ে আঙুলের নোখ উঠে যাওয়ার কথাও মনে রাখে।

প্রণবেশের কাঁধ জড়িয়ে ভেতরে নিয়ে এসে কাবুলদা জিগ্যেস করল, কী ব্যাপার? এত রাত্রে স্বামী-স্ত্রী যুগল অভিযান? ভালোই হয়েছে। হুইস্কি খাবে তো? একটা স্কচ পেয়েছি আজই—

তবে কি সুতপা আগে ফোন করেনি? ঘটনাটা জানে না? কিংবা প্রণবেশের সামনে জানাতে চাইছে না।

সুতপা একটা সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে, ঘরের এককোণে। হঠাৎ দু-হাতে মুখ চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নির্লিপ্ত চোখে সেদিকে তাকাল প্রণবেশ। যেন সুতপা তার স্ত্রী নয়। অচেনা এক ক্রন্দনরতা

যুবতী, দুজন পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে এই ট্র্যাজিক দৃশ্যটি অনেক বেশি ব্যঞ্জনা পায়।

এরপর নিশ্চয়ই কাবুলদা নিদারুণভাবে বিস্মিত ও ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে সুতপার পিঠে হাত রাখবে এবং নানান প্রশ্ন করবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

দেওয়ালের কাবার্ড খুলতে মুখ ফিরিয়ে খানিকটা অবাক হয়ে বলল, এ কী? কান্নাকাটি কিসের জন্য? কত্তাগিন্নিতে ঝগড়া হয়েছে?

প্রণবেশ ঘড়ি দেখল। পৌনে এগারোটা। এইরকম ছেঁদো নাটক আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, এখানে বাবুনের খোঁজ করতে বেরুতেই হবে।

—বাবুন এখনও বাড়ি ফেরেনি। আমি সওয়া দশটার সময় বাড়ি ফিরে শুনলাম...সুতপা খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে।

—বাবুন...বাড়ি ফেরেনি? তাতে এত চিন্তার কী আছে? হি ইজ আ, গ্রোওন আপ বয় নাও!

কিছুক্ষণ আগে সুতপা তার স্বামীর দিকে যে-রকম জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়েছিল, মুখ থেকে হাত সরিয়ে সেইরকম একটা দৃষ্টি দিল কাবুলদার দিকে। সাহায্যের জন্য প্রথম যার কাছে ছুটে এল, সে-ও কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না? অবশ্য, সুতপার চোখের কোণে অশ্রু লেগে আছে বলে তার এখনকার দৃষ্টিকে বেশ রমণীয় মনে হল প্রণবেশের।

এবারে চড়াভাবে হেসে বলল, আচ্ছা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাবুনের খোঁজ এনে দিচ্ছি, তাহলে হবে তো?

প্রণবেশের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, তুমি বেট্ ফেলবে আমার সঙ্গে?

প্রণবেশের ভুরু কুঁচকে গেছে। কাবুলদা আর যাই হোক, যা-তা মিথ্যে কথা বলে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাবুন-এর খবর জেনে দেবে? বাবুন কি এ-বাড়িতেই এসেছে! কিন্তু এ-বাড়িতে বাবুনের কোনও খেলার সঙ্গী কিংবা বই বদলা-বদলির সঙ্গী নেই, সে কেন আসবে?

কাবুলদা পরেছে একটা কালচে রঙের হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি। গায়ের রং ফরসা, তাই এই রঙের পোশাকে তাকে বেশ মানায়। একটাও বোতাম নেই, দেখা যাচ্ছে তার স্বাস্থ্যবান, রেশম বুক। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। ঠিক ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে হাত ছড়িয়ে আছে!

এবারে গলা জড়িয়ে কাবুলদা বলল, র-ত-ন, টেলিফোনটা নিচে দিয়ে যা!

বিশ্ব সংসারের সবাইকে চেনে কাবুলদা। এখন একটার-পর-একটা টেলিফোন শুরু করবে। তা বলে পাঁচ মিনিট? এত আত্মবিশ্বাস?

কাবার্ডটা আবার খুলতে-খুলতে কাবুলদা জিগ্যেস করল, হুইস্কি খাবে তো?

সুতপার মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রণবেশ বললে, হ্যাঁ, খাব।

কাবুলদার সঙ্গে বসে এসব খাওয়া-টাওয়া পছন্দ করে না প্রণবেশ। অন্য সময় এড়িয়ে যায়। কিন্তু এখন তার শরীর কিছু অ্যালকোহল চাইছে।

একটা সুদৃশ্য বোতল বার করল কাবুলদা। কয়েকটি পাতলা ফিনফিনে গেলাস নামাল, তারপর অতি যত্ন করে তিন গেলাসে বিলাতি মদ্য ঢালতে লাগল। প্রণবেশ বা সুতপা কোনও কথা বলছে না। ওরা পরস্পর চোখাচোখিও এড়িয়ে যাচ্ছে।

রতন টেলিফোনের রিসিভারটা এনে প্লাগ লাগাবার পর কাবুলদা বলল, ঠান্ডা জল নিয়ে আয়, রতন। প্রণবেশ, তোমার সোডা লাগবে? সুতপা তুমি বাড়িতে ফোন করো!

সুতপা চমকে উঠে বলল, বাড়িতে?

হ্যাঁ, তোমাদের পাশের ফ্ল্যাটে। তোমরা চলে আসার ঠিক দু-মিনিট বাদেই বাবুন বাড়ি পৌঁছে গেছে। আমাকে ফোন করে জানাল, তোমরা এলে যেন খবর দি! এবারে হল তো? হা-হা-হা-হা!

খবরটা হজম করতে বেশ কয়েকমুহূর্ত সময় নিল ওরা দুজন।

কাবুলদা বলল, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, ফোন করে দ্যাখো।

সুতপা তাকাল প্রণবেশের দিকে। এত রাত্রে সে লিলিদের ফ্ল্যাটে ফোন করতেও চায় না। সে দায়িত্ব প্রণবেশের ওপর দিতে চায়।

প্রণবেশ কাঁধ ঝাঁকাল। অর্থাৎ বাবুন যখন এসেই গেছে তখন আর ফোন দরকার কি। তার চোখ হুইস্কির গেলাসের দিকে।

সুতপা জিগ্যেস করল, কেন সে এত দেরি করে ফিরল, কোথায় গিয়েছিল?

কাবুলদা বলল, সেসব বাড়িতে গিয়ে জিগ্যেস করো। আমি জানতে চাইনি। এত চিন্তার কি আছে, বাবুন ইজ আ ভেরি নাইস বয়। এর মধ্যেই ওর বেশ দায়িত্বজ্ঞান হয়েছে। নাও রিল্যাক্স। বসো! এই নাও গেলাস।

বাবুনের জন্য এত উতলা ছিল সুতপা, এখন বাবুন বাড়ি ফিরেছে শুনে বাড়ি ফেরার জন্য আর সে-রকম ব্যস্ততা দেখা গেল না তার। সে নাক কুঁচকে বলল, আমি হুইস্কি খাব না। অন্য কিছু নেই?

কাবুলদা বলল, ভোদ্‌কা আছে। বিয়ারও দিতে পারি। তুমি যা চাও!

যেন কাবুলদাই তার নিরুদ্দেশ সন্তানকে উদ্ধার করে দিয়েছে, এরকম একটা কৃতজ্ঞতা বোধে সুতপা গিয়ে বসল, তার পাশে। বিজয়ীর ভঙ্গিতে সহাস্য মুখে কাবুলদা তাকাল তার দিকে।

প্রণবেশ এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে মন দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

হুইস্কির গেলাসে প্রথম চুমুক দেওয়ার পর সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল গেলাসের মধ্যকার সোনালি রঙের পানীয়ের দিকে। তার মুখ তেতো লাগছে আর সেই স্বাদটা সে তাড়াতে চাইছে যে-কোনও উপায়ে। এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিলে কি ঠিক হয়ে যাবে?

একটা কথাই তার মনে পড়ছে বারবার। বাড়ি ফিরেই বাবুন এখানে ফোন করল কেন? রঘু নিশ্চয়ই বলেছে যে তার বাবা আর মা একসঙ্গে ট্যাক্সিতে বেরিয়েছে তাকে খুঁজতে। তারা যে প্রথমেই কাবুলের বাড়িতে আসবে, সে কথা বাবুন বুঝল কী করে?

॥ দুই ॥

অফিস থেকে ট্যুরে পাঠানো কিছু টাকা অতিরিক্ত উপার্জন হয়। নইলে বাকি সবটায় নিরানন্দ ভ্রমণ। দু-দিনের জন্য বম্বে আসা, কিন্তু চোখের পলকে কেটে গেল সেই দুটো দিন। এখানকার জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারিতে হুসেনের একটা রেট্রোসপেকটিভ প্রদর্শনী দেখার ইচ্ছে ছিল প্রণবেশের, কিন্তু সে সময়ই পাওয়া গেল না। অফিসের লোকজনরা সবসময় তাকে চিনে জোঁকের মতন ঘিরে ছিল।

কলকাতায় তুলনায় বোম্বাইয়ের অফিস-সংক্রান্ত লোকজনদের অনেক বেশি পশ্চিমি কেতাদুরস্ত মনে হয় প্রণবেশের। ক্লায়েন্টের সঙ্গে দুপুরের লাঞ্চের সময় ব্যবসার কথাবার্তা। তখন মদ খেতে হবে খুব মেপে, কেন না তারপর সারা দুপুর কাজ। রাত্তিরে ডিনার পার্টিতে আবার অন্যরকম, খুব ঢিলেঢালা ভাব, ইয়ার্কি অশ্লিল রসিকতা এমনকী নেশার ঝোঁকে নাচ পর্যন্ত। এইসব পার্টিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক। তখন আর কোনও কাজের কথা না, তখন শুধু ভজনীয় ব্যক্তিদের সূক্ষ্মভাবে তোষামোদ করাটাই আসল কাজ।

প্রণবেশের এক-এক সময় খুব ক্লান্ত লাগে, এইরকম পরিবেশ একেবারে পছন্দ করে না, তবু সে নিরুপায়। তার যা চাকরি, তাতে শুধু কোনওক্রমে চাকরি রক্ষা করার চেষ্টা করে গেলেই চলবে না, হয় প্রতিনিয়ত উন্নতির চেষ্টা করে যেতে হবে, নইলে বরখাস্ত হতে হবে। তোমার

উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানে অনবরত দৌড়ানো।

একটি মাঝারি ধরনের বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে প্রণবেশ দাশগুপ্ত চার নম্বর এক্সিকিউটিভ। আটচল্লিশ বছর বয়সে, ব্রহ্মতালুতে সবে টাক পড়তে শুরু করেছে। এমনিতে রোগা লম্বাটে চেহারা, অথচ তারই মধ্যে ভুঁড়ির রেখা স্পষ্ট। সে যে এক সময় মোটামুটি ভালোই ক্রিকেট খেলত তা আর বোঝবার কোনও উপায় নেই। তবু এখনও প্রণবেশকে যুবকদের দলেই ফেলা যায়। যে-কোনও আড্ডাতেই সে অন্যদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না কখনও। অল্পবয়েসি ছেলে-মেয়েদের সামনে সে হঠাৎ-হঠাৎ স্মৃতিচারণও শুরু করে দেয় না।

ফেরার পথে প্লেনের জানলার পাশে আসন পেয়েছে প্রণবেশ। কয়েক বছর আগেও দূরপাল্লার রেল কিংবা বিমান-যাত্রায় প্রণবেশ সর্বক্ষণ একটা বই মুখে করে বসে থাকত। স্টেশন বা এয়ারপোর্ট থেকে কিনে নিত কোনও থ্রিলার। একটা মিনিটও ফাঁকা যেতে দিত না। কিন্তু ইদানীং তার উপলব্ধি হয়েছে যে, সব সময়েই যদি লোকের সঙ্গে কথা বলবে কিংবা বই পড়বে, তাহলে নিজের মুখোমুখি হবে কখন?

বাবুন, তুই কি জানিস, তোর জন্য, পুঁচকির জন্য, তোর মায়ের জন্য আমাকে এত সব কিছু মেনে নিতে হয়েছে? নইলে এসব চাকরি-ফাকরির কি আমি পরোয়া করতুম কখনও? লোকে বলে, আমি ছেলেমেয়ের জন্য, আমার বউয়ের জন্য, সংসারের জন্য একটুও সময় দিই না। লোকের তা বলার কোনও লাইসেন্স লাগে না, তারা যা খুশি বলতে পারে। লোকে কি বুঝবে যে আমার ছেলেমেয়ে যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে, আমার স্ত্রী যাতে তার শখ মিটিয়ে নিতে পারে সে জন্য আমাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাটতে হয়। সেই জন্যই আমি বাড়ির জন্য কোনও সময় দিতে পারি না। লোকে বোঝে না, কিন্তু বাবুন, তুই বুঝবি?

মোটেই উচ্চারিত সংলাপ নয়, একেবারেই মনে-মনে কথা। তবু প্রণবেশের ভুরু উঁচুতে উঠে গেছে, নাকের পাটা দুটো ফোলা, প্রতি লোমকূপে সতর্কতা, যেন সামনেই বসে আছে তার প্রতিপক্ষ।

সেইরকম ভাবেই একটুক্ষণ বসে থেকে, তারপর প্রণবেশ আস্তে-আস্তে শান্ত হল। তারপর হাসল। তারপর নিজেকে একটু বকল। দূর, এসব কী পাগলের মতন আমি চিন্তা করছি? বাবুন ছোটছেলে, তার কী এসব বোঝার বয়স হয়েছে এখন? সে এখন খেলাধুলা করবে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবে, পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্রমে-ক্রমে বাইরে পা বাড়াবে। কত সুন্দর ওই বয়েস, কত তাজা, কত স্বপ্নময়...।

বছর পাঁচেক আগে এইরকম একটা ফ্লাইটে দেখা হয়েছিল কাবুলদার সঙ্গে। কাবুলদার চেহারাটা চোখে পড়বার মতন, সাজপোশাকেও উগ্র রঙের ব্যবহার থাকে বেশি। অন্য যাত্রীরা নিজের জায়গায় বসে থাকে, কিন্তু কাবুলদা ঘোরাঘুরি করছিল অনবরত। এয়ার হোস্টেস, স্টুয়ার্ডদের সঙ্গে কথা বলছিল সাবলীলভাবে। কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গেও চেনা আছে।

প্রণবেশও চিনতে পেরেছিল, কিন্তু কথা বলেনি। খুবই সামান্য পরিচয়! তবু এই মানুষটিকে প্রণবেশের মনে আছে।

নিউ আলিপুরে বড়মামা যখন বাড়ি করলেন, তখন প্রথম-প্রথম সেখানে কিছুদিন যেত প্রণবেশ। বড়মামার ছেলে নাটুদার খুব বন্ধু এই কাবুলদা। চেহারার মতন এর ব্যবহারেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বলে এইসব মানুষকে চট করে ভুলে যাওয়া যায় না।

অতদিন পর প্লেনের মধ্যে দেখা পেয়ে প্রণবেশ কোনও কথা বলেনি। তার মনে হয়েছিল, কাবুলদাই তাকে চিনতে পারবে না। প্রণবেশের চরিত্রে কিংবা ব্যবহারে তো সেরকম বৈশিষ্ট কিছু নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার একবার চোখাচোখি হতেই কাবুলদা এগিয়ে এসে বলেছিল, তুমি...প্রণবেশ না? অনেকদিন তোমায় দেখিনি, নাটু বিলেতে চলে যাওয়ার পর ওর বাড়িতেও আমার বেশি

যাওয়া হয় না...

কেন, কাবুলদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার দিনটার কথা আজ মনে পড়েছে? প্রণবেশের কি চিন্তা করার আর কোনও বিষয় নেই?. সে সিগারেট ধরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

আজকালকার এইসব বড়-বড় বিমানগুলো এত উঁচু দিয়ে চলে যে বাইরের কোনও দৃশ্য দেখার থাকে না। শুধুই বোকা-বোকা শূন্যতা। আগেকার ডাকোডা বা ফকার ফ্রেন্ডশিপ জাতীয় বিমানগুলো ছিল অনেক ভালো, তাতে বসে নিচের পাহাড়-নদী জঙ্গল যেমন দেখা যেত তেমনি দেখা যেত ওপরের মেঘের খেলা।

এক-একটা ছোটখাটো ঘটনায় এদিক-ওদিক মানুষের জীবনটা কত বদলে যেতে পারে। পাঁচ বছর আগে সেই যে কাবুলদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেটা না হতেও তো পারত। সেদিনকার বদলে পরের দিন প্রণবেশ এলেই অন্যরকম হত।

কাবুলদার সঙ্গে দেখা হতেই সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরোনো সম্পর্ক ঝালিয়ে নিল। নাটুদার বন্ধু এই সুবাদে কাবুলদা তাকে প্রথম থেকেই তুমি সম্বোধন করার অধিকার পেয়েছে।

কাবুলদা সেদিন প্রণবেশের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে ককপিটে নিয়ে গিয়েছিল। একজন পাইলটের সঙ্গে তার তুই-তুকারির সম্পর্ক। ককপিট থেকে দেখার কিছুই নেই। অন্য যাত্রীরা এখানে আসতে পারে না, কাবুলদা পারে, এই অহমিকার সুড়সুড়িটাই আসল কথা।

দমদম পৌঁছে কাবুলদা জিগ্যেস করেছিল, তোমায় নিতে কি গাড়ি আসবে?

প্রণবেশ এমন বড় চাকরি করে না যে তার জন্য কেউ এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাবে। সে শেয়ারের ট্যাক্সির চেষ্টা করে, না পেলে কোচের টিকিট কাটে।

কাবুলদার জন্য গাড়ি এসেছে। তিনি প্রণবেশের কাঁধে হাত দিয়ে বলেছিলেন, চলো, তোমায় পৌঁছে দিচ্ছি। কোথায় থাকো এখন? আগে তো আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতে না? সেখানেই আছ?

প্রণবেশ বলেছিল, না, না, এখন বড্ড দূরে থাকি, প্রতাপাদিত্য রোডে। আপনি আমায় এসপ্লানেডে নামিয়ে দেবেন!

কাবুলদা উদাস ভাবে হেসে বলেছিলেন, চলো না।

কাবুলদা কী চাকরি করে কিংবা ওর নিজেরই কিছু ব্যবসা-ট্যাবসা আছে কিনা প্রণবেশ তখন তা জানত না। তার গাড়িটা অত্যন্ত ঝকঝকে তকতকে। সাদা রঙের কোট পরা ড্রাইভার। গাড়ির চেহারা দেখেই তার মালিকের আর্থিক সাচ্ছল্য টের পাওয়া যায়।

একেবারে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল কাবুলদা। এরকম একটা উপকার করলে আনন্দিত হওয়ারই কথা তবু প্রণবেশ সঙ্কুচিত বোধ করছিল। অযাচিত উপকার নেওয়া সে একেবারেই পছন্দ করে না। ছেলেবেলা থেকেই তার এইরকম স্বভাব।

বাড়ির দরজার কাছে এসে নিছক ভদ্রতাবশতই প্রণবেশ বলেছিল, একটু বসে যাবেন নাকি। এককাপ চা—।

সাধারণত কেউ এরকম সময় গাড়ি থেকে নামে না। বলে, পরে আর একদিন আসব।

কিন্তু কাবুলদার যেন কোনও ব্যস্ততা বা ক্লান্তি নেই। বেশ প্রফুল্লভাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা এক কাপ চা খেতে পারি। তোমার বউয়ের সঙ্গেও আলাপ হবে।

সুতপা প্রথমে কাবুলদাকে দেখে খুশি হয়নি। সে বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল।

তখনও স্নান হয়নি সুতপার। পরনে একটা আটপৌরে শাড়ি। রান্নাঘরে সে রঘুর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। গ্যাস ফুরিয়ে গেছে, কেরোসিন স্টোভটা রঘু খুলে ফেলে নিজে নিজেই সারাতে গিয়ে সেটা আরও নষ্ট করে ফেলেছে, সেটা আর ধরানোই যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় স্বামী যদি একজন অপরিচিত পুরুষকে বাড়িতে নিয়ে আসে, কোনও স্ত্রীই আহ্লাদিত হয় না।

স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে ছিল সুতপা।

প্রণবেশও বেশ বিরক্ত হয়েছিল। এক কাপ চা খাওয়াবার জন্য ডেকে আনা হয়েছে ভদ্রলোককে, চা না খাইয়ে তো বিদায়ও করা যায় না। রান্নাঘরে চায়ের জল গরম করার মতন ব্যবস্থাও রাখতে পারেনি সুতপা? প্রণবেশ টাকা রোজগারের জন্য খেটে-খেটে মরছে...। যত বেশি সময় লাগবে, ততক্ষণ কাবুলদাকে বসিয়ে রাখতে হবে, ততক্ষণ প্রণবেশকে ভদ্রতা করে কথাবার্তাও চালিয়ে যেতে হবে!

প্রণবেশ সুতপার দিকে চোখের ইঙ্গিত করেছিল যেন চট করে পাড়ার দোকান থেকে চা কিনে আনা হয়।

কাবুলদা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছিল। মুখে তার সবসময় মুচকি হাসি লেগে থাকে।

সোজাসুজি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, কী গ্যাস নেই? ক'টা সিলিন্ডার? একটা মোটে? আজকাল একটা সিলিন্ডার রাখলে চলে? একটা ফুরোলে তো আর একটা পেতে-পেতে দেড় মাস।

দামি প্যান্ট ও টি-শার্ট পরা কাবুলদা এরপরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল রঘুর পাশে। যেন রঘুর সঙ্গে তার বহুদিনের চেনা এইভাবে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, তোমার বাড়ি কোথায়? মেদিনীপুরে তো, তাই না? এই দ্যাখো, আমি পলতে-ভরা শিখিয়ে দিচ্ছি। পলতে-ভরাটা আসল।

কেরোসিন তেল ও ভুষো কালিতে হাত দু-খানা মাখামাখি করে খানিকক্ষণের মধ্যেই স্টোভটা সারিয়ে ফেলল কাবুলদা। দেশলাই জ্বালিয়ে স্টোভটা চালু করে আবার নিভিয়ে দিল। আবার জ্বালাল। আবার নেভাল। এইভাবে পাঁচবার পরীক্ষা করার পর শতকরা একশো ভাগ নির্ভুল ফলাফল পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রঘুকে বলল, নাও, আর খারাপ হবে না।

মুখে একটুও গর্বের ভাব না ফুটিয়ে কাবুলদা উঠে দাঁড়িয়ে সুতপাকে বলল, সাবান দাও। রান্নাঘরে একটা এক্সহস্ট ফ্যান লাগাওনি কেন? তাতে গন্ধ হয় না।

সুতপাকে কাবুলদার সেই প্রথম কথা। সদ্য আলাপের পর এইরকম বাক্য দিয়ে কথা শুরু করার বোধহয় আর কোনও নজির নেই।

সুতপার মুখে ততক্ষণে নির্মল বিস্ময় ও মুগ্ধতা আঁকা হয়ে গেছে। সুতপার রুচি অতি সূক্ষ্ম। চট করে কোনও মানুষকে সে পছন্দ করে ফেলে না। সুতপা কাবুলদাকে সাবান ও টাটকা তোয়ালে দিল। চা তৈরির আগে কিমার চপ ভাজার হুকুম দিল রঘুকে। তারপর স্বামীর দিকে এমনভাবে তাকাল, যার একটাই অর্থ হয়। দেখলে তো, অন্য বাড়ির পুরুষেরা মেয়েদের রান্নার ব্যাপারেও সাহায্য করতে জানে। আর তুমি শুধু গা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে...।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে কাবুলদা বলল, সুতপা তুমি কি বাংলার বাইরের মেয়ে? তোমার উচ্চারণে একটু যেন টান আছে।

সুতপা বলল, আমি অনেকদিন এলাহাবাদে পড়াশুনো করেছি। কিন্তু আমার উচ্চারণে টান আছে? মোটেই না!

—এলাহাবাদ? ওখানকার মিত্রদের কারুকে চেনো? অলোক মিত্র আমার বন্ধু...।

প্রণবেশ আগাগোড়া নির্বাক দর্শক। যেন নিজের বাড়িতে সে-ই অতিথি। বোম্বেতে যে প্যান্ট-শার্ট পরেছিল, সেই পোশাক পরেই বসে আছে আর একটার-পর-একটা সিগারেট ধ্বংস করছে। তার তুলনায় এ-বাড়িতে কাবুলদা অনেক বেশি সাবলীল। কাবুলদার এক জায়গায় বসে থাকার অভ্যেস নেই, চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের শয়নকক্ষের দরজার কাছে। সুতপার সঙ্গে আলোচনা করছে বাবুনের লেখাপড়া বিষয়ে। বাবুন তখন সিক্স-সেভেনে পড়ে বোধহয়, সুতপার খুব ইচ্ছে ওর স্কুলটা পালটে সেন্ট জেভিয়ার্সে নিয়ে যাবে। কাবুলদা বলল, সেন্ট জেভিয়ার্সে দিতে একটু প্রবলেম হবে ঠিকই, তবে কোনওকিছুই অসম্ভব নয়। চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি এরকম একজনকে ভরতি করিয়েছি একবার—

সুতপা দারুণ উৎসাহে বলে উঠেছিল, আপনি তাহলে আমার ছেলের জন্য একটু চেষ্টা করবেন?

ছেলের স্কুল পালটানোর ব্যাপারে প্রণবেশের ঘোর আপত্তি আছে। সুতপা ওই কথা বলার সময় একবার প্রণবেশের চোখের দিকে তাকায়নি পর্যন্ত।

পরদিনই কাবুলদা একটা গ্যাস সিলিন্ডার এনে হাজির করেছিল। সঙ্গে সুতপার নামে বৈধ কার্ডও আছে। দুটি সিলিন্ডার থাকলে সারা মাসে আর গ্যাসের সমস্যা থাকবে না। কলকাতা শহরে কোনও গৃহকর্ত্রীর কাছে এটা যে কতখানি আনন্দের ব্যাপার, তা শুধু তারাই জানে।

সুতপা নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। লোকটা কি জাদুকর? ছ-মাস চেষ্টা করেও নতুন গ্যাস পাওয়া যায় না।

কাবুলদা এসেছিল বিকেল চারটের সময়। তখন প্রণবেশের বাড়িতে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। কাবুলদা কিন্তু সেদিন একটুও বসেনি, সুতপার শত অনুরোধ সত্ত্বেও এককাপ চা খেতে রাজি হয়নি। গ্যাসের সিলিন্ডারটা পৌঁছে দিয়েই তাড়াহুড়ো করে চলে গিয়েছিল।

সেদিন বাড়ি ফিরে সুতপার উল্লাসিত মুখ থেকে ঘটনাটা শুনে প্রণবেশ কী খুশি হয়েছিল? অথবা রাগ করেছিল? রাগ হওয়ারই বা কী আছে? খুশি হওয়ারই বা কী আছে? এইরকম ব্যাপার হলে স্ত্রীর সামনেও স্বামীকে ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকতে হয়।

তারপর এল সুতপার রান্নার জন্য এক্সহস্ট ফ্যান। বিনা পয়সায় নয় কিন্তু। কাবুলদা যে-যে উপকার করে, তার কোনওটাই প্রত্যাখান করা যায় না এইজন্য। কাবুলদা নিজের থেকেই প্রত্যেকটি জিনিসের দাম উল্লেখ করে, এমনকী খুচরো পয়সা পর্যন্ত ভাঙিয়ে নেয়।

পাঁচ বছর আগে প্লেনে হঠাৎ দেখা, তারপর থেকে কাবুলদা প্রায় প্রত্যেকদিনই বাড়িতে আসে। যেদিন আসে না, সেদিনও টেলিফোনে 'যোগাযোগ হয়! কাবুলদা এসে পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি থাকে না। কোনও-না-কোনও কাজ নিয়েই আসে। কাবুলদাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চাইলেও আধঘণ্টার বেশি ধরে রাখা যায় না। সবসময়েই ব্যস্তবাগীশ।

প্রণবেশ একদিন দারুণ অবাক হয়েছিল প্রদীপের বাড়ি গিয়ে। বসবার ঘরের মেঝেতে বড়-বড় তিনটে অয়েল পেইন্টিং পাতা রয়েছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া, জল আর কাটা আলু নিয়ে কাবুলদা হাঁটু গেড়ে বসে প্রদীপের স্ত্রী শান্তাকে শেখাচ্ছে কীভাবে অয়েল পেইন্টিং পরিষ্কার করতে হয়।

প্রণবেশকে দেখে কাবুলদা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলেছিল, এই যে দ্যাখো, প্রণবেশ, এই সব ভালো ভালো ছবি, ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে যাচ্ছে, অথচ পরিষ্কার করে না কতদিন। অন্যায় ভারি অন্যায়।

সেদিন প্রণবেশের হাসি পেয়েছিল। এই লোকটা কি সবকিছু জানে? এ যে গল্পের চরিত্র।

শান্তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে কাবুলদা, যাতে বোঝা যায় যে সে এ-বাড়িতেও প্রায়ই আসে। অথচ, মাত্র মাস তিনেক আগে, প্রণবেশের বাড়িতেই প্রদীপ আর শান্তার সঙ্গে কাবুলদার প্রথম পরিচয়। বিয়ের পর বোম্বেতে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিল প্রদীপ, এবারে কলকাতায় অন্য চাকরি নিয়ে এসেছে। মানিকতলায় ওদের পৈত্রিক বাড়ি। পুরোনো আমলের বাড়ি, সেকেলে কিছু ফার্নিচার ও ছবি আছে।

প্রদীপ প্রণবেশের বাল্যবন্ধু, কিন্তু শান্তার সঙ্গে এখনও তেমন ভালো করে ভাব হয়নি প্রণবেশের। অথচ কাবুলদার সঙ্গে শান্তা এরইমধ্যে খুনসুটি ও ঝগড়া পর্যন্ত করে। শান্তা বেশ উৎসাহী চোখ নিয়ে বসে আছে কাবুলদার গা ঘেঁষে।

এক-একজন মানুষ পারে এরকম।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রণবেশ দেখতে লাগল কাবুলদার ছবি পরিষ্কার করা। আর কিছু না হোক, অন্তত এই কাজটা প্রণবেশ বোঝে। তাকে ছবি বেচে খেতে হয়। না, না, না, প্রণবেশ

শিল্পী নয়, পৃথিবীর অমর শিল্পীরা তার মতন মানুষের কথা শুনলে নাক কুঁচকোবে। সে বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকত এক সময়। এখন সে কাজও করে না, সে তার কোম্পানির হয়ে বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা বিক্রি করতে যায় বড়-বড় ফার্মের কাছে।

কিন্তু অল্প বয়সে, যখন জীবনটা ছিল অন্যরকম, যখন মনে হত অদেখা ভবিষ্যতের গর্ভে আছে কত না রত্নখানি, তখন এক-একটা ভালো ছবি দেখলে সে রোমাঞ্চিত হত। স্বপ্ন দেখত, প্যারিসের নদীর ধারে বসে সে ছবি আঁকবে আর দরকার হলে ভিক্ষে করেও পেট চালাবে। সেসব কতদিন আগেকার কথা। ছেলেমানুষী!

কাবুলদা ছবি পরিষ্কার করার ব্যাপারে দক্ষ নয়, কিন্তু তার এই জ্ঞানটুকু আছে যে মাঝে-মাঝে এইসব অয়েল পেইন্টিং পরিষ্কার করতে হয়।

সে নিজেই বলল, জানো, প্রণবেশ, একদিন লেডি রানুর বাড়িতে গিয়ে দেখি আর্ট কলেজের কয়েকটি ছেলে ওঁর বাড়ির ছবিগুলো পরিষ্কার করছে! তাদের মধ্যে একটি ছেলে, কী ফাইন তার হাত, একটা কাটা আলু নিয়ে, সে আলুগুলোও ছিল অন্যরকম, বেশ ভিজে-ভিজে, এই আলুগুলো শুকনো, কোলড স্টোরেজের আলু তো, তা ছেলেটা একটা কাটা আলু নিয়ে সাঁ করে হাত ঝুলিয়ে গেল, মনে হল যেন ছোঁয়া লাগালোই না, অথচ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে। ছেলেটার কাছ থেকে শিখে নেব ভেবেছিলুম, সময় পাওয়া গেল না—।

প্রণবেশ বলল, আপনি তো বেশ ভালোই পারছেন দেখছি।

প্রণবেশ জানে, প্রদীপের বাড়ির এই ছবিগুলো এমন কিছু মূল্যবান নয়। নাইনটিনথ সেঞ্চুরির বিলিতি দুর্বল কপি।

প্রদীপ তখন ওপরে ছিল। একটু পরে নেমে এল। সে বলল চল পিন্টু, এখানে শান্তা আর কাবুলদা বসে কাজ করছে, আমরা ডিস্টার্ব করব না। আমরা অন্য ঘরে যাই।

প্রণবেশও ঠিক এই রকমই করে। কাবুলদা যখন তার বাড়িতে এসে সুতপার সঙ্গে নানান কাজের কথা বলে, তখন প্রণবেশ সেখান থাকতে চায় না। কোনও-না-কোনও অছিলায় অন্য ঘরে চলে যায়।

একটা গোলমাল হয়েছিল গত বছর শিলং যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে।

ততদিনে জানা হয়ে গেছে যে কাবুলদার নিজস্ব ব্যবসা আছে। ব্যবসা মানে নানারকম এজেন্সি ও অর্ডার সাপ্লাই। রোজগার বেশ ভালো। কাবুলদার স্ত্রী আছে, দুটি বাচ্চা আছে। যে-কোনও কারণেই হোক, কাবুলদার স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না। কারুর সঙ্গে মিশতেও চায় না। প্রণবেশ মাত্র কয়েকবারই কাবুলদার বাড়িতে গেছে, কিন্তু শুধু প্রথমবারই কাবুলদা তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে সেই ভদ্রমহিলাকে আর দেখা যায়নি।

কাবুলদা পরোপকারী। পুরুষের চেয়ে তাদের বউদেরই সে উপকার করে বেশি। তা বলে পুরুষদের উপকার করতেও সে বিমুখ নয়। মুশকিল হচ্ছে এই যে অনেক পুরুষই উপকার নিতে চায় না। প্রণবেশ অফিসের কাজের ব্যাপারেও কাবুলদা একবার সাহায্য করতে চেয়েছিল, প্রণবেশ এড়িয়ে গেছে।

প্রণবেশের পরিচিত অন্তত পাঁচটি পরিবারে কাবুলদার নিয়মিত যাতায়াত। সকলের সঙ্গেই সমান হৃদ্যতা।

সেবার কাবুলদাকে নিজস্ব কাজে শিলং যেতে হবে। এক সন্ধেবেলা কাবুলদা এসে বলল, সুতপা তোমরাও চলো না।

মেঘালয়ের এক মন্ত্রী কাবুলদার বিশেষ বন্ধু। সে মন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় শুধু শিলং নয়, গোটা মেঘালয় সফর করা যাবে। শিলং ক্লাবে বিনা পয়সায় থাকা, ঘোরাঘুরির জন্য সবসময় গাড়ি পাওয়া যাবে ইত্যাদি।

কাবুলদার স্বভাব আছে নেম ড্রপিং করার। শুধু মেঘালয়ের মন্ত্রী কেন, পশ্চিমবাংলা ও কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রী, লেডি রাণু, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, সুচিত্রা সেন, জিৎপাল রবিশঙ্কর, শান্তিপ্রসাদ জৈনের পুত্রবধূ, ডানলপ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার ইত্যাদি অনেকের সঙ্গেই তার চেনা। এর মধ্যে কোনটি সত্যি, কতটা মিথ্যে তা বোঝার উপায় নেই। কারণ, কাবুলদা একবার রবিশঙ্করের সই করা একখানা রেকর্ড উপহার দিয়েছে বাবুনকে। টেলিভিশানের খবরে একদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পাশে কাবুলদাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। কোনও এক সময় কাবুলদার বাড়ির টেলিফোন খারাপ থাকায় প্রণবেশদের বাড়ি থেকেই কাবুলদা উড়িষ্যায় বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল।

শিলং বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবটা লোভনীয় তাতে সন্দেহ নেই। বাবুনের ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে, কলকাতায় তখন প্রখর গরম। সুতপা যেন নেচে উঠেছিল একেবারে।

কিন্তু সুতপার উৎসাহে ঠান্ডা জল ঢেলে দিয়েছিল প্রণবেশ। তার অফিসের দারুণ কাজ আছে। তাকে তখন একবার দিল্লি যেতেই হবে। সেই প্রোগ্রাম এড়াবার কোনও উপায় নেই।

সুতপা রাগ করে বলেছিল, তুমি প্রত্যেক মাসে একবার করে বোম্বে-দিল্লি যাও আমাদের বুঝি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

প্রণবেশ বলেছিল, আমি কি আর শখ করে যাই! রুজি-রোজগারের জন্য যেতেই হয়।

তবু তো তোমার যাওয়া হয়ই। আমরা যে বছরের-পর-বছর দম আটকে কলকাতায় পড়ে আছি!

সুতপার এই কথাটা সত্যি নয়। প্রতি বছর না হলেও অন্তত দুবছরে একবার প্রণবেশ তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে যায়। গত সেপ্টেম্বরেই যাওয়া হয়েছিল গোয়াতে, একমাসের ট্রিপ। কিন্তু রাগের সময় সুতপার এসব কথা মনে থাকে না।

সে কথার উল্লেখ না করে প্রণবেশ ক্লান্তভাবে বলেছিল, তোমরা বোঝো না কেন, প্রত্যেক মাসে প্লেনে ট্রাভেল করা কী বিরক্তিকর ব্যাপার!

তা বলে তুমি এখন ছুটি নিতে পারো না?

যে-কোনও সময় ছুটি নেওয়া যায় না। এ তো গভর্নমেন্ট অফিস নয়। এখন পি-কে ছুটিতে আছে!

সুতপা আরও রেগে উঠে বলেছিল, তাহলে তুমি না যেতে পারো যেও না। আমি বাবুন আর ছুটিকে নিয়ে ঘুরে আসি। আমার কতদিন ধরে শিলং দেখার ইচ্ছে! বাবুনের পরীক্ষা হয়ে গেল, ও বেচারা কোথাও যাবে না?

প্রণবেশ তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় বলেছিল, তা বেশ তো, তোমরা ঘুরে এসো না!

কাবুলদা বলল, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে। সুতপা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমার সঙ্গে চলুক। প্রণবেশ তুমি দিল্লির কাজ সেরে সোজা চলে এসো শিলং-এ। আমরা তোমার জন্য ওয়েট করব।

প্রণবেশ বলল, তা চেষ্টা করা যেতে পারে। আপনারা চলে যান, আমি আপনাদের জয়েন করার চেষ্টা করব পরে। যদি না পারি তো পারলুম না।

সেইরকমই ব্যবস্থা হয়েছিল। প্লেনের টিকিট কেটে ফেলা হল পর্যন্ত।

প্রণবেশ বেশ স্বস্তি বোধ করেছিল। সুতপার অনেকদিন থেকে শিলং যাওয়ার ইচ্ছে। সে নিয়ে যেতে পারছে না এই সুযোগে সুতপা ঘুরে আসুক।

হৃদয়ের অতি গভীরে এক-একটা গোপন কথা থাকে। এখন সেই গোপন কথাটি হল, অফিসের কাজে প্রণবেশের দিল্লি যাওয়াটা তত জরুরি নয়। অন্য কারুর ওপরে সেই ভার দিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু এই শিলং ভ্রমণটায় প্রণবেশ কিছুতেই নিজেকে জড়াতে চায় না। পরোপকারী কাবুলদার সঙ্গে

দিনের-পর-দিন একসঙ্গে কাটাতে হবে, এই চিন্তা করলেই প্রণবেশের শরীর শিউরে ওঠে। একথা সুতপাকেও বলা যায় না।

শিলং যাত্রার ঠিক আগের দিন স্বামী-স্ত্রীতে অকস্মাৎ এক ঝগড়া হয়ে গেল।

কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে একটা ছবি আঁকার স্টুডিও খোলা হয়েছে, অফিস ছুটির পর প্রণবেশ সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসে। ল্যান্সডাউন রোডে দু-খানা ঘর ভাড়া নিয়ে এই স্টুডিও। প্রণবেশ আর তার তিন বন্ধু জীবিকার জন্য চাকরি করে বিভিন্ন অফিসে। এই স্টুডিওটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে, এখানে তারা নিজস্ব ছবি আঁকবে।

ছবি আঁকার কাজ অবশ্য তেমন কিছু এগোয়নি। আড্ডা আর পারস্পরিক ক্ষোভ বিনিময়ই হয় বেশি। বোতল কিনে এখানে মদ খাওয়ার বেশ সুবিধে। বারের চেয়ে অনেক সস্তা পড়ে।

সেদিন প্রণবেশের একটু বেশিই মদ্যপান হয়ে গিয়েছিল। মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কাজ করছিল প্রণবেশের। পরদিন সকালেই সুতপাদের ফ্লাইট, আজ ওদের রাত জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়।

বাড়ি ফিরে প্রণবেশ দেখেছিল, সুতপা বাথরুমে। প্রণবেশ চুপি-চুপি রঘুকে জিগ্যেস করেছিল, বউদিদের খাওয়া হয়ে গেছে!

সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। প্রণবেশের খাওয়ার ঢাকা দেওয়া আছে।

প্রণবেশ বলেছিল, আমি আর রাত্রে খাব না। সব তুলে দে। তোরা শুয়ে পড়।

সুতপা বাথরুম থেকে বেরুবার আগেই প্রণবেশ জামা প্যান্ট ছেড়ে লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। কিন্তু ঘুমোয়নি, চোখ মেলে রেখেছিল কষ্ট করে। প্রণবেশ আগেই ঘুমিয়ে পড়লে সুতপা খুব রেগে যায়।

সুতপা বাথরুম থেকে বেরিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, প্রণবেশ নিরীহভাবে জিগ্যেস করেছিল, তোমাদের সব গুছানো হয়ে গেছে? ডায়িংক্লিনিং থেকে গরম জামা-কাপড় আনিয়েছ?

সুতপা করুণ, দুঃখিত মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, বাবুন যাবে না বলছে।

কেন? বাবুন যাবে না কেন?

কী জানি! আজ সারাদিন ধরেই আমাকে বলছে, মা আমি যাব না!

হঠাৎ বাবুনের এরকম খেয়াল হল?

ও বলছে, ওর নাকি টেবিল টেনিস ম্যাচ আছে।

সত্যি আছে নাকি?

কী জানি! থাকলেও এমন কিছু ফাইন্যাল-টাইন্যাল নয়। তাহলে তো আগেই বলত।

আসল ব্যাপার কী জানো! ছেলে বড় হচ্ছে, সে এখন বাপ-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় না। এখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই তার বেশি ভালো লাগবে। আমারও এরকম হত, মা-বাবার সঙ্গে কোথাও যেতে চাইতুম না।

কিন্তু বাবুনের জন্যেই তো আমি গরজ করে...ওর পরীক্ষা হয়ে গেল, পরীক্ষার পর সবাই তো বেড়াতে যেতে চায়—

তুমি ওকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেছ?

বললুম তো কতবার। ও বলছে, বাবা যাবে না, আমিও না গেলেই বা...আমি ঠিক একা থাকতে পারব।

প্রণবেশ উঠে বসে বলেছিল, দাঁড়াও, আমি বাবুনকে বুঝিয়ে বলছি। আমি বললে, ও ঠিক শুনবে। এই বয়েসের ছেলেরা স্বাধীন হতে চায়। এখন টিকিট-ফিকিট কাটা হয়ে গেছে। এবারে ওকে যেতেই হবে। আমি ওকে বলছি।

প্রণবেশ খাট থেকে নামবার আগে সুতপা তার সামনে এসে দাঁড়াল। বেশ কয়েক মুহূর্ত

কোনও কথা বলল না সে, ঘনঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল শুধু। সিনেমার ভাষায় একে বলে ফুটেজ খাওয়া।

তারপর সুতপা গলার আওয়াজ একেবারে বদলে ফেলে ঝাঁঝাল স্বরে বলল, তুমি আমায় জোর করে শিলং পাঠাতে চাইছ কেন বলো তো?

প্রণবেশ একেবার আকাশ থেকে পড়ল।

আমি...আমি তোমায় জোর করে শিলং পাঠাচ্ছি? তার মানে?

নিশ্চয়ই! তুমি যেন আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছ। কেন বলো তো?

কী পাগলের মতন কথা বলছ সুতপা? তোমারই তো শিলং যাওয়ার খুব শখ!

শিলং যাব, তা তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারো না? কাবুলদার সঙ্গে যেতে হবে কেন?

তুমি নিজেই তো যেতে চাইলে।

আমি চাইলাম, আর তুমি অমনি রাজি হয়ে গেলে? তোমার আসল মতলবটা কী বলো তো?

কী মুসকিল, তুমি যেতে চাইলে, তুমি এত উৎসাহ দেখালে, তাতে আমার রাজি হওয়াটা দোষের ব্যাপার?

কাবুলদার সঙ্গে আমি কেন যাব? সে আমার কে?

সেটা তুমিই ভালো জানো!

আমি যার-তার সঙ্গে বাইরে যেতে চাইলে তুমি অমনি রাজি হয়ে যাবে? তার মানে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেই যেন তুমি বেঁচে যাও।

আমি যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হতুম, তাহলে তুমিই বলতে আমি স্বার্থপর, আমি স্বামী হিসেবে অত্যন্ত পোসেসিভ, আমার মন সংকীর্ণ।

আমি শিলং যাব, সঙ্গে আমার স্বামী নেই, কাবুলদা যাবে অথচ তার বউ যাবে না, লোকে কী বলবে?

লোকে কী বলে না বলে, ওসব গ্রাহ্য করি না আমি!

তার মানে তুমি আমাকেও আর গ্রাহ্য করো না!

এরপর কান্না শুরু করল সুতপা! প্রণবেশ কিছুক্ষণ-অপ্রস্তুত হয়ে বসে রইল। সে কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

একটু পরে কান্না থামিয়ে সুতপা বলল, সত্যি করে বলো তো, তুমি আমায় সন্দেহ করো? তাহলে আমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব!

সেরকম তো কোনও কারণ ঘটেনি।

সত্যি করে বলো!

হ্যাঁ, সত্যিই বলছি, সেরকম কোনও কারণ ঘটেনি। তোমার সন্দেহ করব কেন?

তাহলে তুমি এত উদাসীন কেন? আমার ভাল্লাগছে না। কিচ্ছু ভাল্লাগছে না? আমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি! তুমি যখন আমাকে আর চাও না...

ছুটন্ত সুতপাকে উঠে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে হল প্রণবেশকে।

সুতপা আবার একটুক্ষণ কাঁদল। তারপর বলল, আমি এক্ষুনি ফোন করে দিচ্ছি কাবুলদাকে। আমরা শিলং যাব না।

সুতপা সত্যিই টেলিফোন তুলতে প্রণবেশ বলল টিকিট কাটা হয়ে গেছে, অতগুলো টাকা নষ্ট হবে!

সুতপা জ্বলন্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, ছিঃ! তুমি এরকম...এখনও টাকার কথা ভাবছ।

এই অভিযোগের কোনও উত্তর না দিয়ে প্রণবেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে-মনে ভাবল, যাদের বাল্যকাল দারিদ্র্যে কেটেছে, তাদের এই এক দোষ, কিছুতেই তারা টাকা খরচের কথা উপেক্ষা করতে পারে না। টাকার জন্য মানুষকে যে কত উঞ্ছবৃত্তি করতে হয়, তা তো তুমি জানো না সুতপা!

সেই রাত্রে সুতপার টেলিফোন পেয়ে একটুও বিচলিত হয়নি কাবুলদা। যেন এরকম পরিণতি তার জানাই ছিল! সুতপার সিদ্ধান্ত পালটাবার জন্য কাবুলদা কোনও অনুরোধ করল না। হালকা গলায় বলল ঠিক আছে, নো প্রবেলম। টিকিট রিফাউন্ডের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসে তার চেনা আছে!

না, কাবুলদা আর সুতপার সম্পর্ক নিয়ে কখনও কোনও সন্দেহ করার কারণ ঘটেনি প্রণবেশের মনে। কাবুলদার ব্যবহারে কোনও গোপনীয়তা নেই। এই এক ধরনের মানুষ পরস্ত্রীর মধ্যে নিজেকে অতি প্রয়োজনীয় করে তোলাতেই যার আনন্দ। খুব বেশি এগোয় না আর।

সুতপার ব্যাপারটাও প্রণবেশ বোঝে। অধিকাংশ মেয়েই চায় কোনও পুরুষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে। স্বামী যদি অতি ব্যস্ত কিংবা উদাসীন হয়, আর অন্য কোনও সুবিধাজনক পুরুষ যদি কাঁধটা এগিয়ে দেয়, তাহলে মেয়েরা সেখানেই মাথা রাখে। তার মানেই দ্বিচারিণী হওয়া নয়।

কিন্তু বাবুন কেন শিলং যেতে চায়নি!

কিংবা সেই যেদিন সে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল, সেদিন বাবুন বাড়ি ফিরেই শুনেছিল, তার মা ট্যাক্সি করে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সেদিন বাবুন তার মামাবাড়িতেও খবর নেওয়ার আগে প্রথমেই কেন কাবুলদার বাড়িতে ফোন করল?

বাবুন বড় হচ্ছে, অনেক কিছু বুঝতে শিখছে। বাবুন কি মনে করে, কাবুলদা তার মায়ের প্রেমিক?

॥ তিন ॥

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামছিল বাবুন, নিচে কাবুলদার সঙ্গে দেখা।

কাবুলদা জিগ্যেস করল, এই তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?

পাশ কাটিয়ে যেতে-যেতে বাবুন বলল, আমার বন্ধুর বাড়িতে।

কাবুলদা খপ করে বাবুনের ডান হাত চেপে ধরে বলল, দাঁড়া না, পালাচ্ছিস কোথায়? তোর এক মিনিটও কথা বলার সময় নেই। এই ডেস্ক-ক্যালেন্ডারটা তোর জন্য এনেছি দ্যাখ তো, তোর পছন্দ?

একটা জার্মান ক্যালেন্ডার। লম্বাটে, চকোলেট বাক্সের মতন। পাতায়-পাতায় অতি সুদৃশ্য ছবি।

বাবুন সেটার দিকে ভালো করে চোখ না বুলিয়ে বলল, হ্যাঁ।

এই নে।

তুমি তো ওপরে যাচ্ছ। ওপরে রেখে দাও।

মা আছে বাড়িতে!

হ্যাঁ। বাবাও আছে।

বাবুনের হাতটা ছেড়ে দিতে গিয়েও হঠাৎ চমকে গিয়ে কাবুলদা বলল, একি তোর এখানে কাটল কি করে? ইস, এ যে অনেকখানি।

ডান হাতের কনুইয়ের ঠিক ওপরেই একটা সদ্য ক্ষত। হাফ-শার্টের হাতার নিচে খানিকটা ঢাকা পড়ে।

বাবুন বলল, কাল খেলতে গিয়ে লেগেছে। বেশি লাগেনি।

ওষুধ লাগিয়েছিস?

না। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ।

মিথ্যে কথা বলছিস। তোর মা দেখেছে?

আবার বাবুনের হাত চেপে ধরে কাবুলদা বলল, চল আমার সঙ্গে ওপরে। যখন-তখন সেপটিক হয়ে যেতে পারে—।

বাবুনের তখন খুবই তাড়া, ওপরে ফিরে যাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু কাবুলদার মুঠি সে ছাড়াতে পারে না।

তাছাড়া বাবুন খুব ভদ্র ছেলে। সে কাবুলদার কথা মেনে নেয়।

বসবার ঘরের সোফায় আধ-শোওয়া ভাবে কাত হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে প্রণবেশ। কাবুলদা তাকে দেখেও কোনও কথা না বলে চেঁচিয়ে ডাকল, সুতপা! দ্যাখো তোমার ছেলের কীর্তি।

বাবুনকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে প্রণবেশ জিগ্যেস করল, কী হয়েছে রে বাবুন!

কিছু না।

সুতপাও বেরিয়ে এসে উৎকণ্ঠিতভাবে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে।

কাবুলদা বলল, এই দ্যাখো, তোমার ছেলে কতখানি হাত কেটেছে। নিশ্চয়ই তোমরা কোনও খবর রাখো না?

সমস্ত মুখখানাকে ভয়েই ছবি করে তুলে সুতপা বলল, অ্যাঁ? দেখি! ছেলেটা আজকাল এত অসভ্য হয়েছে, কিচ্ছু বলে না আমাকে। সবকিছু লুকোয়।

কাবুলদা বলল, ওষুধ-টষুধ কিছু আছে? নিয়ে এসো, আমি একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি! খোলা রাখা একদম ঠিক নয়।

জমে-পড়া মানুষের মতন সুতপা বলল, কী ওষুধ? কোন ওষুধ লাগে? না, ওষুধ তো কিছু নেই।

ডেটল আছে তো অন্তত?

হ্যাঁ, তা আছে।

এইবারে বাবুন প্রতিবাদ করে বলল, আমি ডেটল লাগাব না। বড্ড জ্বালা করে।

কাবুলদা সবিস্ময়ে বলল, ডেটল লাগালে জ্বালা করে? বলিস কী রে? আমরা তো যখন তখন ডেটল লাগাচ্ছি। রাস্তার ধুলোবালিতে কত জার্ম থাকে, একটা কিছু অ্যান্টিসেপটিক না লাগালে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে যেতে পারে, জানিস?

বাবুন বলল, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কেটে গেল। টিটেনাস হলে তার মধ্যেই হয়, পরে হয় না।

সুতপা ততক্ষণে ডেটল নিয়ে এসেছে। সে জোর করেই বাবুনের হাতে লাগাতে যায়।

বাবুন আবার প্রতিবাদ করে বলল, না, না, দিও না, বলছি তো দরকার নেই।

কাবুলদা বলল, কেন ছেলেমানুষী করছিস বাবুন? আমি খুব যত্ন করে লাগিয়ে দিচ্ছি, একটুও জ্বালা করবে না।

যার শুক্রবীজে বাবুনের জন্ম, সে এতক্ষণ নির্বাক দর্শক ছিল। এবারে সে খানিকটা ব্যক্তিত্ব নিয়ে বলল, এদিকে আয় তো বাবুন।

বাবুন কাছে আসতেই প্রণবেশ তার হাত ধরে ক্ষত স্থানটা দেখল। অন্তত বছর খানেকের মধ্যে ছেলে তার এত কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়নি, প্রণবেশও বাবুনের শরীর স্পর্শ করেনি।

হাতটা ভালো করে উলটে দেখে প্রণবেশ বলল, বাবুন ঠিকই বলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে আর টিটেনাস হয় না। অল্প বয়সে এরকম মাঝে-মাঝে তো কাটবেই। আমাদের কত কেটেছে।

কখনও ওষুধ লাগাইনি। ব্যান্ডেজ না বেঁধে খোলা রাখলেই এসব তাড়াতাড়ি সেরে যায়। তুই যা বাবুন।

কাবুলদা বুদ্ধিমান, সে আর কোনও কথা বলল না। কিন্তু সুতপা বলল, বাবুনের কী ভাগ্য, আজ তার বাবা তাকে দেখেছে। সারাদিন তো ছেলের সঙ্গে একমিনিট কথা বলারও সময় পায় না।

প্রণবেশ আবার তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে খবরের কাগজে।

কাবুলদা জিগ্যেস করল, প্রণবেশ আজ তুমি অফিসে যাওনি?

প্রণবেশ চোখ না তুলেই বলল, নাঃ! আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। জ্বর-জ্বর লাগছে।

বাবুন আর দাঁড়াল না। দরজার কাছ থেকে ছুঁড়ে দিল, মা আমি যাচ্ছি!

রাস্তায় নেমেই প্রায় ছুটতে শুরু করল বাবুন। তার দেরি হয়ে গেছে। লেকে এতক্ষণে কিশোর আর টুকটুক সাইকেল চড়া প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে।

কাল সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েই বাবুনের হাত কেটে গিয়েছিল। মাকে বললে, মা কিছুতেই সাইকেল চালানো শিখতে দিতে রাজি হত না। মার তো সব তাতেই ভয়।

কিশোর এসে গেছে, টুকটুক এখনও আসেনি। দুজনে প্রায় একঘণ্টা সাইকেল নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করল, তাও টুকটুকের পাত্তা নেই। কিশোর বলল, চল, টুকটুকের বাড়িতে যাই।

ঘামে জামাটামা ভিজে গেছে দুজনের। সাইকেলটাকে মাঝখানে রেখে দুজনে দু-পাশে হাঁটতে লাগল। স্কুলে অন্য ছেলেদের পরীক্ষা চলছে বলে এখন ওদের চারদিন ছুটি।

নানানরকম গল্প করতে-করতে কিশোর একসময় হঠাৎ বলল, আমার ছোটমাসি তোর বাবাকে চেনে।

কিশোরের ছোটমাসিকে বাবুন দু-তিনবার মাত্র দেখেছে। তার উল্লেখমাত্র তাঁর চেহারাটা ভেসে উঠল বাবুনের চোখে, বুকের মধ্যেটাও ধক করে উঠল। বাবুনের প্রিয় একটি কমিকস সিরিয়ালে একটি মেয়ের ছবি আছে, যে অনেক দূরের এক-এক গ্রহ থেকে মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে নেমে আসে। কিশোরের ছোটমাসিকে ঠিক অবিকল সেইরকম দেখতে।

কী করে চিনল?

ছোটমাসি তো ছবি আঁকে। আমার মেসোর সঙ্গে তোর বাবার বন্ধুত্ব আছে, মাঝে-মাঝে তোর বাবা যায় ও-বাড়িতে।

কোথায় বাড়ি রে তোর ছোটমাসির।

যোধপুর পার্কে। জলের ট্যাংকটা আছে দেখছিস তো, তার ঠিক পাশেই।

আমি ভেবেছিলুম তোর ছোটমাসি বাইরে থাকেন।

বাইরে মানে?

অনেক দূরে।

আগে থাকত দুর্গাপুরে। হ্যাঁ রে, বাবুন তোর বাবা খুব ড্রিংক করে, না?

একটুক্ষণ চুপ করে রইল বাবুন। তারপর বলল, হ্যাঁ করে। তবে, ক্যাপটেন হ্যাডকের মতন খুব না! কে বলল তোকে?

ছোটমাসিই মাকে বলছিল। বলল, লোকটা ট্যালেন্টড ছিল খুব, ড্রিংক করে-করে নিজেকে নষ্ট করছে।

তোর বাবা ড্রিংক করে না?

কখনও না। আমার বাবা সিগারেট খায় না, পান খায় না, রোজ সকালে যোগব্যায়াম করে।

তোর বাবার হেলথটা খুব ভালো। তোর দাদা কিন্তু ল্যাকপেকে।

দাদাটা কীরকম যেন। কিছু খায় না, জানিস তো। মাংস খায় না, ডিম খায় না। আচ্ছা বাবুন,

তুই বড় হয়ে ড্রিংক করবি?

আমি তো আগেই খেয়েছি।

যাঃ! ইউ কিডিং!

হ্যাঁ রে। আমাদের বাড়িতে তো আগে প্রায়ই পার্টি হত, আমি যখন খুব ছোট ছিলুম, তখন আমার বাবা কিংবা আমার মাসিরা আমাকে বিয়ার কিংবা জিনের গেলাসে চুমুক দিতে বলত।

তোর ভালো লাগত?

প্রথম-প্রথম বোধহয় ভালো লাগত। পরে ভালো লাগেনি।

এখনও তোদের বাড়িতে ড্রিংকের পার্টি হয়।

হয় মাঝে-মাঝে। কিন্তু আমি আর তার মধ্যে থাকি না।

আমার ছোটমাসিও ড্রিংক করে।

তবে আমার বাবার নামে ওই কথা বলল কেন?

ছোটমাসি আর মেসো একটু-একটু ড্রিংক করে। বেশি না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কখনও ওইসব জিনিস টাচ করব না।

যদি তুই ফরেনে যাস?

তাহলেও, ফরেন কান্ট্রিতেও অনেকে ড্রিংক করে না...

ওদের অন্তরঙ্গ আলোচনা হঠাৎ থেমে গেল। সামনেই মিষ্টুনী আর দুটি মেয়ে। নিশ্চয়ই সিনেমার টিকিট কাটতে বেরিয়েছে।

মিষ্টুনী বলল, কী রে, সঙ্গে সাইকেল থাকতেও হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন? চালাতে জানিস না বুঝি?

মিষ্টুনী ওদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। বড় চটাং-চটাং কথা বলে, ওকে পছন্দ করে না বাবুন, তাই সে কোনও উত্তর দিল না।

কিশোর বলল, আমরা তো তবু সাইকেল হাঁটাচ্ছি, তোর দাদাকে একদিন দেখলুম গাড়ি ঠেলছে।

সবাইকেই একদিন-না-একদিন গাড়ি ঠেলতেই হয়।

তোর দাদাকে আমি কোনওদিন গাড়ি চালাতে দেখিনি, শুধু ঠেলতেই দেখেছি।

অন্য মেয়ে দুটি হেসে উঠল। কিশোর এইরকম চালাক-চালাক কথা বলতে পারে। বাবুনের কোনও আগ্রহ নেই, সে গোমড়ামুখে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু মিষ্টুনী তাকেও ছাড়বে না। তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই সুগতটা ওরকম বেগুন ভাজার মতন মুখ করে আছে কেন? এই তোর দাঁতে ব্যথা হয়েছে বুঝি?

আবার অন্য মেয়ে দুটি মুচকি হাসল। এরা বিনা কারণে হাসে। বাবুন এইসব মেয়েদের একদম সহ্য করতে পারে না।

সাইকেলটা ঠেলে দিয়ে সে কিশোরকে বলল, চল চল!

টুকটুক বাড়িতেই আছে। সকাল থেকে তার পেট ব্যথা। চোখের কোণে কালি পড়েছে কপালে একটা সাদা রঙের ব্রণ।

টুকটুক ক্ষুণ্ণভাবে বলল, মা কিছুতেই বেরুতে দিল না। সাইকেলটা ছাদে ওঠাতে পারবি? তাহলে এখন একটু ছাদে চালাতুম।

টুকটুকদের ছাদটা বেশ বড়, কিন্তু চারতলার ওপরে। কিশোর আর বাবুন কাঁধে করে সিঁড়ি দিয়ে সাইকেলটা তুলতে শুরু করেছিল, দোতলায় টুকটুকের মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেল।

এ কী করছ তোমরা, অ্যাঁ? ছাদে সাইকেল চালাবে?

কিশোর সঙ্গে-সঙ্গে বলল, না, মাসিমা চালাব না ছাদে রেখে দেব।

কেন, ছাদে রাখবে কেন?

রাস্তায় রাখলে চুরি হয়ে যেতে পারে।

ঠিক আছে, রেখে এসো। কিন্তু তোমরা কেউ এই রোদ্দুরে ছাদে থাকবে না। টুকটুক একদম ছাদে উঠবে না।

টুকটুকের মা বাবুনের মায়ের চেয়ে অনেক বড়। টুকটুকের বড়দিই তো প্রায় সুতপার সমান! টুকটুকের মাকে যতবারই দেখে বাবুন, ঠিক মা বলে মনে হয় না, মনে হয় দিদিমা। টুকটুক তার মাকে খুব ভয় পায়। কিন্তু বাবুন তো তার মাকে ভয় পায় না, বাবুন জানে মাকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ।

টুকটুকের বাবা রিটায়ার করে এখন বাড়িতেই থাকেন। এখন অবশ্য তিনি নেই, থাকলে নিশ্চয়ই সাইকেল ছাদে তোলা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

বাবুনের মনে হয়, এটা একটা অন্যরকম বাড়ি। এইরকম একটা বাড়িতে থাকতে তার কেমন লাগত? টুকটুক নিশ্চয়ই কোনও সন্ধেবেলাতেই বাড়িতে একা থাকে না। অথচ বাবুনকে থাকতে হয়। বাবা তো প্রায় কোনওদিনই সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে না, দু-একদিন ফিরলেও আবার মাকে নিয়ে কোনও পার্টিতে চলে যায়। একা থাকতে বাবুনের খারাপ লাগে না।

টুকটুকদের বাড়িটা অন্যরকম, সবসময় অনেক মানুষ। অন্যরকম বাড়িতে থাকতে কীরকম লাগে?

বেশিক্ষণ থাকা হল না সেখানে। আবার কিশোর আর বাবুন সাইকেলটা ঘাড়ে করে ছাদ থেকে নামাল! টুকটুকের ওপর কিন্তু ওরা একটুও বিরক্ত হল না, রাগ হল টুকটুকের মায়ের ওপর।

রাস্তায় বেরিয়ে কিশোর বলল, আর দু-একদিন প্র্যাকটিস করেনি, তারপরই ডাবল রাইডিং করে তোকে আমি বাড়ি পৌঁছে দেব।

বাবুন বলল, চল তোর বাড়িতেই যাই। দুটো-তিনটে বই নেব।

তোর বাড়ি যেতে দেরি হবে না? তোর মা চিন্তা করবে না?

মোটে তো সাড়ে বারোটা বাজে!

তুই বরং এক কাজ কর। আমাদের বাড়িতে খেয়ে নে। বাড়িতে একটা ফোন করে দিবি!

তা হবে না, আজ বাবা বাড়িতে আছে। মা বলেছে আজ বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খেতে।

কিশোরদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। একটা গলি দিয়ে শর্টকাটে যাওয়া যায়। গলি দিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই ওরা দেখল, কিশোরদের বাড়ির সামনে একটা সাদা রঙের ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কিশোর বলল, ছোটমাসি এসেছে।

বাবুনের বুকের মধ্যে আবার ধক করে উঠল, সেই অন্য এক দূরের গ্রহ থেকে আসা মেয়ের ছবি। শান্ত, মর্মভেদী দৃষ্টি।

কিশোরদের বাড়িটি দোতলা। এর মধ্যে একতলার একটি ঘর কিশোরের নিজস্ব। ঘরে অজস্র বই আর রেকর্ড। কিশোরের বাবা একজন পাবলিশার, তাই অনেক বই বিনা পয়সায় কিংবা খুব কম দামে পান।

সাইকেলটা ভেতরে তুলে ওরা একতলার ঘরে বসল। একটু পর কিশোর একবার ওপরে গিয়ে নিয়ে এল দু-গেলাস জল-জিরার সরবত। বাবুন একগাদা বই ছড়িয়ে বিভোর হয়ে আছে।

আসলে, বাবুন খুবই ছটফট করছে ভেতরে-ভেতরে। তার ইচ্ছে করছে একবার কিশোরের ছোটমাসিকে দেখতে। মাঝে-মাঝে চোরা চোখে চাইছে দরজার দিকে, যদি ছোটমাসি নেমে আসে। কাছেই সিঁড়ি।

কিশোরও একটা বই খুলে বসল। তারপর দুজনেই নিঃশব্দ। যেন ঘরের মধ্যে আর কেউ

নেই। টুকটুক তেমন বই পড়ে না, কিন্তু কিশোর আর বাবুন দুজনেই বইয়ের পোকা।

একটুবাদে বাবুন জিগ্যেস করল, এই, তোর কাছে জাস্টিস লিগের কোনও কমিকস নেই?

কিশোর ঠোঁট উলটে বলল, না। আজকাল আর ওগুলো পড়ি না, বড্ড একঘেঁয়ে।

বাবুন অবশ্য এখনও কমিকস পড়ে। তবে আগের মতন অত নেশা নেই। ওই সিরিজের যে-কোনও একটা বই পেলে সে সেই মেয়েটির সঙ্গে কিশোরের ছোটমাসির চেহারাটা একবার মিলিয়ে দেখত।

ওপর থেকে একবার কিশোরের মায়ের ডাক শোনা গেল, এই খোকা, তুই চান করবি না?

কিশোর লম্বা করে উত্তর দিল, যাচ্ছি, একটু পরেই যাচ্ছি।

কিশোরের একটু অস্বস্তি লাগছে। বাবুন এখানে থাকবে না, খাবে না বলছে। তাহলে বাবুনকে ফেলে সে স্নান করতে যায় কী করে? বাবুন বই নিয়ে মগ্ন, যে ক'খানা ইচ্ছে বই তো সে বাড়ি নিয়ে যেতেই পারে!

কিশোরের খাটে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে বাবুন। বাড়ি ফেরার কথা যেন সে ভুলেই গেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সিঁড়িতে খটখট আওয়াজ হল। ছোটমাসির চটির শব্দ।

কিশোর ঘরের ভেতর থেকেই বলল, ছোটমাসি, তুমি চলে যাচ্ছ?

নীপা দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে বলল এ কী, তোরা দুই বন্ধুতে এখানে বসে আছিস, কোনও সাড়া শব্দ নেই। কী করছিস রে?

কিশোর বলল, বই পড়ছি।

চানটান করবি না? খাবি না?

বাবুনের প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা। সে অবাক বিস্ময়ে দেখছে কী আশ্চর্য মিল! অবিকল সেই অন্য গ্রহ থেকে আসা মেয়েটির মতন। ঠিক সেইরকম চোখ, সেইরকম চুল, হাতের নোখগুলোতে গোলাপি রং।

বাবুনের দিকে একবার তাকাল বটে নীপা, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

কিশোরকে বলল, খোকা, তুই কিন্তু কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবি। সেজদিকে বলেছি তোকে নিয়ে যেতে। না গেলে চাঁটি লাগাব কিন্তু।

কিশোর বলল, কাল? কাল যে টিভিতে আমাদের স্কুলের কুইজ প্রোগ্রাম আছে।

আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখবি। কোনও কথা শুনতে চাই না।

আলতোভাবে ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে ছোটমাসি চলে গেল।

কিশোরের সঙ্গে-সঙ্গে বাবুনও এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার দিকের জানলার কাছে।

ছোটমাসি ফিয়াট গাড়িটার সামনে দরজা খুলে বসল। হাত ব্যাগ খুলে চোখে লাগাল সানগ্লাস। তারপর চাবি ঘোরাতেই ইঞ্জিনের সতেজ শব্দ হল। পরের মুহূর্তেই হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কিশোর বলল, ছোটমাসি দারুণ ড্রাইভিং করে।

বাবুনের মনে হল, এটা তো খুব স্বাভাবিক। যে অন্য গ্রহ থেকে আসে, সে সামান্য একটা ফিয়াট গাড়ি চালাতে পারবে না?

ওপর থেকে কিশোরের মা আবার হাঁক পাড়লেন, এই খোকা, তুই ভেবেছিস কী? চানটান করতে হবে না আজকে?

মায়ের ডাকের উত্তর না দিয়ে কিশোর ঘুরে দাঁড়াল বাবুনের দিকে। তারপর চোখদুটো বড়-বড় করে বলল, অ্যাই যাঃ! একটা দারুণ ভুল হয়ে গেল তো?

কী?

ছোটমাসিকে বললে হত, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যেত।

ছোটমাসির বাড়ি তো অন্যদিকে।

তাতে কী হয়েছে? একটু ঘুরে তোকে নামিয়ে দিয়ে যেত। তুই এই রোদ্দুরের মধ্যে কী করে এখন যাবি! ইস, কেন যে আগে মনে পড়ল না।

না, না, না, আমি ঠিক চলে যাব। কী দরকার বলবার!

কিশোরের ওপর কোনও রাগও হচ্ছে না কিংবা আফশোষও হচ্ছে না বাবুনের। ছোটমাসির সঙ্গে এক গাড়িতে যেতে হলেই বরং সে লজ্জায় মরমে মরে যেত!

খালি একটাই কৌতূহল হচ্ছে বাবুনের। ছোটমাসির গাড়িতে উঠলে উনি কি তাকে বাড়িতে নামিয়ে দিতেন, না অন্য গ্যালাক্সির আর একটা প্ল্যানেটে নিয়ে যেতেন?

তুই আজ আমাদের বাড়িতে থেকে যা বাবুন? তোর বাড়িতে আমি ফোন করে দিচ্ছি!

না, না, না! আজ না গেলে মা খুব বকবে। বারবার বলে দিয়েছে।

আমি মাসিমাকে রিকোয়েস্ট করছি।

বলছি তো, আজ নয়। আজ বাবা বাড়িতে আছে।

বাবুন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু মায়ের অনুরোধ কিংবা বাবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়ার ব্যাপারে তার কোনও গরজ দেখা গেল না, সে হাঁটতে লাগল অলস ভাবে।

এক সময় তার খুব কাছেই একটা ঘাড়-লম্বা দোতলা বাস থামতেই বাবুন লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। বাসটা যাচ্ছে উলটোদিকে। বাবুন প্যান্টের পকেট থাবড়ে দেখে নিল, তার কাছে কিছু খুচরো পয়সা আছে।

যোধপুর পার্কের প্রথম স্টপেই নেমেই পড়ল বাবুন। তারপর আবার হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল জলের ট্যাঙ্কটার কাছে। এইখানেই কোথাও ছোটমাসির বাড়ি না? সাদা রঙের ফিয়াট গাড়িটা দেখলেই বোঝা যাবে।

এদিককার প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই গ্যারাজ আছে। কাছাকাছি সবক'টা বাড়ির গ্যারাজে উঁকি মেরে দেখতে লাগল বাবুন। কোনও গ্যারাজ ফাঁকা, কোনওটাতে গাড়ি আছে। কিন্তু কোনওটাতেই সেই সাদা ফিয়াট গাড়িটা নেই। ছোটমাসি আসেনি।

বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর একটুও ক্লান্ত হওয়ার বদলে বাবুনের মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত হাসি। সে ঠিকই বুঝেছিল। ছোটমাসি মাঝে-মাঝে সুদূর অন্য কোনও গ্রহ থেকে আসে, আবার সেখানেই ফিরে যায়।

॥ চার ॥

ছুটিকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া আর স্কুল থেকে নিয়ে আসাই সুতপার সারাদিনের প্রধান কাজ।

স্কুলটা বেশি দূরে নয়, তবু যাওয়ার সময় প্রায় রোজই তাড়াহুড়ো থাকে, রিকশা নিতে হয়। আসবার সময় হেঁটেই ফেরে। প্রত্যেকদিন নতুন-নতুন ঘটনা হয়, ছুটি সেইসব গল্প শোনায় মাকে। পাঁচ বছরের মেয়ে ছুটি এর মধ্যেই দারুণ গল্প বানাতে শিখেছে।

ছুটির স্কুলটা একটু অদ্ভুত সময়ে। দুপুর বারোটা থেকে তিনটে। কল-কারখানার মতন এই নামকরা স্কুলটাও বিভিন্ন শিফ্‌টে চলে। ছুটির জন্য এই দুপুরের শিফটেই জায়গা পাওয়া গেছে অতি কষ্টে।

এক হিসেবে অবশ্য তাতে সুতপার সুবিধেই হয়েছে। ছেলে এবং স্বামী আগেই খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায়। মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্কুলে পাঠাবার জন্য সুতপা নিশ্চিন্তভাবে অনেকটা সুযোগ পায়।

মাঝে-মাঝেই মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পর সুতপার মনটা উদাস-উদাস লাগে। এরপর

সমস্ত দুপুরটা ফাঁকা, বাড়িতে কথা বলার কেউ নেই। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেসও নেই সুতপার। এক-একদিন নিউ মার্কেটে যায় অবশ্য, কিন্তু সেখানেও স্বস্তি নেই, তিনটের মধ্যেই ফিরতে হবে, ঠিক সেই সময় ট্যাক্সি পাওয়া না গেলে পাগল-পাগল লাগে।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে সুতপা। নিজেও সেটা বোঝে। মাঝে-মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করে, এই যে একটা টিপিক্যাল বাঙালি মায়ের মতন হয়ে গেলুম, এটা কেন? আমার নিজের কি কোনও আলাদা জীবন থাকতে নেই? সারাদিন ধরে ছেলেমেয়ের খাওয়া-দাওয়া কিংবা লেখা-পড়া কিংবা অসুখ-বিসুখ এই নিয়ে চিন্তা! আমার মা তো আমায় নিয়ে এত চিন্তা করেনি! আমরা ছিলুম সাত ভাই-বোন...সবাই তো ঠিকঠাক মানুষ হয়েছি! ছুটিকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা তো অনায়াসেই রঘুকে দিয়ে করানো যায়? তবু নিজের আসাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে?

এটা কি মাদার-ইনস্টিংক্ট, না ছাই। যে-সব মায়েদের চাকরি করতে হয়, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে না? বিদেশে ছেলেমেয়ের বোর্ডিং-এ হোস্টেলে থাকে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কতটুকু পায়? অথচ সেই ছেলেমেয়েরাই তো বড় হয়ে বিশ্ব জয় করে!

সুতপার মাঝে-মাঝে নিজের ওপরই রাগ ধরে যায়। তার পরিচয় এখন শুধু একজনের স্ত্রী কিংবা দুটো ছেলেমেয়ের মা, আর কিছুই না!

কলেজ জীবনে সুতপা একটু-একটু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিল, কলেজ ইউনিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিও হয়েছিল ভোটে জিতে। ইয়ুথ কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিল লখনৌ। সেই সুতপার কি এরকম ঘরের মধ্যে গুটিয়ে থাকার কথা? সুতপার সহপাঠীদের মধ্যে একজন এখন মন্ত্রী।

বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুতপার। অত তাড়াতাড়ি তার বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না। তার বাড়ি থেকেও কোনও চাপ আসেনি। কিন্তু প্রণবেশের সঙ্গে আলাপের তিন মাসের মধ্যেই...প্রণবেশ তখন কী দারুণ আকর্ষণীয় ছিল, লম্বা চেহারা, ফিডেল কাস্ত্রোর মতন মুখভরতি দাড়ি গোঁফ, নিজের ডিজাইন করা একটা অদ্ভুত ঢোলা আলখাল্লা পরে ঘুরে বেড়ায়। 'দারুণ স্মার্ট' কথাবার্তা বলে। একদিন চৌরঙ্গিতে মেট্রো সিনেমার সামনে বসে ছবি এঁকে বিক্রি করছিল, কী অসম্ভব ভিড় হয়ে গিয়েছিল সেখানে, পরদিন সব কাগজে সে খবর ছাপা হয়েছিল। প্রণবেশের তখন মেয়ে বন্ধু কম ছিল না। সুতপার বান্ধবী আল্পনাই তো প্রায় পাগল হয়েছিল প্রণবেশের জন্য। আল্পনাটা ভাগ্যিস এখন অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, নইলে জ্বালাত খুব।

বিয়ের ঠিক ন-মাসের মধ্যেই বাবুন জন্মাল। বন্ধুবান্ধবরা কেউ-কেউ দুষ্টু ইঙ্গিত করেছিল, হ্যাঁরে তোদের কি আগে থেকেই...। সেরকম হতেও পারত, কিন্তু হয়নি।

বাবুনকে নিয়ে প্রথম চারটে বছর সুতপা সবার থেকে একেবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বন্ধু-বান্ধব, রাজনীতি, সিনেমা-থিয়েটার কোনও কিছুর সঙ্গেই তার যোগ ছিল না। প্রণবেশ তখন ছিল একরোখা, রগচটা ধরনের মানুষ, কথায়-কথায় চাকরি ছেড়ে দিত। বাটা কোম্পানির কাছ থেকে একটা বড় অর্ডার পেয়েছিল, সেই অফিসের সি.আর.ও. কী একটা সামান্য অভদ্রতা করায় কাগজপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল প্রণবেশ। এইরকমভাবে অনেক টাকার অফার সে প্রায়ই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেইসব ধাক্কা সামলাতে হয়েছে সুতপাকে।

অতটুকু বাচ্চা নিয়ে নতুন সংসার, তার আগে সুতপার রান্নাঘরে ঢোকার অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রথম-প্রথম টাকার টানাটানি হলে অসহ্য বোধ হত সুতপার। আবার বাপের বাড়ির কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য বাইরে একটা হাসিখুশি ভাব বজায় রাখতে হত, নিজের গয়না বিক্রি করে সেই টাকায় সে বাপের বাড়ির লোকদের ঘনঘন নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে।...

দুপুর রোদে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সুতপা হঠাৎ এক জায়গায় থমকে গেল। সে আপন

মনে হাঁটছিল, এদিকটায় ইচ্ছে করে আসেনি। কিন্তু তার চিন্তার স্রোতই যেন তাকে এইদিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে।

একটা ইট রঙের তিনতলা বাড়ি। দোতলার ডান দিকের কোণে একটা ছোট্ট বারান্দা। সেই বারান্দায় বেশ কয়েকটা ফুলের টব, একদিকের রেলিং-এ একটা বেডকভার ঝুলছে। ঘরের জানলায় ক্যাটকেটে হলুদ রঙের পরদা। হলুদ রংটা সুতপার চিরকালের অপছন্দ।

ওই বারান্দা সমেত দু-খানি ঘরের ছোট ফ্লাটটায় বিয়ের পর প্রথম নীড় বেঁধেছিল সুতপা আর প্রণবেশ। ভাড়া ছিল একশো পঁচাত্তর টাকা। এখন নিশ্চয়ই সাত-আট শো হবে।

বাবুন জন্মাবার এক বছর পর বারান্দার রেলিংটা উঁচু করবার জন্য নিজের খরচে গ্রিল লাগিয়েছিল সুতপা। সেই গ্রিল এখনও আছে। চার পাঁচ বছরেই দারুণ দস্যি হয়ে উঠেছিল বাবুন, সবসময় চোখে চোখ না রাখলেই একটা কিছু বিপত্তি বাঁধিয়ে বসত।

ছোট-ছোট দু-খানা ঘর আর ওইটুকু বারান্দা, পাঁচ-ছ'জন লোক এলেই আর বসার জায়গা করা যেত না। প্রণবেশের তো কাণ্ডজ্ঞান নেই, যখন তখন সে তার বন্ধুবান্ধবদের এক দঙ্গলকে নিয়ে আসত। হইহল্লা আর মদ্যপান। বাবুন তখন পেটে, সেই অবস্থাতেই মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে প্রণবেশের বন্ধুদের জন্য খিচুড়ি রেঁধে দিতে হয়েছে সুতপাকে। অবশ্য তার নিজেরও এরকম আড্ডা খারাপ লাগত না।

বাড়িটার নিচে একটা পানের দোকান। একই দোকানদার রয়েছে এখনও। সে চিনতে পেরে হাসছে।

সুতপা একটু অপ্রস্তুত বোধ করল এবং সেই অবস্থাটা কাটাবার জন্য সে এগিয়ে এসে বলল, দুটো পান দাও। তোমার পান খাওয়ার জন্যই এদিকে এলাম।

এই বাড়িতে থাকার সময়ই একদিন প্রণবেশের সঙ্গে ঝগড়া করে সুতপা কয়েকটি স্লিপিং পিল খেয়েছিল। তারপর ছোটাছুটি, ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতালে...প্রণবেশ একেবারে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিল। প্রণবেশ ঠিক সময়ে ধরে ফেলে ব্যবস্থা নিয়েছিল বলেই সুতপা সেবার বেঁচে যায়।

পানওয়ালা সে কথা জানে, তাই সুতপার লজ্জা করছে।

পানওয়ালা জিগ্যেস করল, খোকাবাবু কেমন আছে?

সুতপা বলল, সে আর খোকাবাবু আছে নাকি? সে এখন তোমার সমান লম্বা।

পানওয়ালা ভ্রূ তুলে বলল, হ্যাঁ? অ্যাত্ত বড় হয়ে গেছে!

এই মানুষটি ভালো। প্রায় বাবুনকে জোর করে একটা-দুটো টফি বা লজেন্স দিত। এখন বাবুন বোধহয় একে দেখলে চিনতেও পারবে না।

বাবুনের চার বছর বয়সে প্রণবেশ একটা ভালো চাকরি পাওয়ায় ওরা এই ফ্ল্যাট ছেড়ে একটা বড় ফ্ল্যাটে উঠে যায়।

তবু এই বাড়িটা সম্পর্কে একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করছে সুতপা। তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম চারটে বছর...অনেক অভাব অনটন ছিল বটে, তবু এখন মনে হয় সবচেয়ে সুখের চারটি বছর। তখন জীবনটা ছিল একটানা পিকনিকের মতন।

একবার ওপরে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দেখে এলে হয় না?

পরক্ষণেই ইচ্ছেটা দমন করে ফেলল সুতপা। এখন যারা ভাড়া থাকে তারা কীরকম মানুষ কে জানে! যারা জানলায় ক্যাটকেটে হলদে পরদা টাঙায়, তাদের সম্পর্কে কিছুতেই উচ্চধারণা পোষণ করতে পারে না সুতপা। তা ছাড়া কী হবে ওপরে গিয়ে?

পান চিবুতে-চিবুতে আবার হাঁটতে লাগল সুতপা, মোটে পৌনে একটা বাজে। এখনও সওয়া দু-ঘণ্টা। এতক্ষণ কী করবে সে? বাড়িই ফিরে যাবে।

একখানা নীল রঙের অ্যাম্বাসেডার সুতপাকে ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে থেমে আবার ব্যাক করে এল। প্রদীপের স্ত্রী শান্তা সেই গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, এই সুতপাদি, কোথায় যাচ্ছ?

সুতপা জিগ্যেস করল তুমি এদিকে?

শান্তা বলল, এদিকে তো আমার মামাবাড়ি। আমার দিদিমার খুব অসুখ শুনে দেখতে এসেছিলুম, আজ দুপুরের জন্য গাড়িটা পাওয়া গেল...তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সুতপা মুচকি হেসে বলল, কোথাও না। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর ঘুরছি।

উঠে এসো গাড়িতে! আমাদের বাড়িতে চলো।

তোমাদের বাড়ি ...মানিকতলায়? এখন যাব কী করে, তিনটের সময় আবার মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে যেতে হবে।

তিনটের তো এখন ঢের দেরি! এসো, এসো।

না, না, ঠিক সময় ফিরতে না পারলে মুশকিল হবে।

এই গাড়ি করেই ফিরে আসবে। প্রদীপ আজ অফিসের কাজে দুর্গাপুর গেল, গাড়িটা এখন আমার।

গাড়ি আর গাড়ি। যাদের গাড়ি আছে তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই এইসব কথা বলে। কিন্তু সুতপার গায়ে বেঁধে। এখন সুতপারা যে সামাজিক স্তরে উঠে এসেছে সেখানে চেনাশুনা সবারই গাড়ি আছে। চেষ্টা করলেই প্রণবেশও কি এমন একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনতে পারে না? এজন্য অফিসের লোন-ও তো পাওয়া যায়। কিন্তু প্রণবেশের অসম্ভব গোঁ, সে কিছুতেই গাড়ি কিনবে না। গাড়ি কিনলে নাকি গাড়িওয়ালা শ্রেণিতে উঠে যেতে হবে, সেটা তার অসহ্য।

গাড়ি না কিনলেও প্রণবেশ প্রায় নানা কাজে অফিসের গাড়ি পায়। যখন গাড়ি থাকে না তখন সে ট্যাক্সি চড়ে। ট্যাক্সিতে তার অনেক টাকা বেরিয়ে যায়। কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে কেউ-না-কেউ তাদের গাড়িতে লিফ্‌ট দেবেই। প্রত্যাখ্যান করা যায় না কিন্তু সুতপা এটা মনে-মনে খুব অপছন্দ করে।

শান্তা এমন জোর জোরাজুরি করতে লাগল যে আর এড়ানো গেল না। উঠতেই হল গাড়িতে।

ওঠা মাত্র শান্তার গা থেকে একটা বেশ দামি পারফিউমের গন্ধ পেল সুতপা। অসুস্থ দিদিমাকে দেখতে এলেও বুঝি পুরো সাজগোজ করে আসতে হয়। অবশ্য সবসময় সেজেগুজে থাকাই ওর স্বভাব।

সুতপা বলল, তার চেয়ে এক কাজ করো না, কাছেই তো আমাদের বাড়ি, সেখানে একটু বসে গল্প করে যাও না!

শান্তা বলল, দুপুরে খাইনি যে। তুমি খেতে দেবে!

সুতপা হেসে ফেলে বলল, সেরকম ভালো কিছু নেই, তবে কিছু দিতে পারব নিশ্চয়ই!

শান্তা বলল, তবে তাই চলো!

পরের মুহূর্তেই শান্তা আবার মত বদলে বলল, ও না, না, যেতে পারব না তো? জানো সুতপাদি, বাড়ি থেকে বেরুবার পরই মনে হচ্ছে, কী যেন একটা ভুল করে এসেছি, কী যেন ফেলে এসেছি!

কী ফেলে এসেছ?

সেটাই তো মনে করতে পারছি না। আলমারিটা খোলা রেখে এলুম? হট প্লেটটা চালিয়ে এসেছি? কিছুই মনে পড়ছে না, অথচ মনে হচ্ছে খুব একটা ভুল হয়ে গেছে। বাড়ি না ফিরলে নিশ্চিন্ত হতে পারব না। সুতপাদি, তোমার কখনও এরকম হয় না?

সুতপা বলল, এরকম হয় না?

প্রদীপের সঙ্গে প্রণবেশের তুই তুই সম্পর্ক। অথচ শান্তা সুতপাকে সুতপাদি বলে। শান্তা

কী মনে করে ও সুতপার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট? শান্তা ছোট সেজে থাকতেই ভালোবাসে। বয়েস কমানোর মেয়েলি স্বভাবটি সুতপা একদম সহ্য করতে পারে না।

শান্তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকে সুতপা চমকে গেল। বসবার ঘরের সোফার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে কাবুলদা।

জুতো খোলা, জামার বোতাম খোলা, কাবুলদা ওপরের দিকে চেয়ে একমনে ঘুরন্ত ফ্যানটি দেখছে।

নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কারুর বাড়িতে কি কেউ এতটা স্বাভাবিক থাকতে পারে?

দুজন নারীর মধ্যে কাবুলদা শুধু শান্তাকেই দেখল! তারপর বলল, বেশ? অ্যাঁ।

শান্তা বলল, আপনি কখন এলেন?

কখন মানে? যখন আসার কথা ছিল, সাড়ে বারোটায়!

আজ আপনার আসার কথা ছিল?

বাঃ আমাকে নেমতন্ন করে ভুলে গেলে?

আপনাকে নেমতন্ন করেছিলুম?

তাও ভুলে গেছ? পরশুদিন আমি এলুম, তখন বলেছিলুম, আজ সকালবেলা সি আই টি রোডে আমার কাজ আছে, তুমি বললে দুপুরে এখানে খেয়ে যেতে।

শান্তা চোখ বড়-বড় করে জিভ কেটে বলল, ও মা, ছি-ছি, তাই তো! একদম ভুলে গিয়েছিলুম! সেইজন্যই আমার মনে হচ্ছিল...সেরকম কিছু রান্নাবান্নারও ব্যবস্থা করিনি...চলুন, আপনাকে একটা ভালো হোটেলে খাওয়াচ্ছি, এ-পাড়ায় একটা চাইনিজ হোটেল খুলেছে।

আমি হোটেলে খাব কেন?

সত্যি, খুব দুঃখিত। আমার কী যে হয়েছে আজকাল, কিছুই মনে রাখতে পারি না।

আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করেছি। এতক্ষণ শানু ছিল, ওর সঙ্গে গল্প করছিলুম।

শানু কলেজে যায়নি?

এইমাত্র গেল। ওকে বললুম তোমার বউদি নিশ্চয়ই ভুলে গেছে। তুমি রান্নার ঠাকুরকে বলো, দুটো ডিম সেদ্ধ দিয়ে ফ্যানা ভাত বসিয়ে দিতে।

না, না, আপনি ফ্যানা ভাত খাবেন কেন, আমার জন্য তো রান্না হয়েছেই।

আমি ফ্যানা ভাত আর ডিম সেদ্ধ খেতে দারুণ ভালোবাসি! সঙ্গে একটু ঘি চাই। ভালো ঘি আছে তো?

কাবুলদা, প্লিজ, এবারকার মতন আমায় ক্ষমা করে দিন। আর একদিন আপনাকে খুব ভালো করে খাওয়াব। একটু বসুন, আমি দেখে আসছি, কী ব্যবস্থা হয়েছে।

তুমি বসো তো, তোমায় যেতে হবে না। তোমার দিদিমাকে দেখতে গিয়েছিলে, কেমন আছেন?

ভালো নয়, মানুষ চিনতে পারছেন না।

তোমার দিদিমাকে কি আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাও, না মরে গেলেই ভালো হয়?

তার মানে?

অনেক সময় বুড়ো-বুড়িরা বেঁচে থেকে বেশি কেষ্ট পায়। তাদের চিকিৎসা নিয়ে ঘটা করার কোনও মানে হয় না।

কাবুলদা, আমার মা মারা গেছেন খুব কম বয়সে। আমার দিদিমাই আমায় মানুষ করেছেন।

যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাও তো আমি একজন ভালো ডাক্তারের সন্ধান দিতে পারি। হি ইজ অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ডক্টর, আই টেল ইয়ু...

সুতপা দেওয়ালের দিকে ফিরে এমনভাবে একটা ক্যালেন্ডারের ছবি দেখছে যেন সে একলা-একলা কোনও চিত্র প্রদর্শনীতে এসেছে।

কাবুলদা আর শান্তার মধ্যে অনেকক্ষণ ডাক্তার বিষয়ে কথা চলতে লাগল। তারপর একসময় কাবুলদা জিগ্যেস করল, সুতপা, তোমরাও আজ নেমন্তন্ন আছে নাকি এ-বাড়িতে?

ঘরে ঢোকার দশ মিনিটের মধ্যে সুতপার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি কাবুলদা। অথচ এই মানুষই তাদের বাড়িতে যখন তখন গিয়ে কত খাতির দেখায়। মানুষ এরকম হতে পারে? শান্তাদের সঙ্গে এই ক'দিনেই এত বেশ ভাব হয়ে গেল?

সুতপার একটা গুণ আছে। এক-একসময় সে রেগে গেলেও চমৎকারভাবে তা লুকিয়ে ফেলতে পারে। মুখে কোনও চিহ্ন ফোটে না।

দু-দিকে মাথা নেড়ে সে জানাল তার নেমন্তন্ন নেই।

কাবুলদা আবার জিগ্যেস করল, তুমি যে আজ এই সময়ে এদিকে এলে, আজ ছুটির স্কুল নেই?

এবারে একদিকে মাথা হেলিয়ে সুতপা জানাল যে, আছে। মুখে সে কোনও কথা উচ্চারণ করছে না, কাবুলদার দিকেও মুখও ফেরায়নি।

কাবুলদার পরবর্তী প্রশ্নটা শোনা গেল না, বাইরে বিরাট শব্দে বজ্র গর্জন হল। তারপরেই ঝড় উঠল।

সকাল থেকেই দিনটা মেঘলা-মেঘলা ছিল, তাই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সুতপার ভালো লাগছিল। কেন সে শান্তার কথা শুনে এখানে এল?

শান্তা মেয়েটি ভারি অদ্ভুত। আজ প্রদীপ কলকাতায় নেই, তবু আজ সে কাবুলদাকে নেমন্তন্ন করেছে দুপুরে। প্রণবেশ যখন বাইরে ট্যুরে যায়, তখন কাবুলদা যখন তখন সুতপাদের বাড়িতে আসে বটে, কিন্তু সুতপা কোনওদিন ওকে সেই সময়ে খেতে নেমন্তন্ন করে না।

এরকম নিরিবিলি দুপুরেবেলা কাবুলদাকে নেমন্তন্ন করেও শান্তা সে কথা ভুলে গেল? এরকম ভুলের কথা কেউ কখনও শুনেছে? নিশ্চয়ই ভুলেই গিয়েছিল, নইলে এইরকম একটা দুপুরে সে সুতপাকে প্রায় জোর করেই এখানে নিয়ে আসবে কেন?

তবে...সত্যিই কি ভুলে গিয়েছিল? নাকি পুরোটাই শান্তার অভিনয়? এমনও তো হতে পারে যে সুতপাকে দেখাবার জন্যই সে আজ তাকে এখানে টেনে এনেছে। শান্তা দেখাতে চায় কাবলুদার ওপর তার অধিকার অনেক বেশি।

এই কথাটা মনে করেই সুতপা আবার লজ্জিত হয়ে পড়ল। ছি, ছি, এসব সে কী ভাবছে? কাবুলদার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? বাড়িতে আসে, নানারকম উপকার-টুপকার করে, ঠাট্টা ইয়ার্কি হয়, এই পর্যন্ত।

শান্তার বাচ্চাকাচ্চা নেই, সে অনেক ঝাড়া হাত-পা। সে কাবুলদাকে নিয়ে যা খুশি করুক।

সুতপার ইচ্ছে করছে, এখুনি এখান থেকে চলে যেতে। আজ তার একলা থাকতেই ভালো লাগবে। সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের রূপ দেখতে লাগল।

এদের বসবার ঘরটা একটা লম্বা হল ঘরের মতন। তার একপ্রান্তে খাওয়ার টেবিল। কাবুলদা খেতে বসে গেছে, শান্তাও এবার খেয়ে নেবে।

শান্তা ডাকল, এই সুতপাদি, তুমি এসো, এখানে আমাদের সঙ্গে বসো।

সুতপা বলল, তোমরা খেয়ে নাও না।

তুমি আমাদের সঙ্গে বসে একটু খাও।

আমি কিছু খেতে পারব না। আমার একদম পেট ভরতি।

একটু দই খাও অন্তত?

বলছি তো, এখন পেটে একটুও জায়গা নেই—

শান্তা উঠে এসে সুতপার হাত ধরে আদুরে গলায় বলল, ওসব শুনছি না। একটু কিছু খেতেই

হবে।

প্রায় টানতে-টানতেই সে সুতপাকে নিয়ে গেল খাওয়ার টেবিলে।

কাবুলদা খুব মন দিয়ে ডিম সেদ্ধ মাখছে। সত্যিই ফেনা ভাত দেওয়া হয়েছে তাকে। এই লোকটা ফেনা ভাত, ডিম সেদ্ধ এত ভালোবাসে? এই পাঁচ বছরের মধ্যে সুতপাকে তো একদিনও সে কথা বলেনি!

কাবুলদা গম্ভীরভাবে হুকুম করল, শান্তা, কাঁচা লঙ্কা দাও। দু-তিনটে নিয়ে এসো।

দু-তিনটে কাঁচা লঙ্কা চাই? আপনি এত ঝাল খান, আপনি বাঙাল বুঝি?

ঝাল খাওয়া কি বাঙালদের একচেটিয়া নাকি? তাহলে সাউথ ইন্ডিয়ানরা সবাই বাঙাল।

সুতপা নিজেই একটা কাচের প্লেটে খানিকটা দই তুলে নিল, চামচ দিয়ে তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল। শান্তা আর কাবুলদার কথাবার্তাতে সে যোগ দিচ্ছে না।

কাবুলদাও সরাসরি সুতপাকে উদ্দেশ্য করে বলছে না একটা কথাও। অথচ মাত্র তিন দিন আগেই সুতপাদের বাড়িতে গিয়ে কত গল্প করে এসেছে।

দইয়ের প্লেটটা ঠিক করে নামিয়ে রেখে সুতপা মনস্থির করে ফেলল এখানে তার আর একমুহূর্তও থাকা উচিত নয়। ওদের দুজনের খুনসুটির মাঝখানে উপস্থিত থেকে সে কেন বাধার সৃষ্টি করবে? খাওয়া-দাওয়া হলে কাবুলদা একটু বিশ্রাম নেবে নিশ্চয়ই। তখন শান্তা হয়তো ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবে। কিংবা দুপুরেবেলায় নিঝুম বাড়ি, দুজনে আরও কিছু করবে কি না তাই বা কে জানে! সে ওদের যা ইচ্ছে হয় করুক, তাতে সুতপার কিছু আসে যায় না।

আমি চলি!

শান্তা বলল, এই সুতপাদি, একটু বসো, আমাদের খাওয়া হয়ে যাক!

না রে, এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, এই বেলা চলে যাই। পরে মুস্কিল হবে।

এখনও তো আড়াইটে বাজেনি। আমাদের গাড়ি তোমায় ছেড়ে দিয়ে আসবে, কতক্ষণ আর লাগবে?

না, না, গাড়ির দরকার নেই। আমি বাসেই চলে যাব! এখনও যথেষ্ট সময় আছে।

কেন, বাসে যাবে কেন? কোনও অসুবিধে নেই, বললুম তো, আজ গাড়িটা সারাদিনই আমার।

আমাদের ওদিকে রাস্তায় খুব জল জমে, গাড়ি আটকে গেলে মুসকিল হবে, তার চেয়ে বাস অনেক ভালো।

এতক্ষণ বাদে কাবুলদা বলল এত তাড়া কীসের? কোথায় যাবে?

সুতপার বদলে শান্তাই উত্তর দিল, ওর মেয়েকে স্কুল থেকে তুলতে হবে।

ঠিক আছে, আমি তো ওইদিকেই যাব। দাঁড়াও, খেয়েনি!

সুতপা বলল, কারুর যাওয়ার দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব।

শান্তা বলল, এক কাজ করলে তো হয়। কাবুলদাকেও যেতে হবে না। আমার গাড়ির ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি সে গিয়ে ছুটিকে এখানে নিয়ে আসুক, ততক্ষণ আমরা এখানেই গল্প করব।

কাবুলদা বলল, শুধু ড্রাইভার গেলে ছুটিকে আনতে পারবে না।

শান্তা বলল, তাহলে সুতপাদি সঙ্গে গিয়ে মেয়েকে এখানে নিয়ে আসুক।

এত গাড়ির আলোচনায় সুতপার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে। তার যদি নিজের গাড়ি থাকত, তাহলে কি এরা এইসব কথা বলতে পারত?

কাবুলদা বলল, ইন এনি কেস, আমি আর বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। আমার ওদিকে যেতেই হবে। চারটের সময় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

সে-কথায় কান না দিয়ে নিজের হ্যান্ড ব্যাগটা তুলে নিয়ে সুতপা দরজার দিকে এগোল।

কাবুলদা বলল, এই সুতপা, একটু দাঁড়াও, আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

সুতপা সে-কথার উত্তরও দিল না, থামলও না।

সে দরজাটা খোলার আগেই এঁটো হাতে-মুখে ছুটে এসে কাবুলদা তার বাঁ-হাত দিয়ে সুতপার একটা হাত চেপে ধরল।

সুতপা শান্তভাবে বলল, কী হচ্ছে? আমার দরকার আছে, যেতে দিন আমাকে।

বলছি তো আমিও যাব!

শান্তাও কাছে এসে মিনতি করে বলল, এই সুতপাদি, তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে গেলে কেন? পাঁচ মিনিট দেরি করতে পারবে না? তোমায় আমি গল্প করার জন্য ডেকে আনলুম!

দপ করে সুতপার মনের মধ্যে একটা নীল রঙের আগুন জ্বলে উঠল। সে শান্তার চোখে তার স্থির চোখ রেখে মনে-মনে বলল, নেকি! হারামজাদি! তোর স্বামী আজ বাড়ি নেই বলে তুই আজ কাবুলদার সঙ্গে ঢলানি করছিস! আমাকে আবার তার সাক্ষী রাখতে চাস? এক্ষুনি তোর চোখদুটো গেলে দেব আমি!

সুতপা অবশ্য এরকম কথা জীবনেও কখনও উচ্চারণ করতে পারবে না।

সে খুবই স্বাভাবিক, শান্ত গলায় বলল, আমায় তোমরা আটকাতে চাইছ কেন? আমার আড্ডা দিতে ভালোই লাগে, কিন্তু আমাকে যে এখন যেতেই হবে!

কাবুলদাকে সে বলল, আমার হাত ছাড়ুন! শুধু-শুধু আমার জন্য তো আপনার যাওয়ার দরকার নেই। খাওয়ার পর আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

সুতপা ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টার করতেই কাবুলদা প্রচণ্ড ধমকের সুরে বলল, কি পাগলামি হচ্ছে? দেখছ না, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে? দাঁড়াও, আমি হাত ধুয়ে আসছি।

ঘটনাটি অতি নাটকীয়তার দিকে চলে যাচ্ছে বলে সুতপা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তাকে বলল, খুব বৃষ্টি আসছে তো, বাবুন চারটের সময় স্কুল থেকে আসে! বেশি বৃষ্টি হলে যদি ফিরতে না পারে সেইজন্য চিন্তা হয়।

শান্তা শুধু 'ও' বলেই অপরাধীর মতন মুখে চুপ করে গেল।

অর্থাৎ তার তো ছেলেমেয়ে নেই, তাই সে এসব ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারে না।

হাত ধুয়ে এসে কাবুলদা তৃপ্ত মুখে বলল, খুব ভালো খেলুম! বাড়িতে মশলা-টশলা কিছু আছে?

আগের মতন অপরাধী মুখ করে শান্তা বলল, এই রে, মশলা নেই বোধহয়?

হা-হা করে হেসে কাবুলদা বলল, জানতুম। বাড়িতে কিছু একটা মুখশুদ্ধি রাখতে হয়। আমার এক বন্ধু এই সরের ব্যবসা করে, দু-তিন কৌটো পাঠিয়ে দেবে এখন! চলি—!

গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত সুতপা আর কাবুলদা দুজনেই নিস্তব্ধ। গাড়ি ছাড়ার পর দুজনেই অবশ্য শান্তার দিকে চেয়ে হাত নাড়ল।

তারপর সুতপা কাবুলদার দিকে তাকাল। আজ যদি কাবুলদা তার সঙ্গে বেরিয়ে না আসত, তাহলে জীবনে সে আর এই লোকটিকে ক্ষমা করত না। বাড়িতে এলে দরজা বন্ধ করে দিত।

কাবুলদার মুখে সেই সর্বক্ষণের চাপা হাসি, সে জিগ্যেস করল, কী হল, হঠাৎ এত রাগ হয়ে গেল কেন?

আপনি আমার হাত চেপে ধরলেন কেন?

তাতে দোষ হয়েছে খুব?

আমি তো বাসে ট্রামেই চড়ি। আমার তো একা আসার কোনও অসুবিধে ছিল না?

বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ইচ্ছে করছিল বুঝি? দেখছ, বৃষ্টি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

শান্তা বেচারি খুব গল্প করার মুডে ছিল। আমাকে তো চলে আসতেই হত, সেইজন্যই বলছিলুম, আপনি আর কিছুক্ষণ থেকে গেলে পারতেন।

হা—হা—হা—হা!

এর মধ্যে হাসির কী আছে? আপনি যখন তখন বোকার মতন হেসে ওঠেন কেন?

ওটা তো হাসি নয়। লাংসের এক্সারসাইজ। ওতে ভেতরের সিস্টেমটা ভালো থাকে। এই রকম বৃষ্টির দিনে কী ইচ্ছে করে বলো তো? কোথাও লং ড্রাইভে চলে যেতে। যাবে? ডায়মন্ডহারবারের দিকে!

আপনি যে বলছিলেন চারটের সময়ে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

তা তো আছেই। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে আর কী হবে। আরে কাজ তো রোজই থাকে, তা বলে রোজই কি আর সব কাজ করা যায়?

আর যাই হোক, কাবুলদার মুখে এরকম রোমান্টিক ধরনের কথা কোনওদিন শোনা যায়নি! খুবই প্র্যাকটিক্যাল আর বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাকে বলে। মেয়েদের ব্যাপারে একটু দুর্বল, তা-ই মেয়েদের সঙ্গে কখনও গদগদ সুরে কথা বলে না। মানুষের চরিত্র পর্যালোচনার দিকে সুতপার চরিত্রে বেশ ঝোঁক আছে। কাবলুদার মতন মানুষের কাছ থেকে সে কখনও কাজ ফেলে বৃষ্টির মধ্যে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব আশা করেনি।

তবে কি এটা শান্তার প্রস্তাব? শান্তা সবসময় আনন্দ কিংবা মজা সন্ধানী। সবসময় একটা কিছু হইচই চায়। অসুস্থ দিদিমাকে দেখতে গেলেও সে পারফিউম মেখে যায়।

কাবুলদা তো আজ অনায়াসেই সুতপাকে কাটিয়ে দিয়ে শান্তাকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বেড়াতে যেতে পারত। কাবুলদা এই প্রস্তাবটা শান্তাকে না দিয়ে সুতপাকে দিল কেন?

কাবুলদা জিগ্যেস করল, কী চুপ করে রইলে যে? যাবে তো বলো? গাড়িতে তেল ভরে নিই?

অমনি প্রণবেশের প্রতি তীব্র অভিমানে ভরে গেল সুতপার বুক। তার স্বামী কতদিন তাকে এরকম প্রস্তাব দেয়নি। কতদিন কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়নি। সবসময় শুধু কাজ আর কাজ। কী এত হাতি ঘোড়া কাজ করে, তা সে-ই জানে! অফিস থেকে সবাই একবার বাড়ি ফেরে। অথচ প্রণবেশ যে কোথায় যায়, তার কোনও ঠিক নেই। বলে তো নিজেদের স্টুডিওতে গিয়ে অন্য কাজ করে। কিন্তু সেখানেও ফোন করলে প্রায়ই শোনা যায়, প্রণবেশ নেই। প্রত্যেক দিন বাড়ি ফেরে মাতাল হয়ে।

তাহলে সুতপাও যা খুশি করবে! সে কেন এইরকম একটা বৃষ্টি ঝরা দুপুরে কোথাও বেড়াতে যাবে না! নিশ্চয়ই যাবে, তাতে কী দোষ আছে?

কাবুলদা হঠাৎ আজ প্রস্তাব দেওয়ায় সে খুশির চেয়েও কৃতজ্ঞ হল বেশি।

হ্যাঁ, যাব!

তাহলে এক কাজ করা যাক। ছুটিকে আগে স্কুল থেকে তুলে নিই।

ছুটিকে আমার বাপের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব!

তার কী দরকার! ছুটিকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেবো। যদি তুমি চাও তো বাবুনকে স্কুল থেকে নিয়ে নিতে পারি।

সুতপা দ্বিতীয়বার অবাক হল। এই লোকটির চরিত্র বোঝা সত্যিই খুব দুষ্কর। একজন মহিলাকে সে বৃষ্টির দিনে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছে, সঙ্গে সে সেই মহিলার ছেলে-মেয়েদেরও স্বেচ্ছায় নিয়ে যেতে চায়? এ আবার কি ধরনের রোমান্টিকসিজম?

শান্তার ছেলেমেয়ে নেই। আজ তার স্বামীও কলকাতায় নেই। শান্তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়াই তো খুব স্বাভাবিক ছিল কাবুলদার পক্ষে।

নির্লজ্জের মতন সুতপা বলল, এইরকম দিনে কেউ কি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যায়? ওরা সত্যিই বাড়িতে থাকতে পারবে!

তুমি যে বলছিলে বাবুন বাড়ি না ফিরলে তোমার দুশ্চিন্তা হয়?

বাবুন এখন বড় হয়েছে। ও একলা বাড়ি তো ফিরতে পারেই, অনেক সময় নিজের খাওয়ার নিজেই নিয়ে নেয়। তা ছাড়া রঘু তো আছেই।

সেদিন বাবুন একটু বেশি রাত করে ফিরেছিল বলে তুমি একেবারে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছিলে কেন?

বেশ করেছিলুম। আপনি আমায় এত জেরা করছেন কেন বলুন তো।

আই অ্যাম সরি। আমার কথাবার্তাই একটু উলটোপালটা। লেখাপড়া তো বেশি শিখিনি!

লেখাপড়া না শিখলেও তো আপনি অনেকের চেয়ে বেশি রোজগার করেন। কখন কাজ করেন তা-ও বুঝি না। এর বাড়ি ওর বাড়ি ঘুরে বেড়াবার প্রচুর সময় পান।

হা—হা—হা—হা!

আবার সেই বোকার মতন হাসি!

তাহলে কী ঠিক হল? ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হবে কি হবে না?

সেটা আমি বুঝব, তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

ঠিক আছে, আগে তাহলে ছুটিকে স্কুল থেকে তোলা যাক, তারপর তুমি যা হুকুম করবে।

একটুক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। বৃষ্টিটা মাঝে খুব জোরে ঝেঁকে-ঝেঁকে আসছে, আবার একটু কমে যাচ্ছে। রাস্তায় এখনও জল জমেনি। তবে রাস্তা একদম ফাঁকা। গাড়িগুলো যাওয়ার একরকম চট্‌চট্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু। ওদের গাড়িটা শিয়ালদার উড়ালপুলের ওপর উঠেছে। এই জায়গাটা এখনও নতুন-নতুন মনে হয়। যেন বিদেশ।

কাবুলদা বলল, ড্যাস বোর্ডে সিগারেট আর লাইটার আছে, একটু বার করে দেবে?

সুতপা বার করে দিল। কাবুলদা একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে বলল, লাইটারটা একটু জ্বেলে দাও না।

সুতপা ঝুঁকে এসে লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। অনভ্যস্ত হাতে সহজে আগুন জ্বলে না! সুতপাকে আরও অনেকটা ঝুঁকে আসতে হল।

কাবুলদা সুতপার দিকে দু-চোখের হাসি দিয়ে বলল, থ্যাঙ্কস্‌।

এই ছোট্ট ব্যাপারটা কী ভালো লাগল সুতপার। ঠিক যেন সিনেমার মতন। প্রেমিক-প্রেমিকারা গাড়ি চালাতে-চালাতে এইরকম করে।

পরক্ষণেই আবার তীব্র অভিমান হল প্রণবেশের ওপর। প্রণবেশ গাড়ি চালাবে, সে তার বুকের কাছে মাথা এনে এইরকম ভাবে সিগারেট ধরিয়ে দিতে পারত। প্রণবেশ তাকে এই সুখটুকু কখনও দেয়নি।

সুতপার চোখে প্রায় জল এসে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, শান্তা মেয়েটি বেশ ভালো!

কাবুলদা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, হুঁ।

ছেলেপুলে হয়নি, বেশ স্বাধীন আছে এখনও।

হুঁ, হুঁ।

আজ শান্তা সারাদিন ফ্রি, আপনি ওকেই কোথাও নিয়ে গেলে পারতেন!

হুঁ, হুঁ।

হুঁ, হুঁ করছেন কেন? শান্তাকে নিয়ে গেলেন না কেন? আমাকে শুধু-শুধু নিয়ে গিয়ে কী লাভ!

লাভ!

আমি জানতে চাইছি, আপনি শান্তাকে নিয়ে গেলেন না কেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে কাবুলদা বলল, তাহলে গাড়ি ঘোরাই? শান্তাকে তুলে নিই?

তার আগে আমাকে এই সামনের বাস স্টপে নামিয়ে দিন।

হা-হা-হা-হা।

এর মধ্যে হাসির কি আছে?

তুমি একটু আগে আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলে, আবার হঠাৎ বিনা কারণে মত বদলালে, তা শুনে হাসব না?

আমি তো একটি বুড়ি, ঊনচল্লিশ বছর বয়েস হয়ে গেছে। আমায় নিয়ে আপনি বেড়াতে যাবেন কেন? শান্তাকে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখায়, ও হইচই করতে ভালোবাসে, ওকে আপনি নিয়ে গেলেন না কেন?

অত সব ক্যানো-ফ্যানো জানি না। তখন বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে পড়েনি! তোমার সঙ্গে গাড়ি চালাতে-চালাতে মনে হল, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথাও ঘুরে এলে বেশ হয়, তাই বললুম—

সুতপা মুখটা ঘুরিয়ে নিল জানলার দিকে। তবে আবার কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

কাবুলদা বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে সুতপার কাঁধ চাপড়ে বলল, কাম অন্ সুতপা, শুধু-শুধু মেজাজ খারাপ করছ কেন? কে বলেছে তুমি বুড়ি? ইউ আর এ প্রিটি গার্ল।

আপনি আপনার বউদিকে নিয়ে কোথাও যান না কেন?

সে কোথাও যেতে চায় না তো আমি কী করব?

কাবুলদার হাতটা এখনও সুতপার কাঁধে।

কাবুলদা যখন তখন গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে বটে, কিন্তু এই পাঁচ বছরের মধ্যে হঠাৎ কখনও জড়িয়ে ধরার কিংবা চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেনি।

সুতপা হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল। দেখা যাক না কী হয়। আজ সে যাবে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবে না। সে একলা কাবুলদার সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার ঘুরে আসবে। এই মানুষটা সত্যিই কী রকম তা সুতপার জানা দরকার।

পার্ক সার্কাসের কাছে গাড়ি ঘুরতেই একটা বেশ বড় ভিড় চোখে পড়ল। লোকজন চ্যাচেমেচি করছে। সদ্য অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে মনে হচ্ছে।

কাবুলদা ভিড়ের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে গাড়ি পার্ক করল রাস্তার ধারে। তারপর, দেখি কী হয়েছে বলে নেমে গেল দরজা খুলে।

সুতপা বারণ করবারও সময় পেল না। এরকমভাবে থেমে পড়া তার একটুও পছন্দ হয়নি। অ্যাকসিডেন্টের দৃশ্য সে সহ্য করতে পারে না।

কাবুলদা ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে। লোকজনের চ্যাঁচামেচি ক্রমশই বাড়ছে। একটা ট্যাক্সিতে ঘিরে ধরেছে সবাই।

একটু পরেই ভিড় সরে গেল একদিকে। তার মধ্য দিয়ে দেখা গেল কাবুলদা একটা ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে লোকজনদের হুকুম করছে, হাঁ করে দেখছেন কী, ট্যাক্সির দরজাটা খুলুন।

আশ্চর্য, আগে থেকে এখানে এত লোক থাকতেও কেউ আগে ছেলেটিকে তোলেনি। কাবুলদাকেই এসে তুলতে হল।

কাবুলদার কি পরোপকারের নেশা?

সুতপা ভালো করে দেখল ছেলেটিকে। ষোলো-সতেরো বছর বয়েস, মুখখানা যেন অবিকল...। ধক্ করে উঠল সুতপার বুক। বাবুন? সেইজন্যেই কাবুলদা নিজে থেকে ওকে তুলছে...

দরজা খুলেই সুতপা ছুটল সেদিকে।

ততক্ষণে ছেলেটিকে ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ট্যাক্সি স্টার্ট নিয়েছে।

সুতপা কাছে এসে বলল, কে? ও কে?

কাবুলদা হাতের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, আমি চিনি না। কলেজের ছাত্র বলে মনে হল। যা ইরেসপনসিবল সব লোকজন। ছেলেটাকে আগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে, তা না শুধু গ্যাঞ্জাম করছে? এখনও বেঁচে যেতে পারে, তবে খুব সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট মাথায় চোট লেগেছে, জ্ঞান নেই...

সুতপা কোনও কথা বলতে পারছে না। তার বুকের মধ্যে ধকধক করেই চলেছে। শুধু মনে হচ্ছে বাবুনের কথা। এই বৃষ্টির মধ্যে বাবুন ফিরবে—

গাড়িতে ওঠার পর সুতপা কাতরভাবে বলল, কাবুলদা, আমার আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ছুটিকে তোলবার পর আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিন। কিছু মনে করবেন না, প্লিজ—

কাবুলদা বলল, ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ উইশ!

॥ পাঁচ ॥

অফিসে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল প্রণবেশের। দোষটা অনেকখানি তারই। সে রগচটা মানুষ, একবার মেজাজ খারাপ হলে তার আর মুখের ভাষার ঠিক থাকে না।

সব অফিসেই পলিটিকস থাকে, পাপেট শো-র পুতুলের মতন একজন ওঠে, একজন নামে। পার্কিনসনসাহেব থিয়োরি দিয়ে গেছেন যে, যে-মালিক তার কর্মচারীদের মধ্যে সবসময় একটা ঈর্ষা আর প্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে রাখতে পারে, সেই মালিকই সার্থক।

প্রণবেশ যাকে শত্রু মনে করে, তার সঙ্গেও হাসিমুখে কথা বলতে পারে না, এইটাই তার অযোগ্যতা। এই ধরনের মানুষকে তো কষ্ট পেতে হবেই।

রাগের মাথায় চাকরি ছেড়ে দেবেই ঠিক করেছিল প্রণবেশ। নিজের ঘরে বসে রেজিগনেশন লেটার ড্রাফট করা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল, তারপর মাথার চারপাশে একটা ভয় ঘুরতে লাগল।

চাকরি ছাড়লে এক্ষুনি আর একটা চাকরি পাবে কি না সেটা বড় সমস্যা নয়। সুতপার প্ররোচনায় সে সল্টলেকের এক-টুকরো জমি কেনার জন্য অফিস থেকে চল্লিশ হাজার টাকা অগ্রিম নিয়েছে কিছুদিন আগেই। সেটা শোধ দেবে কী করে? যতদিন না সেই ঋণ শোধ হবে, ততদিন প্রণবেশ এই অফিসের ক্রীতদাস। সল্টলেকের জমিটা বিক্রি করে দেবে? সুতপার নামে জমি। সে রাজি হবে?

হ্যাঁ, সুতপা রাজি হবে, তা প্রণবেশ জানে। কিন্তু সেজন্য সুতপা এমন একটা আত্মত্যাগীর ভাব করে থাকবে যেটা প্রণবেশ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

যেন প্রণবেশ একটা অপদার্থ আর সুতপা কত মহান।

এই বাজারে মনের মতন একটা চাকরি জোটানোও সহজ নয়। প্রণবেশের যোগ্যতা আছে। কিন্তু ঝগড়া করে চাকরি ছাড়লে বদনাম রটে যায়। চাকরি ছাড়ার পর নতুন চাকরি খোঁজার চেয়ে,এই চাকরি থাকতে-থাকতেই অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা করা অনেক বেশি সম্মানজনক। তাতে কদর বেশি পাওয়া যায়।

প্রণবেশ সেই চেষ্টাই করবে।

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রণবেশ তিনবার রাস্তার ফুটপাত বদল করল। সে মনস্থির করতে পারছে না। প্রথমে ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে সুতপাকে সব কথা বলবে। একজন কারুকে তো বলা দরকার।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই যদি দেখে ওই রাস্কেল কাবুলদাটা বসে আছে? প্রণবেশ সাধারণত বিকেলে

বাড়ি ফেরে না, সেইজন্য ওই সময়েই রাস্কেলটা বেশি আসে। ওর ওই হাসি-হাসি মুখ আর সবজান্তা ভাবটা দেখলেই প্রণবেশের আজকাল গা জ্বলে যায়। এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল মানুষদের সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। অথচ, কাবুলদা এমন কিছু কাজ এখনও করেনি, যে-জন্য তাকে বাড়িতে আসতে বলতে বারণ করা যায়।

কাবুলদাও নিশ্চয়ই বোঝে যে প্রণবেশ তাকে পছন্দ করে না। সেইজন্যেই প্রণবেশ যখন থাকে, সেইসব সময়ে সে বড় একটা আসে না। পুরুষদের সঙ্গে তার কোনও প্রয়োজনও নেই, তার যত ভাব মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা ওকে দেখলে একেবার গলে যায়। যে-বাড়িতে একবার ঢোকে, সে-বাড়িতে অমনি গেড়ে বসে। এই সেদিন শুনল, চঞ্চলদাদের বাড়িতেও কাবুলদা নিয়মিত যাচ্ছে আজকাল। চঞ্চলদার স্ত্রী কত শিক্ষিতা, তাঁর লেখা বই বিলেত থেকে বেরিয়েছে, অথচ তিনি এই অশিক্ষিত লোকটার সঙ্গে এত সময় কাটান কী করে? কী কথা বলেন?

প্রণবেশের আজ যা মনের অবস্থা, এখন বাড়ি ফিরে কাবুলদাকে দেখলে সে কিছুতেই মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে না। মুখ দিয়ে খারাপ গালাগালি বেরিয়ে আসাও বিচিত্র নয়। সে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

প্রণবেশ চলে এল নিজেদের স্টুডিওতে। চারবন্ধুর প্রত্যেকের কাছে চাবি আছে, ঢুকতে অসুবিধে নেই। দুপুর থেকে ঝড় বৃষ্টি চলছে, এখনও টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে, আজ আর কেউ আসবে কি না সন্দেহ।

প্রণবেশ সঙ্গে একটা হুইস্কির বোতল নিয়ে এসেছে। তার থেকে এক পেগ ঢালল।

চারদিকের দেওয়ালে চারটি ক্যানভাস! তিনটিই ফাঁকা। একটি ক্যানভাসে একটি অসমাপ্ত ছবি। শান্তনু কয়েকদিন নিয়ে ওটাতে কাজ করছে।

প্রণবেশ একবার ভাবল, শান্তনুর ছবিটাতেই তুলি চালাবে? যে মেয়েটিকে আঁকছে, তার কাঁধটা একেবারে ঠিক হয়নি।

হাতে তুলি নিয়েও প্রণবেশ থেমে গেল। শান্তনু খুব রেগে যাবে। এইসব ব্যাপারে শান্তনু খুব টাচি।

অন্য একটা ক্যানভাসের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। কী আঁকবে? কিছুই মাথায় আসছে না। শুধু-শুধু মেয়েছেলে এঁকে কী হবে? এই পৃথিবীর মেয়েরা আর কতকাল শিল্পীদের মগজ খাবে?

যেন ঘোরের মাথায় কেটে গেল অনেকক্ষণ। ঘোর ভাঙার পর চমকে উঠে প্রণবেশ খেয়াল করল, এতক্ষণ সে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে। তার হাতের তুলিটা ক্যানভাসের ওপর একটা আউট লাইন এঁকে ফেলেছে? একটি মেয়েরই আদল। অস্পষ্ট হলেও নীপাকে ঠিক চেনা যায়।

এর মধ্যে তিনবার গেলাসে হুইস্কি ঢালা হয়ে গেছে। টলটলে নেশা হয়েছে প্রণবেশের। সে একা-একাই বেশ শব্দ করে হেসে উঠল।

নাটকের সংলাপের মতন বলল, এসব ছবি এঁকে কী হবে বাবা? কিস্যু না! তুমি কোনওদিন আর শিল্পীদের দলে নাম লেখাতে পারবে না হে! চাকরি করে খাচ্ছ, তাই খাও! বউ ছেলে মেয়ে, সংসার, সল্টলেকে জমি, প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিমল সরকারের পায়ে তেল মাখা, থুঃ! থুঃ!

আরও বেশি নাটকীয় ভাবে সে হাতের তুলিটাতে রং লাগিয়ে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে নীপার ছবিটা বিকৃত করে দিতে লাগল।

একলা ঘরে থাকলে মানুষ অন্য রকম হয়ে যায়। বিশেষত পেটে কিছু মাদক পানীয় গেলে তো আর কথাই নেই। এখন সে নীপাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

আবার সে তুলিতে রং লাগিয়ে নীপার মূর্তিটাকে একটা নদীতে পরিণত করতে লাগল। ছোট পাহাড়ি নদী।

এ ছবিটাও অসমাপ্ত হয়ে রইল। প্রণবেশের ভালো লাগছে না। সে একা-একা মদ্যপান পছন্দ

করে না, এই সময় দু-একজন সঙ্গীকে নিয়ে বকবক করতে ভালো লাগে।

একা-একা পান করলে নেশাও বেশি হয়ে যায়। প্রণবেশ তো আজ নিছক নেশা করতে চায় না, সে আনন্দ করতে চায়।

গেলাসে আর একটু ঢেলে নিয়ে সে জানলার কাছে দাঁড়াল। এখনও সমানভাবে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি প্রণবেশের খুব পছন্দ। তার ভিজতে ইচ্ছে করে।

হঠাৎ ঘর বন্ধ করে প্রণবেশ বেরিয়ে পড়ল বাইরে। হুইস্কির বোতলটা সে একটা খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়েছে। রাস্তায় বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজল না অবশ্য। সহজেই পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিতে উঠে প্রণবেশ বলল, যোধপুর পার্ক।

তারপর বোতল খুলে ছোট-ছোট চুমুক দিতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় একটা কথা গেঁথে গেছে। নীপার একটা পোট্রেট আঁকতে হবে। নীপাকে দেখলেই বতিচেল্লির আঁকা একটা ছবির কথা মনে হয়। নীপা যদিও খুব দুষ্টু মেয়ে, কিন্তু মুখটা দেখলে মনে হয় যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না!

প্রণবেশ এমনভাবে নীপাকে আঁকবে, যাতে নীপা চিরকালের মতন স্থির যৌবনা থেকে যায়। নীপার রূপ আছে, কিন্তু শিল্পীর তুলি ছাড়া সব রূপই নশ্বর!

প্রণবেশ অবশ্য কোনওদিন পোট্রেট আঁকেনি, অত ধৈর্য তার নেই।

চুমুক দিতে-দিতে বোতলটা অনেকখানি শেষ করে ফেলল প্রণবেশ।

এদিকে বৃষ্টি কম। খুব গুঁড়ি-গুঁড়ি পড়ছে! যোধপুর পার্কে জলের ট্যাঙ্কার কাছে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটাতে গিয়ে প্রণবেশ দেখল কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বাবুন।

প্রণবেশ এমনই চমকে গেল যে মনে হল সে ভুল দেখছে চোখে।

চোখ বড়-বড় করে সে আবার দেখল। সত্যিই তো বাবুন, আস্তে-আস্তে হেঁটে তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাবুনের চোখ একটা বাড়ির জানলার দিকে, তাই সে প্রণবেশকে দেখতে পায়নি।

বাবুন! এই—

বাবুন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে-ও খুব অবাক হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার মুখটা উদাসীন ধরনের। সে বাবার দিকে তাকাল শুধু, কোনও কথা বলল না।

বাবুন তুই এখানে কী করছিস?

এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছি।

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে প্রণবেশ বলল, প্রায় সাড়ে আটটা বাজে, পড়াশুনো না করে তুই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছিস এখানে!

একমুহূর্তে প্রণবেশ যেন বাবা হয়ে উঠল। সে বাবুনকে ঠিক বকুনি দিতে চায় না। শুধু বাবুনের জন্য উদ্বিগ্ন। পড়াশুনো না করে কেন এখন বাবুন এখানে ঘুরছে?

প্রণবেশ ভাবল, বাবুনের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ি ফিরে যাবে। কতদিন বাবুনের সঙ্গে মন খুলে গল্প হয়নি।

কিন্তু প্রণবেশের জ্ঞান টনটনে আছে। হাঁটতে গেলে তার পা টলে যাবে এখন, সে জানে। বেশি কথাও বলতে পারবে না, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে?

বাবুন জিগ্যেস করল, বাবা, তুমি এখানে কোথায় যাচ্ছ?

বাঁ-হাতে হুইস্কির বোতলটা ধরা, সেটা লুকোবার আর কোনও পথ নেই। ডান হাত তুলে সে বলল, এই যে, এই বাড়িতে। খুব জরুরি কাজ আছে একটা।

একটু থেমে আবার কিছু মনে পড়ায় প্রণবেশ বলল, তুই এক কাজ কর বাবুন। এই ট্যাক্সিটা নিয়ে বাড়ি চলে যা তাড়াতাড়ি। এই নে, টাকা নে—

বাবুন বলল, না, আমি বাসে চলে যাচ্ছি।

আর কোনও কথা শোনার জন্য বাবুন দাঁড়াল না। হনহন করে এগিয়ে গেল।

প্রণবেশ সেই দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বাবুন রেগে গেছে। কেন নিল না টাকা? বাবুন মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। যখন ছোট ছিল, থ্রি-ফোরে পড়ত, প্রণবেশ ট্যুর থেকে ফিরলেই বাবুন বলত, বাবা কী এনেছ আমার জন্য? কী এনেছ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রণবেশ ডান দিকে তাকাল। দোতলার একটি ছোট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বতিচেল্লির ছবির সেই নারী।

নীপা কখন এখানে এসে দাঁড়াল? সে কি বাবুনের সঙ্গে তার কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে?

প্রণবেশ নীপার দিকে হাত তুলল, নীপা কোনও সাড়া দিল না। অন্যদিক থেকে তিনজন লোক হেঁটে আসছে, প্রণবেশ সচেতন হয়ে সঠিকভাবে হেঁটে এল নীপাদের বাড়ির দরজার সামনে।

দরজা খোলাই ছিল, দোতলায় উঠতে-উঠতে প্রণবেশ চুলটা ঠিক করে নিল। মনে-মনে বলল, নীপা যেন বুঝতে না পারে, আজ একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে!

ভেতরে ঢুকে খুব সিরিয়াস গলায় প্রণবেশ জিগ্যেস করল, বিজন কোথায়?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নীপা তার মুখের দিকে অপলক ভাবে চেয়ে বলল, তুমি আজ আবার এত খেয়ে এসেছ? তোমায় বারণ করিনি আমি?

মোটেই বেশি খাইনি, আজ মেজাজটা খুব খারাপ ছিল, বিজন কোথায়? ওর সঙ্গে আমার জরুরি কাজ আছে।

বিজন একটু ওষুধের দোকানে গেছে। এক্ষুনি আসবে। কিন্তু তুমি এইরকম অবস্থায় কখনও আমাদের বাড়িতে আসবে না। হাতে আবার একটা বোতল নিয়ে এসেছ? ছি-ছি!

তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও!

আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। আমরা তোমাকে সহজ মানুষ হিসেবে চাই। তুমি কেন শুধু-শুধু নিজেকে নষ্ট করছ?

আমি কারুর কোনও সাহায্যের পরোয়া করি না! আই উইল নেভার কাম ব্যাক টু দিস ড্যাম ব্লাডি হাউজ! আর কোনওদিন তোমার মুখ দেখব না।

প্রণবেশ দরজার দিকে ছুটে গেলেও নীপা তাকে একটুও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। ঘরের ঠিক মাঝখানে ঘাড় উন্নত করে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাড়ির বদলে অন্য একটা পোশাক পরে আছে নীপা, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লুটোনো একটা সেমিজের মতন, কোমরে রঙিন সিল্কের দড়ির বাঁধন। যেন সে মানুষ নয়, এক পাথরের দেবী।

সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নেমে গেল প্রণবেশ। নীপা তবু একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

একতলা পর্যন্ত নেমে গিয়েও আবার ফিরে এল প্রণবেশ। তার চোখ দুটি ক্রোধে আর বেদনায় জ্বলজ্বল করছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় প্রণবেশ বলল, বিজন ওর অফিসের একটা ডিজাইন আমাকে দিয়ে করাতে চেয়েছি। বলে দিও, সে কাজ আমি আর করব না! ও যেন আমার আর খোঁজ না করে। তোমাদের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ।

পাথরের দেবী তার দক্ষিণ হস্ত তুলে আদেশ করল, এখানে এসে বসো!

না! আর কোনওদিন...

ছেলেমানুষী করো না! ভেতরে এসে বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নীপা যদি ভেবে থাকো—

অত চেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? আমি কি কালা?

প্রণবেশ চোখে যেন ঝাপসা দেখছে। নীপার শরীরটা যেন ধোঁয়ায় ঢাকা। পায়ের নিচের

মাটি দুলছে। নেশার মধ্যেও প্রণবেশ বুঝতে পারে যে তার বেশি নেশা হয়ে গেছে। রাগ হলেই তার নেশা বেড়ে যায়। এখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, তাহলে বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে।

সে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। বোতলটা পাশে নামিয়ে রেখে দু-হাত দিয়ে দু-চোখ ঘষল। তারপর তাকিয়ে দেখল, নীপার চেহারাটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে।

শান্ত গলায় প্রণবেশ বলল, আই অ্যাম সরি, এভাবে আজ আমার আসা উচিত হয়নি। তবে এ কথাও বলে দিচ্ছি, আর কোনওদিন আমি তোমার কাছে আসব না। তুমি যদি ভেবে থাকো, তোমার রূপ দিয়ে তুমি আমাকে একেবারে বেঁধে ফেলেছ, সেটা ভুল।

নীপার মুখে এবারে দুঃখের ছায়া পড়ল। সে মুখোমুখি একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, তুমি আবার ওইরকম কথা বলছ? শুধু রূপের কথা আমি মেয়ে বলে আমার চেহারার কথাটাই তোমার মনে আসে? আমি কি একজন মানুষ নই, আমার কি মন বলে কিছু নেই? মেয়েরা কি তোমাদের চোখে শুধু শরীর?

শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?

কী বললে?

তুমি বুঝবে না। সাহিত্য-টাহিত্য তো কিছু পড়ো না। পড়ো তো ওই বারবার ক্যার্টল্যান্ড জাতীয় সব ট্রাশ। আর আঁতেল সাজবার জন্য আর্ট সম্পর্কে বড়-বড় কথা! মোডিগ্লিয়ানি চতিচেল্লি, রূয়ো, পিকাসো! ওই পিকাসোটা তো একটা ফেরেববাজ, ও কি ছবি আঁকতে জানে? তোমার ঘরে দু-খানা পিকাসোর প্রিন্ট টাঙিয়ে রেখেছ। তুমি জানো, ওই শুয়োরের বাচ্চা ন্যাংটা মেয়েমানুষ ছাড়া আর কোনও মেয়েমানুষই আঁকেনি! তবে তুমি পিকাসোর ভক্ত কেন? আবার শরীর নিয়ে বড়-বড় বাকতাল্লা মারছ!

আজ দেখছি তোমার মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।

প্রণবেশের চোখটা আবার ঝাপসা হয়ে আসছে। একটা কিছু করা দরকার। আজ হঠাৎ এতখানি কিক্ হল কেন?

সে আঙুল তুলে বলল, তোমায় ডাকছে, যাও শুনে এসো।

নীপার একটিই সন্তান, সে দার্জিলিং-এ পড়ে। বাড়িতে আছে শুধু তাদের রান্না করার এক বৃদ্ধ ঠাকুর। সে ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে।

নীপা উঠে গেল ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে।

সঙ্গে-সঙ্গে বোতলটা তুলে নিল প্রণবেশ। বিষে বিষক্ষয় হয় না? আজ তার এই দুর্বলতাটা কাটাবার জন্য আরও একটু খাওয়া দরকার।

প্রণবেশ একটা লম্বা চুমুক দিল।

আবার সে নীপাকে যখন ফিরে আসতে দেখল, তখন তার মনে হল, নীপাকে এত সুন্দর আর কোনওদিন দেখায়নি। নীপা তাকে আজ অপমান করতে চাইছে অ্যাঁ? ঠিক আছে, প্রণবেশও উত্তর দিতে জানে।

নীপা বলল, শোনো, আমি আর বিজন তোমার সত্যিকারের বন্ধু হতে চাই। তুমি এলে আমরা খুশি হই। কিন্তু এরকম ভাবে কেন আসবে? আগে থেকেই যদি ড্রাঙ্ক হয়ে যাও, তাহলে তো কোনও কথাই বলা যায় না। তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে চাই। বিজন বলে, তোমার মতো একজন শার্প লোক—

প্রণবেশ অত্যন্ত কাতরভাবে বলল, নীপা, আমাকে একটা গেলাস দেবে? তোমাদের বাড়িতে সোডা আছে? কতদিন গেলাসে ঢেলে, সোডা মিশিয়ে বেশ ভালো করে একটু মদ খাইনি।

আবার তুমি ওটা খাবে!

ভীষণ ইচ্ছে করছে। নীপা, আমার আজ খুব মন খারাপ, আমি যেন একটা খাঁচায় বন্দি জানোয়ার, কিছুতেই ছিঁড়ে বেরুতে পারছি না...তার চেয়েও বড় কথা, ছিঁড়ে বেরুবার ইচ্ছেটাই আস্তে-আস্তে চলে যাচ্ছে...আমি মরে যাচ্ছি।

নীপা উঠে গিয়ে একটা গেলাস ও ফ্রিজ থেকে একটা সোডার বোতল নিয়ে এল। তারপর বলল, তোমার ওই মন খারাপের কথা আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না। বেশি মদ খেলেই তুমি ওরকম কথা বলো। কোনওদিন তুমি সুস্থ সাদা চোখে আমার বাড়িতে আসোনি। এর কারণটা কী বলো তো?

নীপা এসে কাছে দাঁড়াতেই প্রণবেশ প্রায় হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে এসে তার একটা হাত চেপে ধরে বলল, তোমায় আজ অলৌকিক দেখাচ্ছে, এত রূপ যেন এ-জন্মে আগে আর কখনও দেখিনি।

হাত ছাড়িয়ে নিল না নীপা। একটু শ্লেষের সঙ্গে বলে তুমি একটু আগে আমায় অশিক্ষিত বললে, এখন রূপের প্রশংসা করে তুমি আমায় আরও অপমান করছ। অর্থাৎ আমার মাথায় কিছু নেই আমি একটা চেহারা মাত্র। যে-সব মেয়েরা রূপের প্রশংসা শুনলে খুশি হয়, আমি তাদের দলে পড়ি না।

তুমি খুশি হও কি না তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

পরশুদিন সুতপার সঙ্গে আলাপ হল।

কার সঙ্গে?

সুতপা, তোমার স্ত্রী!

হাত ছেড়ে দিয়ে নীপার মুখের দিকে তীব্র চোখে তাকাল প্রণবেশ। তার চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল, সুতপার সঙ্গে? কোথায়?

আমার দিদির ছেলে কিশোর, সে তো তোমার ছেলের সঙ্গে পড়ে। তোমার ছেলের নাম সুগত না?

হ্যাঁ, বাবুন, মানে সুগত।

আমার বড়দি সুগত আর তার মাকে নেমন্তন্ন করেছিল। খুব ভালো লাগল তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে। তুমি কোনওদিন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আসো না কেন?

সুতপাকে তো তুমি কখনও নেমন্তন্ন করোনি!

এতক্ষণ বাদে হাসল নীপা। তার হাসির মধ্যেই পাওয়া গেল সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

নীপা বলল, বিজন আসছে।

আবার হাসতে-হাসতে বলল, তোমার স্ত্রীকে নেমন্তন্ন করিনি? তোমায় কখনও নেমন্তন্ন করেছি নাকি? তুমি তো এমনি-এমনিই আসো। যেদিনই বেশি মদ খাও, সেদিনই আমাদের বাড়িতে আসতে ইচ্ছে করে তোমার। এর কারণটা আমি আজও বুঝতে পারি না।

দরজার কাছে এসে বিজন বলল, কী তুমি আজও প্রণবেশদার সঙ্গে ঝগড়া করছ নাকি? কখন এলে প্রণবেশদা?

নীপা বলল ঝগড়া করব কার সঙ্গে? আজ একেবারে চুর-চুর অবস্থা।

প্রণবেশ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলল, তোর বউটা দেখলেই আমাকে অপমান করে। কেন বল তো, আমি কি মানুষটা এত খারাপ? কোনওদিন অন্যায় কিছু করেছি?

সামনা-সামনি একেবারে সটান সে মাটিতে পড়ল মুখ থুবড়ে।

নীপা আর বিজন দুদিক থেকে তাকে টেনে তুলল। মেঝেতে কার্পেট পাতা, তাই কপাল-টপাল কাটেনি!

নীপা বলল, আশ্চর্য, অন্য কেউ এভাবে পড়ে গেলে ঠিক তার মাথা ফেটে যেত। শুধু মাতালদেরই কিছু হয় না।

বিজন বলল, খুব লেগেছে নিশ্চয়ই। প্রণবেশদা, তুমি একটু শোবে।

প্রণবেশ খুব শান্তভাবে বলল, আমি এমনি-এমনি পড়ে যাইনি। আমার বুক ব্যথা করছে। অসম্ভব ব্যথা করছে। বিজন, নীপা, আমি আর কোনওদিন জ্বালাব না। আমি মরে যাচ্ছি।

বিজনেরই প্রতিক্রিয়া হল বেশি। সে একেবারে আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ? বুক ব্যথা? হার্ট? তোমার কি হার্টে আগে কিছু ছিল?

নীপা অতটা ব্যস্ত না হয়ে বলল, একটু শুয়ে পড়ো ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণবেশ বাঁ-দিকের বুকটা খামচে ধরল, তার মুখখানা সাংঘাতিক কুঁচকে গেছে।

বিজন বলল, নীপা, তুমি বিছানাটা ঠিক করে দাও, আমি শুইয়ে দিচ্ছি।

নীপা বলল, লম্বা সোফাটাতেই শুইয়ে দাও না!

প্রণবেশ মুখ তুলে বলল, কিচ্ছু দরকার নেই। আমার শেষ সময় এসে গেছে। এ ব্যথা একেবার অন্যরকম। আমি ভয় পাই না, আমি সাহসীর মতন মরতে চাই।

হুইস্কির বোতলটা তুলে একটা চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করতে নীপা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কেড়ে নিতে গেল। একটুক্ষণ টানাটানির মধ্যেই বেশ কিছুটা গিলে ফেলল প্রণবেশ। তারপর আপনিই ছেড়ে দিল বোতলটা।

কয়েকবার হেঁচকি তুলে সে একটা শূন্য কলসির মতন হেলে পড়ল মাটিতে। তার জিভ বেরিয়ে পড়ল অনেকখানি।

॥ ছয় ॥

ফোনটা চার-পাঁচবার বেজে উঠল। এই সময় মায়েরই টেলিফোন ধরার কথা, তাই বাবুন গ্রাহ্য করছিল না। শেষ পর্যন্ত পড়ার টেবিল ছেড়ে বিরক্তভাবে তাকে উঠতেই হল!

হ্যালো!

সুতপাদি...আমি—

ধরুন!

বাকি কথা না শুনেই বাবুন টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মা তোমায় ডাকছে!

কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বাবুন রান্নাঘর আর বাথরুমে উঁকি মারতে গেল। বাথরুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে জলের একটানা শব্দ।

দুম-দুম করে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বাবুন বলল, মা, তোমার টেলিফোন—

ভেতর থেকে সুতপা বলল, কে জিগ্যেস কর। আমার বেরুতে দেরি হবে।

বাবুন ফিরে এসে রিসিভার তুলে বলল, বাথরুমে বেরুতে একটু দেরি হবে, আপনি কে বলছেন?

শোনো, আমার খুব জরুরি দরকার। তুমি কি সুগত?

হ্যাঁ।

আমি নীপা মাসি বলছি। চিনতে পারছ? আমি কিশোরের ছোটমাসি, বুঝতে পারছ তো? তোমার মাকে বলো, একটা খুব জরুরি দরকার..

নিশ্চয়ই ষষ্ঠেন্দ্রিয় কোনও ব্যাপার আছে। ঠিক তক্ষুনি ভিজে গায়ে কোনও ক্রমে শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে এল সুতপা। চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

কে রে বাবুন?

বাবুনের মুখখানি বিহ্বল। সে তখনও নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। নীপা

মাসি মানে সে? অন্য গ্রহের মানবী, যে মাঝে-মাঝে মানুষের ছদ্মবেশে যোধপুর পার্কের এক বাড়িতে থাকে?

বাবুনের হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে সুতপা আতঙ্ক জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, হ্যালো কে?

আমি নীপা। কিশোরের ছোটমাসি, ক'দিন আগে আলাপ হয়েছিল মনে আছে? আপনি এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলে আসুন, হঠাৎ একটা ব্যাপার হয়েছে...

কী ব্যাপার, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নীপা, মানে আপনি, কী হয়েছে বলুন তো?

সুতপাদি, আপনি নার্ভাস হবেন না। বিশেষ কিছু নয়, প্রণবেশদা সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ও আপনাদের বাড়িতে।

হ্যাঁ, ফোনে কথা বলে সময় নষ্ট না করে আপনি চলে আসুন বরং।

ওর কী হয়েছে, সত্যি করে বলুন!

বিশেষ কিছু না। শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগছে, তাই আপনি কাছে থাকলে ভালো লাগবে।

আপনি টেলিফোনটা ওকে দিন, ওর সঙ্গে কথা বলব।

সুতপাদি, উনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, এখন অবশ্য, মানে টেলিফোনটা অনেক দূরে উনি আসতে পারবেন না। আপনি বরং চলে আসুন না, বেশি রাত তো হয়নি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে...যোধপুর পার্কে জলের ট্যাঙ্কের কাছেই আমাদের বাড়ি, সাদা রঙের, দোতলা।

ও কথা বলতে পারছে না? ওর জ্ঞান নেই?

আপনি শিগগিরই চলে আসুন।

নারী বলেই এর পরেও শাড়ি পরবার জন্য সুতপাকে পাঁচ মিনিট সময় খরচ করতে হল। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, প্রণবেশ আর বেঁচে নেই। শরীরের প্রতি কোনওদিন কোনও যত্ন নেয় না। বাইরে ট্যুরে গিয়ে কত রকম অত্যাচার করে...।

প্রণবেশ নেই? সুতপার মনে হল, পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। প্রণবেশ ছাড়া আর কারুকে তো সে ভালোবাসেনি। প্রথম যৌবনের সেই যে তীব্র ভালোবাসা, তা ফুরোতে-ফুরোতে এক জীবন কেটে যাওয়ার কথা!

কাবুলদার কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য নেওয়ার কথা এখন আর সুতপার মনেই পড়ল না।

অতি কষ্টে কান্না চেপে সে বলল, শিগগির চল, তোর বাবার...কী যেন হয়েছে!

বাবুন আগেই সব বুঝেছে। তবে এর মধ্যে কোনও উপলব্ধির তীব্রতা নেই। এখনও তাকে আচ্ছন্ন করে আছে নীপা মাসির গলার আওয়াজ।

বাবার অসুখ করেছে, বয়স্ক লোকদের তো এরকম মাঝে-মাঝে অসুখ করেই। তার জন্য মা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কেন? বাবা নীপা মাসিদের বাড়িতে গেছে, সেখানে গেলেই এখন নীপা মাসির সঙ্গে দেখা হবে বাবুনের।

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি পেতে আরও দশ মিনিট সময় খরচ হল। সুতপার খালি মনে হচ্ছে, সে আর প্রণবেশকে দেখতে পাবে না। কিন্তু বাবুন, এখন যাতে বাবুন হঠাৎ ভেঙে না পড়ে সেজন্য সুতপাকে সামলে থাকতে হবে। বাবুনের ওপর এখন কত দায়িত্ব। ছুটিকেও কি সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল? ছুটি খুব বাবার ভক্ত, সে আর বাবাকে দেখতে পাবে না!

যোধপুর পার্কে ঢোকার পর সুতপা হঠাৎ বলল, বাড়ির নম্বর? বাড়ির নম্বর তো বলেনি? জলের ট্যাঙ্কের পাশে—

বাবুন বলল, আমি বাড়ি চিনি! বাবা কোন বাড়িতে যায় আমি জানি।

তুই জানিস মানে? কী করে জানলি? বাবা কি এখানে প্রায়ই আসে?

হ্যাঁ।

সুতপা একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। এসব কী বলছে? তার আড়ালে নীপা বলে ওই ফরসা মেয়েটার কাছে প্রণবেশ প্রায়ই আসে? বাবুনও তা জানে? অথচ সুতপা জানে না।

একটা আগুনের শিখা লকলক করে সুতপার বুক ছুঁয়ে গেল।

নীপাদের বসবার ঘরের মেঝেতে চিত করে শোয়ানো হয়েছে প্রণবেশকে। এর মধ্যে একজন নয়, দুজন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে বিজন। একজন তার নিজের দাদা, অন্যজন এ-বাড়িরই একতলায় থাকেন। দুজনকেই ঠিক সময়ে পাওয়া গেছে।

ঘরে পা দিয়েই সুতপার মনে হল প্রণবেশ বেঁচে নেই। সারা ঘরে মৃত্যুর স্তব্ধতা।

সুতপা কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ল প্রণবেশের মাথার কাছে। তার মুখ দিয়ে কুঁ-কুঁ শব্দ হতে লাগল।

নীপা তার পিঠে হাত রেখে বলল, সুতপাদি, ভয়ের বিশেষ কিছু হয়নি সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুতপার মনে হল, একটা রক্তচোষা পিশাচী তার নোংরা হাত দিয়ে সুতপাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। তার শরীরটা শিউরে উঠল।

বাবুন বাবার দিকে দু-এক পলক মাত্র তাকিয়ে তারপর একদৃষ্টে চেয়ে রইল নীপার দিকে! আজ সবাই ব্যস্ত, এখন কেউ বাবুনকে লক্ষ করছে না, তাই সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছে। অবিকল সেই ছবির মতন মুখ। কাঁধ থেকেই হাত দু-খানি সম্পূর্ণ খোলা, এরকম সুন্দর হাত কোনও মানুষের হয়! কী নরম! যেন গোটা শরীরটাই মাখন দিয়ে গড়া।

বিজনের দাদা মুখ তুলে বললেন, আজ রাত্তিরটা নড়াচড়া না করানোই ভালো। এখানেই শুইয়ে রাখো। হার্টের কিছু হয়নি, কাল সকালেই বাড়ি চলে যেতে পারবে।

এরপর তিনদিন প্রণবেশ সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিল নিজের বাড়িতে। তার তেজ অনেক কমে গেছে! বেশ বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে সে।

সুতপা দারুণ সেবা করল প্রণবেশের। অনেকদিন সে স্বামীকে এত কাছাকাছি পায়নি। যেন পুরানো কালের প্রেম আবার ফিরে এসেছে। সুতপা রান্না কিংবা অন্য কাজে আধঘণ্টার বেশি ব্যস্ত থাকলেই প্রণবেশ ডাক দেয়, এই তপু, এখানে এসো, একটু বসো না! আমায় একলা শুইয়ে রাখবে নাকি?

নীপা আর বিজন প্রত্যেকদিন দেখতে আসে প্রণবেশকে। দুই পরিবারের মধ্যে একটা দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বিজন খুব সরল আর সাদাসিধে মানুষ। খুব জোরে-জোরে হাসে। এইরকম হাসির শব্দ শুনলেই বোঝা যায় মানুষটার মনটা খুব পরিষ্কার। নীপারও অনেক গুণ আছে, সে কথা সুতপাকেও স্বীকার করতে হয়েছে। নীপা মেয়েটি মোটেই ন্যাকা নয়, হাবে-ভাবে, ছলাকলায় শুধু নিজের রূপ দেখিয়ে অন্যদের জয় করবার চেষ্টা নেই। সবচেয়ে বড় কথা, নীপা কখনও সুতপাকে সামান্য একটুও অবজ্ঞার ভাব দেখায় না।

একদিন রাত আটটায় নীপা আর বিজন ওদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে প্রণবেশ আর সুতপা দুজনেই বিদায় জানাচ্ছে ওদের, সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল কাবুলদা।

অন্য অতিথিকে আসতে দেখে নীপা আর বিজন গল্প থামিয়ে বলল, আচ্ছা চলি, কাল-পরশু আর আসা হবে না, একটু বাইরে যাচ্ছি, পরে আর একদিন আসব। প্রণবেশদা তো ভালোই হয়ে গেছে।

ওপরে এসে কাবুলদা বলল, ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা কে?

প্রণবেশ তাড়াতাড়ি বলল, আমাদের বন্ধু।

তারপরেই সাড়ম্বরে বলল, তপু, আমার সন্ধেবেলার ওষুধটা দাওনি! রাত্তিরের খাওয়ারটাও তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।

অর্থাৎ কাবুলদার সঙ্গে কথাটা এড়াবার জন্য প্রণবেশ এখন ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকবে!

কাবুলদা বলল, তোমরা এবারে একটা কাজ করো! প্রণবেশ কিছুদিন ছুটি নিয়ে কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসো, তাতে শরীরটা সারবে। শিগগিরই তো গরমের ছুটি পড়ছে। আমি তোমাদের একটা বাংলো ঠিক করে দিচ্ছি—

প্রণবেশ হাই তুলে বলল, হ্যাঁ তা মন্দ হয় না! দেখা যাক।

কাবুলদাকে সুতপার সাহচর্যে রেখে প্রণবেশ অন্য ঘরে চলে গেল।

অবশ্য সে রাতে ঘুমোতে অনেক দেরি হল প্রণবেশের। শয্যায় সে সুতপাকে অনেকখানি পৌরুষ দেখাল, অনেক আদর করল। তারপরেও একটানা গল্প।

সাতদিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হল প্রণবেশ! ঠিক আগেকার নিয়মে দাড়ি কামানো, স্নান, সাড়ে আটটার মধ্যে খেতে বসা। সুতপা পাশে দাঁড়িয়ে যত্ন করে খাওয়ালো স্বামীকে।

তারপর প্রণবেশ যখন জুতোর ফিতে বাঁধছে তখন সুতপা হাতে করে মশলা নিয়ে এসে অত্যন্ত আদুরে সপ্রেম গলায় জিগ্যেস করল, আজ কখন বাড়ি ফিরবে?

প্রণবেশ মুখ তুলে হেসে বলল, ছুটির পর, এই ধরো ছ'টা সাড়ে ছ'টা।

আজ তোমাদের স্টুডিওতে যাবে না!

উঁ—উঁ—উঁ—, না বোধহয়। আজ আর যাব না।

অফিসে যেন আজই আবার কারুর সঙ্গে ঝগড়া করো না। ঝগড়া করলেই তো তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, তারপর আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না।

তোমার কি ধারণা আমি ইচ্ছে করে ঝগড়া করি? এক-এক সময় ওই সুবিমলটা এমন ব্যবহার করে...

আবার ওই সুবিমলের সঙ্গেই তো তুমি দুপুরবেলা বেরিয়ে মদ খেতে যাও!

সেসব দিন চলে গেছে। সুবিমলের সঙ্গে আমি পারতপক্ষে দেখাই করি না।

অন্য কেউ যদি তোমায় জোর করে মদ খাওয়ার জন্য টেনে নিয়ে যায়? তুমি না বলতে পারবে?

আমি ছেলেমানুষ নই যে কেউ আমায় জোর করে নিয়ে যাবে। একটু-আধটু খেলেই বা দোষ কী? একদিন হঠাৎ শরীর খারাপ হয়েছিল, সে-রকম অনেকেরই হয়।

তার মানে তুমি আজ খাবে?

সেকথা বলিনি। আমি না খেয়েও থাকতে পারি। দেখলে তো এই সাত দিন...আমার মনের জোর আছে।

সাতদিনের পর আটদিনের দিনও কি সেই মনের জোর থাকবে?

এরকম করে বলছ কেন, তপু?

বলছিলুম যে আজ একটু খেলেই তোমার আর একটু খেতে ইচ্ছে করবে। তারপর বেশি খাওয়া হলেই তোমার তখন নীপাদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করবে!

প্রণবেশ মুখ তুলে সুতপার দিকে স্থির ভাবে তাকাল। তার এতক্ষণের প্রসন্ন মুখে তিনটে ভাঁজ পড়েছে।

গলার আওয়াজ বদলে ফেলে সে বলল, বিজনদের বাড়িতে আমাকে মাঝে-মাঝে যেতে হয় কাজের জন্য। বিজন ওর অফিসের কিছু-কিছু কাজ আমাকে দিয়ে করায়। তাতে আমার কিছু এক্সট্রা টাকা রোজগার হয়, সেই টাকা তোমারই সংসারের কাজে লাগে।

এমনই কাজ যে সে জন্য তোমাকেই শুধু ওদের বাড়িতে যেতে হয় ওরা কখনও তোমার বাড়িতে আসে না।

এর মধ্যে 'ওরা' আসছে কোথা থেকে। কাজটা বিজনের সঙ্গে। নীপা আমাকে বলেছে, তুমি যেদিনই ওদের বাড়িতে যাও, খুব বেশি মদ খেয়ে যাও, কোনও কথাই ভালো করে বলতে পারো না!

তপু, তুমি আমার সঙ্গে এখন ঝগড়া করতে চাও?

বারে, ঝগড়া কেন করব? আমি বলছি যে নীপার বাড়িতে মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা তোমার যেতে ইচ্ছে করে তো যাও, আমি বারণ করছি না! কিন্তু অত মদ খেয়ে যেও না। নীপা পছন্দ করে না!

পাশের ঘরেই পড়ার টেবিলে বাবুন বসে আছে, ছোট মেয়ে বিছানায় শুয়ে রেডিওর নব্ ঘোরাচ্ছে, রান্নাঘরে রয়েছে রঘু। এসব কিছুই আর খেয়াল রইল না প্রণবেশের। সে চিৎকার করে বলে উঠল, বলছি তো, আমাকে ও-বাড়িতে যেতে হয় কাজের জন্য, টাকা রোজগারের জন্য! তোমাদের আর একটু সুখ স্বাচ্ছেন্দ্যের জন্য!

সুতপা মিষ্টি করে হেসে বলল, অত জোরে কথা বলছ কেন? রেগেই বা যাচ্ছ কেন? আমি তো শুধু জানতে চাইছি। নীপার কাছে তোমার যেতে হয় কাজের জন্য?

নীপার কাছে নয়, বিজনের কাছে।

ও। খুব গোপনীয় কাজ বুঝি? এক বছর ধরে তুমি ওদের বাড়িতে যাচ্ছ অথচ আমাকে ঘুণাক্ষরেও তা বলোনি!

আমাকে কতরকম কাজ করতে হয়, তুমি সব জানো? সে খবর রাখার তোমার সময় আছে?

নীপা আমাকে বলছিল। তুমি ওদের বাড়িতে গিয়ে প্রায় প্রত্যেকদিনই বলো, তোমার খুব মন খারাপ। তোমার কিছু ভালো লাগে না। তোমার যখন মন খারাপ হয়, তখন তোমার বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করে না। তখন শুধু নীপার কাছেই যেতে ইচ্ছে করে!

কয়েক মুহূর্ত থেমে রইল প্রণবেশ। যেন বাঘের মতন সে এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সুতপার টুঁটি চেপে ধরবে! তার মুখখানা গনগনে লাল হয়ে গেছে।

সে হুংকার দিয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, যাই তো নীপার কাছে। বেশ করি। বাড়িতে ফেরার উপায় আছে? বাড়ি ফিরলেই তো দেখব সেই কাবুল রাস্কেলটা বসে আছে? একটা হামবাগ, ইডিয়ট, ধর্মের ষাঁড়, ওকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তোমরা মেয়েরা যে ওর মধ্যে কী পাও...ওকে দেখলেই একেবারে গলে যাও, গা ঘেঁষে দাঁড়াও।

এই, আস্তে।

তুমিই তো শুরু করেছ! আগে আমি নিয়মিত বাড়ি ফিরতুম না। কয়েক বছর ধরে বাড়িতে একটু শান্তি নেই, ওই লাফাঙ্গা বদমাশটা সবসময় ঘর জুড়ে থাকে, তোমরা ওকে প্রশ্রয় দাও! বাড়িতে কোনও বন্ধুবান্ধবকেও ডাকার উপায় নেই। আমার বন্ধুরা কেউ ওকে পছন্দ করে না। ওই কাবুলটা এমন পাজি, আমাদের বাড়িতে যদি কোনও বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, অমনি তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। বাড়িতে এখন একটু প্রাইভেসি নেই পর্যন্ত।

কাবুলদা আসে বলেই তোমার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না। একথা আগে বলোনি কেন? কাবুলদাকে আসতে বারণ করে দিতুম।

কেন বলব? তুমি তাকে পছন্দ করো। সে তোমার বয়ফ্রেন্ড, তাকে না দেখলে তোমার একদিনও চলে না। বাড়ির ব্যাপারে আমার কোনও মতামত পর্যন্ত তুমি নাও না, সবই কাবুলদা। আমি শুধু একটা পয়সা রোজগারের যন্ত্র।

তোমার মতামত না নিয়ে আমি কী করেছি?

বাবুনের স্কুল পালটানো, জানো, তাতে আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল। তুমি তা গ্রাহ্যও করলে না, কাবুলদার কথায় নেচে ওঠে...

তুমি জোর দিয়ে বারণ করলে!

আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। তোমার যখন একজনকে এত পছন্দ, তখন আমি বাধা দেব কেন? তোমার ওইরকম পুরুষই পছন্দ, ব্লাস্ট, হামবাগ, চেহারাসর্বস্ব। কখনও জামার বুকের বোতাম লাগায় না, মেয়েদের কাছে সেক্স অ্যাপিল দেয়।

কাবুলদাকে তোমার এত অপছন্দ, অথচ আগে কখনও বলোনি।

তোমরা মেয়েরা হিপোক্রিট! নিজের স্বামী দু-একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি না ফিরলে কিংবা অন্য কোনও বাড়িতে গেলেই রেগে যাও! আর ওই লোকটা যে দিনের-পর-দিন নিজের স্ত্রীকে নেগলেক্ট করে, কোথাও নিয়ে যায় না, স্ত্রীকে মানুষ বলেই মনে করে না, শুধু পরের বউদের পেছনে-পেছনে ঘুরঘুর করে, তাকেই তোমাদের এত পছন্দ! তার সঙ্গে প্রেম! ওর বউয়ের মনের অবস্থায় কথাটা একবারও ভাবো না তোমরা? তোমরাও জেনে-শুনে সেই মহিলাকে ঠকাচ্ছো না?

এই জন্যই বুঝি তুমি নীপার কাছে যাও? তোমার যত মন খারাপের কথা শুধু ওকেই বলো?

আমাকে অফিসে যেতে দেবে কি দেবে না বলো?

যাও না, কে আটকাচ্ছে। তবে একটা কথা শুনে রাখো। নীপা এসে এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন আমার চেয়ে ও-ই বেশি চেনে তোমাকে। তুমি ওর পুরোপুরি ক্রীতদাস। তোমার যত মনের কথা দুঃখের কথা, সব ওর সঙ্গে। আমার সঙ্গে তোমার মনের কোনও মিল নেই, আমি শিল্প টিল্প নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিন্তু নীপা অনেক কিছু বোঝে, সেইজন্য ওর সঙ্গেই তোমার প্রাণের কথা হয়।

নীপা কখনও এমন কথা বলতে পারে না।

হ্যাঁ বলেছে! খুব মিষ্টি-মিষ্টি করে আমাকে শুনিয়েছে। যেন আমার জন্য ওর কত চিন্তা! ওভাবে আমি বোকাসোকা মেয়ে, কিছু বুঝি না।

নীপা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেই না।

তা কী করে করবে। ও যে দেবী! ওর ফরসা রং, বয়েস কম, একটু ছবিটবি আঁকে, সেইজন্য তোমার মাথা কিনে নিয়েছে।

ডোনট বি ন্যাস্টি, তপু!

ন্যাস্টি, হ্যাঁ, আমি ন্যাস্টিই হব। কী করে প্রতিশোধ নিতে হয় আমি জানি! আমি কি করব জানো! তুমি অফিস চলে গেলে আমি কাবুলদাকে ফোন করব। তারপর কাবুলদাকে সঙ্গে নিয়ে নীপার বাড়িতে যাব!

অদ্ভুতভাবে হাসল সুতপা। কথাটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগল প্রণবেশের।

সুতপা আবার বলল, নীপা দুপুরবেলা আমাকে যেতে বলেছে। আমি কাবুলদাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, নীপার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

প্রণবেশ আর্তভাবে দু-হাত তুলে 'না, না' বলতে চাইল। কিন্তু বলতে পারল না। সুতপা তার বুকে সাংঘাতিক অস্ত্র হেনেছে। বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইল।

সুতপা খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর খুব মজা হবে কাবুলদা স্বভাব তো তুমি জানোই। এরপর থেকে তুমি যখনই নীপার কাছে যাবে, দেখবে, যে কাবুলদা সেখানে বসে আছে!

প্রণবেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরাজিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। আস্তে-আস্তে বলল, এরকম করা তোমার উচিত হবে না।

নিশ্চয়ই করব। কাবুলদা খারাপ লোক জেনেও আমার সঙ্গে তাকে মিশতে দিতে তোমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার প্রেমিকার সঙ্গে সে মিশলেই তোমার আঁতে ঘা লাগবে, তাই না? আমি

বুঝি প্রতিশোধ নিতে জানি না?

ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠতেই স্বামী-স্ত্রীর যুদ্ধ থেমে গেল।

সুতপা টেলিফোন ধরে বলল, হ্যালো? হ্যাঁ কাবুলদা, বলো! দুপুরে! না, আজ দুপুরে আমি সিনেমায় যেতে পারব না। তুমি বরং দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে চলে এসো। তোমার সঙ্গে একটু বেরুব...যা রোদ্দুর, এখন একলা-একলা রাস্তায় বেরুনোই যায় না?

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে প্রণবেশের দিকে তাকাল সুতপা। প্রণবেশ দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল খুব আস্তে-আস্তে।

পড়ার টেবিলে বসে বাবুন কান খাড়া করে মা-বাবার প্রত্যেকটি কথা শুনেছে।

বছরে একবার দু-বার এরকম ঝগড়া হয়। বাবুন তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না! মা কান্নাকাটি শুরু করলে সে কখনও-কখনও মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

এবারের ঝগড়াটা অন্যরকম। আজ মা কাঁদেনি। আজ মায়ের কথাগুলি বাবুনের পছন্দ হয়নি।

নীপা মাসির বাড়িতে মা কাবুলমামাকে নিয়ে যাবে কেন? কাবুলমামা সবসময় ও-বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে? কাবুলমামা বড্ড বেশি কথা বলে।

নীপা মাসির সঙ্গে এখন ভাব হয়ে গেছে বাবুনের। সে ইচ্ছে করলেই যখন-তখন ও-বাড়িতে যেতে পারে। এর মধ্যে কয়েকবার গেছে। লজ্জায় কোনও কথা বলতে পারে না, শুধু মাঝে-মাঝে মুখের দিকে তাকায় আর মুখ নিচু করে।

কাবুলমামা গিয়ে বিরক্ত করার চেয়ে কিছুদিন নীপা মাসির অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভালো। নীপা মাসির নিজের দেশে, সেই অনেক-অনেক দূরের গ্রহে।

দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাবুন! দেওয়ালটা এখন মহাকাশ। বাবুন দেখতে পাচ্ছে নীল শূন্যতার মধ্যে ধপধপে সাদা ম্যাক্সি পরে নীপা মাসি উড়ে যাচ্ছে, হাতদুটি ঠিক ডানার মতন মেলা, চোখ দিয়ে আলো বেরুচ্ছে যেন, কী অপূর্ব যে দেখাচ্ছে নীপা মাসিকে। ঠিক যেন, ঠিক যেন, পাখি, না পরী, না উড়ন্ত ফুলগাছ।

বাবুন হাতছানি দিয়ে ফিসফিস করে বলল, নীপা মাসি, আবার এসো, আবার কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এসো, শুধু আমার জন্য!

কোথায় আলো

সিঁড়ির আলোটা না জ্বালিয়েই নিচে নেমে এল সুজয়া। একতলায় বসবার ঘরটাও অন্ধকার। সেটার পাশ দিয়ে এসে সদর দরজাটা খুলল খুব সাবধানে। তবুও ক্রিক করে শব্দ হল দরজাটায়। সুজয়া একটুক্ষণ সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে। তার বুক কাঁপছে। নিশ্বাস পড়ছে ঘনঘন।

মাত্র সন্ধে সাড়ে সাতটা। এইরকম সময় আগে অনেকদিনই তো সুজয়া বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। হঠাৎ কিছু কেনার দরকার হলে দোকানে গেছে। কিংবা বন্ধুদের এগিয়ে দিয়েছে রাস্তা পর্যন্ত। কোনওদিন তো কেউ কিছু ভাবেনি। আজও সুজয়া সেইভাবে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না।

সদর দরজাটা চেপে বন্ধ করে সুজয়া আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে কোনওক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে শেষবারের মতন তাকাল বাড়ির দিকে। আর কোনওদিন সে এখানে ফিরে আসবে না।

সদর দরজার পাশেই লেটার বক্স। হঠাৎ খুব মায়া হল সেটার দিকে তাকিয়ে। যেন কত আপনজন। কত ছেলেবেলা থেকে সুজয়া এই লেটার বক্সটা দেখছে। বাড়ির আর সব কিছুর থেকে এই লেটার বক্সটার জন্যেই যেন বেশি কষ্ট হতে লাগল সুজয়ার। অন্যমনস্কভাবে সে লেটার বক্সটা একবার খুলল। ভেতরটা খালি। সুজয়া তার নামে কোনও চিঠি আশাও করেনি। কেই বা তাকে চিঠি লিখবে।

গলির মোড়ে সুজয়ার ছোট ভাই বিজন দাঁড়িয়ে আছে আর দুটি ছেলের সঙ্গে। বিজন গতবার পার্ট টু পরীক্ষায় ফেল করে এখনো কলেজের ছাত্র আছে। ফেল করেছে মানে, সবক'টি পরীক্ষা দেয়নি। প্রশ্ন কঠিন হয়েছে বলে চেয়ার-টেবিল ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল। তার জন্যে যে ওর একটা বছর নষ্ট হল, সে জন্যে কোনও আক্ষেপ নেই। সন্ধের পর গলির মোড়ে আড্ডা দেওয়াই তার প্রধান কাজ।

সুজয়া যদি বিজনদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, হয়তো বিজনরা তার দিকে তাকিয়েও দেখবে না। দেখতে পেলেও বিজন কোনও প্রশ্ন করবে না। তবু সুজয়া ইতস্তত করতে লাগল। সে কিছু চুরি করেনি, কোনও দোষ করেনি, তা হলেও যেন মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ রয়ে গেছে।

বিজন আর তার বন্ধুরা এইসময় কথা বলতে-বলতে এগিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে। তারা মোড় ঘুরে যেতেই সুজয়া এগোতে লাগল।

বড় রাস্তায় এসে সুজয়া আর একবার তাকিয়ে দেখল, বিজনদের দেখা যাচ্ছে কিনা। ওরা কাছাকাছি কোথাও নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে সুজয়া রাস্তা পার হয়ে বাস স্টপে দাঁড়াল। প্রায় তক্ষুনি এসে গেল একটা দোতলা বাস। বাসে উঠে পড়ে সুজয়া একটা জানলার ধারে সিট পেয়ে গেল। এটা যেন একটা বিরাট সৌভাগ্যের মতন ব্যাপার। এই সন্ধেবেলা বাসে উঠেই একটা বসবার জায়গা পাওয়া কি সোজা কথা? তাও জানলার ধারে!

সুজয়া বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিল। এখন তার সব অস্বস্তি কেটে গেছে। বুকের মধ্যে কুলকুল করছে একটা নতুন ধরনের আনন্দের স্রোত। এইরকম সন্ধেবেলা সে বাসে করে একা একা ঘুরেছে অনেকবার। কিন্তু আজ সব কিছু আলাদা। আজ সে স্বাধীন। কারুর জন্যেই তার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।

সুজয়া রাগের মাথায় দুম করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসেনি। অনেকদিন ধরেই সে এই কথাটা ভাবছিল। সে একা নিজস্ব রুচি অনুযায়ী বাঁচতে চায়। কিন্তু তার মতন সাধারণ মেয়ের পক্ষে তা মোটেই সোজা নয়। অনেক বাধা। চিন্তা করেও একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

আজ সন্ধেবেলা তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার বিশেষ কোনও কারণ ঘটেনি যদিও, দুপুর থেকে সে একা-একা নিজের ঘরে শুয়ে নিজের জীবনটার কথা চিন্তা করতে-করতে একসময় ছটফট করে উঠল। এটা কি জীবন? গোপন দুঃখ আর চাপা অপমান সয়ে সয়ে প্রতিটি দিন কাটানো? তখন সুজয়া ঠিক করল, ঝট করে বেরিয়ে পড়তে না পারলে হয়তো কোনওদিন বেরুনো হবে না। সবসময়ই দ্বিধার পিছুটান থাকবে।

সুজয়া ঠিক কোথায় যাবে, তা ভেবে রাস্তায় বেরোয়নি। সেরকম কোনও যাওয়ার জায়গাও তার নেই। কোনও যুবতী মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে সকলেই ধরে নেবে, কোনও প্রেমিক তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু সুজয়ার সেরকম কেউ নেই। কারুর সঙ্গে তো সুজয়া চলে যেতে চায়নি, সে একা থাকতে চেয়েছে।

তবে প্রথমে সে অপরাজিতার কাছে যাবে। অপরাজিতা তার ছেলেবেলার বন্ধু। বিয়ের পর অনেকদিন বোম্বেতে ছিল। মাত্র দেড়মাস আগে ওর স্বামী ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে কলকাতায়। যোধপুর পার্কে ওদের ছোট্ট ছিমছাম ফ্ল্যাট। অপরাজিতার স্বামী প্রদীপ্ত বেশির ভাগ সময়ে বাড়িতে থাকে না, অফিসের কাজ ছাড়াও ওর নিজস্ব আর একটা কী যেন ছোটোখাটো ব্যবসা আছে। সুজয়া প্রায়ই এসেছে অপরাজিতার সঙ্গে গল্প করতে।

বাস গড়িয়াহাট ছেড়ে গোলপার্কে এসেই থেমে গেল। রাস্তায় কিসের যেন একটা গণ্ডগোল। অনেকগুলি যুবক উত্তেজিতভাবে ঘোরাফেরা করছে, বড়-বড় ড্রাম রাস্তার মাঝখানে টেনে এনে বন্ধ করে দিচ্ছে সব গাড়ি।

হুড়মুড় করে লোকজন সব নেমে পড়ল বাস থেকে। সুজয়াকেও নামতে হল। ভিড় ছেড়ে সুজয়া এক পাশে সরে দাঁড়াল। কোনও বাসই আর ওদিকে যাচ্ছে না। কিন্তু এতদূর এসে সুজয়া আর ফিরে যাবে না। যোধপুর পার্ক এখান থেকে খুব একটা দূর নয়। হেঁটেও যাওয়া যায়।

অপরাজিতাদের ফ্ল্যাটটা দোতলায়। দরজা বন্ধ, ভেতরে আলো জ্বলছে, অনেকগুলো গলার আওয়াজ। সুজয়া কলিংবেল টিপল।

একটুক্ষণ দেরি করে খুলল দরজা। পাজামা ও গেঞ্জিপরা প্রদীপ্ত। প্রদীপ্ত বেশ লম্বা, সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা। প্রদীপ্ত প্রথমে এমনভাবে তাকায় যেন চিনতে পারছে না।

পরমুহূর্তেই সে বলে, ও, আপনি? কী খবর?

সুজয়া একটু চোপসানো গলায় জিগ্যেস করল, অপরাজিতা নেই?

প্রদীপ্ত সদর দরজাটা খুলে রেখেছে, সুজয়া দেখতে পেল বসবার ঘরে সাত-আটজন পুরুষ বসে আছে, দুজন নারী, সম্ভবত প্রদীপ্তের বন্ধু-বান্ধব। কয়েকজনের হাতে মদের গেলাস। সুজয়া জানে যে প্রদীপ্ত মাঝে-মাঝে মদ খায়। অপরাজিতাই সে কথা বলেছে। কাজের স্বার্থে প্রদীপ্তকে এমন সব লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, যাতে এ জিনিসটা বন্ধ করে দিলে চলে না। এই জন্যেই প্রদীপ্তর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় প্রায়ই। অপরাজিতা এই ব্যাপারে একটু অসুখী। সুজয়া অবশ্য অপরাজিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে আজকাল তো অনেকেই মদ খায়। ওতে কিছু যায় আসে না।

প্রদীপ্ত বলল, না, ও তো মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। আপনাকে আসতে বলেছিল বুঝি?

সুজয়া বলল, না, কোনও কথা ছিল না। আমি এমনি এসেছি। কখন ফিরবে?

—আজ বোধহয় ফিরবে না। বলে গেছে যে দিন দুয়েক থাকবে ওর মায়ের কাছে। ওর মায়ের শরীরটা তো বেশি ভালো না।

—ও।

স্পষ্টতই সুজয়ার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সেটা লক্ষ করল প্রদীপ্ত। সে ব্যস্তভাবে বলল, আপনার কি বিশেষ কোনও দরকার ছিল?

নিজেকে সামলে নিয়ে সুজয়া বলল, না, না, সেরকম কিছু নয়। এমনিই এদিকে এসেছিলাম। আচ্ছা চলি—

—চলে যাবেন কেন, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

—না, আমি বসব না।

—এতদূর থেকে এসে চলে যাবেন! একটু বসুন।

বসবার ঘরে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি মারছে এদিকে। চোখে কৌতূহল। সুজয়া বিষম অস্বস্তিতে পড়ল। প্রদীপ্ত একটু বসে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু প্রদীপ্তর বন্ধুদের কারুকে সে চেনে না। মহিলা দুজনের সাজগোজ খুব উগ্র। এত অচেনা নারী-পুরুষের মধ্যে, সুজয়া নিজেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না।

সে মিনতি করে বলল, না, আজ যাই। আর একদিন আসব।

প্রদীপ্তর মুখখানা একটু অসহায় ধরনের। সে ভাবছে, তার স্ত্রীর বান্ধবী অনেক দূর থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে, তাকে কিছুটা খাতির করা দরকার। কিন্তু কীভাবে যে খাতির করবে, তা ভেবে পাচ্ছে না।

সুজয়া আর দেরি করল না, প্রদীপ্তর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। রাস্তায় নেমেই সে একটু রেগে গেল প্রদীপ্তর ওপরে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হল্লা করবে বলেই কি প্রদীপ্ত তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে? কারণ, অপরাজিতা থাকলে মোটেই এরকম মদটদ খাওয়া চলত না। কিংবা অপরাজিতা আজ থাকবে না বলেই কি প্রদীপ্ত তার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনেছে আজ? এতে দোষের কিছু নেই ঠিকই, কিন্তু প্রদীপ্ত যখন অফিসের কাজে বাইরে যায়, তখন কি অপরাজিতা বাড়িতে এরকম পার্টি দিতে পারে? তা হয় না। কেন হবে না? ছেলেরা যা পারবে মেয়েরা কেন তা পারবে না? প্রদীপ্তর দুজন মেয়েবন্ধু এসেছে। অপরাজিতারও কোনও পুরুষবন্ধু যদি আসে কখনও?

সুজয়া বড় রাস্তায় দাঁড়াল। বাস-টাস এখনও বন্ধ। কয়েকজন বলাবলি করছে যে কাঁকুলিয়ায় নাকি একজন ছেলে খুন হয়েছে, তাই তার দলের ছেলেরা এ পাড়ায় বনধ্ ডেকেছে। আজ আর কোনও গাড়ি-টাড়ি চলবে কিনা ঠিক নেই।

খুনের খবর শুনেই সুজয়ার বুক কেঁপে উঠল। খুন শুনলেই চোখের সামনে একটা রক্তাক্ত দৃশ্য ভেসে ওঠে। গা শিরশির করে। রাজনৈতিক ব্যাপার, আবার যদি এক্ষুনি মারামারি শুরু হয়ে যায়। এইরকম সময় সুজয়া কখনও রাস্তায় থাকেনি। একবার সে ভাবল, অপরাজিতাদের বাড়িতে ফিরে যাবে। ওখানে অনেক লোকজন আছে, কেউ-না-কেউ তাকে নিশ্চয়ই পৌঁছে দিতে পারবে।

পরমুহূর্তেই সে নিজেকে কঠিন করল। কেন সে ফিরে যাবে? কেন সে অন্যদের সাহায্য নেবে? রাস্তা তো এখনও জনশূন্য হয়ে যায়নি। মেয়েদের বিশেষ দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু পুরুষমানুষ অনেক আছে। পুরুষেরা যদি এই সময় রাস্তায় ঘুরতে পারে, সেই বা পারবে না কেন? কী তফাত? খুব গণ্ডগোল হলে সে দৌড়ে গিয়ে রাস্তার ধারে কোনও একটা বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারবে ঠিকই।

আর একটা কথা তার মনে পড়ল। এখানে একটা ছেলে খুন হয়েছে, রাস্তায় এত গোলমাল, কিন্তু প্রদীপ্তরা তার কিছুই জানে না। ওরা মদ খেতে খেতে গল্প আর হাসাহাসি করছে। শহরের

জীবন কি অদ্ভুত উদাসীন।

সুজয়া হাঁটতে আরম্ভ করল। গোলপার্ক পর্যন্ত এসে দেখল যে তখনও ভিড় এবং উত্তেজনা আছে বটে কিন্তু মারামারির কোনও লক্ষণ নেই। দু-তিনটে পুলিশের গাড়ি এসে পড়েছে। ধীর পায়ে সুজয়া সেই জায়গাটা পেরিয়ে গেল।

গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে দেখল, আবার সব কিছু স্বাভাবিক। এ দিকে ট্রাম-বাস চলছে, দোকানপাট খোলা।

বাস স্টপে এসে সুজয়া চিন্তা করল, এখন সে কোথায় যাবে? সে ভেবে এসেছিল, আজকের রাতটা অপরাজিতার বাড়িতে কাটিয়ে দেবে। শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্যেই নয়, অপরাজিতার কাছে খুলে বলত সবকিছু। অপরাজিতা তার একমাত্র বন্ধু যার কাছে প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। একজন কারুর সঙ্গে পরামর্শ করার খুব যে দরকার ছিল তার। একা-একা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কী কষ্টকর।

সুজয়া এখন কোথায় যাবে? তার পক্ষে অবশ্য সবচেয়ে সহজ বাড়ি ফিরে যাওয়া। সে তো বাড়িতে কারুকে কিছু বলে আসেনি। সে শুধু একটা ছোট চিঠি লিখে রেখে এসেছে তার বালিশের নিচে। সে চিঠি এখনও কারুর চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। হয়তো, এর মধ্যে কেউ তার খোঁজও করবে না। এইটুকু সময়ের জন্যে বাইরে থেকে ঘুরে এলে তেমন কোনও কৈফিয়ত দেওয়ারও নেই।

অপরাজিতার সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাও করেনি। প্রথমেই এরকম বাধা পড়ল! বাড়ি থেকে বেরুবার আগে একবার তার শাড়িতে টান পড়েছিল। সুজয়া ভেবেছিল, কে যেন তার আঁচল ধরে টানছে। আসলে কিছু নয়, নিজের ঘরের দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে বেরুবার সময় তার আঁচলটা আটকে গিয়েছিল। তাতেই মনে হয়েছিল, তার ঘরই যেন তাকে অনুরোধ করছে, না, যেও না!

আশ্চর্যের ব্যাপার, আগে কোনওদিন তো সুজয়ার আঁচল এরকমভাবে দরজায় আটকে যায়নি। আজকেই এরকম হল বলে কয়েকমুহূর্তের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল সুজয়া। আর কেউ না হোক, তার ঘরটা অন্তত তাকে ভালোবাসে!

তারপর এই অপরাজিতার সঙ্গে দেখা হল না, এটা কিসের লক্ষণ? সে কি ভুল করছে? তার নিয়তি কি নানান ইশারা পাঠিয়ে নিষেধ করছে তাকে? নাঃ, এসব কুসংস্কার!

সুজয়া জেদি মেয়ে। কোনও ব্যাপারে বাধা পড়লেই তার জেদ বেড়ে ওঠে। সে তক্ষুনি মন ঠিক করে ফেলল। বাড়ি থেকে চলে এসেছে যখন একবার, আর সে কিছুতেই ফিরবে না। সে হার স্বীকার করবে না কিছুতেই।

সুজয়া বাড়ি থেকে চলে এসেছে একবস্ত্রে। একটা হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া সঙ্গে কিছু নেই। সে বাড়ির কোনও জিনিসই আনবে না ঠিক করেছিল, শুধু তার নিজের জমানো চারশো ছাব্বিশ টাকা ছাড়া। তার যে সামান্য কিছু গয়না আছে, তাও ফেলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলেছে। গয়নাগুলো ফেলে এলে সেগুলো বউদির ভোগে লাগত, কিন্তু গয়নাগুলো তো সুজয়ার মায়ের, সেসব সে বউদিকে দেবে কেন? বউদি তো নিজের ভাগেরটা পেয়েছেই। তা ছাড়া এইটুকু বোঝার মতন বুদ্ধি তার আছে যে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার কোনও মানে হয় না, টাকা পয়সাই মানুষের অনেকখানি স্বাধীনতা এনে দেয়।

কাছাকাছি একটা শাড়ির দোকানে ঢুকে সুজয়া দু-খানা মাঝারি ধরনের শাড়ি আর কিছু শায়া ব্লাউজ কিনে ফেলল। তারপর পাশের দোকান থেকে একটা সস্তা দামের সুটকেস। এতেই দেড়শো টাকার মতন খরচ হয়ে যাওয়ায় একটু অনুতাপ হল তার। বাড়ি থেকে নিজের সুটকেসটায় কয়েকটা জামাকাপড় ভরে নিয়ে এলেই হত। সুটকেসটা নিয়ে অবশ্য সন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরুনো যেত না। কিন্তু ভোরবেলা বেরিয়ে এলেই বা কী ক্ষতি ছিল। যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে।

এবার আর বাসে না উঠে সুজয়া একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এল হাওড়া স্টেশনে। কলকাতা শহরে আর তার রাত কাটানোর কোনও জায়গা নেই। কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার মানে হয় না। কোনও মেয়ে একা কি কলকাতার কোনও হোটেলে থাকতে পারে? কে জানে! তার চেয়ে বাইরে কোথাও যাওয়াই ভালো।

বাইরে বলতে সুজয়ার পুরীর নামটাই মনে পড়ছে। ছেলেবেলায় সে একবার পুরী গিয়েছিল, জায়গাটা অন্তত চেনা। সেখানে গিয়ে তাকে থাকতে হবে হোটেলেই। তার সামান্য টাকায় বেশিদিন চলবে না। তারপর কী হবে?

সুজয়ার মাথার মধ্যে যেন একটা ঝনঝন শব্দ হচ্ছে সবসময়। তাকে ঠিক মতন সব কথা চিন্তা করতে দিচ্ছে না সেই শব্দটা। ওই শব্দটা যেন একটা বিপদের ঘণ্টা। তাকে ফিরে যেতে বলছে। সে নিছক একটা ছেলেমানুষী করতে যাচ্ছে বলে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে অদৃশ্য কোনও শক্তি। মেয়েদের পক্ষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া সহজ, কিন্তু ফেরা সহজ নয়। আজ রাতটা পেরিয়ে গেলে কাল কি সুজয়া আর বাড়ি ফিরতে পারবে? আজ রাতটার ওপরেই নির্ভর করছে সবকিছু।

মেয়েদের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে সুজয়া একটা পুরীর টিকিট কাটল। খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখল তার সুটকেসটা নেই। একটু আগে সে সুটকেসটা নিচে নামিয়ে রেখেছিল।

সুজয়া মুখ দিয়ে একটা আর্ত শব্দ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখ পড়ল একটু দূরে। একজন সাদা প্যান্ট-শার্ট পরা যুবক সুটকেসটা হাতে নিয়ে মিটিমিটি হাসছে। যুবকটি বলল, কী খবর, চিনতে পারছ?

সুজয়া চিনতে পেরেছে ঠিকই। সিটি কলেজের মর্নিং-এ যখন পড়ত সুজয়া, তখন এই ছেলেটি পড়াত ডে সেকশনে। কী যেন নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে সুশোভন। ওর বন্ধুরা বলত সুসোভন। মর্নিং কলেজ শেষ হওয়ার আগেই ওরা একটা দল মিলে দাঁড়িয়ে থাকত চায়ের দোকানটার সামনে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নানারকম অসভ্য কথা বলত। কোনওকিছুই ওদের মুখে আটকাত না। ওদের মধ্যে একটা ছেলে ছিল চণ্ডী। সেটাই সবচেয়ে অসভ্য। কী জ্বালাতনই যে করেছে। সামনাসামনি এসে কথা বলার সাহস নেই, শুধু দূর থেকে আওয়াজ! এই সুশোভনটা অবশ্য শেষের দিকে একটু নরম হয়ে গিয়েছিল, ও খুব প্রেমে পড়ে গিয়েছিল গায়ত্রীর। গায়ত্রী আর সুজয়া এক সঙ্গে ফিরত কলেজ থেকে। গায়ত্রীর রং ছিল ফরসা, সবাই সুন্দরী বলত তাকে—সেই গায়ত্রীর জন্যে এই সুশোভনই যে কত কাণ্ড করেছে। পেছনে-পেছনে আসত বাড়ি পর্যন্ত। দু-একদিন হাত কচলে গা মুচড়ে কথা বলতেও এসেছিল। গায়ত্রী শেষের দিকে একটু প্রশ্রয়ও দিত ওকে। তারপর পরীক্ষার আগেই ঝট্ করে বাড়ির পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করে চলে গেল কানপুর। সেসব তিনবছর আগেকার কথা।

সুজয়া এগিয়ে এসে বলল, আপনি আমার সুটকেস নিয়েছেন কেন?

সুশোভন হাসিমুখে বলল, ভাগ্যিস আমি নিয়েছিলুম। আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমার।

—কেন?

—তুমি কি পাগল! এটুকু জানো না যে হাওড়া স্টেশনে কেউ সুটকেস অন্য জায়গায় রেখে টিকিট কাটতে যায় না। এক্ষুনি তো হাপিস হয়ে যেত।

ছেলেটার কি সাহস, সুজয়াকে তুমি বলে কথা বলছে। সুজয়া বিরক্তভাবে একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হাতটা বাড়িয়ে বলল, দিন আমার সুটকেসটা দিন।

—আরে দিচ্ছি দিচ্ছি, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?

সুজয়ার মনে হল, এই সুশোভনটাই বোধহয় আজকাল হাওড়া স্টেশন থেকে সুটকেস চুরির পেশা ধরেছে। নেহাত চেনা মানুষ দেখেই পালিয়ে যায়নি।

—আমার ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—কোথায় যাবে?

—পুরী।

—পুরী? একা? আর কেউ আছে সঙ্গে?

—আর কেউ নেই। কেন, একা যেতে পারি না?

—সে কথা বলছি না। পারবে না কেন? আজকাল মেয়েরা সব কিছু পারে। মেয়ে প্রাইম মিনিস্টারের যুগে...

সুজয়া ওর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চায় না। এই সময় তার কোনও চেনা লোক দৈবাৎ এই অবস্থায় দেখে ফেললে নির্ঘাত ভাববে, সে এই সুশোভনের সঙ্গে ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছে। এই বখাটে ছেলেটা পেছনে লাগলে কতক্ষণে ছাড়বে কে জানে!

—পুরীতে কেউ আছে বুঝি?

সুজয়ার মুখে ঝট করে উত্তর এসে গেল। কিছু চিন্তা না করেই সে বলল, হ্যাঁ, পুরীতে আমার মামা থাকেন। আমি সেইখানে যাচ্ছি।

—আমার দিদি-জামাইবাবুও তো এই ট্রেনে পুরী যাচ্ছে। আমি ওদের তুলে দিতে এসেছি। এই দেখো না ওদের জন্যে কলা কিনে আনলাম।

এই বলে সে একছড়া কলা তুলে দেখাল। তারপর গর্বিতভাবে বলল, এই স্টেশনের ফেরিওয়ালারা একেবারে গলা কাটে লোকদের। আমাকে বলে কিনা এই কলাটা চার টাকা ডজন। জানে না তো, কার সামনে খাপ খুলতে এসেছে। দুটো টাকা ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, কোনওরকম টু ফাঁ শুনতে চাই না আমি—

ছেলেটার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যেই একটা বখাটেপনা আছে। এসব একদম ভালো লাগে না সুজয়ার। সে শুধু সুটকেসটা ফেরত পেলেই বাঁচে।

সুশোভন জিগ্যেস করল, তুমি কোনও খাওয়ার-টাওয়ার নাওনি?

—আমার কিছু দরকার নেই।

—রাত্তিরে ঠিক খিদে পাবে।

—আমি খেয়ে এসেছি।

—তা হলেও সঙ্গে কিছু রাখতে হয়। তোমার জন্যে কিছু কিনে আনব?

—বলছি তো দরকার নেই।

—ঠিক আছে, তুমি এর থেকে দুটো কলা খেয়ে নিও! দিদিকে বলে দেবো এখন।

সুজয়া বিরক্তি গোপন করতে না পেরে বলল, আঃ কী মুশকিল? কেন আমাকে জ্বালাতন করছেন। আমাকে সুটকেসটা ফেরত দিচ্ছেন না কেন?

—আরে খাপচুরিয়াস হয়ে যাচ্ছো কেন? আমি কিছু করেছি নাকি? চলো আমার দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। কদিন থাকবে?

—কী?

—পুরীতে ক'দিন থাকবে?

—ঠিক নেই।

—তিন-চারদিন বাদে আমিও যাচ্ছি। তখন দেখা হবে। চলো, ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই।

গেট পেরিয়ে ওরা চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। সুটকেসটা তখনও সুশোভনের হাতে। কয়েক পা হেঁটেই সুশোভন আবার থমকে দাঁড়াল। একটু চিন্তা করে বলল, তুমি তো টিকিট কাটলে দেখলাম।

তোমার রিজার্ভেশান স্লিপ আছে তো?

সুজয়া বলল, রিজার্ভেশান? না তো?

—তা হলে যাবে কী করে?

—কেন টিকিট কেটেছি, ট্রেনে উঠতে পারব না?

—একা-একা ট্রেনে ট্রাভেল করার শখ আছে, অথচ নিয়ম-কানুন কিছুই জানো না?

—আর কী নিয়ম আছে?

—টু টায়ার কিংবা থ্রি টায়ার কোনও কামরাতেই উঠতে পারবে না!

—তা হলে অন্য কামরায় উঠব।

—একেবারে চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে যাবে! জানো না তো।

—মেয়েদের জন্যে আলাদা কামরা নেই?

সুশোভন বেশ জোরে হি-হি করে হেসে উঠল। তারপর বলল, কোন যুগে বাস করছ? এ যুগে কেউ মেয়েদের খাতির করে? সব ভেড়ুয়া পুরুষ প্যাসেঞ্জারেরা আগেই মেয়েদের কামরায় উঠে বসে থাকে।

—আমি ভিড় কামরাতেই উঠব।

—দাঁড়াও, আমি ম্যানেজ করে দিচ্ছি। দাও পাঁচটা-টাকা দাও—

—এখন টাকা দিয়ে কী হবে?

আরে বাবা সিলভার টনিক দিলে সব কিছু ম্যানেজ করা যায়। এর নাম হাওড়া স্টেশন!

সুশোভন এমন ভাবে হাত বাড়িয়ে আছে যে সুজয়া আর তর্ক করতে পারল না। ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকা বার করে দিল। সুশোভন সেটা নিয়ে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে একজন রেল কর্মচারীর সঙ্গে কী যেন কথা বলতে লাগল। একটু বাদেই হাসিমুখে ফিরে এসে বলল, চলো, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে। এক কামরাতেই পেয়েছি।

যে কামরাতে সুশোভনের দিদি-জামাইবাবু ছিলেন, সেই কামরাতেই সে তুলে দিল সুজয়াকে। ওঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ওঁদের কাছে সে সুজয়ার পরিচয় দিল নিজের সহপাঠিনী বলে।

ট্রেন ছাড়তে আর দেরি ছিল না। জানলার পাশে পাশে অনেকটা দৌড়ে এল সুশোভন। তারপর ও বলল আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যাচ্ছি! দেখা হ—বে! দেখা হ—বে!

॥ ২ ॥

জানলার বাইরে চলন্ত অন্ধকার। ক্বচিৎ দু-একটা আলোর বিন্দু দেখা যায়। ট্রেন মাঝে-মাঝে পার হয়ে যাচ্ছে দু-একটা ঘুমন্ত স্টেশন—ছুটছে তো ছুটছেই।

ঘুম আসছে না সুজয়ার। কামরায় আর সবাই এখন গভীর ঘুমে। কতরকম ভঙ্গিতে শুয়ে আছে নারী-পুরুষ। সুজয়া উঠে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারের দিকে। কিছুই দেখবার নেই তবু সে চোখ ফেরাতে পারে না। যেন ওই দিকে তাকিয়ে সে তার ভবিষ্যতটা দেখবার চেষ্টা করছে।

পাশার দান পড়ে গেছে। সুজয়ার আর ফেরবার উপায় নেই। আর সে ফিরে যেতে পারবে না নিজের বাড়িতে। আজ থেকে তার ভাগ্য সম্পূর্ণ তার নিজের। সঙ্গে আছে সামান্য কিছু টাকা। গয়নাগুলো বিক্রি করলে বড়জোর দেড় হাজার টাকার মতন পাওয়া যেতে পারে। এই টাকায় কতদিন চলবে? টাকাই মানুষের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে। একটা কিছু করতেই হবে তাকে। কী করবে

সুজয়া? এই অচেনা পৃথিবীতে সে একা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে কেন? দেখাই যাক না, কী আর হবে, বড়জোর সে মরে যাবে। তার বেশি তো আর কিছু না। তবু হার মানবে না সুজয়া।

বাড়ির জন্যে তার একটুও দুঃখ হচ্ছে না। চব্বিশটা বছর যেখানে কাটিয়েছে তার জন্যে একটুও মায়া নেই। বাড়িটা একটা বন্দিশালা হয়ে উঠেছিল।

সুজয়ার মা মারা গেছেন দশ বছর আগে। তখন দুঃখ পায়নি সুজয়া। মায়ের মৃত্যুটা খুব স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিয়েছিল। তার আগে মা প্রায় দু-বছর অসুখে ভুগেছিলেন। শরীরটা একেবারে মিশে গিয়েছিল বিছানার সঙ্গে। বহু রকম চিকিৎসা করা হয়েছিল। একবার মাত্র মাস দুয়েকের জন্যে মাকে এনে রাখা হয়েছিল পুরীতে, তখন তিনি অনেকটা সুস্থ ছিলেন। স্থান পরিবর্তনের জন্যেই হোক কিংবা সমুদ্রের হাওয়ার জন্যেই হোক, বেশ উপকার হয়েছিল তাঁর। কিন্তু মাকে সারা বছর তো পুরীতে রাখা সম্ভব নয়। কে তার সঙ্গে থাকবে?

সুজয়ার বাবার একটা ছোটখাটো কার্ডবোর্ডের ব্যবসা আছে। ব্যবসার এখন পড়ন্ত অবস্থা। বাবাকে দিনরাত খেটেখুটে সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছে। মায়ের চিকিৎসার জন্যে তিনি বেশি সময় দিতে পারতেন না, কিন্তু টাকা পয়সা খরচ করেছেন সাধ্যমতন। মায়ের পক্ষে সেই সময় মরে যাওয়াই ঠিক হয়েছে। শুধু-শুধু বেঁচে থেকে অন্যদের কষ্ট দেওয়া।

কিন্তু দেখা গেল, মা বিছানায় শুয়ে থাকলেও ওই বাড়িতে তাঁর প্রভাব ছিল অনেকখানি। সমস্ত সংসারটা ছিল তাঁর অধীনে, তাঁকে জিগ্যেস না করে কোনও কাজই করা যেত না। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পরেই সংসারটা কীরকম ছন্নছাড়া হয়ে গেল। বাবা কোতরং থেকে এক পিসিমাকে আনিয়ে রাখলেন সংসার দেখাশুনো করার জন্যে। কিন্তু পিসিমা পুজোআচ্চা নিয়েই থাকেন। দাদা কিংবা বিজন তাঁর কথা একটুও শোনে না। ওরা ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়িয়ে ক্রমশ বখে যেতে লাগল। বাবা সারাদিন বাড়ি থাকে না, দেখবার কেউ নেই।

এর পর সমস্যা দেখা দিল সুজয়াকে নিয়ে। সুজয়ার দাদা অজয় পাড়ার মধ্যেই এমন গুন্ডামি করত যে লজ্জায় মাথা কাটা যেত সুজয়ার। গুন্ডা হিসেবে অজয়ের বেশ খ্যাতি রটে গিয়েছিল। বাবা তাকে নিজের ব্যবসাতে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন, সে রাজি হয়নি।

হঠাৎ অজয় একদিন বাড়িতে জানাল, সে বিয়ে করবে। পাত্রী সে নিজেই ঠিক করেছে। কথাটা বাবার কানে গেল। বাবা প্রথমে শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল যে পাত্রীর সঙ্গে তাদের জাত-টাতের মিল ঠিকই আছে। এবং মোটামুটি ভদ্র পরিবারের মেয়ে, ওর বাবা একজন রেলের ক্লার্ক। মেয়েটি পার্ট ওয়ান পাস। ওইরকম একটি মেয়ের সঙ্গে অজয়ের মতো একটি গুন্ডা ছেলের কী করে আলাপ পরিচয় এবং প্রণয় হল, সেটা একটা রহস্য। যাই হোক, সুজয়ার বাবা আপত্তি করার কোনও কারণ পেলেন না।

তবে, তিনি আপত্তি করলেন অন্যদিক থেকে। ঘরে সোমখ বোন থাকলে বড় ভাইয়ের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা উচিত নয়। আগে সুজয়ার বিয়ে দেওয়া দরকার।

সুজয়া তখন সদ্য কলেজে ভরতি হয়েছে, আঠারো বছর বয়েস। তাদের পরিবারের মধ্যে সেই-ই মোটামুটি পড়াশুনোয় ভালো। ভালো মানে ফার্স্ট সেকেন্ড হয় না, স্কলারশিপ পায় না, মোটামুটি পরীক্ষায় পাস করে যায়। তার চোখের সামনে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন।

তখন জোর চেষ্টা হল সুজয়ার বিয়ে দেওয়ার। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হয় না। বিয়ের পাত্রী হিসেবে সুজয়া আকর্ষণীয়া নয়। তার গায়ের রং কালো। ছেলেবেলায়, অর্থাৎ সুজয়ার বয়স বারো, তখন বিল্টু নামে তাদের পাশের বাড়ির একটি পনেরো বছরের ছেলে একদিন সন্ধেবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে বলেছিল, সুজয়া তুই কি সুন্দর। এমন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এমন টানা-টানা চোখ—। এইসব কথা বলতে বলতে বিল্টু সুজয়ার গালে ও পিঠে আলতো করে হাত ছোঁয়াচ্ছিল

আর অদ্ভুত এক মধুর আবেশে প্রায় বুজে আসছিল সুজয়ার চোখ। কিন্তু বিল্টু দু-বছর বাদেই গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়। তারপর থেকে সুজয়াকে কেউ কখনও সুন্দরী বলেনি।

সুজয়ার মাঝারি ধরনের চেহারা। সে কুৎসিতও না, রূপসিও না। তার স্বাস্থ্য ভালো, কখনও তার অসুখ করে না। কিন্তু এসব কোনও যোগ্যতা নয়। বিয়ের বাজারে মাঝারি ধরনের মেয়েকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়।

প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই সুজয়াকে সেজেগুজে দাঁড়াতে হত পাত্রপক্ষের সামনে। কেউ পছন্দ করে না। কেউ বা পছন্দ করলেও দরদামে বনে না। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দিলে অনেক টাকা খরচ করতে হয়, নইলে ঠিক মতন পাত্র জোটানো শক্ত। সুজয়ার বাবা বেশি টাকাও খরচ করতে পারবেন না। তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক করা যাচ্ছে না বলে বাড়ির সবাই বিরক্ত হয়ে উঠল।

বড় ভাইকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্যেই তার বোনকে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বিদায় করে দিতে হবে, এই ধারণাটা যে একটা মেয়ের পক্ষে কত অপমানজনক, তা কেউ ভেবে দেখে না। সুজয়া প্রত্যেক দিন রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদত। সেই সময় তার খুব মনে পড়ত মায়ের কথা।

তবু সুজয়া মুখে কোনও আপত্তি করেনি। তার ছেলেমানুষী হৃদয় এই অভিমানে উদ্বেল হয়ে উঠত যে, বাড়ির সবাই যখন তাকে তাড়িয়ে দিতেই চায়, আজ সে চলে যাবে। কানা, খোঁড়া, বুড়ো—যার সঙ্গেই তার বিয়ে দেওয়া হোক, সে চলে যাবে মুখ বুজে। তাতে যদি বাবা-দাদা খুশি হয়, তবে তাই হোক।

কিন্তু এরপর অন্য একটা অভিজ্ঞতায় তার মনটা বদলে গেল। তখনও সুজয়া কলেজে যাচ্ছে ঠিকই। কলেজের বান্ধবীকে সে বলেনি যে তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। তার বান্ধবীরা কেউ-কেউ প্রেমে পড়েছে, কেউ-কেউ বিয়ের ব্যাপারে সুন্দর স্বাস্থ্যবান ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের স্বপ্নে দেখে। সুজয়ার সঙ্গে কখনও যে-কোনও ছেলের আলাপ হয়নি, তা নয়। নানান জায়গায়, নানান সূত্রে দু-চারজন ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার। কিন্তু কেউ তাকে ভালোবাসেনি। ওরা তাকে চায়ের দোকানে কিংবা অন্ধকার ময়দানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সুজয়া রাজি হয়নি কখনও। সে বুঝতে পেরেছে, ওইসব প্রস্তাবের মধ্যে শুধু লোভ আছে, ভালোবাসা নেই।

একদিন কলেজের কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে সুজয়া লাইট হাউসে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল ইভিনিং শোতে। সিনেমা দেখে বেরুবার পর ওদের এক বান্ধবী শিপ্রার দূর-সম্পর্কের এক মাসতুতো দাদা (কিংবা প্রেমিক) হঠাৎ উপস্থিত হল সেখানে। শিপ্রা সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সেই দাদাটা তো কিছুতেই ছাড়বে না, তার সঙ্গে চা খেতেই হবে। সুজয়ার ভয় করছিল বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে বলে। কিন্তু কেউ তার আপত্তি গ্রাহ্য করল না।

চা খেতে খেতে বৃষ্টি নামল। সে কি সাংঘাতিক বৃষ্টি। মনে হয় যেন কলকাতা শহরটা একেবারেই ডুবে যাবে। যাই হোক, প্রায় একঘণ্টা বাদে তো বৃষ্টি থামল, কিন্তু তখন গাড়িঘোড়া প্রায় সব অচল হয়ে গেছে। মেয়েরা ভয়ে অস্থির। শিপ্রার সেই দাদা অবশ্য দৃঢ়ভাবে ভরসা দিতে লাগল যে সে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে সবাইকে ঠিক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

একটি গাড়িবারান্দার নিচে ওরা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাদাটি হন্যে হয়ে খুঁজছে ট্যাক্সি। এমন সময় সুজয়ার চোখে পড়ল একটু দূরে আর একটি মেয়ের দিকে। মেয়েটি বেশ সাজগোজ করেছে, ঝলমলে শাড়ি পরা, একটা থামের পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে, মুখটা বিষণ্ণ।

সুজয়া তার বান্ধবীদের বলল, দ্যাখ, ওই মেয়েটাকে দ্যাখ, নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়েছে।

সকলেই কৌতূহলী হয়ে সেই মেয়েটির দিকে তাকাল। ওদের মধ্যে অর্চনা নামের একটি মেয়ের মন খুব নরম। সে বলল, ইস, এত রাত্রে একা কী করে বাড়ি ফিরবে? বোধহয় কারুর

আসবার কথা ছিল—

শিপ্রা বলল, ওকেও নিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে?

শিপ্রার দাদা শুনতে পেয়ে বলল, কাকে?

সে সেই মেয়েটির দিকে এক পলক তাকাল। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, তোমরা ওর দিকে তাকিও না।

সবাই অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, কেন?

—বলছি তো তাকাতে হবে না।

সুজয়া তবু জিগ্যেস করল, কেন? কী হয়েছে?

—ও খারাপ মেয়ে!

—খারাপ মেয়ে? তার মানে?

—কী মুশকিল, সব কথা তোমাদের জানতে হবে? বেশ্যা কাকে বলে জানো না? ও তো একটা রাস্তার বেশ্যা, লোক ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের সকলের মুখ বিহ্বল হয়ে গেল। সদ্য কলেজে কচি-কচি মেয়ে, রূঢ় বাস্তবের অনেক কিছুর সঙ্গেই ওদের পরিচয় নেই। যেন ওদের বুকে ধক করে লাগল। যেন এক অসম্ভব পাপ ও অন্যায়কে ওরা এত কাছ থেকে দেখছে। এই পাপের হাওয়া ওদের গায়ে লাগতে পারে।

সুজয়ার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম। সে চুম্বাকৃষ্টের মতন তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তার সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ওই মেয়েটি প্রায় তারই বয়সি হবে। সে সেজেগুজে এত রাত্রে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে, যদি কোনও পুরুষ তাকে পছন্দ করে নিয়ে যায়। সুজয়া ওর মধ্যেই দেখতে পেল, দু-একজন লোক মেয়েটির কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছে, তারপর আবার চলে যাচ্ছে। বোধহয় ওদের পছন্দ হচ্ছে না কিংবা দামে বনছে না। মেয়েটি কতক্ষণ ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? রাত শেষ হয়ে গেলেও কেউ যদি তাকে পছন্দ না করে?

সুজয়ার ঠোঁট দুটো শুকনো হয়ে গেছে, নিশ্বাস পড়ছে খুব আস্তে আস্তে। জীবনে সে কখনও এত ভয় পায়নি। এক সাংঘাতিক উপলব্ধি হঠাৎ সেই মুহূর্তে তার সরল জীবনটা তছনছ করে দিল। তার অবস্থাও কি ঠিক ওই পণ্যা মেয়েটির মতো নয়? সে তো প্রতি সপ্তাহে একবার সেজেগুজে তাদের বাড়িতে একগাদা পুরুষের সামনে দাঁড়ায়। সেই পুরুষেরা তাকে কিনবে কিনা যাচাই করে দেখে। তারপর পছন্দ না করে চলে যায়। ওই মেয়েটির সঙ্গে তার তফাত? কোথায় তফাত? এই উত্তর তাকে জানতেই হবে। না জানলে সে আর বাঁচতে পারবে না।

সেই রাত্রেই সুজয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার অভিজ্ঞতা ছিল না কিংবা মাথাও ঠান্ডা ছিল না। ঘুমের বড়ি জোগাড় করলে কিংবা কেরোসিন দিয়ে কাপড়ে আগুন ধরালে সে সার্থক হতে পারত না বটে, তবে সে কথা তার মনে পড়েনি। তাড়াহুড়োতে একগাদা দড়ি জোগাড় করে সে ঘরের কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলে পড়েছিল। দড়িগুলো মজবুত ছিল না, সঙ্গে-সঙ্গে ছিঁড়ে পরে যায়। সেই হুড়মুড় শব্দে বাড়ির সব লোক ছুটে এসেছিল, লাথি মেরে দরজার খিল ভেঙে প্রথম ঘরে ঢুকেছিল তার দাদা।

সেদিন সুজয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরায় বকুনি খেয়েছিল বাড়ির সকলের কাছে। তারপর আত্মহত্যার চেষ্টায় সবাই ধরে নিয়েছিল, সে নিশ্চয়ই বাইরের কোনও ছেলের সঙ্গে নটঘট বাধিয়েছে। তাকে সেবা করার বদলে তার পিসিমা আর দাদা তাই খোঁটা দিয়ে বকুনি দিতে লাগল আরও। একমাত্র বাবার মনটা একটু নরম হয়ে পড়েছিল এই আচমকা ঘটনায়। হাজার হোক তাঁর মেয়ে, একসময় বাচ্চা বয়েসে তো কোলে-পিঠে করে আদর করেছেন একে—এর কী দুঃখ তা তিনি বুঝতে পারলেন না যদিও, তবু বিচলিত হয়ে পড়লেন বেশ। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি মেয়ের মাথায়

হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন খুকি, তোর কী হয়েছে আমায় বল তো। আমায় বল।

সেই স্নেহের স্পর্শে সুজয়ার দুঃখ ও অভিমান ফেটে পড়েছিল একেবারে। সে পাগলের মতন মেঝেতে গড়াতে গড়াতে বলেছিল, তোমরা আমাকে মেরে ফেলো! আমাকে মেরে ফেলো! আমি মরে গেলেই তো তোমরা সবাই বাঁচো!

সেই ঘটনার পর সুজয়ার বিয়ের চেষ্টা কিছুদিন চাপা পড়েছিল। তার দাদা আর অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি। বাবাও আর অমত করেনি। বিয়ে হয়ে গেল পরের মাসেই। নতুন বউ দীপা দুদিনেই সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসল।

ওই ঘটনায় সুজয়ার একটা লাভ হয়েছিল। মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরে আসার ফলে জীবন সম্পর্কে তার সাহস বেড়েছে। সে আর কখনও আত্মহত্যার চেষ্টা করবে না। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি পৃথিবীর ওপর তার কোনও অধিকার নেই? কোনও মানুষ বা কোনও অসুখ যদি তাকে হঠাৎ মেরে না ফেলে, তা হলে কিছুতেই সে আর তার জীবনের দাবি ছাড়বে না।

বিয়ের পর সুজয়ার দাদা অজয় গুন্ডামি অনেকটা ছেড়ে দিল। তার শ্বশুর তাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে এক মাড়ওয়াড়ি কোম্পানিতে। চাকরির পদটি সামান্য হলেও রোজগার বেশ ভালো। এ ছাড়া সকালে সে হেদোতে ছোট ছেলেদের সাঁতার শেখায়। পাড়ার লোক এখন আর তাকে ভয় না করলেও সমীহ করে। বিপদে আপদে তার সাহায্য চায়।

ছোট ভাই বিজন ঠিক গুন্ডামির দিকে না গেলেও সে মেতে উঠল রাজনীতি নিয়ে। রাজনীতি মানে যেসব বুদ্ধিহীন কাণ্ড আজকাল চলছে তাই। অর্থাৎ স্লোগান, মিছিল, দলাদলি, অপর দলের ছেলেদের সঙ্গে লড়াই, যে ছেলে বরাবর অঙ্কে কাঁচা, ইংরেজি বা বাংলা কোনও ভাষাই ভালোভাবে জানে না, সেই তখন হঠাৎ ছাত্রনেতা হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময়েই বিজন বাড়িতে থাকে না, রাজনীতি করে সে পয়সাও পায় মনে হয়, কেন না তার হাতখরচের কোনও অভাব নেই।

সুজয়ার বউদি দীপা তার থেকে মাত্র তিন বছরের বড়। প্রথম দিকে তার সঙ্গে খুব ভাব ছিল সুজয়ার। দুজনে প্রায় সমবয়েসি বন্ধুর মতন, সারাদিন ধরে কতরকম গল্প! দীপা সামান্য একটু অহংকারী হলেও তার মনটা তেমন জটিল নয়। সেসব খাওয়ার সুজয়ার সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে খায়, তার নতুন শাড়ি পরতে দেয়। তার মনে স্নেহ দয়া মায়া আছে।

কিন্তু দীপার একটি মাত্র দোষ, অন্য কারুর মতামত শোনার মতন তার ধৈর্য নেই। সে একটা ছোটখাটো মেয়ে অটোক্রাট। সে যা বলছে, অন্যদের তা শুনে চলতে হবে। তা যত ছোটখাটো ব্যাপারই হোক। যেমন, দীপা হয়তো একদিন ঠিক করল, সুজয়াকে একটা সিনেমা দেখাবে। সে যে ছবিটা দেখাতে চায়, যদি সুজয়া সেটা আগেই তার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখে থাকে তাহলেই দীপা চটে লাল হবে। কেন সুজয়া সেটা আগে দেখেছে? কোনও যুক্তিই সে মানবে না। কিংবা সুজয়াকে এক বান্ধবী তার জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেছে, আর সেদিনই দীপা নিজে মাংস রেঁধেছে বাড়িতে। তা হলে আর সুজয়ার নেমন্তন্ন যাওয়া হবে না। সুজয়া যদি বলে, বউদি, আমি শুধু একবারটি ঘুরে আসছি, ওখানে কিছু খাবো না, বাড়িতে এসে খাবো তাতেও রেগে যাবে দীপা। যেন সেদিন দীপাকে অবজ্ঞা করার জন্যেই সুজয়া নেমন্তন্ন নিয়েছে। এই ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে মতবিরোধ হয়। এক এক সময় অসহ্য হয়ে উঠেছে সুজয়ার কাছে। সে এমন কথা ভেবেছে, বউদি যদি দু-বেলা খেতেও না দেয়, তবু তার এত কষ্ট হবে না। নিজের সমস্ত মতামত কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে খেতে না পাওয়ার কষ্ট অনেক কম। সে কোনওদিন বাইরে বেরুবার সময় কী রঙের শাড়ি পড়বে, তাও ঠিক করে দীপা। দীপা হয়তো নিজেরই একটা দামি শাড়ি নিয়ে বলবে, আজ এটা পরে যাও। সুজয়া যদি সামান্য একটু আপত্তি করে, অমনি তার মুখ ভার। সেদিন আর ভালো করে কথাই বলবে না।

অর্থাৎ দীপা মনে করে, সে এই বাড়ির বড় ছেলের বউ, এই সংসারের কর্ত্রী। তা হলে সবাই তার কথা শুনে চলবে না কেন? বছর খানেকের মধ্যেই তার মতামতের আধিপত্যে বাড়ির সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এমন কি বুড়ি পিসিমা পর্যন্ত। শুধু বাবার সামনে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে দীপা। বাবা যে-টুকু সময় বাড়ি থাকেন, তখন তাঁর সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি করে না দীপা। তিনি বুঝতেও পারেন না যে প্রায়ই বাড়ির অনেকের সঙ্গে দীপার কথা বন্ধ থাকে। বিজন তো একবার এমন ঝগড়া করল বউদির সঙ্গে যে তারপর থেকে ওরা দুজনে আর মুখোমুখি কথা বলে না।

অজয়ের রোজগার দিনদিন বাড়ছে। ইচ্ছে করলে অজয় দীপা আলাদা সংসার করে থাকতে পারে। কিন্তু তা ওরা যাবে না। কেন যাবে? এটা অজয়ের পৈতৃক বাড়ি। এ বাড়িতে তার অংশ আছে। তার অধিকার ছেড়ে দিয়ে সে কেন অন্য জায়গায় থাকতে যাবে ভাড়া গুনে? বিজনও এই কারণেই কখনও বাড়ি ছাড়বে না।

শুধু সুজয়া দিনরাত ছটফট করত ওই বাড়িতে। তার কোনও টান নেই বাড়ির ওপরে। দিন-দিনই বাড়ির পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সারাদিন বাইরে কাটাবার পর এক সময় বাড়িতে ফেরার জন্যে একটা কিছু তো আকর্ষণ থাকা দরকার? সুজয়ার সেরকম কিছু নেই।

সুজয়া বি.এ. পাশ করার পর এম.এ. পড়তে চেয়েছিল, বাবা আর রাজি হলেন না। বেশি লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের চেহারা শুকনো আমসির মতন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের জাতের মধ্যে বেশি লেখাপড়া জানা ছেলে নেই, এম.এ. পাস মেয়ের জন্যে পাত্র পাওয়া যাবে কোথায়? এর চেয়েও বড় কারণ, এম.এ. পড়তে গেলে একটা বাড়তি খরচ আছে না? কে দেবে? ব্যাবসার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সুজয়া বি.এ.-তে রেজাল্ট খুব ভালো করেনি, মোটামুটি পাসকোর্সে বেরিয়ে এসেছে। সে খোঁজ নিয়ে দেখল তার পক্ষে এম.এ. ক্লাসে ভরতি হওয়া এমনিতেই শক্ত।

তখন তার মুক্তির একমাত্র উপায় চাকরি। কিন্তু চাকরি পাওয়াও তো সহজ নয়। তার বাবা মেয়ের চাকরি করা পছন্দ করেন না। একটা ভালোমতন চাকরি পেলে সুজয়া আলাদাভাবে অন্য কোথাও গিয়ে থাকত। তাও কলকাতায় সম্ভব নয়। তাদের পুরোনো রক্ষণশীল পরিবার, বহু আত্মীয়স্বজন কলকাতায় ছড়ানো। তারা কেউ সুজয়াকে আলাদা থাকতে দেবে না। সুজয়ার একার বদনামে তাদের বংশের সকলের যে বদনাম। সুজয়ার দাদা গুন্ডামি করলে কারুর বদনাম হয় না কিংবা প্রতিকার করার সামর্থ্য নেই, কিন্তু একটি মেয়ে আলাদা থাকলেই সকলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের পরিবারে একটা নিয়ম-রীতি তো আছে। সেই নীতি যে ঠিক কি, তাও কেউ পরিষ্কার বলতে পারে না। শুধু কতকগুলো বদ্ধমূল কুসংস্কার।

সুজয়া মাত্র তিনমাসের জন্যে একটি ইস্কুলে টেম্পোরারি ভেকেন্সিতে কাজ করেছিল গোপনে। সেই সময় কিছু টাকা জমিয়েছে। তারপর অনেক চেষ্টা করেও আর কোনও চাকরি পায়নি। সে যদি বিহার, উড়িষ্যা-আসামের কোনও গ্রামের স্কুলে মাস্টারি পেত, তা হলেও লুকিয়ে সেখানে চলে যেতে পারত। সেরকম অনেক দরখাস্ত পাঠিয়েছে, একটারও উত্তর আসেনি।

এর মধ্যে আবার উৎপাত আরম্ভ হয়েছিল, আবার পুরোদমে শুরু হয়েছিল তার বিয়ের চেষ্টা। একটি মাঝারি পরিবারের মাঝারি চেহারার চব্বিশ বছরের মেয়ে সম্পর্কে সকলের মনে শুধু একটাই চিন্তা আসে কবে তাকে বিয়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। কতরকম পাত্রপক্ষ যে এল তাকে দেখতে। এক জায়গাতে তো মোটামুটি ঠিকই হয়ে গিয়েছিল বিয়ে। পাত্র নিজে দেখতে এসে রাজি হয়ে গেল। মোটামুটি নাদুস-নুদুস চেহারার একজন লোক, বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, তার নিজের কিসের যেন সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আছে। দাবি-দাওয়া নিয়ে দর কষাকষি করতে

লাগল ঝানু ব্যবসায়ীদের মতন। দুটি গডরেজের আলমারি আর একটা স্কুটার তাকে দিতেই হবে। রাত্রিবেলা খাওয়ার ঘরে বসে বাবা, অজয় আর দীপার সঙ্গে আলমারি ও স্কুটার নিয়ে আলোচনা করেন। দূর থেকে তাই শুনে সুজয়া লজ্জায় আর ঘৃণায় মরমে মরে যায়।

শেষ পর্যন্ত বাবা যখন প্রায় রাজি হয়ে গেলেন, তখন সুজয়া গোপনে একটা চিঠি লিখল সেই পাত্রটিকে। তাকে জানাল যে আমি বিয়ের জন্যে এখন প্রস্তুত নয়, আপনি আরও অনেক ভালো মেয়ে পাবেন, আপনি এ বিয়েতে রাজি হবেন না। গুণধর পাত্রটি এই চিঠির কথা জানিয়ে দিল সুজয়ার বাবাকে, আরও কী-কী অপমানকর কথা বলেছিল কে জানে, বাবা একেবারে রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরলেন। সারা বাড়িতে এক তুমুল কাণ্ড। লাঞ্ছনার আর শেষ রইল না। সুজয়া মুখ বুজে সব সহ্য করল।

সুজয়া কি বিয়ে করতে চায় না? তার কি ইচ্ছে হয় না কোনও পুরুষের সঙ্গিনী হতে? কতদিন মাসিক পত্রিকা বা কোনও গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে সুজয়ারও মনে হয়েছে, গল্পের নায়কের মতো একজন পুরুষ তার পাশে এসে বসেছে তার হাতটা তুলে নিয়েছে নিজের হাতে, ফিসফিস করে কানের কাছে বলেছে কোনও স্নেহময় কথা। আর সব মেয়ের মতন সুজয়াও তো ভালোবাসার কাঙাল। কত সময় তার শরীর কারুর আদর পাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে থেকেছে। কেউ তো আসেনি সেরকম।

ছেলেবেলায় সুজয়া পুতুল খেলত। তখন থেকেই সুজয়া স্বপ্ন দেখেছে, একদিন তার একটা ছেলে হবে। সেই ছেলেকে নিয়ে পুতুলের মতো আদর করবে। কোনও একটা সংসার সে সাজাবে নিজের হাতে। সেখানে সে বসে থাকবে একজনের প্রতীক্ষায়। সেই একজন শুধু তার আকর্ষণে ফিরে আসবে বাড়িতে। সেরকম কিছু তো হল না তার জীবনে।

যে লোকটা সুজয়াকে বিয়ে করতে রাজি হল, তার কাছে সুজয়ার চেয়ে আলমারি আর স্কুটারের দাম অনেক বেশি। ওই দুটি না পেলে সে সুজয়ার বদলে অন্য একজনকে বিয়ে করবে অনায়াসে। আলমারি ও স্কুটারসমেত সুজয়া ওই লোকটির বাড়িতে গেলে কি শান্তি পেতে পারত? শুধু তার মনোরঞ্জন করে সারাজীবন কাটিয়ে যাওয়া।

না, সুজয়া আর পারছিল না। সে মুক্তি চেয়েছিল। এ অপমান ও গ্লানির জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। সে ইচ্ছেমতন বাঁচতে চায়। সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কি ইচ্ছেমতন বাঁচতে পারবে না? তাই সে বেরিয়ে পড়েছে। যা হয় হোক! যা ছিল, তার চেয়ে আর খারাপ কি হবে?

সুজয়া এক সময় চমকে উঠল। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। এ কান্না তো দুঃখের নয়, ভয়েরও নয়। নিজের জীবনের কথা ভাবতে গেলে বুঝি এমনই হয়।

চোখের জল মুছে সে তাকিয়ে দেখল, কামরার সবাই এখনও ঘুমন্ত। ট্রেনটা এইমাত্র কি একটা স্টেশন ছেড়ে গেল। রাত এখনও অনেক বাকি। সুজয়া শুয়ে পড়ল এবার। শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখতে লাগল অনেকগুলি ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ। এরা সবাই জানে যে কোথায় যাবে, আবার কোথায় ফিরবে। শুধু সুজয়াই আর ফেরার পথ রেখে আসেনি।

॥ ৩ ॥

সুশোভনের দিদিই জাগিয়ে তুললেন সুজয়াকে। সুজয়া চোখ খুলে দেখল একটি গোলমতন সুন্দর মুখ তার মুখের কাছে ঝুঁকে আছে। সুশোভনের দিদি পূরবী বললেন, কী উঠবে না? আর মাত্র দুটো স্টেশন বাকি।

সুজয়া ধড়মড় করে উঠে বসল। কামরায় আর সবাই জেগে গেছে। ইস, এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল, সকলে নিশ্চয় তাকে দেখছে। এত লোকের চোখের সামনে ঘুমিয়ে থাকার কথা ভাবলেই যেন কীরকম লাগে।

ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে একটা স্টেশনে। পূরবীর স্বামী দেবকুমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চা-ওয়ালার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এক ভাঁড় চা সুজয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নিন। চা খেয়ে নিলে ঘুম কেটে যাবে।

পূরবী বলল, দাঁড়াও, আগে মুখ-টুক ধুয়ে আসুক। মুখ না ধুয়েই চা খাবে কি!

দেবকুমার বললেন, মুখ ধোওয়ার আগে চা খেলে কোনও দোষ হয় না। লোকে বেড টি খায় না? ভোরবেলা এই ভাঁড়ের চা হচ্ছে রেলের বেড টি!

সুজয়া বলল, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।

দেবকুমার তবু জোর করে বলল, আরে নিন-নিন। আমিও তো মুখ না ধুয়েই চা খাচ্ছি।

পূরবী বললেন, সবাই বুঝি তোমার মতন!

এবার ট্রেন ছেড়ে দিলে অনেকক্ষণের মধ্যে আর চা পাওয়া যাবে না।

সুজয়া হাত বাড়িয়ে চা-টা নিল। আড়চোখে দেখল, দেবকুমার চায়ের দাম দিয়ে দিলেন। সুজয়া ঠিক বুঝতে পারল না, তার চায়ের দামটা তারই দেওয়া উচিত কিনা। ব্যাগটা একবার হাত দিল, কিন্তু পয়সা বার করা আর হল না, চা-ওয়ালা এরমধ্যেই চলে গেছে।

দেবকুমার বললেন, সুশোভন বলে গেল, ওকে দেখাশুনা করতে, আমরা তো কিছুই করলাম না।

পূরবী বললেন, রাত্তিরে তো ওকে অনেক করে খেতে বললাম, কিছুতেই খেল না।

সুজয়া লাজুকভাবে হেসে বলল, আমি খেয়ে এসেছিলাম। একেবারে খিদে ছিল না।

দেবকুমার বললেন, প্ল্যাটফর্মের একটা স্টলে জিলিপি ভাজছে, গরম জিলিপি দারুণ জমবে, আপনি মুখটা ধুয়ে আসুন আমি চট করে নিয়ে আসছি।

সুজয়া তার হাতব্যাগটা নিয়ে চলে গেল বাথরুমে। সে ব্রাশ কিংবা টুথপেস্ট কিছুই আনেনি। বাড়ি থেকে চলে আসার কোনও প্রস্তুতিই তার ছিল না। সকালবেলা দাঁত না মাজলে বড় বিচ্ছিরি লাগে। অনেক কিছু কিনতে হবে।

সুজয়া জল দিয়ে বারবার কুলকুচো করল মুখ। পেটে খিদে চিনচিন করছে। কাল বিকেলে বাড়ি থেকে আসবার আগে এক কাপ চা ও দুটো বিস্কুট খেয়ে এসেছিল শুধু, তারপর সারা সন্ধে ও রাত্তিরে কিছু পেটে পড়েনি। সুশোভনের দিদি-জামাইবাবু অনেক সাধাসাধি করেছিলেন, সুজয়া লজ্জায় কিছু নেয়নি। ওঁরা সাধাসাধি করেছিলেন বলেই সে নিজেও কিছু কিনে খেতে পারেনি।

সুশোভনের দিদি-জামাইবাবু দুজনেই ভারি চমৎকার মানুষ। এটা একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সুশোভনটা একটা চ্যাংড়া, বখা ছেলে, পড়াশুনোয় ভালো না, মেয়েদের বিরক্ত করাই যার প্রধান কাজ—তার দিদি জামাইবাবু এত ভালো হয় কী করে। কিংবা যার আত্মীয়স্বজন এমন সভ্য ভদ্র সে ছেলে এমন বখাটে হয় কেন? সুশোভনের দিদির কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়, উনি বেশ পড়াশুনো করেছেন। আর দেবকুমারবাবু তো কলেজের অধ্যাপক। তবে, অধ্যাপক শুনলেই যে প্রায় ঠান্ডা নিরীহ মানুষের কথা মনে হয়, উনি সেরকম একটুও নয়, রীতিমতো ছটফটে প্রাণখোলা মানুষ। ওদের একটি দুবছরের বাচ্চা ছেলে আছে। দেখলেই মনে হয়, ওরা সুখী। ওরা কি নিজেদের নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করেছে? দেবকুমারের গায়ের রং কালো, ছিপছিপে লম্বা চেহারা। ছেলেরা কালো হলে কিছু আসে যায় না।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে সুজয়া আবার নিজের জায়গায় বসল। দেবকুমার মস্ত এক ঠোঙা

জিলিপি নিয়ে এসেছেন, তাঁর হাতে রসে মাখামাখি। ওঁদের ছেলে বাবলু, 'আমায় জিলিপি দাও' 'আমায় জিলিপি দাও' বলে লাফালাফি করছে বাবার সামনে।

পূরবী একটা প্লেটে চার-পাঁচখানা জিলিপি এগিয়ে দিলেন সুজয়ার দিকে। সুজয়া বলল, আমি নিচ্ছি, পরে নিচ্ছি, আপনি বাবলুকে আগে দিন।

দেবকুমার বলল, ও এর মধ্যেই তিনটে খেয়ে ফেলেছে। দিচ্ছি আর টপাটপ করে মুখে পুরে ফেলছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, না হলে ও আর কারুকে খেতে দেবে না।

সুজয়া নিজের প্লেট থেকে একটা তুলে দিল বাবলুকে। বাবলু সত্যিই একসঙ্গে মুখে পুরে দিল পুরো জিলিপিটাই। তার কচি গালটা ফুটে উঠল বলের মতন। শুধু ওরা তিনজনই নয়, কামরার আরও অনেকে হেসে উঠল বাবলুকে ওই অবস্থায় দেখে।

বাবলু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড় মারল কামরার অন্যদিকে। তাকে সামলাবার জন্যে দেবকুমার চলে গেলেন সেদিকে।

পূরবী বললেন, বড্ড দুষ্টু ছেলে, সারাদিন যা জ্বালাতন করে।

সুজয়া বাবলুর দিকে চোখ রেখে মুগ্ধভাবে বলল, কী সুন্দর!

অনেক মা-ই নিজের সন্তানের প্রশংসা শুনলে একেবারে গদগদ হয়ে ওঠেন। নিজেরাই তারপর ছেলের গুণপনার সাতকাণ্ড ব্যাখ্যান করতে বসে যান। কিন্তু বুদ্ধিমতী মহিলারা এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান।

পূরবী বললেন, পুরীতে কোন জায়গায় তোমার মামার বাড়ি?

তাড়াতাড়ি আর কোনও জায়গার নাম মনে এল না সুজয়ার। সে বলল, স্বর্গদ্বার।

—স্বর্গদ্বার? যে-দিকটা শ্মশান?

—হ্যাঁ, ওই দিকের রাস্তাতেই।

—তোমার মামারা কি এখানে অনেকদিন আছেন? এইখানেই কাজ-টাজ করেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আমার মামা এখানে কাজ করেন।

—বাঃ, তাহলে তো তোমাদের চমৎকার একটা বেড়াবার জায়গা আছে। তোমরা প্রায়ই আসো।

সুজয়ার মুখে একটা হালকা ভয়ের ছায়া পড়েছে। তার মিথ্যে কথা বলা তেমন অভ্যেস নেই। সেই যে সুশোভনকে একবার টপ করে বলে ফেলেছিল পুরীতে তার মামার বাড়ি আছে, তারপর থেকেই এই কাল্পনিক মামাবাড়ির প্রসঙ্গটা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

মনে-মনে নিজের ওপর রেগে গেল সুজয়া। কেন তাকে এরকম মিথ্যে কথা বলতে হবে? সে কি পরিষ্কার বলতে পারত না যে মামা-টামা কেউ নেই, সে একাই পুরীতে বেড়াতে যাচ্ছে! এতে অস্বাভাবিক কী আছে? একটা ছেলে যদি একা বেড়াতে যেতে পারে, একটি মেয়ে কেন পারবে না?

কিন্তু এ কথা যে বলতে পারেনি, সেটা তো সুজয়ার নিজেরই দুর্বলতা। একটা মিথ্যে কথার জন্যে এবার অনেক মিথ্যে কথা চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এখন কি দুম করে বলতে পারে. এতক্ষণ আমি ভুল বলেছি, আমি মামার বাড়ি যাচ্ছি না?

পূরবী বললেন, আমরা একটা ভাড়া বাড়ি নিয়েছি, পুরী হোটেলের পেছন দিকে। তুমি এসো কিন্তু আমাদের ওখানে।

—নিশ্চয়ই আসব।

—তুমি কতদিন থাকবে?

—ঠিক নেই। আট-দশদিন।

আমরাও দিন পনেরো থাকব ঠিক করে এসেছি। দু-চারদিন পরে আরও কয়েকজন আসবে। তুমি নিশ্চয়ই পুরীর সব কিছু চেনো, আমাদের একটু চিনিয়ে দিও।

—হ্যাঁ, আমি তো আসছিই আপনাদের ওখানে।

সুজয়া আরও লজ্জা পেতে লাগল। এই সময় তারও বলা উচিত ছিল আপনারাও আসবেন আমার মামার বাড়িতে। কিন্তু এই পৃথিবাতে সুজয়ার একটিও মামা নেই। পুরীতে সে একজনকেও চেনে না।

শুধু কি মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে তাও নয়। তাকে সুশোভনের সাহায্যও নিতে হয়েছে। সুশোভন সিট রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা না করে দিলে সে এরকম আরাম করে আসতে পারত না। সুজয়া কি নিজের সমস্ত ভার নিজে নিতে পারে না?

ট্রেন মাত্র দেড়ঘণ্টা লেট করে পুরীতে এসে পৌঁছল। পূরবী আর দেবকুমার সুজয়ার সঙ্গে একসঙ্গেই যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলাদা-আলাদা সাইকেল রিকশা নিতে হল, বিকেলবেলাই দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুজয়া এগিয়ে গেল।

পুরী হোটেল সুজয়া চেনে, তার অনেক দূরে তাকে থাকতে হবে। যত দূরেই থাকুক, এত ছোট্ট শহরে সকলের সঙ্গেই সকলের দেখা হয়ে যায়। পূরবীরা জানতে ঠিকই পারবে, সুজয়া কোথায় উঠেছে। যাক পরে যা হয় হবে।

একটা ছোট্ট হোটেলের সামনে সুজয়ার রিকশা থামল। হোটেলটা বাঙালির। অফিস ঘরে মালিক বা ম্যানেজার কেউ নেই, একজন পরিচারক-শ্রেণির লোক বসেছিল, সুজয়া তাকে ঘরের কথা বলতেই সে আগ্রহে তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘর খুলে দিল। ছোট হলেও মোটামুটি ছিমছাম পরিচ্ছন্ন, জানলা খুললেই সমুদ্র দেখা যায়, ভাড়া মাত্র বারো টাকা। সুজয়ার পছন্দ হয়ে গেল।

পরিচারকটি বলল, আমার নাম ঘনশ্যাম, দিদিমণি! যখন যা দরকার হয়, একটিবার ডাকবেন—

সে চলে যাওয়ার পর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সুজয়া। একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। আজ ওই ঘরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কারুর কিছু বলার নেই। ইচ্ছে করলে সে দিনের-পর-দিন এই ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারে, কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসবে না।

কিন্তু না, তা সম্ভব নয়। সে খরচ চালাবে কী করে? যা সামান্য টাকা আছে, ক'দিনেই ফুরিয়ে যাবে। তারপর?

সুজয়া এসে বারান্দায় দাঁড়াল। সামনে বিশাল সমুদ্র। যতই ভূগোল পড়া থাক, তবু সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে মনে হয়, এর কোনও ওপার নেই। মানুষ জানে, সমুদ্রের সবচেয়ে বেশি গভীরতা বড় জোর ছ'মাইল কি সাড়ে ছ'মাইল। তবু সমুদ্র দেখলেই অতল সমুদ্র—এই কথা মনে আসে।

বেলা দশটা সাড়ে দশটা বাজে। এরই মধ্যে বহুলোক স্নান করতে নেমেছে। হাজার-হাজার নারী-পুরুষের আনন্দ কলরব ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়েও কানে ভেসে আসে। ছেলেবেলায় সুজয়া যখন পুরীতে এসেছিল, তখন এক-একদিন দু-ঘণ্টা তিনঘণ্টা ধরে স্নান করেছে। কি ভালোই যে লাগত! উঠতে কিছুতেই ইচ্ছে করত না, বাবার বকুনির চোটে উঠতে হত। এখন সে যতক্ষণ খুশি চান করতে পারবে—কেউ তাকে নিষেধ করার নেই।

কিন্তু—। আবার সুজয়ার মনে একটা খটকা লাগল। সে একা কি করে স্নান করতে যাবে? এই যে এত মানুষ জলে দাপাদাপি করছে, এর মধ্যে কেউ কি একা আছে? সে একা-একা জলে নামলেই সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে না?

হঠাৎ এই একাকীত্ববোধ সুজয়াকে বিমর্ষ করেছিল। এখন থেকে সব কিছু একা করতে হবে। নিজের মনের কথাও কারুকে খুলে বলতে পারব না? যদি তার সঙ্গে অন্তত আর একজন কেউ থাকত—না, কোনও ছেলে, আর একটি মেয়ে—যে তার মতন স্বাধীন থাকতে চায়, তাহলে দুজন মিলে সব কাজই অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু সুজয়ার বন্ধুদের মধ্যে সেরকম কেউ ছিল না। তা ছাড়া, এ কথাটা তো সুজয়ার আগে মনে আসেনি।

সুজয়া সমুদ্রে স্নান করতে গেল না, বাথরুমেই স্নান সেরে নিল। ঘনশ্যামকে দিয়ে কিনিয়ে আনল টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান—এরকম কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস। তারপর ঘরে খাওয়ার আনিয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

হোটেলটার প্রায় সব ঘরেই লোক আছে। ঘনশ্যাম বলেছিল, আজ সকালেই একজন এই ঘরটা ছেড়ে গেছে বলে সুজয়া এত সহজে পেয়েছে। নইলে এখন হোটেলে ঘর পাওয়া যায় না।

দুটিমাত্র ঘরে সুজয়া দেখেছে স্বামী-স্ত্রী-বাচ্চা নিয়ে দুটি পরিবার আছে। আর সব ঘরেই পুরুষ বোর্ডার। অফিসে চাকরি করার লোক কিংবা ছাত্র। সুজয়ার পাশের ঘরটাতেই চারজন যুবক এক সঙ্গে আছে। স্নানের পর সুজয়া আবার একটু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, তখন পাশের বারান্দায় ছিল ওরাও। গেঞ্জি আর পাজামা পরা চারজন স্বাস্থ্যবান পুরুষ। ওদের চোখাচোখি হতেই সুজয়া চলে এসেছিল নিজের ঘরে। এখন বেরিয়ে ওরা তাস খেলছে। মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে ওদের চ্যাঁচামেচি। তার মধ্যে 'ওই মেয়েটা' 'ওই মেয়েটা' শোনা যায় কয়েকবার। ওরা কাকে নিয়ে আলোচনা করছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সুজয়ার ঘুম ভাঙল দরজার খটখট আওয়াজে। ধড়মড় করে উঠে বসে সুজয়া বোঝার চেষ্টা করল আওয়াজটা তারই ঘরের কিনা, আবার আওয়াজ হল। সুজয়া বেশবাস সামলে চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলে দেখল অত্যন্ত লম্বা একজন পুরুষ। ধুতির ওপর শার্ট পরা। মাঝারি বয়েস, দেখলেই মনে হয় লোকটি নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব সচেতন। লোকটির হাতে একটা লম্বা বাঁধানো খাতা।

দরজা খোলার পর লোকটি সুজয়াকে কিছু জিগ্যেস না করেই ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। তার হাঁটার ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, সে এই হোটেলের মালিক। খাতাটা টেবিলের ওপর রেখে সে বলল, আপনি রেজিস্টারে নাম সই করেননি।

সুজয়া বলল, ও সে কথা তো আমাকে কেউ বলেনি। দিন সই করে দিচ্ছি।

লোকটি একবার সারা ঘরে চোখ বোলাল, দেখে নিল সুজয়ার জিনিসপত্তর। তারপর জিগ্যেস করল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

সুজয়া খাতায় তার নাম ঠিকানা লিখতে লিখতেই উত্তর দিল, কলকাতা থেকে।

—আপনি ক'দিন থাকবেন?

—ঠিক করিনি এখনও। অন্তত চার-পাঁচদিন।

—আপনাকে একদিনের বেশি তো আমরা জায়গা দিতে পারব না।

সুজয়া অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। কোনও হোটেলের মালিকের মুখ থেকে এরকম রূঢ় কথা সে আশাই করেনি। তার মুখে একটা অরুণ আভা ছড়িয়ে পড়ল। সে দৃঢ়গলায় জিগ্যেস করল, কেন? আমি পাঁচদিনের টাকা এক্ষুনি অ্যাডভান্স দিয়ে দিচ্ছি।

—এই ঘর আগেই রিজার্ভ করা আছে।

—আমাকে তো সে কথা আগে কেউ বলেনি।

—ঘনশ্যাম জানত না।

—সেটা কি আমার দোষ?

—আপনি একাই থাকবেন?

—হ্যাঁ।

—আর কেউ আসবে না?

—না।

—একা এরকম কারুকে আমরা হোটেলে জায়গা দিই না।

—একা কেউ থাকে না? তা হলে সিঙ্গল রুম রেখেছেন কেন? হোটেলে কেউ একা থাকতে পারবে না, এত একটা অদ্ভুত কথা।

—একা কোনও মেয়েছেলেকে আমরা রাখি না। তাতে পুলিশের ঝামেলা হয়!

কথাটা শুনে সুজয়ার রাগে জ্বলে ওঠা উচিত ছিল, তার বদলে হঠাৎ চোখে জল এসে গেল। মুখের ওপর এরকম অপমান করতে পারে কেউ। তাকে ওরা খারাপ কিছু ভাবছে। সুজয়া এখন কী করবে? এরা তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে কিছুই করতে পারবে না।

সুজয়া কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, একা কোনও মেমসাহেব এলে, আপনি তাকে ভাড়া দিতেন না? তাড়িয়ে দিতে পারতেন?

লোকটার মুখ এতক্ষণ গম্ভীর ছিল, এবার তার ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটল। সুজয়ার চোখের দিতে তাকিয়ে বলল, আমি একটু বসি?

সুজয়া কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সে চেয়ার টেনে বসল। পায়ের ওপর পা তুলল। তারপর পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে, একটা কাঠিতেই সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল আরাম করে। হাসি-হাসি মুখ তুলে বলল, সঙ্গে কারুর আসার কথা ছিল, শেষ পর্যন্ত আসেনি?

—কারুরই আসার কথা ছিল না।

—সত্যি?

—আমি আপনাকে মিথ্যে বলব কেন? আপনি আমাকে এরকম জেরাই বা করছেন কেন?

—খাতায় যে ঠিকানা লিখেছেন, সেটা আপনার আসল ঠিকানা?

—তার মানে?

কিন্তু রাগের মধ্যেও সুজয়ার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আগে খেয়াল করেনি। সে তো সত্যিই কলকাতায় নিজেদের বাড়ির ঠিকানাই লিখে দিয়েছে। কী সাংঘাতিক ভুল। তার পুরোনো পরিচয় আর কারুকে জানাবার কোনও মানে হয়?

তাড়াতাড়ি কলমটা নিয়ে সুজয়া আবার খাতায় তার ঠিকানাটা ঘষেঘষে কেটে দিল। লোকটি কোনও বাধা দিল না। তাকিয়ে রইল শুধু হাসি-হাসি মুখে। তারপর বলল, আঠারো বছর হোটেলের ব্যবসা করছি, আমি অনেকরকম মানুষ চিনি। বাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসা হয়েছে বুঝি?

সুজয়া বুঝতে পারল, এখানে মেজাজ গরম করে কোনও লাভ নেই। সে একটুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল, তারপর মৃদুগলায় বলল, না, আমি বেড়াতে এসেছি।

—কয়েকটা কথা জিগ্যেস করি, কিছু মনে করবেন না। বাড়িতে কে-কে আছেন?

—বাবা, দাদা-বউদি, ছোট ভাই, পিসিমা।

—মা নেই?

—না।

—বাড়ির লোক এরকম একা-একা আসতে দিল?

সুজয়া মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, সে আর কথা বলবে না। সে কি কোনও অন্যায় করেছে?

সে বলল, আমার বয়স চব্বিশ বছর, আমার কি নিজের ইচ্ছে মতন কিছু করার অধিকার নেই? নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারি না?

—তা হলে শুনুন, গত মাসেই এখানে এরকম একটা কেস হয়ে গেছে। একটা মেয়ে, বালিগঞ্জের খুব হাই ফ্যামিলির মেয়ে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল। সঙ্গে একটা বেকার ছেলে, বদ্যি—মেয়েটা আবার ব্রাহ্মণ। মেয়ের বাপ-মা ঠিক খবর পেয়ে গেছে, মেয়েটাকে অনেক করে ফেরানোর চেষ্টা করল, মেয়েটা তো কিছুতেই যাবে না, সেও ওই কথা বলেছিল, তার বয়স একুশ হয়ে গেছে—লিগ্যালি সে আর বাপ-মায়ের অধীন নয়। তারপর কি হল জানেন? আইন দেখালেই আরও আইনের কথা আসে। মেয়েটার দাদা থানায় ডায়েরি করলে যে তার বোন বাড়ি থেকে দশ হাজার ক্যাশ টাকা আর বারো হাজার টাকার গয়না চুরি করে এনেছে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন, পুলিশ এসে মেয়েটাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল, আর ছেলেটাকে যা মার দিলে! কাজেই ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। হোটেলের বদনাম হয়ে যায়।

সুজয়া একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আন্তরিক সরলতার সঙ্গে বলল, দেখুন, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি সে রকম কোনও অন্যায় করে বাড়ি থেকে চলে আসিনি। গণ্ডগোলও হয়নি। বাড়ির পরিবেশ আমার ভালো লাগছিল না। তাই আমি আলাদা থাকতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?

—কী সাহায্য?

—আপনি আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারেন? আপনার হোটেলে কোনও কাজ খালি নেই? আমি অফিস ঘরে বসে খাতাপত্তর লিখতে পারি। এমনকি দরকার হলে, রান্নাবান্না বা পরিবেশন।

—আপনার মতো কোনও মেয়েকে হোটেলে কাজ দিলে আমার স্ত্রী আমাকে একেবারে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। বাসন মাজার জন্যেও আমি ছেলে রাখি, ঝি রাখি না।

—কেন?

—চব্বিশ বছর বয়েস হয়েছে বলছেন আর এটা বোঝেন না?

—আর কোনও কাজ পাওয়া যাবে না?

—আপনি কলকাতা শহর ছেড়ে পুরীতে এসেছেন কাজ খুঁজতে? তার থেকে ভালো কথা বলছি, কালকের ট্রেনেই বাড়ি ফিরে যান।

—আমি কিছুতেই ফিরে যাব না।

—মোট কথা আমার হোটেল ছাড়তে হবে কালকেই। আমার স্ত্রী প্রত্যেকদিন সন্ধের পর এখানে একবার আসেন। খাণ্ডার মেয়েছেলে কাকে বলে জানেন? আমার স্ত্রীকে দেখলেই বুঝবেন। তিনি যদি একবার টের পান, আমি এতক্ষণ আপনার ঘরে বসে কথা বলেছি, তা হলে আর রক্ষে নেই!

—এতে অন্যায় কী আছে?

—ন্যায়-অন্যায় বুঝি না। আমার স্ত্রীর মুখের ওপর কোনও কথা আমি বলতে পারব না। শ্বশুরের টাকায় ব্যবসা করছি কী না।

—আপনার স্ত্রীকে যদি আমি সবকথা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলি, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন না?

—আপনি খেপেছেন? কোনও মেয়েছেলে কখনও অন্য মেয়েছেলেকে সাহায্য করে। মেয়ে জাতের শত্রু তো মেয়েরাই।

—আমি তা বিশ্বাস করি না।

—আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন। আমাকে রেহাই দিন।

—অন্য কোনও হোটেলে আমি জায়গা পাব না? টুরিস্ট লজে?

—চেষ্টা করে দেখুন।

সেদিন সন্ধেবেলাতেই সুজয়া দেখতে পেল হোটেলের মালিকের স্ত্রীকে। ভদ্রমহিলার বিশাল চেহারা। মহারানি ভিক্টোরিয়ার মতন হাবভাব। হোটেলের উঠোনে দাঁড়িয়ে দাপটের সঙ্গে কথা বলছেন ঘনশ্যামের সঙ্গে।

সুজয়া দেখছে তার ঘরের জানলা থেকে। নিজেকে একটু আড়াল করে রেখেছে। যেন সে একটা চোর, সে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য। মুখটা তেতো হয়ে গেল সুজয়ার।

চুল আঁচড়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে নিচে নেমে এল সুজয়া। মহারানি ভিক্টোরিয়ার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল হোটেলের বাইরে। তিনি সুজয়ার দিকে শুধু একবার ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

সমুদ্রের ধারে এসে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সুজয়া, রাগে তার শরীর জ্বলছে। সে কিছুতেই হোটেল ছেড়ে যাবে না। দেখা যাক, ওরা কী করে। আসুক না পুলিশ। সে কোনও অন্যায় না করলেও পুলিশ ধরবে?

সমুদ্রের ধারে এখন যথেষ্ট ভিড়। যে-কোনও সময় পূরবী আর দেবকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ওদের বাড়িতে একবার যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করছে না। গিয়ে কী বলবে ওদের? আবার একঝুড়ি মিথ্যে বলতে হবে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে বালির ওপর বসল। হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে গভীর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে গেল। খেয়ালই করেনি, কখন সন্ধে নেমে এসেছে। এক সময় মুখ তুলতেই দেখল অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে সমুদ্রের ধার। কাছাকাছি আর কোনও মহিলাকে দেখা যাচ্ছে না। এদিকে-ওদিকে কিছু ছেলে বসে জটলা করছে। সকলেই যেন দেখছে তার দিকে। সুজয়া গ্রাহ্য করল না। সে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

এখানে এসে অবধি ভালো করে সমুদ্র দেখতে পারেনি। মন অস্থির থাকলে কোনও সুন্দর জিনিসও উপভোগ করা যায় না। বিরাট বিরাট ঢেউ এসে অনবরত ভাঙছে, শব্দের বিরাম নেই, তবু সমুদ্রকে কি শান্ত আর উদাসীন মনে হয়।

কয়েকটা ছেলে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নানারকম মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। এসব মেয়েদের গা-সওয়া। সুজয়া ছেলেগুলির চোখে চোখ রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ সরাসরি তাকায় না।

একটু পরে সুজয়া উঠে পড়ল। হোটেলের গেটের কাছেই ঘনশ্যাম দাঁড়িয়ে। তার মুখে চোখে চঞ্চল ভাব। যেন সে কিছু একটাতে ভয় পেয়েছে। ফিসফিস করে বলল, আপনাকে গিন্নিমা দেখা করতে বলেছেন।

—কোথায়?

—অফিস ঘরে।

খাটের ওপর পা তুলে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে গিন্নিমা। সুজয়াকে দেখেই তিনি বললেন, ঘনশ্যাম, বিলটা কোথায় রাখলি!

চেহারার মতনই গলার আওয়াজ জোরাল, মুখখানা উনুনের মতন গনগনে, তিনি আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন সুজয়াকে।

ঘনশ্যাম তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর থেকে বিলটা নিয়ে এল। গিন্নিমা বললেন, এই নিন আপনার বিল, আমাদের এখানে অ্যাডভান্স টাকা দিতে হয়।

সুজয়া গম্ভীরভাবে বলল, বিলটি ওপরে পাঠিয়ে দেবেন, টাকা দিয়ে দেব।

—ঠিক আছে। সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ নেই?

—না।

—কেউ আসবে? ট্রেন মিস করেছে?

—না। আর কেউ আসবে না।

—বসুন না, ওই চেয়ারে বসুন না।

—আমি ওপরে যাব। আপনার আর কিছু বলার আছে।

—এইটুকুই বলার আছে, আমার হোটেলটা ফুর্তি করার জায়গা নয়!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ফুর্তির কোনও ব্যবস্থা আছে বলেও তো মনে হয় না।

—এখানে কি পুরুষ ধরতে আসা হয়েছে?

—আমার বাবার যদি অনেক টাকা থাকত, তা হলে তিনিই আমার জন্যে একজন পুরুষ জুটিয়ে দিতেন। যেমন আপনার বাবা দিয়েছেন।

—মুখ সামলে কথা বলবে।

—আপনি আমাকে ধমকাবেন না। আপনার কোনও অধিকার নেই।

—ইঃ! বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর। তোমাকে যে আজই রাত্তিরে হোটেল থেকে বার করে দিচ্ছি না এই ঢের! আমার মুখে-মুখে কথা।

—চেষ্টা করে দেখুন না!

—তার মানে? তুমি যাবে না?

—না।

—ঠিক আছে, তোমার মতন মেয়েকে কীভাবে যাওয়াতে হয় আমি তার ব্যবস্থা করছি!

নিজের ঘরে এসে সুজয়া রাগে ফুঁসতে লাগল। দেখা যাক ও কি করে। সে কিছুতেই যাবে না। কিছুতেই না।

সে রাত্রে সুজয়া কিছু খেল না। দরজায় খিল এঁটে রইল। সর্বক্ষণ আশা করেছিল, কেউ এসে দরজা ধাক্কা দেবে। কিন্তু কেউ এল না। এমনকি ঘনশ্যামও না। শুধু পাশের ঘরের ছেলেদের তাস খেলার হইচই কানে আসছে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সুজয়া।

পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। ঘনশ্যামই এসে তাকে জাগাল। চা আর বিস্কুট নিয়ে এসেছে। সুজয়া দরজা খোলার পর ঘনশ্যাম সেগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলল, দিদিমণি, কাল রাত্তিরে কিছু খেলেন না?

সুজয়া অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, না।

আজ ঘনশ্যামকে আর চিন্তিত দেখাচ্ছে না। লোকটা খারাপ নয়। শরীরে মায়া-দয়া আছে মনে হয়।

ঘনশ্যাম আবার জিগ্যেস করল, দিদিমণি, সকালে কী খাবেন? ডিম খাবেন তো?

সুজয়া বলল, এখন আর কিছু দরকার নেই।

—কাল গিন্নিমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে।

সুজয়া এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, কার? কী শরীর খারাপ হয়েছে?

—গিন্নিমার তো অসুখ হয়ে গেছে কাল রাত্তিতে, আপনি খুব রাগিয়ে দিলেন তো!

—আমি রাগিয়ে দিলাম মানে? উনিই তো যা-তা কথা বলেছিলেন।

—গিন্নিমার মুখের ওপর তো কেউ কথা বলে না। কেউ কিছু বললেই ওনার রাগ হয়ে যায়। ব্লাডপ্রেসার আছে তো, বেশি হলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়। তারপরই মূর্ছা। কাল রাত্তিরে তো একেবারে এখন তখন অবস্থা। ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল। দু-খানা ইনজেকশন দিলেন—

এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যেও সুজয়ার একটু হাসি পেয়ে গেল। ভদ্রমহিলার বিরাট মোটা চেহারা, নিশ্চয়ই খুব বেশি ব্লাড প্রেসার—তিনি যাকে যা খুশি বলবেন, কেউ তার উত্তর দিলেই ওনার

অসুখ হবে, না, এ তো ভারি মজার ব্যাপার।

সে হাসি সামলে বলল, উনি এখন কেমন আছেন?

—ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে আছেন। আপনি চা-টা খেয়ে নিন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে!

সুজয়া চায়ে চুমুক দিল, ঘনশ্যাম তবু দাঁড়িয়ে আছে। সে কি খালি কাপ-প্লেট নিয়ে যেতে চায়? কিন্তু তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা সেরকম নয়। তা ছাড়া কেউ সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে কীরকম অস্বস্তি লাগে।

সুজয়া জিগ্যেস করল, তুমি আর কিছু বলবে?

—হ্যাঁ। আপনাকে ডাক্তারবাবু একবার ডেকেছেন।

—ডাক্তারবাবু? কোন ডাক্তারবাবু?

—যিনি আমদের গিন্নিমাকে কাল দেখতে এসেছিলেন।

—তিনি আমাকে ডাকবেন কেন!

—তিনি আপনার সব কথা শুনেছেন তো। ডাক্তারবাবুকে এখানে সবাই চেনে। খুব ভালো মানুষ।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ডাকবেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না।

—ডাক্তারবাবু যে আমাকে বললেন, ঘনশ্যাম, হোটেলের ওই দিদিমণিকে সকালবেলাতেই আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসবি। ভুলে যাস না যেন।

সুজয়া ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করতে লাগল। ঘনশ্যাম মিনতি করে বলল, দিদিমণি আপনি আপত্তি করবেন না। একবার চলুন, ডাক্তারবাবু যখন বলেছেন।

—ঠিক আছে যাব এখন একবার।

—আজ সকালেই চলুন। আপনি তৈরি হয়ে নিন, আমি একটু পরেই আসছি। ঘনশ্যামের পীড়াপীড়িতে খানিকটা বাদে বেরিয়ে পড়তেই হল সুজয়াকে।

ডাক্তারবাবুর বাড়ি হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সমুদ্র থেকে মাত্র একটা রাস্তা পরেই। রীতিমতন বড় এবং পুরোনো আমলের বাড়ি।

বাইরের ঘরেই ছিলেন ডাক্তারবাবু একটা গেরুয়া রঙের সিল্কের লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা, চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। একটু ভারী ধরনের গোলগাল চেহারা, ঠোঁটের হাসিটি দেখলেই মনে হয় মানুষটা ভালো।

বাইরের ঘরে আরও তিন-চারজন লোক ছিল। ডাক্তারবাবু ঘনশ্যামের সঙ্গে সুজয়াকে দেখেই বললেন, একটু বসতে হবে, আমি আমার হাতের কাজগুলো আগে সেরেনিই!

তাড়াতাড়ি কয়েকটা প্রেসক্রিপসন লিখে তিনি অন্য লোকদের আগে ছেড়ে দিলেন। ঘর খালি হয়ে যাওয়ার পর তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সুজয়ার দিকে তাকালেন, তারপর হাসি-হাসি মুখে জিগ্যেস করলেন, আপনি বলব না তুমি বলব?

প্রথমেই এরকম প্রশ্নের জন্য সুজয়া তৈরি ছিল না। বুঝতে একটু সময় লাগল। অচেনা লোকের মুখ থেকে সে আপনি সম্বোধনই পছন্দ করে। বয়েসে বেশি হলেই বা। তবু এরকম প্রশ্নের উত্তরে যা বলতে হয়, সুজয়া তাই-ই বলল, আমাকে তুমি বলবেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, তোমার নাম তো সুজয়া? তোমার সম্পর্কে আমি কালই রাত্তিরে শুনেছি! তোমার তো সাহস কম নয়, তুমি বিমলা সান্যালের মুখে-মুখে কথা বলেছ।

সুজয়া চুপ করে রইল।

ডাক্তারবাবু আবার বললেন, সাহসী মেয়েদের আমি পছন্দ করি। যাই হোক, তুমি চাকরি খুঁজতে এখানে এসেছ?

সুজয়া মুখ তুলে বলল, হ্যাঁ।

—কী চাকরি তোমার চাই?

—যে-কোনও চাকরি।

—পড়াশুনো?

—বি.এ. পাস করেছি।

—বি.এ. পাস করলে কজন আজকাল চাকরি পায়? তবু ছেলেমেয়েরা এখনও বি.এ. পড়ে, আশ্চর্য না? যাই হোক, একশো টাকা মাইনে আর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা যদি হয়, তা হলে তোমার চলবে?

সুজয়া রীতিমতন চমকে উঠল এবার। এ কি কথা শুনছে সে! স্বর্গ থেকে দেবদূত এসে কি তার সামনে এই ডাক্তারবাবুর ছদ্মবেশ ধরে বসে আছে?

সুজয়া বলল, সেরকম কিছু পেলে তো খুবই ভালো হয়।

—ঠিক আছে। আজ থেকেই শুরু করো।

—আমায় কী করতে হবে?

—তুমি আমার বাড়িতে থাকবে। আমার দুটি ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের পড়াবে। বিশেষ করে বাংলা, ওরা এখানে বাংলা ভালো শিখতে পারছে না। আমার খাতাপত্রও লিখতে হবে কিছু কিছু। আর পরে যদি একটু-আধটু নার্সিং শিখে নিতে পারো, মাইনে আরও বেশি পাবে। কী, রাজি?

—এ তো আমার পক্ষে দারুণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

—শোনো, আমি তোমার অতীতের কথা জিগ্যেস করব না, তোমার বাড়ি কোথায় ছিল কিংবা তোমার বাবা-মায়ের কথাও জানতে চাইব না। কিন্তু তোমাকে কাজ করতে হবে মন দিয়ে।

—আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে...

—ঠিক আছে, আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। তোমার জিনিসপত্র হোটেল থেকে ঘনশ্যামই এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এসো, তোমার ঘরটা দেখিয়ে দিচ্ছি—

ডাক্তারবাবু উঠে চটি ফটফট করে দরজার কাছে গিয়ে ডাকলেন, গুণমণি, গুণমণি—

॥ ৪ ॥

ডাক্তার নারায়ণ মুখোপাধ্যায়রা পুরীতে তিন পুরুষের বাসিন্দা। ওঁর ঠাকুরদা পুরীর রাজার স্টেটে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন। নারায়ণ মুখোপাধ্যায় অবশ্য ডাক্তারি পাস করার পর কলকাতাতেই প্র্যাকটিস করেছেন কিছুদিন। কিন্তু মন টেকেনি। পুরীতেই ছেলেবেলা থেকে কাটিয়েছেন বলে আবার ফিরে এসেছেন এখানেই। ডাক্তার হিসেবে এখানে তাঁর দারুণ পসার হলেও মানুষটা অনেকটা সমাজসেবক ধরনের। গরিবদের কাছ থেকে টাকা নেন না, অনেক সময় বাড়িতে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আসেন। নুলিয়া বস্তিতে সকলে দেবতার মতন ভক্তি করে।

তাঁর বাড়িটা যেমন বিরাট তেমনি কত যে মানুষ সেখানে আছে তা দেখার। হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী এখন এ বাড়িতেই, কিন্তু হেমেন্দ্রনাথকে সুজয়া দেখেনি।

প্রথম দুদিন সুজয়া তার বাড়ি থেকে বেরুল না। বেরুবার কোনও প্রয়োজনও সে বোধ করে না। সকালে ছেলেমেয়ে-দুটিকে নিয়ে কিছুক্ষণ পড়াতে বসে। ওরা বেশ শান্ত, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই সুজয়ার, বাংলা গল্প বলেই সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। অঙ্ক আর ইংরেজি পড়ে মাস্টারমশাইয়ের

কাছে। বাকি সময়টা সুজয়া নিজের মনেই কাটায়। অন্নপূর্ণার কাছ থেকে কয়েকটা গল্পের বই আর মাসিক পত্রিকা চেয়ে এনেছে, তাতেই সময় কেটে যায়।

কখনও-কখনও অন্নপূর্ণা তাকে ডেকে পাঠান। দোতলার চওড়া বারান্দার একপাশে তিনি তখন পান সাজতে বসেন। ডাক্তারবাবু পান খেতে ভালোবাসেন—তা ছাড়া বাড়ির সকলের জন্যে পান সাজেন অন্নপূর্ণা। মাঝে-মাঝে ঠাকুর-চাকরেরা তাঁর কাছে কোনও জিনিস চাইতে এলেই তিনি আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে দিয়ে বলেন, যা আলমারি খুলে নিয়ে যা। কোনও কিছুর হিসেব রাখেন না অন্নপূর্ণা, যে যা চায় তিনি দিয়ে দেন। ঠাকুর-চাকরেরা আলমারি খুলে কোনও জিনিস কতখানি নিয়ে যাচ্ছে, তা তিনি লক্ষও করেন না। আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখা শুধু একটা নিয়মরক্ষা!

কী সুন্দর তখন দেখায় অন্নপূর্ণাকে। চওড়া লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরে বসে থাকেন পা মেলে। পিঠের ওপর গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুল, মাঝারি মোমের মতন নরম সাদা। মনে হয়, মানুষ নয়, কোনও শিল্পীর গড়া দেবীমূর্তি।

অন্নপূর্ণাকে দেখে এক সময় সুজয়ার মনে হয়, মানুষে-মানুষে কত তফাত! হোটেলের মালিকের বউয়ের মনটা হিংসা আর লোভে ভরা। আর অন্নপূর্ণার মধ্যে লোভ হিংসা দূরে থাক, কোনওরকম ক্ষুদ্রতা নিচতাই নেই—কারুর সঙ্গে কখনও রাগ করে কথা বলেন না!

সুজয়া এসে অন্নপূর্ণাকে পান সাজতে সাহায্য করে, জাঁতি নিয়ে সুপুরি কুচোতে বসে। অন্নপূর্ণা তাকে জিগ্যেস করেন, তুমি সবসময় বাড়িতে বসে থাকো কেন? বেরোও না কোথাও?

সুজয়া বলে, কোথায় যাব?

অন্নপূর্ণা হেসে বলেন, বাঃ, এর নাম বুঝি মেয়েমানুষের স্বাধীনতা? একটা বাড়িতে চাকরি নিয়ে তারপর সেই বাড়িতে বদ্ধ হয়ে থাকা?

সুজয়া একটু লজ্জা পেয়ে বলে, এখানে তো কারুকে চিনি না। একা-একা কোথায় আর যাব!

—বাড়ি থেকে বেরুলেই তো লোকের সঙ্গে ভাব হবে। এ বাড়িতে তো অনেক মানুষজন আছে, কারুর সঙ্গে ভাব হয়নি তোমার?

—না, এখনও হয়নি।

—তোমাকে দেখে আমার কী মনে হয় জানো! আমার যদি তোমার মতন কম বয়স থাকত, আমি তোমার মতন স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতাম।

—আপনি আর কি স্বাধীন হবেন? আপনি তো ইচ্ছেমতন সব কিছু করতে পারেন। এমন চমৎকার সংসার, এরকম সুখী জীবন ক'জন পায়?

—তা হলে তুমি বলছ, আমি ভালো আছি।

—ভালো নেই?

—বিয়েটা কি একটি চাকরির মতন নয়? ছেলেমেয়ে মানুষ করা, স্বামীর যত্ন, সংসারের সবাইকে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা—প্রত্যেকদিন ঠিক একই কাজ।

সুজয়া অন্নপূর্ণার মুখে এই ধরনের কথা শুনে একটু চমকে গেল। অন্নপূর্ণাকে দেখলে শুধু তার নরম আর সুন্দর মনে হয়, তাঁর জীবনটা সব মিলিয়ে সুখের—তবু তিনি এসব চিন্তা করেন, তা যেন বিশ্বাসই করা যায় না। অন্নপূর্ণা মোটেই সাধারণ নারী নন।

সুজয়া বলল, না চাকরির সঙ্গে আপনার কোনও তুলনা চলে না। আপনি যা করছেন, সবই তো আপনার ইচ্ছেমতন, এটা আপনার নিজের সংসার, আপনার তো এখানে স্বাধীনতা কিছু কম নেই।

অন্নপূর্ণা তাঁর পাতলা ঠোঁটে আলতো হেসে বলেন, তা হলে বিয়ে ব্যাপারটাতে মেয়েদের

স্বাধীনতা নষ্ট হয় না! বিয়ে জিনিসটাতেও তোমার আপত্তি নেই?

—আমি সেরকম কথা কখনও বলিনি।

—তোমার জন্যে তা হলে একটা পাত্র দেখব নাকি?

সুজয়া লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল।

অন্নপূর্ণা আবার বললেন, তুমি একটি ব্যাপার জানো কি? ওই যে হোটেলের প্রভাসবাবুর স্ত্রী বিমলা, ওর সঙ্গেই তো তোমাদের ডাক্তারবাবুর বিয়ের কথা হয়েছিল। ওরা তো পুরীর লোক। সে সময় বিমলা এরকম মোটাও ছিল না, রাগীও ছিল না। বিয়েটা তো হতেও পারত, কী একটা সামান্য কারণে যেন আটকে গেল!

অন্নপূর্ণা বাচ্চামেয়ের মতন হাসতে লাগলেন। যদি বিয়ে হত, তা হলে আজ কী হত বলো তো?

সুজয়া বলল, তা হলে ডাক্তারবাবুর জীবনটা নষ্ট হয়ে যেত!

—এখনও যে তোমাদের ডাক্তারবাবুর জীবন নষ্ট হয়নি, কী করে জানলে?

—একি জানতে হয়!

—তুমি ছেলেমানুষ, সুজয়া, তুমি অনেক কিছুই জানো না। দেখো আমি একজন নামকরা ডাক্তারের বউ, কিন্তু আমারই বারোমেসে অসুখ!

—কী অসুখ আপনার?

—কী জানি! কোনও ডাক্তারই সারাতে পারে না। আমার স্বামী কত লোকের রোগ সারাচ্ছেন, কিন্তু তিনি আমার অসুখটা আজ অবধি ধরতেই পারলেন না, এটা একটা মজার ব্যাপার না?

সত্যিই খুব আশ্চর্য তো?

প্রভাসবাবুর স্ত্রী বিমলার যখন যে অসুখ হোক, আমার স্বামীকে ছাড়া আর কারুকে সে দেখাবে না! ওঁর হাতের একটা ইনজেকশান কিংবা ট্যাবলেটেই কাজ হয়ে যায়!

অন্নপূর্ণা আপনমনেই হাসতে লাগলেন। সুজয়া কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে রইল।

অন্নপূর্ণাকে তার রীতিমতন রহস্যময়ী মনে হয়। কথাবার্তা শুনলে বোঝা যায়, অন্নপূর্ণা অনেক বই-টই পড়েছেন, অনেক বিষয় জ্ঞান আছে—কিন্তু তাঁকে বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেখা যায় না। তাঁর নিজের শখ-আহ্লাদ নেই। সংসারের সকলকে ভালোভাবে খাইয়ে পরিয়েই তাঁর তৃপ্তি। অথচ তাঁর মনের মধ্যেও কোথাও একটা গভীর অতৃপ্তি রয়ে গেছে।

অন্নপূর্ণার ভাইয়ের স্ত্রী অলকা স্বাস্থ্য সারাবার জন্য এখানে প্রায় বছর খানেক ধরে আছেন। ওদের বাড়ি জামসেদপুরে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে থাকলেই অলকার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। নইলে হাঁপানির টান দেখা যায়। ওঁর স্বামী হেমেন্দ্রনাথকে ব্যবসার জন্যে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, মাঝে-মাঝে এসে এখানে সপ্তাহখানেক থেকে যেতে হয়।

অলকাও কখনও-কখনও পান সাজার আসরে এসে বসেন। অলকা আবার ঘোর সংসারী। টাকাপয়সা, শাড়ি-গয়না, চাল-ডালের হিসেবের বাইরে কিছু জানেন না। অন্নপূর্ণা খুব মন দিয়েই যেন সবসময় অলকার কথা শোনেন, কখনও বুঝতে দেন না এসব কথায় তাঁর কোনও আগ্রহ নেই।

অলকার স্বভাবটি অহংকারী ধরনের। তিনি যে বড়লোকের বউ, সে কথা সবসময় হাবভাবে বুঝিয়ে দেন। সুজয়ার সঙ্গে মোটামুটি ভালোই ব্যবহার করেন, কিন্তু সুজয়াকে যে এ বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে দয়া করা হয়েছে, এবং দাদামণি অর্থাৎ ডাক্তারবাবু যে অনেককেই এরকম দয়া করেন সেকথা ওঁর হাবভাবে বেরিয়ে পড়ে।

অন্নপূর্ণার তাড়াতেই সুজয়া বাড়ি থেকে মাঝে-মাঝে বেরুতে শুরু করল, সঙ্গে তার ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে যায়। ওরা কিছুক্ষণ সমুদ্রের ধারে বালির ওপর ছোটাছুটি করে, সুজয়া বসে-বসে দেখে। কখনও সেও খেলায় যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

একদিন পেছন থেকে হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল, এই যে পেয়েছি।

সুজয়া মুখ ফিরিয়ে দেখল সুশোভন।

সুশোভন বলল, আরে দু-দিন ধরে আমি তোমায় খুঁজে-খুঁজে হাল্লাক হয়ে যাচ্ছি। কোথায় ডুব মেরেছিলে?

সুজয়া আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

সুশোভন সুজয়ার ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এরা তোমার মামার ছেলেমেয়ে বুঝি?

সুজয়া অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল।

—তুমি আমার দিদির সঙ্গে আর একদিনও দেখা করতে গেলে না কেন? দিদি-জামাইবাবু তো হাঁ হয়ে গেছে। আমাকে দিদি বলল, মেয়েটা কি হারিয়েই গেল কিনা কে জানে। কী ব্যাপারটা কী? কেন যাওনি?

—যাব-যাব ভেবেছিলাম, যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

—আমার দিদি-জামাইবাবু কি খারাপ লোক?

—সে কথা কি আমি বলেছি।

—তবে? আমি তো দু-দিন সমুদ্রের ধারটা প্রায় চষে ফেললুম তোমার খোঁজে।

সুশোভন এমনভাবে কথা বলছে যেন সে সুজয়ার কতকালের বন্ধু। অথচ সুজয়া কোনওকালেই ওর বন্ধু ছিল না, ওকে কখনও পছন্দ করেনি। ছেলেটা হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। অবশ্য ওর দিদি-জামাইবাবু সত্যিই ভালো মানুষ, তাঁদের সঙ্গে আর দেখা করেনি বলে সুজয়ার মনে খানিকটা অস্বস্তি ছিলই। কিন্তু যেতে পারেনি। ওখানে গেলে মিথ্যে কথা বলতে হবে।

সুশোভন বলল, চলো, এখন আমার সঙ্গে চলো। দিদিকে বলে এসেছি, তোমাকে ঠিক ধরে আনব।

সুজয়া বলল, এখন? এখন আমার সঙ্গে ওরা রয়েছে যে!

—ওদের নিয়ে চলো!

—ওদের ফেরার সময় হয়ে গেছে। ওরা দেরি করে ফিরলে বাড়িতে রাগ করবে।

—তা হলে ওদের পৌঁছে দাও।

—আজ থাক, আর একদিন যাব।

—আর একদিন? চালাকি পেয়েছ? আবার কেটে পড়বার তাল?

—না, সত্যিই কাল যাব।

—ওসব বাতেলা ছাড়ো! তোমার হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যাব কিন্তু।

সুশোভন কর্কশ ধরনের ছেলে। সে সত্যি হয়তো সুজয়ার হাত চেপে ধরতে পারে। সুজয়ার রাগ হচ্ছিল খুব কিন্তু আবার অসহায়ও বোধ করছে। এই ছেলেটা যদি হঠাৎ উদ্ভট কাণ্ড করে ফেলে, তা হলে ভিড় জমে যাবে এখানে।

সে বিরক্তি লুকিয়ে বলল, আচ্ছা আপনি দাঁড়ান এখানে, আমি ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

—আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তোমার মামার বাড়িটা দেখে আসি।

—আপনি দাঁড়ান না, আমি আসছি এক্ষুনি, বললাম তো।

—কেন তোমার সঙ্গে গেলে দোষ আছে? তোমার মামার বাড়িটা দূর থেকে দেখে এলে আপত্তি আছে কিছু! ভেতরে না হয় না-ই নিয়ে গেলে!

অগত্যা সুজয়াকে রাজি হতেই হল। তার ছাত্র-ছাত্রীরা তাকে সুজয়াদি বলে ডাকে—সুতরাং ওদের মাসতুতো ভাই-বোন বলে চালানো যেতে পারে। রাস্তা পার হয়ে ওদের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে সুজয়া বলল, তোমরা যাও পড়তে বোসো, আমি একটু পরেই ফিরছি।

ওরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে না পড়া পর্যন্ত সুজয়া অপেক্ষা করল। তারপর বলল, চলুন।

সুশোভন ফস করে একটা সিগারেট জ্বালাল। তারপর জিগ্যেস করল, মামা বুঝি খুব কনজারভেটিভ?

সুজয়া বলল, কেন?

—বেশি দেরি করে ফিরলে রাগ করবে?

—বেশি দেরি করব কেন? আমি একটু বাদেই ফিরব।

—আহা, এমনি কথার কথা বলছি। তুমি পুরীতে কতদিন থাকবে ঠিক করেছ।

—কিছুই ঠিক করিনি।

এটা এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবু সুশোভন হেসে উঠল হো-হো করে। সুজয়ার রাগ ধরে গেল। এরকম বিশ্রী ধরনের হাসিতে তার গা জ্বালা করে। সে বলল, হাসছেন কেন?

—এমনিই। কেন হাসতে পারব না। তুমি আমাকে আপনি আজ্ঞে করে কথা বলছ কেন? তুমি বললেই তো পারো।

—আমি যাকে-তাকে তুমি বলি না।

—কাকে-কাকে বলো? ক'জন তুমি বলার মতন ফ্রেন্ড আছে?

—আপনি বড্ড বাজে বকছেন।

—আমার স্বভাবই এই। আচ্ছা, তোমার সেই বন্ধু গায়ত্রী, তার বিয়ে হয়ে গেছে?

—অনেক দিন আগে।

—ওঃ, আমাকে খুব চোট দিয়েছিল। তিন-চারখানা চিঠি লিখেছিল আমাকে, ইনিয়ে-বিনিয়ে যত কথা—তারপরেই অন্য লোককে বিয়ে।

—গায়ত্রী মোটেই আপনাকে চিঠি লেখেনি। আপনিই তার পেছনে লাগতেন।

—আলবাৎ চিঠি লিখেছিল। আমার কাছে এখনও ডকুমেন্ট আছে।

সুজয়া বিমূঢ় হয়ে গেল। গায়ত্রী তাকে বলেছিল এই ছেলেটা শুধু ওকে বিরক্ত করে, পেছন পেছন যায়। কিন্তু গায়ত্রীও যে ওকে চিঠি লিখেছিল, সে কথা তো কোনওদিন জানায়নি?

সুশোভন বলল, গায়ত্রীর জন্যে এখনও আমার কষ্ট হয়। তুমি গায়ত্রীর বন্ধু বলেই তোমার সম্পর্কে আমার একটু উইক্‌নেস আছে।

সুজয়া কোনও কথা না বলে মুখটা অন্যদিকে ফেরাল।

সুশোভন বলল, কী বিশ্বাস হল না? উইক্‌নেস না থাকলে কি আমি তিন-চারদিন ধরে গোটা পুরী শহরটাতে তোমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজি? অন্য কোনও মেয়ের দিকে তাকাবার টাইমই পাইনি।

সুজয়া এতেও কোনও মন্তব্য করল না।

—কী গম্ভীর হয়ে আছ যে?

—না তো!

সুশোভন আবার অকারণে হেসে উঠল, তারপর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, তোমার সব ব্যাপার আমি জানি! তুমি বাড়ি থেকে পালিয়েছ!

সুজয়া থমকে দাঁড়িয়ে বিবর্ণমুখে বলল, কী? মোটেই না!

—আমার কাছে চেপে লাভ নেই। আমি পাকা খবর নিয়েই বলছি। তোমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু রতন, সে আমার চ্যালা। তার কাছ থেকে খবর পেয়েছি। তোমার বাড়ি থেকে খোঁজাখুঁজি করছে। থানায় ডায়েরি করেছে।

—আমি পালিয়ে আসিনি, এমনিই চলে এসেছি।

—ওই একই হল। রতনদের ধারণা তুমি কোনও নটবর ছোকরার সঙ্গে সটকেছ। কিন্তু তুমি যে একাই এসেছ, সে ব্যাপারে আমি নিজেই সাক্ষী আছি। ওদের কাছে অবশ্য কিছু ভাঙিনি।

সুজয়া বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এতদিন পর তার মনে পড়ছে বাড়ির কথা। সে কল্পনা করার চেষ্টা করল তার দাদা-বউদি এখন কী করছে? প্রথম খবরটা পেয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া কীরকম হয়েছিল।

সুশোভন সুজয়ার একটা হাত আলতোভাবে ছুঁয়ে বলল, আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? এত ঘাবড়াবার কিছু নেই।

—আমি মোটেই ঘাবড়াইনি।

—গলার আওয়াজ কেঁপে গেছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। তোমার ভয় নেই, আমি কারুকে কিছু বলিনি, দিদি-জামাইবাবুকেও না। চলো, এসে গেছি, এই বাড়ি।

দরজা ভেজানো ছিল, সুশোভন হাত দিয়ে ঠেলে খুলল। ভেতরে একটা উঠোন। সেখানে একজন বুড়ি ঝি বাসন মাজছে। উলটো দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

সুশোভন বলল, এসো, ওপরে এসো। বসবার ঘর দোতলায়।

ওপরে উঠে এল সুজয়া। বসবার ঘরে কয়েকখানা চেয়ার টেবিল আর তক্তপোশ! সুজয়া বসল একটা চেয়ারে।

সুশোভন তক্তপোশটার ওপরে সশব্দে বসে জুতোর ফিতে খুলতে লাগল।

সারা বাড়িটা কেমন যেন নিস্তব্ধ। যে-বাড়িতে বাচ্চা ছেলে থাকে, সে বাড়ি এত চুপচাপ হয় না।

সুজয়া জিগ্যেস করল, ওরা সব কোথায়?

সুশোভন বলল, ও, মনেই ছিল না, দিদি-জামাইবাবুর আজ সন্ধেবেলা সাক্ষীগোপালে যাওয়ার কথা। ওখানে কীসব পুজোটুজো আছে, সেইখানেই গেছে বোধহয়।

সুজয়ার ভুরু কুঁচকে গেল। সুশোভন কি আগে থেকেই জেনেশুনে কোনও মতলব করে তাকে ডেকে এনেছে এখানে? মুখ তুলে দেখল, সুশোভন একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে।

চোখাচোখি হতেই সুশোভন বলল, চা খাবে?

—না। আমি তা হলে যাই, পূরবীদিরা নেই যখন।

—বসো না। একটু পরেই এসে যাবে। তুমি তা হলে এখন কী করবে? তোমার প্ল্যান কী?

—কী আবার প্ল্যান।

—এখানেই থাকবে?

—আপাতত।

—যে বাড়িতে উঠেছ, সেটা যে তোমার মামার বাড়ি নয়, তা বুঝতেই পারছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কেউ মামার বাড়িতে ওঠে না। ওখানে কি চাকরি করছ?

—ধরে নিন সেইরকমই কিছু একটা।

—তোমার বাবা-দাদা যদি খবর পেয়ে যায়?

—খবর পেলে কী হবে? আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে নাকি?

—ঝামেলা করতে পারে। সেরকম ঝামেলা হলে কেউ কি আর তোমাকে চাকরিতে রাখবে?

—সে আমি তখন দেখব কী করা যায়। আপনার এত কৌতূহল কেন?

—আরে তুমি আমার ওপর এত তড়পাচ্ছো কেন? আমি কি কারুকে কিছু বলেছি? আমি তো ইচ্ছে করলেই তোমাদের বাড়িতে খবর দিয়ে দিতে পারতাম।

—আপনি যা খুশি করতে পারেন।

—তুমি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ। আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, দেখি কিছু খাওয়ার-টাবার পাওয়া যায় কিনা!

সুশোভন চট করে উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সুজয়ার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। এক্ষুনি তার উঠে পড়া উচিত। সুশোভনকে কিছু না বলেই কি সে চলে যাবে?

সুশোভন আবার ফিরে এল, হাতে একটা শালপাতার বড় চ্যাঙাড়ি নিয়ে। বলল, ভুবনেশ্বরের মুড়কি, খুব গ্র্যান্ড খেতে। খাবে?

সুজয়া বলল, না আমি খাব না।

সুশোভন ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আরে নাও, না! একটু খাও না, হাত পাতো।

সুশোভন এমনভাবে সামনে এসে একমুঠো মুড়কি নিয়ে হাত বাড়িয়ে আছে যে না নিয়ে পারা যায় না। তবে সুজয়া বলল, বলছি তো আমি এখন খাব না!

—কেন হাত ময়লা হয়ে যাবে? ঠিক আছে তুমি হাঁ করো, আমি তোমার মুখে পুরে দিচ্ছি।

—না।

সুশোভন এরপর অত্যন্ত হালকা গলায় বলল, তা হলে একটা চুমু খাব?

সুজয়া জ্বলে উঠে বলল, কী?

—একটা চুমু। ওনলি ওয়ান!

—এইসব ইতরতা করার জন্যে আপনি আমাকে ডেকে এনেছেন?

—মোটেই না। তোমার মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি খুব ভয় পেয়েছ। আমার ভয় পাওয়ার জন্যেই তোমার মুখটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সেই জন্যেই হঠাৎ একটা ইচ্ছে হল।

—আমি এক্ষুনি চলে যাব।

সুশোভন আলগাভাবে সুজয়ার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, বসো—

সুজয়া এক ঝটকায় সেই হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, অসভ্য কোথাকার!

সুশোভন এবার মুড়কির চ্যাঙাড়িটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। তারপর লোহার মতন শক্ত দুহাতে সুজয়ার কাঁধ চেপে ধরে বলল, আমার কাছে ওসব জোর দেখিয়ো না! জোর দেখানো আমি একদম পছন্দ করি না। চুপ করে বসে থাকো এখানে।

নিজেই আবার হাতদুটো সরিয়ে বলল, তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না। আমি এখন কনট্রাকটারি ব্যবসা করছি, নিজের ফার্ম খুলেছি। মাস গেলে বারো-চৌদ্দশো টাকা আপসে আসে। আরও বাড়বে। তোমাকে একটা সাজেশন দিতে পারি, শুনবে?

—এ সব শুনে আমাব লাভ?

—শুনে রাখো। আমি রিসেন্ট বিয়ে করার কথা ভাবছি। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকো, আমিও রাজি। দু-চারদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। তা হলে তোমার বাড়ি থেকে পালানোর ব্যাপারটাও সলভ্ড হয়ে যেতে পারে।

সুজয়া যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। এসব কী বলছে ছেলেটা। এত হালকা ঠাট্টা ইয়ার্কির সুরে কেউ বিয়ের কথা বলতে পারে?

সুশোভন বলল, কী চুপ করে রইলে যে? কোনও কমেন্ট নেই?

—এসব কী বলছেন আপনি?

—খারাপ কিছু তো বলিনি, বিয়ের কথা বলেছি।

—এই রকমভাবে আমাকে শুধু-শুধু অপমান করতে চান।

—এই সেরেছে, অপমান করলুম কোথায়? বিয়ে তো একটা লিগ্যাল ব্যাপার, বিয়েব কথা বললে অপমান হয়?

—আজ এই মেয়ে কাল ওই মেয়ের পেছনে ঘোরাঘুরি করে তারপর হঠাৎ একটি মেয়ে সম্পর্কে কিছু না জেনে তাকে অমনি বিয়ের কথা বলা যায়?

—তবে আর কীভাবে বলতে হয়? আমি বাবা অত সব জানি-ফানি না! মনে এল কথাটা, বলে ফেললাম। আমার দিদিও বলেছিল তোমার সম্বন্ধে, যে মেয়েটা বেশ ভালোই, তাই আমিও ভাবলুম, বিয়ে যখন করতেই হবে।

—বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা?

—তবে কি গুরু ঠাকুর নাকি? হাতজোড় করে পুজো করতে হবে? আচ্ছা তাই করছি।

নকল পুজোর ভঙ্গিতে সুশোভন মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সুজয়ার একটা হাত মুঠো করে ধরল।

সুজয়া এবার রাগের সঙ্গে নয়, কম্পিতগলায় বলল, আমায় ছেড়ে দিন, আমি এখন বাড়ি যাব।

—আরে তখন থেকে ওই এককথা বলছ কেন? বাড়িতে কে আছে? বাচ্চা মেয়েরা যেমন মায়ের কাছে যাব বলে, তুমিও সেইরকম করছ দেখছি!

—আমাকে এখন যেতেই হবে। আমি কি যেতে পারি?

—যাও না। তোমাকে কি আমি জোর করে ধরে রেখেছি।

—আমি যাচ্ছি তা হলে।

সুজয়া চেয়ার ছেড়ে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। তার শরীরটা একটু-একটু কাঁপছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, সুশোভন ঝপ করে চেপে ধরবে। এই ফাঁকা ঘরে শয়তান ছেলেটা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

কয়েক পা এগিয়ে গেল সুজয়া কোনও বাধা পেল না। দরজার কাছে গিয়ে সে আবার বলল, যাচ্ছি।

সুশোভন তার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে। যেন পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে কৌতুক। সে বলল, এক্ষুনি যেতেই হবে?

—হ্যাঁ।

—আমি যে কথাটা বললুম, তার কোনও উত্তর দিলে না?

—বিয়ে জিনিসটা আমার কাছে এত সহজ বলে মনে হয় না।

—ঠিক আছে। আমি তো আরও দু-তিনদিন এখানে আছি। এর মধ্যে আর একটু চিন্তা করে দেখো।

॥ ৫ ॥

সুজয়া ধীরপায়ে হেঁটে এল রাস্তা দিয়ে। দূরত্ব বেশি নয়, তবু যেন মনে হচ্ছে রাস্তা ফুরোচ্ছে না। অথচ বেশি জোরে হাঁটতে পারছে না, শরীরের মধ্যে একটা অবশ ভাব।

রাত খুব বেশি নয়। সাড়ে আটটার মতন। কিন্তু এর মধ্যেই এই ছোট্ট শহরটাকে ঘুমন্ত মনে হয়। আজকাল আর সমুদ্রের ধারে বেশি রাত পর্যন্ত কেউ বেড়ায় না।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকে সুজয়া একবার তাকাল ডাক্তারবাবুর ঘরের দিকে। সাধারণত প্রতিদিনই এ সময়ে কিছু লোকজন থাকে। আজ আর অন্য কেউ নেই। বিরাট টেবিলটাতে একটা টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে ডাক্তারবাবু নিমগ্ন হয়ে কী যেন লিখছেন।

সমস্ত ঘরটা যেন অন্ধকার, টেবিলল্যাম্পের আলোয় শুধু দেখা যায় ডাক্তারের মুখ আর খানিকটা অংশ। এই আলোয় ডাক্তারের ফরসা মুখখানা অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও ধ্যানী পুরুষ।

সুজয়া দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ডাক্তার হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন। তারপর বললেন, কী খবর? এসো, ভেতরে এসো—

সুজয়া একটুখানি ভেতরে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করাই হয়নি। তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, না কোনও অসুবিধে নেই।

—ভালো লাগছে?

—খুব ভালো লাগছে।

—তুমি ইচ্ছে করলে ওই চেয়ারে বসতে পারো। অথবা যদি ওপরে যেতে চাও আমি আটকাবো না।

সুজয়া একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তক্ষুনি নিজের ঘরে একা যেতে ইচ্ছে করছিল না। একটু আগে সুশোভন যে-সব কথা বলেছে, সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করতেও সাহস হচ্ছে না তার। বরং এখানে বসে পড়ার পর মনটা অনেক হালকা লাগছে।

কিছুক্ষণ চুপ করেই বসে রইল। ডাক্তার ওলটাতে লাগালেন খাতার পাতা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায়, সুজয়া একটু লজ্জা পেয়ে গেল। ডাক্তার তাকে বলেছিলেন, তাঁর খাতাপত্র লেখার সাহায্য করতে আর নার্সিংটা একটু শিখে নিতে। এই ক'দিনে সেসব কিছুই করে নি সে।

লাজুকভাবে বলল, আপনার খাতাপত্র লেখার কাজ দেবেন বলেছিলেন—

—তুমি করবে?

—হ্যাঁ, আপনি একটু দেখিয়ে দিলেই।

—সারাদিন যত রুগি দেখি, তাদের যে ব্যবস্থাপত্র দিই, তার ওপর একটা সব মিলিয়ে নোট রাখা আমার অভ্যেস। পরে কাজে লাগে খুব। তোমাকে আমি সব বলে দিলে তুমি যদি লিখতে পারো।

—নিশ্চয়ই পারব।

—তা হলে রোজ সন্ধের পর বসতে হবে আমার সঙ্গে।

—আপনি খবর দিলেই আমি আসব। আমাকে একটু-আধটু নার্সিং শেখাবেন বলেছিলেন।

—তোমার কি শেখার ইচ্ছে আছে? আমি বলছি বলেই যে শিখতে হবে, তার কোনও মানে নেই। সবার তো সব কিছু ভালো লাগে না?

—না, আমার ভালো লাগবে। আপনি আমাকে এত সাহায্য করেছেন, আর আমি এইটুকু পারব না।

ডাক্তার নারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবার সরলভাবে হাসলেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, সবসময় মনের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতাবোধ জাগিয়ে রাখলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। তোমার

যে-টুকু ইচ্ছে হয় তাই করবে।

সেদিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চোকবার পর সুজয়া যখন নিজের ঘরে শুতে এল, আলো নেভানোর পর অন্ধকারে সেই দিনই সুজয়ার প্রথম মনে হল, তার ঘরটা বড় নির্জন। ছাদের ওপরে একদম একা। কেমন যেন ভয় ভয় করে। এর চেয়ে নিচে অন্য মানুষজনের সঙ্গে থাকলেই যেন অনেক ভালো হত।

একা হওয়া মাত্রই সুশোভনের কথাগুলো তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। বিয়ে? একটা ভালোবাসার কথা নয়, তার আগেই একজন দুম করে তাকে বিয়ে করার কথা বলে ফেলল, তবু বিয়ে কথাটাই রক্তের মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করে। সুশোভনকে সে চেনে, হালকা চ্যাংড়া টাইপের ছেলে, মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরা আর তাদের জ্বালাতন করাই ওর স্বভাব। কিন্তু বিয়ে? আর কারুকে কি ও এরকম বিয়ের কথা বলেছে।

সুজয়ার মনে হতে লাগল, সুশোভন তাকে কোনওরকম বিপদে ফেলে দেবে না তো? সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে যেন ভেসে উঠল ডাক্তারবাবুর মুখটা। টেবিলল্যাম্পের আলোয় সেই শান্ত সুন্দর মুখ। সুজয়ার মনে হল, ওই মানুষটি তাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

সেই নিশ্চিন্ততা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল সুজয়া।

পর দিন থেকেই সে সন্ধের পর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কাজে বসতে লাগল। ডাক্তারবাবু তাকে প্রতিটি রোগীর হিস্ট্রি বলে যান, সুজয়া সেগুলি লেখে। দু-একদিনের মধ্যেই এ কাজে বেশ আগ্রহ জন্মে গেল তার। এটা যেন একটা রিসার্চের কাজের মতন। প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা ইতিহাস। প্রত্যেকটি অসুখ, তা যত ছোটখাটোই হোক না কেন, তার সঙ্গে যে আগেকার অসুখ-গুলোরও সম্পর্ক আছে। এই সমস্ত কেস-হিস্ট্রিগুলোর ওপর ভিত্তি করে ডাক্তারবাবুর পরে একটা বই লেখার ইচ্ছে আছে।

তা ছাড়া এখানে বসে থাকার সময় সুজয়ার মনে কোনওরকম অশান্তি থাকে না। ডাক্তারের কোমলভাবে কথা বলার ভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি—এ সবই তাকে খুব ভরসা দেয়। তার প্রতি এতখানি গুরুত্ব দিয়ে কখনও কেউ কথা বলেনি। ডাক্তার প্রতিটি বিষয়ে তাকে খুব প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন। কাজ শেষ হওয়ার পর সুজয়া যখন ওপরে শুতে আসে, তখন সে একটুও ক্লান্তি বোধ করে না, বরং বেশ তৃপ্তি নিয়ে ঘুমোয়।

সুজয়া আবার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিল। যদি সুশোভন ওত পেতে থাকে! সে যে-কোনও উপায় সুশোভনের হাত থেকে নিষ্কৃতি চায়।

দিন তিনেক বাদে সকাল এগারোটার সময় চাকর এসে সুজয়াকে খবর দিল একজন ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন। সুজয়া তখন নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিল।

কথাটা শুনে প্রথমে সে খানিকটা ভয় পেয়ে গেল। কে আসবে তাকে ডাকতে? কলকাতা থেকে তার বাড়ির কেউ আসেনি তো? পরক্ষণেই বুঝতে পারল, এ সুশোভন ছাড়া আর কেউ নয়। সেই আগের দিন এ বাড়ি দেখে গেছে।

সুজয়া বুঝতে পারল না, ওকে নিয়ে কী করবে। এ বাড়িতে কেউ তাকে কখনও ডাকতে আসে না। সুশোভন যদি জোর করার চেষ্টা করে? ভয় দেখায়?

সুজয়া চাকরকে বলল, তুমি বলে দাও, আমি এখন ব্যস্ত আছি, এখন কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

চাকর নিচে নেমে গেল। একটু পরেই আবার ফিরে এসে বলল, বাবু বললেন, একবার দেখা করেই চলে যাবেন।

সুজয়া মনের জোর পেয়ে গেছে। সে এবার দৃঢ়স্বরে বলল, না, আমি এখন যেতে পারব

না। বলে দাও, আমার সময় নেই।

সুজয়া ছাদে গিয়ে পাঁচিলের পাশে দাঁড়াল। নিজেকে আড়াল করে; এখান থেকে বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখা যায়।

সুজয়া দেখতে পেল, সুশোভন বেরিয়ে যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে। মোড় বেঁকবার আগে পর্যন্ত সে কয়েকবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এ বাড়ির দিকে। তার চোখে মুখে কীরকম যেন একটা অবাক-অবাক ভাব।

সুজয়া ভাবল, নিজের ঘরে নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবু এখন রোগী দেখছেন। তিনি যদি জানতে পারেন, কী লজ্জার ব্যাপার হবে একটা ছেলে তাকে ডাকতে এসেছিল, সুজয়া দেখা করল না, এতে অন্যরা কী ভাববে কে জানে।

সেদিন সন্ধেবেলা কিন্তু ডাক্তারবাবু এ সম্বন্ধে একবারও কিছু উল্লেখ করলেন না। সুশোভনের কথা তিনি জানেন কিনা তাও বোঝা গেল না।

সুজয়ার আগের জীবনের কথা ডাক্তাববাবু একবারও জিগ্যেস করেননি। অন্নপূর্ণার কাছে থেকে তিনি শুনেছেন কিনা তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে তাও বোঝার উপায় নেই।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে যায়। চাকর দু-বার খাওয়ার জন্যে ডাকতে আসে, ডাক্তারবাবু তাকে বলে দেন, একটু পরে যাচ্ছি। নিজে ডাক্তার হলেও তিনি স্বাস্থ্যের কোনও নিয়ম মানেন না। রাত্রে কখন খান তার ঠিক নেই। সুজয়া চলে যাওয়ার পরও তিনি এক-একদিন রাত জেগে লেখার কাজ করেন ওই ঘরে বসে।

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলে যাচ্ছিলেন, সুজয়া কলম থামিয়ে চুপ করে বসে আছে। ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, কী, লিখছ না?

সুজয়া লজ্জা পেয়ে গেল। লজ্জা লুকোবার জন্যে সে নিচু করল মুখ। সে এতক্ষণ কোনও কথাই শুনছিল না, একদৃষ্টে দেখছিল ডাক্তারবাবুকে, কেন যে ওই মুখখানার দিকে নির্নিমেষ ভাবে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে তার। ওই মানুষটি যেন পুরুষশ্রেষ্ঠ। ওরকম আর কেউ নেই। সুজয়ার ইচ্ছে করে ওঁর একেবারে বুকের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াতে। ওই চওড়া বুকে একবার মাথা রাখে।

সুজয়া চমকে উঠল। এ কি ভাবছে সে! এরকম অসম্ভব চিন্তা তার মনে এল কী করে?

ডাক্তার বললেন, তোমার নিশ্চয়ই ঘুম পেয়েছে। তুমি এবার ওপরে যাও।

সুজয়া তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, না, আমার ঘুম পায়নি।

—তোমার বোধহয় এইসব নীরস কথা শুনতে ভালো লাগছে না।

—হ্যাঁ, ভালো লাগছে। আপনি যা বলেন, সবই আমার ভালো লাগে শুনতে।

এই কথা বলে আরও বেশি লজ্জা পেল সুজয়া। ঠিক এইরকমভাবে সে বলতে চায়নি। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

ডাক্তার হাসিমুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, জানো, তোমার কথা আমি প্রায়ই চিন্তা করি।

—আপনি আমার কথা ভাবেন?

—হ্যাঁ। আমি ভাবি, তুমি ভবিষ্যতে কী করবে? আমার বাড়িতে এই সামান্য চাকরি করে তো তোমার সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তুমি কিছু ভাব কি?

—না। আমি ভবিষ্যতের কথা বেশি ভাবতে পারি না। যা হওয়ার তাই হবে।

—তবু একটা কিছু তো ঠিক করে রাখা দরকার। প্রত্যেকের জীবনেই একটা কিছু উচ্চাশা থাকা উচিত।

—আমি আপনার পাশে থেকে এইরকম কাজ করেই যেতে চাই। আপনি যদি কখনও আমাকে

চলে যেতে না বলেন—তবে এই কাজটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগবে। আমার আর কিছুই দরকার নেই।

—তা তো হয় না।

—কেন হবে না। আপনি যখন রাত জেগে এ ঘরে বসে কাজ করেন, তখন আপনাকে খুব একা লাগে। এ বাড়িতে এত লোক, কিন্তু আপনার কাজের ব্যাপারে আর তো কেউ সাহায্য করে না।

—ডাক্তারকে আবার কে কী সাহায্য করবে। আমার তো সেরকম কোনও সাহায্যের দরকার নেই।

—তবু আমি যদি কোনও সাহায্য করতে পারি—

—তুমি আমার সঙ্গে নুলিয়া বস্তিতে যেতে পারবে? ওদের যদি কিছু স্বাস্থ্যের নিয়ম শেখানো যায়, যদি ওদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় কেন রোগ হয়, কী করে তা আটকানো যায়—তা হলে সত্যি কিছু কাজ করা হয়।

চোখমুখ উজ্জ্বল করে সুজয়া বলল, নিশ্চয়ই যাব। রাত্রে শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ সুজয়ার ঘুম আসে না, সে শুধু ডাক্তারবাবুর কথাগুলোই চিন্তা করে। সে কোনও কাজে লাগতে পারবে, এর জন্যেই সে একটা নতুনরকমের আনন্দ বোধ করে।

সুজয়া টের পেল, তার শরীরে মাঝে-মাঝেই একটা শিহরণ খেলে যায়। একটা অন্যরকম অনুভূতি। সারাদিন ধরে সে ডাক্তারবাবুর একটা মুখের কথা শোনার জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকেও আশ মেটে না। ওঁর খুব কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে করে। এমন কি একথাও সে ভাবে, তার যদি কোনও অসুখ হয়, তা হলে ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই তার হাত ছুঁয়ে দেখবেন, মাথার কাছে এসে বসবেন। ইস, এক্ষুনি কেন একটা অসুখ হয় না!

একটু পরে সুজয়া আবার ভয় পেয়ে যায়। এইসব চিন্তার মানে কী? একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ তার মন প্রাণ সম্পূর্ণ জুড়ে ফেলেছে। এরকম ব্যাপার সুজয়ার জীবনে আগে কখনও ঘটেনি। এরই নাম কি ভালোবাসা। সুজয়া শিউরে ওঠে। একি সর্বনাশের ইঙ্গিত এসে গেল তার জীবনে।

দিন দুয়েক বাদে সুজয়া রাত্রিবেলা শুতে এসেছে, দেখল, একজন লম্বা মতন লোক দাঁড়িয়ে আছে ছাদের আলসের কাছে। প্রথমে সুজয়ার বুকের মধ্যে কাঁপুনি লেগেছিল, তারপরই মনে পড়ল, এই লোকটিই অন্নপূর্ণার ভাই হেমেন্দ্রনাথ। গতকাল উনি এসেছেন। হেমেন্দ্রনাথের তারা দেখার শখ আছে।

সুজয়া আবার নিচে নেমে গেল। দোতলার দিকে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ সময় কাটাল। হেমেন্দ্রনাথ নিশ্চয় নেমে আসবেন। অলকার খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া অভ্যাস। তিনি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। অন্নপূর্ণা অবশ্য জেগে আছেন। প্রায় রাত্রে তার ঘুম হয় না। রাত জেগে তিনি গল্পের বই পড়েন। ডাক্তারবাবু ওপরে না উঠে আসা পর্যন্ত অন্নপূর্ণার ঘরে আলো জ্বলে।

সুজয়া ছাদে ফিরে এসে দেখল, হেমেন্দ্রনাথ তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দীর্ঘ চেহারাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, ঠোঁটে একটা সিগারেট জ্বলছে।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে হেমেন্দ্রনাথ সুজয়ার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আপনি এই ঘরটায় থাকেন?

সুজয়া বলল, হ্যাঁ।

হেমেন্দ্রনাথ কয়েক পা এগিয়ে ঘরটার জানলার পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, দিদির বিয়ে হওয়ার পরে আমি প্রায়ই এসে এখানে থাকতাম। তখন এই ঘরটা রাখা থাকত আমার জন্যে।

আপনার এখানে একা থাকতে ভয় করে না?

সুজয়া বলল, না।

—অনেক মেয়েকেই তো দেখেছি, রাত্তিরবেলা ছাদে একা যেতে ভয় পায়।

—কিসের ভয়?

হেমেন্দ্রনাথ শুকনো ভাবে হেসে বললেন, তা ঠিক। কিসের ভয়? আজকাল আর অনেকেই ভূত-টুতের ভয় পায় না। আমি এখানে থাকলে আপনার অসুবিধে হবে।

সুজয়া ইতস্তত করে বলল, না। অসুবিধে কেন হবে।

—আমার অনেক রাত পর্যন্ত ছাদে থাকতে ভালো লাগে। আপনি তারা দেখেন?

—না।

—আমি চিনিয়ে দিতে পারি। সপ্তর্ষি কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?

পরিচ্ছন্ন নির্মল রাত। আকাশে মেঘ নেই। ঝকঝক করছে অসংখ্য তারা। সমুদ্রের ঢেউয়ের অশান্ত গর্জন ভেসে আসছে। এখান থেকেই দেখা যায়। বাতাসে একটা কিছুর গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধটা আসলে আসছে হেমেন্দ্রনাথের মুখ থেকে।

হেমেন্দ্রনাথ নিচু হয়ে টেলিস্কোপের পাশে তোলা একটা বোতল তুলে চুমুক দিলেন। শুধু তারা দেখার জন্যেই হেমেন্দ্রনাথ ছাদে আসেন না, অন্য আকর্ষণও আছে। প্রতিদিন মদ্যপান করা তার অভ্যেস। এ বাড়িতে ওই ব্যাপারটা প্রকাশ্যে চালানো অসম্ভব।

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, আপনার সব কথা শুনেছি। আপনার বিয়ে হয়েছে?

সুজয়া বলল, না।

—কারুর সঙ্গে কিছু ঠিক করা আছে?

—না।

—আপনি চাকরি করবেন ঠিক করেছেন?

—হ্যাঁ।

—বি. এ. পাস তো। আপনার জন্যে জামসেদপুরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ওখানে আমার অনেক জানাশুনো আছে। শ চার-পাঁচেক মাইনে পাবেন, বেশিও হতে পারে। বোনাস আছে।

সুজয়া চুপ করে রইল। তার অন্য কোনও চাকরির দরকার নেই। সে এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না।

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, আপনি আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রাখবেন।

সুজয়া বলল, আমি এখানেই বেশ আছি।

—এখানে কত পান? শুনলাম তো একশো টাকা।

—আমার তো বিশেষ কিছু লাগে না।

হেমেন্দ্রনাথ আবার হাসলেন। শুকনো ধরনের হাসি। তারপর টেলিস্কোপটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আসুন, এইখানটায় চোখ লাগিয়ে দেখুন।

সুজয়া সামনে চোখ রাখলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাঁর কাঁধের ওপর দুটো হাত রাখলেন। হাতদুটো সেখানেই রয়ে গেল।

সুজয়ার শরীরটা কেঁপে উঠল। পুরুষের এই স্পর্শ চিনতে ভুল হয় না। হেমেন্দ্রনাথ সুজয়ার ঘাড়ের ওপর থেকে চুল সরিয়ে সেখানে একটা আঙুল বুলোচ্ছেন।

সুজয়া ছিটকে সরে এল।

হেমেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, ভয় নেই।

তারপর তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। শার্টের সবক'টি বোতাম খুলে বুকটা একেবারে ফাঁকা করে ফেললেন। তারপর বললেন, কাছে এগিয়ে আসুন, এই যে বুকের এই পাশটা দেখতে পাচ্ছেন মস্ত বড় একটা কাটা দাগ? একবার গুন্ডাদের হাত থেকে একটি মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে এইখানে ছুরি খেয়েছিলাম। সবাইকে জিগ্যেস করে দেখবেন। আমার কাছ থেকে মেয়েদের কোনও ভয় নেই। আমি মেয়েদের ভালোবাসি।

সুজয়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

হেমেন্দ্রনাথ আবার বললেন, আপনি বাড়ি থেকে চলে এসেছেন অ্যাডভেঞ্চার করবার জন্যে—তাহলে সব পুরুষমানুষকেই ভয় পেলে চলবে কেন?

এবারও সুজয়ার মুখে কোনও কথা এল না।

এবার নারীর উদ্ধারকর্তা হেমেন্দ্রনাথ নিজেই কয়েকপা এগিয়ে এসে সুজয়ার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, আমি আপনাকে কোনও বিপদে ফেলব না। কী সুন্দর এই রাতটা, আমরা দুজনে এখানে আছি, আপনি আমাকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারেন।

বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ হেমেন্দ্রনাথ তাঁর একটি হাত সুজয়ার কোমরে রেখে আলতোভাবে আকর্ষণ করলেন নিজের দিকে।

সুজয়া ব্যাকুলভাবে মিনতি করে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন।

—কেন ভয় করছে?

—আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে ছেড়ে দিন।

হেমেন্দ্রনাথ সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি কারুর ওপর জোর করি না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যান, আমিও নিচে যাচ্ছি।

সারারাত ঘুম এল না সুজয়ার। সে বুঝতে পেরেছে, হেমেন্দ্রনাথ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। হেমেন্দ্রনাথ অন্নপূর্ণার ভাই, এ বাড়িতে একজন সম্মানিত মানুষ। তাঁর নামে নালিশ করা যাবে না কারুর কাছে। হেমেন্দ্রনাথকে দিনেরবেলা অন্যদের মাঝে সে দেখেছে, অত্যন্ত হাসিখুশি মজলিশি মানুষ। তাঁর চরিত্রে কোনও মালিন্য কেউ কল্পনা করতে পারবে না। মানুষ কীরকম অসম্ভব বদলে যায় অন্য পরিবেশে। সুজয়ার সঙ্গে তার পরিচয় অল্প সময়ের, অমনি সুশোভনের মতন...। সব পুরুষই কি সুশোভনের মতন ব্যবহার করে? ভালোবাসার কথা কেউ বলে না, শুধু শরীরের দিকে লোভ।

তারপরেই মনে পড়ল ডাক্তারবাবুর কথা। ওই একটি মাত্র মানুষ একবারও একটুও অশোভন ব্যবহার করেননি। রাত্তিরবেলা নির্জন ঘরে থেকেছে তবুও না। ওই মানুষটারও কোথায় যেন একটা গোপন দুঃখ আছে, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করবেন না সেকথা।

ডাক্তারবাবুর কথা মনে আসতেই সুজয়ার রক্তস্রোত দ্রুত হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, তার আসল বিপদ নিজের কাছ থেকেই। ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেই তার শরীরে একটা আনন্দের ঢেউ আসে। সে নিজেই নিজের সর্বনাশ করে ফেলেছে। ডাক্তারবাবুকে এতোটা ভালোবেসে ফেলার পরিণাম কি।

অনেক ভেবেচিন্তে সুজয়া বুঝতে পারল, এই সংসারে থাকলে ক্রমেই জটিলতা বাড়বে। অন্নপূর্ণার মনে সে কিছুতেই দুঃখ দিতে পারবে না। ডাক্তারবাবু কিংবা হেমেন্দ্রনাথ যে-কোনও একজনের ব্যাপারে জানতে পারলেই অন্নপূর্ণা মনে আঘাত পাবেন।

সুশোভন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সে কেন রাজি হল না? এটাই তো একমাত্র বাঁচার পথ। একজন নিজে থেকে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, এতে তো তার অসম্মানের কিছু নেই। সুশোভন একটু হালকা ধরনের ছেলে—কিন্তু সুজয়া কি সেটুকু বদলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে পারত না।

তার মনে পড়ল, এ বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার সময় রাস্তায় সুশোভনের বারবার ফিরে তাকানো। তখন তার মুখখানাতে আন্তরিক একটা ছাপ ছিল। সুজয়া তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় একটা অবাক অবাক ভাব ফুটে উঠেছিল তার মুখে।

সুজয়া মন ঠিক করে ফেলল।

পরদিনই সকালেই সুজয়া গেল সুশোভনের দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে। সেখানে শুনতে পেল, সুশোভন আগের দিনই ফিরে গেছে কলকাতায়। ওঁদের আর এখানে মন টিকছে না। ওঁরা চলে যাচ্ছেন চিল্কায়।

সুজয়া মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। সুশোভনের কথা ভেবে তার বুকটা মুচড়ে উঠল। বারবার মনে পড়তে লাগল তার সেই অবাক মুখের ভাবটা।

॥ ৬ ॥

সুজয়া ঘুমোয়নি, কিন্তু আলো নিভিয়ে শুয়েছিল। এই সময় তার জানলার সামনে একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি দাঁড়াল।

হেমেন্দ্রনাথের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঘুমিয়ে পড়েছেন?

সুজয়া কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। সাড়া দিল না, আজ ওপরে এসে ছাদে হেমেন্দ্রনাথকে না দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সারাদিনই প্রায় তিনি বাড়ি ছিলেন না। হেমেন্দ্রনাথ এখানে এখন বেশ কিছুদিন থাকবেন—তাঁর ব্যাবসার ব্যাপারে এখানে কী যেন কন্ট্রাক্টের কথা চলছে।

হেমেন্দ্রনাথ আবার ডাকলেন, কী ঘুমিয়ে পড়েছেন? সুজয়া? সুজয়া?

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা গেল না। হেমেন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দা। তিনি ডেকেই চলেছেন।

সুজয়া ঘুম থেকে ওঠার ভান করে বলল, কী বলছেন?

—আপনার ঘরে কাচের গেলাস আছে একটা? দিন তো।

সুজয়া আলো না জ্বেলেই কাচের গেলাসটা জানলার শিক গলিয়ে বাইরে বার করে দিল। হেমেন্দ্রনাথ সেটা নিয়ে ঘরের মধ্যে চোখ বুলোলেন।

জানলার পাশেই রাখা একটা জলের কুঁজো। সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে হেমেন্দ্রনাথ বললেন, কুঁজোটা বার করে দিন, ওটাও আমার লাগবে।

সুজয়া দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। সে ভেবেছিল, কিছুতেই ঘরের দরজা খুলবে না। কিন্তু গেলাসটা জানলার শিক গলিয়ে বাইরে দিলেও কুঁজোটা তো সেইভাবে দেওয়া যাবে না। ঘরে আর কোনও পাত্রও নেই যে তাকে জল ঢেলে দেবে।

আর কোনও উপায় নেই। চোর-ডাকাত হলে জোর করে দরজা আটকে রাখা যায়। কিংবা চিৎকার করে লোকজন ডাকা যায়। কিন্তু বাড়ি লোকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় কী? এখন যদি চেঁচিয়ে লোক ডাকেও, তাতে কি লাভ হবে? এরপর এ বাড়িতে সে থাকতে পারবে? পুরুষ মানুষের যতই দোষ থাকুক, তার ক্ষমা আছে। কিন্তু সে একটা অপরিচিতা মেয়ে।

দরজা খুলে সুজয়া কুঁজোটা বাড়িয়ে দিল। হেমেন্দ্রনাথ হাতের বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢেলেছেন, সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এতে খানিকটা জল মিশিয়ে দিন।

সুজয়া বিনাবাক্যে কুঁজো থেকে জল ঢেলে গেলাসটাকে ভরতি করে দিল। তারপর বলল, কুঁজোটা এখানে রাখি?

—হ্যাঁ, রাখুন। তারপর এইখানটায় বসুন।

হুকুমের সুরে কথাগুলো বলে হেমেন্দ্রনাথ বসলেন ঘরের সামনের সিঁড়িতে। হাত দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করে দিলেন।

সুজয়া বলল, যদি কিছু মনে না করেন, আমার ঘুম পেয়েছে, আমি একটু ঘুমোতে যাব?

হেমেন্দ্রনাথ হেসে বললেন, কী অদ্ভুত কথা বলছেন? ঘরের সামনে বসে একজন পুরুষ মদ খাবে, আর সেই ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে কি তখন ঘুমোতে পারে? এটা অসম্ভব ব্যাপার!

সুজয়ার বলতে ইচ্ছে করছিল, তা হলে আপনি এখানে বসেছেন কেন? একটু অন্য জায়গায় গেলে কী হত? তাছাড়া সারা বাড়ি এখন নির্জন হয়ে গেছে, অনেকেই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে, দোতলায় বসে ওই ছাঁইপাঁশ খেলেই বা কে কী বলত? অলকাই বা কীরকম স্ত্রী? তার স্বামী এত রাত পর্যন্ত ছাদে থাকে, সেখানে আর-একটি মেয়ে রয়েছে—তবু অলকা স্বামীর খোঁজ নিতে আসে না কেন?

কিন্তু এসব কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। এ বাড়িতে সুজয়ার সে অধিকার নেই।

সুজয়াকে চুপ করে থাকতে দেখে হেমেন্দ্রনাথ বললেন, একটু পরে ঘুমোলেও চলবে। এখানে একটু বসুন, কয়েকটা কথা বলি।

সুজয়া ম্লান গলায় বলল, কী বলবেন বলুন, আমি দাঁড়িয়েই আছি।

হেমেন্দ্রনাথ তার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, আরে বোসো না। তুমি তো বড্ড জেদি মেয়ে!

সুজয়া আড়ষ্টভাবে বসে পড়ল। হেমেন্দ্রনাথ গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সন্তুষ্টভাবে বললেন, আজ একটা দেড় লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট পেয়েছি। মনটা ভালো আছে, আজ একটু সেলিব্রেট করা দরকার।

—আপনি আমাকে কী যেন বলবেন বলছিলেন।

—তোমাকে তো বলছিই, আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই, আমি মানুষটা খারাপ না, কারুর কোনও ক্ষতি করি না।

—আমি তো ভয় পাইনি।

—বাঃ, এইটিই তো খুব ভালো কথা।

হেমেন্দ্রনাথ তার একটি হাত সুজয়ার উরুর ওপর রাখলেন। একটি বলিষ্ঠ রোমশ হাত।

সুজয়া বলল, আপনি কি এইভাবে আমাকে পরীক্ষা করছেন, আমি ভয় পাই কিনা।

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, এটা কোনও ভয় পাওয়ার ব্যাপারই নয়। এতে কি তোমার বিপদ আছে?

—আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

—ব্যাপারটা খুব সোজা। তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছো অ্যাডভেঞ্চার করার জন্যে। অনেক ছেলেও এরকম বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। যায় না? তুমি না হয় একটু নতুনত্ব দেখেছ—এই যা। কিন্তু তুমি নিশ্চয় ছেলেদের সমান সমান হওয়ার চেষ্টা করবে? তাহলে শরীর সম্পর্কে তোমার এত ছুঁৎমার্গ কেন? বাড়ি থেকে পালানো কোনও ছেলের সঙ্গে যদি অচেনা কোনও মেয়ের এরকম ঘনিষ্ঠতা হয়। সে কি ভয় পায়? মেয়ে হয়ে তুমি বা ভয় পাবে কেন? আজকালকার দিনে?

—কিন্তু আমি যদি একা থাকতে চাই?

—আজকালকার দিনে কারুর পক্ষে একা থাকা অসম্ভব। কোনও মেয়ের পক্ষে আরও অসম্ভব। আমি যখনই কল্পনা করি, এই ছাদের ঘরে অন্ধকারে একটি মেয়ে, তাও কুমারী, একলা রয়েছে, তক্ষুনি আমার মনটা ছটফট করে। আমার মন বলে, এটা চলে না। আমার ইচ্ছে করে তোমার কাছে চলে আসতে, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে।

—কিন্তু আপনার তো স্ত্রী আছে, আপনি বিবাহিত।

—তাতে কী হয়েছে? তাতে বন্ধুত্ব করার কী দোষ আছে?

সুজয়া হেমেন্দ্রনাথের হাতখানি নিজে উরু থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, এই বুঝি বন্ধুত্ব?

—ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব একেবারে নিরামিষ হলে চলে না।

অতর্কিতে হেমেন্দ্রনাথ সুজয়ার কাঁধটা ধরে টেনে এনে তার ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলেন। সুজয়া ছটফট করে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ কঠিন হাতে আঁকড়ে আছেন তাকে।

চুম্বন শেষ করার পর হেমেন্দ্রনাথ হাসতে-হাসতে বললেন, কী, এটা কী খারাপ ব্যাপার?

সুজয়ার চোখে জল এসে গেছে। তার মনে হচ্ছে, হেমেন্দ্রনাথ একটা বদ্ধ উন্মাদ, এর হাত থেকে সে সহজে নিস্তার পাবে না।

কান্না মেশানো গলায় সুজয়া বলল, এ আপনি কী করলেন?

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, কিছু না। এতে পৃথিবীর কারুর কিছু ক্ষতি হয়নি। শুধু একটু ভালো লাগায়।

সুজয়া রাগে জ্বলে উঠে বলল, আমার এসব মোটেই ভালো লাগে না।

—আস্তে-আস্তে ভালো লাগবে।

—না!

—এত রাগ করছ কেন? একটু চুপ করে বোসো।

হেমেন্দ্রনাথ সুজয়ার রাগটাই শুধু টের পেলেন, তার চোখের জল দেখলেন না। তখনও সুজয়ার চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে।

হেমেন্দ্রনাথ বললেন, বুদ্ধিমান মেয়েদের উচিত এসব একটু-আধটু ফুর্তির ব্যাপার খুব সাধারণ ব্যাপার হিসেবে নেওয়া। এর বদলে কোনও সুযোগ বা সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। যেমন আমিই তোমাকে সাহায্য করতে পারি—

—আমার ঘেন্না হয়।

কথা বলতে-বলতে সুজয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার হেমেন্দ্রনাথও একটু রেগে গেছেন। তিনি হুকুম দিলেন, কাছে এসো।

—না।

হেমেন্দ্রনাথ উঠে ধরতে এলেন সুজয়াকে। সুজয়া চট করে সরে গেল।

কিন্তু কোথায় যাবে সুজয়া? সারা ছাদে ছোটাছুটি করা চলে না। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেও নিস্তার নেই।

হেমেন্দ্রনাথ কয়েকবার ধরবার চেষ্টা করলেন সুজয়াকে। সুজয়া দৌড়ে-দৌড়ে সরে গেল আর চাপা গলায় বলতে লাগল, না-না—

হেমেন্দ্রনাথ ছাদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর ক্রুদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, কি ছেলেমানুষই করছ। দাঁড়াও! তোমাকে বলেছি তো তোমার কোনও ভয় নেই।

সুজয়া হাত জোড় করে কাতর গলায় বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন।

—আমি কি তোমাকে ধরে রাখতে চাইছি নাকি? শোনো, একটা কথা শুনে রাখো আমার কাছে, আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি বলেই বলছি, তুমি যদি এরকম ন্যাকামি করো, তাহলেই তুমি বেশি করে বিপদে পড়বে। আমি ভদ্রলোক, আমি তোমাকে বিপদে ফেলব না, কিন্তু অন্যরা তোমাকে ছাড়বে না।

সুজয়া এইসব কথা শুনে বশীভূত হয়েছে ভেবে হেমেন্দ্রনাথ আবার তাকে ছোঁবার জন্যে

এগোলেন। সুজয়া এক দৌড়ে সিঁড়ির দরজার কাছে পৌঁছে, তরতর করে নিচে নেমে গেল।

সারা বাড়ি একেবারে নিঝুম। শুধু দোতলায় অন্নপূর্ণার ঘরে আর একতলায় ডাক্তারবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। সুজয়া একতলায় এসে বাথরুমে ঢুকে গেল। বার বার মুখ ধুতে লাগল। তার ঠোঁটে যেন নোংরা লেগে আছে, কিছুতেই মুছছে না। তার জীবনে প্রথম চুম্বন। কোনও প্রেমিকের নয়, একজন লোভীর।

হেমেন্দ্রনাথের সামনে থাকার সময় নিজেকে সামলাবার জন্যে সুজয়া মনটাকে শক্ত করে রেখেছিল। এখন আর নিজেকে সামলাতে পারছে না। ভীষণ ঘেন্না আসছে, হাত দিয়ে মুখটা চেপে আছে ফোঁপানির আওয়াজ বন্ধ করার জন্যে।

বাথরুমের দরজা খুলে বেরুতে যেতেই দরজাটা জোরে শব্দ হল।

ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, কে?

কোনও উত্তর না দিয়ে সুজয়া চলে এল ডাক্তারের ঘরে। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল, চোখে তখনও জল ঝরছে।

ডাক্তার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে কী একটা চার্ট দেখছিলেন। অবাক মুখখানা ফিরিয়ে জিগ্যেস করলেন, একি! কী হয়েছে?

সুজয়া কোনও উত্তর দিতে পারল না।

ডাক্তার নিজের জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, কী ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

সুজয়া ডাক্তারের দিকে একটুক্ষণ অপলকভাবে তাকিয়ে রইল। চোখের জলের ঝাপসা দৃষ্টিতে তার মনে হল, পৃথিবীতে এই একজন মাত্র মানুষের কাছে সে নিশ্চিন্তে আশ্রয় চাইতে পারে।

সুজয়া দৌড়ে এল ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার জিগ্যেস করলেন, হঠাৎ ভয়-টয় পেয়েছ নাকি? ছাদের ঘরে একলা থাকো, আমি ভেবেছিলাম।

সুজয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি ভয় পাইনি। একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আপনি আমাকে কখনও দূরে সরিয়ে দেবেন না, বলুন!

—হঠাৎ এই কথা।

—আপনি আমাকে কখনও ভুল বুঝবেন না?

—তোমার কী হয়েছে বলো তো ঠিক করে? এসো এই চেয়ারটাতে বসো।

সুজয়া চেয়ারে বসল না। তার বদলে সে আরও এগিয়ে ডাক্তারের ডানহাতটা চেপে ধরল। উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছে। শুধু যে হেমেন্দ্রনাথের ব্যবহারের জন্যে এ উত্তেজনা, তা নয়। বোধহয় আরও কিছু।

সুজয়া বলল, আমি এখানেই থাকব, আর কোথাও যাব না!

—তুমি তো এখানেই থাকবে, কোথায় আবার যাবে?

—শুধু এইখানে।

এবারে সুজয়া যা করল, তা সে নিজেই ভাবেনি। সে ডাক্তারের বুকে মাথা রেখে বার বার বলতে লাগল, শুধু এইখানে আর কোথাও না, শুধু এইখানে।

ডাক্তার চমকে উঠলেন কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু তিনি সুজয়াকে সরিয়ে দিলেন না। তার ঘাড়ের কাছে হাত রেখে বললেন, ইস, তোমার গা এত গরম কেন? তোমার কী হয়েছে?

—আমার কিছু হয়নি।

সুজয়া মুখ তুলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। কী সুন্দর এই মুখ। কীরকম ভালোবাসা মাখানো ঠোঁট দুখানি। তৃষিতের মতন সেইদিকে তাকিয়ে রইল সুজয়া। ডাক্তারের স্পর্শেও কত

আনন্দের শিহরণ। ডাক্তারের শরীরের সঙ্গে তার শরীর এখনও লেগে আছে।

ডাক্তারের মুখে অল্প হাসি। শান্তগলায় বললেন, তোমার মুখে একটা সরলতার ছাপ মাখানো—

—জানি আপনার কাছে আমি কিছুই না, খুবই সামান্য একটা মেয়ে।

—না, তুমি সামান্য কেন হবে?

সুজয়া ডাক্তারের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়তে চাইছিল, মনের মধ্যে সংকোচ আর তীব্র ইচ্ছার লড়াই চলছে। এরকম তার কখনও হয়নি। ডাক্তারের শরীরের মধ্যে যেন একটা চুম্বক বসানো, তাকে টানছে ভীষণভাবে।

—জামাইবাবু!

সুজয়া একেবারে কেঁপে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হেমেন্দ্রনাথ।

সুজয়া ছিটকে সরে এল। সে ডাক্তারের হাত ধরেছিল, ডাক্তারের বুকে মাথা রেখেছিল, সবই হেমেন্দ্রনাথ দেখেছে নিশ্চয়ই। লজ্জায় একেবারে যেন মাথা কাটা গেল সুজয়ার। ছি, ছি, একি করল সে। ডাক্তারের সম্মান নষ্ট করে যদি কিছু বলে হেমেন্দ্রনাথ।

ডাক্তার কিন্তু লজ্জা বা আড়ষ্টতার ভাব দেখাল না। শান্তগলায় বললেন, কী খবর হেমু?

হেমেন্দ্রনাথ বলল, ঘুম আসছিল না, তাই আপনার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম। বিরক্ত করলাম নাকি?

—না, বোসো।

হেমেন্দ্রনাথ হাসি মুখখানা ঘুরিয়ে তাকালেন সুজয়ার দিকে। তারপর বললেন, তুমি বসো না, দাঁড়িয়ে কেন?

সুজয়া কোনওক্রমে ভাঙাগলায় বলল, না। আমি ওপরে যাই।

—আরে বসো-বসো, আমি এলাম বলেই চলে যাবে?—হেমেন্দ্রনাথ সুজয়াকে হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁকে বাধা দিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন, না। সুজয়া ওপরেই যাক। অনেক রাত হয়েছে।

সুজয়া ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় একটু দাঁড়াল। তার ইচ্ছে হল আড়ালে দাঁড়িয়ে একটু শোনে, হেমেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে কী বলে। ভয়ে সুজয়ার শরীরটা হিম হয়ে গেছে। তার একমাত্র ভয়, যদি হেমেন্দ্রনাথ ডাক্তারকে কিছু অপমান করে! সব দোষ তো সুজয়ারই। সেই তো নিজে ডাক্তারের হাত ধরেছিল, বুকে মাথা রেখেছিল। রাত্তিরবেলা একটি কুমারী মেয়েকে এই অবস্থায় ডাক্তারের সঙ্গে দেখলে, হেমেন্দ্রনাথ কি সেই সুযোগ ছাড়বেন? সুজয়ার কেন এরকম মতিভ্রম হল!

সুজয়া কিন্তু সেখানে দাঁড়াল না। ঘরের ভেতরের কথা এখান থেকে ভালো শোনা যায় না। তাছাড়া, এই অবস্থায় হঠাৎ কেউ যদি তাকে দেখতে পায়, তাহলে আরও খারাপ হবে।

সুজয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে লাগল। পা-দুটো বিষম ভারী মনে হচ্ছে। গত দু-তিনদিন তার জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যে সে আর মাথার ঠিক রাখতে পারছে না। এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে কোনও পরামর্শ নিতে পারে। একা-একা কি সব ঠিক করা যায়?

দোতলায় এসে সুজয়া দেখল অন্নপূর্ণার ঘরে আলো জ্বলছে। সেই ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল সুজয়া। একা থাকতে তার একটুও ভালো লাগছে না।

অন্নপূর্ণার ঘরের দরজাটার একটা পাল্লা ভেজানো। সুজয়া আস্তে-আস্তে সেখানে এসে দাঁড়াল। খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছেন অন্নপূর্ণা। পাশে ছড়িয়ে আছে তাঁর চুল। কোনও রাজপ্রাসাদের মহারানির মতন অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সুজয়া মৃদুগলায় ডাকল, দিদি!

অন্নপূর্ণা একটু চমকে এদিকে তাকালেন। খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না। হাসিমুখে বললেন, কে,

সুজয়া? এসো, ভেতরে এসো।

সুজয়া ভেতরে এসে দাঁড়াল।

অন্নপূর্ণা বললেন, এসো না। এইখানটায় এসে বসো। আমি উঠতে পারছি না, কিছু মনে করো না। আমার কোমরে বড্ড ব্যথা।

—আপনার কোমরে ব্যথা, তাহলে আমি যাই!

—ওমা, একি কথা? আমার কোমরে ব্যথা তুমি চলে যাবে কেন?

—আপনার কোমরে ব্যথা, তবু আপনি রাত জেগে বই পড়ছেন?

—তাতে কী হয়েছে? আমার সব সময়েই একটা না একটা ব্যথা থাকে। ভালো বই পড়লে তবে একটু আনন্দ পাই।

সুজয়া বিছানার একধারে বসে পড়ল। সে কিছুতেই তার ভেতরের উত্তেজনা দমন করতে পারছে না। নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল, কথা বলতে পারল না আর।

অন্নপূর্ণা কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, কী হয়েছে? খুব মন খারাপ হয়েছে বুঝি?

—না কিছু হয়নি।

কথা ঘোরাবার জন্যে সুজয়া সঙ্গে-সঙ্গেই আবার বলল, আপনার কোমরের কোনখানটায় ব্যথা? আমি একটু টিপে দেব?

দূর পাগল। কেউ যদি দেখে ফেলে কী বলবে?

—কেন, কী হয়েছে তাতে?

—কেউ দেখে ফেলবে বলবে আমি একটা বি.এ. পাস করা মেয়েকে ঝি-চাকরানির মতো খাটাচ্ছি!

—যার যা খুশি বলুক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।

অন্নপূর্ণা সুজয়ার হাতটা চেপে ধরে বললেন, না ভাই, সত্যি কিছু দরকার নেই, আমার ব্যথাটা সেরকম নয়। তোমার কী হয়েছে সত্যি করে বলো তো।

—জানি না, আমার কী হয়েছে আমি নিজেই জানি না।

অন্নপূর্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমি বলেছিলাম না। শরীরটাই একটা বাধা হয়ে উঠবে! মেয়েদের যে শরীরটাকে বাদ দিয়ে আর কিছুই করার উপায় নেই।

সুজয়া দারুণ চমকে উঠল। অন্নপূর্ণা এ কথা বললেন কেন? তা হলে কি অন্নপূর্ণা টের পেয়েছেন। তিনি কি সব কিছুই জানেন?

অন্নপূর্ণা সুজয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। কোনওরকম রাগ বা অবজ্ঞার চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে। তিনি আবার বললেন, মেয়েদের শুধু শরীরের জন্যেই অনেক কষ্ট পেতে হয়।

সুজয়া এতই অভিভূত হয়ে গেল যে তার চোখে জল এসে গেল।

অন্নপূর্ণা আবার জিগ্যেস করলেন, কী, খুব ভয় পেয়েছ বুঝি?

সুজয়া উত্তর দিল না।

ওপরের ঘরে থাকতে যদি ভয় করে তা হলে আমি দোতলাতেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

সুজয়া হাতের উলটোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল। হঠাৎ সে মন ঠিক করে ফেলেছে।

—না, তার দরকার নেই। আমি ওপরেই যাচ্ছি।

—এক্ষুনি যেতে হবে না, আর একটু বোসো তা হলে।

—আপনি বই পড়ছিলেন, আমার আসার জন্যে পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

—কথা বলার মানুষ পাই না বলেই তো বই পড়ি।

—দিদি, আপনাকে একটিবার প্রণাম করব?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সুজয়া উঠে গিয়ে অন্নপূর্ণার পা-দুটো চেপে ধরল। তারপর নিজের মাথাটা ছোঁয়াল সেখানে।

অন্নপূর্ণা পা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। কৌতুকের সঙ্গে বললেন, কী ব্যাপার কী? হঠাৎ রাতদুপুরে এত ভক্তি কেন? অতি ভক্তি তো চোরের লক্ষণ!

সুজয়া গম্ভীরভাবে বলল, দিদি, আপনার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

—জীবনটা তো এক্ষুনি ফুরিয়ে যাচ্ছে না। শোধ করার জন্যে এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? এমনও তো দিন আসতে পারে, সেদিন আমিই তোমার কাছে দয়া চাইতে যাব?

—আপনাকে দয়া করার সাধ্য কারোর নেই।

সুজয়া আর দাঁড়াল না। অন্নপূর্ণাকে খানিকটা অবাক করে রেখে ওপরে উঠে এল। ছাদের দরজাটা সিঁড়ি দিয়ে বন্ধ করা যায়, অন্যদিক থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। হেমেন্দ্রনাথ কি আবার আসতে পারে?

কিন্তু সুজয়ার আর কোনও ভয় নেই। সে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে কাঁদল। তারপর আবার উঠে নিজের জিনিসপত্র গুছোতে লাগল।

সে নিজেই নিজের সর্বনাশ করছে। এ বাড়িতে তার থাকার কোনও উপায় নেই। হেমেন্দ্রনাথের চেয়েও বড় বিপদ অন্য জায়গায়। আজ সুজয়া নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছে, ডাক্তারকে সে কত তীব্রভাবে ভালোবেসে ফেলেছে। ডাক্তারের সামনে গেলেই সে আর স্থির থাকতে পারে না। আজ সে ডাক্তারের বুকে মাথা রেখেছিল, ডাক্তার তাঁকে এজন্যে ভর্ৎসনা করেনি। ঠেলে সরিয়েও দেয়নি।

একদিন না একদিন সেটা প্রকাশ পাবেই। তখন অন্নপূর্ণা কী ভাববেন সুজয়াকে? না, সুজয়া কিছুতেই অন্নপূর্ণাকে কষ্ট দিতে পারবে না। এর বদলে তার নিজের মরে যাওয়াই ভালো।

ভোরের আলো ফোটার আগেই সুজয়া বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ৭ ॥

এই ক'দিনেই সুজয়া এখানকার ট্রেনের সময় সম্পর্কে মোটামুটি জেনেছিল। এই সব ছোট শহরে সকলেরই ট্রেনের সময় মুখস্থ। ট্রেন-কেন্দ্রিক জীবন অনেকটা।

সুজয়া জানত, ভোর রাত্রেই আপ ট্রেন আছে। সেই ট্রেন ধরেই সে যে-কোনও জায়গাতে চলে যেতে চেয়েছিল। যে-কোনও জায়গায়—ডাক্তারের কাছ থেকে অনেক দূরে।

স্টেশনে এসে দেখল, বহু লোক অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছে। ট্রেন আসেনি। একটু বাদেই শোনা গেল ট্রেনও আসবে না। আশি-নব্বই মাইল দূরে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, একটা ট্রেনের চারখানা কামরা উলটে গেছে। সেই ট্রেনে যাদের আসার কথা ছিল পুরিতে, তাদের আত্মীয়স্বজনের কান্নাকাটি পড়ে গেছে।

সুজয়া পড়ল অন্যরকম বিপদে। সকাল হলেই ডাক্তারের বাড়িতে তার খোঁজ পড়বে। তাকে না দেখে প্রথমেই খুঁজতে আসবে স্টেশনে।

একবার কোনও বাড়ি ছেড়ে আসার পর আবার সেই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মতন লজ্জা

আর আছে নাকি। যে-কোনও উপায়েই হোক, এখান থেকে তাকে সরে যেতেই হবে। কী করে যাবে? পায়ে হেঁটে আর কতটা দূরে যাওয়া যায়? পুরী শহরের মধ্যে আর লুকিয়ে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। একমাত্র উপায় সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া।

সুজয়া স্টেশনের বাইরে এসে সব আকাশ-পাতাল ভাবছে, একজন লোক তার পাশে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, দিদি, আপনি কোথায় যাবেন?

সুজয়া একটু চমকে জিগ্যেস করল, কেন?

লোকটি বলল, একটা শেয়ারের ট্যাক্সি আছে, খুর্দা রোড পর্যন্ত যেতে পারেন। ছ'টাকা ভাড়া লাগবে।

—ট্যাক্সি?

—হ্যাঁ, এই দেখুন, ওই যে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে—একটা ফ্যামিলি যাচ্ছে ওতে, আরও একজন-দুজন লোক একস্ট্রা নেওয়া হবে—এত লোক আটকা পড়ে গেছে আজ।

সুজয়া দেখল, এটা একটা চমৎকার সুযোগ। খুর্দা রোড পর্যন্ত গেলেও অনেকটা দূরে যাওয়া হবে। সেখান থেকে আবার অন্য কোথাও গেলেই চলবে।

সুজয়া বলল, হ্যাঁ, আমি যাব।

—আপনি একলা আছেন তো? একজনের বেশি আর জায়গা নেই।

—হ্যাঁ, আমি একলা!

—সেই জন্যেই আপনাকে জিগ্যেস করতে এলুম। অনেক লোকই যেতে চাইছে—কিন্তু সবাই একসঙ্গে দু-তিনজনের জায়গা চায়—

ট্যাক্সিটার চেহারা ট্যাক্সির মতন নয়। কালো রঙের প্রাইভেট গাড়ি। পেছনের সিটে একজন ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা বাচ্চা নিয়ে বসে আছেন। সুজয়াকে তাঁদের সঙ্গেই চেপেচুপে বসানো হল। দুজন লম্বা চেহারার লোক গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল, তারা বসল সামনে। ড্রাইভারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ওদের সঙ্গে।

সুজয়ার পাশে বসা ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা বাংলা জানেন না মনে হয়। কারণ, কথা বলছিলেন অন্য ভাষায়। সুজয়ার সঙ্গে তাঁরা আলাপ করার চেষ্টা করলেন না। সুজয়া নিশ্চিন্তই হল। তাদের সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না এখন।

কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা চলার পরই গাড়িটা একটি গ্রামের পাশের রাস্তায় থেমে যেতে সুজয়া অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে নেমে গেলেন সেখানে।

সুজয়া ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল, একি গাড়ি খুর্দা রোড যাবে না?

হ্যাঁ, যাবে তো।

সুজয়া ধরেই নিয়েছিল ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাও খুর্দা রোড পর্যন্ত যাবে। কিন্তু ওঁরা যদি মাঝপথেই নেমে পড়েন, তাঁতে সুজয়া আপত্তি করতে পারে না।

সামনের সিটে যে লম্বামতন দুজন লোক বসেছিল তাদের একজন ঘাড় ঘুরিয়ে জিগ্যেস করল খুর্দা রোডে কার বাড়িতে যাবেন?

সুজয়া বলল, কারুর বাড়িতে না। ওখান থেকে অন্য জায়গায় যাব।

—কিন্তু আজ তো সারাদিন ট্রেন চলবে কিনা সন্দেহ। যে-রকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারপর অন্তত দশ-বারোঘণ্টা ট্রেন বন্ধ থাকবেই।

লোকটি গায়ে পড়ে কথা বলতে আসছে বলে সুজয়া বিরক্ত হল। সে আর কিছু বলল না।

একটুবাদে সে লোকটার পাশের লোকটা বলল, এই জহর, পেছনে তো অনেক জায়গা আছে,

শুধু-শুধু এখানে গাদাগাদি করে বসে লাভ কি?

জহর নামে লোকটা বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে!

পাশের লোকটা বলল, ঠিক আছে কি? এই ড্রাইভার গাড়ি থামাও। এতটা রাস্তা কষ্ট করে যাবো কেন?

সত্যিই, পেছনের সিটে এখন সুজয়া একা বসে আছে। সামনের সিটে ওরা চারজন।

গাড়িটা থামল, লোক দুজন নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে সুজয়াকে জিগ্যেস করল, আমরা এখানে বসতে পারি? আপনার আপত্তি আছে?

সুজয়া এক কোণে সরে গিয়ে বলল, না বসুন না আপনারা।

লোকদুটো পেছনে এসে বসবার পর গাড়ি আবার ছাড়ল। লোকদুটি সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকাতে লাগল সুজয়ার দিকে।

লোকদুটোর চুল উসকোখুশকো, পোশাকে অনেক ভাঁজ, কীরকম যেন রাত জাগার চিহ্ন। একজনের চোখ বেশ লাল। তবে ওদের মোটামুটি ভদ্রপরিবারের বলেই মনে হয়।

সুজয়া একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ট্রামে বাসে সবসময়েই তো অন্য লোকজনের পাশে বসে যেতে হয়। কিন্তু ট্যাক্সিতে অপরিচিত লোকের পাশে বসাটা যেন কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। সুজয়া দ্রুত চিন্তা করতে লাগল, খুর্দা রোডে পৌঁছে সে কী করবে? ট্রেন যদি না চলে, তাহলে সে কোথায় যাবে? তার একমাত্র ইচ্ছে, ডাক্তারবাবুরা যেন তাকে খুঁজে না পায়। ওদের কারুর কাছে সে জীবনে আর মুখ দেখাবে না। যদিও ডাক্তারকে আর একবার দেখার জন্যে তার বুকের মধ্যে এখনই আকুলিবিকুলি করছে।

ওদের মধ্যে একজন ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তারপর সুজয়ার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আমরা সিগ্রেট খেলে আপনার অসুবিধে হবে না তো!

সুজয়া বলল, না।

লোকটি সুজয়ার সঙ্গে গল্প করতে চায়। সে আবার বলল, আমার নাম জহর দাস। আর এ আমার ফ্রেন্ড, এর নাম কার্তিক চক্রবর্তী। নমস্কার।

সুজয়াকেও হাত তুলে নমস্কার করতে হল।

—আপনার নামটা বললেন না।

—সুজয়া সরকার।

—আপনি পুরীতে মোটা গিন্নির হোটেলে উঠেছিলেন না?

—হ্যাঁ।

—ওখানে আপনাকে একবার দেখেছিলাম। আপনি একলা একলাই সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান? এবার এখান থেকে কোথায় যাচ্ছেন?

—আমাকে এসব কথা জিগ্যেস করছেন কেন?

—না, না, এমনিই। দেখছিলাম তো একা-একা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন, সুটকেস-ফুটকেস সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আজকে এইরকম গোলমালের দিনে কোনও মেয়েছেলে তো একা-একা যায় না!

সুজয়ার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল। মিথ্যে কথা বলতেই হবে, উপায় নেই। এদের কৌতূহল না মিটলে ওরা চুপ করবে না।

সুজয়া বলল, আমি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ করি। চাকরির জন্যে আমাকে একলা একলাই অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়। এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না।

—আপনি চাকরি করেন? কোন কোম্পানি?

মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস নেই, সে চট করে কিছু বানিয়ে বলতে পারে না। সুজয়া কিছুতেই সে মুহূর্তে কোনও ওষুধ কোম্পানির নাম মনে করতে পারল না। মনে পড়ছে যত ঘড়ি কোম্পানির নাম, ওমেগা, ওয়েস্ট এন্ড! কী বিপদ! দু-একটা সাধারণ ওষুধের নামও মনে আসছে, কিন্তু সেগুলো কোন কোম্পানি! লোকদুটি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

সুজয়া বলল, এটা নতুন কোম্পানি!

জহর ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, নতুন কোম্পানি? ও! সেই জন্যেই বুঝি আপনার মতন মেয়েছেলে না রাখলে কোম্পানি চলে না?

সুজয়ার রাগ হচ্ছে, কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারছে না। লোকদুটির যদি মতলব খারাপ থাকে? গাড়ি চলছে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, দু-পাশে মাঠ।

হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। যে গাড়ি চালাচ্ছিল, সে নেমে এসে বলল, আমার আর চালাতে ভালো লাগছে না মাইরি। এই কার্তিক, তুই এবার একটু চালা!

কার্তিক নেমে গেল, সেই লোকটি এসে বসল তার জায়গায়। সুজয়া ক্রমশ বেশি অবাক হচ্ছে। সে ভেবেছিল, ভাড়া গাড়িতে পেছনের লোক দুটিও তার মতনই যাত্রী। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সবাই এক দলের।

কার্তিক স্টিয়ারিং-এ বসে বলল, ওস্তাদ, কোনদিকে যাব?

লোকটি বলল, ইয়ার্কি মারিস না, চল তো সোজা! একেবারে চিল্কায় গিয়ে থামাবি!

যে লোকটি এতক্ষণ ড্রাইভার ছিল, সুজয়া তাকে ভালো করে লক্ষ করেনি আগে। এই লোকটির মুখখানা নিষ্ঠুর ধরনের। মুখে অনেকরকমের দাগ। সে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল সুজয়ার দিকে।

চিল্কার কথা শুনে আরও বেশি চমকে উঠল সুজয়া। সে বলে উঠল, কেন চিল্কায় কেন? আমি তো চিল্কায় যাব না!

ওস্তাদ ধরনের লোকটি বলল, চলো না, আমাদের সঙ্গে দু-দিন থাকবে!

—তার মানে?

—তোমায় দুশো টাকা দেব এখন।

—এ সব কি বলছেন আপনারা! গাড়ি থামান। শিগগির গাড়ি থামান। আমি এখানেই নেবে যাব।

—চেঁচিওনা, চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই!

—আপনারা আমাকে মিথ্যে কথা বলে গাড়িতে তুলেছেন?

—আর তুমি বা কি সত্যি কথা বলছ? ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করো? ন্যাকামি? আমরা বুঝি না? আমরা ঘাস খাই? একা-একা মাল ক্যাচ করার জন্যে ঘুরে বেড়াতে পারো, আর আমাদের সঙ্গে দু-দিন থাকলেই দোষ?

সুজয়ার এখন একগাদা ওষুধ কোম্পানির নাম মনে পড়ে গেছে। সে জোর দিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আমি কাজ করি! ডুমেক্স কোম্পানির নাম শুনেছেন? আপনাদের নামে আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করব।

লোকটি ঝুঁকে এসে সুজয়ার উরুতে একটা হাত রেখে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে বলল, রাগ করলে তোমাকে বেশ ভালো দেখায় মাইরি! তা বলে আমাদের পুলিশের ভয় দেখিও না!

সুজয়া চলন্তগাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে চাইল।

তার আগেই লোহার মতন শক্ত হাতে ওস্তাদ চেপে ধরল তাকে। পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে বলল, একদম চুপ মেরে বসে থাকো। মেয়েছেলের সঙ্গে ছুরি-ছোরার কারবার আমি পছন্দ

করি না, কিন্তু—

তারপরেই ওস্তাদ সুজয়ার মুখের ওপর নিজের থাবার মতন হাতটা চাপা দিয়ে নিচু করে দিল সুজয়ার মুখটা। চেঁচিয়ে বলল, মুখটা বেঁধে ফেল না! সামনে একটা টাউন আছে।

ধস্তাধস্তি করেও সুজয়া আত্মরক্ষা করতে পারল না। জহর আর ওস্তাদ মিলে তার মুখ আর হাতদুটো বেঁধে ফেলল।

এইসব কাণ্ড ঘটছে প্রকাশ্য দিনেরবেলায়, এমনকি সদ্য সকাল হয়েছে। গাড়ি চলছে হাইওয়ে দিয়ে, শহরের মধ্যে প্রায় ঢোকেই না। পাশ দিয়ে মাঝে-মাঝে গাড়ি যাচ্ছে, তারা জানতে পারছে না কিছুই। সুজয়াকে নিচে শুইয়ে তার গায়ের ওপর ওরা পা দিয়ে চেপে আছে, আর নিশ্চিন্তে সিগারেট টানতে টানতে হাসাহাসি করছে!

সুজয়ার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে অনবরত। এই তার পরিণতি। সে মুক্তি চেয়েছিল, কেউ তাকে মুক্তি দেবে না। ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরুবার সময় সে ভেবেছিল, মরে যাওয়াও তার পক্ষে সহজ। কিন্তু এ যে মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। এরা তাকে নিয়ে কী করবে?

গাড়ি এসে থামল দুপুরের দিকে। চারদিকে ছোট-ছোট টিলা, লোকবসতি নেই। একটা টিলার ওপর বহুদিনের একটা পুরোনো বাড়ি।

ওরা, সুজয়াকে গাড়ি থেকে ধরাধরি করে বার করে খুব দ্রুত নিয়ে এল ভেতরে। দুজন দু-দিক থেকে ধরে প্রায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল দোতলায়। জহর তাড়াতাড়ি দরজার তালা খুলল। ভেতরে একটা খাটে বিছানা পাতা। তার ওপরে ধপাস করে ওকে ফেলে দিয়ে ওস্তাদ কঠোরগলায় বলল, এখানে চুপ মেরে শুয়ে থাকো।

ওরা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। সুজয়ার কান্না শুকিয়ে গেছে। মনটা সম্পূর্ণ যেন অসাড়। এখন সে কি করবে, জানে না। যা হয় হোক!

খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর সে আস্তে-আস্তে উঠে বসল। হাত বাঁধা মুখ বাঁধা, কিন্তু হাঁটতে কোনও অসুবিধে নেই।

ঘরটাতে তিনটে জানলাই খুলে ফেলল। এরকম বাঁধা অবস্থাতেও যে ছিটকিনি খোলা যায়, সে জানত না।

বাইরেটা অদ্ভুত সুন্দর। যত দূর চোখ যায়, ঢেউ খেলানো পাহাড়ি জমি। চিল্কার লেক এখন দেখা যাচ্ছে না অবশ্য। কিন্তু এই পাহাড়ি জমিতে প্রচুর সবুজের সমারোহ। জায়গাটা অদ্ভুত শান্ত। এই নির্জনতা এখন সুজয়ার কাছে একটুও সুন্দর মনে হল না, বেশি ভয়ংকর মনে হল। এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলেও কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

অন্য দরজাটাও খুলে ফেলল সুজয়া। এটাতে তালা দেওয়া ছিল না। দরজার পরে বাইরের দিকে একটা বারান্দা। সেই বারান্দায় এসে সুজয়ার মনে এক ধরনের আনন্দ এল। এই তো মুক্তির রাস্তা খোলা আছে। আর কিছু না হোক, সে তো এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে পারবে। তার মৃত্যু কেউ আটকাতে পারছে না।

সুজয়া পরীক্ষা করে দেখল, হাত বাঁধা অবস্থাতেও সে বারান্দার রেলিং-এর ওপর উঠতে পারবে। তবুও সুজয়া তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ার জন্যে মনকে প্রস্তুত করতে পারল না।

মানুষের জীবনটা বড় প্রিয়। জীবনের বড় মায়া। মরলে তো সব শেষ। সুজয়া তার মনকে বোঝাল, দেখাই যাক না ওরা কি করে। শেষ পর্যন্ত মরার রাস্তা তো খোলাই রইল। ওদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার বদলে সুজয়া নিশ্চয়ই মরবে।

দরজাটা ভেজিয়ে রেখে সুজয়া আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। অকস্মাৎ তার মনে পড়ল সুশোভনের কথা। সুশোভনকে সে পছন্দ করেনি। কিন্তু সুশোভন জোর করেনি তার ওপর। সুশোভন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। তখন সুজয়া ভেবেছিল, একটা সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করে সাধারণ জীবন কাটাবে না!

ঘণ্টা দুয়েক পরে তালা খুলে ঢুকল জহর। হাতে তার একটা ঠোঙা আর-একটা বড় মাটির ভাঁড়। সেগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে সে বলল, খুব খিদে পেয়েছে না? এই তো খাওয়ার এনেছি।

কাছে এসে সুজয়ার বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, নাও খেয়ে নাও, কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা কোরো না! আমরা দিনদুয়েক থাকব এখানে, একটু আমোদ-ফুর্তি করব, তারপর তোমাকে ছেড়ে দেব, কেউ টের পাবে না।

সুজয়া ঘৃণা ও দুঃখ মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জহরের দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, আপনারা বুঝি এ বাড়িতে প্রায়ই জোর করে ধরে আনেন মেয়েদের?

জহর হাসতে হাসতে বলল, জোর করে ধরে আনতে হবে কেন? অনেকে নিজের ইচ্ছেতেই আসে। টাকা দিই। তোমাকেও তো টাকা দেব বলেছি!

—আমাকে ওরকম খারাপ মেয়ে ভাবলেন কী করে?

—আরে, এতে খারাপ ভালোর কী আছে? একটু ফুর্তি-টুর্তি করব, গায়ে কোনও দাগই লাগবে না!

জহরের মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। এই দিনের বেলাতেই সে মদ গিলে এসেছে।

সে সুজয়ার ডানহাতটা তুলে নিয়ে বলল, ইস, এত জোরে বেঁধেছিল যে হাতে লাল দাগ পড়ে গেছে!

বদমাশ লোকেদের সহানুভূতির কথা শুনলে আরও গা জ্বালা করে। সুজয়া হাতটা ছাড়িয়ে নিল।

—নাও, খেয়ে নাও!

—আমি কিছু খাব না। আপনাদের দেখেই আমার ঘেন্নায় বমি আসছে।

—দেখো, আমাকে যা বলেছ, বলেছ? আমাদের ওস্তাদের সামনে কিন্তু এরকম টেঁটিয়াগিরি কোরো না!

জহর এই কথা বলতে-বলতেই দরজা ঠেলে বাকি তিনজন ঢুকল।

প্রত্যেকের হাতে মদের বোতাল ও খাওয়ার।

কার্তিক বলল, কি রে শালা জহর, তুই একলা পীরিত করছিস নাকি? জহর বলল, না রে মাইরি। দ্যাখ না, এ কিছু খেতেই চাইছে না। না খেয়ে যদি নেতিয়ে পড়ে তা হলে আর শেষটায় কোনও মজাই হবে না।

ওস্তাদ বলল, আরে খাবে, খাবে, ঠিকই খাবে। ওরকম প্রথম দিকে একটু নছল্লা অনেকেই করে।

জহর বলল, কোথায় বসব? সবাই মিলে খাটে বসলে তো জায়গা হবে না!

যে লোকটি রেল স্টেশন থেকে প্রথমে ডেকে এনেছিল গাড়িতে, সে বোধহয় এদের দলে ফাই ফরমাস খাটে। ওস্তাদ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, এই হেবো, নিচ থেকে একটা শতরঞ্চি-ফতরঞ্চি নিয়ে আয় না। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস ক্নে? দেব, দেব তোকে পেসাদ দেব।

ওরা খাওয়ার-টাওয়ার নামাতে-নামাতেই হেবো একটা বড় শীতলপাটি নিয়ে এল। সবাই এখানে বসে রুটি মাংস খেতে-খেতে আরও হুকুম করতে লাগল হেবোকে, জল নিয়ে আয়, গেলাস নিয়ে আয়।

সুজয়া খাটের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দিকে তাকিয়ে তার আরও একটা কারণে অবাক লাগছে। এরা যে একটা পাপ করছে, তার কোনও চিহ্ন নেই এদের মুখে চোখে। বরং বেশ একটা হাসিখুশি খোলামেলা ভাব।

গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে ওস্তাদ সুজয়ার দিকে ফিরে জিগ্যেস করল কি গো, তুমি মাল-টাল খাও তো।

সুজয়া কোনও উত্তর দিল না।

—ওরকম তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো এসে এখানে!

সুজয়া তবু চুপ।

এবার জহর অনুরোধ করে বলল, আরে বসো না? একটু খাও! মাংসটা বেশ ভালো রেঁধেছে। চেখে দ্যাখো!

সুজয়া তবু নড়ছে না দেখে ওস্তাদ বলল, আমি খাওয়াচ্ছি ওকে।

খানিকটা রুটি আর তার মধ্যে একটু মাংস নিয়ে সেটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল ওস্তাদ। সুজয়াকে জড়িয়ে ধরে জোর করে তার মুখে ভরে দিতে গেল খাওয়ারটা! সুজয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। লোকটার গায়ে অসুরের মতন শক্তি। এক সময় সে খাওয়ারটা পুরে দিল সুজয়ার মুখে।

সুজয়া খাওয়ারটা থু-থু করে ছিটিয়ে দিল ওস্তাদের গায়ে।

ওস্তাদ বলল, আরে, এ ছুঁড়িটা তো মহা বিচ্ছু আছে দেখছি! দাঁড়া—

সুজয়ার একটা হাতে হ্যাঁচকা টান মেরে ওস্তাদ তাকে নিয়ে এল নিজের বুকের ওপরে। বজ্র আলিঙ্গনে তাকে চেপে ধরে সে সুজয়ার ঠোঁট কামড়ে ধরল।

এর নাম চুম্বন। সুজয়া ব্যথায় চিৎকার করতে গিয়েও পারল না।

ওস্তাদ সুজয়াকে দু-হাতে ধরে কার্তিকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল নেঃ।

কার্তিকও সেইরকমভাবে ওকে চেপে ধরে চুমু খেতে গেল। সুজয়া তখন পাগলের মতন মাথা ঝাঁকাচ্ছে। কিন্তু বলশালী পুরুষদের সঙ্গে পারবে কেন? কার্তিকও সুজয়ার ঠোঁটে কিছুক্ষণ নিজের ঠোঁট চেপে তারপর তাকে ঠেলে দিল জহরের দিকে।

ওই একই ভঙ্গিতে জহর চেপে ধরল সুজয়াকে। কিন্তু সে চুমু খেল না। সুজয়ার দিকে চোখে চোখ ফেলে বলল, কেন এরকম পাগলামি করছ? কোনও লাভ আছে?

জহর সুজয়াকে ছেড়ে দিতেই হেবো বলল, আমাকে দাও! আমি একটু পাব না?

ওস্তাদ তাকে এক ধমক দিয়ে বলল, তুই চুপ মার! তুই এখনও বাচ্চা আছিস!

সুজয়া মন ঠিক করে ফেলেছে। সে মরবে। মৃত্যুই এখন একমাত্র সম্মান দিতে পারে।

সুজয়া ছুটে গেল বারান্দার দরজাটার দিকে। ওরা বাধা দেওয়ার আগেই সে দরজাটা ঝট করে খুলে ফেলে চলে এল বারন্দায়। কিন্তু রেলিং-এর ওপরে ওঠবার আগেই ওস্তাদ এসে তাকে চেপে ধরে ফেলল। সুজয়া কামড়ে দিল তার হাত। তার ঠোঁটে রক্ত।

সাধারণ গল্পের নায়িকারা কোনও একটি অলৌকিক উপায়ে এই সময়ে রক্ষা পেয়ে যায়। কেউ এসে তাকে উদ্ধার করে। কিংবা গুন্ডাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ সৎ হয়ে যায়। কিন্তু সুজয়া বাঁচল না।

ওস্তাদের গায়ের জোরের চেয়েও মনের জোর আরও বেশি। কিছুতেই ছাড়ল না সুজয়াকে। পাঁজাকোলা করে তুলে আবার নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। অন্যদের মাঝখানে নামিয়ে দিয়ে বলল, এ সব আবার কী নকশা হচ্ছে? আমাদের ফাঁসাবার চেষ্টা? আশ্চর্য এই মেয়েছেলে জাত মাইরি, একটু ফুর্তি করার বদলে কারুর মরতে ইচ্ছে যায়!

সুজয়া কোনও কথাই বলতে পারছে না। তার গলার কাছে যেন অনেকখানি বাষ্প জমে গেছে।

ওস্তাদ বলল, এসো, কী করে ফুর্তি করতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি!

অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই, ওর শাড়ি-ফাড়িগুলো সব খুলে দে তো!

সুজয়া দেখল বাঘের মতো তিন-চারজন লোক তাকে ঘিরে হাত বাড়িয়ে আছে। সুজয়া কোনদিকে পালাবে!

বহুকাল আগে সুজয়ার মা মারা গেছে, তবু এই সময় সুজয়া 'ও মাগো, মা, মা' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে সে সারা ঘরে দৌড়োচ্ছে, কিন্তু ওরা যেন তাকে নিয়ে খেলা করছে। ঠিক খেলার মতন হাসিমুখে ওরা এক-একজন এগিয়ে আসছে কাছে।

একটু পরেই দুজন দু-দিক থেকে চেপে ধরল। ওর দু হাত। আর হেবো টান দিল ওর শাড়ির আঁচল ধরে। পড়পড় করে শাড়ি ছেঁড়ার শব্দ হল।

হঠাৎ সুজয়া বলল, দাঁড়ান! আমাকে ছাড়ুন! আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি।

সুজয়ার কান্না থেমে গেছে, কোনও এক অলৌকিক উপায় শান্ত হয়ে গেছে তার মন। ওরা তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, এইভাবে মরার কোনও মানে হয় না। তার বদলে অন্য একটা উপায় আছে।

সুজয়ার গলার আওয়াজ শুনে ওরা একটু থমকে গিয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। সুজয়া আগে হাত দিয়ে ঠোঁটের রক্তটা মুছে ফেলল। তারপর সত্যিই নিজের শাড়িটা খুলতে লাগল। চার জোড়া উৎসুক লোভী চোখের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, জোর করছিলেন কেন? আদর করে, মিষ্টি করে বলতে পারেননি আমাকে? এইসব আনন্দ কি জোর করে পাওয়া যায়?

ভোগী পুরুষগুলি একটু যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ওস্তাদ নিচু হয়ে ঢুক করে এক চুমুক মদ খেয়ে ফেলল। সেই দেখাদেখি অন্যরাও। ওস্তাদের কব্জিতে সুজয়ার দাঁতের দাগ।

শাড়িটা সম্পূর্ণ খুলে ফেলে এক পাশে ছুঁড়ে দিল সুজয়া। ব্লাউজের বোতামের হাত দিয়ে বলল, এটাও খুলতে হবে?

ওস্তাদ বলল, হ্যাঁ। সব।

সুজয়া আবার তাকে ধমক দিয়ে বলল, আদর করে বললে, নরমভাবে বললে, সবই পাওয়া যায়।

তারপর সে ঝট করে জহরের দিকে ফিরে বলল, আমি শুধু তোমার কাছে থাকব। এদের বাইরে যেতে বলো।

জহর চমকে গিয়ে বলল, অ্যাঁ?

সুজয়া জহরের কাছে ঘেঁষে এসে বলল, আমি শুধু তোমার কাছে থাকব। ওরা কেউ এখানে থাকবে না। ওদের তুমি বাইরে যেতে বলে দাও।

জহর মিনতিমাখা চোখে তাকাল ওস্তাদের দিকে। হো-হো করে হেসে উঠল ওস্তাদ। তারপর বলল, ওরে, আমাদের মধ্যে দলাদলি করে দিতে চাইছে! একেই বলে মেয়েদের জাত! আমার কাছে ওসব চালাকি নয়।

সুজয়া গ্রাহ্য করল না ওস্তাদকে। সে এখন শুধু সায়া আর ব্রেসিয়ার পরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। সে জহরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, তোমাকে প্রথম থেকেই আমার ভালো লেগেছে। তুমি আমাকে বিলিয়ে দেবে এদের কাছে?

ওস্তাদ সুজয়ার নগ্ন বাহু চেপে ধরে কড়া গলায় বলল, এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে? ওসব

ফিকির-ফন্দি ছাড়ো।

সুজয়া বলল, ভালো করে যদি কথা বলো, তা হলে যা চাও, তাই দেব। কিন্তু প্রথমে শুধু ও থাকবে। আর কেউ থাকবে না।

কার্তিক বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা একটু বাইরে দাঁড়াই। প্রথমে একটু জহরকেই চান্স দেওয়া যাক। দেখছ না, এর মধ্যেই জহরের মুখখানা কীরকম গদগদ হয়ে গেছে।

ওস্তাদ বলল, ওসব ন্যাকামি এখানে চলবে না। সবাই সমান ভাগ করে নেব। তার মধ্যে আমার ফার্স্ট চান্স!

জহর বলল, কিন্তু ওস্তাদ, আমি ওকে এনেছি।

ওস্তাদ এক হুংকার দিয়ে বলল, চোপ!

সুজয়া ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে ওস্তাদের দিকে, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

জহর আবার কিছু বলতে যেতেই ওস্তাদ তার রক্তাক্ত হাত তুলে মারতে গেল তাকে।

কার্তিক ওদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, একি, একি করছ ওস্তাদ! মারামারি করছ নিজেদের মধ্যে? মেয়েটা এই চাইছিল! তারচেয়ে একটা কথা বলি—এবারের মতন জহরকেই ফার্স্ট চান্স দাও!

ওস্তাদ এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর জহরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, লে!

ওরা বাইরে চলে যাওয়ার পর সুজয়া রক্তহীন ফ্যাকাশে জহরের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এসো—

সুজয়া তার কুমারীত্ব উপহার দিল একজন অচেনা মানুষকে। এর বিনিময়ে সে ভালোবাসা চেয়েছিল। কত সামান্য এই চাওয়া। অনেকেই পায়, সুজয়া পেল না।

॥ ৮ ॥

জহর লোকটি একটু অদ্ভুদ ধরনের। তার মধ্যে মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি। কিছু কিছু গুণ আছে তার স্বভাবে। কিন্তু সে বড় বেশি অন্যের কথা শুনে চলে। অসৎ কাজের দিকে তার একটা দুর্নিবার ঝোঁক আছে, সেইজন্যে অসৎ সঙ্গীও জুটে যায় অনেক। রাস্তায় কোনও অসহায় ভিখিরি দেখলে সত্যিই তার মায়া হয়, সে আগ বাড়িয়ে তাদের ভিক্ষে দেয়, কিন্তু অসহায় কোনও মেয়েকে জোর করে ভোগ করার ব্যাপারে তার বিবেকে কোনও বাধা নেই।

দিন দশ-বারো একটানা সে বেশ ভালো থাকে। মন দিয়ে কাজ করে টাকা রোজগার করে। তারপরই আবার সাত-আটদিন ধরে কুসঙ্গী যোগাড় করে মদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, মেয়ে জোগাড় করে লাম্পট্য চালায়।

জহর সুজয়াকে ছাড়ল না। অন্য বন্ধুদের ছেড়ে সে সুজয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরল উড়িষ্যার শহরে শহরে। কখনও হোটেলে, কখনও ডাকবাংলোয় দিনের-পর-দিন কাটাতে লাগল।

সুজয়া আর বাধা দেয়নি। পালাবার চেষ্টা করেনি। সে ভেবেছিল একবার আত্মসমর্পণ করার পর তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। সে এখন যেন কাঠের পুতুল, তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করা যেতে পারে।

পালাবার সুযোগ ছিল অনেক। জহর যখন নিজের কাজেকর্মে যায়, তখন সে অনায়াসেই দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু যাবে কোথায়? আবার ডাক্তারের কাছে ফিরে যাবে? কিন্তু সুজয়া যে নষ্ট হয়ে গেছে। সে আর কখনও কোনও পবিত্রতার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। ডাক্তারের

শান্ত চোখদুটির কথা মনে পড়লেই সুজয়ার বুকটা গুমরে গুমরে ওঠে।

জহরকে দেখলে এখন তার মনেই হয় না যে সে একটি নারী হরণকারী লম্পট। সে এখন মোটামুটি ভালোই ব্যবহার করে সুজয়ার সঙ্গে। তাকে অনেকগুলি শাড়ি কিনে দিয়েছে। তা ছাড়াও খুব যত্ন করে জিগ্যেস করে, তোমার কী খেতে ভালো লাগে, বলো? তুমি আমার কাছে কিছু চাও না কেন? তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব।

সুজয়া যে চারজন বন্ধুর মধ্যে জহরকেই বেশি পছন্দ করেছিল, এতে তার আত্মাভিমানে বেশ একটা সুখ লেগেছে। মেয়েদের কাছ থেকে জোর করে সব কিছু নেওয়াই যার স্বভাব, সেই লোক কারুর কাছ থেকে সামান্য একটু মমতা বা ভালোবাসা পেলেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

দিন পনেরো এইরকম ঘোরার পর সুজয়াকে নিয়ে এল দুর্গাপুরে। এখানে তার একটি বাড়ি ভাড়া করা আছে। দুর্গাপুর-রাউরকেলায় নানারকম অর্ডার সাপ্লাই করাই তার জীবিকা।

সেই বাড়িতে এনে জহর বলল, আমি তোমাকে নিজের বউয়ের মতন যত্ন করে রাখব। তুমি কোনও চিন্তা কোরো না।

বৌয়ের মতন আর সত্যিকারের বউ হওয়া যে এক নয়, সেটুকু বোঝার বুদ্ধি যেন জহরের নেই। তার ধারণা, সুজয়ার এখন আর দুঃখ করার মতন কিছু রইল না। তাকে বাড়ি-ঘর দেওয়া হয়েছে, সংসার দেওয়া হয়েছে। এক-একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে জহর অত্যন্ত অভ্যস্ত স্বামীর মতন সুজয়াকে হাঁক দিয়ে বলে, ওগো কয়েকটা লুচি ভেজে খাওয়াও না!

জহর যে বিবাহিত, সে কথা সুজয়াকে গোপন করেনি। ভুবনেশ্বরে ওদের পৈতৃক বাড়িতে ওর বউ ও দুটি সন্তান আছে। খুব কম বয়েসে বাবা-মা বিয়ে দিয়েছিল, স্ত্রী সুন্দরী নয়, প্রায়ই অসুখে ভোগে। জহর মাসে একবার বাড়ি যায়।

সুজয়া এখানে এসে নিজের একটা সংসার পেল। সুজয়া সংসার চায়নি। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। এখন সে একজন বিবাহিত লোকের রক্ষিতা।

টাকাপয়সা খরচ করার ব্যাপারে জহরের কোনও কার্পণ্য নেই। সংসার সাজাবার জন্যে সেসব কিছুই কিনে আনে। মাসে মাত্র দশদিন খেটেই সে এত টাকা কী করে পায় কে জানে!

এখানে এলেও দিন সাতেক সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করার পরই সে অশান্ত হয়ে উঠল। আবার মদ হই-হল্লা। কয়েকদিনের জন্যে উধাও হয়ে গেল দুর্গাপুর থেকে। ফিরে এসে খুব ক্ষমা-টমা চাইল সুজয়ার কাছে।

এখন সুজয়ার পালাবার সুযোগ আছে যথেষ্ট। জহর সবসময় বাড়ি থাকে না। তালাবন্ধ করে রাখে না সুজয়াকে। এমনকি যে আলমারিতে তার কিছু টাকাপয়সা থাকে, সেটাতেও চাবি দিতে ভুলে যায়।

যে-কোনও দিন বেড়িয়ে পড়তে পারে সুজয়া। কিন্তু কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত কি বাড়িতেই ফিরবে? এই কলঙ্কিনী মূর্তি নিয়ে? একলা বসে-বসে সে ভাবে, যে সুজয়া মুক্তি খুঁজতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, তার মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন সে অন্য একটি মেয়ে। এখন আর তার কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

এখনও ডাক্তারের কথা মনে পড়ে। বুকটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে। একইরকম ভাবে। কিছুতেই ওই মুখটা সে ভুলতে পারে না। কী ভুল করেছিল সুজয়া? সে ভালোবেসেছিল এমন একজন মানুষকে, যাকে সে কোনওদিন পেতে পারত না।

সুজয়ার একটিমাত্র সান্ত্বনা, সে অন্নপূর্ণার মনে কোনও কষ্ট দেয়নি। তার বদলে সে নিজে যত কষ্ট পাক, সে সহ্য করে নিতে রাজি আছে।

দু-মাস—আড়াই মাস কাটাবার পর সুজয়া বুঝতে পারল, তার আর কোথাও যাওয়া হবে

না। তার নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সে গর্ভবতী।

কাছাকাছি দু-একটা বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। বাড়িতে থাকতে গেলে সবসময় মুখ ভার করে থাকা যায় না। পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে একটু হেসে কথা বলতে হয়। তবু সুজয়া সবসময় মনে-মনে কাঁটা হয়ে থাকে। সকলেই জানে সে জহরের স্ত্রী। আসল কথাটা যদি জানাজানি হয়ে যায়?

সুজয়া পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। কারুকে দেখাতে চায় না মুখ। তার আরও একটা ভয় আছে। দুর্গাপুর কলকাতা থেকে এমন কিছু দূর নয়। আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ কাজের সূত্রে এখানে আসতেই পারে। যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়? ছুরি দিয়ে কেটে সুজয়া যদি নিজের মুখটা বদলে ফেলতে পারত।

তবু তাকে কখনও-সখনও বেরুতে হয়। জহর যখন ভালো মেজাজে থাকে, তখন সে সুজয়াকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে কিংবা সিনেমায় যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। সুজয়া রাজি না হলে রেগে যায়। জহরের মনের ভাবটা হচ্ছে এই, তার ইচ্ছেমতন সব কিছু চলবে। সে যখন বন্ধুদের হই-হল্লা ছেড়ে একদিনের জন্যেও সুজয়ার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাইছে, তখন সুজয়া রাজি হবে না কেন?

একদিন নাইট শোতে সিনেমায় গিয়ে সুজয়া দেখে ফেলেছিল তার এক দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই আর তার স্ত্রীকে। সুজয়া তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলেছিল। ওরা নিশ্চয় সুজয়ার সব কথা জানে। এখন যদি তার বাড়ির লোক খোঁজ পেয়ে যায়, তা হলে ভরাডুবিটা সম্পূর্ণ হবে।

গর্ভের সন্তানের কথা ভেবে সুজয়া এখন তার মৃত্যুর কথাও চিন্তা করে না। যে সন্তান সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত, যে সুজয়ার জন্যে আরও বেশি বিপদ ডেকে আনছে, তার চিন্তায়ও মনটা মায়ায় ভরিয়ে দেয়।

সুজয়া জানে তার গর্ভে একটা সর্বনাশের বীজ ধীরে-ধীরে বাড়ছে, কিন্তু এখন আর সুজয়া একেবারের জন্যেও আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে না। ভেতর থেকে একটা প্রবল শক্তি যেন বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে, তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। বেঁচে থাকতেই হবে।

সব গল্পের একটা শেষ আছে। মানুষের জীবনের গল্প কিন্তু এত সহজে শেষ হয় না। তা চলতেই থাকে। সুজয়ার জীবনও যদি এরকম ভাবে চলতে থাকত, তা হলে তা লেখার দরকার হত না। কিন্তু নদী যেমন বারবার বাঁক নেয়, মানুষের জীবনেও সেরকম ঘটে।

এক বিকেলে জহর জোর করে বেড়াতে নিয়ে গেছে তাকে। সেদিন অনেক টাকার একটা অর্ডার পেয়ে তার মেজাজ ভালো আছে। সুজয়া চায় না, তবু জোর করে শাড়ি কিনে দিল একটা! বাঁধের দিকটায় খানিকক্ষণ ঘুরল। সুজয়া জানে, জহরের হাতে এখন এত বেশি টাকা এসেছে, তখন দু-তিনদিনের মধ্যে সে অশান্ত হয়ে উঠবে—সাঙাতদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা শুরু করবে।

ফেরার পথে ওরা একটা সাইকেল রিকশা নিয়েছে। বেশ গল্প করতে-করতে আসছে। হঠাৎ এক জায়গায় রিকশাটা থামল। সুজয়াকে বলল, তুমি একটু বসো আমি একটা সিগারেট কিনে আনছি।

নেমে গিয়ে সে অনেকক্ষণ দেরি করতে লাগল। অর্থাৎ শুধু সিগারেট নয়, সে মদের বোতলও যোগাড় করতে গেছে। সুজয়া রিকশার ওপরে বসে আছে তো বসেই আছে।

হঠাৎ মুখ তুলে দেখল, একজন লম্বামতন যুবক এগিয়ে আসছে তার দিকে। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট পরা মাথা-ভরতি চুল। সুজয়ার বুকটা কেঁপে উঠল। এ কে?

আর একটু কাছে আসতেই সে চিনতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে বলল, এই রিকশাওয়ালা চলো—

রিকশাওয়ালা জিগ্যেস করল, বাবু আসবেন না?

সুজয়া ব্যাকুলভাবে বলল, না-না, বাবু পরে আসবেন, তুমি শিগগির চলো। খুব জলদি।

রিকশা চলতে শুরু করতেই যুবকটি চেঁচিয়ে উঠল, সুজয়া—

সুজয়া মুখ ফেরাল না।

যুবকটি আবার বলল, এই সুজয়া, একটু দাঁড়াও।

সুজয়া দু-হাত দিয়ে কান চাপা দিল। সে শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না। সুশোভন যে-সুজয়াকে চিনতো, সে তো মরে গেছে। রিকশাওলাকে বারবার তাড়া দিতে লাগল, জলদি চলো—

সুশোভন রিকশার পেছনে পেছনে খানিক ছোটার চেষ্টা করে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এক জায়গায়।

রিকশাটা মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে। সুজয়া আবার হারিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে সুজয়ার কানে বাজতে লাগল সেই ডাক। রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নামবার সময় সন্তর্পণে তাকাল। না, কেউ নেই। সুশোভন আর কখনও খুঁজে পাবে না তাকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে জহর বাড়ি ফিরে দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে দিল। একি, তুমি বাড়িতে? এদিকে আমি সারা টাউনে তোমাকে গরুখোঁজা খুঁজছি।

সুজয়া শান্তভাবে বলল, কেন এতে খোঁজাখুঁজির কী আছে?

—বাঃ খুঁজব না! আমি ভাবলাম, তোমার চেনাশুনো কারুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, তুমি তার সঙ্গে যদি চলে যাও।

—আমার আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, তুমি জানো না?

—তাহলে আমায় ফেলে চলে এলে কেন?

—এমনিই?

—এমনিই? ওসব শুনছি না, তোমাকে বলতেই হবে, তুমি কেন এলে?

সুজয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর ক্লান্তভাবে বলল, আমার খুব পেটব্যথা করছিল, আমি আর থাকতে পারছিলাম না।

এই কথা শুনেই নরম হয়ে গেল জহর। সে সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ও তাই নাকি? আমাকে বললে না কেন? আমি ওষুধ কিনে দিতাম।

—না, দরকার নেই। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

জহর সন্তুষ্ট হয়ে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। গেলাসে মদ ঢেলে একটা চুমুক দিয়েই তার আবার অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। সে গলা চড়িয়ে ডাকল, সুজয়া, সুজয়া।

সুজয়া দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, কী, জল এনে দেব?

—না, এদিকে এসো, কাছে এসো তো।

—আমি রান্না করতে যাব।

—পরে যাবে। তুমি বললে, তোমার আজ পেটে ব্যথা করছিল। আর আগে ক'দিন দেখছি, তুমি রাত্তিরে বমি করছ। তোমার অসুখ-টসুখ করেছে? ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?

—আমার অসুখ হয়নি।

—তা হলে এসব কী?

—তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি। আমার বাচ্চা হবে।

কথাটা শুনেই জহর যেন লাফিয়ে উঠল। মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে গেল তার। একটুক্ষণ চুপ থেকে সে আবার জিগ্যেস করল, তুমি ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ।

—ক'মাস।

—অন্তত সাড়ে তিন মাস।

—আরে এ কথা তুমি আগে বলোনি? মেয়েছেলেদের বুদ্ধি বলে একে। যাক, আমার বেশ ভালো ডাক্তার আছে। এখনও নষ্ট করে ফেলা যাবে।

—কী বলছ তুমি? নষ্ট করবে?

—বাঃ, তা ছাড়া কী করবে? বোকার মতন কথা বলো না।

—আমি যতই বোকা হই, আমার সন্তান আমি নষ্ট করব না।

—আলবাৎ করতে হবে। এখন বাচ্চা হলে একেবারে ফেঁসে যাব। আমার অলরেডি দুটো ছেলেমেয়ে আছে।

—তোমার থাকতে পারে, আমার তো কিছু নেই।

—আর দরকার নেই। ইন্ডিয়ার এত হেভি পপুলেশান, তার মধ্যে আবার ভিড় বাড়াবার কোনও মানে হয়!

—সে চিন্তা আমার নয়। আমার তো এই প্রথম। আমি পাপ করতে পারি, তুমি পাপ করতে পারো, ও তো কোনও দোষ করেনি?

জহর খাট থেকে তড়াক করে নেমে এসে সুজয়ার ঘাড়ে হাত রেখে চোখ পাকিয়ে বলল, এরকম উলটো-পালটা বকলে কিন্তু একদম খুন করে ফেলব। তোমাদের দুজনকেই। কাল আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

—তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো। আমি সন্তান নষ্ট করব না।

রাগের মাথায় সুজয়ার গালে এক থাপ্পড় মাড়ল জহর। সুজয়া টলে পড়ে যাচ্ছিল, চেয়ারটা ধরে সামলাল।

জহর একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, সরি। আমি মারতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনবে না? তুমি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছ?

—আমি আর কিছু জানি না। আমি একটা নিষ্পাপ শিশুকে মারতে পারব না।

—এখনও জন্মালোই না। হাত পাও গজায়নি এখনও।

—তা হোক, তবু আমি জানি, ও আছে।

জহর ফিরে গিয়ে খাটে বসল। গুম হয়ে বসে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এক চুমুকে গেলাস শেষ করে আবার ঢালল। সুজয়ার সঙ্গে আর একটা কথাও বলল না।

ভোরবেলা জেগে উঠে সুজয়া আর দেখতে পেল না জহরকে। জহর চলে গেছে।

জহর এরকম আগেও চলে গেছে হঠাৎ-হঠাৎ। কিন্তু এ যাওয়া যে অন্যরকম, তা একটু দেখলেই বোঝা যায়। জহর তার নিজস্ব সব কিছু নিয়ে গেছে, দাড়ি কামাবার সেট আর টুথ ব্রাশ পর্যন্ত। তার কাগজপত্র কিছু নেই, আলমারিতে একটাও টাকা-পয়সা নেই। শুধু টেবিলের ওপর গুণে-গুণে মাত্র একশোটি টাকা চাপা দেওয়া আছে।

সুজয়া তক্ষুনি ঠিক করে নিল, জহরের খাট, আলমারি, চেয়ার টেবিল সব বিক্রি করে দেবে সে। তার শাড়ি আর সামান্য গয়না আছে, এসব বিক্রি করলেও কিছু পাওয়া যাবে। শুধু ভাত ছাড়া আর কিছু খাবে না। তবু তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। কুলি কামিনদেরও তো স্বাস্থ্যবান বাচ্চা হয়। দশ মাস পরে তার সন্তান জন্ম হলে, তাকে সে কোলে নিয়ে ভিক্ষে করবে। কিংবা লোকের বাড়িতে গিয়ে ঝি-গিরি করবে, তবু শিশুটিকে সে মরতে দেবে না।

সুজয়া বাইরের দিকের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। বাইরের লোকের সঙ্গে সে আর কোনও সম্পর্কই রাখবে না এখন। একটি ঠিকে ঝি আসত রোজ সকালে কাজ করতে, ছাড়িয়ে দিল তাকেও।

দিন চারেক বাদে একদিন দুপুরবেলা দরজায় ঘা পড়ল। আওয়াজ শুনেই সুজয়া বুঝল, জহর

নয়। আর যেই হোক, সে দরজা খুলবে না। কিছুক্ষণ সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবেই!

বেশ কয়েকবার ঠকঠক শব্দ হল দরজায়। তারপর হাঁক শোনা গেল, মানি অর্ডার, মানি অর্ডার।

এমনকি টেলিগ্রাম শুনলেও সুজয়া গ্রাহ্য করত না। কিন্তু মানি অর্ডার শুনে সে একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। টাকা জিনিসটাকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। জহরের নামে টাকা হলেও সে নিয়ে নেবে।

দরজা খুলে দেখল, পোস্টম্যান নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুশোভন।

একমুখ হেসে সুশোভন বলল, কীরকম চুপকি দিলাম? ভেবেছিলে বুঝি দরজা খুলবে না?

সুজয়া নিষ্প্রাণ গলায় বলল, আপনি কেন এসেছেন?

সুশোভন ভেতরের দিকে এক পা এগিয়ে বলল, এসেছি, তাতে দোষটা কী হয়েছে? সেদিন আমাকে দেখে রিকশা নিয়ে ওরকম বাঁই-বাঁই করে পালিয়ে গেলে কেন?

সুজয়া কোনও উত্তর দিল না। সুশোভন দরজা দিয়ে ঢুকে এল ভেতরে। তারপর বলল, চেনাশুনা মানুষের সঙ্গে কি লোকে দেখা করতে আসে না। এতে দোষের কী আছে? তোমার বর কোথায়?

—বাড়িতে নেই। আপনি এখন যান।

আমি ভূত নই, চোর ডাকাত নই, ভিখিরিও নই, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ কেন?

—আপনি আমার কাছে আসবেনই বা কেন?

—এমনই। আমি অত ভেবেটেবে আসি না। তবে কি জানো? পুরীতে তুমি আমার হৃদয়ে এমন চোট দিলে যে তারপর আমি অন্য কারুকে বিয়েই করলুম না। সেই থেকেই ভেবে রেখেছি, তোমার সঙ্গে আবার একবার না একবার তো দেখা হবেই, তখন জিগ্যেস করব।

—কী জিগ্যেস করবেন?

সুশোভন একটু থেমে হাসল। তারপর বলল, কিছুই না। দেখা হলে আর ওসব মনে থাকে না। তুমি দুর্গাপুরে ক'দিন আছো?

—তিন-চার মাস।

—আমি এখানেই থাকি এখন। আমি তো এখানে কনট্রাক্টারি করি, তোমার বর কোথায় গেছেন? হঠাৎ এসে আমাকে দেখে ফেললে রাগ করবেন না তো? অনেক লোকের আবার সন্দেহবাতিক থাকে।

সুজয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

সুশোভন বলল, তোমার বাড়ি কী করে খুঁজে পেলাম জানো? সেদিন তো তুমি চলে এলে একা রিকশা নিয়ে। তারপর এক ভদ্রলোক এসে সেই রিকশাটাকে খুব খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। সেই থেকেই বুঝলাম, ভদ্রলোক তোমার হাজব্যান্ড। তারপর আমি ওকে ফলো করব ভেবেছিলাম, তা আর হল না। তবে ওর নামটা জেনে নিয়েছিলাম। ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলছিল। নাম জানলেই তো বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না দুর্গাপুরে! শেষ পর্যন্ত পিওনদের জিগ্যেস করে করে—

সুজয়ার মুখখানা ঝড়ের আকাশের মতন। সে চায় সুশোভন এখান থেকে চলে যাক! এক্ষুনি, আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই—

সুজয়া বলল, ও আমার স্বামী নয়। আপনি বেরিয়ে যান!

—স্বামী নয়? তা হলে উনি কে?

—কেউ না? কেউ না? ওই আমার সর্বনাশ করেছে! আপনি যান, আপনি যান, আপনি যান...

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সুজয়া। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, শুয়ে পড়ল মাটিতে।

সুশোভন হকচকিয়ে গেল। অস্ফুটভাবে বলল, যা বাবাঃ! আমি কী দোষ করেছি? আমাকে যেতে বলছ কেন? তারপর সে নিচু হয়ে সুজয়ার পিঠে হাত দিয়ে বলল, এই ওঠো? কী হয়েছে কী? আমায় সব বলো তো!

সুজয়া বলল, আপনি চলে যান। আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমি মরে গেছি!

শেষ যে পুরুষটি জোর করে, সুজয়ার ওপর, তার নাম সুশোভন। সে সুজয়ার কোনও কথাই শোনেনি। সে সুজয়াকে কোলে করে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছে খাটে। সুজয়ার চোখের জল মুছে দিয়েছে। এবং সুজয়ার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও তাকে সে বিয়ে করতে চেয়েছে।

সুশোভন আর দেরি করেনি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে বিয়ের রেজিস্ট্রি সেরে ফেলে। তার আগেই সুজয়াকে নিয়ে আসে নিজের কোয়ার্টারে।

সুজয়ার গর্ভে সন্তানের বিষয়েও তার কোনও আপত্তি নেই। তার যেমন হালকা স্বভাব, সেইভাবেই সে ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দেয় না। সে বলে, পরের ছেলেকেও তো অনেকে পুষ্যি নেয়। এও সেইরকম। সাহেবরা তো দু-তিনটে বাচ্চাসমেত বিধবা বিয়ে করছে হরদম, আর আমরা পারবো না কেন? এ তো মোটে একটা পুঁচকে বাচ্চা! দেখো না, আমি ছেলেটাকে কীরকম মাস্তান করে তুলি!

তারপর সুজয়ার থুতনি ধরে আদর করে বলে, মাইরি, পুরীতে আমাকে কী চোটই না দিয়েছিলে! তোমাকে ফিরে না পেলে এই বুকটা আর জুড়োত না।

সুজয়া আর সুশোভন দুজনেই আশা করেছিল ছেলে হবে। হলও একটি মেয়ে।

হাসপাতালে সুজয়ার জ্ঞান ফেরার একটু পরে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সুশোভন খুশির সঙ্গে বলল, মেয়েটাকে দেখেছ? মুখখানা অবিকল তোমার মতন হয়েছে। পাগলিটাকে দেখতে বেশ ভালোই হবে। বুঝেছ? এক মাথা চুল, বড়-বড় চোখ! আমার দিকে তাকাচ্ছে কেমন, ঠিক চিনে ফেলেছে!

নার্সের হাতে ধরা শিশুকন্যার দিকে তাকিয়ে সুজয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার চোখে টলটল করছে দু-ফোঁটা জল।

আবার মেয়ে? এর ভাগ্যে আবার কত দুঃখ আছে কে জানে? শুধু মেয়ে বলেই তো সুজয়া কত জায়গায় হেরে গেল।

পরক্ষণেই সুজয়া ভাবল, এই মেয়ে যখন বড় হবে, তখন এই যুগটা বদলে যাবে, এই সমাজও হয়তো অনেকটা বদলে যাবে। তখন আমি যা পারিনি, আমার মেয়ে কি তা পারবে?

মধুময়

তুমি আর কখনও এসো না।

মধুময় টেবিলে কনুইয়ের ওপর থুতনি রেখে যেমনভাবে বসে ছিল, সেইরকমই রইল, একটুও চমকে উঠল না, একটাও কথা বলল না। আসলে সে মনে-মনে ব্যাকুলভাবে বলতে চাইল, আমি পারব না। স্বপ্না, কেন আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ?

সে নিঃশব্দে স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

স্বপ্না বলল, তুমি কি চাও আমি আত্মহত্যা করি?

মধুময় এখনও চুপ।

—কেন দিনের-পর-দিন আমাকে এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলছ? যে সম্পর্ক একবার ভেঙে যায়, তাকে আর জোর করে জোড়া লাগানো যায় না। আমি ওপরে গেলেই মা আমাকে বকুনি দিয়ে একেবারে ভাজা-ভাজা করবে। আমার দাদা-টাদারা শেষকালে যদি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়, সেটা কি ভালো হবে?

মধুময় একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, ঠিক আছে, আমি এখানে আর আসব না, কিন্তু বাইরে কোথাও—

—না, তাও সম্ভব নয়। আমি ওরকমভাবে কিছু চাই না, বাড়ির লোককে কিছু না জানিয়ে লুকিয়ে, গোপনে—ওটা আমার স্বভাব নয়।

—মাসে অন্তত একবার।

—কেন তুমি অবুঝের মতন কথা বলছ? আমি যা পারব না, সে সম্পর্কে জোর করে কোনও লাভ আছে?

—তুমি একসময় বলেছিলে...

—তারপর কত কী বদলে গেছে।

—আবার সবকিছু বদলে নেওয়া যায় না, আমি যদি সেই আগের মতন—

—তা হয় না। তুমিও জানো, তা হয় না। সাড়ে চারটে বাজল, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।

মধুময় উঠে দাঁড়াল। তার লম্বা শরীরটার জন্য সে বিব্রত, এইরকম মুখের ভাব। কাঁধ দুটো উঁচু হয়ে আছে। মাটির দিকে চোখ রেখে সে জিগ্যেস করল, তাহলে আর আমি কোনওদিন আসব না?

স্বপ্না বলল, তোমারও তো একটা আত্মসম্মান আছে, যেখানে কেউ তোমাকে চায় না, সেখানে কেন তুমি আসবে?

—তুমিও চাও না?

স্বপ্না মধুময়ের ডান বাহুতে বাঁ-হাতটা ছোঁয়াল। এর আগে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে মধুময় যে ক'বার স্বপ্নাকে ছুঁতে গেছে, সেই ক'বারই স্বপ্না এমনভাবে ছটফটিয়ে দূরে সরে গেছে যেন মধুময় একজন মেথর, এক্ষুনি কমোড পরিষ্কার করে এল।

আজ স্বপ্না নিজেই ছুঁয়ে দিল মধুময়কে। যেখানে সে হাত রেখেছে সেই জায়গাটা যেন জ্বলছে।

—তোমাকে তো বুঝিয়ে বললাম, আমাদের পুরোনো সম্পর্ক আর নেই।

—আচ্ছা, আমি আর আসব না।

স্বপ্না মধুময়ের বাহুতে আর একটু চাপ দিল, গলার আওয়াজ আরও নরম করে বলল, লক্ষ্মীটি,

শুধু-শুধু মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখো না, আমাকে ছাড়াও তুমি জীবনে অনেক কিছু করতে পারো—

মধুময় স্থির চোখ তাকিয়ে রইল স্বপ্নার দিকে। এক সময় কোনও কথা না বলে শুধু চোখে-চোখেই অনেক কথা হয়ে যেত। কিন্তু স্বপ্না চোখ ফিরিয়ে নিল। মধুময় জানে, স্বপ্নার মনটা ফুলের মতন কোমল। ফুলও এক সময় কঠিন হতে পারে।

মধুময় আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এই বৈঠকখানা ঘরের সামনেই একটা লম্বা বারান্দা। তার শেষ প্রান্তে, কয়েকটা সিঁড়ির পর বাইরের গেট। বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে সে মনে-মনে বলতে লাগল, আমি আর আসব না, আমি আর এখানে আসব না।

তার পিঠে যেন একটা গরম হাওয়া লাগছে। যেন কার নিশ্বাস। মধুময় তবু তাকাল না পিছন ফিরে। এ কথা ঠিক, স্বপ্না তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেট পর্যন্ত আসবে না। সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে বসবার ঘরের দরজার সামনে। অত দূর থেকে স্বপ্নার স্বস্তির নিঃশ্বাস কি তার পিঠে লাগতে পারে?

গেট থেকে বেরিয়ে মধুময় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সামনেই ট্রাম স্টপ। মধুময়ের এখান থেকেই ওঠবার কথা। কিন্তু উঠল না, হাঁটতেই লাগল। দুটো হাতই কোটের পকেটে গোঁজা, মাটির দিকে মুখ, সে রাস্তার কিছুই দেখছে না।

বেশ খানিকটা গিয়ে মধুময় থমকে দাঁড়াল। মনে-মনে বেশ পরিষ্কার উচ্চারণে সে বলল, আমি স্বপ্নার মাকে খুন করব। ওই ভদ্রমহিলা অনেকের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছেন। আমি স্বপ্নার দাদাকেও খুন করব, কারণ সে আমাকে অপমান করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। এমনকী, স্বপ্নার মেজোকাকা যদি উলটোপালটা কথা বলতে আসেন, তাহলে তাকেও খুন করা যেতে পারে।

তারপর মধুময় আবার স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে বলবে, আমি আবার এসেছি। এখন তো আর বারণ করার কেউ নেই।

কোটের পকেট থেকে মধুময় হাত দুটো বের করল। সে পারে, সে অনায়াসেই এই তিনজনকে খুন করে ফেলতে পারে।

তারপর মধুময় হাসল। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? মাকে দাদাকে ছোট কাকাকে খুন করলেই বা স্বপ্না তার কাছে আসবে কেন? একজন খুনিকে কেনই বা সে ভালোবাসবে? ওইসব প্রিয়জনের চেয়ে কি তার আকর্ষণ বেশি?

তাছাড়া, স্বপ্নার প্রতিটি ব্যবহারেই আজ ফুটে উঠেছিল যে সে নিজেই আর মধুময়কে চায় না। বিশেষত ওই যে গায়ে হাত ছোঁয়ালে। চরম ন্যাকামি নয়! বাড়ির কুকুরকে বাইরে পাঠাবার সময় গায়ে হাত বুলিয়ে যেমন লোকে বলে, যা-যা—সেরকমভাবেই স্বপ্না তাকে চলে যেতে বলেছে।

মধুময় আর কোনওদিন আসবে না স্বপ্নার বাড়িতে। রাসবিহারী মোড় থেকে লেক মার্কেট পর্যন্ত ট্রাম রাস্তা, এই রাস্তাটুকুতে সে আর পায়ে হেঁটে যাবে না কোনওদিন। ট্রাম, বাস বা ট্যাক্সিতে যেতে হলে সে এতটুকু পথ চোখ বুঁজে থাকবে। সারাজীবনের মতো এটা ঠিক হয়ে গেল।

ওই জন্যই স্বপ্না ক'দিন ধরে তার লেখা চিঠিগুলো ফেরত চাইছিল। আজ আর চায়নি। মধুময়কে তাড়াবার ব্যস্ততায় ভুলে গেছে বোধহয়। স্বপ্না কি ভেবেছিল যে সে অন্য কাউকে বিয়ে করলে মধুময় ওই চিঠিগুলো দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে পারে? স্বপ্না এরকমও ভাবতে পারে তার সম্পর্কে?

হ্যাঁ, ভাবতে তো পারেই। মানুষ একবার খারাপ কাজ করলে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার করাও তো তার পক্ষে স্বাভাবিক।

দেশপ্রিয় পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে মধুময় একটা সিগারেট ধরাল। এবার সে কী করবে? এখন মানে এই মুহূর্তে নয়—বাকি জীবনটা?

তার চোখের সামনে যেন চলচ্ছবির মতন ফুটে উঠল তার গত কয়েক বছরের জীবনের

ঘটনা। এই ঘটনাগুলো সে ভুলতে চায়, কিন্তু কেউ তাকে ভুলতে দেবে না। সে আশা করেছিল স্বপ্না অন্তত তাকে সবকিছু ভুলিয়ে দেবে। দুজনে মিলে আবার একটা নতুন জীবন শুরু করবে।

পার্কের রেলিং-এর পাশে দাঁড়ানো মধুময় যেন একটা পাথরের মূর্তি।

গত দু-বছর মধুময় একটা দারুণ ভুলের মধ্যে ডুবে ছিল। এর মধ্যে জেল খাটতে হয়েছে প্রায় এক বছর। তাও কোনও রাজনৈতিক কারণে নয় যে গর্ব করে বলা যাবে।

সি. আই. টি. রোডে এক সময় স্বপ্নাদের বাড়ি আর তাদের বাড়ি ছিল পাশাপাশি। স্বপ্নার বাবা সরকারি চাকরি ছেড়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ঢুকেই উন্নতি করতে লাগলেন হু-হু করে। তারপর ঝাঁ করে একটা গোটা বাড়ি কিনে উঠে গেলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে। মধুময় ধরেই নিয়েছিল, স্বপ্নার সঙ্গে তার চিরকালের সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এই ধরে নেওয়াটাই তার প্রথম ভুল। সচরাচর এরকম হয় না।

বি-এস-সি পাস করে মধুময় এম-এস-সি-তে ভরতি হওয়ার সুযোগ পেল না কলকাতায়। একটা সিট পাওয়া গিয়েছিল পাটনা ইউনিভার্সিটিতে। তার বাবা সেইখানেই ভরতি করে দিয়ে এলেন মধুময়কে।

কোনওক্রমে দাঁতে দাঁত চেপে দু-বছর কাটিয়ে দিয়ে এম-এস-সি পরীক্ষা দেওয়া উচিত ছিল মধুময়ের। কিন্তু পাটনায় কিছুতেই মন টিকল না তার, ছ'মাসের মাথায় পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। সেটা মধুময়ের দ্বিতীয় ভুল।

সে ভেবেছিল, শুধু-শুধু এম-এস-সি-র জন্য দুটো বছর নষ্ট করে কী লাভ। আসল উদ্দেশ্য তো চাকরি! চাকরির জন্য বি-এস-সিও যা এম-এস-সিও তাই। কলকাতায় ফিরে সে চাকরির জন্য উঠে পড়ে লাগল। অর্থাৎ এই শহরের আট দশ লাখ বেকারের মধ্যে ডুবে গেল সে।

বাড়ি বদল করলেও স্বপ্নার সঙ্গে তার দেখা হত প্রায় রোজই। গোড়ার দিকে পাটনা যাওয়ার পর স্বপ্না তাকে চিঠি লিখত নিয়মিত। মধুময়ের চিঠি লেখার ব্যাপারে বড় আলস্য। স্বপ্নার তিনখানা চিঠির উত্তরে সে লিখত একটা। স্বপ্নার চিঠি পাঁচ পাতা তো মধুময়ের দেড় পাতা। কিংবা, চিঠিতে কিছু লেখার বদলে মধুময় একটা দুটো ছবি এঁকে পাঠাত।

মধুময় ভেবেছিল এক বছরের মধ্যে সে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পেয়ে যাবে, তারপর আর এক বছর সময় লাগবে সবকিছু ঠিকঠাক করে নিতে। তখন সে আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বিয়ে করবে স্বপ্নাকে।

কিন্তু চাকরি পাবে কি, কখনও-কখনও ইন্টারভিউ পেলেও মধুময়ের যেতে ইচ্ছে করত না। বাবা-কাকা মেসো-পিসের চেনাশুনো বা ধরাধরির সূত্রে কয়েকবার এরকম ইন্টারভিউ পেয়েছে মধুময়। কিন্তু সে বিরক্তিতে ঠোঁট উলটেছে। সাড়ে তিনশো, চারশো টাকা মাইনে—এই সামান্য টাকার চাকরি পেয়েই বা কী লাভ? এই টাকায় আজকাল দুখানা ঘরের বাড়িও ভাড়া পাওয়া যায় না।

স্বপ্না বলেছে, প্রথমেই বুঝি কেউ বেশি মাইনে দেয়? চাকরিতে ঢুকলে দু-এক বছর পর নতুন গ্রেড, নতুন স্কেল দেবে।

স্বপ্নাদের বাড়ির বৈঠকখানায় দুপুরবেলা শুয়ে থেকেছে মধুময়, তার পকেটে ইন্টারভিউয়ের চিঠি। সে হাসতে হাসতে বলেছে, জানো, ইন্টারভিউয়ের জন্য সকাল সাড়ে ন'টায় যেতে বলে, তারপর বসিয়ে রাখে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। হয়তো ডাক পড়ে সেই চারটে সাড়ে চারটের সময়...আমার খুব খিদে পেয়ে যায়।

স্বপ্না হেসে বলেছে, ঠিক আছে, আমি দুপুরবেলা টিফিন কৌটোয় করে তোমার জন্য খাওয়ার নিয়ে যাব।

মধুময় বলেছিল, অন্য ক্যান্ডিডেটরা তোমাকে দেখে সিটি দেবে।

তাহলে—কথাটা শেষ না করে স্বপ্না তার ছোট্ট হাতব্যাগটা খুলে দুটো দশ টাকার নোট

বের করে বলেছে, তোমার কাছে রাখো।

ওপাড়ার একটি বাচ্চাদের স্কুলে স্বপ্না তখন সকালবেলা পড়াতে শুরু করেছে। তার নিজস্ব রোজগার আছে। স্বপ্নার কাছ থেকে ওই টাকা নেওয়াটা হয়েছিল তার তৃতীয় ভুল। স্বপ্না বলেছিল, তোমার উচিত ছিল আর্টিস্ট হওয়া। কেন তুমি সায়েন্স পড়তে গেলে?

এই কথাটা শুনলেই মধুময় লজ্জা পায়। মধুময়ের ছবি আঁকার হাত আছে। সে কোথাও শেখেনি। ছোটবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার শখ। আত্মীয়স্বজনরা সবাই প্রশংসা করেছে তার ছবি দেখে। স্বপ্নার ছবি সে এঁকেছে অনেকগুলো, কিন্তু মধুময় জানে, আত্মীয়স্বজনের বা বান্ধবীর প্রশংসা পেলেই কেউ আর্টিস্ট হয় না। এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করা দরকার। ছবি আঁকা সারাদিনের কাজ। খরচও অনেক। সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে শিল্পী হওয়ার ঝুঁকি সে নিতে পারেনি। তাকে শখের শিল্পী হয়েই থাকতে হবে।

বেকার অবস্থায় বেশ বড় কয়েকটি প্রলোভনের মধ্যে পড়তে হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বখাটে হয়ে যাওয়া। মধুময় হঠাৎ পাড়ার বেকার বখাটেদের দলে ভিড়ে গেল। বখাটেমির একটা দারুণ নেশা আছে তো। সবসময়ই কিছু-না-কিছু উত্তেজনা। এ পাড়া ও পাড়ায় ঝগড়া, মারামারি, রবারের কারখানার পিছনের মাঠে সন্ধের পর লুকিয়ে-লুকিয়ে মদ্যপান, নারীদের বিষয় জমকালো আলোচনা। প্রত্যেকটিই ধাপে-ধাপে এগোয়।

আর্ট স্কুলে ভরতি না হয়ে সায়েন্স পড়তে যাওয়া যেমন মধুময়ের চরিত্র-বিরোধী কাজ হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি চরিত্র-বিরোধী কাজ সে করতে লাগল এই নতুন বন্ধুদের সঙ্গে মিশে। যে মধুময় ছিল লাজুক নম্র একটি ছেলে, সে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ার ছোটখাটো গুন্ডাদের মধ্যে বেশ নাম করে ফেলল। তার লম্বা চেহারা, চুল বড়-বড়, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করলে এবং গলায় একটা রুমাল বাঁধলে তাকে গুন্ডার ভূমিকায় বেশ মানিয়েও যায়।

স্বপ্নার সঙ্গে এই সময়টায় কম দেখা হতে লাগল। দেখা হলেও স্বপ্না তার এই পরিবর্তিত ভূমিকা কিছু বুঝতে পারে না। স্বপ্না অভিমান করে। মধুময় তখন চমৎকার মিথ্যে বলতে শিখেছে, সেইসব মিথ্যে দিয়ে সে স্বপ্নাকে ভোলায়।

স্বপ্নার সঙ্গে তখন দেখা হত সকালে বা দুপুরে। সন্ধের পর একদিনও নয়। সন্ধের পর মধুময় অন্য মানুষ।

মধুময়ের সেই বখাটে দলের আর একজনেরও কোনও মেয়ে বন্ধু ছিল না। কেউ ভালোবাসা পায়নি। তাই তারা সর্বক্ষণ মেয়ের শরীর নিয়ে আলোচনায় মেতে থাকত। মধুময়ের তো সেরকম কোনও অভাব ছিল না। তবু কেন সে ওই আলোচনায় বেশি মজা পেতে লাগল সেটা একটা রহস্য। মেয়েদের বিষয়ে আলোচনা করার বদলে সে তো স্বপ্নার সঙ্গেই সময় কাটাতে পারত খুব সুন্দরভাবে। অথচ সে স্বপ্নার কাছে না গিয়ে বসে থাকত ওই বন্ধুদের সঙ্গে। হয়তো যে-কোনও সুন্দর জিনিস সম্পর্কেই তার আক্রোশ জন্মে গিয়েছিল। ছবি আঁকা একদম ভুলে গিয়ে সে উপভোগ করত বন্ধুদের অশ্লীল রসিকতা।

মধুময় তখন ঠিক যেন একটা দ্বিতীয় গুপ্ত জীবন কাটাচ্ছিল। সে সম্পর্কে কিছু জানে না। তার বাড়ির কেউই কোনও সন্দেহ করেনি। মধুময়ের বাবা বাড়িতে থাকেন খুবই কম সময়, ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে তিনি মনোযোগ দিতে পারেন না। শুধু মাঝে-মাঝে রাত্তিরবেলা বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার একটু আগে স্ত্রীকে বকাবকি করেন খানিকটা।

—ছেলেটা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এরকম বেকার হয়েই থাকবে—সারাদিন কী করে সে?

মধুময়ের মা তাড়াতাড়ি ছেলের দোষ চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন নানা কথা বলে।—চাকরির জন্যে তো হন্যে হয়ে ঘুরছে সারাদিন। চাকরি কি আজকাল গাছে ফলে?

—এতগুলো জায়গায় আমি নিজে গিয়ে চেষ্টা করলাম ওর জন্য, কোথাও তো ইন্টারভিউয়ে

ভালো করতে পারে না। এবার না হয় আমাদের অফিসেই বড় সাহেবকে বলে দেখব...

মধুময়ের বাবা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর নিজের অফিসে বড় সাহেবকে বলে একটা ছোটখাটো চাকরির ব্যবস্থা করে ফেললেন। কিন্তু সে চাকরিও প্রত্যাখ্যান করল মধুময়।

সরাসরি বাবার সঙ্গে কথা না বলে, মাকে সে জানিয়ে দিল, বাবার সঙ্গে সে এক অফিসে চাকরি করবে না। তাতে বাবারও অসুবিধে হবে, তার নিজেরও অসুবিধে হবে। অফিসের লোকেরাও এ ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না।

মধুময়ের বাবা এ কথা শুনে আরও রাগ করলেন। স্ত্রীকে তিনি জানিয়ে দিলেন ছেলে যা খুশি করে করুক। দুদিন বাদে আমি যখন চোখ বুজব আর সংসারটা ওর ঘাড়ে পড়বে, তখন বুঝবে ঠ্যালা।

মধুময়ও তার মাকে জানিয়ে দিল, তিন মাসের মধ্যেই যে-কোনওভাবেই হোক, একটা উপার্জনের পথ সে খুঁজে নেবে। এ জন্য বাবাকে চেষ্টা করতে হবে না। সে নিজেই পারবে।

বেকারেরও হাতখরচ লাগে, আড্ডার সময় বেকারদেরও পয়সা খরচ হয়। মধুময় তখন যাদের সঙ্গে মিশছিল, তারা অনেকেই তার চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড়, এবং পাঁচ-ছ'বছর ধরে বেকার। কোন অত্যাশ্চর্য উপায়ে তারা পয়সা জোগাড় করত তা মধুময় জানে না। কিন্তু তার নিজের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মায়ের কাছ থেকে আর প্রত্যেকদিন পয়সা চাওয়া যায় না। স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হলে মধুময় বলত, দেখি তুমি কত পয়সা জমালে—তারপর স্বপ্নার হাতব্যাগটা খুলে বলত, তোমার কাছ থেকে আবার পনেরো টাকা ধার নিলাম। সব শোধ করে দেব একসঙ্গে!

মধুময়ের ছোট বোন রুমি শুধু একদিন তাকে বলেছিল, হ্যাঁরে দাদা, তুই আজকাল রতনদের দলের সঙ্গে মিশছিস? আমাদের কলেজের সামনে দেখলাম তোরা একটা ট্যাক্সি করে যাচ্ছিস...

রুমি পড়ে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে। গতকাল সত্যিই ওইখান দিয়ে মধুময়রা গিয়েছিল একটা ট্যাক্সিতে। মধুময় অস্বীকার করতে পারল না।

—কেন, ওদের সঙ্গে মিশলে কী হয়েছে?

—ওরা তো সবক'টা বাজে ছেলে! তোর সঙ্গে রুচিতে মেলে?

—কে বলেছে বাজে ছেলে?

—ওরা সবসময় খারাপ-খারাপ কথা বলে, মেয়েদের দেখলে সিটি দেয়...

—তোকে দেখে কোনওদিন খারাপ কথা বলেছে কিছু?

বখাটে ছেলেদের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। তারা কখনও সেমসাইড করে না। নিজেদের দলের কারুর আত্মীয় বা চেনা মেয়েদের ওরা বলে সেমসাইড।

মধুময় বলল, লোকের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না তারা ভালো কী খারাপ। ওরা মোটেই খারাপ ছেলে নয়, বেকার বলে সবাই ওদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি ইচ্ছে করে বেকার হয়ে আছে?

—বেকার হলেই বুঝি বখাটে হতে হবে? তুই ওদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে স্বপ্নাদিকে বলে দেব।

স্বপ্না সম্পর্কে সবাই একটা কথা জানে। স্বপ্না একদম মিথ্যে কথা বা কোনওরকম খারাপ কথা সহ্য করতে পারে না। ছেলেরা দূরে থাক, কোনও মেয়েও স্বপ্নার সামনে কোনও অসভ্য কথা বললে, স্বপ্না সেখান থেকে রাগ করে উঠে যায়। মধুময়ের সঙ্গে স্বপ্নার এতদিনের পরিচয়, কিন্তু মধুময় এখন পর্যন্ত একবারও স্বপ্নাকে চুমু খায়নি। বিয়ের আগে স্বপ্না ওসব ব্যাপার কল্পনাই করতে পারে না।

মধুময় এমনভাবে রুমির দিকে তাকিয়ে ছিল যেন রুমি যদি সত্যিই স্বপ্নার কাছে এ ব্যাপারে কোনও নালিশ করে, তাহলে সে রুমিকে ভস্ম করে ফেলবে!

লম্বা-চওড়া চেহারার জন্য মধুময়কে খুব পছন্দ করে রতন। প্রায়ই সে মধুময়ের পিঠ চাপড়ে

বলে, এ ছেলেটাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে। এরকম একটা এক নম্বরি ছেলে কেরানিগিরির জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিল, এ কথা ভাবা যায় মাইরি! এ ছেলের তো রাজা হওয়ার কথা!

মধুময়ের সাহস পরীক্ষা করবার জন্য একদিন সন্ধেবেলা কার্জন পার্কের কোণে দাঁড়িয়ে রতন বলল, ওই যে মোটা মতন লোকটা যাচ্ছে তুই ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারিস মধুময়?

মধুময় অবাক হয়ে বলেছিল, কেন? ওকে ফেলে দেব কেন?

রতন বলেছিল, সে কথা জানবার তোর দরকার নেই। লোকটাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েই ইডেন গার্ডেনের দিকে ছুটে পালাবি। যদি ধরা না পড়িস, তাহলে বুঝব, তুই বাহাদুর।

—আর যদি ধরা পড়ি?

—তখন উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবি। এমনিতে লোকের সঙ্গে রাস্তাঘাটে ধাক্কা লেগে তো যায়ই। আর যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়—

—পুলিশে ধরবে কেন?

ধরবে না, কথার কথা বলছি। তবু যদি ধরে তুই তখন কিন্তু আমাদের কারুর নাম বলবি না। তা হলে বুঝব তোর হিম্মত।

লোকটির মুখ ভরতি পান, বাতাবী লেবুর মতন গোল মুখের মধ্যে চোখ দুটো অতি লোভীর মতন। দেখলেই মনে হয়, লোকটা সারাদিন স্বার্থ চিন্তা করে। মানুষ ঠকানোই ওর পেশা। লোকটার হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ।

উলটোদিক দিয়ে হেঁটে গিয়ে মধুময় লোকটির সামনে থমকে দাঁড়াল। অনেক সময় এ রকম হয়, দুজন লোক মুখোমুখি পড়ে যায়, একজন ডানদিকে সরলে অন্যজনও ডানদিকে সরে, আবার দুজনই বাঁদিকে। সেই রকম অবস্থায় মধুময় লোকটিকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল। লোকটিকে দেখেই সে খুব অপছন্দ করেছিল বলে ল্যাং-টা বেশ জোরেই কষাল।

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। হাতের ব্যাগটা ছিটকে গেল।

মধুময় যেন দেখতেই পায়নি, এইভাবে এগিয়ে গেল। তারপর রাজভবনের পাশ দিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে সে ছুটে গেল ইডেন গার্ডেনের দিকে।

পরের দিন রতন বলল, লোকটার ব্যাগে দেড়হাজার টাকা ছিল মাত্তর। এই নে তোর শেয়ার, চারশো টাকা!

মধুময়ের হাত কাঁপছিল।

রতন বলেছিল, কী রে, ভয় পাচ্ছিস? লোকটা বড়বাজারে ব্যবসা করে। এই দেড়হাজার টাকা তো ওর কাছে হাতের ময়লা। সর্ষের তেলের দাম কেজিতে আট আনা বাড়িয়ে দিলেই ওদের দিনে দশহাজার টাকা রোজগার! জানিস!

অপরাধবোধকেও অতিক্রম করে গেল নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ। একটা বদমাশ লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এই হিসেবে ব্যাপারটাকে নিল মধুময়। যেন সে একটা ছোটখাটো রবিনহুড। গভর্নমেন্ট তো এইসব ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেবে না। আমরাই দেব।

স্কুল কলেজে পড়ার সময়েও মধুময় কখনও গুন্ডামি মারামারি করেনি। তার স্বভাবটাই ছিল নরম। বলশালী চেহারা হলেও অনেকে তাই তাকে বলত মেয়েলি ছেলে। এখন মধুময় প্রমাণ করে দিল, সে মোটেই মেয়েলি নয়। এই নতুন ভূমিকায় সে বেশ উত্তেজনা বোধ করল।

টাকাটা পাওয়ার পর সে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল, তোমার কাছ থেকে সবসুদ্ধ কত টাকা ধার নিয়েছিলাম যেন? পঁচাত্তর টাকা না? এই নাও।

স্বপ্না অবাক হয়ে বলেছিল, তুমি চাকরি পেয়ে গেছ? কই, আমাকে বলোনি তো!

মধুময় বলেছিল, না, চাকরি পাইনি এখনও। তবে, শিগগিরই কিছু করব।

—তাহলে কোথায় পেলে টাকা?

মধুময় চটেছিল। সে পুরুষমানুষ, সে কেন একটি মেয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দেবে টাকা কোথা থেকে পেল? স্বপ্না রোজগার করতে পারে, আর সে পারে না! বেকার বলে কি স্বপ্নাও তাকে অবজ্ঞা দেখাতে শুরু করেছে?

সে জোর করে স্বপ্নার ব্যাগে গুঁজে দিল পঁচাত্তর টাকা। গঙ্গার ধারে রেস্তোরাঁয় গিয়ে আরও খরচ করে ফেলল কুড়ি টাকা, স্বপ্না খেতে চায় না, তবু সে জোর করে খাওয়াবেই।

স্বপ্না তবু বারবার জিগ্যেস করতে লাগল টাকাটার কথা। সে জানতে চায় মধুময় হঠাৎ এমন বড়লোক হয়ে উঠল কী করে। তার কাছে মধুময় কোনও কিছুই গোপন করে না, স্বপ্নার এরকম ধারণা, সুতরাং টাকা পাওয়ার ব্যাপারটাই বা বলবে না কেন? কিন্তু টাকার প্রসঙ্গ উঠলেই চটে যাচ্ছিল মধুময়।

দ্বিতীয় কাজটিও মধুময় বেশ সার্থকভাবেই করল। কাজ বেশ সোজা, কোনও একটি লোককে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া। মধুময় নিজের হাতে টাকাপয়সা লুঠ করে না। সে ভার রতন আর দুজন সঙ্গীর। সে শুধু একটি লোককে রাস্তায় ফেলে দেয়। এবং দ্বিতীয়বারেও সে লোকটিকে দেখিয়ে দিয়েছিল রতন, তারও চেহারার মধ্যে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতার ছাপ। মানুষের রক্ত নিংড়ে নেওয়াই যেন ওর কাজ। এইসব লোকের নিশ্চয়ই শাস্তি পাওয়া উচিত। আর রীতিমতন ঘৃণার সঙ্গেই লোকটিকে ফেলে দিয়েছিল মধুময়।

দ্বিতীয়বার পেল সে মাত্র সাতাশ টাকা! রতন খুব আফশোসের সঙ্গে বলেছিল, ও শালা মহা কঞ্জুষ। অতবড় পেটমোটা ব্যাগের মধ্যে রেখেছিল মাত্র একশো তিরিশ টাকা! শালা!

ব্যাগে সত্যিই কত টাকা ছিল, সেটা জানবার উপায় নেই মধুময়ের। সেটা রতন যা বলবে, তা-ই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু মধুময় জানে, দলপতিকে অবিশ্বাস করতে নেই। তা ছাড়া, কাজটাই তার খুব ভালো লাগছে, সে কিছু খারাপ লোককে শাস্তি দিচ্ছে। টাকাটাই তো প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু এই টাকাটা পকেটে রাখলেই যেন মধুময়ের পকেট জ্বলতে থাকে। তক্ষুনি ইচ্ছে করে খরচ করে ফেলতে। মধুময়ের অন্তত দুটো গেঞ্জি কেনার দরকার, সে কথা মাকে মুখ ফুটে বলতে পারছে না। কিন্তু নিজের রোজগার করা টাকা দিয়েও সে গেঞ্জি কিনল না। ছুটে চলে গেল স্বপ্নার কাছে। যাওয়ার পথে একটা দোকান থেকে কিনে নিয়ে গেল রাজশেখর বসুর রচনাবলীর একটি খণ্ড। স্বপ্না একদিন বলেছিল, রাজশেখর বসুর বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। খুব পড়তে ইচ্ছে করে।

উপহারটা পেয়ে খুশি হয়েছিল স্বপ্না। কিন্তু সেইসঙ্গে বলেছিল, তোমার কী যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে আজকাল।

মধুময় চমকে উঠে বলেছিল, কই না তো! তুমি কী পরিবর্তন দেখলে?

—কীরকম যেন ছটফটে ভাব। এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে পারো না। আগে তো এরকম ছিলে না।

—মধুময় হেসে বলেছিল, বেকাররা একটু ছটফটেই হয়।

—নিজেকে সবসময় বেকার বোলো না তো! আমার শুনতে ভালো লাগে না!

—আমি আর বেশিদিন বেকার থাকব না অবশ্য।

—কোথাও চাকরি পাচ্ছ বুঝি?

—চাকরি ছাড়া পুরুষ মানুষ আর অন্য কোনও কাজ করতে পারে না?

খেলাটা বেশ জমে উঠেছিল।

মধুময় আজকাল অধিকাংশ সময়েই বাড়িতে থাকে। আগে থাকত না। বেকার ছেলেদের পক্ষে বাড়িতে বসে থাকা একটা লজ্জার ব্যাপার। খেয়েদেয়ে রোজ দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়া বেকার ছেলেদের পক্ষে বড়ই বেমানান। লোকে তাকে আরও বেশি উপহাস করে। বেকাররা রোগা হবে, তাদের চোখের কোণে কালি থাকবে, মেজাজ হবে খিটখিটে, এটাই যেন স্বাভাবিক।

যেন দেখলেই বেকার বলে চিনতে পারা যায়। পরিচ্ছন্ন পোশাক, পরিপাটিভাবে চুল আঁচড়ানো, সুন্দর চেহারার বেকার দেখলে বাকি সব লোকদের কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

মধুময়ও আগে বোতাম খোলা শার্ট আর রবারের চটি পরে, চুল না আঁচড়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়াত। দুপুরবেলা নাকে-মুখে কোনওরকমে খানিকটা ভাত গুঁজে খুব ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কোনও পার্কে গিয়ে শুয়ে থাকত গাছের ছায়ায়।

চাকরি পাওয়াটাই বড় কথা নয়, সবসময় এমন একটা ভাব দেখাতে হবে যেন চাকরির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করা হচ্ছে। আর চাকরির চেষ্টা মানে তো শুধু দরখাস্ত লেখা নয়, গুরুত্বপূর্ণ লোকদের ধরাধরি করা।

কিন্তু মধুময় আর দুপুর রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করা ছেড়ে দিয়েছে। সে দুপুরে ঘুমোয় না অবশ্য, বই পড়ে কিংবা ছবি আঁকে।

মা মাঝে-মাঝে জিগ্যেস করেন, কিছু সুবিধে হল রে, খোকা? তোর বাবা জিগ্যেস করছিলেন।

মধুময় করুণ মুখ করে বলে, দ্যাখো মা, চাকরি নেই বলে রোজ লোকের কাছে অপমান সইতে পারব না। হাজার হোক ভদ্দরলোকের ছেলে। চাকরি যেদিন হওয়ার সেদিন হবেই। তার আগে রোজ-রোজ লোকের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করা—

মা চুপ করে যান। এটা যে মধুময়ের একটা নতুন কায়দা সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। এমনকি ওই করুণ মুখভঙ্গিটাও অভিনয়। মধুময়ের নতুন খেলার পক্ষে এটা খুব দরকারি।

শতকরা নিরানব্বইজন প্রৌঢ়ার মতন মধুময়ের মা-ও নিয়তিতে বিশ্বাস করেন। সুতরাং, চাকরি যেদিন হওয়ার সেদিন হবেই, এই কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। মধুময়ের বাবা এখনও ভালো চাকরি করছেন, সংসারে খুব একটা অনটন নেই। তবে ছেলে পড়াশুনা শেষ করে বেকার বসে আছে, এটাই যা লজ্জার ব্যাপার। তিন বছর হয়ে গেল।

বেকার ছেলেদের প্রেম করতে নেই। অন্তত প্রকাশ্যে। আগে মধুময় স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে যেত গোপনে-গোপনে। কিন্তু এখন সে ইচ্ছে করেই সবাইকে জানিয়ে দেয় স্বপ্নার কথা। এটাও তার নতুন কৌশল।

সকালবেলা সে তার বোন রুমিকে বলল, তোর কাছে মেঘদূতের কোনও অনুবাদ বই আছে? একবার দিস তো, স্বপ্না চাইছিল। অর্থাৎ সে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিতে চায় যে আজ সে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

সপ্তাহে তিনদিন স্বপ্না গানের ক্লাসে যায়। ওর ক্লাস শেষ হয় আটটার সময়। সেই তিনদিন ঠিক আটটা দশে হাজরা মোড়ে দাঁড়ালে দেখা হয় স্বপ্নার সঙ্গে।

কিন্তু মধুময় বাড়ি থেকে বেরোয় দুটোর সময়। মাঝখানে ঘণ্টা পাঁচেক তার অন্য কাজ থাকে। মধুময়ের বাড়ির কেউ তো জানতে পারছে না যে স্বপ্নার সঙ্গে ঠিক ক'টার সময় দেখা করতে যাবে। রাস্তায় কিংবা বাড়িতে।

সন্ধেবেলা বেরিয়ে সে চলে আসে শিয়ালদা স্টেশনে। তার নতুন বন্ধুরা কাছাকাছি কোনও চায়ের দোকানে অপেক্ষা করে আগে থেকে। এক-একদিন এক-এক জায়গায়।

এই সময়টায় শিয়ালদা স্টেশনে সাংঘাতিক ভিড়। সবাই দারুণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করে। কারুর কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে মধুময় তার বন্ধুদের সঙ্গে ভেতরে গিয়ে অলসভাবে ঘুরে বেড়ায়। আসলে তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখে যাত্রীদের ওপর। তারপর বেছে-বেছে একজনকে ঠিক করে। সেই লোকটির চেহারায় কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। তাকে শুধু সচ্ছল হলেই চলবে না, তাকে নিষ্ঠুরও হতে হবে। দেখলেই যাতে বোঝা যায় এই লোক অন্য অনেককে ঠকায়। অপরের রক্ত শোষণ করেই সে বেঁচে আছে। কিংবা, এই লোক খাবারে ভেজাল মেশায়, কিংবা বেবিফুড ব্ল্যাক করে। শুধু চেহারা দেখেই এতখানি বুঝে নিতে হয়।

কোনও একটা ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ায় সেই সময় কাজ শুরু করে মধুময়। এই সময় একটা দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মধুময়ের অন্য বন্ধুরা তখন আলাদা হয়ে গেছে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। মধুময় দৌড়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে সেই বেছে রাখা লোকটিকে খুব জোরে ধাক্কা দেয়। ধাক্কাটা এমনভাবে দিতে হয়, যাতে সে ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে।

প্রথম-প্রথম মধুময় ধাক্কা মেরে নিজেও দৌড়ে পালাত। এখন আর তা করে না, সে নিজেই লোকটিকে টেনে তোলে। অন্য লোকরাও সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। দু-এক মিনিট সময় লাগে। তার মধ্যেই লোকটির ব্যাগ হাওয়া। রতন কিংবা ধনা ব্যাগটা নিয়ে মিশে যায় ভিড়ের মধ্যে।

মধুময় লোকটিকে সমবেদনা জানায়। অন্যদের সঙ্গে মিলে সেও ব্যাগটা খোঁজবার ভান করে। তার আগে সে নিজেই লোকটিকে ধমক দেয়—আপনার চোখ নেই মশাই, ট্রেন এসেছে বলে এমন অন্ধের মতন ছুটতে হবে।

মধুময়কে সন্দেহ করার উপায় নেই। তার দুর্দান্ত সুন্দর চেহারা, প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মতন সাজপোশাক। তার ব্যবহার কত ভদ্র।

স্টেশন থেকে ব্যাগ-ট্যাগ ছিনতাই করে ছিঁচকে চোরেরা। সকলেরই ধারণা, সেইসব ছিঁচকে চোরদের একটা টিপিক্যাল চেহারা আছে। তাদের মাথায় খোঁচা-খোঁচা চুল, ইঁদুরের মতন লম্বাটে মুখ আর চঞ্চল চোখ। লোকেরা সেইরকম চেহারার কারুকেই ভিড়ের মধ্যে খোঁজে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হলে মধুময় ট্রেনে উঠে পড়ে। উলটোডাঙা বা দমদম পর্যন্ত চলে যায়। তারপর সেখানে নেমে আবার উলটোদিকের ট্রেন ধরে শিয়ালদা ফিরে আসে। সব মিলিয়ে একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার বেশি লাগে না।

মৌলালির মোড় থেকে একটু বাঁ-দিকে বাঁকলে যে পার্কটা, সেখানে অপেক্ষা করে রতনরা। টাকাপয়সা তক্ষুনি ভাগ হয়ে যায়। লোক চিনতে খুব ভুল না হলে রোজগার হয় বেশ ভালোই। এক-একদিন চার-পাঁচহাজার টাকাও থাকে ব্যাগে। দুশো-আড়াইশোর কমে কোনও দিন না।

সপ্তাহে একদিন শিয়ালদায়, পরের সপ্তাহে হাওড়ায়, তার পরের সপ্তাহে ডালহৌসিতে, এবং তারপর একদিন চৌরঙ্গিতে সিনেমা পাড়ায়। মাসে মোট চারদিন কাজ। হাজার বারোশো টাকা হেসে-খেলে পাওয়া যায়।

টাকা ভাগাভাগির পর রতন আর ধনারা যায় ফুর্তি করতে। মধুময় কিন্তু আর ওদেব সঙ্গে থাকে না। তার অন্য কাজ আছে।

ঠিক আটটা দশে সে পৌঁছে যায় হাজরা মোড়ে। তার মুখে বিন্দুমাত্র উত্তেজনার চিহ্ন নেই।

স্বপ্না এগিয়ে এসে জিগ্যেস করে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?

মধুময় হাসিমুখে বলে, অন্তত আধঘণ্টা।

স্বপ্না বলে, তুমি আচ্ছা পাগল! এরকম ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার কী দরকার? বাড়িতে আসতে পারো না? আমি তো রোজ গানের স্কুলে আসি না।

মধুময় বলে, আমার এ রকম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেই ভালো লাগে। ঠিক নতুন প্রেমিকদের মতন মনে হয়।

সেই হাফপ্যান্ট পরা বয়েস থেকে স্বপ্না মধুময়ের বান্ধবী। সবাই জানে, মধুময় একদিন স্বপ্নাকে বিয়ে করবে। একটা ঠিক মতন চাকরি পেলেই হয়।

টাকাগুলো খরচ করাই এক ঝামেলা। স্বপ্না বেশ সচ্ছল পরিবারের মেয়ে হলেও শখ করে পাড়ার একটা মর্নিং স্কুলে পড়ায়। অর্থাৎ তার একটা বৈধ রোজগারের পথ আছে। নিজের খরচ সে নিজেই চালায়। এবং যেহেতু তার প্রেমিক বেকার, তাই সে ধরেই নিয়েছে যে দুজনে কোনও রেস্তোরাঁয় যেতে গেলে স্বপ্নাই ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দেবে।

মধুময় তাতে আপত্তি করে নিজে টাকা দিতে গেলেই স্বপ্না জিগ্যেস করে, তুমি টাকা কোথায়

পেলে?

মধুময় নিজেই একসময় স্বপ্নার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে। সুতরাং হঠাৎ তার পকেটে অনেক টাকা থাকার ব্যাখ্যা দেওয়া তার পক্ষে সত্যিই শক্ত। তাই সে এক গাল হেসে বলে, আমার রিস্টওয়াচটা আজ বিক্রি করে দিলাম।

—কেন?

—বেকারের হাতে ঘড়ি মানায় না।

—যাঃ, বাজে কথা বোল না। আমাকে জিগ্যেস না করে কেন বিক্রি করলে?

—জিগ্যেস করলে তুমি আপত্তি করতে, সেই জন্য।

—আমি তোমাকে আর একটা ঘড়ি কিনে দেব।

অথচ মধুময়ের পকেটে তখন অনেক টাকা। একজন বেকারের তুলনায় তো বটেই, তার বয়েসি অনেক ছেলের তুলনাতেই সে বেশ সচ্ছল। পকেটে হাজার খানেকের বেশি টাকা রয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে মতন খরচ করার উপায় নেই। একজন বেকার দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে—এ কি কেউ কখনও দেখেছে?

স্বপ্না এত বেড়াতে ভালোবাসে, মধুময় ইচ্ছে করলেই ট্যাক্সি ভাড়া করে তাকে নিয়ে চলে যেতে পারে ব্যারাকপুর বা ডায়মন্ডহারবার। কিংবা আরও দূরে। অবশ্য খুব বেশি দূরে নয়, কারণ সেদিনের মধ্যেই ফিরতে হবে। কোথাও তার সঙ্গে স্বপ্না রাত্রে থাকবে, এ কথা কল্পনাই করা যায় না।

স্বপ্না এখনও ভাবে, বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের সাধারণ আলিঙ্গন চুম্বনও পাপ। স্বপ্নার অসাধারণ সারল্য ও সততার জন্য তার কলেজের বান্ধবীরাও কখনও তাকে তাদের গোপন কথা বলেনি।

এত সরল বলেই কখনও ঠকাতে ইচ্ছে করেনি মধুময়ের। কিন্তু সে যে কিছুদিন ধরে দু-রকম জীবনযাপন করছে সে-কথা স্বপ্নাকে কিছুতেই জানাতে পারে না।

যদিও মধুময়ের মনে-মনে যুক্তির অভাব নেই। সে তো কোনও অন্যায় করছে না। তার স্বাস্থ্য ভালো, পড়াশুনোয় মাঝারি, সে তো সৎভাবে থেকে এই দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বেকার আখ্যা দিয়ে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে বছরের পর বছর।

বাড়ির লোকের অনুরোধে মধুময় ডব্লু.বি.সি.এস. পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসও করেছে। প্যানেলে নাম আছে তার। কিন্তু কবে চাকরি হবে কোনও ঠিক নেই। তার দু-বছর আগে যাদের প্যানেলে নাম উঠেছিল, তারাও অনেকে চাকরি পায়নি এখনও। এ কীরকম ব্যবস্থা, যেখানে পনেরো হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পর চাকরি পায় মাত্র বাইশজন? বছরের-পর-বছর এই অদ্ভুত কাণ্ড চলছে। এরই ওপর দেশ টিকে আছে।

মধুময় কেন নিজেকে বঞ্চিত করবে? কেন চব্বিশ বছর বয়সেও তাকে বাবা মায়ের কাছে হাত পেতে ট্রাম বাস ভাড়া কিংবা সিগারেটের খরচ চাইতে হবে? তাই সে কেড়ে নিচ্ছে। যাদের বেশি আছে, কেড়ে নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে। চোরের ওপর বাটপাড়ি করাটা কি একটা অপরাধ? মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন। সেই সময়টা তারা বঞ্চিত নিঃস্ব হয়ে থাকবে কেন?

মধুময়ের এক কাকা বাড়িতে এসে একদিন বললেন, শোন, তোর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি আমি। শুধু-শুধু বাড়িতে বসে আছিস—

মধুময় অমনি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। তার চাকরির জন্য আত্মীয়স্বজনেরা সবাই যেন খুব চিন্তিত। এই জিনিসটাই তার ভালো লাগে না। সে কি সবার করুণার পাত্র? তার জন্য অন্যরা ব্যবস্থা করে দেবে কেন? তার নিজের কি যোগ্যতা নেই?

কাকা বললেন, আমাদের পাড়ার স্কুলের আমি কমিটি মেম্বার। তুই এ স্কুলে ঢুকে পড়।

মধুময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, স্কুলে?

হ্যাঁ, বেশি খাটুনি নেই। স্কুলে তো প্রায়ই ছুটিছাটা থাকে। তার ওপর গ্রীষ্মের ছুটি, পুজোর ছুটি—

—স্কুলে পড়ানো আমার পোষাবে না।

—কেন—পোষাবে না কেন? তোকে তো আর বরাবর স্কুলমাস্টারি করতে বলছি না। যতদিন তুই ভালো চাকরি না পাস...শুধু-শুধু বসে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো...তারপর মাস গেলে শ-আড়াই টাকা, মন্দ কি।

—আড়াইশো টাকা?

—মনে কর ওটা তোর হাত খরচ।

—আড়াইশো টাকার জন্য রোজ সকালে স্নান করে ভাত খেয়ে বেরুতে হবে—থাকতে হবে দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত। অথচ আমারই মতন বি.এস-সি পাস করে যারা ব্যাঙ্কে বা এল আই সি-তে কিংবা কোনও কমার্শিয়াল ফার্মে ঢোকে, তারা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করার জন্য অন্তত সাত-আটশো টাকা পায়।

—সেরকম চাকরি যতদিন না পাচ্ছিস...স্কুলে থাকতে থাকতেই অন্য জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে পারিস...আজকাল তো অনেক ভালো ছেলেই বসে না থেকে স্কুলের চাকরিতে ঢুকে পড়ে। তারপর নানা জায়গায় দরখাস্ত পাঠায়, কিংবা পরীক্ষা দেয়। দু-এক বছরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েও যায়।

—মেজোকাকা, আমার স্কুলে পড়াবার যোগ্যতা নেই।

—বি.এস-সি পাশ করেছিস, আর স্কুলের ছেলেদের তুই পড়াতে পারবি না?

—সবাই কি পড়াতে পারে?

—কেন পারবে না?

—সেই জন্যই তো আজকাল ইস্কুলগুলোর এই অবস্থা।

মধুময়ের মাকে ডেকে মেজোকাকা বললেন, ও বউদি, শুনুন আপনার ছেলের কথা। ওর জন্য একটা স্কুলের কাজ জোগাড় করে আনলাম, ও তাতে রাজি নয়। শুধু-শুধু বসে থাকার চেয়ে আড়াইশো টাকা পেত।

মধুময়ের মা চট করে কোনও মন্তব্য করলেন না। ছেলের মেজাজ তিনি জানেন। একবার কোনও ব্যাপারে না বললে সহজে আর হ্যাঁ করানো যায় না।

মেজোকাকা বললেন, স্কুলে তো আজকাল পড়াশুনো প্রায় হয়ই না। প্রায়ই স্ট্রাইক-ফাইক লেগেই থাকে। সেইজন্যই বলছিলাম, একবার ঢুকে পড়তে পরলে ঠায় বসে-বসেই মাইনে পেত।

মা আস্তে-আস্তে বললেন, ও বোধহয় স্কুলের কাজ পারবে না। একসঙ্গে অতগুলো ছেলেকে সামলানো...

মধুময় বলল, তুমি ঠিকই বলেছ মা। সবাই কি সব জিনিস পারে? আমার দ্বারা মাস্টারি করা হবে না।

বাড়িতে থাকলে মেজোকাকার সঙ্গে আরও তর্ক-বিতর্ক করতে হবে বলে মধুময় একটা ছুতো দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

ভেতরে-ভেতরে রাগে সে ফুঁসছে।

কোনও চাকরি পাচ্ছে না বলেই সে স্কুলে পড়াবে? স্কুলে পড়ানোটা এতই সহজ কাজ? অযোগ্যতা নিয়ে কিংবা অযত্নের সঙ্গে স্কুলের ছেলেদের পড়ানোটা অন্যায় নয়? অন্য চাকরির চেষ্টা করতে করতে স্কুলে দু-এক বছর কাটিয়ে মাইনে নেওয়ার চেয়ে একজন চোরাকারবারির টাকা ছিনিয়ে

নেওয়া কি বেশি অন্যায়?

মঙ্গলবার রাত পৌনে এগারোটার সময় একটা ঘটনা ঘটল।

সন্ধে থেকে একটা লোককে অনুসরণ করছিল মধুময় ও তার বন্ধুরা। লোকটা মেট্রো সিনেমা থেকে বেরিয়েছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে লোকটার চেহারায় বা ব্যবহারে কোনও মিল নেই। লোকটার মুখখানা হিংস্র ধরনের, একটা দামি প্যান্ট ও সিল্কের হাওয়াই শার্ট পরা, হাতে সোনার ব্যান্ডের ঘড়ি। মেয়েটি পরে আছে সাধারণ একটা তাঁতের শাড়ি, মুখখানা লাজুক। এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে ওই ধরনের পুরুষদের যোগাযোগ হয় একটিমাত্র উপায়েই। টাকার জোরে।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে লোকটি ওই মেয়েটিকে নিয়ে ঢুকল একটি বারে। এখানে পর্দা ঘেরা কেবিন আছে। সেখানে ওরা বসে রইল দু-ঘণ্টা। মধুময়ের বন্ধু রতন আর ধনাও বারের মধ্যে গিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। মধুময় বাইরে ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

সেই বার থেকে বেরিয়ে লোকটি আর মেয়েটি হাঁটতে লাগল। লোকটির চোখ লালচে হয়ে এসেছে, মুখের চামড়া চকচক করছে। মেয়েটি কিছু পান করেছে কিনা বোঝা যায় না।

চৌরঙ্গি তখন আলোকোজ্জ্বল। প্রচুর লোকজন, এখানে কিছু করার উপায় নেই। ওরা যদি হাঁটতে-হাঁটতে জাদুঘরের দিকে যায়, তাহলেই মধুময়ের সুবিধে। ওদিকটায় অন্ধকার থাকে।

কিন্তু ওরা গ্রান্ড হোটেল পেরিয়ে এসেও আবার ফিরল। গ্র্যান্ড হোটেলের গেটের কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়াল। লোকটি মেয়েটিকে হোটেলের মধ্যে নিয়ে যেতে চায়, অথচ মেয়েটি যাবে না। এতবড় হোটেলে ঢুকতে মেয়েটি বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে। লোকটি একটুক্ষণ হাত পা নেড়ে মেয়েটিকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করল। মেয়েটি তবু যাবে না। তখন ওরা ঢুকল গ্র্যান্ড হোটেলের নিচেই আর একটা বারে। ওরা আরও খাবে। এবার বেরুল সাড়ে দশটার সময়।

বেশি চেষ্টা করতে হল না, সহজেই পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। দরজা খুলে মেয়েটি আগে উঠল, লোকটি কিন্তু উঠল না। জানলা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মেয়েটিকে বলতে লাগল কী যেন সব। তারপর হাতের ঝোলানো ব্যাগ খুলে টাকা তুলে দিল মেয়েটির হাতে।

ট্যাক্সি চলে যাওয়ার পর লোকটি দু-হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। ওকে যে অন্য কেউ লক্ষ করছে, ও তা জানে না।

লোকটা রাস্তা পেরিয়ে চলে এল গ্র্যান্ড হোটেলের উলটোদিকে। যেখানে প্রাইভেট গাড়িগুলো পার্ক করা থাকে। লোকটা কি নিজের গাড়ি এখানে রেখে এতক্ষণ পায়ে হেঁটে ঘুরছিল? নিজের গাড়ি থাকতেও সে মেয়েটিকে ট্যাক্সিতে করে পাঠিয়ে দিল? মানুষ কেন এমন করে কে জানে!

এদিকটায় বেশ অন্ধকার।

হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে লোকটির সামনে এসে দাঁড়াল মধুময়। খুব ব্যস্তভাবে দৌড়বার ভঙ্গি করে খুব সোজা ধাক্কা দিল লোকটাকে। কতটা জোরে ধাক্কা দিতে হবে তা মধুময়ের এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। লোকটা মাটিতে পড়ে যেতেই রতন আর ধনা এগিয়ে এসে নিপুণ হাতে ব্যাগটা তুলে নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল।

কিন্তু মধুময় চলে যাওয়ার আগেই লোকটি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাতে চেপে ধরল মধুময়কে। লোকটার গায়ে বেশ জোর।

সে চেঁচিয়ে উঠল, শালা, তুম ধাক্কা মারা। কাহে মারা।

মধুময় নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। কিন্তু একটুও দেরি করবার উপায় নেই। লোকটার চিৎকার শুনে এক্ষুনি লোক জড়ো হয়ে যাবে।

মধুময় প্রচণ্ড জোরে দু-খানা ঘুঁষি মারল লোকটার থুতনিতে।

লোকটা 'মার ডালা, মার ডালা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ততক্ষণে কিছু লোক পৌঁছে গেছে সেখানে।

মধুময়ের বুক কাঁপছে, কিন্তু মুখখানা শান্ত। সে আদৌ পালাবার চেষ্টা করল না।

লোকটা হাউহাউ করে বলতে লাগল, হামারা ব্যাগ—বহুৎ রুপিয়া থা—ইতনা বড়া হ্যান্ডব্যাগ।

মধুময় বিরক্তির সঙ্গে বলল, আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো? যত সব পেঁচি মাতাল।

অন্য লোকেরা এসে প্রশ্ন করতে লাগল, কী হয়েছে দাদা—কী হয়েছে?

লোকটি বলল তার ব্যাগ হারাবার কথা।

মধুময় চিবিয়ে চিবিয়ে জিগ্যেস করল, কত বড় ব্যাগ?

লোকটা দু-হাত তুলে ব্যাগের মাপ দেখাল। লোকটার ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মধুময় হেসে অন্যদের বলল, দেখুন কী ঝামেলা। এ সব লোকদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।

লোকটা মাতাল। কথা বলছে জড়িয়ে-জড়িয়ে। সবাই মাতালের বিপক্ষে যায়। তা ছাড়া অত বড় একটা হ্যান্ডব্যাগ যে মধুময় নেয়নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। তা ছাড়া মধুময়কে কে সন্দেহ করবে? তার সুন্দর চেহারা, মাথার চুল নিপাটভাবে আঁচড়ানো, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব আছে।

কাছাকাছি কোথাও ব্যাগটা নেই। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই মাতালের প্রলাপ হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। লোকটার জড়ানো কথার মধ্যে এটুকুই শুধু বোঝা গেল, এদিকে তার গাড়ি নেই, সে এদিকে এসেছিল হিসি করবার জন্য।

লোকটিকে ভিড়ের হাতে সঁপে দিয়ে মধুময় ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরল।

এই তার প্রথম বাধা। যদি পুলিশ আসত, অবশ্য পুলিশ কিছুই প্রমাণ করতে পারত না। কলকাতা শহরে চলতে-চলতে তো মানুষের সঙ্গে মানুষের ধাক্কা লাগেই। আর মধুময় নিজে কোনওদিন ব্যাগ কেড়ে নেয় না।

পুলিশকে মধুময় ভয় পায় না। ভয়টা শুধু জানাননি হয়ে যাওয়ার—যদি চেনাশুনো কোনও লোক হঠাৎ দেখে ফেলে? যদি ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ কোনওদিন বেরিয়ে আসে স্বপ্নার দাদা? যদি সেই সময়ই রতনরা ব্যাগটা নিয়ে পালাতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে যায়?

কিন্তু এটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ঝুঁকি না নিলে জীবনে কোনও কাজই করা যায় না।

লোকটাকে ঘুঁষি মারার জন্য মধুময়ের একটুও অনুতাপ হয়নি। লোকটা যে একটা জাত শয়তান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। লোকটা নিরীহ মেয়েদের সর্বনাশ করে টাকার জোরে। এসব টাকা ওরা পায় কোথায়? লোকটা ওই মেয়েটিকে গ্র্যান্ড হোটেলে নিয়ে যেতে চাইছিল। এক সন্ধেতে গ্র্যান্ড হোটেলে কত টাকা খরচ হয়? অনেক কেরানির এক মাসের মাইনের চেয়ে বেশি।

পরদিন সকালে দেখা করার কথা ছিল স্বপ্নার সঙ্গে। স্বপ্না ন্যাশনাল লাইব্রেরির কার্ড করাবে, মধুময় সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

পরদিন সকালে মধুময় অন্য মানুষ। সে স্বপ্নার প্রেমিক। রাসবিহারীর মোড়ে স্বপ্নার জন্য অপেক্ষা করতে-করতে সে গুনগুন করে একটা গান গাইতে লাগল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কার্ড হয়ে গেল খুব সহজেই। বাইরে বেরিয়ে এসে স্বপ্না বলল, আজ এমন সুন্দর দিনটা, এক্ষুনি বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।

ফিনফিনে হাওয়ার সঙ্গে গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ছে। ওই বৃষ্টিতে বেশ ভালো লাগে। যেন বিদেশের তুষারপাতের মতন। গা ভেজে না। আকাশটা ছায়াময়, স্নিগ্ধ, সত্যিই একটা বেড়াবার মতন দিন।

স্বপ্না আবার বলল, এইসব দিনে কী ইচ্ছে করে জানো তো? ইচ্ছে করে কোনও নদীর ধারে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে। চলো না, গঙ্গার ধারে গিয়ে একটু বসি।

মধুময় বলল, গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখবে, ঠিক কোনও-না-কোনও চেনা লোক বেরিয়ে পড়বে।

স্বপ্না বলল, থাকুক গে চেনা লোক। তবু এমন দিনটা নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না।

—গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলে ভিখিরিরা এসে জ্বালাবে। তোমার ভালো লাগবে না।

—বুঝেছি, আসলে তুমি যেতে চাও না। তোমার আজ কোনও ইন্টারভিউ আছে?

—না, বরং তোমাকে আর একটা কোনও নদীর ধারে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে কোনও চেনা লোক নেই, ভিখিরি নেই।

—কোথায়?

—চলোই না—

—কত দূরে?

—সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসব। বাড়িতে বরং একটা টেলিফোন করে দাও।

হাওড়া স্টেশনে এসে মধুময় একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটল দুটো। তার পকেটে যথেষ্ট টাকা, ইচ্ছে করলেই সে ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারে, কিন্তু বেশি টাকা খরচ করতে দেখলেই স্বপ্না প্রশ্ন তুলবে। সেইজন্যই, আগেকার থার্ড ক্লাস, আজকাল যার নাম হয়েছে সেকেন্ড ক্লাস—সেই টিকিটই কাটল।

ট্রেনে উঠেই বুঝল, ভুল করেছে।

স্বপ্নার জন্য কোনওক্রমে একটা বসবার জায়গা পাওয়া গেলেও মধুময়কে থাকতে হল দাঁড়িয়ে। অসম্ভব ভিড়। লোকেরা গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। স্বপ্নার পাশে সামান্য একটু জায়গা, মধুময় নিজে সেখানে বসেনি, কিন্তু আর একটি লোক নির্লজ্জের মতন সেখানেই বসে পড়ল ঠেসাঠেসি করে।

মধুময়ের রাগ গা জ্বলতে লাগল। স্বপ্নাকে অন্য কেউ ছোঁয়, সেটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু উপায়ও কিছু নেই। ট্রেনে সবাই একটু জায়গার জন্য পাগল, সভ্যতাভব্যতা কেউ বড় একটা মানে না।

ভেবেছিল জানলার ধারে বসে গল্প করতে-করতে যাবে। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কথা বলাও যায় না।

স্বপ্না কিন্তু মজা পাচ্ছে। সকৌতুকে সে মাঝে-মাঝে দেখছে মধুময়কে। মধুময়ের সঙ্গে এর আগে সে কখনও ট্রেনে চেপে কোথাও বেড়াতে যায়নি।

হঠাৎ খেয়াল হতেই মধুময় এক হাতে তার প্যান্টের পকেট চেপে ধরল। তার সব টাকা সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। যদি কেউ পকেট মেরে নিয়ে যায়!

কথাটা ভেবেই অবশ্য হাসি পেয়ে গেল তার। এ টাকা তার নিজস্ব নয়। সে নিজেই কোনও চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। এখন তার কাছ থেকেও যদি কেউ এ টাকা মারে, তবে সেই লোককে কী বলা যাবে?

ঘণ্টাখানেক পর ভিড় একটু ফাঁকা হতে মধুময় বসবার জায়গা পেল। স্বপ্না জিগ্যেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মধুময় বলল, আর আধঘণ্টা পরেই জানতে পারবে।

সেই আধঘণ্টা পরে ট্রেন ঝমঝমিয়ে পার হতে লাগল একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে। নিচে বিরাট একটা নদী। বর্ষার সময় দুকূল ছাপিয়ে গেছে।

স্বপ্না জিগ্যেস করল, এই নদীর নাম কী?

—রূপনারায়ণ।

স্বপ্নার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কত নাম শুনেছে এই নদীর। কত বইতে পড়েছে, কিন্তু আগে কখনও দেখেনি। কলকাতা থেকে এত কাছে? মাত্র দেড়ঘণ্টা?

উঠে দাঁড়িয়ে মধুময় বলল, আমরা এখানে নামব।

স্টেশনের নাম কোলাঘাট। নামটার সঙ্গে কেমন যেন একটা ইলিশ-ইলিশ গন্ধ আছে। কোলাঘাট শুনলেই ইলিশ মাছের কথা মনে পড়ে যায়।

মধুময় জিগ্যেস করল, তোমরা তো একবার পুরী গিয়েছিলে—তখন এই নদী দ্যাখোনি?

—তখন এর ওপর দিয়ে গেছি?

—হ্যাঁ, রাত্তিরে গিয়েছিলে বোধহয়, তাই খেয়াল করোনি।

স্টেশনটা বেশ উঁচুতে। সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওরা নেমে এল নদীর ধারের রাস্তায়। সেই রাস্তা দিয়ে খানিকটা হাঁটবার পর একটা হোটেল পড়ল। প্রায় পৌনে দুটো বাজে। বেশ খিদে পেয়েছে।

মধুময় বলল, এসো, আগে খেয়ে নিই।

ভেতরে গিয়ে বসতেই একজন বেয়ারা এসে বলল, একটু আগেই নদী থেকে ধরা একদম টাটকা ইলিশ মাছ আছে বাবু!

মধুময় বলল, দাও। ভাত, ডাল আর মাছ ভাজা।

কলাপাতায় করে দেওয়া হল ভাত। হোটেলে তখন ওরা ছাড়া কেউ নেই। গরম-গরম মাছ আর মাছের ডিম ভাজা আনতে লাগল। ওরা খেয়ে ফেলল পাঁচ-ছ'খানা করে।

স্বপ্না বলল, আমি জীবনে কখনও একসঙ্গে এত মাছ খাইনি। তবে সত্যি খুব চমৎকার স্বাদ।

খেয়ে উঠে ওরা চলে এল নদীর ধারে। স্বপ্না বলল, আমরা একটু নৌকা করে ঘুরে বেড়াব না?

মধুময় বলল, বর্ষাকাল, যে কোনও সময় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

—তাতে কী হবে? উঠুক না ঝড়। আরও ভালো লাগবে।

—যদি নৌকা উলটে যায়?

—যাক না। আমি ডুবে যাব? কেন তুমি আমায় বাঁচাতে পারবে না?

—তা পারব অবশ্য।

স্বপ্না ঠোঁট উলটে বলল, ইস, তার দরকার হবে না মোটেই। আমি খুব ভালো সাঁতার জানি।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নৌকা পাওয়া গেল না। সব নৌকা চলে গেছে মাছ ধরতে।

তাকালেই দেখা যায়, নদীর বুকে এখানে ওখানে মোচার খোলার মতন দুলছে মাছ ধরার নৌকা। সবাই জাল ফেলে বসে আছে। মাঝে-মাঝে জাল টেনে তুলছে, তখন দেখা যাচ্ছে চকচকে ইলিশের মৃত্যুর আগের শেষ দুটি-তিনটি লাফ।

মধুময় জিগ্যেস করল, এর আগে তুমি কখনও ইলিশ মাছ লাফাতে দেখেছ?

—সত্যি, আগে কখনও দেখিনি।

হঠাৎ বেশ জোরে বৃষ্টি এসে গেল। তাতে অবশ্য ভেজার ভয় নেই। ওরা দৌড়ে এসে দাঁড়াল একটা ব্রিজের নিচে। এখানে পাশাপাশি তিনটে ব্রিজ, দুটো ট্রেনের জন্য। একটা মানুষ ও গাড়ির।

ব্রিজের নিচে একেবারে নদীর ধারে দু-খানা সিমেন্টের চাঙড়ের ওপর বসল ওরা। নদীর বুকে বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। অদ্ভুত মোহময় সেই দৃশ্য।

মধুময় তার একটা হাত রাখল স্বপ্নার কাঁধে।

স্বপ্না মধুময়ের দিকে তাকাল।

মধুময় অনুনয় করে বলল, আজ আপত্তি কোরো না, প্লিজ। খুব ইচ্ছে করছে, তোমাকে একটু ছুঁয়ে থাকি।

স্বপ্না সরিয়ে দিল না হাতটা। বরঞ্চ মধুময়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুময় বলল, এই নদী দেখেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম,

জানিলাম এ জগৎ মিথ্যা নয়।'

স্বপ্না হেসে বলল, হল না।

স্বপ্না সাহিত্যের ছাত্রী ছিল। মধুময়ের চেয়ে এসব সে অনেক ভালো জানে।

সে বলল, "রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম, জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।"

মধুময় বলল, ওই একই হল। মিথ্যা আর স্বপ্ন তো একই।

স্বপ্না বলল, এক? মিথ্যা আর স্বপ্ন এক?

—স্বপ্নটাও মিথ্যে নয়?

—না। মোটেই না। মিথ্যেটা শুধুই মিথ্যে। আর স্বপ্নটা সত্যিও না, মিথ্যেও না, অন্যরকম কিছু।

মধুময় বলল, হ্যাঁ, ঠিকই তো। তোমার নাম স্বপ্না, তুমি মিথ্যেও নও, সত্যিও নয়, তুমি সব কিছুর থেকে আলাদা।

স্বপ্না হাসল।

মধুময় হঠাৎ একটা কিছু দেখে চমকে উঠল। তার জামাটার নিচের দিকে একটা লাল রক্তের ফোঁটার দাগ। জামাটার রং হলদে বলে ভালো করে নজর না দিলে দেখা যায় না।,

এটা কিসের দাগ? নিজের মনকে প্রশ্ন করবার আগেই মধুময় অবশ্য উত্তরটা জানে? এটা রক্তের দাগ। কালকের জামাটাই পরে এসেছে মধুময়। কাল রাত্তিরে লোকটাকে ঘুষি মারবার ফলে লোকটার ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই রক্তেরই একটু ছিটে লেগেছে মধুময়ের জামায়।

মধুময়ের গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল। একটা নোংরা লোকের রক্ত লেগে আছে তার জামায়। লোকটার নিষ্ঠুর লোভী মুখখানা ভেসে উঠল তার চোখে।

সে স্বপ্নার কাঁধ থেকে উঠিয়ে নিল নিজের হাত। এইরকম নোংরা জামা পরে স্বপ্নাকে ছুঁয়ে থাকা উচিত নয়।

—তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে! স্বপ্না বলল।

—কই, না তো! এমনি বৃষ্টি দেখছি।

—ওই দ্যাখো, ব্রিজের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন আসছে।

একটু দূরে একটা ইটের নৌকা দাঁড় করানো। দুজন লোক মাথায় করে ইট নিয়ে আসছে পারে। নৌকাটা চওড়া করে রাখতে হয়েছে বলে, ওদের খানিকটা জলের মধ্যে নেমে গিয়ে আনতে হচ্ছে ইট। লোক দুটোরই বুকের পাঁজরা বার করা। পুরো নৌকার ইট নামাতে ওদের নিশ্চয়ই সারাদিন লেগে যাবে। সারাদিন এত পরিশ্রম করে ওরা ক'টাকা পায়? নিশ্চয়ই ভালো করে খেতে পায় না, নইলে অত রোগা হবে কেন? সারাদিন এত পরিশ্রম করেও মানুষ খেতে পায় না।

লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মধুময় বুঝতে পারল জোয়ার এসে গেছে, ক্রমশ নদীর জল বাড়ছে। কেননা একটু আগে ওরা হাঁটুজল পর্যন্ত নামছিল, এখন ওদের উরু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে।

এসব নদীতে বান ডাকে না, তাই ভয় নেই। জোয়ারের সময় জল বাড়ে আস্তে-আস্তে। বেলাভূমির ওপর জল কতটা এগিয়ে আসছে চট করে বোঝা যায় না।

মধুময়ের ইচ্ছে হল, সে এই নদীতে নেমে যায়। ডুব দিয়ে খুব ভালো করে স্নান করে। জামাটা ধুয়ে মুছে ফেলে রক্তের দাগটা। কিন্তু তাতে কাল রাত্তিরের স্মৃতি মুছে যাবে?

বারবার মনে পড়ছে সেই লম্পট লোকটার মুখ। খেলাটা ভেঙে যাচ্ছে। মধুময় এরকম চায়নি। স্বপ্নার কাছে যখন আসবে, তখন সে অন্য মানুষ থাকতে চায়।

তার গোপন জীবনের কোনও ছাপ যেন না পড়ে।

কিন্তু জামায় এই রক্তের ছিটে!

মধুময় উঠে গিয়ে এক টুকরো ইট দিয়ে বালির ওপর একটা জাহাজ আঁকতে লাগল। প্রায় স্বপ্নার পায়ের কাছে। আঁকার হাত ছিল মধুময়ের, সে শিল্পী হতে-হতে হল না, তার বদলে ছিনতাই দলের সদস্য হয়েছে।

স্বপ্না বলল, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো জাহাজটা।

মধুময় বলল, এক্ষুনি আমরা একটা জাহাজডুবি দেখব।

—স্বপ্না বলল, তার মানে?

—বুঝতে পারলে না—জল বাড়তে-বাড়তে এই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবে।

—জল বাড়ছে নাকি?

—তাকিয়ে থাকো, এবার বুঝতে পারবে।

এবার সত্যিই জল বাড়ার ব্যাপারটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু-একটু করে এগিয়ে এসে নদীর রেখা প্রথমে ছুঁয়ে দিল জাহাজটার একটা প্রান্ত। তারপর এগোতে লাগল একটু-একটু করে। মিনিট দশেকের মধ্যেই ডুবে গেল জাহাজটা। স্বচ্ছ টলটলে জলের নিচে বালির ওপর মধুময়ের আঁকা জাহাজটা পরিষ্কার দেখা যায়।

জল বেড়ে এসে ছলাৎ-ছলাৎ করতে লাগল স্বপ্নার পায়ের কাছে। একটুক্ষণের মধ্যেই তার গোড়ালি পর্যন্ত এসে গেল।

স্বপ্না বলল, কী দারুণ ব্যাপার না? নদীটা কত দূরে ছিল, আর কত কাছে এসে গেল—এ রকম আগে কখনও দেখিনি।

আর এখানে বসা যায় না। জল আরও বাড়বে। এবার স্বপ্নার শাড়ি-টাড়ি ভিজে যাবে। দুপুর ঢলে এসেছে। এবার বাড়ি ফেরার কথাও মনে আসে।

উঠে স্টেশনের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে স্বপ্না বলল, তুমি আমাকে নদী দেখাবে বলেছিলে, দেখালে না তো!

মধুময় অবাক হয়ে স্বপ্নার দিকে তাকাল।

স্বপ্না বলল, এটা তো নদী নয়, নদ। রূপনারায়ণ নদ। বলেই স্বপ্না ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল খিলখিল করে।

মধুময় বলল, ও পুরুষ, তাই বলো। সেই জন্যই তোমার পা জড়িয়ে ধরবার জন্য এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছিল।

স্টেশনে এসে মধুময় আর ভুল করল না। আর সে ভিড়ের কামরায় যেতে পারবে না। স্বপ্নার সঙ্গে এই প্রথম ট্রেনে বেড়ানো। সে টিকিট কাটল ফার্স্ট ক্লাসের।

যথারীতি স্বপ্না অবাক।

—তুমি এত টাকা খরচ করলে শুধু-শুধু?

—একটা আংটি বিক্রি করে দিলাম যে। সেই টাকা রয়েছে।

—আবার আংটি বিক্রি করেছ? কেন? তোমার দরকার হলে আমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারো না?

—আংটি তো আমি পরিই না বলতে গেলে। আর কখনও পরবও না। শুধু-শুধু রেখে লাভ কী?

—তবু জিনিসপত্র বিক্রি করা আমি পছন্দ করি না।

—শোনো স্বপ্না, এমন সুন্দর দিনগুলি আমরা টাকার অভাবে নষ্ট করব? অন্য লোকরা আনন্দ করবে, আর আমরা করব না?

মধুময় আড়চোখে আর একবার তার জামার রক্তের ফোঁটাটার দিকে তাকাল। স্বপ্না দেখতে পায়নি। হলদে জামা, হয়তো স্বপ্না লক্ষ করবে না।

মধুময় মনে-মনে তীব্রভাবে বলল, না, আমি কোনও অন্যায় করিনি। একটা বদমাশ লোক রাস্তা থেকে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে মদের দোকানে কিংবা হোটেলে এক রাত্রে তিন-চারশো টাকা ওড়ায়। আর এক-জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা ট্রেনে নিরিবিলিতে একটু ভ্রমণ করতে পারবে না? কোনটাতে টাকার সবচেয়ে ভালো ব্যবহার হয়?

ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা একদম ফাঁকা। লোকাল ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে সাধারণত জায়গা পাওয়া যায় না। কলেজের ছাত্র, ভিখিরি আর হকাররা এসে খুব গোলমাল করে। কিন্তু এখন এই শেষ বিকেলে তারা কেউ নেই।

চলন্ত ট্রেনের নির্জন কামরায় যেন একটা রোমান্টিকতার গন্ধ মাখানো। মুখোমুখি বসে থাকা। বাইরে চলমান সবুজ মাঠ। সবকিছু বড় মোহময়।

হঠাৎ ঝুঁকে মধুময় তার দু-হাত রাখল স্বপ্নার কাঁধে। ভিখিরির মতন করুণ গলায় বলল, তোমায় একটু আদর করব?

স্বপ্না মধুময়ের হাত দুটো ধরে বলল, তুমি আর আমি এরকম একটা আলাদা জায়গায় বসে আছি—এই তো আমার দারুণ ভালো লাগছে!

—তোমায় একবার চুমু খাই?

—না, প্লীজ।

—একবার। কেউ দেখবে না এখানে।

—না। যখন সময় আসবে।

মধুময় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল স্বপ্নার দিকে। তার বন্ধুরা সবাই বলে, মেয়েরা মুখে কখনও 'হ্যাঁ' বলে না। ইচ্ছে থাকলেও মুখে 'না-না' বলে। একটু জোর করতে হয়। মেয়েরা ওই জোর করাটাই পছন্দ করে।

মধুময় কি স্বপ্নার ওপর জোর করবে? মধুময় নিজের হাত দুটো স্বপ্নার কাঁধ থেকে সরিয়ে নিল। জামায় ওই রক্তের ছিটেটুকু না থাকলে সে নিশ্চয়ই আজ স্বপ্নাকে জোর করে বুকে টেনে নিত। কোনও আপত্তিই শুনত না।

—তুমি রাগ করলে?

—না, রাগ করিনি।

—প্লীজ, রাগ করে আজকের এই সুন্দর দিনটা নষ্ট করে দিও না। আমার এত ভালো লাগছে আজ সব কিছু।

—সত্যিই রাগ করিনি। কিন্তু তুমি যে বললে, যখন সময় আসবে...যদি কোনওদিনই আর সময় না আসে?

—যাঃ, তাই কখনও হয়? আমরা একসঙ্গে থাকব না?

—আমি চাকরি না পেলে তোমায় বিয়ে করতে পারব না। যদি কোনওদিনই চাকরি না পাই?

—নিশ্চয়ই পাবে।

—তিন বছর তো হয়ে গেল...অনেকে শুনেছি আট-দশ বছর বেকার, যদি আমারও সেই অবস্থা হয়?

—আমি ততদিনই অপেক্ষা করে থাকব। এমনকি যদি প্রয়োজন হয় তবে চিরকাল...

—চিরকালের কথা বোলো না। শুনলেই আমার ভয় করে। চিরকাল কি কেউ কারুর জন্য অপেক্ষা করতে পারে?

—তুমি চাকরি না পেলেই বা, আমি তো চাকরি পেতে পারি। একবার তো একটা পেয়েও ছিলাম, নিইনি। আবার যদি চেষ্টা করি, আমি ভালো একটা চাকরি পেলেই তারপর আমরা...

এ কথা সত্যি যে স্বপ্না চেষ্টা করলেই একটা চাকরি পেতে পারে। স্বপ্নার রেজাল্ট ভালো। তা ছাড়া মেয়ে বলেই কিনা কে জানে, সে দরখাস্ত পাঠালেই ইন্টারভিউ-এর ডাক আসে। আর মধুময়ের অধিকাংশ দরখাস্তের কোনও উত্তরই আসে না।

মধুময় বলল, তুমি চাকরি করতে যাবে, আর আমি বাড়িতে বসে থাকব?

—বসে থাকবে কেন—তুমি বাড়িতে বসে ছবি আঁকবে। সেটাই তোমার কাজ।

—আমার ছবি আঁকা তো শখের কাজ। আমি তো শিল্পী নই। তারপর যদি আমাদের ছেলে মেয়ে হয়, তুমি অফিসে যাবে, আর আমি ঘরে থেকে বাচ্চাকে খাওয়াব, ঘুম পাড়াব, স্কুলে দিয়ে আসব—

—যাঃ! এরকম ভাবে বোলো না।

—মধুময় তিক্তভাবে হা-হা করে হেসে উঠল।

শিয়ালদা স্টেশনে পরের কাজটা হল খুব নিখুঁতভাবে। দারুণ ভিড় সেদিন। পরপর কয়েকটা ট্রেন বাতিল হওয়ার ফলে সাঙ্ঘাতিক হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছিল। এইসব দিন মধুময়দের কাজের পক্ষে খুব চমৎকার।

একটা ট্রেন থামার সঙ্গে-সঙ্গে একদল যাত্রী হুড়হুড়িয়ে নেমে আসছে, আর একদল তক্ষুনি সেই ট্রেনে ওঠবার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করেছে—সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে মধুময় একজন বুড়ো লোককে এমন সুকৌশলে ল্যাং মারল যে সেই বুড়ো বুঝতেই পারল না, কে তাকে মেরেছে।

বুড়োটি পড়ে গেল চিৎপাত হয়ে, মাটিতে মাথা ঠুকে অজ্ঞানের মতন হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। রতন আর ধনা চোখের নিমেষে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সরে পড়ল। পরিষ্কার কাজ।

বুড়োটি চোখ মেলে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল।

—আমার ব্যাগ? আমার ব্যাগ কে নিল? ওর মধ্যে যে আমার যথাসর্বস্ব ছিল গো!

এ রকম অনেকেই বলে, মধুময় বিশেষ মনোযোগ দিল না। বিশেষত বুড়ো লোকেরা কান্নাকাটি করে নাটক সৃষ্টি করতে ভালোবাসে। বুড়োটির মুখখানা ঠিক একটা শকুনির মতন। নিশ্চয়ই এক নম্বরের ধড়িবাজ!

—আমার মেয়ের বিয়ের টাকা...আমার শেষ সম্বল...

সবাই মহা ব্যস্ত, তবু বুড়োটির কান্নাকাটি শুনে একটা ভিড় জমে গেল। মধুময় একপাশে সরে দাঁড়াল। কেউ তাকে ল্যাং মারতে দেখেনি।

বুড়োটি উঠে বসে দারুণভাবে মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে বলল, আমি এখন বাড়ি ফিরব কী করে? ওরা আমাকে মেরে ফেলে গেল না কেন? আমার মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে...প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে আজই সাড়ে তিনহাজার টাকা তুলে আনলাম...সামান্য স্কুলমাস্টারি করি...

মধুময় ভুরু কোঁচকাল। এই বুড়োটি তাহলে স্কুলমাস্টার! দেখে কিন্তু মনে হয়েছিল, লোকটি এক নম্বরের ঘুঘু। মানুষ ঠকানোই এর পেশা।

লোকটি এমন ডুকরে কাঁদতে লাগল যে সহানুভূতি না জেগে উপায় নেই।

একজন বলল, ও দাদু, পুলিশে খবর দিন।

আর-একজন বলল, পুলিশে খবর দিলে ঘোড়ার ডিম হবে। এরকম তো হামেশাই হচ্ছে।

মধুময় ভাবতে লাগল, সত্যিই কি এই বুড়ো লোকটির মেয়ের বিয়ের টাকা? অনেকে সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য এরকম মিথ্যে কথা বলে।

কয়েকজন লোক ধরাধরি করে বুড়োটিকে নিয়ে গেল রেলওয়ে পুলিশের কাছে। মধুময়ও কৌতূহলী হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

লোকটি সত্যিই নিজেকে স্কুলমাস্টার বলে পরিচয় দিল। রিটায়ারমেন্টের আর মাত্র এক বছর

বাকি। মেয়ের বিয়ে আর পাঁচদিন বাদে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে আজই তুলে এনেছিল মোট সাড়ে তিনহাজার টাকা।

দুজন যাত্রী সাক্ষী দিল, তারা লোকটিকে চেনে। উনি থাকেন বেলঘরিয়ায়। পড়ান শ্যামবাজারের এক স্কুলে। অতি নিরীহ মাটির মানুষ। পাড়ার সবাই খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। ওঁর মেয়ের জন্য সবাইকে নেমন্তন্ন পর্যন্ত করা হয়ে গেছে।

মধুময় এদিক ওদিক তাকাল। অবশ্য কোনও লাভ নেই। রতন আর ধনা ব্যাগটা নিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

মাত্র সাড়ে তিনহাজার টাকায় বিয়ে হয়? সাড়ে তিনহাজার টাকার জন্য বিয়ে আটকে যাবে?

আজ আর মধুময়ের ট্রেন ধরে দূরে যাওয়ার দরকার নেই। কেউ তাকে দেখেনি। সে এমন স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে। তবু সে ট্রেনে উঠে পড়ল। সেই বুড়ো লোকটার সঙ্গে একই কামরায়।

বুড়ো লোকটি ট্রেনে বসেও কাঁদতে লাগল অনবরত। আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে অন্য লোকেরা শোনাতে লাগল আরও নানারকম চুরি ও রাহাজানির গল্প।

মধুময় একদৃষ্টে চেয়ে রইল বুড়ো লোকটির মুখের দিকে। মুখ দেখে সবসময় মানুষ চেনা যায় না। এই লোকটি যদি অতি বদমায়েশই হবে তাহলে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ইস্কুলে মাস্টারি করে গেল কেন? মানুষ ঠকানোর তো আরও অনেক ভালো-ভালো উপায় আছে। এর আগে যাদের কাছ থেকে ব্যাগ কাড়া হয়েছে, তারাও সবাই কি বদমাশ ছিল তাহলে?

বেলঘরিয়া স্টেশনে নেমে আবার আর একটা কাণ্ড হল। বুড়ো লোকটি হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। কিছুতেই বাড়ি যাবে না। বাড়িতে গিয়ে কী করে সে মুখ দেখাবে।

একদল যুবক উৎসাহী হয়ে বলে উঠল, চলুন দাদু, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। কী আর করবেন বলুন। আপনাকে যে প্রাণে মারেনি এই ঢের। ওরা অনেক সময় ছোরাছুরি চালায়।

—মারল না কেন? ওরা আমাকে মেরে ফেললেই আমি বাঁচতাম! মেয়েটার বিয়ে হবে না, সর্বনাশ হবে।

মধুময়ও ভিড়ে গেল সেই যুবকদের দলে। একটা রিকশায় বুড়ো মানুষটাকে চাপিয়ে ওরা চলল পিছুন-পিছুন।

বাড়ি খুব বেশি দূর নয়। স্টেশন থেকে সাত-আট মিনিটের পথ। বাড়ি মানে খুবই সামান্য ব্যাপার। দু-খানা ঘর, পাকা দেওয়াল হলেও ওপরে টিনের চাল। সামনের জমিতে ট্যাঁড়স আর বেগুন ফলে আছে।

বাড়ির সামনে বৃদ্ধটি আর একপ্রস্থ কান্না শুরু করতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অনেকে। তাদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে মধুময়ের যেন হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। একুশ বাইশ বছরের একটি মেয়ে, সাধারণ তাঁতের শাড়ি পরা, লাজুক ধরনের মুখখানা। খুব সম্ভবত এই মেয়েটিরই বিয়ে—

কিন্তু এই মেয়েটিকেই মধুময় সেদিন চৌরঙ্গিতে দেখেছিল না? সেই লম্পট লোকটির সঙ্গে? মধুময়ের খুব ভালো মনে নেই, কিন্তু এর সঙ্গে খুবই মিল, সেই একইরকম মুখের লাজুক ভাব। যদি এই মেয়েটি না-ও হয়, তবু ঠিক এরই মতন একটি মেয়ে, ভদ্র পরিবারের, কিন্তু টাকার অভাবে ওইসব জায়গায় গিয়ে লম্পট ধনীদের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়।

আর যদি সত্যিই এই মেয়েটি হয়? গ্র্যান্ড হোটেলে ঢুকতে রাজি হচ্ছিল না কিছুতেই। হয়তো মেয়েটি পুরোপুরি পাপের জীবনে যেতে চায়নি। বিয়ে করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছিল।

সাড়ে তিন হাজার টাকার জন্য মেয়েটির বিয়ে হবে না। মেয়েটি আবার বাধ্য হয়ে ওইসব লম্পটদের কাছে যাবে। মধুময়ের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে—ন্যায়-অন্যায় বোধ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সে আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে একটি পরিবারের সর্বনাশের জন্য সে নিজে দায়ি।

তার পকেটে আজ মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা আছে। অবশ্য হুট করে এদের টাকা দিতে গেলেই বা এরা কী ভাববে।

উলটোদিকের ট্রেন ধরে মধুময় ফিরে এল শিয়ালদায়। সেখানে আবার মানুষজন যেমন দৌড়চ্ছিল তেমনিই দৌড়চ্ছে। খানিক আগে যে একজন বৃদ্ধ লোক এখানে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তার কোনও চিহ্নই নেই। একটা বেঞ্চে চারজন পুলিশ বসে নিশ্চিতভাবে সিগারেট টানছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় রতন, ধনারা নেই। মধুময়ের আজ অনেক দেরি হয়েছে। ওরা থাকবেই বা কেন?

পরদিন মধুময় পাগলের মতন খুঁজতে লাগল রতনদের। কোথাও ওদের পাত্তা নেই। সন্ধের দিকে ওদের পাড়ার ফ্যাক্টরির পিছনের জমিতে ওদের আড্ডা বসে, সেদিন ওখানেও কেউ আসেনি। রতনের বাড়িতে তিনবার গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না।

সারারাত ঘুমোতে পারল না মধুময়। পরদিন ভোরবেলা রতনের বাড়িতে গিয়ে তাকে ধরল।

ঘুম চোখে বেরিয়ে এসে রতন চমকে উঠল মধুময়কে দেখে। চোখ দুটো লালচে, উস্কোখুস্কো চুল মধুময়ের। এরকম চেহারায় তাকে দেখা যায় না কখনও।

রতন ফিসফিস করে বলল, কী হল! তুই ধরা পড়েছিলি? তোকে মেরেছে?

মধুময় গম্ভীর গলায় বলল, না।

—সেদিন তুই এলি না দেখে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মাইরি! ভাবলাম, নির্ঘাত তুই ধরা পড়েছিস।

—তবু তোরা আমাকে দেখতে যাসনি।

—কোনও লাভ আছে? সবাই মিলে ধরা দিয়ে লাভ কি বল?

—আমার সঙ্গে একটু আয় রতন, জরুরি কথা আছে।

দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে এসে বসল একটা পার্কে। মধুময়ের ব্যবহার দেখে রতন একটু ঘাবড়ে গেছে। সে পুরোনো পাপী, তাই পুলিশে ধরা পড়ার ভয় তার বেশি। সে মনে-মনে ঠিক করেছিল, কয়েকদিনের জন্য বাড়ি থেকে গা-ঢাকা দেবে। তার অন্য আস্তানা আছে।

মধুময় সরাসরি বলল, পরশু আমরা যে টাকাটা পেয়েছি সেটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে—

রতন আকাশ থেকে পড়ল। টাকা ফেরত দিয়ে আসতে হবে? ছিনতাইয়ের টাকা কেউ ফেরত দেয়? ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মধুময় বলল, আমরা বেছে-বেছে বদমাশ লোকদের টাকা কাড়ব ঠিক করেছিলাম। অন্তত আমি সেইজন্য এসেছিলাম তোদের দলে। যাতে আমার বিবেক পরিষ্কার থাকে। কিন্তু পরশু আমাদের ভুল হয়েছে। লোকটা একজন নিরীহ স্কুল মাস্টার। ওটা ওর মেয়ের বিয়ের টাকা।

এ সব ভাবালুতায় রতনের মন গলে না। সে বলল, হ্যাট! কী সব আগড়ুম-বাগড়ুম বকছিস! টাকা ফেরত দিতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবি!

মধুময় বলল, না, ধরা পড়ব না। আমি লোকটার বাড়ি দেখে এসেছি। লোকটার নাম জেনেছি। বাড়ির নম্বর আর রাস্তার নামও জেনে এসেছি। টাকাটা ওকে মানিঅর্ডার করে পাঠালে এখনও ওর মেয়ের বিয়ে হতে পারে।

—পোস্ট অফিস থেকে টাকা পাঠাবি? পুলিশ ঠিক খোঁজ করে বার করে ফেলবে তোকে।

—সে ঝুঁকি আমি একলা নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি জানি, পুলিশ আমার খোঁজ পাবে না।

—যাব বাবা! এসব কী আজব কথা! কিন্তু টাকাটা তো আমার কাছে নেই।

—তার মানে?

—তুই সেদিন এলি না বলে ভাগ-বাঁটোয়ারা হল না। পুরো টাকাটা আমি ধনার কাছে রেখেছি।

—ঠিক বলছিস? যদি মিথ্যে কথা বলিস রতন, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি এ লাইন আজ থেকে ছেড়ে দিচ্ছি...কিন্তু এ টাকাটা ফেরত না দিলে আমি তোদের সবক'টাকে ধরিয়ে দেব!

—শোন মধুময়, মিথ্যে নিয়েই আমাদের কারবার। পথেঘাটে হাজার রকম মিথ্যে বলি। সেইজন্যই দলের লোকদের কাছে কখনও মিথ্যে কথা বলি না একটাও। ওতে দল টেকে না।

তবু মধুময় পরীক্ষা করার জন্য জিগ্যেস করল, ব্যাগে কত টাকা ছিল।

—সাড়ে তিনহাজার।

—ঠিক আছে, আমি ধনার কাছে এক্ষুনি যাচ্ছি। তুইও চল আমার সঙ্গে।

—আমি যাব না ভাই। তুই যে রকম কথাবার্তা বলছিস, তাতে আমার ভয় লেগে যাচ্ছে। একসঙ্গে তিনজন এখন না জোটাই ভালো। তুই ধনার কাছ থেকে সব টাকাটা নিতে চাস নে, আমি আপত্তি করব না। তারপর সেই টাকা নিয়ে তুই যা-খুশি কর। কিন্তু লোক জানাজানি করিস না।

আর একটু দেরি করলে ধনাকে বাড়িতে পাওয়া যেত না। সে জামাকাপড় পরে বেরুবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

মধুময়কে দেখে সেও বলল, তুই ধরা পড়িসনি তাহলে?

মধুময় বলল, কেন, আমি ধরা পড়লে তোরা খুশি হতিস?

ধনা অবাক হয়ে বলল, যাঃ, কী বলছিস! তুই ধরা পড়লে আমরা খুশি হব কেন? তুই আমাদের নাম বলে দিলে তো আমরাও ফেঁসে যেতাম।

—হয়তো ভেবেছিলি, আমাকে আর ভাগ দিতে হবে না।

—তোর বখরা নিতে এসেছিস বুঝি? কিন্তু তোকে ক'দ্দিন সবুর করতে হবে ভাই।

—কেন?

—আমি টাকাটা সব খরচ করে ফেলেছি।

মধুময় সঙ্গে-সঙ্গে ধনার গলা চেপে ধরে বলল, তোকে আমি খুন করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস?

মধুময়ের তুলনায় ধনার গায়ের জোর অনেক কম। সে মধুময়ের সঙ্গে কিছুতেই পারবে না। অসহায়ভাবে মধুময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, আমাকে মেরে ফেলতে চাস, মেরে ফেলিস। কিন্তু আজ নয়, আজ ছেড়ে দে। আজ আমার ভীষণ দরকার, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

—তার চেয়েও অনেক বেশি দরকারি কাজে আমি এসেছি—পরশুর পুরো টাকাটা আমার চাই। রতনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি, সে রাজি হয়েছে।

—বললাম তো খরচ হয়ে গেছে। তোর ভাগটা আমি পরে শোধ করে দেব।

—তোকে আমি শেষ করে দেব, ধনা!

—আমার কথাটা আগে শোন। আমার গলাটা ছাড়। আমার মা নার্সিংহোমে, আমাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। আমার মা কাল মরতে বসেছিলেন। কাল হঠাৎ মায়ের অ্যাপেনডিক্স বার্স্ট করেছে। তক্ষুনি অপারেশন না করালে বাঁচাবার কোনও আশাই ছিল না। কোনও হাসপাতালে জায়গা পাইনি, তাই নার্সিংহোমে ভরতি করালাম। তিনজন বড় ডাক্তারের ফি, চোদ্দো বোতল রক্ত কিনতে হয়েছে বাইরে থেকে, ডবল দাম দিয়ে...

—আমি তোর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

—তুই যদি আমার সঙ্গে নার্সিংহোমে...আমি কোনওদিন বন্ধুবান্ধবকে বিট্রে করি না...কাছে যদি টাকাটা না থাকত, তাহলে কিছু করার উপায় ছিল না। কিন্তু টাকা রয়েছে আমার কাছে, অথচ আমার মা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন, এটা আমি সহ্য করতে পারি? তুই বল? আমার তিনটে

ছোট-ছোট ভাই-বোন আছে। মা মারা গেলে ওদের নিয়ে আমি একেবারে পথে বসতাম।

মধুময়ের তুলনায় ধনার বাড়ির অবস্থা অনেক খারাপ। মধুময়ের তবু বাবা বেঁচে আছেন এবং চাকরি করেন, ধনার বাবা মারা গেছেন অনেক দিন।

মধুময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু টাকাটা খরচ হয়ে গেল। জানিস, একটা মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল এজন্য, হয়তো তার ভবিষ্যতটাই—

—কার বিয়ে?

মধুময় ঘটনাটা খুলে বলল। ধনারও ভাব হল রতনের মতোই। সে ভাবল, মধুময় বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছে।

সে মধুময়ের হাত চেপে ধরে অভিযোগের সুরে বলল, তুই এই কথা বলছিস? একটা মেয়ের বিয়ে আটকে যাওয়া কি আমার মায়ের মৃত্যুর চেয়ে বড় কথা? আমার মা মরলে তুই খুশি হতিস?

—আঃ! বাজে বকিস না। এরকম কোনও তুলনা চলে না।

—তুই কাল এলে আমি টাকাটা দিয়ে দিতে পারতাম। তারপর আমার মা মরলে মরতেন!

—আমি সে কথা বলিনি।

—মেয়েটির পরে আবার বিয়ে হতে পারে।

—কী করে হবে? ওর বাবার শেষ সম্বল ওই সাড়ে তিনহাজার টাকা।

—আমরা আর চার-পাঁচটা কেস করে কিছু টাকা তুলে ওদের পাঠিয়ে দিতে পারি।

—আমি এ লাইনে আর নেই। আর কোনওদিন যাব না আমি তোদের সঙ্গে।

—দু-দিন একটু মাথা ঠান্ডা করে থাক। আমি নার্সিংহোমে যাচ্ছিরে।

সেদিন সন্ধেবেলা স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। ভালো করে স্নান-টান সেরে কাচা জামাকাপড় পরে বেরিয়ে পড়ল মধুময়। মুখখানা তার শুকনো বিষণ্ণ। সে নিজেই বুঝতে পারছে।

স্বপ্নার সামনে এসে সে হাসি ফোটাল জোর করে। প্রথমে দেখল একটা সিনেমা। তারপর বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে খাবে।

স্বপ্না বলল, আজ আমি খাওয়াব কিন্তু, তুমি পয়সা খরচ করতে পারবে না।

মধুময় একটুও আপত্তি করল না।

ওরা বসল একটা কেবিনে। এখানেও ওরা মুখোমুখি দুজন। কিন্তু ট্রেনের কামরার সঙ্গে কত তফাত। একটু পরদা সরে গেলেই বাইরে থেকে একগাদা লোভী চোখ উঁকি মারে।

স্বপ্না যাতে কিছুতেই বুঝতে না পারে, সেইজন্য মধুময় মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে নানারকম আবোলতাবোল কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু তার দুটো জীবন আর আলাদা নেই।

আজ আর মধুময়ের জামায় রক্তের ছিটে নেই, তবু তার সর্বাঙ্গ অশুচি মনে হচ্ছে। সে স্বপ্নার হাতটাও ধরল না। বারবার মনে পড়ছে বেলঘরিয়ার সেই ছোট্ট বাড়িটার মেয়েটির কথা। সে কত আশা করেছিল কয়েকদিন বাদে তার বিয়ে হবে...আর হবে না। মেয়েটি আবার চৌরঙ্গিতে এসে দাঁড়াবে, সংসার চালাবার দায়ে লোভী ধনীদের শিকারের জন্য। মধুময়ই এজন্য দায়ি। মধুময়ই দায়ি? মেয়েটির বিয়ে হওয়া বড়, না ধনার মায়ের চিকিৎসা? কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়?

ওই মেয়েটি আর তার বাবাকে সাহায্য করার জন্য মধুময় কি আবার ছিনতাই-এর কাজে নামবে? ওদের সাহায্য করার জন্য অন্য লোকদের টাকা কেড়ে নেওয়া কি ঠিক? আবার যদি তাদের মধ্যে কেউ ওই বুড়ো লোকটির মতন...

মধুময় ডাকল, স্বপ্না?

স্বপ্না বলল, কী?

মধুময় বুঝতে পারল, এই প্রশ্ন স্বপ্নার কাছে তুলে কোনও লাভ নেই। স্বপ্না কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই সে হাসিমুখে বলল, না, কিছু না।

তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়েই কেঁপে উঠল। কিছুতেই সামলাতে পারল না নিজেকে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপেও আটকাতে পারল না। মধুময় নিঃশব্দে কেঁদে উঠল। চোখ দিয়ে পড়তে লাগল বড়-বড় জলের ফোঁটা।

স্বপ্না প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে এসে মধুময়ের মুখখানা দু-হাতে তুলে ধরে বলল, এই এই, কী হয়েছে তোমার! কী হয়েছে বলো না। আমাকে বলো—

মধুময় মুখ নিচু করে বলল, কিছু না, কিছু না, এমনিই হঠাৎ বোকার মতন।

স্বপ্না বলল, ভেঙে পোড়ো না, লক্ষ্মীটি। একটা কিছু পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। আর না পেলেই বা চাকরি। আমি তো রয়েছি। লক্ষ্মীটি শোনো—

মধুময় চোখ মুছে ফেলল। সে যে ন্যায়-অন্যায়ের দারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে, সে কথা বলা যাবে না স্বপ্নাকে। কারুকেই বলা যাবে না। এই একটা ব্যাপারে মধুময় দারুণ একা।

রতন একদিন বলল, এবার একটা বড় গোছের কাজে হাত দিতে হবে। তোরা রাজি আছিস?

দলের সবাই সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। শুধু চুপ করে ছিল মধুময়। কথা হচ্ছিল রবারের কারখানার পিছনের মাঠে। মধুময় ভাবছিল এই দলে মেশা সে ছেড়ে দেবে। সে তার বিবেককে মোটেই বশ করতে পারছে না। তবু হঠাৎ সে বলে উঠল, যদি সত্যি খুব বড় কাজ হয়, তা হলে আমি রাজি আছি।

রতন মধুময়ের পিঠ চাপড়ে বলল, এই ছেলেটার হিম্মত আছে। এ একদম ভয় পায় না আমি দেখেছি।

—কী কাজ রতনদা?

—রাস্তাঘাটে লোকদের ল্যাং মারা বড় ছিঁচকে কাজ, ওতে আর আনন্দ নেই। এবার একটা বড় কাজ করলেই কয়েকমাস ফুর্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কাজটা হচ্ছে লোকাল ট্রেনে ডাকাতি। ট্রেনের কোনও একটা কামরায় উঠে দুটো খেলনা পিস্তল আর দুটো ছুরি নিয়ে ভয় দেখালেই বাঙালিরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন তাদের পকেটের মানিব্যাগ আর হাতঘড়ি-টড়িগুলো খুলে নিতে বেশি সময় লাগে না। খুব সহজ কাজ। খবরের কাগজে এরকম প্রায়ই বেরোয়। কেউ ধরা পড়ে না।

রতনের সাকরেদ ধনা বলল, শুধু খেলনা পিস্তল কেন ওস্তাদ? আর কিছু থাকবে না?

মধুময় বলল, রতনদা, আমার একটা কন্ডিশন আছে, সেটা আগে থেকেই বলে রাখা দরকার।

কী?

এই কাজটা করার পর আমি তোমাদেরও একেবারে ছেড়ে দেব। আমার সঙ্গে তোমরা কেউ সারাদিন আর যোগাযোগ করতে পারবে না। আর, এই কাজে যতই টাকা উঠুক, আমাকে অন্তত সাড়ে তিনহাজার টাকা দিতেই হবে।

ধনা বলল, তুই বুঝি এখনও সেই বুড়ো লোকটাকে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ভাবছিস? তুই পাগল নাকি রে?

মধুময় উত্তর দিল, সব মানুষেরই কিছু-কিছু পাগলামি থাকে। ধরে নে, এটাই আমার পাগলামি।

রতন বলল, ঠিক আছে। মেনে নিলাম। তোকে আমি দেব ও টাকা।

ধনা 'হুররে' বলে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি একটা পাইপগান জোগাড় করতে পারব।

রতন বলল, তাহলে তো আরও ভালো। দু-খানা বড় ছুরি আমার নিজের কাছে আছে। মধুটার বেশ ষণ্ডা চেহারা আছে, তুই মধু একখানা ছুরি নিয়ে কামরার দরজার কাছে দাঁড়াবি।

মধুময় আপত্তি তুলল। সে বললে, কিন্তু রতনদা, এ তো নিরীহ লোকদের ওপরে ডাকাতি

করা হবে। খারাপ লোকদের শাস্তি দেওয়া তো হবে না। ট্রেনের কামরায় তো আমাদের মতন লোকই থাকে।

ধনা বলল, ফার্স্ট ক্লাস না সেকেন্ড ক্লাস?

রতন বলল, ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকে কোনও লাভ নেই। ফার্স্ট ক্লাসে আজকাল বেশিরভাগ লোকই পাসে যায় কিংবা বিনা টিকিটে। এ ছাড়া মাঝে-মাঝে দু-একজন মিলিটারি অফিসার থাকে, তাদের কাছে রিভলভার থাকতে পারে।

কথা থামিয়ে রতন মধুময়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, এ ছেলেটা ঠিকই বলেছে। নিরীহ লোকদের ওপর আমরা হামলা করব না। তবে, তোকে একটা কথা বলছি মধু, তুই কাগজে দেখেছিস, ট্রেনের কামরায় এ রকম ডাকাতি হলেই কোনও একটা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পাঁচ, সাত কি দশহাজার টাকা খোওয়া যায়। লোকাল ট্রেনে একটা লোক এত টাকা নিয়ে যাতায়াত করে কেন? নিশ্চয়ই ব্ল্যাক মানি। গভর্নমেন্ট নিয়ম করেছে ব্যবসার বড়-বড় লেনদেন সব চেকে করতে হবে। তবু যারা পকেটে নোটের তাড়া নিয়ে ঘোরে, তাদের মতলব খারাপ নয়? তুই কী বলিস?

মধুময় বলল, তা ঠিক।

—আমরা খবর রাখব...ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরাঘুরি করে কিছু লোককে ওয়াচ করব।

সাঁতরাগাছির দিকটা রতনের খুব চেনা। ওখানকার লাইনে পালানোর সব ঘোঁতঘাঁত সে জানে। কাজ হাসিল করার পর এক জায়গায় চেন টেনে ওরা ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে পালাবে।

আগে তিনবার ওরা সাঁতরাগাছির লোকাল ট্রেনে ঘুরে এল। কোনওরকম অসুবিধে নেই। চাল-স্মাগলাররা যখন তখন চেন টানে এ লাইনে। ট্রেনও দিব্যি ভালো ছেলের মতন থেমে যায়। আর্মড গার্ড-ফার্ড কিছু নেই। এদিকে কয়েকটা কোল্ড স্টোরেজ আছে। ব্যাগ ভরতি তাড়া-তাড়া নোট নিয়ে এ লাইনে প্রায়ই ব্যবসায়ীরা ঘোরাফেরা করে।

দিন ঠিক হল মে মাসের তিন তারিখ। দুপুর একটা চল্লিশের ট্রেন। ওই সময় বেশির ভাগ লোকই ঝিমোয়। আর কামরায় গোলমাল হলেও পাশের কামরার লোকেরা শুনতে পাবে না।

দলে থাকবে পাঁচজন। রতন, ধনা, কল্যাণ, বিশু আর মধুময়।

দুজন ব্যবসায়ীকে শেওড়াফুলিতে সকাল থেকে ফলো করবে রতন আর কল্যাণ। টাকা পয়সার খবর ঠিকঠাক থাকলে তবেই কাজ শুরু হবে।

সবই ঠিকঠাক মিলে গিয়েছিল। একটা বড় কামরায় আলাদাভাবে ছড়িয়ে খুব নিরীহভাবে বসে ছিল ওরা। যেন কেউ কাউকে চেনে না। সকলের হাতে একটা করে কাগজ কিংবা বই, যেন যে যার পড়াশুনো নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে।

তারপর এক সময় দুটো স্টেশনের মাঝখানে হঠাৎ হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওরা পাঁচজন। রতনের গলাটাই সবচেয়ে বাঁজখাই, সে হুংকার দিয়ে উঠল, খবর্দার, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। মধুময়ের হাতে ঝলমল করে উঠল একটা মস্ত বড় ভোজালি। সে দাঁড়াল দরজা আটকে।

কথা ছিল সাধারণের ঘড়ি মানিব্যাগ নেওয়া হবে না। কিন্তু কিছু যাত্রী ভয় পেয়ে নিজের থেকে তাদের ঘড়ি আর মানিব্যাগ ছুড়ে দিতে লাগল ওদের পায়ের কাছে। একজন ভদ্রমহিলা হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে নিজের হাতের চুড়ি খুলতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আমার ছেলেকে কিছু বোলো না। আমার একমাত্র ছেলে—

ধনাটা লোভীর মতন কুড়িয়ে নিতে লাগল সেই সব ঘড়ি মানিব্যাগ আর চুড়ি। রতন আর কল্যাণ দুজন যাত্রীর হাতব্যাগ ধরে টানাটানি করছে। এই সময় একটা যাত্রী হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চেন টেনে দিল। আর চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে।

বিশু তার বুকের কাছে খেলনা পিস্তল ঠেকিয়ে ধমকাতে লাগল, খবরদার! একদম চুপ! মেরে ফেলব একেবারে!

ট্রেন থেমে এল আস্তে-আস্তে। দুটো বাচ্চা ছেলে মধুময়ের বগলের ফাঁক দিয়ে গলে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

মধুময় তাদের আটকাতে পারল না। সে ভেবেছিল, অত বড় ভোজালিটা দেখেই সবাই ভয় পাবে। কিন্তু কেউ ভয় না পেলে তার গায়ে ভোজালির কোপ বসাবার কথা মধুময় চিন্তাও করেনি। ছেলে দুটো মধুময়কে ভয় পেল না কেন? তার মুখ দেখেই ওরা বুঝে গিয়েছিল যে সে কারুকে মারতে পারবে না? সে একজন শৌখিন ডাকাত?

রতন আর কল্যাণ তখনও ব্যাগ দুটো ছিনিয়ে নিতে পারেনি বলে মধুময় বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত।

এদিকে বাচ্চা দুটো মাটিতে নেমে চিৎকার করতে লাগল, ডাকাত! ডাকাত! মেরে ফেলল সবাইকে—মেরে ফেলল—!

রতন হুকুম দিল, রিট্রিট!

পাশের কামরাগুলো থেকে যাত্রীরা বেরুবার আগেই ওরা দৌড়াল মাঠের মধ্যে দিয়ে। কিছু যাত্রী খানিকটা পথ তাড়া করে এল বটে কিন্তু ওদের কেউ ছুঁতে পারল না।

প্রায় তিন মাইল দূরে একটা বাঁশঝাড়ের পাশে ওরা একটু বিশ্রাম নিতে বসল। তখন দেখা গেল ওদের মধ্যে একজন কম। পাঁচজনের মধ্যে চারজন এসেছে। বিশু নেই। বিশু কি তাহলে অন্য দিকে পালিয়ে গেল?

ধনা বলল, বিশেটাকে আমি কিন্তু মাইরি ট্রেন থেকে নামতে দেখিনি।

রতন তার কলার চেপে ধরে বলল, শালা, সে কথা তুই আগে বলিসনি কেন?

ধনা বলল, বললেই বা কি হত? তুই কি তাহলে ফিরে যেতিস তাকে আনতে?

বেচারা বিশু, খেলনার পিস্তল নিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

রতন বলল, এখানে বসে থাকলে আরও ডেঞ্জার আছে। এক্ষুনি সার্চ পার্টি আসতে পারে। চারজন চারদিকে ছড়িয়ে পড়। নিজের বাড়িতে ফিরে যাসনি এখন। বিশুটা প্যাঁদানি খেয়ে নির্ঘাৎ সবার নাম বলে দেবে।

মধুময়ের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, বাড়ি ফিরব না? তাহলে আমি যাব কোথায়?

রতন জিগ্যেস করল, তোর কি অন্য কোথাও লুকোবার জায়গা নেই?

মধুময়ের চকিতে মনে পড়ে গেল স্বপ্নার কথা। নিজেদের বাড়িতে না ফিরে সে স্বপ্নার কাছে গিয়ে বলতে পারে, আমি ট্রেন ডাকাতি করে এসেছি। আমাকে তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো।

সে ঘাড় নেড়ে বলল, না, নেই।

—এই খেয়েছে! তাহলে কি হবে? বাড়ি ফিরলেই তো ধরা পড়ে যাবি। ঠিক আছে, তুই আয় আমার সঙ্গে।

তক্ষুনি উঠে ওরা ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন দিকে। মধুময়ের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। এর আগে সে কখনও রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকেনি। ব্যাপারটার গুরুত্বও যেন সে বুঝতে পারেনি আগে। ধরা পড়ার মানেই তো জানাজানি হয়ে যাওয়া। স্বপ্না জেনে যাবে যে সে ট্রেনে ডাকাতি করতে গিয়েছিল।

সে রতনকে জিগ্যেস করল, কত দিন আমরা বাড়ির বাইরে থাকব? বাড়ির লোকই তো পুলিশে খবর দেবে।

রতন বলল, দু-তিনদিন ঘাপটি মেরে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘাবড়াসনি।

রতনের সঙ্গে মধুময় বড় রাস্তায় এসে বাস ধরল। আধঘণ্টা বাদে সেই বাস থেকে নেমে আবার ধরল উলটো দিকের একটা বাস। এই রকমভাবে, প্রায় পাঁচবার গাড়ি বদল করে সন্ধ্যা নাগাদ তারা এসে পৌঁছল হাওড়ায়।

ব্রিজ পেরিয়ে ওরা কিন্তু কলকাতায় এল না। একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া শহরের মধ্যেই অনেক গলি ঘুরে-ঘুরে থামল এসে একটা বাড়ির সামনে।

একটা খুব পুরোনো আমলের দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার পর রতন চেঁচিয়ে ডাকল, মুক্তো। ও মুক্তো—

তিরিশ-বত্রিশ বছরের একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে রতনকে বলল, কী ব্যাপার?

রতন একগাল হেসে বলল, তোমার এখানে থাকব আজ, সঙ্গে এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।

মুক্তো নামে সেই স্ত্রীলোকটি বলল, থাকবে কি গো। বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে এসে থাকব বললেই কি হয়? আমার ঘরে আজ লোক আছে।

মধুময় এসব কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না। এটা কি একটা হোটেল?

রতন বলল, তোমার ঘর আটকা? তাহলে ছাদে সেই যে ছোট একটা ঘর ছিল?

—সেখানে থাকবে? কেন বাপু? মুখ দিয়ে এখনও দুধের গন্ধ যায়নি, বাড়ি যাও না। মা বাবা চিন্তা করবে না?

—আঃ, বাজে কথা ছাড়, থাকতে দেবে কিনা বলো না?

মুক্তো ঘরের ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটা চাবি নিয়ে এল। সেটা রতনের হাতে দিয়ে বলল, যাও ঘর খুলে বসোগে। আমি যাব অখন এক সময়।

সিঁড়ি দিয়ে রতন আর মধুময় উঠে এল ছাদে। একটা লম্বাটে ছোট্ট ঘর। চাবি খোলার পর দেখা গেল, সে ঘরের মেঝেতে একটা তেলচিটে মাদুর পাতা আছে শুধু, আর কিছু নেই।

মধুময় জিগ্যেস করল, এটা কার বাড়ি রতনদা? ওই মেয়েটি তোমার আত্মীয়?

রতন বলল, সব আস্তে-আস্তে টের পাবি। এখন মুখ বুঁজে থাক, বেশি কথা জিগ্যেস করিস না। তুই বাড়িতে না ফিরলে তোর বাড়ির লোক চিন্তা করবে?

তা তো করবেই। আমি অবশ্য বলে এসেছি, তারকেশ্বরে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি...আজ রাত্তিরে না ফিরলে ভাববে হয়তো সেখানে আটকে গেছি, কিন্তু কাল সকালে—

—এখানে চার-পাঁচদিন ঘাপটি মেরে থাকা দরকার...সব ব্যাপারটা কেঁচে গেল।

—চার-পাঁচদিন।

—এ লাইনে এলে একটু ঝুঁকি নিতেই হয়।

—রতনদা, তুমি আগে বলোনি।

—আগে কী বলব? তুই কি কচি খোকা? কিছু বুঝিস না?

মধুময় সত্যিই তো কচি খোকা নয়। তার তো জানা উচিত ছিল যে, আগুনে হাত দিলে একবার-না-একবার হাত পুড়ে যেতেই পারে। মধুময় নিজের ডান হাতের পাঞ্জার দিকে তাকাল, সত্যিই যেন সেখান থেকে পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে।

রতন তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, আরে এখনই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে হাতব্যাগটা ছিনিয়ে আনতে না পারলেও কোনও এক ফাঁকে রতন ছ'গাছি সোনার চুড়ি, তিনটি ম্যানিব্যাগ আর তিনটে হাতঘড়ি ঠিক হাতিয়ে আনতে পেরেছে।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রতন মানিব্যাগগুলো খুলে চাদরের ওপর ঝাড়তে লাগল। সব মিলিয়ে তিনশো বারো টাকা আছে। একটা মানিব্যাগের মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি। সেই ছবিটার দিকে তাকাতেই লজ্জা করল মধুময়ের।

রতন ছবিটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলল, আর যা কাগজপত্র ছিল সবই ছিঁড়ে ফেলে লুকিয়ে রাখল মাদুরের তলায়। ব্যাগগুলো নিয়ে সে কী করবে ভেবে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

ছাদের কোণে একটা গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলে অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে

রতন ব্যাগ তিনটেকে গেঁথে রাখল জলের তলার মাটিতে। তারপর নিশ্চিন্ত মুখ করে ফিরে এল ঘরে।

একটা ঘড়ি সে নিজের হাতে পরে অন্য আর একটা ঘড়ি মধুময়কে দিয়ে বলল, পরে নে।

মধুময় ঘড়িটা ফেরত দিয়ে বলল, আমার দরকার নেই। তুমিই রাখো।

রতন বলল, আমি এতগুলো ঘড়ি নিয়ে কী করব? একটা রাখ তোর কাছে।

ঘড়িটা সে ছুড়ে দিল মধুময়ের কোলের ওপর।

বাকি ঘড়িটা আর সোনার চুড়িগুলো সে নিজের পকেটে রাখল।

টাকাগুলো থেকে গুনে-গুনে সে একশো টাকা তুলে নিয়ে মধুময়ের হাতে দিয়ে বলল, এই টাকাগুলো তোর পকেটে রাখ। আজ দুপুরের ব্যাপারটা নিয়ে তুই মুক্তোকে কিছু বলবি না। যা বলার আমি বলব, তোকে আমি সাজাব একটা কয়লাখনির মালিকের ছেলে। আমি ওকে বলব—

রতনের তুলনায় মধুময় বেশি পড়াশুনো করেছে, সে খবরও রাখে অনেক বেশি। সে বলল, কয়লাখনির আবার এখন কোনও মালিক আছে নাকি? সব খনি তো গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়েছে।

রতন তাতে একটুও থতমত খেল না, সে অবহেলার সঙ্গে বলল, তোর ওসব ফ্যাকড়া তুলতে হবে না। মুক্তো ওসব কিছু বোঝে না। আমি বলব, তোকে নিয়ে আমরা এখানে ফুর্তি করতে এসেছি। দেখিস, মুক্তো এই কথা শুনেই বলবে, ফুর্তি করতে এসেছ! এ লাইনে নতুন দেখছি। এই বলেই তোর থুতনিতে হাত দিয়ে একটু আদর করবে। তুই তখন ওই পুরো একশো টাকা তুলে দিবি মুক্তোর হাতে। ছ্যাঁচড়ামি করে দু-একটা দশ টাকার নোট লুকিয়ে রাখিস না যেন, পুরোটাই দিবি, তাহলে দেখবি খুব খাতির করবে।

মধুময়ের শরীরে একটা শিহরণ লাগল। মুক্তোর জীবিকা কি, এখন তা বুঝতে আর কোনও অসুবিধে নেই। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে, কোনওদিন এরকম কোনও বাড়িতে এসে সে রাত কাটাবে।

জায়গাটা রতনের বেশ পরিচিত দেখা যাচ্ছে। সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগল, হরিয়া, এ হরিয়া!

একটু পরে একজন বেশ জোয়ান শক্ত-সমর্থ চেহারার বুড়ো লোক উঠে এল ছাদে।

রতন তাকে প্রথমে দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, রুটি আর তড়কা এনে দাও তো হরিয়া। তারপর আরও একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, মুরগির মাংসও আনবে। আবার দুটো দশ টাকার নোট দিয়ে বলল, আর তিন-চার বোতল বীয়ার!

লোকটি চলে যেতেই রতন উপুড় হয়ে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল, আর একটু বাদেই তার নাক ডাকতে লাগল।

মধুময় বসে রইল গুম হয়ে। একদিনের মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেল যে সে খানিকটা দিশাহারা বোধ করছিল। সে কিন্তু ঠিক ভয়ও পায়নি। বরং এইসব নিষিদ্ধ ব্যাপারে খানিকটা রোমাঞ্চই অনুভব করছিল মনে-মনে। তিন-চারদিন বাড়ি না ফিরলে বাড়িতে কী ধরনের হইচই হবে, কে জানে। সে যাই হোক, ফিরে গিয়ে মধুময় কোনওরকমে সব ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। শুধু যেন স্বপ্নার কানে কোনও কথা না যায়।

কিন্তু সেই সাড়ে তিনহাজার টাকা জোগাড় করা হল না। এ যাত্রা যদি মধুময় বেঁচেও যায়, আর এরপর এই লাইন একেবারে যদি ছেড়েও দেয়, তবু সারাজীবন তার মনের মধ্যে একটা গ্লানি থেকে যাবে। রাত্তির বেলার দিকে চৌরঙ্গিতে আবছা অন্ধকারে কোনও ধনী লম্পটের পাশাপাশি কোনও ভীরু লাজুক চেহারার বাঙালি মেয়েকে দেখলেই তার মনে হবে, সেই মেয়েটির দুর্ভাগ্যের জন্য মধুময়ই দায়ি।

হরিয়া খাবার নিয়ে এল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। দুটো ভাঁড়ে মাংস আর তড়কা, ঠোঙার

মধ্যে রুটি আর পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কা, আর চার বোতল বীয়ার।

রতন প্রথমেই হরিয়াকে দুটো রুটি আর খানিকটা তড়কা আর মাংস তুলে দিয়ে বলল, এই নাও, খাও।

হরিয়া বলল, এ বাবু, হামাকে থোড়াসা বিয়ার পীলান!

—যাও, তোমার গেলাস নিয়ে এসো। আর, আমাদের জন্যেও দুটো গেলাস এনো।

রতন নিজে থেকে শুরু করে দিল সঙ্গে-সঙ্গে। মধুময় ঠিক শুরু করতে পারছে না। হাতটাত ধোওয়া হয়নি। সারা গা ঘামে চিটচিট করছে। ভালো করে জল দিয়ে মুখহাত না ধুতে পারলে তার খেতে রুচি হচ্ছে না।

রতন বলল, পেট ভরে খেয়ে নে মধু।

মধুময় অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল রতনের দিকে।

রতন বলল, দেখছিস কি, পেট খালি রাখলেই নানারকম দুশ্চিন্তা আসে। দু-চারদিন আমরা এখানে খাব-দাব ঘুমোব, তারপর দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

মধুময়েরও খুব খিদে পেয়েছিল। আর দেরি না করে সেও একটা রুটি তুলে নিয়ে মাংসের ঝোলে ডোবাল।

হরিয়া তিনটে গেলাস নিয়ে এসেছে। সে দরজার বাইরে বসে নিজের গেলাস থেকে চুকচুক করে বীয়ার খাচ্ছে।

কী—সব বীয়ার শেষ করে ফেললে? দরজা ফাঁক করে দাঁড়াল মুক্তো।

রতন বলল, না না, তোমার জন্যও রেখেছি। এই হরিয়া, আর একটা গেলাস।

মুক্তো বলল, গেলাস লাগবে না। বলে একটা বোতল তুলে নিয়ে ঢকঢক করে ঢালল গলায়। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে বলল, আঃ! আজ বড্ড খাটুনি গেছে।

মধুময় কিছুতেই বিস্ময় লুকোতে পারছে না মুক্তোকে দেখে। তার চোখ দুটি বিস্ফারিত। জীবনে এটা তার একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

মুক্তো পরে আছে শুধু একটা কালো শায়া আর একটা সাদা ব্রেসিয়ার। তার স্বাস্থ্য বেশ ভরাট, ব্রেসিয়ার উপছে বেরিয়ে আছে দুই স্তন। এইরকম পোশাকে কোনও মেয়ে যে পুরুষের সামনে আসতে পারে, সিনেমায় নয়, বাস্তব জীবনে, এরকম ধারণাই ছিল না মধুময়ের। এ জন্য বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই মুক্তোর, এমনকি হরিয়ার মতন একজন ভৃত্য শ্রেণির লোক যে বসে আছে, তা-ও গ্রাহ্য করছে না।

—আজ আবার এ কাকে নিয়ে এসেছ? মুক্তো প্রশ্ন করল রতনকে।

রতন বলল, এ আমার এক বন্ধু, একটা কয়লাখনির মালিকের ছেলে...

মুক্তো খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসির সঙ্গে-সঙ্গে তার স্তন দুটি কাঁপতে থাকে।

—নতুন যে আসে, সে-ই তো শুনি কয়লার খনির মালিকের ছেলে! দেশে কত কয়লার খনি আছে গা?

মধুময় ততক্ষণে পকেট থেকে সেই একশোটা টাকা বার করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে মুক্তোর দিকে।

—বাপের পকেট মারা হয়েছে বুঝি? আসতে-না-আসতেই টাকা দিচ্ছ যে—

মধুময় এরপর আর কি কথা বলবে বুঝতে পারল না। সে মুক্তোর দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতেও লজ্জা পাচ্ছে। সে চোখ নামিয়ে নিল।

সে মন দিয়ে দেখতে লাগল নিজের ডান হাতের পাঞ্জাটা। তার হাতের রং আগে তো এরকম ছিল না, ঠিক পোড়াটে কালো রং। সে স্পষ্ট অনুভব করছে চামড়া-পোড়া গন্ধ।

মুক্তো বসে পড়ল ওদের গা-ঘেঁষে। শায়াটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে সে ধরল, যা গরম, এ ঘরে

তোমরা দুজনে থাকবে কি করে? এই হরিয়া, এখানে বসে-বসে বীয়ার গিলছিস, লজ্জা করে না? যা, আমার দোতলার ঘরটা সাফ করে দে তাড়াতাড়ি। এমন একটা টেঁটিয়া লোক এসেছিল কিছুতেই যেতে চায় না, তার ওপর আবার বমি করে ঘর ভাসিয়েছে!

হরিয়া চলে যেতেই মুক্তো মধুময়কে জিজ্ঞাসা করল তোমার নাম কি ভাই?

মধুময় রতনের দিকে তাকাল। এখানে সত্যি নাম বলতে হয় না বানিয়ে বলতে হয়, তা সে জানে না।

মধুময়ের দ্বিধা দেখে মুক্তো বলল, ঠিক আছে, তোমার নাম বলতে হবে না, আমিই তোমার নাম দিয়ে দিচ্ছি। তোমার নাম দিলাম আমি নাড়ুগোপাল।

বলেই সে হাসতে-হাসতে ঢলে পড়ল মধুময়ের বুকে। দু-হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, কি—আমাকে পছন্দ নয়?

মধুময়ের এইটুকু জীবনে কোনও নারী তার এত ঘনিষ্ঠ হয়নি। কারও স্তনের স্পর্শ লাগেনি তার বুকে। কেউ তার গলা জড়িয়ে ধরেনি এমনভাবে।

স্বপ্না ছাড়া আর কোনও মেয়ের সঙ্গে মেশেনি সে। স্বপ্নার সঙ্গে এরকম শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা কল্পনাই করা যায় না।

উত্তেজনায় তার চোখের কোণ, চিবুক ও কানের লতিতে যেন জ্বালা করতে লাগল। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

—কি—তোমার বন্ধুটি বোবা নাকি গো?

রতন বলল, প্রথম দিন এসেছে তো, তাই লজ্জা পাচ্ছে।

রতন মুক্তোর কোমরে হাত দিয়ে আকর্ষণ করল নিজের দিকে। এবার মুক্তো মধুময়কে ছেড়ে অবলীলাক্রমে মাথা রাখল রতনের বুকে। তারপর বলল, একটা সিগারেট দাও না মাইরি!

রতন মুক্তোর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিতেই সে বলল, ধরিয়ে দাও।

এক হাতে সিগারেট আর এক হাতে বীয়ারের বোতল নিয়ে সে রতনের বুকে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। বীয়ার ও সিগারেট দুটোই শেষ করার পর সে উঠে বসল আবার। ব্যস্ত হয়ে বলল, অনেক রাত হয়ে গেল। তোমরা তো দিব্যি খেয়ে নিয়েছ। আমায় খেতে হবে না? খিদে পেয়েছে।

নিজের বুকের ওপর থেকে রতনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে মুক্তো বলল, তোমরা সারারাত থাকবে তো? নিচে আমার ঘরে তোমাদের মধ্যে একজন চলো, আর একজন এখানেই ঘুমাও। একটা বালিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর মধুময়ের দিকে চেয়ে বলল, এই নাড়ুগোপাল তো আজ নতুন এসেছে, ও-ই আমার সঙ্গে চলুক আজ।

রতন বলল, কেন, আমরা তিনজনেই তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকি না?

মুক্তো বলল, উঁহু। ওসব চলবে না। বললুম না, আজ বড্ড খাটুনি গেছে, আজ আর ওসব পারব না।

রতন বলল, আমি চুপচাপ পাশে শুয়ে থাকব।

—তোমাকে আমি চিনি না! তুমি মহা ফেরেব্বাজ!

মুক্তো উঠে দাঁড়িয়ে মধুময়ের হাত ধরে বলল, এসো নাড়ুগোপাল চলো।

রতন বলল, ঠিক আছে, ও-ই যাক, আমরা কয়েকদিন থাকছি এখানে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মধুময় একব্যার অসহায়ভাবে তাকাল রতনের দিকে।

রতন হাসতে-হাসতে বলল, দেখিস, সাবধান! মুক্তো যেন তোকে কাঁচাই খেয়ে না ফেলে! ও কিন্তু তা পারে।

মুক্তো বলল, মারব ঝাঁটা!

ঠিক একটা বাচ্চা ছেলের মতন মধুময়ের হাত ধরে টানতে-টানতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মুক্তো। মধুময় সম্পূর্ণ নির্বাক।

দোতলায় ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। একটা আলমারি, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা বড় খাট। ড্রেসিং টেবিলের কাচটা বাজে, মুখ লম্বা দেখায়।

মুক্তো মধুময়কে খাট দেখিয়ে বলল, একটু বসো, আমি আসছি।

মধুময় আড়ষ্টভাবে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ঘরখানা। দেয়ালে পুরোনো ক্যালেন্ডারের অনেকগুলো ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা। সবই শিব-দুর্গা-কালী—এইসব ঠাকুর দেবতার ছবি। ঘরে কি রকম যেন একটা আঁশটে গন্ধ, দুটো জানলা, দুটোই বন্ধ।

মুক্তো ফিরে এল একটু বাদেই। তারপর খাটের তলা থেকে টেনে বার করল কয়েকটা বাটি আর ডেকচি। সেগুলোর ঢাকনা খুলতেই দেখা গেল তাতে হয়েছে ভাত, ডাল, তরকারি আর মাছ।

মাটিতে বসে পড়ে মুক্তো বলল, ও নাড়ুগোপাল, একটু খাবে কিছু?

মধুময় বলল, না, আমি খেয়েছি। আপনি খান।

মুক্তো একগাল হেসে বলল, ও বাবা, আপনি, আজ্ঞে! শোনো বাবু, এখানে ওসব চলে না। আমাকে তুমি বলো। অনেকে তো তুই-তোকারি করে। খাবে না আমার সঙ্গে? আমার হাতের ছোঁয়া বুঝি খেতে নেই? তোমরা আর-সব পারো, শুধু হাতের ছোঁয়া খেলেই তোমাদের জাত যায়!

—না, সেজন্য নয়। আমি সকলের ছোঁয়া খাই। কিন্তু একটু আগেই তো অনেক খেলাম।

—তাও একটু খেয়ে দেখো, আমি কেমন রেঁধেছি। আমি বাপু নিজে রাঁধি, দোকানের কেনা জিনিস পারতপক্ষে খাই না।

ডাল, আলু-সজনেডাঁটার তরকারি আর পার্শে মাছ। ঠিক মধুময়দের বাড়ির রান্নার মতন। ঠিম মাসি-পিসিদের মতনই মুক্তো জোর করে তাকে বলতে লাগল, আর একটু ভাত নাও। আর একটা মাছ দেব?

মুক্তো মধুময়ের চেয়ে অন্তত দশ-বারো বছরের বড়।

খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দাতেই বালতিতে রাখা জলে ওরা হাত ধুয়ে নিল।

মুক্তো জিগ্যেস করল, তুমি ওইসব পরেই শোবে নাকি? একটা শাড়ি দেব—লুঙ্গির মতন করে জড়িয়ে নেবে?

মধুময় বলল, না-না, তার দরকার নেই।

মধুময় পরে আছে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। সে জীবনে কখনও লুঙ্গি পরেনি। একটি অচেনা মেয়ের শাড়ি পরে সে শোবে। এই ধারণাটাই তার কাছে অদ্ভুত লাগে। এতক্ষণ বাদে মধুময় ভয় পাচ্ছে। যেন এবার একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটতে যাবে।

এতক্ষণ তার অনুভূতি যেন সম্পূর্ণ অসাড় হয়েছিল। এখন সে হঠাৎ উপলব্ধি করল যে তাকে নিচে আনা হয়েছে এই মুক্তো নামের মেয়েটির সঙ্গে এক ঘরে শোবার জন্য। তা কি সম্ভব? এই স্ত্রীলোকটিকে সে কয়েকঘণ্টা আগেও চিনত না।

মুক্তো একটু হাই তুলতে গিয়েও চেপে গেল। তারপর খানিকটা জোর করে হাসি টেনে বলল, এখন গল্প করবে, না শোবে?

মধুময় বলতে চাইল, আমি ওপরে চলে যাই। আমি রতনের পাশে শুয়ে থাকতে পারব। গরমে আমার কষ্ট হবে না। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না।

—তুমি পান খাও?

—না।

—আমিও খাব না। একটা সিগারেট দাও বরং।

—আমার কাছে তো সিগারেট নেই। ওপর থেকে নিয়ে আসব?

—না, থাক। আর আনতে হবে না। এবার তাহলে আলো নিভিয়ে দিই?

মধুময় হঠাৎ আড়ষ্ট গলায় বলে উঠল, আমি বাইরে শোব।

মুক্তো ভুরু দুটো তুলে জিগ্যেস করল, বাইরে শোবে? কেন?

মধুময় বলল, বাইরে শুতেই আমার ভালো লাগবে। বারান্দায় তো অনেক জায়গা আছে।

মুক্তো বলল, বারান্দায় শোবে? তাহলে মাঝরাত্তিরে কী হবে জানো? তোমায় ভূতে ধরবে। বলেই হি-হি করে খুব জোরে হেসে উঠল মুক্তো।

মধুময় তবুও দৃঢ়ভাবে বলল, না, আমি বাইরেই শোব, আমার কিছু হবে না।

মুক্তো হাসি থামিয়ে বলল, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? রাতদুপুরে তোমায় বারান্দায় দেখলে এ বাড়ির চাকররা ভাববে আমি তোমায় ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তখন তারা তোমায় চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়ো।

মধুময় অসহায়ভাবে, প্রায় মিনতির সুরে বলল, তাহলে আমি ঘরের মধ্যেই মাটিতে শুচ্ছি। আমার বিছানা লাগবে না।

মুক্তো এবার মধুময়ের মাথাটা দু-হাতে জড়িয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কেন গো নাড়ুগোপাল? আমায় ভয় পাচ্ছ? আমি কি সত্যি তোমায় খেয়ে ফেলব নাকি? আলো নিভিয়ে দিচ্ছি, আর দেরি করতে পারছি না।

কিন্তু আলো নেভাবার আগেই মুক্তো তার শায়া আর ব্রেসিয়ার খুলে ফেলল চট করে। মধুময় চোখ বুজে ফেলল। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে।

সে আগে অনেক মেয়ের ছবি এঁকেছে। এমনকি নগ্ন মেয়েদের ছবিও এঁকেছে কয়েকখানা। কিন্তু কখনও বাস্তবে দেখেনি। বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলো দেখে নকল করেছে সে। সেইগুলো আঁকবার সময়ই তার শরীর ঝিমঝিম করত। বাথরুমে ছুটে গেছে অনেকবার। এখন চোখের সামনে একটি বাস্তব গোটা নগ্ন রমণী দেখে সে যেন ঠিক সহ্য করতে পারল না। ঘরের মধ্যে বড্ড চড়া আলো। এই আলোটা ঠিক নয়। একটা হালকা নীল আলো জ্বালা থাকলে সে মুক্তোর ছবি আঁকতে পারত

মুক্তো আলনা থেকে একটা ছাপা শাড়ি টেনে জড়িয়ে নিল গায়ে। তারপর টুপ করে আলো নিভিয়ে খাটে উঠে এসে মধুময়কে জড়িয়ে ধরে বলল, আমার নাড়ুগোপাল, সত্যিই নাড়ুগোপাল।

মধুময় শুয়ে রইল কাঠ হয়ে। তার শরীর দাউদাউ করে জ্বলছে। কিন্তু মুক্তোর শরীরটা খুব ঠান্ডা। সে যেন স্নেহের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে আছে মধুময়কে। এই অবস্থাতেও মধুময় মনে-মনে ঠিক যেন জপ করার ভঙ্গিতে বলল, স্বপ্না, আমি কি পাপ করছি? তুমি আমাকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করবে না? আমি এতটা বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস করো, আমি বুঝতে পারিনি।

মধুময় খুব সন্তর্পণে নিজেকে মুক্তোর আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিল।

মুক্তো বলল, তোমার কিছু ইচ্ছে করছে না বুঝি? তাহলে বাপু আজ লক্ষ্মীর ছেলের মতন ঘুমিয়ে পড়ো। আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে। যা খাটুনি গেছে সারাদিন।

একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তো।

মধুময়ের চোখ খরখরে। যেন তার সারারাত ঘুম আসবে না কিছুতেই। শুয়ে-শুয়ে সে আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। রতনদের সঙ্গে মিশে সে কিছু-কিছু নিষিদ্ধ কাজ ও কথাবার্তায় বেশ আনন্দই পেত। কারণ, তাদের বাড়ির আবহাওয়া বড় মার্জিত। মধুময় বাড়ির বাইরে এসে একটা অন্যরকম স্বাদ পেয়েছিল এই প্রথম। ছোটখাটো বেআইনি কাজেও সে কোনও অন্যায় দেখেনি। কারণ এতদিন বেকার থেকে সে বুঝেছিল, এই সমাজ বেকার তৈরি করে কিন্তু বেকারদের সম্পর্কে কোনও দায়িত্ব নেয় না। যে-কোনও উপায়েই হোক, এই সমাজকে একটা আঘাত দেওয়া দরকার। বাড়ির কড়া শাসনে মধুময় কখনও কোনও রাজনৈতিক দলে ভিড়তে পারেনি। সেইজন্য ও ব্যাপারে

তার কোনও স্পষ্ট ধারনাও নেই।

রতনের দুর্দান্তপনা ও দুঃসাহস তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু রতনের এদিকের জীবনটা কথা সে কোনওদিন ঘুণাক্ষরেও জানেনি। এ জীবনে সে আসতে চায়নি কখনও। রতনদের তো স্বপ্না নেই, তার আছে।

মধুময় একবার ভাবল, চুপি চুপি উঠে পড়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যায়। এদিককার রাস্তা সে চেনে না, ঘুরতে-ঘুরতে কোনওরকমে বাড়ি পৌঁছতে পারবেই। তারপর সে আর রতনদের সঙ্গে মিশবে না। এই কয়েক মাসের ঘটনা সে তার জীবন থেকে মুছে ফেলবে।

কিন্তু বাড়িতে যদি পুলিশ আসে? পুলিশের নামেই মধুময়ের বুক কেঁপে ওঠে। পুলিশ তাকে মারবে কিংবা জেল খাটাবে, এজন্য সে ভয় পায় না। কিন্তু পুলিশে ধরা পড়া মানেই সবকিছু জানাজানি হয়ে যাওয়া। তাদের দলের একজন ধরা পড়ে গেছে, সে হয়তো অন্যদের নাম বলে দেবে। পুলিশ অমনি ঠিকানা পেয়ে যাবে মধুময়ের। এ ব্যাপারে রতনের অভিজ্ঞতা বেশি। রতনের কথা শুনেই চলা উচিত এখন। ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করতে গেলে মধুময় হয়তো আরও বেশি বিপদে পড়বে।

গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একদিন মধুময় স্বপ্নাকে নিয়ে অন্ধকার ময়দানে বসে ছিল। অন্ধকারে বসার কারণ আর কিছুই নয়, শুধু একটু নিরিবিলি পাওয়া। সেখানে বসে-বসে গল্প, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। স্বপ্নার সঙ্গে গল্প করার জন্য কখনও কোনও বিষয়ের কথা চিন্তা করতে হয় না। হঠাৎ সামনে একটি পুলিশ এসে উপস্থিত।

সেই পুলিশটি বিশ্রী গলায় বলেছিল, এখানে বসে অসভ্যতা করা হচ্ছে, অ্যাঁ?

পুলিশ তো আর স্বপ্নাকে চেনে না, সেজন্যই ওরকম কথা বলতে পেরেছিল। স্বপ্নার সঙ্গে অসভ্যতা? মধুময়ের হাজার ইচ্ছে থাকলেও স্বপ্না একবারও তাকে জড়িয়ে ধরতে দেয়নি পর্যন্ত।

পুলিশ দেখে মধুময় সেদিনও বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নার মনের মধ্যে তো কোনও অন্যায় বোধ নেই, তাই সে পুলিশকে গ্রাহ্য করেনি। সে বলেছিল, আজেবাজে কথা বলছেন কেন? মাঠের মধ্যে বসা কি অপরাধ?

পুলিশটি বলেছিল, সে কথা থানায় গিয়ে বড়বাবুকেই জিগ্যেস করবেন। এখন চলুন থানায়।

স্বপ্না সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঠিক আছে, চলুন।

মাঠ পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসবার পর পুলিশটিই বলেছিল, আজ ছেড়ে দিলাম, বাড়ি যান। আর ওরকম করবেন না।

স্বপ্না বলেছিল, ছেড়ে দিলাম মানে? আমরা থানাতেই যেতে চাই। আমরা আপনার বড়বাবুকেই জিগ্যেস করব, মাঠে বসা অপরাধ কি না।

তখন পুলিশটিই পালিয়ে গিয়েছিল। সে নিশ্চয়ই আশা করেছিল ওদের কাছ থেকে কিছু ঘুষ পাবে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল থানায় যাওয়ার নাম শুনলেই ওরা ভয় পেয়ে তার কাছে কাকুতিমিনতি করবে।

কিন্তু এখন তো মধুময় পুলিশ দেখলে জোর দিয়ে বলতে পারবে না, চলুন থানায়, আমি কোনও অন্যায় করিনি।

মুক্তোর মতন একটা বেশ্যার পাশে শুয়ে-শুয়ে মধুময় স্বপ্নার কথা ভাবছে? ছি, ছি, এতে তো স্বপ্নাকেই অপমান করা হয়।

অবশ্য মুক্তো মেয়েটি এ পর্যন্ত তার সঙ্গে কোনওরকম খারাপ ব্যবহার করেনি। তবু মধুময় ওর স্পর্শ বাঁচিয়ে আরও খানিকটা দূরে সরে গেল।

বহুক্ষণ পর্যন্ত জেগেই রইল মধুময়। শেষ রাত্রের তন্দ্রায় সে-ই একটা স্বপ্ন দেখল। মধুময় বাড়ি ফিরে গেছে, খুব হাসছে। মা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, তুই লুকিয়ে-লুকিয়ে এম. এ. পরীক্ষা

দিলি কবে? আমরা কিছু জানতে পারিনি! একেবারে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিস! এবার তো তোর চাকরির জন্য চিন্তাই করতে হবে না। গভর্নমেন্ট তোকে ডেকে-ডেকে চাকরি দেবে।

পরদিন ঘুম ভেঙেই ধড়ফড় করে উঠে বসল মধুময়। তার সত্যিই ধারণা ছিল, সে তার বাড়ি ফিরে গেছে। কিন্তু না, এটা মুক্তোর ঘর। মুক্তো উঠে গেছে বিছানা থেকে। চুল আঁচড়াচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, এরই মধ্যে স্নান হয়ে গেছে তার।

একটু পরেই নিচে নেমে এল রতন। পিছন থেকে মুক্তোকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাল কেমন জমেছিল? অ্যাঁ? নাড়ুগোপালকে ঠিক মতন হাতেখড়ি দিয়েছ তো?

মুক্তো এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে রুদ্ধ গলায় বলেছিল, দিলে তো ছুঁয়ে? আবার আমায় চান করতে হবে। জান না, সকালবেলা পুজো না করে আমি কোনও পুরুষমানুষ ছুঁই না।

রতন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, মাফ চাইছি ভাই। একটু চা তো খাওয়াবে অন্তত। না কি সেও পাব পুজোর পরে?

তারপর সবেমাত্র চা খেতে বসেছে ওরা তিনজনে, এমন সময় পুলিশ এল।

পুলিশ ওদের মারধোর করেনি। রতনের পকেটে যা জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তাই-ই যথেষ্ট। ওদের এনে পুরে দেওয়া হল লালবাজার লক-আপে।

পরদিন কাগজে বড়-বড় করে ছাপা হল, পাঁচজন কুখ্যাত ডাকাতের গ্রেপ্তার কাহিনি। এই দলটি নাকি ইতিমধ্যে সাতবার ট্রেন ডাকাতি করেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, এবার ধরা পড়েছে পুলিশের তৎপরতায়।

মধুময়ের বাবা খবর পেয়ে পুলিশকে বলেছিলেন, তাঁর ছেলে এ কাজ করেছে, এটা হতেই পারে না। পৃথিবী উলটে গেলেও তিনি এ কথা বিশ্বাস করবেন না।

পুলিশ তাঁকে নিয়ে এল আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। বাবা মধুময়ের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। একটাও কথা বললেন না। একটু পরে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। পুলিশকে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিই যে এ ছেলের জন্ম দিয়েছি, তা অস্বীকার করতে পারি না।

বাবা নাকি তারপর বাড়ি ফিরে বলেছিলেন, ও ছেলের যা শাস্তি হয় হোক, আমি ওকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই। আমি ওকে ছাড়াবার কোনও চেষ্টাই করব না।

কিন্তু মা কান্নাকাটি করতে লাগলেন। মধুময়ের এক মামা বেশ বড় উকিল। তিনি এলেন সাহায্য করবার জন্য।

মধুময় জামিন পেল না। কিছুদিন বাদে লালবাজার থেকে সরিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।

মামলা চলল এগারো মাস। একই মামলার পাঁচজন আসামি হলেও মধুময়ের বড়মামা লড়তে লাগলেন শুধু একা মধুময়ের হয়ে। তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে ওই দিন সাঁতরাগাছির কাছে ডাকাতির সময়ে মধুময় ওই ট্রেনে থাকতেই পারে না, কারণ সে তখন একটি মারোয়াড়ি কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। সেই অনুযায়ী তিনি এগারোজন সাক্ষী হাজির করালেন। প্রত্যেকেই বলল, সেদিন তারা মধুময়কে ইন্টারভিউ দিতে দেখেছে। মধুময়ের নামে একটা ছাপানো ইন্টারভিউয়ের চিঠিও দাখিল করা হল কোর্টে।

বড়মামা তীব্র ভাষায় বললেন, বাকি যে আরও ছ'টা ডাকাতির অভিযোগ এদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি ডাকাতির সময় মধুময় কলকাতাতেই ছিল না, সে পাটনায়, হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করত তার অকাট্য প্রমাণ আছে। পুলিশ আসল অপরাধীদের ধরতে পারে না, শুধু নিরীহ ছেলেদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়।

পুলিশ-পক্ষ থেকে সাক্ষী ডাকা হয়েছিল মুক্তোকে।

মুক্তো বলেছিল, কে জানে বাপু, আমার ঘরে প্রতিদিনই দু-তিনজন করে লোক আসে, সকলকে চিনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একে আমি আগে দেখেছি কি না মনে করতে পারছি না।

মধুময়ের তখন একমুখ দাড়ি।

পুলিশ থেকে নানারকম ভয় দেখানো হয়েছিল, তবু মুক্তো কিছুতেই মচকায়নি। শেষ পর্যন্ত বেশি জেরার উত্তরে সে দৃঢ়স্বরে বলেছিল, না, আমি একে চিনি না, একে কোনওদিন দেখিনি।

মধুময়ের দাড়ি কামানো আগেকার ছবি দেখানো হল, মুক্তো তখন হাসতে-হাসতে বলেছিল, এইটুকু ছেলে? আমার ঘরে? আমার যে এর ডবল বয়েস, হি-হি-হি-হি।

বিচারক ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন তাকে।

জেলে থাকার সময় উৎকট রকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল মধুময়। কথা বলত না কারুর সঙ্গে। এমনকি রতন, প্রসাদের সঙ্গেও সে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিল, সর্বক্ষণ সে ভুরু কুঁচকে চিন্তা করত। সে যাচাই করে দেখত তার জীবনের ভুলগুলো।

প্রায় এগারো মাস বাদে, যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে গেল মধুময়।

প্রথম দিকে বাবা মধুময়ের আর মুখই দেখতে চাননি, কিন্তু তিনিই জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন মধুময়কে। তিনিই সস্নেহে বলেছিলেন, যা হয়ে গেছে, ওসব আর মনে রাখিস না। সব ভুলে যা।

তার মা ও বোনেরা মধুময়ের প্রতি অতিরিক্ত খাতির দেখাতে লাগল। কেউ এমন একটা কথাও বলল না, যাতে করে মধুময় দুঃখ পেতে পারে। বরং সকলে তাকে সহানুভূতি দেখাতে লাগল এই বলে যে, এতদিন জেলখানায় থেকে কষ্ট পেয়ে মধুময়ের শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েকদিন মধুময় বাড়ি থেকে বেরুতে পারেনি লজ্জায়। মা বলেছিলেন, তুই কেন লজ্জা পাবি মধু? তোর কি শাস্তি হয়েছে? কোর্ট থেকে তোকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। পুলিশ যা-তা একটা বদনাম দিয়ে লোককে ধরে নিয়ে গেলেই কি লোকে তা বিশ্বাস করবে?

আইনের চোখে মধুময় নিরপরাধ ঠিকই। তার কোনও শাস্তি হয়নি। সে এই কথাটা বুক ফুলিয়ে বলতে পারে। কিন্তু তার বাড়ির সব লোক জানে, মধুময় সত্যিই ট্রেন ডাকাতি করতে গিয়েছিল। সে ধরা পড়েছিল একটি কুখ্যাত বেশ্যাপল্লীর মধ্যে, সকালবেলা, একটি মেয়ের ঘরে। সে ছাড়া পেয়েছে, শুধু তার বড়মামার ওকালতি বুদ্ধির জোরে। স্বপ্নাও জানে।

মধুময় জেল থেকে বেরুবার পর প্রায় একমাস যায়নি স্বপ্নার সঙ্গে দেখা করতে। তার মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, স্বপ্না নিজে থেকেই বোধহয় একবার আসবে। প্রায় একবছর দেখা হয়নি স্বপ্নার সঙ্গে, ওর কি মন কেমন করে না?

স্বপ্না আসেনি, চিঠিও লেখেনি।

তারপর মধুময় নিজেই একদিন বেরিয়ে পড়েছিল। তাকে তো নতুনভাবে জীবন শুরু করতে হবে। দিনের-পর-দিন বাড়িতে বসে থাকলে তো আর চলবে না।

বড়মামা একটা ভালো বুদ্ধি দিয়েছিল বাবাকে। মধুময়কে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হোক বোম্বাইতে। সেখানে আছেন মেজোমামা। তিনি চেষ্টা করলে মধুময়ের জন্য একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবেন। যতদিন চাকরি না জোটে, ততদিন বোম্বাইতে থাকলেও মধুময়ের অনেকটা উপকার হবে। এখানে সে লজ্জায় লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারবে না হয়তো। কিন্তু বোম্বাইতে তো সেরকম কোনও অসুবিধে নেই।

মা মধুময়কে জিগ্যেস করেছিলেন, তুই বোম্বাইতে যাবি?

মধুময় বলেছিল, ভেবে দেখি।

নতুনভাবে জীবন শুরু করার আগে স্বপ্নার ব্যাপারটা ঠিকঠাক করা দরকার। জেলে বসে

মধুময় অনেক চিন্তা করে দেখেছে, স্বপ্নাকে বাদ দিয়ে সে জীবন কাটাতে পারবে না। স্বপ্না আঘাত পায়, এমন কোনও কাজ করা উচিত নয় তার পক্ষে।

স্বপ্না কি তাকে ক্ষমা করবে না? একবার সে ভুলের পথে গিয়েছিল, এখন সে ফিরে আসতে চাইলে স্বপ্না কি মেনে নিতে পারবে না তাকে?

পরপর দু-দিন গিয়ে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হয়নি। দু-দিনই স্বপ্নার দাদার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল মধুময়। স্বপ্নার দাদা আগে তার সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই কথা বলত, কিন্তু এখন গম্ভীর। অর্থাৎ এ-ও সব জানে।

স্বপ্নার দাদা বলেছিল, স্বপ্না তো বাড়িতে নেই—

তখনই মধুময়ের সন্দেহ হয়েছিল যে স্বপ্নার দাদা মিথ্যে কথা বলছে। স্বপ্না বাড়িতে থাকলেও মধুময়ের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না।

কিন্তু মধুময়কে তো দেখা করতেই হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে দেখা হলও। প্রথমবার স্বপ্না ঠিক মুখের ওপর খারাপ ব্যবহার করতে পারেনি। বলেছিল, তোমার চেহারাটা অন্যরকম হয়ে গেছে। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে চিনতেই পারতাম না!

মধুময় নিজেই প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেনি। এতদিন পর স্বপ্নাকে দেখা মাত্র তার কান্না এসে গিয়েছিল। সে আবার টের পেয়েছিল, স্বপ্না তার ভুবনের কতখানি জুড়ে আছে। এ যেন শুধু প্রেম-ভালোবাসা নয়, স্বপ্নার কাছে গচ্ছিত আছে তার আত্মার একটা টুকরো। এ কথা মধুময় ভুলে গিয়েছিল।

মধুময়কে এড়াবার জন্য স্বপ্না বলেছিল, তুমি আজই এলে? আমায় যে এক্ষুনি বেরুতে হবে—

প্লেন কিংবা ট্রেন ধরার ব্যাপার থাকলে দেরি করা যায় না। এ ছাড়া আর কোন কারণে এক্ষুনি বেরুতে হবে স্বপ্নাকে? কোনও সিনেমা থিয়েটারে যাওয়ার কথা থাকলে স্বপ্না কি তা সেদিনকার মতন বাতিল করতে পারে না? এমনকি, জরুরি কারুর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলেও মধুময়ের জন্য স্বপ্না কি থেকে যেতে পারে না?

—তুমি কোথায় যাবে?

—আমার একটা দরকার আছে।

স্বপ্না এর বেশি আর কিছু বলতে চায়নি।

মধুময়ও জিগ্যেস করেনি। কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া তার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই বলেছিল, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে?

—কোন চিঠি?

—জেল থেকে আমি তোমাকে লিখেছিলাম।

—না তো?

জেলখানা থেকে চিঠি অনেক সময় সেন্সর করে থাকে। কিন্তু মধুময়ের চিঠিতে তো সেরকম কিছু ছিল না। সবই ব্যক্তিগত কথা।

একটা নয়, তিনখানা চিঠি লিখেছিল মধুময়। শুধু স্বপ্নাকেই। নিজের বাড়িতে সে কোনও চিঠি লেখেনি। সে চিঠি স্বপ্না পায়নি! স্বপ্না তো সহজে মিথ্যে কথা বলে না। তাহলে কি স্বপ্নার বাড়ির লোকেরা সে চিঠি পেয়ে স্বপ্নাকে দেয়নি। জেলখানা থেকে পাঠানো চিঠি দেখলেই বোঝা যায়।

সেই তিনখানা চিঠিতেই মধুময় লিখেছিল, আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই। একবার ভুল করলে কি মানুষ ফিরতে পারে না?

সেদিন স্বপ্না বেশিক্ষণ থাকেনি, কিন্তু মধুময়কে বলেছিল, তুমি আর-একদিন এসো। আর-

একদিন—বলেনি যে কালই এসো। তবু মধুময় পরদিনই গিয়েছিল আবার। স্বপ্না সেদিন সত্যিই বাড়ি ছিল না।

স্বপ্না কী করে জানবে যে মধুময় তার পরদিনই আসবে।

আজ স্বপ্না স্পষ্ট মুখের ওপর বলে দিল, তুমি আর এসো না!

স্বপ্না তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে চাইছে। দশ-বারো বছরের সম্পর্ক, মধুময় তখনও হাফ প্যান্ট ছাড়েনি। স্বপ্না তখনও ফ্রক পরে, সেই সময় ওরা পরস্পর বন্ধু থাকার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল।

দেশপ্রিয় পার্কের রেলিং-এ হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মধুময়। সে এখন কোনদিকে যাবে? তার সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে।

সে আবার অসামাজিক জীবনে ফিরে যেতে পারে। আগের বারের ভুল থেকে সে শিক্ষা নেবে। দ্বিতীয়বার ট্রেনে ডাকাতি করতে গেলে আর ভুল হবে না। না হয়, ধরা পড়ে দু-এক বছর জেল খাটবে। তবু ওই জীবনে রোমাঞ্চ আছে। ওই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মুক্তোর মতন মেয়েরা।

অথবা সে যেতে পারে নতুন একটা সুন্দর জীবনের দিকে। বোম্বাইতে গিয়ে চাকরি। নতুন ফ্ল্যাটে। কিছু টাকা জমিয়ে বিয়ে। অথবা বিয়ে না করে ব্যাচেলরের সুখী জীবন। বন্ধুবান্ধব, আড্ডা, জুয়াখেলা, মদ।

স্বপ্নাকে ছাড়া আর কোনও মেয়েকে বিয়ে করা কি তার পক্ষে সম্ভব? কিংবা বিয়ে করা বা না করারও প্রশ্ন নয়। স্বপ্না তাকে বাদ দিয়েও জীবন কাটাবার কথা চিন্তা করতে পারে। কিন্তু মধুময়ের পক্ষে তা কি সম্ভব? স্বপ্না জানে না যে তার কাছে গচ্ছিত আছে মধুময়ের আত্মার খানিকটা অংশ।

এখন সবকিছুই নির্ভর করছে স্বপ্নার ওপরে।

রাত্তিরে খেতে বসার সময় বাবা রোজই জিগ্যেস করেন, খোকন কোথায়? বাড়ি ফিরেছে?

মা বলেন, হ্যাঁ, ও তো আজকাল সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকে না। খুব পড়াশুনো করে দেখি সবসময়। পড়াশুনোয় আবার মন বসেছে মনে হচ্ছে।

বাবা জিগ্যেস করেন, খেয়েছে না খায়নি। না খেয়ে থাকলে আমার সঙ্গেই ওর খাবার দিয়ে দাও না।

ওর খাওয়া হয়ে গেছে কখন।

এক-একদিন মধুময় সত্যিই বাড়ি ফেরে সন্ধের পর। একটা বই খুলে শুয়ে থাকে বিছানায়। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে তার ঘরে।

কিন্তু বইয়ের পাতা বেশি ওলটানো হয় না। খানিকটা পড়তে-না-পড়তেই মধুময় নিজের চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়।

মা একদিন সকালবেলা বললেন, তোর বাবা বলছিলেন—

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে মধুময় জিগ্যেস করল, কী?

—তুই এই সোমবার বোম্বে যাবি? তোর জন্য টিকিট কাটবে?

—কেন, এই সোমবারই কেন?

—ওঁর এক বন্ধু ফাইজার কোম্পানির মিস্টার মিত্র...উনি যাচ্ছেন সোমবার...তা হলে ওঁর সঙ্গেই যেতে পারিস।

আবার চোখ নামিয়ে মধুময় বলল, কেন, আমি কি শিশু? ওর সঙ্গে যেতে হবে কেন? আমি একা যেতে পারি না?

—তা পারবি না কেন। তবু একজন চেনা লোক সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়...

—না।

—তুই বোম্বেতে যাবি না?

—আর যেদিনই যাই, এই সোমবার যাব না। যেদিন যাব একাই যাব।

পরদিন সকালে মা আবার বললেন, আগের দিনের চেয়েও নরম গলায়, তোর বাবা জিগ্যেস করছিলেন...

আবার চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে মধুময় বলল, কী?

—তুই এই সোমবার যদি না যেতে চাস, কবে যাবি, একটা দিন ঠিক কর। শুধু-শুধু দেরি করে লাভ কি?

—এখন দিন ঠিক করার একটু মুশকিল আছে। অন্তত মাস দু-এক আমাকে এখানেই থাকতে হবে।

—কেন! মাস দু-এক তুই এখানে কি করবি?

মধুময় মায়ের চোখের দিকে সোজা চেয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় বলল, মা, এই জীবনটা আমার। এটাকে কীভাবে খরচ করব, সেটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। আমি যদি বখে যেতে চাই, গুন্ডা-বদমাইশ হয়ে যেতে চাই, তোমরা আমাকে আটকাতে পারবে? আমি একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করছি, আমার অন্তত দু-মাস সময় চাই। সেই দু-মাস সময় দিতে যদি তোমরা রাজি না থাকো, তাহলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও রাজি আছি।

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, ও মা, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা আবার কোথা থেকে আসছে? তোর কি আমাদের ওপর কোনও টান নেই।

মধুময় বলল, মা, আমার বয়েসি অনেক ছেলেই চাকরি-বাকরি, পড়াশুনো বা অন্য অনেক কারণে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় থাকে। তা বলে তাদের টান থাকে না বাবা-মা সম্পর্কে? আমি বেকার বলেই কি আমাকে বাধ্য হয়ে থাকতে হবে এ বাড়িতে?

মা হঠাৎ চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

মধুময়ের যেন আবেগ, অনুভূতি কিছুই নেই। আগে এ রকম ছিল না, আগে মায়ের কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারত না সে। ছেলেবেলা থেকে যখন যতই অবাধ্যপনা করুক, মাকে একবার কাঁদতে দেখলেই সেও কাঁদতে শুরু করত। মায়ের গায়ে হাত বুলিয়ে বলত, তুমি কেঁদো না মা। তুমি যা বলবে, আমি সব শুনব। কেঁদো না...

এখন মধুময় টেবিলের ওপাশে বসে থেকে চুপ করে দেখতে লাগল মায়ের কান্না। তার মধ্যেই সে শেষ করে ফেলল তার চা, টোস্ট।

মধুময় টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে-যেতে বলল, তুমি শুধু-শুধু কাঁদছ মা। বোম্বেতে যাব না, সে কথা আমি একবারও বলিনি। আমি শুধু দু-মাস সময় চেয়েছি।

দু-দিন পর মধুময় নিজেই একটা কথা বলে দারুণভাবে চমকে দিল মাকে।

—মা, আমার অন্নপ্রাশনের সময়ে আমি সাতটা আংটি আর কয়েকটা রূপোর থালা গেলাস পেয়েছিলাম না?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলি তো—

—সেগুলো সব আছে তোমার কাছে?

—হ্যাঁ, থাকবে না কেন—

—চোদ্দো বছর বয়সে আমার যখন পৈতে হয় তখন আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই টাকা দিয়েছিল।

—হ্যাঁ, প্রায় সাতশো টাকা, সে টাকা তোর নামে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া আছে।

—সেই টাকাগুলো আমার চাই, আর ওই সোনার আংটিগুলো আর রূপোর থালা গেলাসও আমি বিক্রি করতে চাই।

মা বিস্ময়ে কোনও কথা বলতে পারলেন না।

মধুময় বলল, ওই টাকাগুলো আর ওই জিনিসগুলো যদি আমার বলেই ভেবে থাকো তোমরা, তাহলে ওগুলো ইচ্ছে মতন ব্যবহার করার অধিকার আমার থাকবে না? আমার পঁচিশ বছর বয়েস, এখনও যদি আমার জিনিস আমি ইচ্ছে মতন ব্যবহার করতে না পারি, তা হলে আর কবে করব? অথবা বলে দাও, ওগুলো আমার নয়, আমি চাইব না।

—কিন্তু ওগুলো বিক্রি করবি কেন?

—বোম্বে যাওয়ার ভাড়াটা আমি ওর থেকে সরিয়ে রাখব। বাকি টাকা আমার হাতখরচ লাগবে।

—হাতখরচ...আমার কাছে চাইলে কি আমি দিই না?

—আমি আর চাইব না। এই দু-মাস অন্তত, আমি বাড়ি থেকে এক পয়সা নেব না, আবার চুরি ডাকাতিও করতে যাব না।

—ফের ওইসব কথা উচ্চারণ করছিস, খোকা?

—মা, চুরি-ডাকাতি অনেকেই করে। কোটিপতি ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মন্দিরের পুরুতরা পর্যন্ত। সে যাই-ই হোক, তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না মা। আমার জন্য আর তোমাদের কখনও লজ্জা পেতে হবে না।

মা বললেন, খোকা, তোর কথা শুনলে আমার আজকাল ভয় করে। তুই এত বদলে গেলি কেন রে?

ভাবলেশহীন গম্ভীর গলায় মধুময় বলল, তোমার কোনও ভয় নেই। কিংবা তুমি যদি ভয় পেতে চাও, তাহলে তো প্রত্যেকদিনই ভয় পাওয়ার মতন কিছু না কিছু ঘটছে পৃথিবীতে।

এই ঘটনার পর আবার মধুময় অনিয়মিত সময়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। কখনও-কখনও অনেক রাত হয়ে যায়। মা সে কথা লুকিয়ে রাখে বাবার কাছে, মধুময় বাড়ি না ফিরলেও তিনি তার ঘরের আলো জ্বেলে রাখেন।

স্বপ্না তার দুজন বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল ডায়মন্ডহারবারে। ওর এক বান্ধবীর পিসতুতো দাদা ওখানকার এস.ডি.ও.। আগে থেকে খবর দিয়ে যায়নি, তাই এস. ডি. ও. সাহেব তখন ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন। সেই বান্ধবীটির নাম এষা। সে বলেছিল, আমার দাদার লঞ্চে করে তোদের কাকদ্বীপ পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

কিন্তু এবার দাদাও নেই, লঞ্চও নেই। এষার বউদি অবশ্য ওদের খুব যত্ন-টত্ন করলেন, কিন্তু ওরা তিনজনেই গঙ্গার ওপরে লঞ্চে চড়ে বেড়াবে এই আশা করেছিল খুব।

একটা উপায় অবশ্য আছে। ডায়মন্ডহারবার থেকে ফেরি লঞ্চ যায় ওদিকের কুঁকড়োহাটি পর্যন্ত। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে, সেই ফেরিতে করে বেড়িয়ে আসা যায়।

অগত্যা ওরা তিনটি মেয়ে ফেরিরই টিকিট কেটে চড়ে বসল। এষার বউদি অবশ্য অনেক বারণ করেছিলেন, ওরা শুনল না। সঙ্গে পুরুষমানুষ নেই বলে কি ওরা বেড়াতে পারবে না?

শীতের মনোরম বিকেল, গঙ্গার ওপর চমৎকার বাতাস। খুবই ভালো লাগবার কথা, কিন্তু স্বপ্না একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এষা আর বাসবী কিন্তু খুশিতে ঝলমল করছে। ওরা জিগ্যেস করল, কি রে স্বপ্না, তোর হঠাৎ মুখ ভার হয়ে গেল কেন?

স্বপ্না ফ্যাকাশেভাবে হেসে বলল, কই, না তো।

এদিক থেকে হলদিয়ায় প্রচুর লোক যাতায়াত করে বলে লঞ্চে বেশ ভিড়। ওরা বসবার জায়গা পায়নি, দাঁড়িয়ে ছিল রেলিং-এ ভর দিয়ে। তিনটি সুন্দরী যুবতী—ওদের দিকে অন্যদের দৃষ্টি পড়বেই। কয়েকটি যুবক বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ল। তারা ভিড় ঠেলেঠুলে এসে দাঁড়াল ওদের পাশে।

স্বপ্না জলের দিকে চেয়ে আছে। লঞ্চের ঘটঘট শব্দ, জলের ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়েও সেই

ছেলেদের কথা তার কানে আসে। এরা সেই বঞ্চিত যুবকের দল, যারা কোনও মেয়েকে বান্ধবী হিসেবে পায়নি বলে যেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই অন্য মেয়েদের দেখলে অপমান করার চেষ্টা করে। ওরা বুঝে গেছে, স্বপ্নাদের সঙ্গে কোনও পুরুষ দেহরক্ষী নেই। তাই ওরা অশ্লীল কথার বন্যা বইয়ে দিতে লাগল। বিশেষত ওদের মধ্যে চশমা পরা লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারার একটি ছেলে এত সব কুৎসিত কথা বলতে লাগল যে, সেসব কথা কখনও যে মুখে উচ্চারণ করতে পারে, স্বপ্না তা কল্পনাও করেনি।

স্বপ্না কোনও খারাপ কথা সহ্য করতে পারে না, তার গায়ে যেন বিষাক্ত তীর ফুটতে লাগল। এষা আর বাসবী দু-একবার তাকাল কটমট করে ছেলেগুলোর দিকে। তাতে যেন আরও বেড়ে গেল তাদের উৎসাহ।

ওরা দাঁড়িয়ে ছিল লঞ্চের ছাদে। স্বপ্না বলল, চল, নিচে যাই। নিচের যাওয়ার একটু পরেই সেখানেও হাজির হল ছেলেগুলো। আবার সেখানেও শুরু হল কুৎসিত কথার ফোয়ারা। অন্য কেউ ওদের বাধাও দিচ্ছে না। একসঙ্গে চার-পাঁচটি ছেলে যে-কোনও অসভ্যতা করলেও অন্য কেউ বাধা দেওয়ার সাহস পায় না।

খেয়া লঞ্চের যাত্রী নানারকম হয়। কেউ কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। অনেকে লঞ্চে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকজন বিস্মিতভাবে যুবকদের দিকে চেয়ে রইল, কেউ-কেউ দুঃখিত হল, কিন্তু একটি প্রতিবাদের বাক্যও উচ্চারণ করল না কেউ। স্বপ্না দু-হাতে কান চাপা দিয়ে রইল। সে ভাবতে লাগল কখন এই যাত্রাটা ফুরোবে।

গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। দু-পাশে উত্তাল ঢেউয়ের দিকে তাকালে মুগ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু স্বপ্নার আর সেদিকে মন নেই। সে চোখ বুজে আছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটকে মনে হল পাঁচঘণ্টা, তারপর লঞ্চ এসে পৌঁছল কুঁকড়োহাটিতে। মেয়ে তিনটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

ভাটার সময় বলে লঞ্চটা ঠিকমতন জেটিতে ভিড়তে পারল না। একটা লম্বা তক্তা ফেলে দেওয়া হল। সেটার ওপর দিয়ে নামতে হবে খুব সাবধানে।

নামবার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। একজন হঠাৎ ঝপাস করে পড়ে গেল নিচে। বহু লোক হইচই করে উঠল একসঙ্গে। সেখানে অবশ্য জল বেশি নেই, থকথকে কাদা। সেই কাদায় মাখামাখি হয়ে লোকটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন স্বপ্নারা দেখল, এই সেই চশমা পরা লম্বা সিড়িঙ্গে ছেলেটা। সে ছিল প্রায় স্বপ্নাদের পিছনেই। তখনও খারাপ কথা চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা তিনজন প্রথমটায় শিউরে উঠেছিল ভয়ে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে বাসবী আর এষা কুলকুল করে হাসতে লাগল।

এষা বলল, বেশ হয়েছে! ঠিক শাস্তি হয়েছে! অসভ্য কোথাকার!

বাসবী বলল, আমার ইচ্ছে করছিল, লোকটাকে ঠেলে ফেলে দিতে!

স্বপ্নার মুখখানা আরও ম্লান হয়ে গেছে। সে একটুও খুশি হয়নি। সে মৃদুস্বরে বলল, যদি লোকটা মরে যেত? হঠাৎ পড়ে গেলে, অনেক সময়—

স্বপ্না অন্ধকারে চকিতে পিছনে একবার তাকিয়েই ঘুরিয়ে নিল মুখ। কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা তখনও চিৎকার করে কাকে যেন গালাগালি দিচ্ছে।

ফেরার লঞ্চ একঘণ্টা পরেই ছাড়বার কথা। কিন্তু কী একটা যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেটা ছাড়ল তিনঘণ্টা বাদে। বাসবী আর এষার ইচ্ছে ছিল হলদিয়া থেকে ঘুরে আসার। এখান থেকে খুব সহজেই বাসে হলদিয়া ঘুরে আসা যায়। তিনঘণ্টা সময় তো হাতে আছেই। কিন্তু স্বপ্না রাজি হল না। সে আর বেশি দূর যেতে চায় না। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ওরা তিনজন লঞ্চে এসেই বসেছিল।

এষা জিগ্যেস করল, কি রে স্বপ্না, তুই এখনও মুখ গোমড়া করে আছিস কেন?

স্বপ্না বলল, ফেরার সময় নিশ্চয়ই ওই ছেলেগুলো আর আসবে না। সত্যি বড্ড জ্বালাতন

করছিল। ছেলেগুলো কীভাবে বলত? ওরকম খারাপ কথা বললে, কোনওদিনই তো কোনও মেয়ে ওদের পছন্দ করবে না।

এষা বলল, আলাপ করার সৎসাহস নেই। আমাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে আলাপ করতে এলে কি আমরা কথা বলতুম না?

ফেরার সময় কোনও ঝঞ্ঝাট হল না। চমৎকার জ্যোৎস্নায় নদী সফর খুব সুন্দরই হল। কিন্তু ফেরার পর ওরা আবিষ্কার করল যে লাস্ট ট্রেন ছাড়া ওদের কলকাতায় ফেরার আর কোনও উপায় নেই। লাস্ট ট্রেনে গেলে ওদের বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত প্রায় বারোটা বেজে যাবে।

এষার দাদা ট্যুর থেকে ফেরেননি। সেদিনও ফিরবেন না খবর পাঠিয়েছেন। বউদি বললেন, রাত্তিরে ডায়মন্ডহারবারেই থেকে যেতে। লাস্ট ট্রেনে ফেরা ওদের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রায় সব কামরাই ফাঁকা থাকে। হঠাৎ-হঠাৎ ডাকাতের উপদ্রব হয়। মেয়েরা কেউই প্রায় ওই ট্রেনে যায় না।

কিন্তু স্বপ্নাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। সে কিছু বলে আসেনি। না জানিয়ে বাড়ির বাইরে সারারাত থাকা স্বপ্না চিন্তাও করতে পারে না। মা-বাবা দারুণ ব্যস্ত হয়ে থানায় হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। অথবা মাঝরাত্তিরে গাড়ি নিয়ে ছুটে আসবেন ডায়মন্ডহারবারে।

এষার বউদি বললেন, ফোনে খবর দিয়ে দিতে।

ফোনে অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করা হল। কিন্তু টেলিফোন দেবতার সেদিন মেজাজ খারাপ। কিছুতেই পাওয়া গেল না। এদিকে লাস্ট ট্রেন ছেড়ে যাবারও সময় হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্না উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে যেতেই হবে। তোরা থেকে যা বরং, আমি তোদের বাড়িতে খবর দিয়ে দেব।

স্বপ্নাকে একা যেতে দেওয়া যায় না। এষা আর বাসবী বলল, না, আমরাও যাব। ট্রেনে যদি ডাকাত আসে মেরে তো ফেলবে না...দেখাই যাক না, একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

স্বপ্না ওদের বারবার বলল যে সে একা ঠিকই চলে যেতে পারবে। তার জন্য ওদের ভ্রমণ নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু স্বপ্নার দুই বান্ধবী অবশ্য তাতে রাজি হতে পারে না। এত রাত্রে স্বপ্না একা ট্রেনে যাবে, এটা কখনও সম্ভব!

এষার বউদি ওদের সঙ্গে তাঁর স্বামীর অফিসের একজন আর্দালিকে পাঠাতে চাইলেন। তাতে আপত্তি করল তিনজনেই। ওরা তেমন অবলা নয় যে পুরুষসঙ্গী ছাড়া ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

ওরা বেছে-বেছে উঠল একটা ভিড়ের কামরায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু দু-তিনটে স্টেশনের মধ্যেই নেমে গেল অনেকে। বেঞ্চগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। ওদের ভয় করতে লাগল একটু-একটু।

মাঝে-মাঝে গাড়ির গতি এমনি এমনিই আস্তে হয়ে আসে। হঠাৎ দু-তিন মিনিটের জন্য নিভে যায় আলো। মনে হয় যে-কোনও মুহূর্তে হুড়মুড় করে উঠে আসবে ডাকাতের দল।

কিন্তু ডাকাতির বদলে শুরু হল সেই পুরোনো উৎপাত।

উলটোদিকের বেঞ্চ থেকে একটা লোক উঠে এসে ওদের ঠিক পাশে বসে পড়ে জিগ্যেস করল, আপনারা কোথায় যাবেন?

লোকটার চোখ দুটো লাল। কথা জড়ানো মুখ দিয়ে ভক্-ভক্ করে বেরুচ্ছে বিশ্রী গন্ধ।

স্বপ্নার যেমন অশ্লীল কথায় আপত্তি, এবার তেমনি আবার মাতালের ভয়। তার কাছে ভূত আর মাতাল প্রায় সমান। এষা শিউরে উঠে সরে গেল।

লোকটি বলল, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি থাকতে কোনও শালা এখানে আপনাদের ভয় দেখাতে আসবে না। আপনারা কোথায় যাবেন বলুন না? আমি আছি, বডিগার্ড।

লোকটি পকেট থেকে একটা বাংলা মদের বোতল বার করে দিল একটা লম্বা চুমুক। অন্য

বেঞ্চ থেকে একজন বলল, আমায় একটু দে। সবটা একাই মেরে দিস না শালা!

মেয়ে তিনটি আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল গায়ে গা-ঘেঁষে। বোঝা গেল এই মাতালটি একা নয়, তার দলে আরও লোক আছে। কামরার সবাই এক দলের কিনা, তাই বা কে জানে!

বাসবী একটু সাহস করে লোকটিকে বলল, আপনি একটু সরে বসুন না। আরও তো অনেক জায়গা রয়েছে!

লোকটি বলল, কেন ভাই? যার যেখানে খুশি বসবে। রেলের সম্পত্তি কারুর কেনা নয়। এখানে সিট রিজার্ভ করাও নেই।

অন্যদিকের লোকগুলো হেসে উঠল বিশ্রীভাবে।

এইসব লোকের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই বুঝে মেয়ে তিনটি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে।

কিন্তু মাতালরা নিস্তব্ধতা সহ্য করতে পারে না। লোকটি ওদের দিকে ঝুঁকে বলল, হ্যাঁ ভাই, আপনারা বুঝি ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে এসেছিলেন?

ওরা কেউ উত্তর দিল না।

লোকটি আবার জড়ানো গলায় বলল, আমার নাম ভগা। আমি থাকতে আপনাদের কোনও ভয় নেই। আমায় এ লাইনে সবাই চেনে। আপনারা কোথায় যাবেন বললেন না তো!

হঠাৎ এই সময়ে আর একবার আলো নিভে যেতেই এষা তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

আলো আবার জ্বলে উঠল সঙ্গে-সঙ্গে।

বাসবী জিগ্যেস করল, কি? কি হয়েছিল রে?

এষা বলল, ওই লোকটা আমার হাত ধরবার চেষ্টা করছিল।

লোকটার মুখে মিটিমিটি হাসি। নেশায় মাথাটা ঝুঁকে পড়ছে বুকের ওপর। সে বলল, হাত ধরব কেন ভাই? আমি পকেটে হাত দিয়ে বিড়ি বার করতে যাচ্ছিলাম...অন্ধকারের মধ্যে নিজের পকেট না অন্যের পকেট—

কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে একটি লোক চাদর মুড়ি দিয়ে, এই শীতের মধ্যেও জানলা খুলে সর্বক্ষণ তাকিয়ে ছিল বাইরে। এবার লোকটি চাদর খুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওদের কাছে এগিয়ে এল। দীর্ঘকায় পুরুষ মধুময়।

বাসবী বা এষাকে যেন সে দেখতেই পেল না। স্বপ্নার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সে বেশ শান্তগলায় বলল, আপনারা ওই দিকটায় গিয়ে বসুন, ফাঁকা আছে। আমি এখানে বসছি।

এষা এই লোকটিকেও অবিশ্বাস করে বলল, কেন আমরা উঠতে যাব? আমরা আগে এখানে এসে বসেছি, ওই লোকটাই ওদিকে চলে যাক না।

মধুময় বলল, সেরকম ভাবে বলে কোনও লাভ নেই। আপনারা আমার জায়গায় গিয়ে বসুন, আমি এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছি।

এষা রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলল, এই লোকটা অত্যন্ত অসভ্য। আমি চেন টানব।

মধুময় বলল, তাকিয়ে দেখুন, এদিককার লোকাল ট্রেনে চেন নেই। সেসব কবেই লোকে ছিঁড়ে-টিড়ে ফেলেছে।

এষা বলল, পরের স্টেশনে আমি পুলিশ ডাকব।

মধুময় বলল, এত রাত্রে কি আর স্টেশনে পুলিশ থাকবে? সন্দেহ আছে।

তারপর সে একটু হেসে বলল, আপনারা বিশ্বাস করুন, আমিই পুলিস, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

এষা তবু সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, আপনি পুলিশ?

মধুময় কামরার চতুর্দিকে প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বেশ

জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি পুলিশ। এরা সব সাধারণ হাটুরে লোক, এদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

স্বপ্না চোখ নামিয়েই ছিল। এবার একটুখানি তুলে বলল, ইয়ে...আপনি এদিকে কেন এসেছিলেন?

মধুময় বলল, এই একটু বেড়াবার জন্য এসেছিলাম। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে এখানে, আপনারা বরং ওই দিকে গিয়ে বসুন, আমি এখানে বসছি।

এষা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে স্বপ্নার হাত ধরে টানল। স্বপ্না আর কোনও কথা বলল না। ওরা তিনজনে চলে গেল কামরার অন্যদিকে।

স্বপ্নাদের পরিত্যক্ত জায়গায় মধুময় বেশ শব্দ করে বসল, তারপর মাতালটিকে বলল, আমি এখন ঘুমোব, সোনারপুর এসে গেলে আমাকে ডেকে দিতে পারবেন দাদা?

মধুময়ের চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যে জন্য চট করে সাধারণ মস্তানরা তাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না।

বাসবী ফিসফিস করে স্বপ্নাকে জিগ্যেস করল, তুই ভদ্রলোককে চিনিস?

স্বপ্না জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। যেন শুনতেই পাচ্ছে না। বাসবী দু-তিনবার জিগ্যেস করার পর সে বলল, হ্যাঁ—চিনি—মানে আমরা আগে যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানে থাকেন।

এষা বলল, লঞ্চে যাওয়ার সময়ও ওই ভদ্রলোককে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। তুই তখন দেখিসনি?

স্বপ্না কোনও উত্তর দিল না।

বাসবী বলল, বেশ হ্যান্ডসাম চেহারা।

এষা বলল, ভদ্দরলোক বললেন, উনি পুলিশ, সত্যি তাই? দেখে কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

স্বপ্না এবারও কোনও উত্তর দিল না।

বাসবী বলল, ওই রকম উপকারী পুলিশ আজকাল সহজে দেখাই যায় না।

এষা বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে ওরা আবার কোনও গোলমাল বাধাবে না তো।

মধুময় কিন্তু ঘুমের ভান করে চোখ বুজে আছে মাথা হেলান দিয়ে। মাতালটি চুপ মেরে গেছে।

স্বপ্নারা বালিগঞ্জ স্টেশনে নামল। অনেক রাত হয়ে গেছে। ওরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

এত রাতে ট্যাক্সি পাওয়া বেশ শক্ত। দু-তিনটে ট্যাক্সি রয়েছে, কিন্তু কোনও অনির্দিষ্ট কারণে ওদের নিতে চায় না। তারপর একটা ট্যাক্সি রাজি হল কোনওরকমে।

দরজা খুলে ট্যাক্সিতে ওঠার মুহূর্তে স্বপ্না একবার ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল পিছনে।

একটা দোকানের পাশে মধুময় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তার মুখ দেখলেই বোঝা যায় স্বপ্নারা ট্যাক্সি না পাওয়া পর্যন্ত সে ওখান থেকে নড়ত না।

স্বপ্নার মুখখানা তবু কঠিন হয়ে রইল। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর বাসবী বলল, ভাগ্যিস ওই ভদ্দরলোক ছিলেন...নইলে আজ কি যে হত...

এষা বলল, মাতালটা আমার হাত ধরার চেষ্টা করছিল, ইস, ভাবলেই গা-ঘিনঘিন করে...।

স্বপ্না যোগ দিল না ওদের কথাবার্তায়।

ট্যাক্সিটা চলে যাওয়ার পর মধুময় সিগারেট কেনবার জন্য দাঁড়াল আর একটা দোকানের সামনে। এতক্ষণ তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু টান-টান হয়ে ছিল। যে-কোনও মুহূর্তে সে লাফিয়ে পড়ে ঘায়েল করে দিতে পারত সাত-আটজন লোককে। এমনকি শেষ ট্যাক্সিওয়ালাটিও যদি রাজি না হত, তাহলে মধুময় গিয়ে চেপে ধরত ওর টুঁটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি। তবু ভেতরে-

ভেতরে সে উত্তেজনা বোধ করেছে এখনও। তার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। স্বপ্না তাকে 'আপনি' বলেছে। লঞ্চে যাওয়ার সময় স্বপ্না তাকে দেখতে পেয়েও একটা কথা বলেনি।

স্বপ্না বলেছিল, তুমি আর আমাদের বাড়িতে কখনও এসো না। মধুময় তো স্বপ্নাদের বাড়িতে যায়নি। কিন্তু পথে বা নদীর বুকেও কি স্বপ্নার সঙ্গে তার দেখা নিষেধ? সেটা ভালো করে জেনে নিতে হবে।

রতনের দেড় বছর জেল হলেও আইনের নানান ফাঁকে ধনা ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। ধনার ভালো নাম ধনঞ্জয়। তার বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। দু-তিনমাস ধরে ভবিষ্যৎ চিন্তা করার মতো বিলাসিতা সে করতে পারে না।

তাকে দু-বেলা খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই হবে। শুধু তার নিজের জন্য নয়, পরিবারের সকলের জন্য। ধনার ছোট ভাইটি পড়াশুনোয় খুব ভালো। ধনা নিজে লেখাপড়া শিখতে পারেনি, তাই ছোট ভাইটিকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য তার খুব আগ্রহ।

বেআইনি টাকা জমিয়ে রাখা যায় না। ধনা আগে যা রোজগার করেছিল, তা কিছুই নেই। ধনার মা আবার শেষ গয়নাটি পর্যন্ত বন্ধক দিয়ে ধনার জন্য উকিল ঠিক করেছিলেন।

জেল থেকে বেরিয়েই ধনা একটা গেঞ্জির কারখানায় কাজ জোগাড় করে ফেলল। কারখানার শ্রমিক নয় অবশ্য, খানিকটা কেরানিগিরি আর খানিকটা মালিকের ফাইফরমাস খাটা। মাইনে খুবই সামান্য।

ধনা স্কুল ফাইনাল পাশ করেছিল কোনওরকমে। ছেলেবেলা থেকেই ব্যায়াম করে তার চেহারা খুব তাগড়া, সে অসম্ভব খেতে ভালোবাসে, সামান্য একটু তরকারি দিয়ে সে পনেরো কুড়িখানা রুটি খেয়ে ফেলতে পারে অনায়াসে।

ধনা মাইনে পায় দুশো চল্লিশ টাকা। ওদের পরিবারে পাঁচজন লোক। সুতরাং প্রত্যেক দিন পনেরো-কুড়িখানা রুটি ধনার ভাগ্যে জোটার কথা নয়।

এক শনিবার বিকেলে পার্ক সার্কাস মাঠের কাছে ধনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মধুময়ের। মধুময় তার পুরোনো সঙ্গীদের সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলছিল। ধনাকে দেখেই তাই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল অন্য দিকে, কিন্তু ধনাই এসে ধরল তাকে।

কী রে মধু, চিনতেই পারছিস না যে!

মধুময় লজ্জা পেয়ে গেল। এরা তো কেউ তাকে জোর করে খারাপ পথে নিয়ে যায়নি। সে-ই গিয়েছিল স্বেচ্ছায়। সুতরাং এদের তো দোষ দেওয়া উচিত নয়। মধুময় বলল, না রে, দেখতে পাইনি তোকে। কেমন আছিস?

ধনা বলল, আর আছি। রোজ দু-বেলা জুতো খাচ্ছি। একটা চাকরি জুটিয়েছি ভাই কোনওরকমে, কিন্তু মালিক যখন-তখন শোনায়, দাগি আসামি, তোমায় চাকরি দিয়েছি এই ঢের!

মধুময় এখনও কোনও কাজ-টাজ করে না শুনে ধনা অবাক হয়ে গেল। জিগ্যেস করল, তাহলে তুই কী করবি ঠিক করেছিস? কিছু ভাবিসনি!

মধুময় দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

ধনা বলল, আমারও ইচ্ছে করছে, এ শালার চাকরিতে লাথি মেরে বেরিয়ে আসি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়ে মাসে মাইনে দেবে মাত্র দুশো চল্লিশ টাকা। আর মালিক দিন-দিন মোটা হবে।

মধুময় সত্যি দুঃখ বোধ করল ধনার জন্য। ছেলেটা খুব খেতে ভালোবাসে, এত কম টাকায় ওর চলবে কি করে।

ধনা বলল, আয়, একটু বসি। দু-চারটে কথা বলি।

মধুময়ের ইচ্ছে নেই, তবু আপত্তি করতে পারল না। ওরা গিয়ে মাঠের মাঝখানে ফাঁকা

জায়গায় বসল। কাছাকাছি কোনও লোকজন নেই।

প্রথমে কিছুক্ষণ পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের কথা হল। রতন নাকি ইতিমধ্যে জেল থেকে একবার পালাবার চেষ্টা করেছিল, ধরাও পড়ে যায়। সে জন্য রতনের মেয়াদ বেড়ে গেছে আরও।

বেচারা রতন! তাকে কখনও ঠিক ঝানু অপরাধী বলে মনে হয়নি মধুময়ের। এই সমাজের ওপরে রতনের একটা তীব্র রাগ আছে, সে রাজনীতি ঠিক বোঝে না, কোনও রাজনীতির দলে গিয়ে ভেড়েওনি, সে একা একাই কিংবা কয়েকজন মিলে এই সমাজকে ভেঙেচুরে দিতে চায়। এ জন্য লোকে তাকে অসামাজিক বলবে ঠিকই। মধুময় এখন বুঝেছে যে এ ধরনের কাজ অসামাজিকতাই, যুক্তি দিয়ে এর কোনও সমর্থন করা যায় না।

ধনার সঙ্গে পার্কে বসে থাকতেও তার একটু লজ্জা-লজ্জা করছে। কেউ দেখলে ভাববে, সে বুঝি আবার পুরোনো দলে ভিড়তে চাইছে।

ধনা বলল, এই চাকরি আমার পোষাতে না। এটা আমার ছাড়তেই হবে। আমি অন্য একটা কাজের কথা ভাবছি, তুই যদি সঙ্গে আসতে রাজি থাকিস—

মধুময় জিগ্যেস করল, কী কাজ?

দ্যাখ, ডাকাতি-ফাকাতি আমাদের পোষাবে না। ওসব কাজে অনেক হ্যাপা। ওর জন্য আলাদা ট্রেনিং লাগে। তাছাড়া বেশি লোক নিয়ে কাজ হয় না। দুজনই যথেষ্ট। তুই রাজি থাকলে লেগে পড়তে পারি।

—কী কাজ?

—তুই তো গাড়ি চালাতে পারিস?

—তা শিখেছিলাম এক সময়।

—ওতেই হবে। আয় তাহলে তোতে আমাতে মিলে একটা দোকান খুলি।

মধুময় হেসে ফেলল।—গাড়ি চালাবার সঙ্গে দোকান খোলার কী সম্পর্ক?

ধনা বলল, বড় ব্যবসা করবার জন্য আমাদের ক্যাপিটাল কেউ দেবে না। ব্যাঙ্কে ধার নিতে গেলে সিকিউরিটি চাইবে কিংবা বলবে টুয়েন্টি পার্সেন্টি টাকা নিজেরা ইনভেস্ট কর—সেইজন্যই বলছি, আমরা ছোটখাটো একটা দোকান খুলতে পারি অন্তত।

মধুময় খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। ছোটখাটো দোকানের দোকানদার হওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

ধনা তার মনের ভাব বুঝেই বলল, আরে তা বলে কি আমি তেলেভাজার দোকান কিংবা গেঞ্জির দোকান খুলতে বলছি তোকে। তুই ভালো ফ্যামিলির ছেলে, তোর প্রেস্টিজে লাগবে। কিন্তু ধর, যদি একটা ওষুধের দোকান খোলা যায়? কত বড়-বড় লোক ওষুধের দোকান চালায়।

—কিন্তু তাতে তো অনেক টাকা লাগে।

—সেই টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। তারও উপায় আছে।

—অন্তত কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার কমে কি ওষুধের দোকান হয়?

—ঠিক তাই। আমিও ওইরকম হিসেব ধরেছি। টাকাটা কীভাবে জোগাড় হবে শোন। আমার সঙ্গে একটা লোকের আলাপ হয়েছে, তার মল্লিকবাজারে ব্যবসা আছে। সে বলেছে, মোটামুটি ভালো কন্ডিশানের গাড়ি যদি ওকে এনে ডেলেভারি দিতে পারি, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাশ চারহাজার টাকা দেবে।

—গাড়ি? কি গাড়ি?

—এই ফিয়াট, অ্যাম্বাসাডার। ফিয়াটের রেট একটু বেশি, পাঁচহাজার।

—ওসব গাড়ি আমরা পাব কোথায়?

ধনা হাত তুলে বলল, এই যে রাস্তাঘাট দিয়ে এত গাড়ি যাচ্ছে। এর থেকে দু-একখানা

আমরা তুলে নিতে পারব না?

মধুময় ঠিক বুঝতে পারল না। ভুরু কুঁচকে ধনার দিকে তাকিয়ে রইল।

—শোন, আমি সব প্ল্যান ছকে রেখেছি। আর কারুকে বলিনি, তোকেই বলছি। কেষ্ট, গণেশ ওরাও আমাকে বলছিল একটা কিছু কাজে নেমে পড়তে। কিন্তু ওদের আমি রিলাই করি না। তোর সঙ্গে আমার পটবে ভালো। এটা জেনে রাখিস আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কখনও নেমকহারামি করি না।

—সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা করব কি করে?

—আমরা গাড়ি কিনতেও যাব না, বেচতেও যাব না। আমাদের কাজ শুধু এক জায়গা থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে আর-এক জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া। বাকি কাজ সেই মল্লিক বাজারের লোকটাই করবে। আমরা এক-একটা গাড়ির জন্য পাঁচহাজার করে টাকা পাব।

—তার মানে গাড়ি চুরি করব?

—তুই একে চুরি বলছিস কেন? চুরি কথাটা শুনতে খুব খারাপ। এটা হচ্ছে ডেলিভারি কেস। এক জায়গার গাড়ি আমরা অন্য জায়গায় ডেলিভারি দেব। কার গাড়ি, কিসের গাড়ি, সেসব তো আমাদের জানবার দরকার নেই। সেসব বুঝবে মল্লিকবাজারের সেই লোকটা।

মধুময় হেসে বলল, ধুৎ! তুই একটা পাগল নাকি!

ধনা বলল, বুঝতে পারলি না? ধর যদি আমরা পাঁচ-ছ'খানা গাড়ি ডেলিভারি দিতে পারি—

মধুময় বলল, ডেলিভারি মানে কি? অন্য লোকের গাড়ি সরিয়ে মল্লিকবাজারে পাচার করে টাকা নেওয়া চুরি নয়?

এটাই সবচেয়ে মজার কাজ। অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চাবি প্রায় সব এক। আর না হলেও তিন-চার রকমের চাবি জোগাড় করা এমন শক্ত কিছুই না। রাত্তিরবেলা নাইট শো সিনেমায় কিংবা অনেক মদের দোকানের সামনে যেসব গাড়ি থাকে, তার থেকে একখানা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগবে? আমি ঘাঁতঘোঁত সব জেনে নেব, তুই শুধু গাড়ি চালিয়ে সরে পড়বি।

মধুময় বিস্মিতভাবে ধনার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি—রাজি?

—তুই কেন গাড়ি চালানো শিখে নিচ্ছিস না? তা হলে তুই নিজেই তো—

—এ সব কাজ ঠিক একা-একা করা যায় না। অন্ততপক্ষে দুজন চাই। একজনকে নজর রাখতে হবে...দ্যাখ, আমরা যদি কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলতে পারি, তাহলেই আমরা একটা ওষুধের দোকান খুলে ফেলতে পারব। তাহলে বাড়ির লোকও কিছু সন্দেহ করবে না।

—বাড়ির লোকেরা জিগ্যেস করবে না, দোকান খোলার টাকা কোথা থেকে পেলাম?

—তুই বলবি, আমি দিয়েছি ক্যাপিটাল। আমি বলব, তুই দিয়েছিস! সেই দোকান থেকে যদি প্রফিট হয় তো ভালোই, তাহলে আমরা অন্য লাইন একদম ছেড়ে দেব। আর যদি প্রফিট না হয় তাহলে দোকানটা চালু রেখে আমরা একখানা দু-খানা করে গাড়ি সরাব। একটা কিছু ব্যবসা বা ঠিক জায়গায় চাকরি জোগাড় করে নিতে পারলে, তারপর তুই তলায়-তলায় চুরি কর ডাকাতি কর, কেউ কিছু বলবে না। যত দোষ শালা শুধু বেকারদের। এদিকে অন্যরা যে চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে...কি, রাজি?

মধুময় অনেকক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল। একবার ভাবল, পুরো প্রস্তাবটাই হেসে উড়িয়ে দেয়। ধনা তার মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চেয়ে আছে।

—যদি আবার ধরা পড়ি?

—কলকাতায় গাড়ি চুরি করতে গিয়ে কেউ কখনও ধরা পড়েছে, তুই শুনেছিস? কোনও রেকর্ড নেই। ছিঁচকে চোরেরা গাড়ির পার্টস-টার্টস চুরি করতে গিয়ে অনেক সময় ধরা পড়ে। আমরা

এ সবের মধ্যে নেই। আমরা দারুণ সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে যাব। আর তোর এরকম সুন্দর চেহারা। তোকে কে সন্দেহ করবে? ধর বাই চান্স কেউ দেখে ফেলল, তাতেই বা কি, তুই বলবি, ভুল হয়ে গেছে। অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে এরকম প্রায়ই ভুল হয়। কি—হয় না?

মধুময় বলল, তা হয়!

—তা হলে? আমাদের একটু বেশি টাকা হলে আমরা নিজেরাই একটা গাড়ি কিনে পাশে রেখে দেব। কেউ যদি আমাদের ধরতে আসে, আমরা ফাঁটের ওপর বলব, আরে মশাই ভুল হয়ে গেছে, এই তো পাশেই আমাদের গাড়ি! কি বল, প্ল্যানটা খারাপ? তুই রাজি থাকিস তো—

মধুময় হাসতে-হাসতে বলল, এত সহজ?

ধনা বলল, হ্যাঁ রে, সত্যি সহজ। একবার ট্রাই করেই দেখা যাক না। যে ভদ্দরলোক গাড়ি ডেলিভারি নেয়, তার আরও ক্লায়েন্ট আছে। প্রায়ই তারা গাড়ি ডেলিভারি দেয়। এ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি!

—এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে? আমাদের তো একটা কিছু করে দাঁড়াতে হবে। কলকাতা শহরে যারা গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের একটা গাড়ি হারিয়ে গেলেও আর একটা গাড়ি কিনে ফেলতে পারে অনায়াসে। আমরা বেশি লোভ করব না, মাসে দুখানার বেশি গাড়ি ডেলিভারি দেব না। আর যদি দোকানটা ভালোভাবে চলে, আমরা পুরোপুরি ভদ্দরলোক হয়ে যাব। তোকে দোকানের জন্য বেশি খাটতে হবে না, সব আমি ম্যানেজ করব।

—ঠিক আছে, ভেবে দেখি ব্যাপারটা।

—শোন মধু, তোকে একটা কথা বলব? দেরি করে লাভ কি? শুভস্য শীঘ্রম্ বলে একটা কথা আছে না? আজ শনিবার, আকাশটা মেঘলা-মেঘলা, বৃষ্টি নামতে পারে, আজই আইডিয়াল দিন...আজই কাজ শুরু করা যাক না? একটা গাড়ি ডেলিভারি দিতে পারলেই তোর দু-হাজার আমার দু-হাজার—

—আজ পারব না আমি।

—কেন? তোর আজ বিশেষ কিছু কাজ আছে?

—সে জন্য নয়। আমি ঠিক একমাস তেইশদিন সময় চাই।

—একমাস তেইশদিন? তার মানে?

—এই সময়টা আমি একটা বিশেষ জিনিস নিয়ে চিন্তা করছি। এই ক'টা দিন কেটে গেলে তারপর আমি ঠিক করব, তোর সঙ্গে এই কাজে নামব কিনা। আমি না নামলেও তুই অন্য লোক পেয়ে যাবি।

—যা বাবাঃ! তুই কি ব্রত-ট্রত নিয়েছিস নাকি? একমাস তেইশদিন ধরে চিন্তা? এরকম শুনিনি কখনও।

মধুময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, ব্রতই বলতে পারিস। তার আগে আমার অন্য কিছু করার উপায় নেই। এ লাইনে যদি আবার ফিরে আসি, তাহলে তোর প্ল্যানটা খুবই ভালো। সন্দেহ নেই। তোর সঙ্গেই নেমে পড়ব।

ধনা সেখানেই বসে রইল অবাক হয়ে। মধুময় হনহন করে হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল।

দেশপ্রিয় পার্ক থেকে রাসবিহারীর মোড়। শুধু এই জায়গাটুকুতে মধুময় জীবনে আর কখনও যাবে না। এ ছাড়া কলকাতার বাকি অংশ বা কলকাতার বাইরে, কিংবা গোটা ভারতবর্ষ, সব জায়গাতেই মধুময়ের যাওয়ার অধিকার আছে। সে স্বাধীন, পুলিশও তার নামে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত করতে পারেনি।

মধুময় এখন প্রায় কোনও সময়ই বাড়িতে থাকে না। মা কোনও অভিযোগ করতে পারেন

না। কারণ মধুময় মাকে খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে তাকে দু-মাস সময় দিতে হবে।

পায়জামা পাঞ্জাবি পরা আর একটা কালো রঙের শাল জড়ানো গায়ে, মধুময় যেন একজন সন্ন্যাসী, সে শহরের পথে-পথে একলা-একলা ঘুরে বেড়ায়। সামান্য চেনাশুনো কাউকে দেখলেই সে সরে যায় চট করে। কারুর সঙ্গে তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। সন্ন্যাসীরা সব সময় ভগবানের কথা চিন্তা করে কিনা কে জানে, কিন্তু মধুময়ের বুকের মধ্যে সবসময় একটিই ছবি, স্বপ্নার মুখ।

এজন্য এক-এক সময় নিজের ওপরেই খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে মধুময়। পৃথিবীতে স্বপ্না ছাড়া কি আর কিছু নেই? সে কি অন্য কিছু নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না? ধরা যাক স্বপ্না মরে গেছে। জেল থেকে বেরিয়ে মধুময় যদি শুনত যে হঠাৎ একটা অসুখে স্বপ্না মারা গেছে ইতিমধ্যে, তা হলে মধুময় কী করত। সে কি পাগল হয়ে যেত? কিংবা আত্মহত্যা করত? কতরকম কঠিন শোক সহ্য করেও তো মানুষ বেঁচে থাকে। ছেলের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে মা, এর চেয়ে বড় শোক তো আর নেই।

চাকরি ছাড়াও কি একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না? মধুময়ের গায়ে জোর আছে, শুধু শারীরিক শক্তি দিয়েও এখনও একজন মানুষ এই শহরে নিজের বেঁচে থাকার মতন টাকা রোজগার করতে পারে।

রেল স্টেশনে কুলিরা কি বেঁচে নেই? সেইসব কুলিরাও কখনও-কখনও হাসে, তারাও গান গায়, অর্থাৎ তাদের জীবনেও কিছু-না-কিছু সুখ আছে। কত বেকার ছেলে তো ফুটপাথে বসে ফ্রক কিংবা গেঞ্জি বিক্রি করে, মধুময় তাও পারে। সে পারে ট্রেনে-ট্রেনে আশ্চর্য মলম কিংবা ডট পেন ফিরি করতে। এসব ব্যাপারে মধুময়ের কোনও লজ্জা নেই।

কিন্তু এগুলো করতে গেলে মধুময়কে একা হয়ে যেতে হবে। একা হলে সে যে ভাবেই হোক নিজের জীবনটা কাটিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু সে একা নয়। তার দু-দিকে বাধা আছে।

বাবা রিয়াটার করবেন শিগগিরই, সবাই আশা করে আছে, তারপর মধুময়ই সংসারের দায়িত্ব নেবে। মধ্যবিত্ত পরিবারে এরকমই নিয়ম।

সে এক ছেলে, তার দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট বোন কলেজে পড়ে। এরকম সংসারে ছেলেটিকেই ঘাড় পেতে সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরি হতে হয়। সেইজন্যই তাকে শেখানো হয়েছে লেখাপড়া। সেই লেখাপড়া শেখার বিনিময়ে সরকার তাকে চাকরি দিতে অক্ষম, সেটাও কি মধুময়ের দোষ?

মধুময় স্টেশনের কুলি কিংবা ট্রেনের ফেরিওয়ালা হয়ে টাকা রোজগার করে সংসার চালাতে চাইলেও কেউ তা মেনে নেবে না। কারণ তারা ভদ্রলোক। ভদ্দরলোকদের ওসব করতে নেই। সে স্টেশনের কুলি কিংবা ট্রেনের ফেরিওয়ালা হলে তার ছোট বোনের ভালো জায়গায় বিয়ে হবে না পর্যন্ত! মা কেঁদে ভাসাবেন। মা তাঁর বড়লোক ভাইদের কাছে কাকুতি-মিনতি করবেন মধুময়ের যে-কোনও একটা ভদ্রলোকের চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য।

কারুকে ঘুষ দিয়ে চাকরি জোগাড় করতেও মা-বাবাদের কোনও আপত্তি নেই। মধুময় গুন্ডামি ডাকাতি করে টাকা রোজগার করলেই আপত্তি। ধরা না পড়লে বোধহয় তাতেও আপত্তি থাকত না। যারা চোরাইমালের ব্যবসা করে, তারাও সবাই ভদ্রলোক।

স্বপ্নার প্রেমিক হিসেবেও সে কুলি কিংবা ফেরিওয়ালা হতে পারে না। স্বপ্নার প্রেমিক! মধুময়ের হাসি পায়।

স্বপ্না তাকে সারাজীবনের মতন তার সঙ্গে আর দেখা করতে বারণ করেছে। কখনও পথে দেখা হয়ে গেলেও মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে। তবু মধুময়ের সন্দেহ হয়। স্বপ্না কি সত্যি সত্যিই তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

মধুময় যেমন মনে করে তার হৃদয়ের একটা টুকরো স্বপ্নার কাছে গচ্ছিত আছে, তেমনি

স্বপ্নারও হৃদয়ের একটা টুকরো কি মধুময়ের কাছে গচ্ছিত নেই? হঠাৎ এক সময় স্বপ্নারও কি মনে হবে না যে মধুময়কে ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না?

মধুময় একবার ভুল করেছে বলে কি স্বপ্না তাকে ক্ষমা করতে পারে না? মধুময়ের মুখ দেখে কি স্বপ্না বুঝতে পারে না যে মধুময় জাত-অপরাধী নয়? মধুময় যদি প্রতিশ্রুতি দেয় তাও স্বপ্না মেনে নেবে না? মধুময় একবার বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলে স্বপ্না তাকে আর বিশ্বাস করবে না। খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার আর সহজে টাকা রোজগারের লোভেই মধুময় রতনদের দলে গিয়ে ভিড়েছিল। সেজন্য মধুময় এখনও ঠিক অনুতাপ বোধ করে না। এই সমাজে যারা অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার করে, যাদের অতিরিক্ত টাকা আছে, তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা কেড়ে নেওয়াটা তেমন অন্যায় মনে করে না মধুময়। এই সমাজ যখন সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারছে না, তখন কেউ-কেউ তো নিজেদের দাবি আদায় করার চেষ্টা করবেই।

তবু স্বপ্নার কথা চিন্তা করেই মধুময় ওই দিকটা একেবারে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে। সে চাকরি জোগাড় করে ভদ্রলোক সাজবে। বম্বেতে গেলে কিছু একটা হয়ে যাবে মনে হয়। কিন্তু তার আগে জেনে নেওয়া দরকার, স্বপ্না তার কাছে ফিরে আসবে কি না। স্বপ্নার জন্যেই তো এতখানি আত্মত্যাগ। নইলে নিছক মধ্যবিত্তের মতন সে বোম্বে গিয়ে চাকরির হ্যাংলামি করতে যাবে কেন?

যদি মধুময়ের বদলে স্বপ্না কোনও মারাত্মক ভুল করে ফেলত? না, স্বপ্না কোনও ভুল কিংবা অন্যায় করবে না, তার নীতিবোধ খুবই পরিচ্ছন্ন এবং গতানুগতিক। সততা আর সারল্যের জন্যই স্বপ্না বেশি সুন্দর। তবু কোনও দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পারে।

স্বপ্না খুব ট্যাক্সি চড়তে ভালোবাসে। একা-একা ট্যাক্সিতে যাওয়ার সময় স্বপ্নাকে হঠাৎ কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারত। তারপর স্বপ্নার ওপর বলাৎকার করে তাকে ছেড়ে দিল। হঠাৎ একদিন মধুময় জানতে পারল, স্বপ্না সন্তানসম্ভবা! তখন মধুময় কি করত? সে কি ঘৃণায় আর স্বপ্নার মুখ দেখতে চাইত না?

মধুময়ের পক্ষে তা কি সম্ভব? সেই বিপদের সময় সে-ই তো ছুটে গিয়ে স্বপ্নার পাশে দাঁড়াত। স্বপ্নার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব দিত সে নিজে। সবচেয়ে বড় কথা, স্বপ্নার মনে যাতে কোনও আঘাত না লাগে, সেটাই বেশি করে দেখত মধুময়।

কিংবা অন্যরকম কিছুও হতে পারত। স্বপ্না সবাইকে বিশ্বাস করে। মধুময় জানে, স্বপ্নার খুড়তুতো ভাই চাঁদু মোটেই ভালো ছেলে নয়। অল্প বয়েস থেকেই বখে গেছে। বাজে-বাজে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেশে চাঁদু—জুয়া-টুয়া খেলে, আরও অন্য কিছু করে কিনা কে জানে!

মধুময় দু-একবার স্বপ্নাকে চাঁদুর কথা বলেছে, স্বপ্না তা উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, যাঃ, চাঁদু খুব ভালো ছেলে, লেখাপড়ায় মাথা নেই, কিন্তু পাড়ার কত লোককে সাহায্য করে।

ধরা যাক, সেই চাঁদু ভুলিয়ে ভালিয়ে স্বপ্নাকে কোথাও নিয়ে গেল তারপর কোনও পাপচক্রে জড়িয়ে ফেলল তাকে। এমনও তো হতে পারে চাঁদুর বন্ধুরা খেপে উঠল স্বপ্নার জন্য, তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে একজন খুন হয়ে গেল ওদের মধ্যে। সেই সময় পুলিশ গিয়ে গ্রেফতার করল সবাইকে। খুনের ব্যাপারে, নিশ্চয়ই স্বপ্নাকেও জেলে আটকে রাখবে। হঠাৎ সেই খবর শুনে মধুময় কি অমনি ভেবে বসবে যে স্বপ্না তার চোখের আড়ালে উচ্ছন্নে গেছে, সে আর স্বপ্নার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না!

রাস্তায় যেতে-যেতে মধুময় থমকে দাঁড়ায়। যেন সে চোখের সামনে দেখতে পায় জেলখানার জেনানা ফাটকে বন্দিনী রয়েছে স্বপ্না। চোখের নিচে দুশ্চিন্তার কালি। ভিজিটার্স রুমে দেখা করতে গেছে মধুময়।

মধুময়কে দেখেই কেঁদে ফেলল স্বপ্না। মুখ ঢেকে সে বলছে, না-না, আমি তোমার কাছে আর মুখ দেখাতে চাই না।

মধুময় স্বপ্নার হাতটা ছুঁয়ে বলল, শান্ত হও।

স্বপ্না হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে বলল, না, তুমি আমায় ছুঁয়ো না, আমি নষ্ট হয়ে গেছি।

মধুময় বলল, স্বপ্না, মুখ তোলো, আমার দিকে তাকাও।

স্বপ্না বলল, আমার এখন মরে যাওয়াই ভালো।

মধুময় বলে, ছিঃ!

স্বপ্না বলল, আর তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। এ পৃথিবীতে আমার আর স্থান নেই।

মধুময় দৃঢ়-গলায় বলল, শোনো স্বপ্না, তোমায় যদি কেউ নরকে নিয়ে যেত, আমি সেখান থেকেও তোমায় খুঁজে আনতাম। আমি জানি, তোমার গায়ে ময়লা লাগলেও তোমার মনে কখনও ময়লা লাগতে পারে না। আমি কি কখনও তোমায় ছেড়ে...

রাস্তার লোক অবাক হয়ে মধুময়কে দেখে। সে পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে। ঠিক যেন একটা পাগল।

এক সময় মধুময় চমকে উঠে সচেতন হয়ে যায়। লজ্জা পেয়ে সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে। সত্যিই তো, স্বপ্নার কথা ভেবে-ভেবে সে পাগল হয়ে গেল নাকি?

সাময়িকভাবে ভুলে থাকার জন্য মাঝেমধ্যে সে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যায়। তবু কিছুতেই সেখানেও মন বসে না। খানিকটা বাদে সে টের পায় যে সিনেমার গল্পটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কারণ, সে পরদার দিকে চেয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু তার মনের মধ্যে চলছে স্বপ্নার চলচ্চিত্র।

অনেক সময় দেখা যায়, ময়দানে কোনও অখ্যাত ক্লাবের ছেলেরা ক্রিকেট প্র্যাকটিস করছে, গায়ে চাদর দেওয়া লম্বা চেহারার মধুময় তাদের একমাত্র দর্শক। সে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। ইচ্ছে করলে কি মধুময়ও ওদেরই মতন খেলাধুলো করে আনন্দে মেতে থাকতে পারত না? কিন্তু তার জীবনটা বদলে গেছে। সে আর অন্য কারুর মতন নয়।

একদিন সন্ধেবেলা একটা বাড়ির সামনে মধুময় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এই বাড়িটা তার খুব চেনা। পুরোনো আমলের বাড়ি, সামনে লোহার গেট, ভেতরে একটু ছোট্ট বাগান, তারপর হলুদ রঙের তিনতলা। দোতলার ডানদিকে যে ছোট্ট ঝোলানো বারান্দা, সেখানে মধুময় কতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে।

এ বাড়িতে অমল থাকে, মধুময়ের স্কুলের বন্ধু। এক সময় মধুময় এ বাড়িতে প্রায় প্রতিদিন আসত, অমলের মা-বাবা, ভাই-বোনেরা সবাই তাকে চেনে। অমলের মা তাকে নিজের ছেলের মতন ভালোবাসতেন। অমলেরও এক সময় খুব শখ ছিল ছবি আঁকার। কতদিন মধুময় আর অমল ওই ঝুলবারান্দায় বসে ছবি এঁকেছে। একের-পর-এক।

একদিনের ঘটনার পর মধুময় আর এ বাড়িতে আসে না। তখন মধুময় আর অমল ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, ওরা দুজনে বসে ছবি আঁকছিল এক দুপুরে, এমন সময় হঠাৎ অমলের বাবা সেখানে এলেন। অমলের বাবাকে অত রেগে যেতে মধুময় আগে কখনও দেখেনি। তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, পড়াশুনো নেই, কিছু না, দিনরাত শুধু ছবি আর ছবি! তোরা কালীঘাটের পটো হবি ভেবেছিস। নিকুচি করেছে ছবি আঁকার।

তারপর অমলের বাবা অমলের আঁকা ছবিগুলো খামচে তুলে নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

খুব অপমানিত বোধ করছিল মধুময়, সে নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। আর আসেনি কোনওদিন।

এমনকি মধুময় পাটনা থেকে ফেরার পর খবর পেয়েছিল যে অমলের মায়ের খুব অসুখ,

তবু সে দেখা করতে আসেনি একবারও। অমলের মা মারা গেছেন।

মধুময় গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে এসে কলিংবেল টিপল।

দরজা খুলে দিল একজন পুরোনো ভৃত্য। এর নাম রাখু। এও মধুময়কে চেনে। সে একটু হেসে বলল, দাদাবাবু অনেকদিন পর এলেন।

—অমল আছে?

—হ্যাঁ আছেন।

দরজা খুলে রাখু সরে দাঁড়াল। আগেকার দিনে মধুময় সোজা দোতলায় উঠে যেত অমলের ঘরে। রাখু ভেবেছে, মধুময় সেইরকম যাবে।

মধুময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলল, যান, ওপরে যান, দাদাবাবু একটু আগেই ফিরেছেন।

মধুময় আড়ষ্ট বোধ করল। সে শুনেছে যে এর মধ্যে অমলের বিয়ে হয়ে গেছে। অমল তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করতেও গিয়েছিল, মধুময় তখন জেলে।

মধুময় বলল, না, আমি নিচের ঘরে বসছি, তুমি দাদাবাবুকে খবর দাও।

অমলদের পরিবার বেশ স্বচ্ছল। তা ছাড়া অমল পাস-টাশ করে একটা চাকরিও পেয়েছে, তারপর বিয়ে করেছে, সে এখন সুখী মধ্যবিত্ত।

মধুময়ের যতদূর মনে আছে এ পাড়ারই রীতা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে অমলের খুব ভাব ছিল। অমল কি তাকেই বিয়ে করেছে? অমল স্বপ্নাকেও চেনে।

এই শীতের মধ্যেও সন্ধেবেলা স্নান করেছে অমল। পাজামা পাঞ্জাবির ওপর একটা সাদা শাল আলগাভাবে জড়ানো। সারা গায়ে পাউডারের গন্ধ।

—কি রে?

মধুময় কথা না বলে হাসল।

সোফার ওপর বসে পড়ে অমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, খাবি? এতদিন পর হঠাৎ মনে পড়ল?

অমল মধুময়েরও আগে থেকে সিগারেট ধরেছে। আগে অমলকে খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট খেতে হত, এখন সে বিবাহিত সংসারী মানুষ বলে বসবার ঘরেই সিগারেট ধরাতে পারে। অমলের বাবা তো যে-কোনও মুহূর্তে আসতে পারেন এখানে।

মধুময় হাত বাড়িয়ে অমলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে বলল, কেমন আছিস?

—ভালোই। তোর খবর কী?

—চলছে।

—মাসিমা কেমন আছেন?

খুবই কাটা-কাটা কথাবার্তা। মধুময়ের মনে হল অমলের মুখে যেন অভিমানের ছাপ। মধুময় যে হঠাৎ এ বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল সেজন্য অমলের তো অভিমান হতেই পারে। বাবা-মায়েরা তো ওরকম একটু-আধটু বকাবকি করেন তা বলে কি কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ত্যাগ করে? অমলের বাবা অমলের ছবিই ছিঁড়েছিলেন। মধুময়ের তো ছেঁড়েননি। তাছাড়া মধুময় নিজেই এখন ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে।

একটু পরেই মধুময়ের খেয়াল হল, সে নিজে থেকে দোতলায় উঠে যায়নি, অমলও তো তাকে ওপরে যেতে বলল না। আগে তারা কখনও বসবার ঘরে বসে গল্প করেনি।

অমল নিশ্চয়ই মধুময়ের কীর্তিকাহিনি সব জানে। মধুময়ের নামে যখন মামলা চলছিল, তখন খবরের কাগজে সব ছাপা হয়েছিল। অমল নিশ্চয়ই খবরের কাগজ পড়ে। এমনিতেও এসব কথা লোকের মুখে ঠিক রটে যায়।

মধুময় জিগ্যেস করল, তুই কি রীতাকে বিয়ে করেছিস?

অমল চকিতে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দরজার দিকে তাকাল। তারপর একটু বিরক্তভাবে বলল, রীতাকে? কেন, রীতাকে বিয়ে করতে যাব কেন? রীতার তো আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

বেশিদিনের তো কথা নয়, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধান, তবু যেন মনে হয় এক যুগ পার হয়ে গেছে, ঘটে গেছে কত কিছু, মধুময় তার অনেক কিছুরই খবর রাখে না।

—তোর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?

—দাঁড়া, ডাকছি।

সোফা থেকে উঠতে গিয়েও অমল আবার বসে পড়ে বলল, ও, ও তো বাড়ি নেই, আমার ছোট বোনের সঙ্গে বেরিয়েছে। তুই আগে থেকে খবর দিয়ে আসিসনি, আর একদিন আয়।

মধুময়ের কেন যেন মনে হল, অমল মিথ্যে কথা বলছে। অমলের স্ত্রী বাড়িতেই আছে, কিন্তু অমল তার সঙ্গে মধুময়ের আলাপ করিয়ে দিতে লজ্জা পাচ্ছে। অমলের স্ত্রী যদি বলে, এই তোমার সেই বন্ধু, যে ট্রেনে-ডাকাতি করেছিল? যে ধরা পড়েছিল একটা বেশ্যার বাড়িতে?

অমল ওর স্ত্রীকে নিচে ডাকতে যাচ্ছিল। তার মানে অমল আর ওকে দোতলার ঘরে নিয়ে যেতে চায় না।

মধুময়ের খুব ইচ্ছে হল একবার দোতলার সেই বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াতে।

মধুময় যদি ওপরে যেতে চায় আর ওপরে গিয়ে দেখে যে অমলের স্ত্রী বাড়িতেই আছে, তাহলে অমল লজ্জা পেয়ে যাবে।

—চা খাবি?

—খেতে পারি।

অমল এবার উঠে গিয়ে ভেতরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, রাখু, রাখু—

রাখু এলে মধুময় কি জিগ্যেস করবে, বলো তো রাখু, তোমার দাদাবাবুর বউ বাড়িতে আছেন কিনা?

মধুময়ের একটু হাসি পেল।

পরক্ষণেই তার মাথায় আর একটা উদ্ভট চিন্তা জাগল। অমলের কাছে কিছু টাকা ধার চাইলে কেমন হয়?

মধুময়ের টাকার দরকার নেই। দুটো মাস চালাবার মতন যথেষ্ট হাতখরচ তার আছে। তবু সে অমলকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে চায়। খুব বেশি নয় শ'দুয়েক টাকা যদি চাওয়া যায়? মধুময়ের মতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে অমল নিশ্চয়ই দুশো টাকা ধার দিতে পারে। কিন্তু মধুময় ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল বলে অমল কি এখন টাকাটা দিতে চাইবে না? ওর বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার মতন কথাটা ঘুরিয়ে দেবে?

এই সময় লোহার গেট ঠেলে দুটি মেয়ে ভেতরে এল। একজন অমলের ছোট বোন বনানী, অন্যজন বিবাহিতা। এই নিশ্চয়ই অমলের স্ত্রী। তাহলে তো অমল মিথ্যে কথা বলেনি।

অমল অবশ্য ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল না, অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে লাগল।

মধুময় যখন বনানীকে দেখেছে তখন ও ফ্রক পরত, এখন শাড়ি পরে রীতিমতো মহিলা হয়ে গেছে। সে অমলের স্ত্রীর সঙ্গে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। মধুময় ডেকে বলল, এই বনানী, কেমন আছিস?

বনানী ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে হেসে বলল, ও মা, মধুদা! চিনতেই পারিনি। আমি ভাবলাম কোনও অচেনা লোক। এত বড়-বড় চুল রেখেছ!

কিন্তু মধুময় খুব ভালোভাবেই জানে, বনানী তাকে আগেই চিনেছিল, ওর চাহনি দেখেই বোঝা যায়। চিনতে পেরেও কথা না বলে চলে যাচ্ছিল।

বনানী বলল, এসো বউদি, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে মধুময়দা, দাদার খুব বন্ধু ছিল, এক সময় খুব আসত আমাদের বাড়ি—

মধুময় উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, নমস্কার! আপনি আগে আমার কথা শোনেননি অমলের কাছে? আপনাদের বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি, তখন আমি জেলে ছিলাম।

অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল হঠাৎ। কেউ কোনও কথা বলল না একটাও।

মধুময় এবার একগাল হেসে বলল, আমি ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম।

এবার অমল সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল প্রতিবাদ করে বলে উঠল, মোটেই না, কেন ইয়ার্কি করছিস, মধু? সবাই জানে তুই কিছু করিসনি, পুলিশ তোর নামে কোনও কেস দিতে পারেনি। জজ তোকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

বনানী বলল, আমরাও কাগজে তাই পড়েছি।

অমল বলল, ওকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছিল। আজকাল পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এমন অপদার্থ।

বনানী বলল, ইস, তোমাকে অনেকদিন জেলে আটকে রেখেছিল, তাই না মধুদা? রোগা হয়ে গেছ সেই জন্য?

অমলের স্ত্রী বেচারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কী বলবে বা কী করবে বুঝতে পারছে না।

মধুময় ভাবল, ওর তো এমন অবস্থা হবেই। কেননা নিশ্চয়ই মধুময়কে নিয়ে আগেও অনেক আলোচনা হয়েছে। মধুময় যে ট্রেনে ডাকাতি করেছিল তাতে ওদের কোনও সন্দেহ নেই। পুলিশ অনেক সময়ই এসব প্রমাণ করতে পারে না, সেই জন্যই তো বাঘা-বাঘা উকিলরা রয়েছে। তাছাড়া মধুময় কোথায় ধরা পড়েছিল, তাও তো কারুর আর অজানা নেই।

অমল যে জোর করে মধুময়কে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে, তার মানে ওর স্ত্রীকে জানাতে চায় যে একজন ডাকাত অমলের বন্ধু নয়। তাও আবার বিচ্ছিরি ধরনের ডাকাতি। অনন্ত সিং-এর দলে ভিড়ে কোনও রাজনৈতিক ডাকাতি করলেও তবু কিছুটা মান রক্ষা করা যেত।

অমলের স্ত্রী বলল, আপনি বসুন। চা-টা কিছু দেয়নি? আমি দেখছি।

দ্রুত পায়ে সে ভেতরে ঢুকে গেল।

এরপর চায়ের সঙ্গে মিষ্টিও এল। অমল জোর করে ছাত্র বয়সের গল্প করতে লাগল। হেসে উঠল কয়েকবার। যেন মধুময়ের সঙ্গে তার আগের মতনই বন্ধুত্ব আছে।

কিন্তু মধুময় যেই বলল, এবার উঠি—অমল তার উত্তরে বলল না, আর একটু বোস। সেও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

বাইরের লোহার গেটটার কাছে এসে মধুময়ের মনের মধ্যে আবার বিড়বিড় করে উঠল। অমল তাকে একবারও দোতলার ঘরে যেতে বলল না। অমলের বউ কিংবা বনানী আর ফিরে এল না তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য।

গেটটা খোলার জন্য হাত দিয়েও থেমে গিয়ে মধুময় বলল, তোরা বললি আমি নির্দোষ, পুলিশ আমায় মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছিল, কিন্তু স্বপ্না সে কথা বিশ্বাস করে না।

অমল বলল, স্বপ্নার সঙ্গে অনেক দিন দেখা নেই। কেমন আছে স্বপ্না?

—আমার সঙ্গে দেখা হয় না।

—ও।

একটু থেমে মধুময় বলল, জানিস অমল, আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই ট্রেনে ডাকাতি করেছিলাম।

একটুও না চমকে অমল তেতো গলায় বলল, কেন গিয়েছিলি! তোর কি এতই টাকার অভাব? মেসোমশাই তো এখনও চাকরি করছেন।

—আমি কোনও চাকরি পেলাম না।

—চাকরি না পেলেই কি ভদ্দরলোকের ছেলেরা ডাকাতি করে? এখন তোর একটা বাজে রেকর্ড হয়ে গেল, এখন কে তোকে চাকরি দেবে?

অমল তুই আমার একটা উপকার করবি? বিশেষ দরকার, তুই আমাকে দুশো টাকা ধার দিবি?

যতটা চমকানো উচিত ছিল, ততটা চমকাল না অমল। সে যেন এরকম কিছুরই প্রতীক্ষা করছিল। একটা কোনও মতলব না থাকলে কি মধুময় হঠাৎ এমনি এসেছে এতদিন বাদে!

ভাবলেশহীন গলায় অমল বলল, কিন্তু আমার যে একদম হাত খালি ভাই। গত মাসে দার্জিলিং গিয়েছিলাম বাড়ির সবাইকে নিয়ে। তাতেই একেবারে ফতুর হয়ে গেছি।

—কিছু দিতে পারিস না? অন্তত শ'দেড়েক? বিশেষ দরকার বলেই বলছি।

—খুব মুশকিলে ফেললি...গোটা কুড়ি তিরিশ টাকা দিতে পারি বড় জোর।

—আচ্ছা থাক।

গেট খুলে বেরিয়ে গেল মধুময়। হাসিমুখে বলল, চলি।

মধুময় কয়েক পা এগিয়ে যাওয়ার পর অমল বলল, গোটা পঞ্চাশেক হলে যদি চলে, কিংবা সামনের সপ্তাহে—

মধুময় বলল, না থাক, তার আর দরকার হবে না।

কিছু দূর যাওয়ার পর মধুময়ের মুখ থেকে হাসিটা আপনা-আপনি মুছে গেল। এ রকমই তো হওয়ার কথা ছিল। মধুময় কি অন্যরকম কিছু আশা করেছিল? অমল তো এর থেকেও খারাপ ব্যবহার করতে পারত।

মন খারাপ—মন খারাপ—মন খারাপ—প্রতি পদক্ষেপে মধুময়ের মন খারাপ বাড়তে লাগল, তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

এ সবই বদলে দিতে পারে স্বপ্না। যদি স্বপ্না একবার এসে বলে, আমি তোমায় ভুল বুঝিনি—অমনি মধুময় অন্য মানুষ হয়ে যাবে। সে স্বপ্নার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে অগ্রাহ্য করবে পৃথিবীর আর সবকিছু।

অথবা, এক্ষুনি হাতে একটা ছুরি নিয়ে মানুষের ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেও মধুময়ের মন খারাপ কেটে যেতে পারে।

মধুময়দের বাড়ির দরজাটা দিয়ে ঢুকেই একটা ছোট মতন গলি। সেখানে ওদের চিঠির বাক্স। সদর দরজা প্রায় সারাদিন খোলা থাকে বলে চিঠির বাক্সে তালা দেওয়া।

পোস্টম্যান যখন চিঠি দিতে এসেছে, ঠিক সেই সময় মধুময় বেরুচ্ছিল। পোস্টম্যানের কাছ থেকে সে চিঠিগুলো চেয়ে নিল। ভাগ্যিস নিয়েছিল! নইলে এ চিঠিটাও পড়ত বাবার হাতে।

সাদা শক্ত কাগজের লম্বা খামটা মধুময় চট করে ভরে নিল নিজের পকেটে, বাকি চিঠিগুলো ফেলে দিল বাক্সে।

বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে মধুময় পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে খুলল। বোম্বাই থেকে তার মামা প্রায়ই মধুময়কে তাড়া দিয়ে চিঠি লিখছেন। মধুময় যেন অবিলম্বে সেখানে চলে আসে। এই চিঠিখানা খুবই জরুরি।

মেজোমামা লিখছেন যে মধুময়ের জন্য তিনি একটি চাকরি প্রায় পাকা করে ফেলেছেন। একটা নাম-করা ওষুধ কোম্পানিতে অফিসার্স ট্রেইনী, এখন পাবে আটশো টাকা, ছ'মাসে ট্রেনিং কমপ্লিট করতে পারলে বারোশো থেকে আঠারোশো টাকা স্কেলে পোস্টিং হবে, সঙ্গে আরও নানারকম সুযোগ সুবিধে আছে। বোম্বাইতে বাড়ি ভাড়া পাওয়া খুব শক্ত। এই কোম্পানি ফ্ল্যাটও দেবে।

মধুময়ের যা যোগ্যতা তাতে এর চেয়ে ভালো কাজ সে নিজে কখনও জোগাড় করতে পারবে না। এই চাকরিটা তার এক্ষুনি লুফে নেওয়া উচিত। এরপর থেকে সে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে

পারে।

মেজোমামা লিখেছেন, এ মাসের সাতাশ তারিখে শুধু একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে আছে যদিও, তবুও ওটা শুধু নিয়মরক্ষার জন্য। মধুময় যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোম্বাই চলে আসে।

মধুময় একবার ভাবল, চিঠিখানা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে রাস্তায় উড়িয়ে দেবে। পরে মেজোমামা বাবাকে কিছু জানালে মধুময় অনায়াসেই বলতে পারবে, কই, আমি তো সেরকম কোনও চিঠি পাইনি!

আবার একটু ভেবে, চিঠিখানা না ছিঁড়ে পকেটেই রেখে দিল। এ মাসের সাতাশ তারিখ, তার মানে এখনও আটদিন দেরি আছে। পঁচিশ তারিখে শেষ হচ্ছে মধুময়ের দু-মাসের ব্রত। যদি সে যাওয়া ঠিক করে, তাহলে পঁচিশ তারিখ রাত্তিরেও সে প্লেনে করে বোম্বাই পৌঁছে যেতে পারে।

যদি সে যায়। সে যাবে কি না, নির্ভর করছে স্বপ্নার ওপর। স্বপ্না যদি ক্ষমা করে, তাহলেই শুধু সে সুন্দর পরিচ্ছন্ন জীবনে ফিরে যাবে। বোম্বাইতে বড় কোম্পানির অফিসার, সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

স্বপ্না যদি না চায়, তাহলে এসব চাকরির কোনও মূল্যই নেই মধুময়ের কাছে। বারোশো টাকা মাইনে? ফুঃ! ধনার প্ল্যান অনুযায়ী একটা গাড়ি মল্লিকবাজারে ডেলিভারি দিলেই দু-হাজার টাকা হাতে আসবে।

মেজোমামা যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন তাঁর গাড়িতেই মধুময় ড্রাইভিং শিখেছিল। সে ঝড়ের মতন উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে গাড়ি। ধনার সঙ্গে একমাসে সে তিরিশখানা গাড়ি হাওয়া করে দিয়ে রোজগার করতে পারে ক্যাশ ষাট হাজার টাকা। সে আর কোনওদিন ছবি আঁকবে না। সে ধনা আর রতনদের মতন মুখ খিস্তি করবে সবসময়। সে অন্য জীবন বেছে নেবে, যে জীবন অনেক বেশি রোমাঞ্চকর।

তখন সবসময় কাছে একটা ছুরি রাখবে মধুময়। কিংবা রিভলভার। তখন কেউ তাকে ধরতে এলে আর বোকার মতন ধরা দেবে না সে।

স্বপ্না থাকলে একরকম জীবন, স্বপ্নাকে বাদ দিয়ে আরেকরকম জীবন। স্বপ্নার কাছে তার আত্মার একটা টুকরো জমা রয়ে গেছে, যা আর কখনও ফেরত নেওয়া যায় না। স্বপ্না যদি একেবারে দূরে সরে যায়, তাহলে অর্ধেক আত্মা নিয়ে মধুময় দিন-দিন অমানুষ হয়ে উঠবে।

সেদিন স্বপ্নাকে মধুময় আবিষ্কার করল দুপুরবেলা মেট্রো সিনেমার সামনে। স্বপ্না চঞ্চলভাবে ঘড়ি দেখছিল। মধুময় একটু দূরে দাঁড়াল। যাতে স্বপ্না তাকে দেখতে না পায়, কিন্তু সে ঠিক নজর রাখতে পারে। স্বপ্না খুবই ব্যস্তভাবে ছটফট করছে।

ঠিক তিনটে বেজে দশ মিনিটে একটি ফিয়াট গাড়ি এসে থামল তার সামনে। একটি অতিরিক্ত ভালো পোশাক পরা যুবক তার থেকে নেমে প্রচুর ক্ষমা চাইতে লাগল দেরি হওয়ার জন্য।

স্বপ্নার ভুরু কুঁচকে ছিল, আস্তে-আস্তে তা সরল হল। তারপর সে হাসল। একটু পরেই ওরা দুজনে চড়ে বসল গাড়িতে। গাড়িটা ভোঁ করে বেরিয়ে গেল। মধুময় দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র পনেরো-কুড়ি গজ দূরে। ওদের দুজনের কেউই তাকে লক্ষ করেনি।

ওই ছেলেটিকে চেনে মধুময়। কয়েকদিন ধরে স্বপ্নার সঙ্গে ওকে দেখছে। ছেলেটি একজন বিখ্যাত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়কের ছোট ভাই। নিজেও গান-টান গেয়ে কিছু নাম করেছে। ওর নাম সুরজিৎ।

গাড়িতে ওঠবার সময় সুরজিৎ আর স্বপ্না এমন গাঢ়ভাবে তাকিয়ে ছিল পরস্পরের দিকে, যা শুধু প্রেমিক-প্রেমিকারাই তাকায়।

মধুময় একটু হাসল। বিবাহিত পুরুষদের স্ত্রী মারা গেলে অন্তত দু-এক বছরের আগে তারা নতুন বিয়ে করে না। মেয়েদের বুঝি অত দেরি সয় না। স্বপ্নার কাছে এখন মধুময় মৃত কি না

কে জানে। তাহলেও মাত্র এই ক'মাসের মধ্যেই সে আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলল!

চট করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মধুময় অনুসরণ করতে লাগল ফিয়াট গাড়িটাকে। আর কয়েকদিন বাদে, মধুময় যদি অন্যরকম জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তা হলে কিছুদিনের মধ্যে সেও ওরকম একটা ফিয়াট গাড়ি কিনে ফেলতে পারবে।

সামনের গাড়িটা চলল হাওড়ার দিকে। মধুময় ভেবেছিল, ওরা ট্রেনে চেপে কোথাও যাবে। কিন্তু গাড়িটা হাওড়া স্টেশনে ঢুকল না, বাকল্যান্ড ব্রিজের ওপর উঠল।

মধুময় শুধু লক্ষ করছিল, ওরা কতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। স্বপ্না কতটা বদলেছে? সে কি তার নতুন প্রেমিকের সঙ্গে শরীর ছোঁয়াছুঁয়ি করতে রাজি হয়েছে? একটু নির্জন রাস্তায় সে কি সুরজিৎকে টপ করে একটু চুমু খাবার অনুমতি দেবে?

সেরকম কিছু ঘটল না। স্বপ্না খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখেই বসে রইল আগাগোড়া। তবে সুরজিৎ নামের ছেলেটি বড় বেশি সিগারেট খায়। গাড়ি চালাতে-চালাতে সে সিগারেট ধরাচ্ছিল, একবার স্বপ্না বুঝি তাকে বকল, তারপর নিজেই লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল ওর সিগারেট।

গাড়িটা থামল শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের সামনে।

মধুময় অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হল। এই বাগানেও ইচ্ছে করলে চুমু-টুমু খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সেই সুযোগ কি ওরা নেবে? মধুময় শুধু দেখে নিতে চায়।

আর মাত্র সাতদিন। তারপরেই স্বপ্নার মুক্তি। মধুময়েরও মুক্তি। স্বপ্নার কাছে তার আত্মার যে টুকরোটা জমা আছে, আর সাতদিন পরে মধুময় সেটার দাবি একেবারেই ছেড়ে দেবে।

ওরা বাগানের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর মধুময় ঢুকল। সে ওদের ঠিক খুঁজে নিতে পারবে। এই কয়েক সপ্তাহে মধুময় অনুসরণ করার ব্যাপারে পুলিশের গোয়েন্দাদের চেয়েও দক্ষ হয়ে উঠেছে।

ছুটির দিন নয়, তাই বেশি ভিড় নেই। যারা এসেছে, তারা সবাই প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকা। মধুময়ের সঙ্গেও স্বপ্না দু-বার এসেছে এখানে। স্বপ্নার সেসব কথা মনে পড়ছে না? কিংবা স্বপ্না মন থেকে মধুময়কে একেবারেই মুছে ফেলেছে?

স্বপ্না আর সুরজিৎ প্রথমে খানিকটা ঘুরতে লাগল এলোমেলো। সুরজিৎ এক-একবার স্বপ্নার হাত ধরতে চাইছে, আর স্বপ্না ছাড়িয়ে নিচ্ছে হাত। কিন্তু তার মুখে হাসি। খুব নিচুগলায় গান গাইছে স্বপ্না। সুরজিৎ তো রীতিমতো গায়ক, কিন্তু সে গান গাইছে না।

একবার ওরা ঢুকল একটা অর্কিড হাউসে। ওখানে মধুময় যেতে পারবে না। তাহলে নির্ঘাত ওদের চোখে পড়ে যাবে। বাইরে থেকে লোহার সিকের ফাঁক দিয়ে মধুময় চোখ রাখতে লাগল ওদের ওপর। সুরজিতের চুমু-টুমু খাওয়ার বেশ ইচ্ছেই আছে মনে হয়। সে মাঝে-মাঝেই স্বপ্নার কাঁধে হাত রাখতে চাইছে, কিন্তু স্বপ্না ঠিক সুযোগ দিচ্ছে না।

মধুময় বেশ উপভোগই করছে ব্যাপারটা। সে কখনও রাস্তাঘাটে মেয়েদের পিছু নেয়নি। আর এই প্রায় দু-মাস সে প্রথম একটি মেয়ের পিছু-পিছু ঘুরছে, যার সঙ্গে তার অন্তত দশ বছরের নিবিড় পরিচয়। যাকে সে মনে করত সবচেয়ে আপন। অথচ সে স্বপ্নার সঙ্গে একটাও কথা বলছে না।

স্বপ্না বেড়াতে ভালোবাসে। মধুময়ের সঙ্গেও সে প্রায়ই বেড়াতে যেত। কিন্তু তখন কি স্বপ্নাকে এত খুশি-খুশি দেখাত? এখন যেন স্বপ্না বেশি উজ্জ্বল!

অর্কিড হাউস থেকে বেরিয়ে স্বপ্না আর সুরজিৎ গেল ঝিলটার ধারে। এখানে নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়।

স্বপ্নাই বলল নৌকো চড়ার কথা। সুরজিতের খুব একটা ইচ্ছে নেই মনে হচ্ছে। বোধহয় সে সাঁতার জানে না। কিন্তু সে কথাটা স্বপ্নার কাছে বলতেও লজ্জা পাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত সুরজিৎ রাজি হল। দরাদরি হল নৌকোওয়ালার সঙ্গে। দুজনে নৌকোয় উঠেও বসল। হঠাৎ সুরজিৎ পকেটে হাত দিয়ে বলল, সিগারেট দেশলাইটা গাড়িতে ফেলে এসেছি।

স্বপ্না বলল, থাক, সিগারেট খেতে হবে না।

অনেকক্ষণ খাইনি। দৌড়ে গাড়ি থেকে নিয়ে আসব।

স্বপ্না বলল, না।

সুরজিৎ নৌকোয় চড়ার নার্ভাসনেস কাটাবার জন্য সিগারেট ছাড়া থাকতে পারবে না। সে এবার বলল, মানিব্যাগটাও রেখে এসেছি গাড়িতে। নৌকোর ভাড়া দিতে হবে না?

স্বপ্না বলল, আমার কাছে পয়সা আছে।

সুরজিৎ বলল, তাহলেও মানিব্যাগটা গাড়িতে ফেলে রাখা মোটেই ঠিক হবে না। প্লিজ, এক্ষুনি আসছি।

আচ্ছা, নিয়ে এসো।

নৌকো থেকে নেমে দৌড় শুরু করার আগে সুরজিৎ ঠাট্টা করে বলে গেল, দেখ, আবার একলা-একলা ভেসে যেও না যেন।

স্বপ্না কিন্তু নৌকোয় বসে রইল না। সুরজিৎ চলে যেতেই নৌকো থেকে নেমে দ্রুত পায়ে একটা ফুলগাছের ঝোপের এপাশে চলে এসে মধুময়ের মুখোমুখি দাঁড়াল।

—তুমি কী চাও?

মধুময় একটুও চমকে যায়নি। সে সদ্য একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে ভাবছিল, সিগারেটের প্যাকেটটা সে সুরজিৎকে উপহার দেবে কিনা। বেচারা অত দূরে গাড়ি পর্যন্ত দৌড়ে যাবে আসবে!

—কিছু চাই না তো।

বেশি রাগ হলে স্বপ্না কেঁদে ফেলে। মধুময় জানে সে কথা। এখনও স্বপ্না কাঁদেনি অবশ্য। কিন্তু চোখ ছলছল করছে।

—তুমি কেন সবসময় দিনের-পর-দিন, আমার পেছনে-পেছনে ঘুরছ? তুমি কি ভাবো, আমি তোমাকে দেখতে পাই না?

—আমি যদি তোমায় দূর থেকে দেখতে চাই, সেটাও কি অপরাধ? তুমি আমায় বারণ করেছিলে তোমাদের বাড়িতে যেতে। সেখানে তো আর যাইনি আমি। এমনকি তোমাদের পাড়াতেও আমি যাই না—

—কিন্তু আমি বলেছিলাম, আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তবু তুমি কেন আমাকে জ্বালাতন করছ?

—জ্বালাতন! আমি বুঝতে পারিনি।

—দিনের-পর-দিন সবসময় যদি বোঝা যায় একজন কেউ নজর রাখছে তার ওপর, কেউ সহ্য করতে পারে?...এরকম করলে আমি পাগল হয়ে যাব।

—নজর রাখার জন্য নয়, আমি শুধু দূর থেকে তোমায় দেখতাম।

—সেদিন ডায়মন্ডহারবারে ওপারে লঞ্চ থেকে নামবার সময় একটা লোককে তুমি ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে। আমি জানি। লোকটা যদি মরে যেত!

—সেই ছেলেটা তোমাদের অপমান করেছিল, দরকার হলে আমি ওকে মেরেই ফেলতাম...এমন কি ট্রেনে সেই মাতালটা—

—তুমি বুঝি আজকাল খুনজখমও শিখেছ? সে তোমার যা খুশি করো...কিন্তু তোমায় কে অধিকার দিয়েছে আমার ওপর পাহারাদারি করবার? আমার কোনও দরকার নেই।

মধুময় দ্রুত ভেবে নিল, হ্যাঁ, সত্যিই এখন দরকার নেই। এখন তো স্বপ্নার সঙ্গে সুরজিৎ থাকেই। কিন্তু সুরজিৎও যদি স্বপ্নার অমতে স্বপ্নাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করত, তাহলে মধুময় নিশ্চয়ই

সুরজিতের মাথাটা ভেঙে দিত।

স্বপ্না বলল, আমি যখন যেখানে যাই, সিনেমায়, বন্ধুর বাড়িতে, গানের ক্লাসে, সবসময় তুমি আমার পেছন-পেছন ঘোর। কেন?

মধুময় চুপ করে রইল।

—আজও এখানে ঢোকার পরই আমি তোমায় দেখতে পেয়েছি। সবসময় পেছন-পেছন কেউ আসছে, এটা জানতে পারলে মানুষের কি বেড়াতে ভালো লাগে? তোমার জন্য কি আমি বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দেব?

উত্তর না দিয়ে মধুময় ভাবল, মেয়েদের মাথার পিছনেও চোখ থাকে, সেইজন্য তারা দেখতে পায়। স্বপ্না জানে যে মধুময় তাকে দেখছে, সেইজন্যই কি সে সুরজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেনি গাড়িতে? সেইজন্যই কি সে সুরজিৎকে চুমু খেতে দেয়নি?

মধুময় উত্তর দিচ্ছে না দেখে স্বপ্না আরও রেগে গেল। সে বেশ উঁচুগলায় বলল, তুমি অর্কিড হাউসের গরাদের ফাঁক দিয়ে বিশ্রীভাবে তাকিয়েছিলে আমাদের দিকে। কেন? তুমি কেন এরকম ব্যবহার করছ আমার সঙ্গে?

স্বপ্না বোধহয় এবার কেঁদেই ফেলবে। মধুময়ের একটা কিছু বলা উচিত।

মধুময় খুব বিনীতগলায় বলল, আমার ভুল হয়েছিল। আজই শেষ, আর কোনওদিন তুমি আমায় দেখতে পাবে না।

স্বপ্না বাঁ-হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল।

—স্বপ্না, তুমি কেঁদো না। আমি আর তোমায় কষ্ট দেব না। আমি তোমার জীবন থেকে সরে যাচ্ছি। এবার আমার অন্য জীবন শুরু হবে।

—দয়া করে তুমি আমায় মুক্তি দাও।

—কথা দিলাম, তুমি আমায় আর কোনওদিন দেখতে পাবে না।

স্বপ্না চঞ্চল হয়ে দূরের দিকে তাকাল। মধুময় জানে যত জোর দৌড়েই যাক, সুরজিৎ-এর মধ্যে ফিরতে পারবে না।

মধুময় বলল, আকাশ মেঘলা, হঠাৎ ঝড় উঠতে পারে, বেশিক্ষণ নৌকোয় থেকো না।

স্বপ্না ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, তোমার তা ভাববার দরকার নেই। আমার জন্য তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না।

—আচ্ছা।

স্বপ্না ঘুরে যাচ্ছিল, মধুময় হাত তুলে বলল, দাঁড়াও, আর একটা কথা—

—কী?

—জেল থেকে আমি তোমায় তিনখানা চিঠি লিখেছিলাম, তুমি কি সত্যিই সেগুলো পাওনি?

—না।

—সেই চিঠিতে আমি ক্ষমা চেয়েছিলাম তোমার কাছে। আমি জীবনে একবার ভুল করেছি। তার জন্য কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না?

—ভুলের প্রশ্ন নয়। সে হলে অন্য কথা ছিল। তুমি আমাকে সাঙ্ঘাতিক অপমান করেছ।

—অপমান?

—নিশ্চয়ই! তুমি রেল-ডাকাতি করতে গিয়েছিলে। সেটাকেও না হয় আমি একটা অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে মেনে নিতাম। কিন্তু তুমি আমাকে না জানিয়ে, গোপনে একটা খারাপ মেয়ের বাড়িতে রাত কাটাতে যেতে...তুমি আমাকে মুখে ভালোবাসার কথা বলে একটা বাজারের মেয়ের কাছে...ছি, ছি, ছি—

মধুময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—বলো, তুমি সত্যি করে বলো, তুমি সেই মেয়েটার বাড়িতে রাত কাটাওনি? পুলিশ সেখান থেকে তোমায় ধরেনি? বল, তুমি সেখানে যাওনি?

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

—তোমার লজ্জা করে না! তারপরেও তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসো!

—আর আসব না। তুমি মুক্তি চাইলে, মুক্তি দিলাম।

গেট বেশ অনেকটা দূর, তবু এর মধ্যেই সেখান থেকে ফিরে এসেছে সুরজিৎ। দূর থেকেই সে দেখেছে স্বপ্নাকে একজনের সঙ্গে কথা বলতে। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে সেখানে এসে দাঁড়াল। ভুরু কুঁচকে গেছে তার।

স্বপ্না সুরজিতের হাত ধরে বলল, চলো।

কয়েক পা এগিয়ে একবার পিছন ফিরে মধুময়ের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ স্বপ্নাকে জিগ্যেস করল, কী বলছিল লোকটা? তোমার আগে থেকে চেনা?

স্বপ্না বলল, হ্যাঁ।

—কে?

—এমনিই চেনা, আমাদের আগেকার পাড়ায় থাকত।

মধুময় তার পরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। সুরজিৎ আর স্বপ্নার নৌকোয় ওঠা দেখল। স্বপ্নার মুখখানা লাল। এখনও সে ভেতরে-ভেতরে রাগে গজরাচ্ছে নিশ্চয়ই।

মধুময় ভাবল, স্বপ্না ভালো সাঁতার জানে। নৌকোটা যদি উলটেও যায়, স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিতে পারবে সুরজিৎকে। মধুময়ের সাহায্যের দরকার হবে না।

নৌকোটা ছেড়ে যেতেই মধুময় ফিরল।

গেট পেরিয়ে এসে পকেট থেকে বের করল মেজোমামার চিঠিখানা। কোনও দ্বিধা না করে সেটাকে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিল হাওয়ায়। অস্ফুটগলায় বলল, বিদায়! বিদায় বোম্বে! ওই জীবন আমার চাই না!

বাসে চেপে খানিকটা গিয়ে আবার নেমে পড়ল মধুময়। একটা রিকশা নিয়ে অনেক ঘুরে-ঘুরে তারপর এসে নামল গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সামনে। সদর দরজা খোলা। মধুময় উঠে এল দোতলায়। একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিল দু-বার।

মুক্তো বোধহয় ঘুমোচ্ছিল তখন। ঘুম-চোখের বিস্ময় অনেক বেশি দেখায়।

—কি গো, তুমি? তুমি আবার এসেছ! তোমার সাহস তো কম নয়!

মধুময় গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলে, তুমি আমায় চিনতে পেরেছ?

—কেন চিনব না? তুমি তো সেই নাড়ুগোপাল। এসো, ভিতরে এসো।

মধুময় বলল, না, ভেতরে যাব না। আমি তোমার কাছে দু-একটা কথা জানতে এলাম।

মুক্তো বলল, ভেতরে এসো না। দরজায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি কথা হয়?

মধুময় তবু সেখানে দাঁড়িয়েই জিগ্যেস করল, তুমি কোর্টে দাঁড়িয়ে কেন বললে, তুমি আমায় চেনো না? তোমার বলা উচিত ছিল, আমি তোমার সঙ্গে বিছানায় রাত কাটিয়েছি। আমার সঙ্গে চোরাইমাল ছিল। তুমি এ কথা বললে আমার নির্ঘাত জেল হত। তুমি কেন সত্যি কথা বলোনি?

কেন, খুব জেল খাটার শখ হয়েছে বুঝি?

—আমার শাস্তি পাওনা ছিল।

মুক্তো মধুময়ের হাত ধরে টেনে জোর করে ঘরের মধ্যে এনে বলল, একটু বোসো না বাপু! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আবার কথা কী? চা খাবে?

—না। আমি এক্ষুনি চলে যাব।

—আহা রে, তোমার মুখখানা এত শুকনো কেন গো? কেউ বুঝি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছে?

মধুময় জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, না না, কে আবার দুঃখ দেবে! আমি সহজে দুঃখ পাই না।

মুক্তো তার শরীরটাকে যেন গ্রাহ্যই করে না। সায়া ও ব্রেসিয়ারের ওপর একটা পাতলা শাড়ি জড়ানো। মাঝে-মাঝেই আঁচলটা খসে যাচ্ছে বুক থেকে, সে সম্পর্কে তার কোনও হুঁশ নেই। আবার প্রলোভন দেখাবারও যে-কোনও চেষ্টা নেই, তাও বোঝা যায়।

মধুময় মুক্তোর চোখে চোখ রেখে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। তুমি আমায় চেনো না! তবু তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলে কেন?

—শোনো ছেলের কথা! কেন আবার কী? আমার ইচ্ছে হয়েছিল তাই!

—পুলিশ তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল?

—দু-চার ঘা চড়চাপড় দিয়েছিল। ওরকম মার খাওয়া আমাদের ঢের অভ্যাস আছে। দাঁড়াও, চা বানাই।

—না থাক, আমি চা খাব না।

—বীয়ার-টিয়ার খাবে? আনাব?

—কিচ্ছু না।

—ওরে বাবা, তুমি যে দেখছি, একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ। তা হঠাৎ এতদিন বাদে এসব কথা?

মধুময় বলল, তোমার কাছে আর একটা কথা জানতে চাই। আমি যদি আবার কখনও হঠাৎ অসময়ে এসে পড়ি, তুমি কি আমায় থাকতে দেবে?

মুক্তো মধুময়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল, তোমাকে আমি একটা কথা বলব? তুমি ওসব গুন্ডামি বাদমাইশির লাইনে যেও না। ওসব তুমি পারবে না। তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ভালো ছেলে।

মধুময় চোয়াল শক্ত করে মুখখানাকে নিষ্ঠুরের মতন করে জিগ্যেস করল, তুমি আমায় তখন থাকতে দেবে কি দেবে না?

মুক্তো হাসতে-হাসতে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে বলল, না।

মধুময় উঠে দাঁড়াল।

—অমনি রাগ হল বুঝি? চলে যাচ্ছ যে?

মুক্তো মধুময়ের মাথার চুলের মধ্যে হাতে ডুবিয়ে বলল, তোমার যখন খুশি চলে এসো আমার কাছে...টাকা থাক বা না থাক। সেসব চিন্তা করতে হবে না...তোমার মন খারাপ হলেই আমার কাছে চলে আসবে, কেমন?

মধুময়ের হঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। কান্না লুকোবার জন্যই সে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বিকেলবেলা সাঙ্ঘাতিক ধুলোর ঝড় উঠেছিল, তারপর থেকেই একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে। বছরের এই সময়টা লোকে ছাতা নিয়ে বেরোয় না, তাই রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। ধনা আর মধুময় এসে দাঁড়াল লাইটহাউস সিনেমার সামনে। সন্ধে সাতটা বাজে।

অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ঘুরে-ঘুরে পছন্দ করতে লাগল গাড়ি। ধনা আবার প্লেট দেখেও বুঝতে পারে কোন গাড়িটা কত নতুন। শুধু চকচকে চেহারা দেখলে বিশ্বাস নেই।

মধুময় পরে আছে একটা ক্রিম রঙের স্যুট, গলায় টাই। এই পোশাকে সে কয়েকবার চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। আজও একরকম ইন্টারভিউ দিতেই এসেছে। ধনা পরেছে পাজামা আর

একটা ধার করা সিল্কের পাঞ্জাবি। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা।

কোটের পকেট থেকে একতাড়া চাবি বার করে মধুময় প্রথম চেষ্টাতেই খুলে ফেলল দরজাটা। গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার আগে সে দরজাটা খুলে কয়েক মুহূর্তে বসে রইল চুপ করে। দেখা দরকার, কেউ কোনও প্রতিবাদ করে কিনা। এখান থেকে পালাবারও সুবিধে আছে, দৌড়ে কোনওক্রম নিউ মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারলেই হল।

কেউ কিছু বলল না।

ধনা গাড়িতে ওঠেনি সে খুব সপ্রতিভাবে বলল, ব্যাক কর, ব্যাক কর। পেছনে অনেকটা জায়গা আছে।

মধুময় গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ব্যাক গিয়ার লাগাল। খুব সহজেই বেরিয়ে এল গাড়িটা। মধুময় ঘুরিয়ে নিল ডানদিকে। তারপর সামনের সিটের দরজাটা খুলে দিতেই ধনা উঠে পড়ল চট্ করে।

মধুময় অ্যাকসেলারেটারে চাপ দিল। সাঁ করে এগিয়ে আবার ঘুরল ডানদিকে। লিন্ডসে স্ট্রিট দিয়ে এসে চৌরঙ্গি, তারপর পার্ক স্ট্রিটের উলটোদিকে ময়দানের রাস্তা। ধনার চোখে মুখে উল্লাস ফেটে পড়ছে একেবারে।

—দেখলি তো কত সোজা!

মধুময় সত্তর-আশি কিলোমিটার স্পিডে রেড রোড দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িটার পিক আপ ভালো। চালিয়ে আরাম আছে।

গঙ্গার ধার দিয়ে ওয়াটগঞ্জের দিকে ঘুরে মধুময় আবার ফিরে এল ময়দানে।

ধনা বলল একটু অন্ধকার দেখে গাড়িটা একবার থামা।

—কেন?

—আমার ঝোলাতে দুটো ফল্‌স নাম্বার প্লেট আছে, সেগুলো লাগিয়ে দেব, তাহলে আর কোনও শালা কিছু করতে পারবে না।

—তার দরকার নেই।

—হ্যাঁ, অবশ্য, সিনেমা ভাঙতে-ভাঙতে আমাদের ডেলিভারি হয়ে যাবে। তার আগে তো কেউ আর খোঁজ করবে না! এখন চল, মল্লিক বাজারের দিকে।

—আমার একটু ঘুরতে ইচ্ছে করছে, অনেকদিন বাদে গাড়ি চালাচ্ছি তো!

—তোর হাত দারুণ মাইরি!

আরও আধঘণ্টা গাড়িটা নিয়ে গঙ্গার ধারেই ঘুরপাক খেল মধুময়। পেট্রলের কাঁটাটা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তার বেশি ঘোরা যাবে না।

গাড়িটা এক জায়গায় থামিয়ে মধুময় আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল কাজটা সত্যিই খুব সোজা।

ধনা অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে বলল, তোকে বলেছিলাম না? কোনও রিস্ক নেই। কোনও শালা ধরতে পারবে না!

মধুময় বলল, এবার ফেরার পালা।

ধনা বলল, সার্কুলার রোড দিয়ে সোজা বেরিয়ে চল মল্লিকবাজার।

মধুময় বলল, আজ মল্লিকবাজার যাব না।

ধনা বলল, তার মানে? তাহলে কোথায় যাবি? তুই এখন বেশি দেরি করলেই বিপদ। আমি সব কথা বলে এসেছি, গাড়ি ডেলিভারি দিলেই—

—আমি এখন গাড়িটা ফেরত রেখে আসব।

—কি পাগলের মতন কথা বলছিস।

—আজ ট্রায়াল দিলাম। দেখলাম, পারা যায় কিনা। দেখা হয়ে গেল, এখনও শো

ভাঙেনি...এখন গাড়িটা ঠিক জায়গায় রেখে এলে গাড়ির মালিক কিছু টেরই পাবে না।

—কিন্তু গাড়িটা ফেরত রেখে আসবি কেন? এক্ষুনি গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে গেলেই তো ক্যাশ চারহাজার টাকা। তোতে আমাতে সমান-সমান।

—তোকে আমি বলেছিলাম না আমার একটা ব্রত আছে... একমাস তেইশদিন বাদে আমার যা ঠিক করার করব? তার এখনও তিনদিন বাকি। আমি এ লাইনেই যাব, কিন্তু সেই তিনদিন কেটে না গেলে কাজ শুরু করব না, আজ শুধু ট্রায়াল দিতে এলাম।

—দ্যাখ মধু, ইয়ার্কি করিস না, গাড়ি ঘোরা।

—না ইয়ার্কি না। মাত্র আর তিনটেদিন ওয়েট করতে পারবি না? বললাম না, আমার একটা ব্রত আছে।

—ব্রত আবার কী? তুই কি মেয়েছেলে নাকি যে ব্রত করবি!

—সত্যি অনেকটা যেন মেয়েছেলের মতনই হয়ে গেছি রে। যাক, আর তো মোট তিনটে দিন। আমি এক কথার মানুষ রে ধনা! আমি যখন তখন মত বদলাই না।

—তা বলে তুই গাড়ি ফেরত দিতে যাবি? পাগল ছাড়া কেউ এ কথা বলে? গাড়িটা এখানেই ফেলে রেখে যা।

—তার দরকার নেই, এখনও অনেক সময় আছে।

—ধনা চিৎকার করে উঠল, আমায় নামিয়ে দে! আমায় শিগগির নামিয়ে দে তাহলে!

ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে মধুময় হেসে বলল, ভয় পাচ্ছিস? তাহলে নেমে যা।

ধনা নেমেই ছুটতে লাগাল এবং তক্ষুনি মিলিয়ে গেল মাঠের অন্ধকারে।

মধুময় ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে পাঁচ, এখান থেকে লাইটহাউস পৌঁছতে দু-তিন মিনিট লাগবে।

গ্র্যান্ড হোটেলের পাশ দিয়ে লাইটহাউসের গলিতে ঢুকতেই মধুময় দেখল সামনে প্রচুর ভিড়।

মধুময়ের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। এত ভিড় কেন? সিনেমা কি ভেঙে গেছে? তা তো হতেই পারে না। ইংরেজি সিনেমা অনেক সময় তাড়াতাড়ি ভাঙে, কিন্তু ছবিটা অনেক বড়, শেষ হবে আটটা কুড়িতে। ধনা আগে থেকে খোঁজখবর নিয়ে গেছে।

মধুময় একটা দিক শুধু খেয়াল করেনি। ধনারও মনে পড়েনি এ কথা। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে সিনেমা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে মিনিট পনেরো আগেই হল থেকে বেরিয়ে এসেছে লোক।

মধুময় মেল ট্রেনের চেয়েও দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এখন সে কী করবে? এখান থেকে গাড়ি ঘোরাবার উপায় নেই। মধুময় পিছন দিকে তাকাল। পিছনে গাড়ি এসে গেছে, সে ব্যাক করেও পালাতে পারবে না। এগিয়ে যেতে হবে সামনেই। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্য দিয়ে...সে ধরা পড়ে যাবে...সে ধরা পড়ে যাবে...মধুময় প্রচণ্ড জোর হর্ণ বাজাল।

কিন্তু ভিড় সরে গেল না। মধুময়ের মনে হল, সমস্ত লোকজন যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। যেন এক হিংস্র জনতা, আর প্রত্যেকেরই হাতে অস্ত্র। মধুময়ের সমস্ত শরীর কাঁপছে, শিরাগুলো যেন ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে। স্টিয়ারিংটা জোরে চেপে ধরল মধুময়। সে ঠিক করল, সে থাকবে না। সে এই সমস্ত লোককে চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কিংবা গাড়িটা এরোপ্লেনের মতন লোকজনের মাথায় ওপর দিয়ে উড়িয়ে নেওয়া যায় না? মধুময় থামবে না, কিছুতেই থামবে না...

মধুময় দরজা লক করে দিল, কিন্তু কাচটা তোলার সময় পেল না। আর আগেই জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল অনেকগুলো হাত। একজন হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠল, এহি আদমি...

মধুময় কোনও কিছু কথা বলার সুযোগ পেল না। তার চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নামানো হল বাইরে। অন্যান্য গাড়ির ড্রাইভাররাই বেশি হিংস্রভাবে এগিয়ে এল তাকে মারবার জন্য। বিরাট

একটা শোরগোল চ্যাঁচামেচির মধ্যেও যেন খুব সরুগলায় দু-একবার শোনা গেল, না—না—না—।

সকলেই তার মাথা লক্ষ্য করে মারতে চায়। মধুময় এক হাতে মুখ চাপা দিয়ে আর এক হাতে মার ঠেকাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একসঙ্গে অনেকে মিলে কিল-ঘুষি চালানোয় মধুময় পা সোজা রাখতে পারল না। পড়ে গেল মাটিতে।

দু-একজন ড্রাইভার লোহার হ্যান্ডেলও হাতে নিয়েছে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় বেশিক্ষণ পড়ে থাকলে মার খেতে-খেতে ওখানেই মরে যেত মধুময়। কলকাতায় মানুষ মারতে ভালোবাসে। এইরকম সময় অনেকের মধ্যেই এসে যায় খুন করার নেশা। কত লোকের কত ব্যাপারে রাগ জমে থাকে, সেইসব রাগ একসঙ্গে দপ্ করে জ্বলে ওঠে আগুনের মতন। সবাই মিলে একজনকে খুন করলে কারুর মনেই খুনের অপরাধ লাগে না।

কিন্তু সে কিছুতেই জ্ঞান হারাবে না। ওই অবস্থাতেও সে যেন জপ করার মতন বলতে লাগল, আমি করব না—আমি মধুময়—আমি বেঁচে থাকব।

ঠিক কোনও আরণ্যক প্রাণীর মতন মধুময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর গাছপালা ভেদ করার মতন সে মানুসের ভিড়ের মধ্যে ঢুঁ দিয়ে ছুটল, দু-হাতে মুখ ঢাকা। কেউ আটকাতে পারল না তাকে। কয়েকজন তাড়া করে এল অনেকটা। কিন্তু তার আগেই সে নিউ মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

নিউ মার্কেটের মধ্যেও কত মানুষ। সবাই যেন মধুময়ের শত্রু। মধুময় মাথা খারাপ বেড়ালের মতন ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক। তারপর অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আবার ছুটল।

দৌড়তে-দৌড়তে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট পার হয়ে একটা ছোট পার্কে ঢুকে পড়ে জিরোতে লাগল মধুময়। একটুক্ষণ দম নেওয়ার পর সে মিলিয়ে দেখতে লাগল তার শরীরের সবক'টা অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ ঠিক আছে কিনা। দুটো চোখ, দুটো কান, একটা নাক, দুটো হাত, দুটো পা—সব ঠিকই আছে। তবে দাঁত নেই ক'টা, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তখনও। দামি কোটটা ধুলো-রক্তে মাখামাখি। ঠোঁট ফুলে গেছে, মাথার পিছন দিকটায় দারুণ ব্যথা।

ধনা ঠিকই বলেছিল, গাড়িটা ফেরত দিতে যাওয়া ঠিক হয়নি। মাঠের মধ্যে ফেলে রাখলেই হতো। মানুষের উপকার করতে নেই। সিনেমা দেখার পর লোকটার বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে, সঙ্গে হয়তো কেউ আছে—এই ভেবেই...।

কিন্তু চোরাই গাড়ির ডেলিভারি ব্যবসায় নেমে এসব কথা ভাবতে নেই, বুঝলে মধুময়। মধুময় নিজেকে এই কথা বলল। আর কয়েকদিন পর আমি এসব কথা একদম ভাবব না। প্রত্যেক দিন অন্তত দুখানা করে গাড়ি হাওয়া করে দেব!

গাড়ি চুরি করা সহজ, ফেরত দেওয়া কঠিন। মধুময় আর কোনওদিন এইরকম পাগলামি করবে না। আজকের মার খাওয়ার ঘটনাটা চেপে যেতে হবে, ধনা যেন জানতে না পারে।

কোটটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল মধুময়। গলা থেকে টাইটাও খুলে ফেলল। এসব আর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। পার্কের মধ্যের ছোট পুকুরটায় নেমে বেশ ভালো করে মুখ হাত ধুয়ে নিল সে। একটা চিরুনি থাকলে ভালো হতো, আঙুলগুলোই চিরুনির মতন করে চালিয়ে দিল চুলের মধ্যে।

ওপরে উঠে এসে কলকাতা শহরটাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, আর দু'দিন অপেক্ষা কর, তারপর মধুময় দন্ত দেখিয়ে দেবে সে কী! কেউ তার চুলের ডগাও ছুঁতে পারবে না। সে সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।

মধুময় বাড়ি ফিরল রাত প্রায় এগারোটায়। দেরি হলে, খাবারঘরে ভাত ঢাকা থাকে। সে ভেবেছিল অন্য সবাই শুয়ে পড়লে সে চুপি-চুপি ঢুকে পড়বে নিজের ঘরে। কিন্তু মা জেগে বসে

আছেন খাওয়ার ঘরে। একা।

মধুময়কে দেখেই মা উঠে দাঁড়িয়ে ভীত-গলায় বললেন, তুই এত দেরি করে ফিরলি। এদিকে আমি চিন্তায়-চিন্তায় মরছি।

মধুময় মুখের কাছে হাত চাপা দিয়ে আছে। যাতে মা তার ফোলা ঠোঁটটা দেখতে না পান!

—স্বপ্না সেই কখন থেকে বসে আছে তোর জন্যে—

মধুময় চমকে উঠল। স্বপ্না? এত রাত্তিরে স্বপ্না? সে তো অনেকদিন বাড়িতে আসেই না।—স্বপ্না?

—হ্যাঁ। ওর কি হয়েছে?

—তা আমি জানব কি করে?

—আমায় কিছুই বলছে না। কাঁদছিল। তারপর বলল, তোর সঙ্গে দেখা না করে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না।

ভুরুর কাছেও চোট লেগেছে, তাই ভুরু কোঁচকাতে গিয়ে মধুময়ের ব্যথা লাগল। মধুময় ভেবে পেল না স্বপ্না কেন এসেছে! স্বপ্না কি কোন বিপদে পড়ে তার সাহায্য চায়? অথচ, স্বপ্নাই সেদিন বলেছিল, সে আর মধুময়ের মুখ দেখতে চায় না। সে পছন্দ করে না মধুময়ের পাহারাদারি।

মধুময় তো আজ সারারাত বাড়িতে না-ও ফিরতে পারত। তাহলে কি স্বপ্না তার জন্য অপেক্ষা করত সারারাত?

মধুময় নিজের ঘরের দিকে এগোতেই মা সঙ্গে এলেন। মধুময় বলল, তুমি একটু এখানে বসো। আমি আগে একটু আলাদা কথা বলে দেখি।

মা এতক্ষণ পর মধুময়কে লক্ষ করে বললেন, তোর মুখের এ কি চেহারা হয়েছে?

—ও কিছু না!

ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল মধুময়। না, স্বপ্না এখন আর কান্নাকাটি করছে না। একটা বই খুলে বসে আছে চোখের সামনে।

মধুময়ের এখন আর বুক কাঁপছে না। স্বপ্নাকে সে মন থেকে মুছে ফেলেছে। তার জীবনে আর স্বপ্নার প্রয়োজন নেই।

—কী খবর? তুমি এত রাত্তিরে?

স্বপ্না উঠে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এটাও কি মধুময়কে চমকে দেওয়ার জন্য? বাড়ির লোক নিশ্চয়ই কিছু ভাববে। এত রাত্রে স্বপ্না মধুময়কে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সেই নীতি-বাতিকগ্রস্ত স্বপ্না!

স্বপ্না বলল, আমি সন্ধের শো-তে লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

এবার মধুময়ের না চমকে উপায় নেই। স্বপ্না তাহলে নিজের কোনও প্রয়োজনে আসেনি? স্বপ্না খুবই অহঙ্কারী, সে কোনও প্রয়োজনের জন্য মধুময়ের কাছে সাহায্য চাইতে আসবে না।

মধুময় স্বপ্নার কথায় গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য বলল, সেখানে আমি অবশ্য তোমায় অনুসরণ করে যাইনি! আমি কথা দিলে কথা রাখি।

স্বপ্না বলল, আমার নিয়তিই বোধহয় আমাকে আজ সন্ধেবেলা ওখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

মধুময় ঠাট্টার সুরে বলল, তাই নাকি? আমি নিয়তি মানি না।

—তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব, উত্তর দেবে?

—বলো।

—তুমি সেদিন বলেছিলে, এরপর থেকে তুমি অন্য জীবন শুরু করবে। সে কি এই জীবন?

একটুও দ্বিধা না করে মধুময় বলল, হ্যাঁ।

স্বপ্না হঠাৎ বসে পড়ল মধুময়ের পায়ের কাছে, মধুময়ের হাঁটু চেপে ধরে বলল, আর একটা

কথা শুধু বলব...সুরজিৎ দু-বার আমাকে চুমু খেয়েছে। আমি বাধা দিইনি, সেজন্য তুমি কি আমায় ক্ষমা করবে?

আজ অনেকগুলো চমকাবার অস্ত্র নিয়ে এসেছে স্বপ্না। মধুময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে একেবারে। এ তো অন্যরকম স্বপ্না! একে যেন মধুময় চেনেই না।

সুরজিৎ তোমায় ভালোবাসে, সে তো তোমায় চুমু খেতেই পারে। এতে দোষের কী আছে?

—আমি ওকে ভালোবাসি না। আমি ভুল করেছি। একবার ভুল করলে কী ক্ষমা করা যায় না? তোমার কাছ থেকে এর উত্তর না জেনে আমি ফিরবই না।

—মধুময় বলল, এসব গোলমেলে কথা তুলে আর লাভ কী? তুমি মুক্তি চেয়েছিলে, আমি মুক্তি দিয়েছি তোমায়। আর তো ক্ষমা-টমার প্রশ্নই ওঠে না।

স্বপ্না বলল, আমি মুক্তি কাকে বলে জানি না। আমাকে মুক্তি দেওয়া মানে কি ভুল জায়গায় ঠেলে দেওয়া?

—সুরজিৎ খুব ভালো ছেলে।

—হোক ভালো। কিন্তু ওর কাছে তো আমার আত্মার কোনও অংশ জমা নেই।

—আমার কাছে আছে নাকি?

—তুমি জানো না!

—আমি যদি লাইটহাউস সিনেমায় না গিয়ে এলিট সিনেমায় যেতাম, তাহলে আর তুমি নিশ্চয়ই আজ আমার কাছে আসতে না। উঠে দাঁড়াও।

—তুমি আগে বলো, আমায় ক্ষমা করবে কি না? বলো, বলো, বলো, বলো—

মধুময় ক্ষীণভাবে হাসল। তারপর নিচু হয়ে স্বপ্নার দু-হাত ধরে বলল, ওঠ। তুমি ঠিকই বলেছ, নিয়তিই বোধহয় আজ সন্ধেবেলা আমাদের দুজনকে এক জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল।